ইতিহাস অনুসন্ধান ১৯

সম্পাদনা

অনিরুদ্ধ রায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা * * * * * ২০০৫

ITIHAS ANUSANDHAN - 19

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ২০০৫

প্রকাশক ঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ ঃ রাহুল কুণ্ডু

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ ঃ
জেনিথ অফসেট
২০বি, শাঁখারীটোলা
কলকাতা ৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

মূল নিবন্ধকারের অভিভাষণ

বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ

বিভাগ ঃ প্রাচীন ভারত

বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

আর্থ সামাজিক - রাজনৈতিক ইতিহাস

আন্দোলন ও সমাবেশের ইতিহাস

আঞ্চলিক ইতিহাস

চিন্তা-চেতনার ইতিহাস

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-কেন্দ্রিক ইতিহাস

নারী ইতিহাস

পরিবেশের ইতিহাস

বিভাগ ঃ ভারত বহির্ভূত

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যতীত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহ — ফিরে দেখা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও ইতিহাস সংসদের সদস্য বন্ধুরা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা ভারতে যে বিপুল গণবিদ্রোহ ফেটে পড়ে, যাতে অংশগ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র, শ্রমিক ও একটু পরে ব্যাপক কৃষক সমাজ, তার ফল কি হয়েছিল তাই নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তখনও নানান বির্তক ও ভিন্নমত ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। এই গণবিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্র সংগঠক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকেও পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদ হিসেবে আমার একটা মূল্যায়ন অবশ্যই ছিল। আজ ফিরে দেখতে গিয়ে আমার সেই মূল্যায়নই রয়েছে, তবে তাতে কিছু কিছু পরিবর্তনও করা উচিত বলে মনে করছি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দখলের শেষ সংগ্রামের ডঙ্কা বাজিয়ে ছিল সর্বপ্রথম নিঃসন্দেহে ভারতের ছাত্রসমাজই। মহাচীনে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে গণবিপ্লবের সূচনায়, বিশেষ করে ১৯১৯ এর ৪ঠা মে-র গণবিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে চীন বিপ্লবের মহানায়ক মাও জে দং লিখেছিলেন যে চীনের ছাত্র সমাজই ছিল গণবিপ্লবের "Bugler, Bridge and standard bearer"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের বিশাল গণবিদ্রোহেও তেমনই ভূমিকা পালন করেছিল এদেশের ছাত্রসমাজ। গর্বের কথা যে সেই গণ বিস্ফোরণের সূচনা হয়েছিল আমাদেরই মহানগরী কোলকাতায়, ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর তারিখে।

১৯৪৫ এব ২১শে নভেম্বর সকাল হয়েছিল অন্য যে কোনও দিনের মতই। জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংস্থারা ডাক দিয়েছিল লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারের প্রহসন বন্ধ কর, মুক্তি দাও তাদের সকলকে। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছিল ছাত্রদের এই সাধারণ ধর্মঘটকে। যদিও এই ছাত্র সংগ্রাম থেকে যুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহ ফেটে পড়বে, তা কেউই তখন উপলব্ধি করেনি—না জাতীয়তাবাদীরা, না কমিউনিষ্টরা। দ্বিপ্রহরে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জমায়েত হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। মুখে তাদের রণধ্বনি "আজাদহিন্দ ফৌজকো ছোড় দেও" আর "আজাদহিন্দ ফৌজ হামারা দোস্ত" 'ছাত্রফেডারেশনের পতাকা হাতে কয়েকশত ছাত্রকে

সভাস্থলে প্রবেশ করতে দেখেই, মঞ্চ থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংস্থার নেতৃবর্গ ব্রজধ্বনি দিলেন "বন্ধুগণ, কমিউনিষ্টপার্টি ও তাদের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ফেডারেশন নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে বলেছে ফ্যাসিস্ট। তাই আমরা বলি 'কমিউনিষ্ট পার্টি হামারা দুশমন"। হাজার হাজার ছাত্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল "কমিউনিষ্ট পার্টি হামারা দুশমন"। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কোনও কথা না বলে; দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে সোজা এগোতে শুরু করল। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাও মিছিলের পিছনে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁদের মুখে স্লোগান "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এক হও।"

মিছিল চলল ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। ম্যাডান ষ্ট্রীট আর ধর্মতলা ষ্ট্রিটের মোড়ে নিউসিনেমার সামনে ঘোড়ায় চড়ে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টরাও গুর্খা পুলিশ বন্দুক হাতে মিছিলের পথ রোধ করল, আর এগোতে দেবে না। মিছিল সুশৃঙ্খলভাবে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে বসে পড়ল। ছোট ছোট দলে ভাগ হওয়া ছাত্রদের সামনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তৃতা বলতে লাগল। একটি অবাঙ্গালী ছাত্র দৃপ্ত কণ্ঠে গান গেয়ে মিছিলের সামনে থেকে পিছনে ঘুরতে লাগল — সেই আজাদ হিন্দ ফৌজেরই গান 'কদম কদম বাড়ায়ে যা, এ খুসীকা গীত গায়ে যা, এ জিন্দেগি হ্যায় ফৌজ কি, ফৌজসে লুটায়ে যা'। ক্রমে সারা মিছিলই সেই গানে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। দীর্ঘ বহুবছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে মিছিলে এসেছে। তাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ প্রায় ছিল না। তারা বল্ল আজ যারাই মিছিলে এসেছে, তারা ছাত্র-কংগ্রেসেরই হোক, আর ছাত্র ফেডারেশনেরই, তারা সবাই আমাদের বন্ধু। "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবিতে সমগ্র ছাত্র সমাজ এক হও" এই ছিল তাদের স্লোগান।

ধর্মতলা ষ্ট্রিটে বেশ কয়েকটি ঝালাই এর দোকানে কর্মরত বেশ কিছু মুসলিম নওজোয়ানও এসে ধ্বনি দিতে লাগল "সাম্রাজ্যবাদী হুঁশিয়ার, হাম নওজোয়ান হ্যায় তৈয়ার!" আর মাঝে মাঝেই ধ্বনি দিল "হিন্দু-মুসলমান এক হো"। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেতারা নেতাজী সুভাষের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কাছে খবর পাঠালেন, তিনি মিছিলের সামনে এসে নেতৃত্ব দিন। কিছুক্ষণ পরে শরৎবসুর অনুগামী একজন কংগ্রেসী এম.এল. এ. শরৎবসুর লেখা চিঠি নিয়ে এসে তা পড়ে শুনিয়ে দিলেন মিছিলের সামনে। তাতে লেখা ছিল "ছাত্ররা তোমরা উস্কানিদাতাদের প্ররোচনায় মিছিল করেছ, এটা কমিউনিষ্টদের চক্রান্ত। তোমরা ফিরে যাও।" ছাত্ররা চিঠিটির বয়ান শুনে স্তম্ভিত। বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির (RCPI) একজন ছাত্র নেতা (নিরঞ্জন সেন) লাফ

দিয়ে উঠে কংগ্রেসী এম.এল.এর হাত থেকে চিঠিটি কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলে দিলেন। ছাত্ররা জয়ধ্বনি করে উঠলো।

সন্ধ্যার মুখে মুখে পুলিশ কমিশনার এসে ছাত্রদের বল্ল তোমরা মিছিল ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাও, নইলে আমরা গুলি চালাবো ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল যে তারা ফিরবে না, বর্জগর্জন উঠল ''চল চল ড্যালহাউসী চল, দিল্লি চল'' ''আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই'' ''সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসহোক''। আচমকা গুলি চালাতে শুরু করল পুলিশ, আর ঘোড়ার আক্রমণ। ছাত্ররা পালাল না, হাতের কাছে যা পেল ভাঙ্গা ইট, সোডার বোতল তাই ছুঁড়ে প্রতিরোধ করতে লাগল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ঝালাই দোকানের মুসলিম তরুণেরা। পুলিশের গুলিতে ও ঘোড়ার আক্রমণে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন ছাত্র ও মুসলিম নওজোয়ান। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় (সে কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য বা কোন দলভুক্ত ছিল না) গুলিতে নিহত হ'ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণবিদ্রোহের রামেশ্বরই প্রথম শহীদ। তার একটু দূরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল মুসলিম জঙ্গী নওজোয়ান আবদুস সালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (পরে প্রসিদ্ধ গায়ক ও গীতিকার) সলিল চৌধুরি সেই মিছিলে ছিল। পরে সে গান বেঁধেছিল। 'রামেশ্বর শপথ তোমার, ভুল না ধর্মতলা, সালাম ভাই শপথ তোমার ভুল না ধর্মতলা, ভুলনা তোমার মিছিলে মিছিল পতাকা পতাকা মেলা, ভুল না তোমার গর্জন সাম্রাজ্যসাহী হুঁশিয়ার! চল চূর্ণ করি এ জীর্ন কারাগার।'' মাস দুই পরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক ''স্বাধীনতা'' কবিতা লেখেন ''রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসমভাই ভারত জোড়া এই রক্ত গাঙ্গের আজ জবাব চাই। পরে এই কবিতাতে সুর দিয়ে গান গেয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ছাত্ররা কেউ বাড়ি গেল না। সারারাত ধর্মতলা ষ্ট্রীটে বসে রইল। কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে ট্রাম, বাস, রিক্সা ধর্মঘট হয়ে গেল। বিভিন্ন হষ্টেল থেকে ছাত্ররা রাত্রে এসে রাস্তায় বসে থাকা ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দুজন কংগ্রেসী মহিলানেত্রী সারারাত বসে রইলেন ছাত্রদের সঙ্গে --- জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি ও বিমল প্রতিভাদেবী। মায়ের মত সেবা করতে লাগলেন আহত ছাত্রদের। প্রাক্তন বিপ্লবী নেত্রী বীনা দাসও এসেছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। শতাধিক আহত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিষ্ট ছাত্র কর্মী অরুণ সেন। তাঁর পেটের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গিয়েছিল। সরকারি হিসেবে ২০/২১ জন ছাত্র ও নওজোয়ান মারা গিয়েছিলেন, বে-সরকারি হিসেবে অনেক বেশী।

শরৎবসুর ফিরে যাবার পরামর্শ শুনে কয়েকজন ছাত্রনেতা মিছিল ছেড়ে চলে গেলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রধান জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতারা কিন্তু চলে গেলেন না অনেকে। রাস্তায় বসে থাকা ছাত্রদের সঙ্গে বসে রইলেন ছাত্র

ফেডারেশনের প্রতিটি কর্মী, নেতা ও সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এই নিবন্ধের লেখক নিজে, ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠক কমলাপতি রায়, ছাত্র নেতা রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্র ফেডারেশনের নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়, সরোজ হাজরা প্রমুখ। প্রাণ তুচ্ছ করে কয়েকজন আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন তরুণ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী নৃপেণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়াও রাস্তায় বসে রইলেন আর. এস. পি. দলের ছাত্র নেতা বিজন বিশ্বাস, সৌরীন ভট্টাচার্য, বদরুল হায়দার চৌধুরী, ফরোয়ার্ড ব্লকের মালবিকা দত্ত, আর. সি. পি. আই দলের নিরঞ্জন সেন প্রমুখ। এঁরাও নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বহু আহত ছাত্রকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে মানুষের চেতনার কিভাবে রূপান্তর ঘটে তা ঐ সন্ধ্যাতেই দেখা গিয়েছিল। আর.এস.পি. -র ছাত্রনেতা সৌরীন ভট্টাচার্য যিনি কয়েকঘন্টা আগেও শ্লোগান দিয়েছিলেন "কমিউনিষ্ট পার্টি হামারা দুশমন", তিনি কমিউনিষ্ট ছাত্র সংগঠকদের আলিঙ্গন করে বল্লেন যে তাঁরা যেন পার্টি অফিসে গিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের বোঝান যে এই ছাত্র সংগ্রামের সমর্থনে তাঁরা যেন শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করেন একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই পারে একাজ করতে। পার্টি অফিসে গিয়ে দেখা গেল যে তাঁরা ইতিমধ্যেই ২২ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। ট্রাম, বাস, রিক্সা অবশ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিষ্ট নেতা রমেন সেন সেই রাতেই চলে গেলেন মেটিয়াবুরুজে সেখানকার সমস্ত শ্রমিককে ধর্মঘটে সামিল করতে। সোমনাথ লাহিড়ীও মহম্মদ ইসমাইল চলে গেলেন ট্রাম শ্রমিকদের মেসে ও বাসের ডিপোতে ট্রাম, বাস ধর্মঘট করাতে। কমিউনিষ্ট নেতা নৃপেণ চক্রবর্ত্তী চলে এলেন ধর্মতলা ষ্ট্রীটে, সারারাত বসে রইলেন ছাত্রদের সঙ্গে।

২২ নভেম্বর সকাল থেকে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টদের জায়গা নিল ইংরেজ সৈন্যরা, বাংলার গভর্ণর কেসি যাদের নির্দেশ দিলেন রাস্তায় মিছিলকারী দেখলেই গুলি কর। কিন্তু তাতে পিছু হঠল না ছাত্রছাত্রীরা, পিছু হঠল না শ্রমিকরা ২২ নভেম্বর সকাল থেকেই জনস্রোত এগিয়ে চলেছিল ধর্মতলা ষ্ট্রীটের দিকে। কোনও যানবাহন চলছে না। কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে ট্রাম, বাস, রিক্সা সম্পূর্ণ ধর্মঘট করেছে। সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বজবজ থেকে কাঁকিনাড়া, চেঙ্গাইল থেকে চাঁপদানি পর্যন্ত কয়েক লক্ষ চটকল, সূতাকল ও ইনজিনিয়ারীং শ্রমিক।[১]

২২ নভেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। চারিদিকে উড়ছে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতারা নিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে উড়ছে বেশ কয়েকটি স্বাধীনতা, শান্তি প্রগতি লেখা ছাত্র

ফেডারেশনের পতাকাও। কিছুক্ষণ পরে ইসলামিয়া কলেজ থেকে কয়েকশত মুসলমান ছাত্র মিছিল করে এসে সমাবেশে যোগ দিলেন, তাঁদের হাতে মুসলিম লীগের পতাকা পূর্ব কলকাতা থেকে রংকল মজুরদের বড় মিছিল সমাবেশে এল লাল ঝাণ্ডা হাতে। এগিয়ে গিয়ে ছাত্ররা তেরঙ্গা ঝাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে দিলেন লাল ঝাণ্ডা ও মুসলিম লীগের পতাকাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে বজ্রধ্বনি উঠল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিন্দুমুসলমান এক হও, কংগ্রেস লীগ কমিউনিষ্ট এক হও। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সংগ্রামী ঐক্যের চেতনা লুপ্ত করেছে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ।[২]

শরৎবসু তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র অমিয়নাথকে নিয়ে সমাবেশে এলেন। ছাত্ররা ভাবলেন যে বোধ করি তিনি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। তা নয় তিনি ছাত্রদের বল্লেন বাড়ি চলে যেতে, সব ব্যাপারটাই একটা কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র। একথা শোনা মাত্র হাজার হাজার ছাত্র তাঁকে ধিক্কার দিয়ে উঠল এবং স্রোতের মত এগিয়ে চল্ল ধর্মতলা ষ্ট্রীটের দিকে যেখানে সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ে মেশিনগান হাতে মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরেজ সৈন্যরা। ছাত্ররা অবিরাম স্লোগান দিচ্ছে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, চল চল ড্যালহাউসী চল, দিল্লি চল'। কিন্তু গুলি চল্‌ল না। চারিধার থেকে মৃত্যুভয়হীন মিছিল দেখে ভয় পেয়ে গেল ইংরেজ সৈন্যরা ও তাদের কর্তা ব্যক্তিরা সাঁজোয়া গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে তারা চলে গেল একেবারে ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে গড়ের মাঠে। আর প্রত্যাশ্যাতীত জয়ের আনন্দে ছাত্র ও নওজোয়ান — শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ মিছিল উদ্দাম বেগে এগিয়ে গেল ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। মুখে তাদের রণধ্বনি 'জয়হিন্দ' আর ''আংরেজ তুম ভারত ছোড়ো'। নাড়ীতে নাড়ীতে সেদিন নতুন অনুভূতি — স্বাধীনতা প্রায় আমাদের মুঠোর মধ্যে। আমাদের শক্তি : সবদল, সব মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। আমাদের এগোবার পথ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। পথ দেখাল কারা? কলকাতার ছাত্রনওজোয়ান শ্রমিকরা।[৩]

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিক মুখপাত্র 'পিপল্‌স এজ' ১৯৪৫-এর ৭ ডিসেম্বরে ''ভবিষ্যতের ইঙ্গিত'' শিরোনাম দিয়ে এক সম্পাদকীয়তে লিখল ''কলকাতার গত সপ্তাহের ঘটনাতে ভারতের বর্তমান অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বিচারকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতি সমূহের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিছিলে ভারতও পা বাড়াক, এটাই আজ সমগ্র জাতির আকাঙ্খা। সাম্রাজ্যবাদ এই বিক্ষোভ দমনে ব্যবহার করেছে পুলিশ ও মিলিটারির বুলেট। তার বিরুদ্ধে ছাত্র-নওজোয়ান-শ্রমিকদের মৃত্যুভয়হীন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। সে ঐক্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ব্যবহার

করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সংকীর্ণতা ও অন্ধ কমিউনিষ্ট বিদ্বেষের ফলে সে সুযোগ ও সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে।

পিপলস্ এজ তার সম্পাদকীয় শেষ করে এই কটি কথা বলে ঃ ''দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের যে অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠেছে, সে আগুনকে জাগ্রত রাখতেই কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।''[৫] অনেকবছর পরে লণ্ডন থেকে ম্যানসার্ট ও মুন, সম্পাদিত 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ষষ্ঠ খন্ড থেকে আমরা জানতে পারি যে ভারতের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি সারক্লর্ড অকিনলেকও একগোপন হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছিলেন ইংলান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্লোমেন্ট অ্যাটলিকে। তাতে তিনি বলেছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এখনই ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আপস মিটমাট করুন, না হলে ভারতে অদূর ভবিষ্যতে গণবিদ্রোহ ঘটে যাবে, আর তাকে সমর্থন জানাবে ভারতীয় সৈন্যরাও।

১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরেজ সরকার আবার দিল্লিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্য একজন সেনানী ক্যাপ্টেন রশীদ আলির বিচার শুরু করল। তার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুযারি কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল মুসলিম ছাত্র লীগ। তাকে সমর্থন জানিয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। ফলে কলকাতা ও শহরতলীতে পরিপূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট হয়ে গেল এবং এক বিরাট ছাত্র মিছিল এগোতে লাগল ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ধর্মঘট ও মিছিলের যে বর্ণনা দিয়েছিল তার থেকে একটু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছিঃ ''হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সম্মিলিত মিছিলের মুখে রণধ্বনি ছিল ''হিন্দু-মুসলমান এক হও'' ও ''ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।'' বিকেল ৪টে নাগাদ সশস্ত্র পুলিশ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মিছিলের পথরোধ করল। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এস.এম.দোহার নেতৃত্বে পুলিশ লাঠি চালনা করে বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। আহত হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্নদা শঙ্কর ভট্টাচার্য। চারিপাশ থেকে লোকজন এসে পথে ভীড় করে ও মিছিলকারীদের সমর্থনে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা কলকাতায়। ট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, লরি, বাস ও ট্রাক জ্বলতে থাকে। সারারাত কলকাতা বিক্ষোভে উত্তাল থাকে।''[৬]

ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টেও একইধরনের লেখা হয়: ''আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশীদ আলির কারাদন্ডের প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি আবার কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। নেতৃত্ব দিচ্ছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগ। ঐক্যের প্রতীক হিসেবে মিছিলকারীরা উড্ডীন রাখছে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট

পার্টির পতাকাকে। পুলিশ থানা অনেক জায়গায় আক্রান্ত হয়েছে, ফলে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। স্কুল কলেজ সমস্তই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"[৭]

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ও শহরতলীতে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দুই শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ানদের ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করল। ট্রাম, বাস ও রিক্সা শ্রমিকরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ডাক দেয় সাধারণ ধর্মঘটের। নৈহাটি থেকে বজবজ পর্যন্ত ১০ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট পালন করে।[৮] ৪/৫ লক্ষ নরনারীর বিশাল ঐক্যবদ্ধ মিছিল কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা হাতে নিয়ে সারা কলকাতা ও শহরতলী মিছিলে তোলপাড় করে দেয়। তাদের মুখে রণধ্বনি ছিল "হিন্দু - মুসলমান এক হও" আর "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক"[৯]

দ্বিপ্রহরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কয়েকলক্ষ মানুষের বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা করলেন গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাসগুপ্ত, মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাসিম, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা গুণদা মজুমদার, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতা যতীন চক্রবর্ত্তী, কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা মোয়াজেম হোসেন প্রমুখ। সবাই বক্তৃতা করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সপক্ষে। ছাত্র নেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "গতকাল আমাদের মিছিলকে পুলিশের বড়কর্তা দোহা গুলি করে চূর্ণ করার ভয় দেখিয়েছিল। সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের তরফ থেকে আমি বলছি : তোমরা আমাদের পেটাতে পার, গুলি করতে পার কিন্তু চূর্ণ করতে পারবে না।"[১০]

কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এক ধারালো ভাষণে বল্লেন যে নেতাদের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়তে বহু সময় লেগেছে, কিন্তু নীচের তলার জনগণ ইংরেজ সরকারের বুলেটের জবাবে ক্রম মূহুর্তে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছে। তারপরেই ঐ বিশাল জনসমুদ্র বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত এগিয়ে গেল মিশনরো দিয়ে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের দিকে। একটি জাতীয়তাবাদী ইংরেজি দৈনিক পরদিন লিখল "গতকাল ও আজ কলকাতায় যা ঘটে গেল তাকে একটা গণ অভ্যুত্থান ছাড়া কিছু বলা যায় না।"[১১]

১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলাতেই বাংলার গভর্ণর কেসি কলকাতার শাসনভার তুলে দিলেন ব্রিটিশ মিলিটারির হাতে। তারা ফতোয়া জারী করল; মিছিলধারী দেখলেই গুলি চালাও। তার জবাবে কলকাতা ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করল। আর ছাত্র নওজোয়ানরা শুরু করল ডাষ্টবিন ও ঠেলাগাড়ি দিয়ে বড় রাস্তাগুলিতে ব্যরিকেড করে ভাঙ্গা ইঁট আর সোডার বোতল নিয়ে খন্ডযুদ্ধ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ বাংলা ঔপন্যাসিক তাঁর নতুন উপন্যাস ''ঝড় ও ঝরাপাতায়, আরম্ভ করলেন এই বলে ''আজ রশিদ আলি দিবস। আজ কলকাতায় হরতাল। শ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইলের ডাকে ট্রাম, বাস, রিক্সা সব বন্ধ। ছাত্ররা প্রাচীরপত্রে লিখে দিয়েছে "Calcutta is declared out of bounds for British troups"। কলকাতার রক্তাক্ত সংগ্রামে শহীদ হলেন শতাধিক ছাত্র, নওজোয়ান ও শ্রমিক। কলকাতার এই গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট ও পরিপূর্ণ হরতাল হল সারা বাংলায়, ঢাকাতে, চট্টগ্রামে, বরিশালে মৈমনসিংহে এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশের বড় বড় শহরগুলিতে।[১২]

কলকাতার এই গণবিদ্রোহ থামতে না থামতেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের রণডঙ্কা বাজল বোম্বাই ও করাচিতে। এবার বিদ্রোহী হল সরকারের বেতনভূক নৌ সেনারা ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের যুদ্ধ জাহাজ তলোয়ারে ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে তারা উড়িয়ে দিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা — স্বাধীনতার লড়াই-এ সর্বাত্মক ঐক্যের প্রতীক।[১৩] বিদ্রোহী নৌ সেনাদের সমর্থনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। বোম্বাই ও শহরতলীর ৫ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করল ১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি। সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্রাকে চড়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করেও সে সাধারণ ধর্মঘট ভাঙ্গতে পারল না ব্রিটিশ ফৌজ। গুলি চালিয়ে তারা হত্যা করল ২৭০ জন শ্রমিক ও ছাত্র নওজোয়ানকে। গুলিতে নিহত হলেন ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কমিউনিষ্ট শিক্ষায়িত্র কমল ঘোষ।[১৪]

আতঙ্কিত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রেই পার্লামেন্টে ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাট্‌লি ঘোষনা করলেন ''ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা করার জন্য শীঘ্রই এক ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে। অতএব এই নৌবিদ্রোহ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।''[১৫] তাতে সাড়া দিলেন কংগ্রেসনেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মুসলিম লীগনেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। তাঁরা বিদ্রোহী নৌ সেনাদের পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে। প্যাটেল বল্লেন'' এটা নৈরাজ্য এবং কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র।''[১৬] জিন্নাহ্ বল্লেন ''এই বিদ্রোহ দায়িত্বজ্ঞানহীন।''[১৭] কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন মাত্র সদস্য শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, ভারত ছাড় আন্দোলনে প্রসিদ্ধ নেত্রী, প্রকাশ্যে নৌবিদ্রোহিদের সমর্থন করে ঘোষণা করলেন নৌ বিদ্রোহী সেনারা প্যাটেল বা জিন্নার কথা শুনে অস্ত্রত্যাগ করো না, আত্মসমর্পণ কোর না। কলকাতা ও বোম্বাইএর পথে ভারত জোড়া ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান্ সংগঠিত করাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।''[১৮]

জাতীয় নেতাদের পরামর্শ শুনে বিদ্রোহী নৌসেনারা সেদিন আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তবে দেশবাসীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন এক মর্মস্পর্শী আবেদন : ''আমাদের জাতির

জীবনে আমাদের বিদ্রোহ এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই চিহ্নিত থাকবে। এই প্রথম একই আদর্শর জন্য রাজপথে সেনাবাহিনীর রক্ত ও জনগণের রক্ত একই সঙ্গে প্রবাহিত হ'ল। সেনাবাহিনীতে যারা আছি, আমরা তা কখনও ভুলব না। আমরা জানি যে প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারাও তা কখনও ভুলবেন না। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক! জয়হিন্দ!" (বিদ্রোহী নৌসেনাদের কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির বিবৃতি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)।

ঐ একই দিনে লন্ডনে, ভারত থেকে সদ্য প্রত্যাগত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের সদস্য অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক রিচার্ডস সাংবাদিকদের বলেন "আমাদের এখনই ভারত থেকে সরে পড়তে হবে। নইলে ভারতীয়রা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।"[১৯] ১৯৪৬-এ পূর্বভারতে ব্রিটিশ বাহিনীর অধিনায়ক সার ফ্রান্সিস টুকার তাঁর স্মৃতি চারণে লিখেছেন যে ১৯৪৬-এ আর ভারতীয়দের গণবিদ্রোহকে অস্ত্র দিয়ে দমন করা সম্ভব ছিল না।[২০] ফ্র্যাঙ্ক রিচার্ডস ও ফ্রান্সিস টুকারের কথা যে কত সঠিক তা বোঝা যায় দুটি ঘটনা থেকে। নৌসেনাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সেনাপতিরা মারাঠা রেজিমেন্টের এক সহস্র ভারতীয় সৈন্যকে পাঠিয়েছিল। তারা নৌসেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছিল। আর ভারতীয় বৈমানিকরা ধর্মঘট করে নৌসেনাদের বিদ্রোহী জাহাজগুলির উপর আকাশ থেকে গোলাবর্ষণ করতে অস্বীকার করেছিল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এ সব কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

বোম্বাইএর সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী নৌসেনাদের প্রতি সেই কটা দিন অকুণ্ঠ ভালবাসা দেখিয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ বোম্বাইএর টাইমস অব ইন্ডিয়াতে যে খবর বেরিয়েছিল তার থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অ্যাপোলো বন্দরে লোকের ভিড় জমেছে। নাবিকরা লঞ্চে করে কুলে এসে দর্শকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তারপর লঞ্চের পর লঞ্চ ভর্তি খাদ্য, ফল এবং মিষ্টান্ন জাহাজের দিকে যেতে লাগল। এ সবই জনসাধারণের ভালবাসার দান। সে এক অভিনব দৃশ্য।"

২২ ফেব্রুয়ারির টাইমস অব ইন্ডিয়াতে আরও লেখে "ক্যাসেল ব্যারাকের উপর গুলি চালাবার সময় বহু সাধারণ মানুষ পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরে খাবার ফেলে দিয়েছে। তাতে অনেকের জীবন বিপন্ন হয়েছে। আঠারো বছরের একটি শ্রমিক সন্তান এক প্যাকেট ছোলা নাবিকদের দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে ব্রিটিশ সরকার ধর্মঘটী নাবিকদের উপোস করিয়ে নতি স্বীকার করাতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই শহরে অলিগলি থেকে খাবারের প্যাকেট হাতে বহুলোক ছুটে এল। তারা গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে এসে নাবিকদের হাতে খাবারের প্যাকেট ও বালতি

ভর্তি জল তুলে দিল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে পাহারারত ভারতীয় সৈনিকদের দেখা গেল লোকজনদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে লঞ্চে তুলে দিচ্ছে। ইংরেজ অফিসাররা অসহায়ের মত তাকিয়ে রয়েছেন।''

২৩ ফেব্রুয়ারির টাইমস অব ইন্ডিয়াতে খবর বের হয় যে ২২ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ধরে বোম্বাই-এর পথে পথে রক্তস্রোত বইতে থাকে। সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টর্মিগান ও রাইফেলধারী ব্রিটিশ ফৌজ মোতায়েন থেকেছে ও যথেচ্ছ গুলি চালিয়েছে। বহুলোকের তাতে মৃত্যু হয়, বহু লোক আহতও হয়। জনতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মিলিটারি লরির উপর আক্রমণ চালাতে থাকে এবং কয়েকটি লরিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে উঠেছে। ভেন্ডীবাজার অঞ্চলের সমস্ত মুসলমান দোকানদার পূর্ব হরতাল পালন করে। সর্বত্র একধ্বনি ''হিন্দু-মুসলমান এক হও'' আর ''ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।'' নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে সমস্ত সওদাগরী জাহাজের নাবিকরাও ধর্মঘট করে। ছাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমস্ত ছাত্র ধর্মঘট করে।

লালঝান্ডার ভলান্টিয়াররা বহু আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের সাহায্য করতে মুসলিম লরি ড্রাইভাররা এগিয়ে আসে। বেলা তিনটে নাগাদ দাদার রোড ধরে মিলিটারি লরি আসতে থাকে। প্যারেলে বিনা কারণে মিলিটারি লরি বারবার গুলি ছোঁড়ে। প্যারেল মহিলা সংঘের সম্পাদিকা কমরেড কুসুম রণদিভে, কোষাধ্যক্ষ কমল ঘোষ এবং কমরেড অহল্যা রঙ্গমেরুর রেলওয়েষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। কমরেড কমল ঘোষের দেহ ভেদ করে একটি বুলেট চলে যায়। গুলি লাগল এসে কমরেড কুসুমের পায়ে। হাসপাতালে কমরেড কমল ঘোষের মৃত্যু হল এই জায়গায় আরও ৪০জন লোক আহত হয়। মানুষের রক্তে জায়গাটা লাল হয়ে যায়।

গণবিপ্লবের স্রোতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হতে চলেছে দেখে যেমন আতঙ্কিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তেমনই ভয় পেয়েছিলেন জাতীয় বুর্জোয়া নেতারা তাই গণবিপ্লব দমন করার জন্য আপস রক্ষা হয়েছিল বুর্জোরা নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। তার মাশুল গুনেছে দেশবাসী বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে সর্বস্বান্ত হয়ে, দেশ ভাগ হয়ে ছিন্ন মূল জীবন যাপন করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই শেষ পর্বের ভারতীয় সেনাদলের, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর, ছাত্র ও নওজোয়ানদের বৈপ্লবিক ভূমিকা তাই আজও উপযুক্তভাবে স্থান পায় না অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের লেখায়। ব্যাতিক্রমী ইতিহাসবিদ ২/৪ জন অবশ্যই আছেন যেমন অধ্যাপক সুমিত সরকার, যিনি তাঁর বহুল প্রচারিত বই ''মর্ডান ইন্ডিয়া''তে লিখেছেন ''১৯৪৬ এর১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে নৌসেনাদের যে

বিদ্রোহ হয় এবং তার সমর্থনে যে গণবিস্ফোরণ দেখা যায়, তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সবচেয়ে গৌরবময় অথচ বিস্মৃত প্রায় অধ্যায়"২১ তাছাড়াও আছে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা R/N Shike ও গোলাম কুদ্দুসের লেখা তথ্য ভিত্তিক উপন্যাস "লেখা নাই স্বর্ণাক্ষরে"

আর আছে বামপন্থী কবি সমর সেনের একটি অসামান্য কবিতা ঃ

"বম্বেতে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ
রাস্তায় রক্তের ছিটে।
বন্দুকের খর শব্দ থামলে শহরে
বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে।
সর্দারের ধমকের গমকে পার্কের রেলিং কাঁপে,
হয়তো কৃত পাপের লজ্জা লাগে মর্গে জমা ২৭০ টা লাশে।
ধোঁকায় জব্দ জাহাজেরা বন্দরে স্তব্ধ।
মাঝে মাঝে উদ্যতসঙ্গীন, সাম্রাজ্যের উদ্ধত প্রতীক।
আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন প্রায়।
মন্ত্রী সভার বিলিতী দূতেরা আগত প্রায়।
জয়হিন্দ"।[২২]

অবশ্য এই সব বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছেন কোনও কোনও বামপন্থী ইতিহাসবিদও। সুনীতি কুমার ঘোষ তাঁর ইংরেজি বই "India and the Ray" এর দশম অধ্যায়টি লিখেছেন The role of CPI from the outbreak of the war to Transfer of Power নামে। তার একটি অংশের নাম CPI and the Post war upsurge of struggle. নানান ভাষ্যকারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখাতে চাইছেন যে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণসংগ্রামের ঢেউ সমগ্র ভারতে আছড়ে পড়েছিল, এবং যখন তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা কেঁপে উঠেছিল, তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব "বিহ্বল ও উল্টোপাল্টা বুঝেছিল" "(Confused and bewildered)। সুনীতি কুমার ঘোষ আরও বলেছেন যে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭, যখন ভারতবর্ষ তাঁর ভাষায় "একটা আগ্নেয় গিরির মাথায় বসেছিল", তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব শ্রেণীসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। আর তার মূল কারণ ছিল যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব বৈপ্লবিক গণসংগ্রামকে ভয় পেত। তবে তিনি এইটুকু

স্বীকার করেছেন যে সি পি আই এর নীচের তলার কর্মীরা এই সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল, এমনকি তাদের নেতৃত্বও দিয়েছিল।

সুনীতিকুমার ঘোষের সমালোচনার এইটুকু সঠিক যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ১৯৪৫-৪৬এর সংগ্রামে প্রথম দিকে সত্যই বেশ খানিকটা "Confused" ছিল কিন্তু তারা কোনও সময়ই গণসংগ্রামের বিরোধিতা করেনি। ১৯৪৬ এর ১৩ ফেব্রুয়ারি কমিউনিষ্ট পার্টির দৈনিক "স্বাধীনতা"য়, পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী একটি সম্পাদকীয় লেখেন "প্রস্তুত হও" নাম দিয়ে। তাকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আত্মসমালোচনা করে লেখেন যে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার গণ অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে তাঁদের ভুল হয়েছিল। এখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এখন সারা ভারতে মাঝে মাঝেই ছাত্র নওজোয়ান ও শ্রমিকদের যে উত্তাল গণসংগ্রামগুলি ফেটে পড়ছে, তা হচ্ছে ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে উচ্ছেদ করে পূর্ব স্বাধীনতা অর্জনের বৈপ্লবিক সংগ্রামেরই সূচনা।

নৌবিদ্রোহের সময় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এই ভূমিকা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোমনাথ লাহিড়ী এই সময় আর একটি অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় লেখেন 'ইহাদের ভুলিবনা" আর ১৯৪৬ এর ৩ মার্চ "পিপলস্ এজ" এ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য বি. টি. রণ দিভে বোম্বাইএর রাজপথে ব্রিটিশ মিলিটারির গুলিতে নিহত শহীদ কমল ঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন "কমল, আমরা লাল পতাকা অর্ধনমিত করছি। ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে সাম্রাজ্যবাদী বুলেটের আঘাতে তোমার জীবনাবসান হ'ল। বোম্বাই শহরের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া যারা নামিয়ে এনেছে, সেই জনশত্রুরাই তোমার জীবন ছিনিয়ে নিল। তোমায় শহীদ হতে হ'ল, কারণ তুমি আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যাওনি। সামরিক বাহিনীকে দেখে তুমি তোমার নিজের স্থান ত্যাগ করনি। তুমি ভারতের বীর কন্যা! তুমি কমিউনিষ্ট পার্টির বীর কন্যা।[১১]

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর অপর এক সদস্য গঙ্গাধর অধিকারী লেখেন "বাচাল রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনাকে 'রাজকীয় নৌবাহিনীর' ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। সাম্রাজ্যবাদের বড় সাহেবরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে এই বিদ্রোহকে দমন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিকরা এক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের শেষ অধ্যায় বলে অভিহিত করবেন।"

সুনীতি কুমার ঘোষ স্বীকার করেছেন যে ১৯৪৬ এর ২৯ জুলাই ডাক-তার বিভাগের কর্মীদের ভারত জোড়া ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি কলকাতায় এক ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট আহবান করেন এবং কার্যতঃ সেদিন কলকাতায় কোনও

ফৌজ বের করতে বা পুলিশ পাঠাতে সরকার সাহস করেনি। অবশ্য সুনীতি কুমার ঘোষ ১৯৪৬ এর ২৪ জুলাই সমস্ত দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিধানসভা ভবনে যে সাহসী মিছিল ও অবরোধ করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে শ্রমজীবী কৃষকরা জমির দাবীতে বাংলাদেশে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ জুড়ে কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বাধীন কৃষকসভার নেতৃত্বে যে তেভাগার সংগ্রাম করেছিলেন তা এক উল্লেখযোগ্য যুদ্ধোত্তর গণসংগ্রাম। একই ভাবে সংগ্রাম করেছিল মহারাষ্ট্রের থানা জেলার ওয়ারলি আদিবাসী কৃষকরা কমিউনিষ্ট নেত্রী গোদাবরী পারুল করের নেতৃত্বে, কেরালায় পুজাপ্রা ও ভায়লারের সাহসী শ্রমিকরা এক বীরত্বপূর্ণ রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ত্রিবাঙ্কুর কোচে সমস্ত স্বৈর শাসনের অবসানের জন্য এবং সর্বোপরি অস্ত্র হাতে নিজাম শাহীর অবসানের জন্য তেলেঙ্গানার কৃষকরা কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার পরিচালনাধীন অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে, যেখানে শহীদত্ব বরণ করেন। সহস্রাধিক কমিউনিষ্ট কৃষক কর্মী ও নেতা এসবই ইতিহাসের স্মরণীয় সংগ্রাম। এসবই ঐতিহাসিক সত., তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অর্ধশতাব্দীরও পরে এই পুরানো ইতিহাসকে ফিরে দেখতে গিয়ে সেযুগের কমিউনিষ্টদের ও ইতিহাসবিদদের কতকগুলি গুরুতর ঘাটতি এখন চোখে পড়ছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম যা মনে হচ্ছে যে এই যে হিন্দুমুসলমান, সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠছিল, যা যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিল, তার গভীরতা কতটা ছিল? সাম্প্রদায়িকতার উৎস পর্যন্ত গিয়ে শিকড় শুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাকে দেশের মাটি থেকে তা উপড়ে ফেলা যায় নি। তা না হলে ১৯৪৬ এর ২৯ জুলাই এর ভারতব্যাপী অভূতপূর্ব গণ-ঐক্য সংঘটিত হবার মাত্র এক পক্ষকাল পরে ১৬ আগষ্ট মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" দিবসে যুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় যে বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল তা কি করে সম্ভব হল? আমরা তখন এর জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে দায়ী করেছি। সন্দেহ নেই যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ঐক্যকে ভাঙবার জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ মৎলব খুঁজছিল। কিন্তু কোন ছিদ্র পথে তারা সেই ঐক্যকে চুরমার করতে সক্ষম হল?

১৯৪৬ এর অর্ধশতাব্দী আগে ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের একটা বড় অংশ যোগ না দেওয়ায় যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাদের তীব্র সমালোচনা করছিলেন, তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের সঙ্গে দ্বিমত হয়েছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি হিন্দু ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন যে মুসলমানরা বা তথাকথিত নীচু জাতের মানুষেরা হিন্দু উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের (যারাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের) সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তাঁদের ফরাসে

বসতে দেওয়া হত না, হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হত। একাজ করা হ'ত বহু বছর ধরে। তাতে মুসলমানরা ও হিন্দু সমাজের তথাকথিত নীচু জাতের মানুষের মনে যে দারুণ ক্ষোভ বছরের পর বছর জমা হচ্ছিল, তা কি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব মনে রেখেছিলেন? তাঁরা সমস্ত দোষই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছিলেন, নিজেদের দীর্ঘ বছরের অন্যায়ের কোনও আত্ম সমালোচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় "শনির কাজই তো রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সর্বনাশ করা; প্রশ্ন করি ঃ হে গৃহস্থ তুমি রন্ধ্রপথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলে কেন? যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা করেছিলেন, যিনি গান বেঁধেছিলেন "বাঙ্গালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, হে ভগবান," সেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের এই ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে চলে গেলেন, আস্তানা গড়লেন শান্তিনিকেতনে। তিনি রচনা করলেন তাঁর অসামান্য উপন্যাস "ঘরে বাইরে"। নিখিলেশ ও সন্দীপের দুই বিপরীত চরিত্রের মধ্যে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের আত্ম সমালোচনামূলক দৃষ্টি ভঙ্গীটি ফুটিয়ে তুললেন।

কিন্তু এই মারাত্মক ভ্রান্তি জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ধরতে পারলেন না। আর সেই ভুলের মাশুল দেশবাসীকে দিতে হ'ল দেশ ভাগ, ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং ছিন্নমূল জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। সম্ভবতঃ একমাত্র গান্ধীজি প্রথম থেকেই জাতীয় আন্দোলনের এই গভীর ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন, অস্পৃশ্যতা বিরোধী হরিজন আন্দোলন করেছিলেন। মন্ত্রেব মত গান জপে চলেছিলেন 'ঈশ্বর-আল্লা তেরি নাম'। ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বাহ্নে একমাত্র তিনিই কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলেছিলেন যে এখন হস্তান্তরে রাজি না হয়ে, তাঁরা আবার গোড়া থেকে অনৈক্যের উৎস সন্ধান করে তা শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সময় সাপেক্ষ ধৈর্যশীল কাজে হাত লাগান। কিন্তু তাতে একমাত্র সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফর খান ছাড়া কোনও নেতাই সম্মত হলেন না, এমনকি গান্ধীজির গভীর অনুরক্ত জওহরলাল নেহরুও না। গান্ধীজি তাঁর হাতে গড়া কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং অবিরাম বড় বড় প্রার্থনা সভা করে যেতে লাগলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। চলে গেলেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে ও কলকাতায়। আশ্চর্য রকমভাবে ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্টের একদিন আগে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে গেল, ১৫ আগষ্ট পরিণত হ'ল হিন্দু মুসলিম মিলনের উৎসবে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সাপ মরে নি, আহত হয়ে গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল মাত্র। বার বার মাথা তুলছিল। গান্ধীজি কলকাতায় দাঙ্গা থামার পর চলে গেলেন দিল্লিতে, প্রার্থনা সভা করে যেতে লাগলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য। নতুন রণধ্বনি

দিলেন দেশবাসীর সামনে। "হিন্দুস্থান ঔর পাকিস্তান মিলকে রহেঙ্গে, মিলকে চলেঙ্গে"। কিন্তু এই রণধ্বনি উগ্রসাম্প্রদায়িকতবাদীর ক্রুদ্ধ করল এবং ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারি প্রার্থনা সভায় প্রার্থনারত গান্ধীজিকে গুলি করে হত্যা করল, উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সংঘের কর্মী নাথুরাম গডসে। গান্ধীজির শহীদত্ব বরণ তখনকার মত থামিয়ে দিল দেশ জোড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে, কিন্তু তার মূলোচ্ছেদ করতে পারল না। সে দায়িত্ব বামপন্থীরাসহ দেশের জাতীয় নেতৃত্ব দীর্ঘ বহু বছর পালন করতে পারলেন না।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা থেকে এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"এ সমস্যা রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল, তবে কিছুটা পরে ও অন্যভাবে। তাছাড়া তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল আর একটি নূতন সমস্যা এবং তা ভয়াবহ। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন যখন উত্তেজনার শিখর চূড়ায়, তখন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটি প্রচন্ড দাঙ্গা হয়ে গেল। সেই দাঙ্গায় প্রথম আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। মনে হল, কোথায় যেন বড় রকমের একটা হিসেবের গোলমাল হয়ে গেছে। কাউকে কিছু না বলে, কোনও কৈফিয়ৎ ওজুহাত না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আর কোনও যোগ রইল না। কিন্তু তখন বেশী দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দেশে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্বন্ধটা ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রভুদের রাজনৈতিক দাবা খেলার বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ১৯৪৭এ সেই দাবা খেলার শেষপর্ব। সে-পর্বে যেভাবে ঘুটি চালাচালি হল উভয়পক্ষে তাতে আমরা হেরে গেলাম। সেই হেরে যাবার দাম আজও আমরা দিচ্ছি। আরও কতকাল দিতে হবে, কে জানে!"

২০০৪ খৃষ্টাব্দের সূচনাতেও সেই হেরে যাবার দাম আজও আমরা দিচ্ছি। এসব কিছু সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারত ব্যাপী যে অভূতপূর্ব গণবিদ্রোহ হয়েছিল, যাতে অংশ নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র, যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আমাদের মত যে তরুণেরা ছিলাম, তাদের মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবাদের দমননীতিতে প্রাণ দিয়েছেন, কারাবরণ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন. তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের দিন তারা এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছে, যে ভারত ব্যবচ্ছেদকে তারা রুখতে পারেনি, তার ফলে যে সাম্প্রদায়িকতা বারে বারে দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে যে বহু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসী ঘুরে দাঁড়িয়েছে, স্বৈরতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয়কে যে তারা প্রতিহত করেছে, ভারতে যে কখনও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে

তারা দেয়নি, এসবই অতীতের সেই গণবিদ্রোহের ঐতিহ্য থেকে তারা এগোবার শক্তি পেয়েছে। এসব কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

বিশ্বযুদ্ধের পর গণবিদ্রোহের আলোচনা করতে গিয়ে সে যুগের যে সব অবদান, শক্তি ও দুর্বলতার কথা বলেছি, সে সবই এখন ফিরে দেখে সঠিক বলে মনে হয়, তবু এই গণবিদ্রোহের ঐতিহ্য আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গর্ব। ঐ যুগের তরুণ বিপ্লবী কবি সুকান্ত ঐ যুগের সংগ্রামীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তাই দিয়েই শেষ করছি।

"বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে!
আমি যাই তার দিন পঞ্জিকা লিখে।
এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ!
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
আজ দেখ তারা সবেগে সমুদ্যত!
নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট!
তাদেরই দলে আমিও যে আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও মরি বাঁচি!
তাই তো চলেছি দিন পঞ্জিকা লিখে।
বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে!"[২৩]

পদটীকা

১। অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫

২। তদেব

৩। অমৃতবাজার পত্রিকা ২২, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ১৯৪৫, December 1945 এর Bombay থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক The Student পত্রিকায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "In Letter of Blood" এবং Home/Pol/FN21/11/45, NAI.

৪। "Peoples' Age" organ of the (weekly) Communist Party of India. 7 December 1945. Bombay.

৫। তদেব

৬। অমৃতবাজার পত্রিকা ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৭। ক্যালকাটা ডিসটারবেন্স রিপোর্ট, ১২/২/৪৬ সিক্রেট হোম/পল/এফ.এন ৫/১২/৪৬

৮। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৯। তদেব

১০। তদেব ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের দিনলিপি থেকে

১১। তদেব

১২। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

১৩। টাইমস অফ ইন্ডিয়া, বোম্বাই ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

১৪। টাইমস অফ ইন্ডিয়া বোম্বাই ২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৫। স্টেটসম্যান কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৬। অমৃতবাজার পত্রিকা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৭। তদেব

১৮। ষ্টেটসম্যান, কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৯। অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩/২/১৯৪৬

২০। সারফ্রান্সিস টুকার ঃ হোয়াইল মেমারি সার্ভস, লণ্ডন, ১৯৪৯

২১। সুমিত সরকার ঃ মর্ডান ইন্ডিয়া ১৮৮৪-১৯৪৭, পৃঃ৪২৩

২২। সমর সেনের কবিতা, কলকাতা ১৯৫৪

২৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য 'অনুভব' ঘুম নেই কলকাতা

প্রাচীন ভারতীয় শারীর শাস্ত্র ঃ কিছু উপলব্ধ ভাবনা

শুক্লা দাস

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়, কার্যকরী সমিতির শ্রদ্ধাভাজন কর্ণধারগণ, মঞ্চে উপবিষ্ট বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ ও সমবেত সম্মানযোগ্য অগ্রজ ও অনুজ ইতিহাসব্রতী, আপনাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আপনারা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বিংশতিতম বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে প্রাচীন ভারত শাখার সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে আমি সম্মানিত বোধ করছি। বাংলাভাষায় ইতিহাস চর্চ্চার যে অনন্য দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতি আমি হার্দিক শ্রদ্ধাশীল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আবিশ্ব অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলনের ব্যাপ্তির কথা স্মরণে রেখেও দ্বিধাদীর্ণ হয়ে বলতে হচ্ছে যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই কিন্তু কিছু ইতিহাসবিদ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অন্য মনোভাব লালন করেন। অবজ্ঞা, উদাসীনতা বা অনীহা যে ভাবেই এ মনোভঙ্গী ব্যাখ্যাত হোক না কেন তা হয়ত বা অপরিণত মননের প্রতিফলন। বর্তমান সকল কর্মকান্ডেরই একটি পশ্চাৎপট থাকে। তাকে অস্বীকার করলে বর্তমানের কোন অবস্থান থাকে না। ইতিহাস নিরবিচ্ছিন্নতাকে পাঠক্রমেই খণ্ডিত করা যায়, তার মূল ধারাবাহিকতাকে নয়। বিবর্তনের বিশ্লেষণী অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তা করলে অসঙ্গতি থেকে যায়। বলা হয়ত বা বহুলতা যে সমকাল ভারতের বহু সমস্যাই কিন্তু বিশ্লেষণহীন অতীতচারণ সঞ্জাত অথবা প্রাচীন মননের অন্তর্শক্তি ও গূঢ় দিগদর্শনকে উপেক্ষা করারই ফলশ্রুতি। প্রাচীন মননের রক্ষণশীলতা, সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার যৌক্তিক ও অযৌক্তিক ত্রুটি ও অপবাদ স্বীকার করেও বলতে হয় যে, কোন বিষয়ের প্রগাঢ় আলোচনা ও অনুপুঙ্খ সমালোচনায় শিকড় অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সমীক্ষণ অবশ্য বিচার্য।

ইতিহাসের পরিমণ্ডলে আজ কোন কিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়; অর্থাৎ ইতিহাস চর্চ্চা ক্রমান্বয়ে আহরণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আদ্যোপান্ত জড়িত। আজ সকল বিদ্যা তার মৌল শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থেকেও অতিক্রমণের ভিতর দিয়ে এক আন্তর্শৃঙ্খলার সানন্দ পাদদেশে উপনীত। ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। একের মধ্যে অপরের

ধারণার ও ভাবনার অনুসঞ্চারণ historiography কে করে তুলছে ঋদ্ধিময়ী। ঐ প্রবণতা যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সূত্রে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চ্চার ইতিহাসের সীমিত কয়েকটি দিক সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ পাঠাভ্যাস আমাকে করতে হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই পূর্বভারতে সম্ভবত প্রথম স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামাজিক ইতিহাস শীর্ষক দুটি ঐচ্ছিক বিশেষ পত্রের প্রবর্তন করেছে। এই বিষয়গৌরব থেকে খণ্ডিত কিছু উপলব্ধ ভাবনা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করার ধৃষ্টতা রাখছি। এখানেও পুনরায় সানন্দ ঋণ স্বীকার। আমার প্রথম ঋণ প্রয়াত অধ্যাপক শচীন্দ্র কুমার মাইতির কাছে, যাঁর উৎসাহে আমার বিজ্ঞানের ইতিহাসমনস্ক হওয়ার প্রারম্ভিক সূচনা। আমার অন্যতম ঋণ আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের কাছে, যাঁদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা আমাকে প্রাণিত করেছে।

ঔপনিবেশিক পরিবেশে জাত ও লালিত বহু ধারণাই আজ পুনর্বিচারের আলোকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক মননকে অতিরঞ্জিত করে ভারতের বিজ্ঞান মনস্কতাকে অনালোচিত রাখার প্রবণতা ইতিহাস চর্চ্চায় সক্রিয় ছিল দীর্ঘকাল। তীব্র Hellenomania-র ফলস্বরূপ গ্রীক বিজ্ঞানকেই এক সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সূতিকাগার।[১] আরব্য বিজ্ঞান সামান্য উল্লিখিত হলেও ইউরোপীয় অস্মিতায় চৈনিক ও ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার আদি পর্ব ফলত আলোচনার কোন পরিসর পায়নি।

আজ সমগ্র বিশ্বে বিদ্যাচর্চ্চার নবোদিত ক্ষেত্র হলো বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান ও নির্মাণ। ভারত প্রসঙ্গে বলা চলে যে ১৯৫০এ দিল্লীতে তৎকালীন National Institute of Sciences of India (বর্তমান নাম Indian National Science Academy) ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্রেই সুসংহতভাবে ভারতের বিজ্ঞান চর্চ্চার ইতিহাস পর্যালোচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয় যার রূপায়ণকাজ আজও অব্যাহত। এখানেই স্থির হয় যে ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের নিরন্তর সম্মিলন ও সহযোগিতা এই গবেষণা কর্মে অতি আবশ্যিক।[২] আজ ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাডেমি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় নিজস্ব পত্রিকা, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান চিন্তন, কর্মকাণ্ড ও কৃৎকৌশলের বহুকৌণিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ যার সিংহভাগ অধিকার করে থাকে। বিজ্ঞানীদের দ্বারা মুখ্যত নিয়ন্ত্রিত বলে তীব্র সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও[৩] এর সদর্থক ও তাৎপর্যময় ভূমিকা কিন্তু কোনক্রমেই উপেক্ষার নয়। আমরা কি এখনও ঔপনিবেশিক সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ থাকবো? নাকি একটি নিজস্ব কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রভূমির উপান্তে এসে দাঁড়ানো একান্ত জরুরী? আমাদের সময়ক্রম রক্ষার প্রতিবন্ধকতা প্রচুর।

রৈখিক পরম্পরা সম্যক অনুসরণও প্রায় অসম্ভব। তথাপি গবেষণা উদ্যোগগুলি আমাদের জানিয়ে দেয় বিকল্প ইতিহাসের দিকে আমরা যেতে আগ্রহী।

কোন দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিবর্তনের ইতিহাস কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বা যুগান্তকারী আবিষ্কারে সীমায়িত নয়। এই ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা চেতনার সঙ্গে আশ্লিষ্ট।[৪] ভারতের বিজ্ঞানচর্চ্চাকে সমাজপটে স্থাপন ও বিশ্লেষণ করার অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।[৫] বিংশ শতকের প্রারম্ভেই তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তখনও কিন্তু E. Zilsel এর গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধপত্র The Genesis of the Concept of Physical Law (1942), B. Farrington এর Greek Science, Its Meaning for us (1944) বা J. D. Bernal রচিত Science in History খণ্ডগুলি (1954, 4 vols) আত্মপ্রকাশ করেনি যাদের মধ্যে অনুরূপ দিশারই অভিনবত্ব নিহিত। প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদানকে সার্বিক স্বীকৃতি দিলেও অযৌক্তিক মহিমা প্রচারের মোহ থেকে বিরত ছিলেন। তাঁর মতে আমরা যদি রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টকেই আমাদের অভ্রান্ত নির্দেশক মনে করি তাহলে সমূহ বিভ্রান্তি। যুক্তিনির্ভরতাই বিজ্ঞানের উৎস-মুখ। এই উৎস-মুখ সামাজিক চাপে শুকিয়ে যাওয়ার মধ্যেই প্রাচীন ভারতে মৌলিক মনন ও অনুসন্ধিৎসার অবতরণিকা সূচিত।[৬]

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নির্দেশিত দিশার অন্যতম অনুগামীরূপে মেঘনাদ সাহাকেও গণ্য করা যায়।[৭] সম-ভাবনার উত্তরসূরী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।[৮] তিনিও প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান মননের আরোহণ ও অবতরণকে সমাজ ভাবনার গতিপ্রকৃতির আলোকে বিচার করার শ্রম-সাপেক্ষ প্রয়াস করেছেন।[৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রমিলা থাপার প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চ্চার বিচ্ছিন্ন অনন্যতা (isolated uniqueness) ধারণাকে প্রাধান্য দিতে অনাগ্রহী। বরং মননশীলতার আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করার প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন। চিন্তা মননের দেশজ উদ্ভবের (indigenous genesis) সঙ্গে অপরাপর বহিরাগত ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ তাঁর মতে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানের দাবী রাখে।[১০] স্বীকার করতেই হয় যে সকল সংস্কৃতিরই কিছু নিজস্ব শিকড় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু ক্রমাগত বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও আদানপ্রদানের ফলে সাংস্কৃতিক ভাবনার সাদৃশ্য ও নৈকট্য অবাস্তব নয়। বরং এই স্বাভাবিক বিশিষ্ট বা সম-পরিগুলের প্রেক্ষিতে সমান্তরাল ভাবনা বিকাশও সম্ভব।[১১] গ্রহণ, স্বীকরণ ও পরিপ্রসারণ মনস্বিতাকে অবশ্যই বৈভব দান করে কিন্তু ঋণের প্রশ্ন একমুখী হতে পারে না। এ প্রসঙ্গেও আমাদের সম্যক সচেতন হওয়ার অবকাশ আছে।[১২] বিজ্ঞান চর্চ্চায় প্রাচীন ভারতের অবস্থান নির্ণয় প্রতীচ্য মডেলের

দ্বারা অনুধাবণ করার সীমাবদ্ধতা আজ স্বীকৃত।[১৩] দয়া কৃষ্ণের মতে, এখান থেকেই indigenization এর সম্ভাব্য সূত্রপাত।[১৪]

মানব সভ্যতা ও অগ্রগতির ইতিহাস এক অর্থে নিরন্তর ব্যাধি ও তার নিরাময়ের অনিঃশেষ ইতিহাস।[১৫] মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যথার্থই শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা চর্চ্চা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মানবেতিহাসে এই বিদ্যা এক অন্যতম চালিকাশক্তিরূপে আজ চিহ্নিত।[১৬] প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার যে কয়েকটি ক্ষেত্র বলিষ্ঠ সম্ভাবনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার প্রধানতম শারীর ও চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্ব ও প্রায়োগিকতা।[১৭] একে কেন্দ্র করে যে শাস্ত্র সম্ভার গড়ে উঠেছিল তার প্রচলিত নাম আয়ুর্বেদ। শিব শর্মার মতে আয়ুর্বেদ অভিধার ব্যাপ্তি বিশাল সে কথা আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন কারণ এ কেবল নিছক শারীরশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালীর বিবরণের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এ এক বিস্তীর্ণ দর্শনও বটে।[১৮] সুস্থ জীবনের প্রতি দৃঢ় নিবদ্ধ আয়ুর্বেদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও আনুপুঙ্খিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সুবিন্যস্ত এক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। আক্ষেপের কথা যে প্রাচীন ভারতীয় শারীর দর্শন বহুলাংশে প্রকৃত মর্যদা পায়নি। মাধবের 'সর্ব দর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থে রসেশ্বর দর্শন অন্তর্ভুক্ত হলেও আয়ুর্বেদ দর্শন অনালোচিত।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চা আলোচনায় শারীর শাস্ত্রের অগ্রাধিকার অকারণ বা অমূলক নয় কারণ এ কথা আজ স্বীকৃত যে প্রাক্-বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের দিকে সচেতন পদক্ষেপের প্রকৃষ্ট পরিচয় নিহিত প্রধানত চিকিৎসা বিজ্ঞানে।[১৯] দেবাশ্রয়ী চিকিৎসা চর্চা থেকে যুক্তি আশ্রয়ের দিকে অভিগমন এখানেই বাণীবদ্ধ হয়েছে।[২০] প্রাক বৈদিক শারীর স্বাস্থ্যরক্ষার লিখিত বিবরণ আমাদের হাতে নেই বটে কিন্তু শারীরবিদ্যা চর্চ্চার যে পরম্পরা তখন থেকেই গড়ে উঠেছিল তা প্রত্নগবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আজ প্রতিষ্ঠিত।

বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমেই শরীর-স্বাস্থ্য সচেতনতার মনন কাঠামোর উন্মেষ আমরা প্রথম লক্ষ্য করি।[২১] বৈদিক শারীরবিদ্যা মূলত দৈব-জাদুকরী চর্চ্চা হলেও pathological ধারণাগুলি কিন্তু এই সময় থেকেই উৎসারিত হতে থাকে। অথর্ব বেদ শরীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক সমস্যা সঙ্কুলতা, বিবিধ প্রশ্ন ও সমাধান দিশার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল। মূলত 'আয়ুষ্যানি' বা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'ভৈষজ্যানি' বা রোগ নিরাময়ের শাণিত বিভাজন অথর্ব বেদেই উদিত। জরা থেকে অজরার অভিমুখে যাবার জন্য প্রবল আকুতি[২২] শত শরত অতিক্রমণের তীব্র আকাঙ্খা[২৩] ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যে সানন্দ জীবনবাদের সূচনা আমরা দেখি ঋগ্বেদে বা অথর্ব বেদে, আমাদের বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনাপটে তার তাৎপর্য প্রগাঢ়[২৪] কারণ এ প্রবণতা অধ্যাত্ম আড়াল দিয়ে আবৃত করার নয়।[২৫]

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা চর্চ্চার ইতিহাসে দৈব থেকে যুক্তি নির্ভর চিকিৎসায় উত্তরণ কোন ক্রমেই সরলরেখা নয়। এর বঙ্কিম বা সর্পিল গতি স্মরণে রেখেও গাঙ্গেয় দ্বিতীয় নগরায়ণ ও বৌদ্ধধর্ম চিন্তার উদ্ভবকে শারীরশাস্ত্রের অগ্রগতির এক ভূমিচিহ্ন বলা যায়। আদি পালি গ্রন্থাবলী সম্যক অনুধাবন করলে, প্রতীতি হয় যে 'যুক্তি ব্যাপাশ্রয়' চিকিৎসা মননের আধারশিলা প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল এই পরিবর্তিত আর্য সামাজিক বাতাবরণে।[২৬] তবে মানবকল্যাণের প্রয়োজনে অপরিহার্য এই বিদ্যার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই তীব্র হয়েছে ব্রাহ্মণ রক্ষণশীলতার বিদ্বেষ ও বৈরিতা এবং শারীরবিদদের সামাজিক অবস্থানে পড়েছিল তার অপচ্ছায়া। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতক থেকে আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু প্রমুখ ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রকারগণ চিকিৎসাকে ঘৃণিত জীবিকা ও চিকিৎসককে অশুচি ও ঘৃণ্য ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করার যে সুসংহত প্রয়াস করেছিলেন মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও তার প্রতিধ্বনি সোচ্চার।[২৭]

জায়মান যুক্তি আশ্রয়ী বিজ্ঞান মননের সঙ্গে ধর্ম সংস্কার ও শাস্ত্রাচারের সংঘাত সর্বকালীন সামাজিক অভিজ্ঞতা। প্রাচীন ভারতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে কি ভাবে বিজ্ঞাননিষ্ঠতা শারীরবিদ্যাকে দিয়েছিল এক অন্য মাত্রা তার প্রকৃত মূল্যায়ন আজও প্রতীক্ষিত।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র প্রসঙ্গ অবতারণার প্রেক্ষিতে যে মৌল সংহিতাদ্বয়ের নাম আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে তা হোল চরক ও সুশ্রুত সংহিতা। এদের রচনাকাল, রচয়িতা বা সঙ্কলকের প্রকৃত পরিচয় নির্ণয়, আলোচ্য বিষয় বৈচিত্র্যের ভিতরে বিবিধ স্তরায়ন ইত্যাদি জটিল প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে গবেষকদের বিতর্ক আজও অব্যাহত। আমাদের সঙ্কীর্ণ পরিসরে এই আলোচনার বিস্তার অসম্ভব। এই সংহিতাদ্বয়ের বিপুল জনপ্রিয়তা সম্ভবত তাদের অন্তর্শক্তির জোরেই। অষ্টম শতকের শেষে, আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে 'শরক' ও 'সুসরুদ' চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যাব প্রামাণিক গ্রন্থরূপে আরব্য ভুবনেও প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছিল।[২৮]

আপাতদৃষ্টিতে চরক সংহিতা রোগ নির্ণয় ও ওষধি প্রয়োগের নির্দেশক জ্ঞানভাণ্ডার এবং সুশ্রুত সংহিতার বিষয় মাহাত্ম্য শল্যায়ন। গ্রন্থ পরিচিতির সীমানা এর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে এদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ এদের তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। এদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান চিন্তার স্ফুরণ ও ব্যাপ্তি আমাদের বিস্মিত করে। এদের সব অনুজ্ঞাই যে এখনও প্রাসঙ্গিক এ কথা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু কালোত্তীর্ণ যুক্তি অনুগামী ভাবনাগুলির দিকে আলোসম্পাতের প্রশ্ন আজ অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

রমিলা থাপার অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে প্রাচীন গ্রন্থ বিশ্লেষণে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা

করতে গিয়ে অযৌক্তিক উপাদানগুলি উপেক্ষা বা বর্জন করা যায় না। যদি যুক্তির প্রতি পক্ষপাতে অযৌক্তিক উপাদানগুলি গ্রস্ত হয়, সেও কিন্তু ইতিহাসের বিকৃতি।[২৯] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে অযৌক্তিকতাকে উপেক্ষা নয়, নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করাই ইতিহাস সম্মত।[৩০] ডি. কে. সিঙ্ঘি Some Issues in the Conceptual Articulation of the Indian Intellectual Tradition নিবন্ধে সতর্ক করেছেন যে প্রাচীন মৌল অভিমত ও অভিজ্ঞতাকে তাদের ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে বিচ্ছিন্ন বিচার করা ইতিহাস চর্চায় যথার্থই বিরাট ত্রুটি।[৩১] তাই চরক-সুশ্রুত সংহিতায় বিজ্ঞান ভাবনার সঙ্গে অবিজ্ঞান ও অতিলৌকিকের ইতস্তত সহাবস্থান সমকালীন ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল দিয়েই ব্যাখ্যা সম্ভব, অন্যথা নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান বিকাশ ও চমকের দ্বারা আমরা আজ এতই আবিষ্ট যে আমাদের মনে থাকেনা এর পিছন ইতিহাসের শ্রম, সাধনা, ব্যর্থতা ও অর্জনের নিরন্তর ধারাবাহিকতা। Cyril Scott মন্তব্য করেছেন যে চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রায় অধিকাংশ আবিষ্কারই পুনরাবিষ্কার মাত্র, প্রাচীন প্রজ্ঞান থেকে নূতন ভাবে আহরিত ও আধুনিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত ও পরীক্ষিত।[৩২] আপাতদৃষ্টিতে এ মন্তব্য অতিকথন মনে হলেও একে সম্যক অসার বলে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। "সংস্কৃত বিজ্ঞান বৈভব" শীর্ষক সাম্প্রতিক এক প্রদর্শনী এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। Ancient Insights and Modern Discoveries শিরোনামে তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত এই প্রদর্শনীতে Scott এর বক্তব্য আশ্চর্য সমর্থন পেয়ে যায়। এই প্রদর্শনী প্রসঙ্গে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি যিনি খ্যাতিমান বিজ্ঞানীও বটে, বলেছেন যে এর মধ্যে অন্বিত "Our Civilizational strength. We have to identify areas from ancient lore and complement modern Science and Technology."[৩৩]

চরক সুশ্রুত সংহিতার মনন প্রাসঙ্গিকতাও আজ উপলব্ধ সত্য। সীমিত পরিসরে তারই কয়েকটি দিক তুলে ধরার বিনম্র প্রয়াস করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েই শুরু করা যাক; স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক সংজ্ঞা আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অভিমত অনুসারে স্বাস্থ্য কেবলমাত্র ব্যাধি বা অশক্ত অবস্থার অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্য হোল শারীরিক মানসিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ।[৩৪] এই আধুনিক সংজ্ঞার সঙ্গে সংহিতাদ্বয়ের ভাবনার আত্মীয়তা বিস্ময়কর। উভয় সংহিতাই স্বাস্থ্যকে এক সুখানুভবের সাচ্ছন্দ্যবোধ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছে। চরকে জীবনবোধ চার প্রকার যথা সুখমায়ু বা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, অসুখমায়ু বা অসুস্থতা, হিতমায়ু বা অর্থপূর্ণ জীবন এবং অহিতমায়ু বা অর্থহীন জীবনযাপন।[৩৫] এই সংহিতাদ্বয় স্বাস্থ্যকে এক ইতিপ্রত্যয়ের সূচক রূপেই চিহ্নিত করেছে। সুস্থের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রলম্বিত আয়ুষ্কাল ও পীড়িতের রোগ নিরাময় এই দুটি কেন্দ্রিক ভাবনাই এখানে আবর্তিত।[৩৬] প্রাচীন

ভারতীয় মনস্বিতায়, সন্ধানে ও বিচারে এ ধরনের আধুনিকতার প্রভূত উপাদান ও লক্ষণ উপলভ্য। নিছক বর্ষের সংখ্যা দিয়ে আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করা নয়, গুণান্বিত জীবন যাপনের প্রমা প্রতিষ্ঠা করে মানবসম্পদের সৃজনশীল বিকাশের উপায় কৌশল আয়ত্ত করাই ছিল শারীরবিদদের অন্যতম অন্বিষ্ট। আজকের সমাজেও মানুষের সার্বিক সুস্থতাই অভীষ্ট লক্ষ্য।

কর্মবাদ বা নিয়তিবাদের দ্বারা রোগ ভাবনা যখন শৃঙ্খলিত ছিল তখন পীড়িতের পরিচয় সে পাতক কিন্তু রোগ যখন শরীর প্রক্রিয়ারূপে বিবেচিত হোল তখন থেকে রোগী বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁকে রোগ বিমুক্ত করাই শারীরবিদের প্রধান সাধনা ও অর্জন। ভাবনার এই উত্তরণ ও বিন্যাস সংহিতা দুটিতে সোচ্চার। রোগ যে কোন একশৈলিক ঘটনা নয় চরক সংহিতায় তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এখানে আছে রোগের প্রকারভেদ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা যেমন সাধ্য ও অসাধ্য, সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য।[৩৭] এখানে বিধৃত একটি তর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। মৈত্রেয় অভিমত দিচ্ছেন, রোগ চিকিৎসা মূলত অর্থহীন কারণ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা, শ্রেষ্ঠ ওষধি ও সার্বিক সেবা সত্ত্বেও কিছু রোগীর মৃত্যু হয়, অপরপক্ষে এসব অনুষঙ্গ বিনাই কিছু রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার কারণ কর্মফলই সব কিছুর মূল।[৩৮] কর্মবাদের প্রতি এই আস্থার প্রত্যুত্তরে আত্রেয় পুনর্বসু জানালেন, এই অভিমত "মিথ্যা"। যেখানে রোগ চিকিৎসা সাধ্য সেখানে সঠিক চিকিৎসার উপযোগিতা অবশ্যই আছে, অন্যথা রোগ জটিল ও চিকিৎসাতীত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। তবে অসাধ্য রোগে চিকিৎসা সফল হয় না।

চিকিৎসা বিনা যিনি সুস্থ হন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে একজন পিছলে পড়া ব্যক্তি মাত্র, যিনি নিজেই উঠে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখেন। সাহায্য পেলে দাঁড়ানোর সেই প্রয়াস শুধু সহজ ও ত্বরান্বিত হয়।[৩৯] কর্মবাদের প্রথাক্লিষ্ট মনন থেকে উত্তরণের এই দিশা চরক সংহিতাকে বৃত করেছে এক অনন্য মাত্রায়।

'পরলোকৈষণা' সম্পর্কে এই সংহিতা স্পষ্টতই সংশয়াকীর্ণ। পুনর্জন্ম আছে কি নেই তার আলোচনা বিস্তার, প্রত্যক্ষ দর্শন ও অপ্রত্যক্ষের অস্তিত্ব নিয়ে চিকিৎসকের মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সর্বকালীনতা এখানে চমৎকার বিন্যস্ত।[৪০] 'বুদ্ধি প্রদীপ' ব্যবহার করে সার্বিক বিচারের যে নির্দেশ রয়েছে এখানে[৪১] তা চিন্তার প্রগতিই আভাসিত করে। এর পরই পুনর্জন্ম প্রশ্ন উত্থাপন, বেদের অভ্রান্তি ইত্যাদি অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর অবতারণা দেখে প্রতীতি হয় যে এগুলি হয়ত বা বহিরঙ্গে শিথিলভাবে উপযোজিত।[৪২] সামাজিক চাপের মুখে সৃজিত কোন কূট কৌশলই হয়ত বা।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সংহিতাগুলির মধ্যে আধারিত যুক্তির প্রতি নির্ভেজাল সম্মানের মানসিকতা। প্রসঙ্গত বলা যায়, এখানে প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে 'সম্ভাষা' বা নিয়মিত আলোচনা চক্রের উপর, শারীরবিদদের আত্ম সমীক্ষা ও ভাবনা আদান প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান সীমানা প্রসারের আবশ্যিকতায়।[৪৩] যুক্তি জ্ঞানকেই ধরা হয়েছে তাঁদের প্রধান আয়ুধ স্বরূপ।[৪৪] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে, ভিষকদের যুক্তিতর্ক দিয়েই পরিপুষ্ট হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় দর্শনের ভিত্তিভূমি।[৪৫] চরক সংহিতার বিচারে শারীরবিদ্যার কোন সমাপ্তি নেই। এটি অনাদি এবং এ জানা প্রবহমান।[৪৬] এই প্রমার মধ্যে নিহিত শারীর বিজ্ঞানের বিপুল সম্ভাবনার দূরদর্শন।

বীক্ষা ও পরীক্ষাই বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম স্তম্ভ। 'পরীক্ষা' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই অন্বিত হয়েছে চরক সুশ্রুত সংহিতায়। শুচি অশুচির লক্ষণরেখা অতিক্রম করে শল্যায়ন শিক্ষায় শব ব্যবচ্ছেদ আবশ্যিক করে যে অনুজ্ঞা রচিত হয়েছে সুশ্রুত সংহিতায় তা এককথায় দুঃসাহসিক। শিক্ষার স্বার্থে শব ব্যবচ্ছেদের এটিই সম্ভবত প্রাচীনতম দলিল।[৪৭] প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'পুরুষ ছেত্তার (dissector) একটি নির্ভীক পারম্পর্য প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছিল এ কথা অনুমান করতে পারি তাই তোপধ্বনিতে সম্মানিত উনবিংশ শতকের মধুসূদন গুপ্তকে প্রথম ভারতীয় 'শব ব্যবচ্ছেদক' বলা[৪৮] সঙ্গত কিনা এ কথা নতুন করে ভাববার অবকাশ হয়ত বা রয়েছে।

ক্ষতস্থান অদৃশ্য হানিকর জীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য শল্যায়ন-উত্তর আরোগ্য পর্বে সুশ্রুত সংহিতার অমোঘ সতর্ক বাণী আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। তবে কি জীবানু প্রতিরোধ ভাবনারও অভ্যুদয় হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় মননে? এই অদৃশ্যদের মাংসও শোণিতের প্রতি দুর্বলতার তথ্যও এই গ্রন্থে পরিবেশিত।[৪৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রোগ জীবাণু জায়নের (bacteria culture) প্রারম্ভিক পর্বে রক্ত ও মাংসই ছিল জীবাণুবিদদের পরীক্ষার প্রধান উপকরণ। প্রাচীন ভারতের লিখিত উপাদানে পরীক্ষাগার বা রসশালার বিবরণ অনুপস্থিত নয়।[৫০] সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয় অনুবীক্ষণের ভাবনাও।[৫১] তথাপি এই চিন্তা চেতনার সমন্বয় সূত্র অনুধাবন এখনও অপেক্ষিত বলে দূরকল্পনার অবকাশ আমাদের নেই।

বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তির প্রতি আনুগত্যই সম্ভবত সংহিতাদ্বয়কে প্রাণিত করেছে নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্যের করণ কৌশল অনুসন্ধানে। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক জি. এস. ঘুরে ১৯৩৫এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে আমাদের দেশে নারী ও পুরুষের বিবাহ বয়স যথাক্রমে অন্যূন ১৬ ও ২১ নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বিলম্বিত বিবাহের সমস্যাবলী নিয়েও তিনি ভাবিত ছিলেন।[৫২] তিনিই ভারতের অগ্রণী সমাজবিদ যিনি সুসংহত ভাবে Fertility data বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছিলেন। এস. কে. প্রামানিক ঘুরের সমাজ মনন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রেক্ষিতে ঘুরের বিবাহ বয়স কেন্দ্রিক প্রস্তাব "Quite radical" বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫৩] গর্ভধারণে

মহিলার বয়সের গুরুত্ব আজ স্বীকৃত। অতিবাল্যে ও প্রৌঢ়ত্বে সন্তান ধারণের সমূহ ঝুঁকি ও সঙ্কট সম্পর্কে আজকের চেতাবনী আমাদের অবিদিত নয়।[৫৪] সুদূর অতীতে চরক সংহিতায় অতিবালা ও প্রজননক্ষম অধিক বয়স্কার গর্ভধারণ সবিশেষ নিরুৎসাহিতই হয়েছে।[৫৫] সুশ্রুত সংহিতা গর্ভধারণকালে মাতা ও পিতার বয়স ১৬ ও ২৫ এর নীচে না হওয়াই মনে করেছে সমীচীন। মূলত এখানে মাতার বয়সকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৫৬] উপরন্তু মাতার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এখানে সম্মতি পেয়েছে গর্ভপাত ও বিলম্বিত ও বিঘ্নিত স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে বস্তিদ্বারের শল্যায়ন রূপ (caesarian section) বিকল্প ব্যবস্থা[৫৭] যা নির্ভীক পদক্ষেপ বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধ্রুপদী সংহিতাগুলি প্রজনন স্বাস্থ্য ভাবনার একটি নিজস্ব চারণভূমি রচনা করে নিয়েছে। গর্ভিণীর আহার, বেশভূষা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিমিত বিশ্রামের যে অনুপুঙ্খ নির্দেশ এখানে ন্যস্ত তা কিন্তু আজও প্রাসঙ্গিক। সূতিকাগারের যে বিবরণ আমরা এখানে পাই তা রক্ষণশীল অশৌচ ভেদরেখা আক্রান্ত কোন বিবর্ণ কক্ষের মডেল নয় এর মধ্যে বিবৃত যত্ন ও পরিশীলিত মনোভঙ্গী মায়ের সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যই যার নির্নীত অভিলক্ষ্য।[৫৮]

মাতার প্রসবোত্তর পরিচর্যার আবশ্যিকতাও এই সংহিতাদের দিয়েছে অনন্য মাত্রা। সুস্থ হয়ে গেলেও মাতার ৪৫ দিন বা ৬ সপ্তাহের বিশ্রাম বিধান সুশ্রুত সংহিতার গর্ভিণী ব্যাকরণ অংশে সোচ্চার।[৫৯] বর্তমানে কর্মরতা মহিলার প্রসবোত্তর ৬ সপ্তাহ ছুটির যে সময়সীমা নির্দ্ধারিত, তার সঙ্গে এই অতীত ভাবনার সৌসাদৃশ্য কি নিতান্তই কাকতালীয় বা কোন পরিণত সম-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত, সময়ের ব্যবধানেও যা ম্লান হবার নয়? সুকুমারী ভট্টাচার্য মাতৃত্বের নয়, মায়ের প্রতি প্রাচীন ভারতের সামাজিক অনীহার যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন[৬০] তার ব্যতিক্রমী দলিল রূপে এই শারীর শাস্ত্রগুলি চিহ্নিত করা যায়। নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্যের গন্তব্যে পৌঁছনোর দিকদর্শন এখানে সার্বিক সূচিত।

নারীর স্বাস্থ্যধারণা প্রধানত প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে জনমানসে। প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রথানুগ ফ্রেমের বাইরেও যে নারীর সুস্থতা তার কর্মভার, মানসিক অবস্থা, শারীর ক্ষমতা, পৌষ্টিকতা ও সামাজিক অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ সম্যক উপলব্ধি আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক হলেও[৬১] এর পিছন ইতিহাসও অগ্রাহ্যের নয়। প্রজনন ক্ষমতার প্রাক্ ও উত্তরকালও যে স্ত্রীস্বাস্থ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত সেই দুর্লভ বিবেচনা এক পরিণত মানসের অভিজ্ঞান রূপেই বাণীবদ্ধ হয়েছে সংহিতা পরিসবে, এ কথা গোচরে আনা একান্ত জরুরী বলেই মনে করি।

Nutrition বা আহার ও পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণার ভুবনায়ন ঘটে গেছে এখন। হিত

ও অহিত বিচার সমেত সুষম আহারের যে অসামান্য তালিকা আমরা পেয়েছি চরক সংহিতায়[৬২] তার প্রাসঙ্গিকতা আজও অব্যাহত। প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশে ধর্মশাস্ত্রকারদের সুদীর্ঘ প্রচারের ফলে আমাদের আহার ও ভোজ্য অনেক সংস্কার ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং নিষেধের দ্বারা আবদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় আলোচ্য সংহিতা দুটি অত্যন্ত মুক্তমনা, সেখানে আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্যই একতম বিবেচ্য তাই কোন খাদ্যই নিষিদ্ধ মনে করার সঙ্কীর্ণতা এখানে নেই।[৬৩] অপরপক্ষে স্মার্ত ও ব্রাহ্মণ শাসিত নিয়ম নিষেধের বেড়াজাল এখানে বার বার লঙ্ঘিত। প্রয়োজনে তথাকথিত নিষিদ্ধ ও অভক্ষ্য রোগীর আরোগ্যকল্পে কূটকৌশলে সংস্কার-সম্মত রূপে গ্রহণ করানোর যে সঙ্কেত এখানে[৬৪] নিহিত তা এককথায় দুঃসাহসিক। প্রয়োজনভিত্তিক মঙ্গলকর প্রবঞ্চনা বর্তমান চিকিৎসা চর্চ্চাতেও পেয়েছে স্বীকৃতি শ্রেয়কে অগ্রাধিকার দানের প্রশ্নে, S. J. Reiser সম্পাদিত Ethics in Medicine : Historical Perspective and Contemporary Concerns গ্রন্থে যা সম্যক আলোচিত।[৬৫]

পরিবেশ সচেতনা, সংবেদনা ও পর্যাবরণের ভারসাম্য রচনা ও রক্ষণের ঐকান্তিক প্রয়োজনের প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে একটি সাম্প্রতিক বিষয় চর্চ্চা[৬৬] যার ব্যাপ্তি আজ স্পর্শ করেছে প্রায় সকল বিদ্যাশৃঙ্খলা। পরিমণ্ডল দূষণজনিত সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতেই এর বিস্তার। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও মননে পরিবেশ সচেতনা ও সংরক্ষণের এক মহৎ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যার সঙ্গে আধুনিক পরিবেশবাদী মননের সাযুজ্য আমাদের বিস্মিত করে। শারীর সংহিতায় সীমাবদ্ধ এ আলোচনায়ও সে প্রসঙ্গ এসে পড়ে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও অনুকূল পবিবেশের সঙ্গে শারীর সুস্থতার নিগূঢ় সংযোগ এখানে সঙ্গতভাবেই উপলব্ধ।[৬৭] বনস্পতি সৃজন ও সংরক্ষণ পরিশুদ্ধ বায়ু, পরিশ্রুত জল, পর্যাপ্ত আলো, শ্যামল সান্নিধ্য এ সবই যে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সঙ্গে আমূল জড়িত এ বার্তার গভীরতা এখানে লক্ষণীয় ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শব্দ দূষণ, তীব্র গন্ধ সেবন জনিত দূষণ, কৃত্রিম আলোয় দৃষ্টি দূষণসঞ্জাত রোগের বিবরণ পরিসর পেয়েছে চরক সংহিতার ঐন্দ্রিয়ক, রোগ বর্গে[৬৮] যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রকৃতির বিপরীতে এখানে ব্যবহৃত শব্দ বিকৃতি। বিকৃতির বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সংহিতায় উপস্থাপিত হয়েছে পরিবেশ সৌহার্দ্যের ঐতিহ্য, নিন্দিত হয়েছে মানুষের সজ্ঞান অপরাধ, যা বিকৃতি ও দূষণের জন্য সামগ্রিক দায়ী।[৬৯] উজ্জ্বল জীবনের খোঁজে এখানে তাই ধ্বনিত পরিবেশ সচেতন নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সংযত জীবনচর্যা রচনার আন্তরিক আহ্বান।[৭০]

জীবন-মৃত্যুর সংজ্ঞা এখন যথার্থই পরিবর্তনশীল। মানুষের বাঁচা এক অর্থে সসম্মানে গুণান্বিত জীবন যাপন। বর্তমান শারীর বিজ্ঞান চর্চ্চার অন্যতম সমস্যাকীর্ণ ও বিতর্কিত ক্ষেত্র Euthanasia প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। জীবনপঞ্জী অনুগামী অর্থে অস্তি হয়েও যিনি

অনস্তিত্বে পরিণত তাঁর শরীরী অবসান ত্বরান্বিত করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা এ নিয়ে আবিশ্ব বহুবিধ তর্ক ও দ্বিধা।[৭১] আরোগ্যাতীত ব্যাধির প্রসঙ্গে এ ভাবনা কিন্তু প্রাচীন গ্রীস, রোম বা ভারতবর্ষে আদৌ অজ্ঞাত ছিল না।[৭২] এমন অবস্থায় চরক সংহিতা স্পষ্টতই সে রোগীর চিকিৎসা থেকে বিরত থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে[৭৩] অর্থাৎ জীবনকে চালিত করার উপাদানগুলি এ সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করাই বিধেয় মনে করেছে। শলাকা সহযোগে শিরা স্থানে ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে জানা ছিল বটে[৭৪] তবে কারুণিক জীবন অবসান ঘটানোয় এর ব্যবহার ছিল কিনা জানা নেই। সংহিতা পর্যালোচনা করলে কিন্তু এ কথা স্পষ্ট হয় যে বর্তমান সমস্যাগুলির শিকড় অতি প্রাচীন। জটিল প্রশ্নাবলী তখনও ভাবিত করেছে শারীর বিশেষজ্ঞ মনন চিন্তন। তার পরম্পরা অনুসরণ যতই অসাধু হোক না কেন।

রোগীর সঙ্গে চিকিৎসাবিদের আরোগ্যমুখী আত্মীয়তায় পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নও এখানে প্রভূত আলোচিত।[৭৫] সংহিতা বিশ্লেষণে রোগী বিশিষ্ট রূপেই প্রতিভাত, তাঁর প্রতি সামাজিক দায়িত্ব এবং আচরণও বিশিষ্ট। সর্বাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আতুরকে আরোগ্যে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে সংহিতা প্রস্তাব সম্মিলিত করতে চেয়েছে নীতিনিষ্ঠ চিকিৎসক ও তাঁর নির্দেশ অনুগামী কুশলী, অভিজ্ঞ, সুভদ্র ও মানবিক সহচর ও সেবাকর্মী।[৭৬] বর্ণানাত্মক উপাখ্যান, উদ্দীপনী চিত্রাবলী, আনন্দময় সঙ্গীতের মাধ্যমে রোগীর মনোরঞ্জন নির্দেশিকা[৭৭] এবং তাঁর প্রফুল্লতাকল্পে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত স্বজন সমাগমকে উৎসাহ প্রদানও[৭৮] অতি বিশ্লেষণাত্মক পরিণত মননশীলতার প্রতিচ্ছবি। রোগ সম্পর্কে রোগীর জানার অধিকার প্রশ্ন আজ উত্থাপিত।[৭৯] রোগীর জানার অধিকার এবং চিকিৎসকের সতর্ক দক্ষতায় রোগীকে জানানোর প্রয়োজন[৮০] প্রাচীন চিন্তাবিদদেরও যে আলোড়িত করেছিল এও সবিশেষ উল্লেখনীয়। চিকিৎসা চর্চ্চায় রোগীর সাহস অন্যতম সহায়করূপে এখন স্বীকৃত। সংহিতা নিরিখেও রোগীর "অভীরুত্ব"[৮১] বা নির্ভীকতাতে আরোপ করা হয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা, যা আজ কালোত্তীর্ণ রূপেই প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য রিপোর্ট ১৯৯৬ ইঙ্গিত দিয়েছে যে সুস্থ বার্দ্ধক্যে উত্তরণের বাস্তবায়ন একবিংশ শতকের অন্যতম সামাজিক লক্ষ্য।[৮২] সুশ্রুত সংহিতায় যেন তারই পূর্বাভাস। অনাগত বাঢ় প্রতিষেধ" ভাবনার মধ্য দিয়ে এখানে বার বার আলোচিত হয়েছে বার্দ্ধক্যায়ন প্রক্রিয়াকে রোধ বা বিলম্বিত করার উপায় কৌশল।[৮৩] বার্দ্ধক্যায়ন এক বহুকৌণিক শারীর প্রক্রিয়া। অক্ষমতা ও পরনির্ভরতার প্রায় সমার্থক বার্দ্ধক্যকে সক্ষম স্বাধীনতার অভিলক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চাইছে আধুনিক গবেষণা, তাই বার্দ্ধক্যের পরিবর্তে Third Age বা তৃতীয় বয়স শব্দবন্ধই শব্দ ভাণ্ডারে সংযোজিত।[৮৪] অনিবার্য বার্দ্ধক্য ক্ষেত্র বিশেষে ত্বরান্বিত, কখনও বা বিলম্বিত। Simon de Beauvoir যথার্থই বলেছেন যে বৃদ্ধের

অবস্থা ও অবস্থান তাঁর সামাজিক পরিমণ্ডলের উপর একান্ত নির্ভরশীল।[৮৫] বার্দ্ধক্যের সমস্যা অনুসন্ধান ও তার প্রকৃষ্ট পরিচালন প্রাচীন ভারতীয় মননে নিবিড় ভাবে প্রোথিত। জীবনাচার ও দিন চর্যার মধ্য দিয়ে কি ভাবে বার্দ্ধক্যকে তাৎপর্যময় করা যায়, কিভাবে সক্রিয়তা ও সামাজিক সংযোগের ভিতর দিয়ে জীবন যাপন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তারই বহুমুখী দিশাদানে সুশ্রুত সংহিতা একান্তভাবে জীবনমুখী।[৮৬] বর্তমান বার্দ্ধক্য কেন্দ্রিক উন্নত চিকিৎসা চর্চ্চা ও গবেষণা প্রমাণ করেছে যে বয়স নির্বিশেষে সৃজনশীলতা সাবলীল বার্দ্ধক্য উপভোগের প্রকৃষ্ট মার্গ।[৮৭] সমাজ বিচ্ছিন্নতা, নিষ্ক্রিয় জীবনধারা ও অমোঘ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে অনাগ্রহ ও রক্ষণশীলতা থেকে উত্তরিত হওয়ার পথনির্দেশে বার্দ্ধক্যকে স্বতন্ত্র মাত্রানুভূতি দিয়েছে সুশ্রুত সংহিতা। প্রথানুগ নেতিবাচকতা থেকে সরে এসে বার্দ্ধক্যকে বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করার অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গী সংযোজিত এখানে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আধুনিক গবেষণালব্ধ ভাবনাগুলির অগ্রিম স্ফূরণ ঘটে গেছে এই সংহিতায়।

"প্রজ্ঞাপরাধ" বা সজ্ঞানে ভুল করার সূত্র ধরেই যে আসে শারীরিক সমস্যাবলী, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে চরক সংহিতা।[৮৮] তাই 'সদ্বৃত্ত' বা সঠিক জীবন-ছন্দ রচনার উপরই আরোপিত এই সংহিতার মূল ঝোঁক।[৮৯] পরিমিতি ও আত্মসংযম, মানসিক স্থৈর্য ও অর্জিত প্রশান্তি জীবনের গুণগত মানবর্দ্ধক, সংহিতার এই গভীর পর্যবেক্ষণ তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি আজও।

শত শরতের রূপ দর্শনের অভিলাষ নিয়ে যে আশাবাদী জীবনবোধ উচ্চারিত হয়েছিল বৈদিক সাহিত্যে, তারই প্রায়োগিক কৃৎকৌশল সন্ধানের প্রয়াসগুলি বিবৃত করেছে ধ্রুপদী এই শারীরশাস্ত্র দুটি। জীবন বীক্ষার বিচিত্র বর্ণালী তাই এখানে সম্যক প্রতিবিম্বিত। "প্রাণৈষণা"[৯০] বা জীবনের প্রতি এষণায় উদ্দীপ্ত করাই এই ব্যতিক্রমী রচনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ও সামাজিক দায়িত্ব।

Indian National Science Academyর সভাপতি অধ্যাপক M. S. Valiathan তাঁর সাম্প্রতিক এক স্মারক বক্তৃতায় যথার্থই এদের "timeless classics" রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর আক্ষেপ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা চেতনায় এই আমূল দিকবদল এখনও বহুলাংশে অনালোচিত রয়ে গেছে।[৯১] সামগ্রিক বিচারে তাই বলতে হয় প্রাচীনতা বা অনাধুনিকতাকে সার্বিক বর্জনীয় মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা ও শরীর কেন্দ্রিক প্রস্থান সমূহ কেবলমাত্র স্বজ্ঞা থেকে উৎসারিত হয়নি। তার উৎস যুক্তি এবং বিজ্ঞান চৈতন্যেও স্থিত।

সূত্র-নির্দেশ

1. Samir Amin, Eurocentrism, London 1989, p. viii, 9.
2. Symposium on the History of Sciences in India, National Institute of Sciences of India, New Delhi, Calcutta 1961, Foreword.
3. Dhruv Raina, Images and Contexts : The Historiography of Science and Modernity in India, New Delhi 2003, p. 105.
4. J. D. Bernal, Science in History Vol. 1 London 1954, Preface pp. 1-3.
5. P. C. Ray, History of Hindu Chemistry Vol. 1 Calcutta 1902-1903, pp. 192-197.
6. P. C. Ray, Essays and Discourses, Madras 1918, p. 183.
9. Santimay Chatterjee, Meghnad Rachana Sankalan (in Bengali) Calcutta 1965, p. 132.
8. Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society in Ancient India, Calcutta 1977, Introduction, p. 1.
9. Debiprasad Chattopadhyay, History of Science and Technology in India Vol. 1. Calcutta 1986, p. 10.
10. S. Irfan Habib and Dhruv Raina ed. Situating the History of Science Dialogues with Joseph Needham, New Delhi 1999, p. 17.
11. B. V. Subbarayappa and N. Mukunda ed. Science in the West and India, Bombay 1995, p. 402.
12. Symposium on the History of Sciences in India, Calcutta 1961, p. 1.
13. Daya Krishna ed. India's Intellectual Traditions : Attempts at Conceptual Reconstructions, Delhi 1987, p. 4.
14. Ibid.
15. F. Henschen, The History of Human Diseases, London 1966, p. 25.
16 F. E. Udwadia, Man and Medicine : A History, New Delhi 2000, Preface vii.
17. Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society, op. cit, pp. 3-4.
18. Shiv Sharma, Ayurvedic Medicine : Past and Present, Calcutta 1975, pp. 155-159.
19. J. Jolly, Indian Medicine Delhi 1977, p. xvii.
20. Caraka Samhita (C.S.) Sutrasthana II. 59.
21. K. G. Zysk, Medicine in the Veda, Delhi 1966, p. xiii.
22. Rg. Veda, 1. 89. 9; 7.54.2
23. Atharva Veda 2.13.4 : 8.2.2
24. Uma Gupta Materialism in the Vedas, New Delhi 1987, p. 5.
25. Sukumari Bhattacharji, Fatalism in Ancient India, Calcutta 1995, Introduction p. 1.

26. J. R. Haldar, Medical Science in Pali Literature, Calcutta 1977, p. 27.
K. G. Zysk, Asceticism and Healing Art in Ancient India, Medicine in the Buddhist Monastery, Delhi 1991, p. 6, 118;
Sukla Das, Contribution of Early Buddhism to the Development of Rational Medicine in India, The Quarterly Review of Historical Studies Vol. 34. Nos 3-4, October 1994 March 1995, p. 15. 20.
27. Sukla Das, Changing Status of Medical Professionals : An Early Indian Perspective, Vijay Kumar Thakur and K. K. Mondal ed. Science, Technology and Medicine in Indian History, New Delhi 2000, pp. 63-64.
28. Ashoke K. Bagchi, Medicine in Mediaeval India 11th to 18th Centuries, Delhi 1997, pp. 50-55.
29. S. Irfan Habib and Dhruv Raina ed. op. cit. p. 20.
30. Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society, op. cit. Introduction 1, p. 367.
31. Daya Krishna ed. op. cit. p. 12.
32. Cyril Scott, Doctors, Disease and Health : A Critical Survey of Therapeutics, Modern and Ancient, London 1946, p. 211.
33. Sanskrit Science Exhibition, Tirupati 2002; All India Oriental Conference Puri 2002 Booklet p. 8.
34. David L. Sills ed, International Encyclopaedia of Social Sciences, New york 1972, Vol. 5. p. 330.
35. C. S., Sutrasthna 1. 41; 30.23.24
36. Ibid, Cikitsasthana, 1.4; Susruta Samhita (S. S.) Sutrasthana 1.1.
37. C. S. Sutrasthana 10.9, 11.5
38. Ibid, 10.4
39. Ibid, 10.5
40. Ibid, 11 4-10
41. Ibid, 11.16
42. Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society op. cit pp. 17-19, 38 ff.
43. Sukla Das, Some Highlights of the Caraka Samhita : A Reappraisal, Kalyan-Bharati, Vol. 3. 1999, pp. 42-43.
44. P. Kutumbiah, Ancient Indian Medicine, Madras 1962, p. xxv.
45. S. N. Dasgupta, A Histroy of Indian Philosophy, Vol. 2. Cambridge 1931, p. 273.
46. C. S. Sutrasthana 30. 27.
47. P. Kutumbiah, The Evolution of Scientific Medicine, Madras 1971, p. 63.

48. Rudrendra Kumar Pal, Medical Sciences, The Cultural Heritage of India Vol. 6. Calcutta 1991, p. 327.
49. Sukla Das, Surgical Heritage of Early India : Spotlight on the Susruta Samhita, The Quarterly Review of Historical Studies Vol 41. Nos 1 and 2, April - September 2001, p. 8.
50. Arun Kumar Biswas Minerals and Metals in Ancient India, Vol. 2. New Delhi 1996, p. 183.
51. Gautama Nyaya Darsana, 3. 46.
Aprapya Grahanam kaca, abhrapatala sphatikantarita upalabdhe.
খালি চোখে দেখা না গেলে কাচ, অভ্রপটল বা স্ফটিক নির্মিত সহায়ক দিয়ে দেখা যেতে পারে।
52. G. S. Ghurye, The Age of Marriage, Marriage Hygiene Anthropo - Sociological Papers, 1963 p. 67.
53. S. K. Pramanik, Sociology of G. S. Ghurye, Jaipur 2001, p. 104.
54. Monica Dasgupta, L. C. Chen, T. N. Krishnan ed. Womens Health in India, Risk and Vulnerability, Delhi 1995, pp. 107, 134, 137.
55. C. S. Sarirasthana 8.6
56. S. S. Sarirasthana 10.40-44
57. Sukla Das, Susruta Samhita : Some Highlights, N. Gangadharan ed. K. V. Sarma Felicitation Volume Being Studies on Indian Culture, Science and Literature, Madras 2000, p. 409
58. C. S. Sarirasthana 8.33
59. K. V. Sarma Felicitation Volume, op. cit. p. 409
60. Sukumari Bhattacharjee, Women and Society in Ancient India Calcutta 1994, pp. 17-18
61. Marge Koblinski, Judith Timyan and Jill Gay ed. The Health of Women, Oxford 1993, p. 33
62. Kalyan Bharati Vol. 3. op. cit pp. 39-40
63. K. V. Sarma Felicitation Volume, op. cit p. 410
64. C. S. Cikitsasthana 8. 149-157
65. S. J. Reiser, A. J. Dyck and W. J. Curran, Ethics in Medicine : Historical Perspectives and Contemporary Concerns, London 1974, p. 274
66. D. P. Owen, What is Ecology? Delhi 1990, pp. 1-2
67. Kalyan - Bharati, Vol. 3 pp. 40-41.
68. C. S. Sarirasthana 1. 122, 128
69. Ibid, Vimanasthana, 3.20
70. Kalyan Bharati Vol. 3. pp. 40-41
71. Sabujkali Mitra, Right to Die : Euthanasia in Greeco - Roman and Indian Tradition, Pranabananda Jash ed.

G. Tucci Birth Centenary Volume, New Delhi 2002, pp. 180-181; Peter Singer ed. A Companian to Ethics. Oxford 1993, p. 294.

72. G. Tucci Birth Centenary Volume, op. cit. p. 182
73. C. S. Indriyasthana 6.3, 12. 62-64
74. H. C. Sharma, Vedic Science and Culture in India, Jaipur 1999, p. 124; Sukumar Sengupta, The Use of Injections in Ancient India, Journal of Calcutta Orientalists, 1974, pp. 50-69
75. C. S. Cikitsathana 1. 17-23; S. S. Sutrasthana 19.18
76. C. S. Sutrasthana 15.7
77. Ibid. 24.41
78. S. S. Sutrasthana 19. 1-6
79. E. D. Pellagrino, Humanism and Physician, Tennessee 1979, p. 102
80. C. S. Sutrasthana 9.9, S. S. Sutrasthana 34 10
81. Ibid.
82. Chev Kidson ed. South East Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, Vol. 28. Supplement 2, Bangkok 1997, p. 87
83. K. V. Sarma, Felicitation Volume, op. cit pp. 411-412
84. George Minois, History of Old Age, Cambridge 1989, p. 3
85. Simon de Beauvoir, old Age. Penguin 1985, p. 100
86. K. V. Sarma, Felicitation Volume, op. cit p. 411
87. H. G. Koenig, Mona Smiley and J. A.P. Gonzales. Religion, Health and Ageing, New york 1988, p. 167
88. C. S. Vimanasthana 3.20
89. Ibid, Sutrasthana 8.30
90. Ibid, 11.3
91. Prof. M. Ś. Valiathan, Acharyas Ancient and Modern, Acharya J. C. Bose Memorial Lecture 30th November 2003. Bose Institute, Kolkata.

তুর্কী-আফগান শাসনকালে রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও পরিবর্ত্তনের গতি (১২০৪ - ১৫৩৮) — একটি বিশ্লেষণ।

অঞ্জলি চ্যাটার্জি

মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত ইতিহাসবিদ্‌গণ,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বিংশতিতম অধিবেশন মধ্যযুগের ভারত বিভাগে সভাপতিরূপে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সংসদের সচিব ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা -- তার সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা এবং পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকেরা ও বিদগ্ধ মনীষীবা তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন নানা নিবন্ধে ও গ্রন্থে। আমি শুধু এখানে রাজনৈতিক ইাতহাসের পটভূমিকায় পারস্পরিক ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

প্রাচীন কালে সমগ্র বাংলাদেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ অঞ্চল সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল।[১]

গুপ্ত যুগের পরে শশাঙ্কের সময় থেকেই গৌড় নামটি একটি ব্যাপক সংজ্ঞা লাভ করেছিল। পাল রাজাদের রাজ্যকালে গৌড় আরও প্রাধান্য লাভ করে। সেন রাজাদের "গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণে মনে হয় যে গৌড় ছিল তাঁদের মহত্ত্বপূর্ণ কেন্দ্র। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৭৯ খ্রিঃ) সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের সিংহাসনে বসেন।[২] কেবল মাত্র গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গতে তার আধিপত্য বিস্তার লাভ করেনি, মগধেও তাঁব শাসনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।[৩] কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে গৌড় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাগ্যাকাশে এল এক বিরাট আলোড়ন। ইখতিয়ার উদ্দীন বিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজী "নুদিয়া" বা নদীয়া আক্রমণ করলেন।[৪]

বখতিয়ার খলজী গজনীর দেশের খলজ জাতীয় আফগান ছিল। জীবিকা অন্বেষণের আশায় গজনীতে মহম্মদ গোরীর অধীনে "দিওয়ান - এ - আরজ" বিভাগে সামান্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৫] কিন্তু এই সামান্য পদে সন্তুষ্ট হতে না পেরে বক্তিয়ার আসেন দিল্লীতে। এখানেও তার শারীরিক গঠনের জন্য মনোমত পদ পেলেন না। এবারে তিনি চলে যান বদায়ুনে, যেখানে সিপাহ্ শালার মালিক হিজবীর-অল-দীনের অধীনে কিছুদিন কাজ করার পর অবোধে পৌঁছোলেন। সেখানকার শাসনকর্ত্তা মালিক হুমাম-অল-দীন তাকে দুটি গ্রাম জাগীর হিসাবে প্রদান করলেন[৬] যা বর্ত্তমানে ভগবত ও ডেইলী পরগনা রূপে নির্দেশিত হয়েছে। বখতিয়ার তার অধিকারের সীমা থেকে গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে স্থিত মনের ও বিহারের নানা অঞ্চলে লুঠতরাজ আরম্ভ করে দিলেন। আর সেই লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র সমেত এক সেনা বাহিনী গড়ে তুললেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি কুতুবুদ্দীনের কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে একটি প্রশংসা পত্র ও একটি খিলাৎ পাঠিয়েছিলেন। প্রথমেই তার সৈনিক অভিযান শুরু হলো বিহার প্রদেশের ওদণ্ডপুরের দিকে। ওদণ্ডপুরের প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার অধিকার করার পরে চুণার দুর্গও তার করতলগত হলো।[৭] তারপর তিনি অগ্রসর হলেন নদীয়ার দিকে। তাঁর আক্রমণে নদীয়া বা নবদ্বীপ বিধ্বস্ত হলো। নবদ্বীপ থেকে ফিরে তিনি গৌড়-লক্ষণাবতীতে তার শাসন কেন্দ্র স্থাপন করলেন।

বস্তুত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুঘলদের আগমন পর্য্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস কখনও খলজী আমীর ওমরাহদের অধীনে কখনও বা দিল্লীর সুলতানদের প্রেরিত রাজপ্রতিভূর অধীনে, কখনও বা দিল্লীর কর্ত্তৃত্ব অমান্যকারী স্বাধীন সুলতানদের অধীনে কখনও বা হাবসী খোজাদের দৌরাত্মে বিপর্য্যস্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। মধ্যে খুব অল্পকালের জন্য হলেও হিন্দু রাজার শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে গৌড় বাংলার তুর্কী আক্রমণ ও তার শাসন বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল? কোন্ কোন্ স্থানীয় লোকেদের ওপর ইসলামের প্রভাব পড়েছিল? সর্বোপরি সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল?

রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থান ও পতনের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রেখায় রেখায় মিল সবসময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। বখতিয়ার খলজী লাখনৌতি ও তার চারপাশের অঞ্চলগুলি অধিকার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশ মাত্র পদানত হয়েছিল। গঙ্গার দক্ষিণতীরে মুসলমান অধিকার বহুদুর বিস্তৃত ছিলনা। লক্ষণাবতী বিজয়ের আট বছর পরে হুসামউদ্দীন বা গিয়াসউদ্দীন ইউয়াসের অধিকার কালে গঙ্গার উত্তরে দেবকোট পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে লখনোর পর্য্যন্ত ভূমি তুর্কীদের

অধীনে এসেছিল।[৮] লক্ষণ সেনের বংশধরগণ তখনও দক্ষিণবঙ্গের অধিকারী ছিলেন। তুর্কী বিজয়ের পরও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল পর্য্যন্ত লক্ষণ সেনের বংশধররা পূর্ববঙ্গে রাজ্যাধিকার ভোগ করেছিলেন।[৯] স্বভাবতই তাঁদের শাসনের প্রভাবে বঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতি নানা বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও সমন্বয় স্থাপন করেছিল।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখেছেন — যেমন সমাজের গঠন, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী এবং প্রত্যেক স্তর ও শ্রেণীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ। সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে জুড়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মের ওপর সামাজিক শ্রেণীবদ্ধতা ও শ্রেণীগত সম্পর্ক কতটা নির্ভরশীল ছিল আবার প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেণীগত মনোভাব কতখানি গড়ে উঠেছিল? এই শ্রেণীগত মনোভাবের সঙ্গে স্বতন্ত্র সামাজিক মর্য্যাদাবোধের বিকাশ কতখানি হয়েছিল?

এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন কেননা ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজ জীবন সম্বন্ধে তথ্যের উপাদান খুব অল্পই পাওয়া যায়। যদিও তৎকালীন সাহিত্য রচনাতে প্রত্যক্ষ ভাবে দেশ ও কালের প্রভাব সুপরিস্ফুট না হলেও সাহিত্যের অন্তরালে একটা জাতির মানসিক সত্ত্বা লুকিয়ে থাকে। তা দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা হোক বা ষোড়শ শতাব্দীর -- সমাজের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের নির্দ্ধারণ রীতির এক অমূল্য উপাদান।

বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য ''চর্য্যাপদ''। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে মহত্ত্বপূর্ণ কয়েকটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন যার অধিকাংশই বৌদ্ধ গান ও দোঁহা। তিনি এগুলির সংকলন করে নাম দিয়েছিলেন ''হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা''।[১০] সরহপাদ, কাহ্নপাদ, তিল্লোপাদ প্রভৃতির দোঁহা ও সিদ্ধাচার্য্যদের রচিত চর্য্যাপদগুলিকে একত্র করে নাম দেওয়া হয়েছে ''চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়''[১১] যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। বাংলা সাহিত্যের মনিষীবা চর্য্যাগীতিকার রচনা কাল নির্ণয় করেছেন দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। চর্য্যার পদগুলি সম্পূর্ণরূপে ধর্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রতীক রূপকের সাহায্যে মানবজীবনের সংগ্রাম, দুঃখ কষ্ট, বেদনা, হতাশা, আশা ও আনন্দের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশই যে এর পটভূমি তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।[১২]

পাল রাজাদের সময় থেকে বাংলাদেশে স্মৃতি, মীমাংসা, বেদের টিকা টিপ্পনী, বেদান্তের টিকা ভাষ্য এই জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচুর রচিত হয়েছিল।[১৩] এইসব স্মৃতি সুত্রাদি গ্রন্থে বাঙালীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ভারতীয় ধারারই আঞ্চলিক রূপ।

সেন রাজাদের আমলেই প্রথম সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটক ইত্যাদির রচনা শুরু হয়। লক্ষণ সেনের রাজসভাকে সংস্কৃত কাব্যানুশীলনে আলোকিত করে রেখেছিলেন উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন আচার্য্য ও জয়দেব। উমাপতি ও শরণের রচিত কোন পৃথক

কাব্য পাওয়া যায়নি বটে তবে কিছু কিছু ছিন্ন কবিতা পাওয়া গেছে। ধোয়ীর "পবনদূত" ও গোবর্দ্ধন আচার্য্যের "আর্য্য সপ্তশতী" বাংলার বাইরেও কিছু প্রসার লাভ করেছিল।[১৪] জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" শুধু যে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছিল তা নয় বিদ্ব সমাজে বাঙালীর এক গৌরবগাথা বলে পরিচিতি লাভ করেছে। একদিকে যেমন সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার অনুশীলন চলেছিল তেমনি অপরদিকে সমাজগঠনের জন্য নানা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলনও শুরু হয়েছিল। হলায়ুধ মিশ্রের "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" গ্রন্থে বাঙালীর উচ্চস্তরের সমাজগঠনের নানাবিধ নিয়মের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৫]

কিন্তু ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বা মূলের টিকা টিপ্পনীও খুব কম পাওয়া গেছে বাংলা গ্রন্থ তো দূরের কথা। এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান যে "তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালী ধর্ম, সমাজ ও ঘর সামলাতে এত ব্যস্ত ছিল যে মৌলিক গ্রন্থ রচনার অবকাশ পায়নি।[১৬]

বাঙালী র বর্ণবিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার পরিচয় আমরা পাই " বৃহদ্ধর্মপুরাণ"[১৭] ও "ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণে"।[১৮] এই দুই পুরাণের নির্ণয়কাল সম্বন্ধে নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তি "এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই কাল দ্বাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুর্দ্দশ শতকের পরে নয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়।[১৯]

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজা গণেশের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালী যে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিল তার অধিকাংশই ছিল স্মৃতি ও মীমাংসা বিষয়ে। এই স্মৃতিকারের মধ্যে শূলপাণি, শ্রীকর আচার্য্য ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০] এরা বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন জীবন যা পৌরাণিক রীতি নিয়মের দ্বারা নির্দ্ধারিত এবং তাদের ধার্মিক জীবনকে নিজস্ব ধারায় রূপ দিতে থাকেন। ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্ভূজের রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক "হরিচরিত" এক বিরাট মহাকাব্য।[২১] বাংলার সুলতান যদু বা জালালুদ্দীনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ টিকাকার রায়মুকুট বৃহস্পতি রচিত "স্মৃতিরত্নহার" ও শিশুপাল বধের টিকা "ব্যাখ্যা বৃহস্পতি" বিদ্ব সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।২২

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ভাষায় " রাধাকৃষ্ণ কাহিনী" কাব্যরূপ লাভ করে বীরভূমের বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" পদে[২৩], মিথিলার বিদ্যাপতির পদাবলিতে[২৪], কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়পদে"।[২৫] বিদ্যাপাত বাঙালী না হয়েও বাঙালীর মন কে জয় করে নিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ফুলিয়ার কৃত্তিবসের রামায়ণও বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল।[২৬] ধর্মীয় বিষয় বস্তুই সেই যুগের বাংলা কাব্য সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির অনুকরণে বাংলা আখ্যায়িকার রচনা। এক একজন শক্তি দেবতার আখ্যায়িকা মূলক স্বতন্ত্র গীতকে সেই দেবতার মঙ্গল বলে অভিহিত করা হতো। যেমন মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল, কলিকা মঙ্গল প্রভৃতি।[২৭] মঙ্গল কাব্যগুলিতে যে কেবল পৌরাণিক ঐতহ্যের বিশেষ প্রাধান্য ফুটে উঠেছে তা হয় -- তৎকালীন দেশ ও সমাজের সাংসারিক জীবনের নানা রীতিনীতি ও ব্যবহারের চিত্রও ফুটে উঠেছে। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত মঙ্গল কাব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিশেষ করে "মনসা মঙ্গল" কাব্যের। আলোচ্য কালে বিজয় গুপ্তের "মনসা মঙ্গল"[২৮] ও বিপ্রদাসের "মনসা বিজয়"[২৯] অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চৈতন্য দেবের সমকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যা প্রচুর না হলেও গুণগত উৎকর্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ আচার্য্য এবং শিবানন্দের পুত্র রামানন্দের পদাবলীতে আধ্যাত্মিক ভাবধারা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কারণ তাঁরা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই কোন বিশেষ সম্প্রদায়গত তত্ত্বকথার উল্লেখ নেই। বাঙালীর জনজীবন ও ধার্মিক চিন্তাধারার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই সব পদাবলীতে। মহাপ্রভুর বাংলা জীবনী কাব্যের মধ্যে উল্লেখনীয় হলো বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত"[৩১] (আঃ ১৫৪৮) ও জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল"[৩২] (১৫৬০ খ্রিঃ) এ দুটি কাব্যে সমসাময়িক বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী দুজনেই মহাভারতের আদি অনুবাদক। পরমেশ্বর দাস রচিত " পাণ্ডব বিজয় কথা"[৩৩] বা "ভারতকথা"র এবং শ্রীকর নন্দী রচিত "অশ্বমেধ পর্ব্বের"[৩৪] অনুবাদের ভনিতায় কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কুলশাস্ত্র সমূহের বিশেষ প্রভাব, কবে থেকে বংশাবলী রক্ষা করার প্রথা বাংলায় প্রচলিত হয় তা সঠিক বলা যায় না। নীহার রঞ্জন রায়ের মতে কোন কুলজীগ্রন্থেরই রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের আগে নয়[৩৫]। কুলজীগ্রন্থমালায় যে নানারকম অসংগতি আছে বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তবে এ কথা সত্য যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বর্ণগত ও ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি শাসিত সমাজ ব্যবস্থার চিত্র আমরা পাই তার একটা প্রাচীন ইতিহাস ছিল যা সামাজিক জনশ্রুতির দ্বারাই যুক্ত হয়েছে শূর, সেন ও বর্মন রাজাদের নামের সঙ্গে। একথা সর্বজনবিদিত যে সেন বর্মন রাজাদের আমলেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশাসন প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর কুলজীগ্রন্থগুলিতে তারই আভাস পাওয়া যায়। কুলজীগ্রন্থমালার যথার্থতা সম্বন্ধে নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তি যে ..... " কুলজী

গ্রন্থমালার পশ্চাতে একটা অস্পষ্ট লোকস্মৃতি বিদ্যমান ছিল এবং এই লোকস্মৃতি একেবারে পুরোপুরি মিথ্যাচারী নয়। তবে কুলশাস্ত্রগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটুকু মাত্রই গ্রাহ্য তাদের বিচিত্র খুঁটিনাটি তথ্য ও বিবরণগুলি নয়''।[৩৬] ব্রাহ্মণ কুলজী গ্রন্থমালায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের ''মহাবংশাবলী বা মিশ্র গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে অনুমান করা হয়।[৩৭]

ফার্সী ভাষায় রচিত সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখনীয় মিনহাজ-উদ্দীন-সিরাজের ''তবকৎ-এ-নাসিরী''[৩৮], জিয়াউদ্দীন বার্ণীর ''তারিখ-এ-ফিরোজশাহী''[৩৯], ফেরিস্তার ''তারিখ-এ-ফেরিস্তা''[৪০], শামসী সিরাজ আফিফের '' তারিখ-এ-ফিরোজশাহী''[৪১] এবং গোলাম হুসেন সলিমের ''রিয়াজ-উস-সালাতীন''[৪২]। মুসলিম ইতিহাসকাররা তুর্কো-আফগান যুগের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিহাস যেখানে রাজা, সেনাধ্যক্ষ, সৈন্যবাহিনী, রাজদরবার ও রাজকর্মচারী প্রধান স্থান লাভ করেছে। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক জীবন ধারার খুব কমই উল্লেখ পাওয়া যায়।

তুর্কী আক্রমণের প্রারম্ভে বাংলার জীবন ধারা ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। গ্রাম্য সমাজ পরিবর্ত্তন দ্রুত হয় না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়। এই পরিবর্ত্তনের গতি অনেকটা নির্ভর করে কাল ও দেশের বিশেষ অবস্থার ওপর। তুর্কী শাসনকালে যুদ্ধ বিগ্রহ স্বত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজজীবন যে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ''চর্য্যাপদে'' সমাজের অভ্যান্তরীণ গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং রাজপুরুষদের জীবনধারা বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত। মাত্র কয়েকটি পদে রাজা, রাজবংশ, উচ্চবংশ, ভূ-স্বামী ও বর্ণ শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যুদ্ধ জয়ের নির্দেশও আছে। ১২ সংখ্যক চর্য্যাপদে দাবা খেলার ছলে রাজা ও মন্ত্রীর এবং ১৪ সংখ্যক পদে ভূ-স্বামীর যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে সামাজিক স্তর বিন্যাসের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সবার ওপরে দেশের রাজা, রাজার প্রতিনিধি রূপে গ্রাম্য সমাজ সমষ্টির শীর্ষ স্থানে যিনি বিরাজ করতেন তিনি স্থানীয় ভূ-স্বামী। বংশ ও ভূ-সম্পত্তি এই ছিল সামাজিক শ্রেণী বিচারের মানদন্ড। সামাজিক স্তর বিন্যাসে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগই প্রধান প্রযোজ্য। বর্ণ বিন্যাসকে ছেড়ে দিলে উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক মর্য্যাদা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো ব্যক্তিগত ধর্মাধিকার -- তা ভূ-সম্পত্তির দ্বারাই হোক বা ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারাই হোক।

পাল সেন রাজাদের লিপি লিখন থেকে জানা যায় যে সামাজিক জীবনের ভর-কেন্দ্র ছিল ভূ-সম্পত্তি। এই ভূ-সম্পত্তির অধিকারী মহামাণ্ডলিক, মহাসামন্তরা কেবল প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায়রূপেই বিবেচিত হতেন না বরং এঁরাই ছিলেন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রধান সহায় ও পোষক।[৪৩]

চর্য্যায় বর্ণিত ভূ-স্বামীরা বা পাল সেন রাজাদের লিপি লিখনে উল্লেখিত ভূ-স্বামীরা তুর্কী শাসনকালেও বিদ্যমান ছিলেন। এইসব ভূ-স্বামীরা পরবর্ত্তীকালে "জমিদার" নামে অভিহিত হন। আবুল ফজলের "আইন-এ-আকবরীতে" বাংলার জমিদারদের উল্লেখ খুব স্পষ্ট।[৪৪] একথা ঠিক যে সুলতানী আমলে মুঘলকালের মত জমিদারী প্রথা বিশিষ্টতা লাভ করেনি। এম. আর. তরফদারের মতে হুসেন শাহী বংশের শাসনকালে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় "মজুমদারী" প্রথার চল ছিল। এক শ্রেণীর ভূমধ্যকারী যাঁরা "মজুমদার" নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সুলতানের রাজকোষ ভূ-রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ জমা দিতেন। পরিবর্ত্তে ভূমির অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু এই অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল না, পরে অধিক মজুমদারই বংশানুক্রমিক ভূ-স্বামী হয়েছিলেন।[৪৫] বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য চরিতামৃতে" হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাসের উল্লেখ পাওয়া যায় "মজুমদার" হিসেবে।[৪৬]

তুর্কী শাসনের প্রথম দিকে যদিও অনেক ভূ-স্বামীরা পীর ও গাজীদের হাতে নিপীড়িত হয়েছিলেন কিন্তু শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সুলতানরা এঁদের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কারণ দিল্লী সুলতানদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে এঁদের সাহায্য ছিল অনিবার্য্য। স্থানীয় প্রজাদের উপর এইসব ভূ-স্বামীদের ছিল বিশেষ প্রভাব। ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান বলবন যখন বাংলা আক্রমণ করলেন তখন বাংলার সুলতান তুঘ্রীল খাঁ বা মুঘীসউদ্দীন উড়িষ্যাতে পালিয়ে গেলেন। তুঘ্রীল খাঁর পশ্চাদধাবন করার সময় সোনার গাঁওর ভূ-স্বামীরা বলবনকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।[৪৭] ঠিক একই ভাবে দেখা যায় যে যখন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইলিয়াস শাহর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি সহ্য করতে না পেরে বাংলা আক্রমণ করলেন তখন ইলিয়াস শাহ প্রসিদ্ধ একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেইসময় বাংলার ভূ-স্বামীরা তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। পরিবর্ত্তে তারা পেলেন ইলিয়াস শাহর কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন ও সম্মান।[৪৮]

১৩৩৮-১৩৬৫ খ্রিঃ পর্য্যন্ত পাবনা ফরিদপুর যশোর ও বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ভূ-স্বামী ছিলেন মুকুট রায় নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ। কিন্তু ধর্মান্তরীকরণে বাধা দিতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারান।[৪৯]

এই ভূ-স্বামী বা পরবর্ত্তীকালে 'জমিদার" নামে অভিহিতদেব অপরিসীম ক্ষমতা দেখে তিক্ত হয়ে ১৩৯৭ তে মৌলানা মজঃফর শামসবলখি ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজমকে চিঠি দিয়েছিলেন এই মর্মে যে হিন্দু জমিদাররা অত্যন্ত ক্ষমতা ভোগ করছে।[৫০] এই ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগনার প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা গণেশ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৫১]

পঞ্চদশ শতাব্দীতেই দেখা যায় যে যশোর বনগাঁ এলাকার জমিদার রামচন্দ্র খাঁ, গৌড়ের জমিদার সুবুদ্ধি রায়, তাহেরপুরের কংসনারায়ণ -- এঁরা সকলেই প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।[৫২] অতএব বলা যেতে পারে যে অর্থ-সামর্থ্যের সঙ্গে মর্য্যাদাও শ্রেণী বিচারের মানদন্ড হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন 'ইক্তা' প্রথা প্রচলিত হলো তখন ইক্তার আওতায় যে সব ভূ-স্বামীরা ছিলেন তাঁদের প্রতিপত্তি একেবারে অব্যহত ছিল না কারণ ইক্তাদারদের ভূমিকাও মহত্ত্বপূর্ণ ছিল।

তুর্কী আক্রমণের পূর্ব্বে দেশের শীর্ষস্থানে ছিলেন রাজা তুর্কীশাসনকালে হলেন সুলতান। পাল রাজাদের ভূমিদান সম্পর্কিত পট্টোলীতে ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনে রাজকর্মচারীদের একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীর তালিকা পাওয়া যায়।[৫৩] তাঁরা অবশ্য সকলেই একই অর্থনৈতিক স্তর ভুক্ত ছিলেন না। বাংলার সুলতানদের অধীনেও ছিল বিভিন্ন রাজকর্মচারী -- যারা প্রশাসনের মহত্ত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন যেমন জংদার, শিকদার, খান-এ-আজম, খান-এ-মোয়াজুম, সব্-এ-লদ্ব, মজলিশ-এ-মজলিশ, মহাপত্রাদিপত্র ইত্যাদি।[৫৪] ভূ-স্বামীদের অধীনে যে সব রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতেন তাদেরও গ্রামীণ সমাজের মধ্যশ্রেণী ভুক্ত করা যায় না। বিত্ত বা প্রতিপত্তি থাকলেও তাদের শ্রেণীগত প্রভাব সমাজে তেমন ছিল না। গ্রাম্য সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিত্ত নির্ভর ছিল না, ছিল কুল বৃত্তিগত।

সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর বাংলার ইতিহসে নগর শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ বা কুলিকদের যে বাণিজ্যিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানত ছিল কুলবৃত্তিগত বাণিজ্য। শ্রেণী হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজে তাদের প্রভূত প্রাধান্য ছিল।[৫৫] কিন্তু সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে কমে গিয়েছিল।[৫৬] "বল্লাল চরিতে"[৫৭] বণিক গোষ্ঠীর উল্লেখ এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণে বণিক ও ব্যবসায়ীদের অগণিত তালিকা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে এরা বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বাণিজ্যে তাদের গৌরবের উপাধি ছিল সওদাগর। সওদাগরী ব্যবসায়ে একদিকে যেমন তারা প্রচুর ধনশালী হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনি সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মনসা মঙ্গল ও চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির কারণ অর্থনৈতিক। তার ফলে একটা শ্রেণীগত মনোভাবও গড়ে ওঠে এবং এই মনোভাবের সঙ্গে ক্রমে একটা স্বতন্ত্র সামাজিক মর্য্যাদাবোধের বিকাশ হয়।

বিত্তশালী গোষ্ঠীর পরে উল্লেখনীয় হলো এক এক বৃত্তি অনুসরণকারী জনগণ যারা স্ব স্ব শ্রেণীর শাসনাধীনে থেকে সমবেত ভাবে চলতো। চর্য্যার বিভিন্ন সংখ্যক পদে বৃত্তিধারী জনসাধারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডোম্বী যে নৌকাপারাপার করে, হালচাষী,

ধীবর, ছুতোর শ্রেণী, মাহুত, শবর শবরী, তাঁতী, ধুনুরী, শুঁড়ির দোকান, ডোম, কৈবর্ত্ত, কাপালিক প্রভৃতির বার বার উল্লেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কৌলিক বৃত্তিপালন করা হতো।[৫৮]

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবতে"ও বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে মনে হয় সমাজের জন্য নির্দ্ধারিত সেবা করে তারা জীবনযাপন করতো। মহাপ্রভুর নবদ্বীপে নগর ভ্রমণের বিবরণে দেখি যে তিনি একে একে তাঁতী, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির কারিগরদের মহল্লায় গিয়ে আত্মীয়দের মতন মিশতেন।[৫৯] তৎকালীন সমাজে বৃত্তিগত গতিশীলতা ছিল না। ফলে যে যার বংশগত বৃত্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনেকটা ধর্মশাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য মনে করে পালন করতো। সেই কারণে দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দীতেও কুলবৃত্তিগত কারিগরদের প্রায় একই ছবি দেখি।

সামাজিক শ্রেণীভেদে, মর্য্যাদাভেদের সঙ্গে জাতি বর্ণভেদ প্রভৃতির সম্পর্ক প্রায় প্রত্যক্ষ। বস্তুত ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জাতি ও বর্ণ নিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করেছেন কাজেই এ ব্যাপারে গভীরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তৎকালীন সমাজ যা বর্ণাশ্রমের ওপর আধারিত ছিল তার মোটামুটি একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণনির্ভর আবার বর্ণ জন্মনির্ভর। বর্ণের সামাজিক মর্য্যাদা নিরূপণ হতো তার বৃত্তি অনুযায়ী আবার বর্ণ অনুসারে বৃত্তির নির্দেশও ছিল।[৬০] জাতি ও বর্ণের আলোচনায় কেবল বাংলাদেশেই নয় সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণদের স্থান সবার ওপরে। ব্রাহ্মণ বর্ণ হিসেবে যেমন শ্রেণী হিসেবেও তেমনিই আলাদা শ্রেণী। কেননা শ্রেণী হিসাবে সমাজের সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও শাস্ত্র সংহিতার ন্যায় রক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তিই ছিল ধর্মানুষ্ঠান এবং অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই তা করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজা, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভ করে দান ও দক্ষিণা স্বরূপ প্রভূত অর্থ ও ভূমির অধিকারী হতেন।[৬১] ব্রাহ্মণ অবশ্য তার কুলবৃত্তির জন্যই গ্রাম্য সমাজে অখন্ড প্রতিপত্তিশালী ছিল। বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্য্যাদা ও প্রভাব বিত্তবান বণিক, কারিগর বা কৃষকদের থেকে অনেক বেশী ছিল। চর্য্যাগীতিতে ব্রাহ্মণদের উল্লেখ কিছুটা ব্যঙ্গচ্ছলে যেমন - " ব্রাহ্মণ নাড়িয়া" অর্থ্যাৎ নেড়া ব্রাহ্মণ।[৬২] পালরাজাদের আমলে দান, ধ্যান, ক্রিয়া কর্ম যা কিছু করা হয়েছে তা এদের সম্মান জানানোর পর।[৬৩] সেন রাজাদের সময় নতুন করে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংগঠিত হয়। ব্রাহ্মণদের রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, গ্রহবিপ্র, শাকদ্বীপী প্রভৃতি নানা উপশ্রেণীতে

বিভক্ত করা হয়।[৬৪] এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, সামাজিক দিক থেকেও গাঞী প্রাধান্যও পরিলক্ষিত হয়। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম থেকে। যে গ্রামে যে ব্রাহ্মণ বাস করতেন তিনি সেই গ্রামের নামানুযায়ী গাঞী পরিচয় গ্রহণ করতেন।[৬৫] কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক হিসাবে বল্লাল সেনের নাম বহুভাবে উল্লিখিত, কৌলীন্যের প্রথম মানদন্ড ছিল নয়টি গুণ — আচার, বিজয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ ও দান। এই নয়টি গুণ সমন্বিতরা হলেন কুলীন। ব্রাহ্মণ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা গুণানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রীয়। আর বারেন্দ্ররা কুলীন, শ্রোত্রীয় ও কাশ্যপ, পাল, সেন রাজাদের বংশের লিপিগুলিতে পাওয়া যায় যে সাধারণ নিয়মে এঁরা পুরোহিত ধর্মজ্ঞ, রাজপন্ডিত, স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্রাদির লেখক প্রশস্তিকার ইত্যাদি।[৬৬] কিন্তু লক্ষণ সেনের রাজসভায় অনেক ব্রাহ্মণই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, হলায়ুধ মিশ্র উচ্চতম রাজপদ অধিকার করেছিলেন। প্রথমে মহামাত্য ছিলেন পরে ধর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।[৬৭] অনেক ব্রাহ্মণই সামন্ত, মহাসামন্ত মন্ত্রী, সন্ধিবিগ্রহিক বা সেনাধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেছেন।[৬৮]

কিন্তু তুর্কী বিজয়ের পর অনেক ব্রাহ্মণই আশাহত হন। তবে ১৪১৫র আগে খুব কম ব্রাহ্মণই মুসলিম শাসকদের রাজসভায় কার্যাভার গ্রহণ করেছিলেন। রাজা গণেশের সিংহাসনারোহণের পর ব্রাহ্মণরা রাজসভায় অনেক বেশী সংখ্যায় কার্য্যভার গ্রহণ করেছিলেন।[৬৯]

হুসেন শাহর রাজ্যকালে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অনেক চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের বাস ছিল।[৭০] মনে হয় এঁরা শাস্ত্র চর্চা ও যাগ যজ্ঞাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তবে হুসেন শাহর দরবারে অনেক ব্রাহ্মণও রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রূপ ও সনাতন সুলতানের দরবারে অত্যন্ত সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রূপ গোস্বামী ছিলেন "সাকার মল্লিক" আর সনাতন গোস্বামী ছিলেন "দবীর খান"।

কিন্তু রাজকার্য্যের কারণে যে সব ব্রাহ্মণেরা মুসলিম শাসকদের সংস্পর্শে অর্থাৎ তথাকথিত "ম্লেচ্ছ" সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের সামাজিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তাঁরা প্রায় পতিতের পর্য্যায়ে গণ্য হতেন। তখন দত্তখাস নামে এক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে "জাতিমালা কাছারী" নামে এক সামাজিক সংস্থার গঠন হয়। দত্তখাস স্বয়ং ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মেহমুদের (১৪৪২-১৪৫৯) অধীনে সম্ভবত একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের সমস্যা সমধানের জন্য তিনি ৫৭ টি সামাজিক সমীকরণ করেছিলেন।[৭১] তারপর উদয়নাচার্য্য ভাদুরী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের অনেক জাতি বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। ১৪৮০-৮১ তে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনদের ৩৬ টি মেল বন্ধন করেন। তার ফলে এক মেলের কুলীন অন্য

মেলের কুলীনদের সঙ্গে কুলকার্য্য সম্পাদন করতে পারতেন।[৭২] তবে সচরাচর কেউই মেল ভঙ্গ করতেন না।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণে জাতি ও বর্ণের চিত্র খুবই স্পষ্ট। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে যত বর্ণ আছে সকলকে সংকর বা মিশ্র বর্ণ বলা হয়েছে এবং তারা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। আবার এই শূদ্র বর্ণকে দুই পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে 'সৎ শূদ্র' ও 'অসৎ শূদ্র' অর্থ্যাৎ উচ্চ ও নিম্ন বর্গ।[৭৩]

তা যাইহোক বাঙালীর সামাজিক গঠন ব্যবস্থা চার্তুবর্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কারণ চার বর্ণের দুই বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলায় অনুপস্থিত। "বস্তুত বাংলাদেশে কোন কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে গঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।"[৭৪] তাই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের পরই রাষ্ট্রে যাদের সক্রিয় প্রভাব ছিল তাঁরা হলেন করণ-কায়স্থ। নীহার রঞ্জন রায়ের মতে "গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের বাঙলার লিপিগুলিতে কায়স্থ শব্দের ব্যবহার যেমন পাইতেছি তেমনই পাইতেছি করণ শব্দেরও .... করণ এবং কায়স্থ একেবারে সমার্থক এ কথা স্পষ্ট না হইলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান তাহা এই ধরনের উল্লেখের মধ্যে সুস্পষ্ট।[৭৫] এঁরা সাধারণত রাজকীয় দলিল পত্রাদির লেখক, পুস্তক লেখক এবং হিসাবরক্ষক হিসাবে পরিচিত ছিল।[৭৬] পাল রাজাদের আমলে কায়স্থরা দক্ষ শাসন পরিচালক ও রাজকর্মচারী রূপে পরিগণিত হয়েছিল।[৭৭] সেন রাজাদের অধীনে এদের সন্ধি বিগ্রহিক ও মহাসন্ধি বিগ্রহিব রূপে দেখা গেছে। লক্ষণ সেনের সভাকবি উমাপতি ধরও করণ-কায়স্থ ছিলেন।[৭৮] শাসন কার্য্যে দক্ষতার জন্য তুর্কী শাসনকালেও প্রশাসনিক বিভাগে কায়স্থদের প্রাধান্য ছিল। আইন-এ-আকবরীতে দেখা যায় যে গৌড় বাংলার অধিকাংশ জমিদাররা ছিলেন কায়স্থ।[৭৯] কায়স্থ সমাজেও কৌলীন্য প্রথাকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হতো।

করণ-কায়স্থদের পরে উল্লেখনীয় হলো অম্বষ্ট-বৈদ্য। অর্বাচীন স্মৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা বৃত্তিধারী লোকেদের বৈদিক বলা হয়েছে। ব্রহ্মাকৈবর্ত্তপুরাণে যদিও বৈদ্য ও অম্বষ্টকে দুটো আলাদা উপবর্ণ হিসাবে উল্লেখ করলেও একই বৃত্তি অনুসারী বলা হয়েছে[৮০] অর্থ্যাৎ চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চর্চা। পাল-বর্মন-সেন রাজাদের লিপিমালায় বৈদ্যরা অম্বষ্ট-বৈদ্য বলে নির্দেশিত, পরবর্ত্তীকালে এই দুই উপবর্ণকে এক এবং অভিন্ন উপবর্ণে পরিবর্তিত করেছিল যেমন করেছিল করণ এবং কায়স্থদের।[৮১]

সে যাই হোক সুলতানী আমলে বৈদ্যদের পরম্পরাগত চিকিৎসক হিসাবেই দেখা যায়।[৮২] এমন কি যোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরামের "চন্ডীমঙ্গলে"ও বৈদ্যদের চিকিৎসক বলা হয়েছে।[৮৩] আধুনিক পন্ডিতদের মতে বৈদ্য সমাজ বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণ তালিকায় কায়স্থ ও বৈদ্যদের পরে যাদের

স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে তারা সকলেই বৃত্তিধারী উপবর্ণ। যেমন গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায় প্রভৃতি। বর্ণ হিসাবে সমাজে এরা উচ্চস্থান অধিকারতো করেইনি বরং কিছুটা অবজ্ঞাত। কথিত আছে যে রাজা বল্লাল সেন কৈবর্ত্ত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকারদের সমাজে উন্নীত করেছিলেন।[৮৪] তুর্কী শাসনকালে বাংলাদেশে এইসব বৃত্তিধারীদের যে তেমন কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় "চন্ডীমঙ্গল" কাব্যে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় পাই যে কাল্পনিক গুজরাট রাজ্যে বসবাস করার জন্য একে একে গোপ, তেলী, মালাকার, কুম্ভকার, বারুই, মোদক, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিকদের আগমন হতে লাগলো।[৮৫] অতএব বৃত্তিধারীদের চিত্র তুর্কী শাসনকালে প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল।

চর্য্যাপদে ডোম, ডোমনী, শবর শবরী, কাপালিক প্রভৃতির যে জীবন চিত্র রূপক আকারে ব্যবহার করা হয়েছে তা সমস্তই বর্ণাশ্রম ধর্মের বহির্ভূত সমাজের চিত্র। পাল রাজাদের লিপিমালায় নিম্নবর্ণের তালিকায় আছে মেচ, অন্ধ্র ও চন্ডালরা। চর্য্যার বর্ণনায় আছে ডোমের কুঁড়ে ঘর গ্রামের বাইরে। অন্ত্যজ পর্য্যায়ে তো সমাজের দৃষ্টির বাইরে। মুসলিম শাসকদের সময়ও বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হয়নি। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান ও সহজযানে ডোম, ডোমনী, শবর, শবরীদের যে স্বীকৃতি ছিল চর্য্যাগীতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতিতে তা ছিল না।

পাল রাজাদের আমলে জাতিপ্রথার অত কঠোরতা ছিল না। বর্মন সেন রাজাদের আমলে বর্ণভেদ বিন্যাস দৃঢ় হয়ে ওঠে। বর্ণাশ্রম প্রথার কাঠামোকে ভিত্তি করে জাত, পাত, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য নির্দিষ্ট হয়। এইভাবে সমাজকে স্তরে উপস্তরে বিভক্ত করে সমগ্র সমাজ বিন্যাস গড়ে তোলে, বর্ণগত আহার-বিহার-বিবাহ ব্যাপারে বিধি নিষেধের প্রাচীর তুলে দেওয়া হলো। আর এই বিধি নিষেধই সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

সেই যুগ ছিল ব্রাহ্মণবাদী অভিজাত উচ্চকোটি লোকেদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু বল্লালী কৌলীন্য প্রথা উচ্চবর্ণের মধ্যেও অনৈক্য সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত -- "বল্লাল সেনের ও তাঁর বংশধরগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে দানগ্রহীতা বহু ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে "কুলীন" এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থ মতে ব্যক্তিগত গুণ দেখিয়া বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়েছিলেন অথচ অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি, ধনঞ্জয় সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পন্ডিত অথবা লক্ষ্মণ সেনের সভাস্থিত জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ কেহই কুলীন হইলেন না। কুলীন হইলেন কেবল তাঁহারাই কুলগ্রন্থের বাহিরে যাহাদের নাম বা কীর্ত্তির কোন পরিচয় নাই ... ইহা বিশ্বাস করা কঠিন"।[৮৬]

লক্ষণ সেনের রাজসভাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আচার বিচারের সূক্ষাতিসূক্ষ আলোচনার সময় অতিবাহিত করছিলেন অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিষ্টার জন্য সমগ্র সমাজকে উত্তমসংকর, মধ্যমসংকর ও অধমসংকর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলো। ফলে তার থেকে উৎপত্তি শ্রেণী বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

পালরাজারা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি ছিলেন কিন্তু সেন রাজারা সাধারণ মানুষকে দুরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাই তাদের অন্তর স্পর্শ করতে পারেন নি। আবার যারা অধমসংকর বলে সমাজে অভিহিত হতো অর্থ্যাৎ চাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, মালো প্রভৃতির সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর জীবন আদর্শের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। বলতে গেলে এই অধমসংকরদের বর্ণাশ্রিত সমাজ বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা যখন এইরকম তখনই ইসলামের আবির্ভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালী সমাজ ইসলামের মুখোমুখি হয়ে শাস্ত্রকার ও নৈয়ায়িকদের নেতৃত্বে নিয়ম নীতির সতর্ক ও দৃঢ় প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বর্ণ বিদ্বেষের শিকার, বঞ্চিত ও শোষিত নিম্নবর্ণের সমাজে, শাস্ত্রী ও নৈয়ায়িকদের নীতিনিয়ম, সমাজ আদর্শ সুদৃঢ় অবরোধ গড়ে তুলতে পারেনি, ফলে সমাজের এই অবহেলিত দিকটায় ইসলামের বাণী প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছিল। অবহেলিত নিম্নকোটির মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামের সাম্য দর্শন ও প্রবল ভ্রাতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নতুন প্রত্যাশায় আশ্বস্ত হয়ে রাজধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। রাজধর্ম ইসলাম তাদের জীবিকার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। কারণ নির্দিষ্ট পেশাজীবি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম পালিত ভারতীয় সমাজে স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাচন করা সহজ ছিল না। তাই তাঁতী, তেলি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি সবাই স্বনামে বা নামান্তরে টিকে রইল মুসলিম সমাজে। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও সমাজের এক অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হলো। ইসলাম নব দীক্ষিতদের বৈষয়িক জীবনে ভাগ্য পরিবর্ত্তনে যতটা না সহায়ক হয়েছিল তার থেকেও বেশী দিয়েছিল তাদের সামাজিক স্বাধীনতা।

যদিও পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বার্বোসা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন যে "দলে দলে হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে"[৮৭] তবুও বলা যেতে পারে যে ধর্মান্তীকরণ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনি। উচ্চবর্ণেরা রাজকার্যাদির জন্য দরবারী পোষাক পরিচ্ছদ ও আদব কায়দা গ্রহণ করলেও চিত্তের গভীরে ইসলাম কোন দাগ কাটতে পারেনি।

জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের অনুপ্রবেশ ছিল অত্যন্ত সুক্ষ ভাবে। তুর্কী আক্রমণের সময় থেকেই ভারতবর্ষে পীর, ফকির, মুরশিদদের আগমন শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সময় মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা আমন্ত্রিত

হতেন। ইসলামী ধর্ম প্রচারকরা প্রায়ই বৌদ্ধ ও হিন্দুর মঠ ও মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করতেন। অথবা মঠ ও মন্দিরের পাশেই পীরের দরগা, খানকা নির্মান করতেন। সাধারণ মানুষ পূর্ব্ব সংস্কার ও আচার বিচার ভুলতে না পেরে ধীরে ধীরে দরগার প্রতি পীরের প্রতি আকৃষ্ট হতো। সেখানে শীর্নি দিতে আসতো কারণ যা এক সময় দেবদেউল ছিল তা পরে মসজিদে পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

তুর্কী আক্রমণের গোড়ার দিকে গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার সমাজ তেমন ভাবে তরঙ্গায়িত হয়নি। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয় ছিল না। তবে মুসলিম শাসকরা যখন নববিজিত দেশকে প্রশাসনের সুবিধার জন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করেছিল তখন থেকেই নতুন নগরের উৎপত্তি বা পুরনো নগরকে পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সবই তখন রাজনৈতিক প্রয়োজনেই হয়েছিল। বক্তিয়ার খলজী বিজিত প্রদেশের সীমাবর্তী অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার শাসনভার খলজী বংশীয় ওমরাহদের ওপর ন্যস্ত করে তাদের এক্তিয়ারের সীমাকে নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন।[৮৮] ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামী অভিজাত তন্ত্র যার ধারক ও বাহক ছিলেন এইসব আমীর ওমরাহরা, এরা গ্রামের থেকে নগরের উন্নতির প্রতি অনেক বেশী দৃষ্টিপাত করেছিল। ফলে লাখনৌতি, তাণ্ডা, দেবকোট, পাণ্ডুয়া ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি নগরগুলি কেবলমাত্র সমৃদ্ধশালী নগর বলে গুরুত্ব অর্জন করেনি তাদের কেন্দ্র করে একটা নাগরিক সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো। সাতগাঁও-র মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক স্থিতি সম্বন্ধে বিপ্রদাসের উক্তি থেকে জানা যায় যে নগরের অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায় "আশরফ" নামে অভিহিত। এই আশরফ শ্রেণীর অন্তর্গত হলেন কাজী, মোল্লা এবং আমীর ওমরাহরা।[৮৯] মুসলিম সমাজে কাজীদের স্থান সবার ওপরে।[৯০] তারপরের স্তরে মোল্লারা এবং তার পরে আমীর ওমরাহরা। কাজী ও মোল্লাদের বিবরণ দিতে গিয়ে বিপ্রদাস তাদের উল্লেখ করেছেন সৈয়দ, মোঘল ও পাঠান বলে অর্থ্যাৎ যারা মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্থান থেকে এসেছেন। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামও ঠিক একইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন কাল্পনিক গুজরাট নগরে সৈয়দ, কাজী, মোঘলদের আগমন সম্বন্ধে।[৯১]

আশরফ শ্রেণী থেকে একেবারে আলাদা কিন্তু মহত্বপূর্ণ — তারা হলো বিভিন্ন বৃত্তিধারী কারিগররা। যেমন জুলাহ, দর্জি, রংগরাজ, পীঠারী ইত্যাদি। আমীর ওমরাহদের ভোগ্যবস্তু নির্মাণের জন্য এবং নগরের চাহিদা অনুসারে এদের আগমন। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বার্বোসার মতানুযায়ী এরা সকলে ধর্মান্তরিত মুসলিম।[৯২] মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গলে" ও এই বৃত্তিধারীদের সূচী আরও স্পষ্ট। যে সব নগর মূলত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, শাসনাবিধান ছিল যে সব নগরে স্বভাবতই সেখানে

রাজকার্য্যের জন্য হিন্দু-মুসলিম রাজকর্মচারীরাও বাস করতেন। এ ছাড়া অধিকাংশ নগরেই কম-বেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা ছিল বলে মনে হয়। শিল্পদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই সমস্ত নগরীতে সমবেত হতে লাগলো। সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ লাখনৌতি থেকে পশ্চিমে রাঢ় দেশে; লাখনোর নগরের দ্বার পর্য্যন্ত এবং পূর্বের দেবকোট পর্য্যন্ত দশদিনের মত পথ নির্মাণ করিয়েছিলেন।[৯৩] ফলে যাতায়াতের সুবিধা ও ব্যবসা বাণিজ্যর উন্নতি হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধি সুবিদিত। রাজনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করে ইরাণ তুরাণ থেকে আগত বণিক সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নগরগুলিতে যাতায়াত করতে লাগলো। ফলে নগরগুলি প্রসার লাভ করতে লাগলো। আর এই প্রসারিত নগরের বিচিত্র জীবনের সংস্পর্শে এসে বাঙালীর মানসিক জীবনেও কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দিল। গ্রাম-কেন্দ্রিক বাঙালীর সামাজিক জীবন ধীরে ধীরে নাগরিকতার অভিমুখে যাচ্ছিল।

প্রাচীনকালে ধর্মকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে উঠতো। আর্য বিজয়ের পরে বিজেতা ও বিজিতের দ্বন্দ মিলনে এক সমন্বিত ধর্ম-সংস্কৃতি দেখা দিয়েছিল। আবার দেব, দ্বিজ, বেদের নামে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন যখন প্রবল হলো তখন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবে উৎপীড়িত মানুষ স্বস্তির সন্ধান করেছে। এমনি করেই সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে। নানাবিধ আর্য প্রভাবের দ্বারা বাংলার লোক জীবনের ধর্ম ও দেবতার বন্দনার পদ্ধতি বারে বারে প্রভাবিত এবং বিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রভাব পরিবর্ত্তনের ধারা আকস্মিক বা যথেচ্ছ ছিল বলে মনে হয় না। প্রথমে জৈন ধর্ম এবং তার প্রায় সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্ম এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই দুটি ধর্মমত প্রথম থেকেই বৈদিক আর্যাচার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের প্রবল বিরুদ্ধাচারী ছিল। সরহপাদের টীকার অন্যত্র আছে "শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কিছু জাতি নাই, সমস্ত লোক একই জাতিতে নিবদ্ধ। ইহাই সহজ ভাব"।[৯৪] বৌদ্ধ ধর্মের লোকমুখীনতা তাদের আচার আচরণকে লোকপ্রিয় করে তুলেছিল। ফলে লৌকিক ধর্মাচরণে বৌদ্ধ প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করে। নীহার রঞ্জন রায়ের মতে "পাল যুগে বৌদ্ধ সহজ ধর্মের উদার আদর্শ কিছুটা সামাজিক জীবনেও সক্রিয় ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন সামাজিক আচার বিচার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সমাজ বিন্যাসে এই উদার মানবাদর্শের স্বীকৃতি বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না।"[৯৫]

বৈদিক আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ আবার পৌরাণিক ধর্ম ও শাস্ত্র সংহিতার অনুশাসন শিরধার্য্য করে হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছিল। গৌড়-বাংলা যখন নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল তখন ভারতের অন্যান্য

জায়গায় শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে বৌদ্ধদের কোণঠাসা করা হয়েছিল। তার ঢেউ বাংলাদেশেও এসে লাগে।

বাংলাদেশে আর্যীকরণের ধারার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব অনেককাল বহমান ছিল। অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড় বাংলায় ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ সংক্রান্ত সমন্বয় ধারা কিছুটা স্বীকৃত হয়েছিল। পাল রাজাদের সময় থেকেই বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সঙ্গে তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের সমন্বয় ঘটে। উভয় ধর্মই এই সময়ে আর্যেতর দেবদেবী, আচার ও সংস্কার ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং কিছু কিছু স্বীকৃতিও লাভ করে। বৌদ্ধ তারাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য পরিবেশে কালী এবং দুর্গার নামে প্রচলিত।[৯৬] কিন্তু চর্য্যাপদে তার কোন স্পষ্ট ছাপ নেই। বরং চর্য্যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে সহজিয়া ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।[৯৭] আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে নবম শতাব্দীর পর থেকে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের দুটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল--শৈব নাথ মত ও বৌদ্ধ সহজিয়া মত। ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সমবায়ে যে মিশ্রমত গড়ে উঠেছিল তা নাথপন্থ নামে পরিচিত।[৯৮] কায়াসাধন এবং দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। এই দুটি মতই চর্য্যাগীতি ও নাথ সাহিত্যে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু পাল রাজারা মহাযান বৌদ্ধ মতাবলম্বী হলেও বৈদিক ও স্মার্ত্ত আচার বিচারের প্রতি কখনও প্রতিকূল ছিলেন না। তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা কর্ত্তৃক ভূমিদান সবতো এঁদেরই উদ্দেশ্যে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে নন্দ নারায়ণের এক দেউলের (দেব কুলের) উল্লেখ আছে।[৯৯] এই মন্দিরে যে দেবতার পূজো হতো তিনি ছিলেন নন্দদুলাল কৃষ্ণরূপী নারায়ণ। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে গরুড় স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল।[১০০] পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম বলতে গেলে রাষ্ট্র ধর্ম ছিল। তা সত্ত্বেও লিপিমালাগুলি রচনায় পৌরাণিক ধর্মও সংস্কারের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। মদনপালের মনহলি লিপি পাঠে বোঝা যায় যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠ অনেক ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল।[১০১]

পাল রাজাদের পতনের পর গৌড় বাংলায় বর্মন ও সেন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলো। বর্মন রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সুত্রপাত হলো তা সেন রাজাদের ছত্রছায়ায় আরও দৃঢ় হলো। সেন রাজাদের রাজসভায় বিদ্বজনের পটভূমিকায. ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কার অর্থ্যাৎ ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা। বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ব্রত্য অনুষ্ঠান দ্রুত প্রসারিত হলো।[১০২] বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন তো পৌরাণিক ও স্মার্ত্ত সংস্কৃতির প্রধান বাহক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা নানা ধরনের ব্যবস্থা নিতে থাকেন। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ক্রিয়া কর্ত্তব্য থেকে ধর্ম ও

সমাজগত আচার আচরণ পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সবই "কাল বিবেক"[১০৩] ও "দায়ভাগ"[১০৪] প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রণ করার রাজকীয় প্রয়াস চলেছিল। সে যুগে দেশের জনসাধারণের ওপর ধর্ম ও ধর্মের অনুশাসন সমাজের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা ছিল। কিন্তু আপন স্বরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কার ছিল লোকবিমুখ। প্রধানত রাজশক্তির সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক সংস্কার প্রাধান্য পেয়েছিল। আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাহায্যে সেন রাজারা বৈদিক স্মার্ত্ত সংস্কৃতির একটা দুরূহ ভার সাধারণ বাঙালীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত রাজসামন্ত ও ব্রাহ্মণগণ যখন বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও শ্রুতি, স্মৃতি মীমাংসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন সমাজের নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত জনসাধারণের মধ্যে অন্য এক ভাবধারা বইছিল। একথা স্বীকার্য যে বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যে অনেকটা কমে আসছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ মতাবলম্বী রামচন্দ্র কবি ভারতীকে ব্রাহ্মণ্য উৎপীড়নে দেশ ছেড়ে সিংহলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১০৫] দুই ধর্মের সংঘর্ষ যেমন চলছিল তেমনি একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় বিশেষ করে নিম্নকোটি লোকেদের ক্রিয়াকলাপে। কারণ বজ্রযান, সহজযান, কুলাচার, ন্যায়ধর্ম, শৈব তান্ত্রিক ধর্ম, অর্দ্ধরহস্যবাদী, অর্দ্ধদেহবাদী, গুহ্য তান্ত্রিক মত দ্রুত বেগে সাধারণ মানুষের চিত্তকে গ্রাস করেছিল।[১০৬] বৌদ্ধ ধর্মের আচার আচরণ ও সংস্কার সমাজের উচ্চভূমি পরিত্যাগ করে নিম্নকোটির লোকজীবনের স্তরে প্রধান শিকড় গেড়েছিল। অভিজাত সমাজের চিন্তাধারায় এই ধর্মের স্থান খুবই কম ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মই ছিল গৌড় বাংলায় একমাত্র অভিজাত ধর্ম। আর সেই ধর্মের উপাস্যরা হলেন বিষ্ণু, শিব, চন্ডী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীরা।[১০৭]

সাধারণ হিন্দুসমাজ পঞ্চোপাসক ছিল।[১০৮] কিন্তু সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই ধারারই প্রাধান্য লক্ষণীয়। সেন রাজাদের লিপি লিখনে উমা মহেশ্বরের যে চিত্র[১০৯] পাওয়া যায় তাতে শৈব ধর্মের প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া গেলেও লক্ষণ সেনের শাসনকালে সমাজের উচ্চ বর্ণের মধ্যে সম্ভবত বৈষ্ণব মত প্রকট হয়ে উঠেছিল। কারণ সেন আমলে প্রাপ্ত শাসনাবলী ও প্রশস্তিতে কৃষ্ণ গোপী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতির শ্লোকগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১১০]

তা যাই হোক গৌড় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জায়গায় পুরাণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য মত এবং বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের আদর্শ যখন বিশেষভাবে প্রচারিত হচ্ছিল তখনই ঘটলো তুর্কীদের আক্রমণ। বস্তুত সেন রাজাদের শাসনকাল বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতিকে পৌরাণিক সংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় দান করেছিল। হঠাৎ আক্রমণে বিপর্যাস্ত বাঙালী আত্মরক্ষার

জন্য নিজেকে বাইরের জীবন থেকে গুটিয়ে নিয়ে উত্তরভারত থেকে অর্জিত পৌরাণিক সংস্কারের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করলো।

পুরাণকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও স্মৃতি সংহিতা অবলম্বনে রচিত স্মার্ত্ত বিধি নিষেধের প্রাচীর দিয়ে বাঙালীকে ঘিরে রেখেছিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে "ভক্তিবাদের" উদ্ভব হয় যার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে রামানুজ, নিম্বার্ক মধব, ভাস্কর ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মতবাদে ও চর্য্যায়। দাক্ষিণাত্যের প্রচারকরা ভক্তিবাদকে কেবল জনপ্রিয় করে তোলেননি তাকে দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। ভক্তিবাদের প্রাবল্যের ঢেউ বাংলা দেশেও এসে পৌঁছয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব রচিত "গীতগোবিন্দ" ভাগবতীয় আখ্যানে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ভক্তির সংগে প্রেমলীলাকে তিনি যুক্ত করেন। ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিতত্ত্ব বাঙালীর মনে যে ধার্মিক অনুভূতি জাগিয়েছিল তা আরও দৃঢ় হলো পূর্ব্বভারতে ভক্তিমার্গের পথিক মাধবেন্দ্র পুরী দ্বারা ভাগবত কথা প্রচারে। সম্ভবত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মাধবেন্দ্র পুরী গৌড় বাংলায় সর্ব্বপ্রথম ভাগবত আদর্শ ও কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করেন। "চৈতন্য ভাগবত" ও "চৈতন্য চরিতামৃতে" মাধবেন্দ্র পুরীকেই বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রবক্তা বলা হয়েছে।[১১১] প্রাক-চৈতন্য যুগের মন্দির গাত্রে অঙ্কিত শিল্পকলার নিদর্শন, পোড়া মাটির কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্তি, নানা স্মৃতি-পুরাণে কৃষ্ণ-বিষ্ণু কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানের বিবরণের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাংলদেশে ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণ-লীলা বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্মৃতিকার শূলপাণি কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন -- "একাদশী বিবেক", "দোলযাত্রা বিবেক", "রামযাত্রা বিবেক" ইত্যাদি।[১১২] মাধবেন্দ্র পুরী ও তার শিষ্যবর্গ বাংলাদেশে গোপাল মূর্তির পূজাও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে ভাগবতে বর্ণিত "কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা" অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে, এই লীলায় কৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপ অপেক্ষা ঐশ্চর্য্যমিশ্রিত রূপই প্রধান।

মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে", বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে" ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাই বর্ণিত হয়েছে। এই কবিরা সকলেই অল্পবিস্তর ভাগবত পুরাণের "কৃষ্ণ লীলা" বিষয়ক স্কন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সে যাই হোক "কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা" গান, পাঁচালী ও কথকতার সাহায্যে বাঙালী মনে গেঁথে গিয়েছিল। চৈতন্যদেব দিবারাত্র বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন।

বৈষ্ণব মতের সাথে সাথে শাক্তমতও প্রাধান্য লাভ করেছিল। লক্ষণ সেনের

রাজ্যকালে বাঙালী স্মৃতিকার হলায়ুধ মিশ্র "ব্রাহ্মণ সর্ব্বাস্বে" চণ্ডী পূজার উল্লেখ করেছেন।[১১৩] অনুমান করা যায় যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক আগেই বাঙালী চণ্ডী ও দুর্গার উপাসনাও করতো। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা গণেশের রাজ্য কালে যে সব রজত মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে মুদ্রার একদিকে বাংলা অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় "দনুজমর্দন দেব" লেখা আছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে রাজা গণেশই দনুজমর্দন দেব উপাধি ধারণ করেছিলেন। যদুনাথ সরকারও এইমতকে সমর্থন করেন। মুদ্রার অপরদিকে লেখা আছে "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" যা স্বভাবতই প্রমাণ করে যে তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন।[১১৪] পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত " গৌরীমঙ্গল" কাব্যেও দেবী আরাধনার উল্লেখ আছে। জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গলে" দেখি জয়ানন্দ বৈষ্ণব হয়েও জনসাধারণের তুষ্টির জন্য শক্তি পূজোর কথাও লিখেছেন।[১১৫]

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেম ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করলেও সমাজের উচ্চস্তরে এই ভক্তি ধর্মের বিশেষ কোন প্রচার ছিল না। প্রাক-চৈতন্য যুগে বাংলাদেশে কৃষ্ণ ভক্তের অপ্রাচুর্য্য না থাকলেও তখনও কোন ধর্ম প্রণালী ও মতবাদ দানা বেঁধে ওঠেনি। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাঢ় দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতির একটা সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন বৃন্দাবন দাস তাঁর "চৈতন্য ভাগবতে"। সে সময় তান্ত্রিক উপাসকের সংখ্যা কম ছিল না। কবি এদের "পাষণ্ড" বলে উল্লেখ করেছেন। শক্তি পূজো মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হতো। মদ্য, মাংস দিয়ে যারা যক্ষ ও বাশুলীর পূজো করতো লোক সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ছিল। বিষহরি বা মনসা পূজোয় সাধারণ লোক বিশেষ অনুরক্ত ছিল এবং বৈষ্ণবদের উপহাস করতো।[১১৬] রাঢ় দেশের এই সামাজিক পরিবেশ আশপাশ অঞ্চলেও বিদ্যমান ছিল।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালী সংস্কৃতির আর একটা দিকও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নতুন আশ্রয় খুঁজছিল আর সেই আশ্রয় তারা খুঁজে পেল নবদ্বীপ-শান্তিপুরে। তাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শুরুতেই নবদ্বীপ-শান্তিপুরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের আনাগোনা শুরু হলো। নবদ্বীপের প্রাধান্য লাভের আগে বৌদ্ধদের বিক্রমশীলা ও ব্রাহ্মণদের মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাধান্য লাভ করেছিল।।[১১৭] কিন্তু বক্তিয়ার খলজীর আক্রমণে বিক্রমশীলা ধ্বংস হয়। মিথিলার গৌরবও অন্তর্হিত হয়। তুর্কী আক্রমণের ফলে সেন রাজারা যখন পূর্ব্ববঙ্গে চলে যান তখন তাঁদের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণও সেখানে আশ্রয় নেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ থেকে সেন রাজাদের আধিপত্য লুপ্ত হবার পর অনেক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চলে ফিরে আসতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের নিয়মিত শাস্ত্রচর্চার জন্য সমাজে তাঁরা খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন। নবদ্বীপ ধীরে ধীরে জ্ঞান গর্বস্ফীত অধ্যাপনার আবাস স্থলে পরিণত হলো। নব্যন্যায়ের কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হবার ফলে নানা দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা

জ্ঞান আহরণ করতে আসতো। নবদ্বীপে অধ্যয়ন না করলে বিদ্যার্থীরা পাঠ সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করতো না।[১১৮] অতএব নবদ্বীপ তখন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্য চর্চার এবং রক্ষারও প্রধান কেন্দ্র। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবিদ ও সমাজপতিদেরও নিবাস গড়ে উঠেছিল। সেই কারণেই বোধহয় শ্রীহট্ট থেকে চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র , চন্দ্রশেখর, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ নবদ্বীপে এসে বাস করছিলেন।[১১৯] আবার জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গলে" দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্রীহট্টে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যে কারণেও বহু লোক নদীয়াতে চলে আসে।[১২০]

চৈতন্য যুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস ছিল বৈচিত্রপূর্ণ। একদিকে পৌরাণিক আদর্শ ও জীবনধারা অর্থ্যাৎ স্মৃতি সংহিতার প্রভাবে উচ্চতর শিক্ষিত মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে।[১২১] অপরদিকে পুরাতন স্মৃতির অনুশাসন ছেড়ে নব্য স্মৃতির পরিকল্পনাও চলছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে শূলপাণি, শতাব্দীর চতুর্থভাগে শ্রীকর আচার্য্য ও শেষ ভাগে তার পুত্র শ্রীনাথ আচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নানা প্রকার স্মৃতি মীমাংসা অবলম্বনে বাঙালী সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। নবীন স্মার্ত্ত বুদ্ধিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নব অভ্যুদয়ের একটা প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল।[১২২] জনশ্রুতি আছে যে স্বয়ং চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে এই স্মার্ত্ত সিদ্ধান্তের পোষণ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য চেতনা নিঃসন্দেহে অধিকতর ব্যপক এবং বহুমুখী ছিল। কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খলার নামে স্মার্ত্ত নীতি নিয়মের অতি প্রয়োগের দ্বারা জীবনের স্বচ্ছ প্রকাশকে আড়ষ্ট করে তুলেছিল। স্মৃতি, শাস্ত্র, সামাজিক রীতি পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন এক ধরনের শ্রেণী ও জাতিবিভাগের বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু সবার অলক্ষে ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। প্রাক চৈতন্যযুগে অনেক বৈষ্ণব মূলত অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দার্শনিক ভক্তগণ অদ্বৈত পন্থা ও ভক্তি পন্থার মিলন ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে ভক্তিবাদ বন্যার স্রোতের মত প্রবলবেগে সমগ্র পূর্ব্বভারতকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। বাস্তবিক রূপে শ্রী চৈতন্যর আবির্ভাব এবং নব বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের সূচনা করে। চৈতন্যদেব যে ভক্তিবাদের ভাবতরঙ্গ তুলেছিলেন তা বাংলাদেশে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল।

চৈতন্য জীবন ধর্ম সর্বাবস্থায় ছিল শ্রেণী, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বন্ধনের অতীত। সর্ব্বজনীন প্রেম মিলনের আকাঙ্খায় সমৃদ্ধ। আ-দ্বিজ-চণ্ডালই শুধু নয় যবন পর্য্যন্ত সকল মানুষে

প্রেম বিতরণে এই সর্ব্বাত্মক মিলন বোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। "হরি ভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ -- এই বাণী সারা বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। শ্রী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় জাতপাতের বাধা মানতে নিষেধ করে গেছেন :-

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।"[১২৩]

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভক্তিতত্ত্বে এই প্রথম প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

স্বভাবতই স্মার্ত্ত পৌরাণিক শক্তির সঙ্গে চৈতন্য জীবন আচরণের প্রত্যক্ষ বিরোধের অবকাশ ঘটেছিল। প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ সমাজ বিশেষত স্মৃতি শাসিত ও তন্ত্রচারী ব্রাহ্মণগণ চৈতন্যদেবের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। বুদ্ধিজীবি নব্য ন্যায়পন্থী পন্ডিত সমাজ, আচারপন্থী স্মার্ত্তসমাজের কেউ কেউ এবং তান্ত্রিক শাক্তসমাজ প্রথম থেকেই চৈতন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।[১২৪]

শ্রী চৈতন্যদেব ইসলাম ধর্মের আশঙ্কা যতটা প্রকাশ করেননি, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন সমাজে ধর্মাচরণের নামে ব্যভিচার বিষয়ে, তাকে তিনি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন।

শ্রী চৈতন্যদেব আবেগমূলক প্রেমধর্ম সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের এ প্রেমবাদ মূলত বৈরাগ্যবাদ। তাঁর প্রেমতত্ত্বে পার্থিব বস্তুর কোন স্থান ছিল না। পার্থিবতা কেবল অবহেলিত নয় অস্বীকৃতও। তাই তাঁর নব বৈষ্ণবমত বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত আচারিক কিংবা তাত্ত্বিক ভাবে জনপ্রিয় হয়নি।

শ্রী চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম সমাজের নিম্নকোটিকে অনেকাংশে ধর্মান্তরিত হবার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। বলা যেতে পারে চৈতন্য আন্দোলনে ইসলামের প্রসার রুদ্ধ হয়েছিল। কেননা ইসলামের যে সব বৈশিষ্ট নিপীড়িত জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল তাদের সব গুলিই চৈতন্য মতবাদে গৃহীত হলো। মানুষে মানুষে সমতা, মিত্রতা, ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার - মানুষের স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের অধিকার, বর্ণভেদে, জাতিভেদে কিংবা সম্পদ ভেদে মানুষের মর্য্যাদার তারতম্যকে অস্বীকৃতি ইত্যাদি। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম ষোড়শ শতকেই একটা নতুন জীবনাদর্শের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

উচ্চবর্ণের মধ্যে যারা অর্থবান বা দরবারী কর্মচারী বা প্রতিপত্তিশালী তাঁরাও প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো না। তাই তাঁরাও ধীরে ধীরে

ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শ্রী চৈতন্য শুধু ধর্ম জগতের নয় বাঙালীর মনোজগতের দ্বারও খুলে দিয়েছিলেন। বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় করে দিয়েছিলেন।

শ্রী চৈতন্যর প্রভাব পরবর্তীকালে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর পার্ষদগণ বিশেষ করে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্য বৈষ্ণব আদর্শ প্রচারের দ্বারা এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৈষ্ণব দর্শন, স্মৃতি ও কাব্য রচনা করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে একটা সুদৃঢ় দার্শনিক প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে "বৌদ্ধ ধর্ম যখন হীনবল হয়ে পড়লো তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজ শাসনে হিন্দুধর্মে গৃহীত হলো না। জাতিভ্রষ্ট বা সমাজভ্রষ্ট নরনারী আগের কালে প্রবজ্যা গ্রহণ করে বৌদ্ধ সংঘে আশ্রয় নিতেন। লুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধ ধর্মের কারণে এইসব নিরুপায় নরনারী বাংলাদেশে বিশেষ করে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এবং ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে নেড়া-নেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও তার পুত্র বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) এই সব ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে উদ্ধার করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম মণ্ডলে স্থান পাওয়ার ফলে তারা বৈষ্ণব সহজিয়া নামে পরিচিত হয়েছে।"[১২৫]

চৈতন্য যুগেও শাক্তমত ও তন্ত্রাশিত ধর্ম প্রায় সমগ্র বাংলাদেশেই ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রাবল্যে শাক্তমত কিছুটা স্তিমিত হলেও বাংলাদেশ থেকে কখনও দূরীভূত হয়নি। বাংলাদেশে যে বহুকাল থেকে তন্ত্রের বিকাশ, বিবর্ত্তন ও জনপ্রিয়তা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সংগৃহীত প্রমাণ-পঞ্জী থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের তন্ত্র গ্রন্থগুলির রচনাকাল দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে।[১২৬] প্রাচীন তন্ত্রকার মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য্য সম্ভবত চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বাংলা অক্ষরে লেখা তাঁর "কাম্য যন্ত্রোদ্ধার" নামে পুঁথিটি ১৩৭৫ খ্রিঃ লেখা হয়েছে।[১২৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০০ খ্রিঃ যে সংস্কৃত পুঁথির তালিকা সঙ্কলন করেছিলেন তাতে অসংখ্য তন্ত্রের পুঁথির উল্লেখ আছে।[১২৮] ব্রাহ্মণ্য শৈব্য ও বৌদ্ধ উভয় মতই তন্ত্রের দ্বারা বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তন্ত্রের প্রভাবেই মহাযান মতে বজ্রসহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতের উদ্ভব হয়। আর তান্ত্রিকতার ফলে শাক্ত পূজা পদ্ধতি ও দেবীতত্ত্ব বাঙালীর মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল ।[১২৯] ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর শিষ্য পূর্ণানন্দ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করে তন্ত্র শাস্ত্রকে শাক্ত পরিবারে প্রচার করেছিলেন।[১৩০] মনে হয় এই শাক্ত সংস্কার বৌদ্ধ প্রাধান্য প্রশমিত হবার পরই বাঙালী সমাজে প্রচার লাভ করে। তবে এই তন্ত্রের সাধনা শাক্ত পন্থী হিন্দুসমাজে কখনও প্রকাশ্যে অধিকাংশ সময়ে গোপনে অনুশীলিত হতো। কিন্তু শ্রী চৈতন্যর আবির্ভাবের পরে বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমে ক্রমে বাঙালীর চিন্তাধারার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনলো। চৈতন্যদেবের এই ভাববিপ্লব অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। আহমদ শরীফ যথার্থই উক্তি করেছেন যে " চৈতন্য

প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবমত কোন অর্থেই ব্রাহ্মণ্য মতের নতুন রূপ নয়, তবুও যে অর্থে শঙ্করাচার্য্য, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ভক্তিবাদী সন্তরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজের রক্ষক সেই অর্থে চৈতন্যদেব বিপন্ন ব্রাহ্মণ সমাজের ত্রাণ কর্ত্তা।"[১৩১]

বিপরীত ধর্মী দুই সংস্কৃতির মোকাবিলায় বাঙালীর জীবন ও সাধনা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়নি তা স্বীকার্য্য নয়। জাতির অন্তর্জীবনে এই শাসনকালের প্রভাব অগোচরে বিস্তার লাভ করেছিল। তুর্কী শাসকদের প্রথমদিকের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অস্থিরতাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খলজী বংশীয় আমীর ওমরাহদের কলহ দ্বন্দে তা সুস্পষ্ট। কে সুলতান হবে তা নিয়ে প্রায়শই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কখনও দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে বাংলার শাসনকর্ত্তার সংঘর্ষ চলতো -- আবার কোন সময়ে বাংলার সুলতান দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নানারকম উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন বিশেষ করে হস্তী, মুদ্রা ইত্যাদি। আবার সুযোগ পেলেই বশ্যতাকে অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করছেন, বলতে গেলে এক ধরনের বিকেন্দ্রীকৃত সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অনুরূপ ছিল দেশের শাসন ব্যবস্থা।

একদিকে যেমন প্রায় যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষ ও ভূ-স্বামীদের মনে শান্তি ছিল না অপরদিকে ধর্মান্তীকরণের সন্ত্রাসনীতি বাঙালী জীবনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। ধর্মান্তীকরণের স্বপক্ষে রিচার্ড এম. ইটন. চারটি প্রচলিত মতবাদের উল্লেখ করেছেন। (১) অভিবাসন, (২) তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরিত, (৩) ধার্মিক পৃষ্ঠপোষকতা, (৪) সামাজিক মুক্তি।[১৩২] কিন্তু তিনি নিজেই এই চারটি মতবাদের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেননি। মহম্মদ শাহ নুরুর রহমানের বক্তব্য হলো যে রিচার্ড ইটন ধর্মান্তীকরণের প্রধান কারণ হিসাবে বলেছেন যে সুফী, গাজীরা চাষ আবাদের জন্য জমি বিতরণ করতেন এবং কৃষকরা উর্ব্বরা জমি পাবার আশায় পীর গাজীদের আখড়া ও দরগার সামনে ভীড় করতো এবং ক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। রিচার্ড ইটনের ব্যাখ্যাটি মহত্ত্বপূর্ণ হলেও কিছুটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।[১৩৩] বলপূর্ব্বক ধর্মান্তরের জন্য যে উৎপীড়ন হতো তার স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে বিদ্যাপতির "কীর্ত্তিলতায়"। কবি লিখেছেন ব্রাহ্মণ বটুক ধরে এসে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ, ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে, ধোয়া উড়নীতে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়, গোড়ে গোমটে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নাই।[১৩৪]

চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু পরেই হাবসী সুলতানদের শাসনকাল শুরু হয় (১৪৮৭ - ১৪৯৩) । ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত (১৫৬০) জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" কাব্যের নদীয়া খণ্ডে এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার বিবরণ আছে। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি নবদ্বীপ ও তার আশেপাশের অঞ্চলে মুসলিম সুলতানদের ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচারের উল্লেখ করেছেন:

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।[১৩৫]

ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রীতির সম্বন্ধটা সব কিছু ছাপিয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুও সুলতানের অনুগ্রহ লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন ভাগবতের" একটি পংক্তি উল্লেখনীয় :-

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার সেই কর্ম
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।।"[১৩৬]

আমীর ওমরাহদের শিথিল জীবন যাপনের কারণে শাসকবর্গ এ দেশের প্রজাদের কখনও সমদৃষ্টিতে দেখেননি। মুসলিম শাসকরা রাজকার্য্যের জন্য বাধ্য হয়ে হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় ও শাসনকার্য্যে দক্ষ কর্মচারীর সংস্পর্শে আসতেন। আর এই ভাবেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচয়ের পাদপীঠ গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব কিছু পরিমাণে হ্রাস পেতে লাগলো।

সুলতান-মহম্মদ-বিন-তোঘলকের রাজ্যকালে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য গৌড় বাংলাকে তিনটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল — লাখনৌতি, সপ্তগ্রাম ও সোনার গাঁও।[১৩৭] ১৩৩৯ খ্রিঃ এই সোনার গাঁওর স্বাধীন সুলতান ফকিরুদ্দিন মোবারক শাহ হর্ষ সেন নামে এক বৈদ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগনার জমিদারী দান করে ও রাজা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।[১৩৮]

১৩৪২ খ্রিঃ ইলিয়াস শাহ বাংলার সিংহাসনে বসার পর রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমির পরিবর্ত্তন হলো। দেশের রাজনৈতিক জীবনে এলো শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব। উড়িষ্যার গঙ্গরামরা দীর্ঘদিন ধরে রাঢ় বরেন্দ্রের মুসলিম শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ইলিয়াস শাহ তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন। এই যুদ্ধে বরেন্দ্রর হিন্দু সমাজ মামলুক সুলতানের বিরুদ্ধাচারণ করে স্বধর্মী উড়িষ্যা রাজকে সাহায্য করেন নি।[১৩৯]

বস্তুত ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস ভাগীরথীর ধারা ধরেই প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর রাঢ়ে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বাড়ে। রুকনুদ্দীন কায়কোয়াসের উত্তরাধিকারী শামসুদ্দীন ফিরোজশাহের (১৩০১-১৩২২) রাজ্যকালে ময়মনসিং ও শ্রীহট্টেও মুসলিম অধিকার বিস্তার লাভ করে।[১৪০] মুসলিম আধিপত্য

সর্ব্বক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য নয়, ইসলামের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। পীর, গাজী, দরবেশদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলাদেশে পীর, ফকির, মুরশিদ, গাজী প্রভৃতির আগমন হতে থাকে। শামসুদ্দীন ফিরোজশাহের উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর তাঁর পিতার জীবদ্দশায় ও পরে ১৩১০ থেকে ১৩২৮ পর্য্যন্ত দফায় দফায় লাখনৌতি ও সোনারগাঁওর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর সময়ে এদেশে মুসলিম ধর্ম-শাস্ত্রবিদ্‌রা সাদরে আমন্ত্রিত হতেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মেহমুদও সৈয়দ ও সুফীদের সাদরে স্থান দিতেন।

ধর্ম প্রচারের জন্য মধ্য এশিয়া থেকে আসা দরবেশরাও মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁরা ধর্মজগতের অধিবাসী হলেও প্রয়োজনে তরবারী ধারণ করে অবাধ্য ভূ-স্বামী বা জনসাধারণের উপর আক্রমণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। শাহ্‌জালাল দরবেশদের মধ্যে একজন যার নেতৃত্বে মুসলিম সেনা দরবেশ দলের সাহায্যে শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করেন।[১৪১]

সাধারণ মুসলিম সমাজ ও শাসকদের ওপর পীর ও ফকির সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। পাণ্ডুয়ার মখদুম গীর, শেখ নুরউদ্দীন নূর কুতুব আলম, ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী -- এরাঁ সকলেই অতিশয় প্রতাপান্বিত ছিলেন।[১৪২] কথিত আছে যে সুলতান নাসিরুদ্দীন মেহমুদ সৈদা নামে এক ফকিরকে এক গ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সৈদা যখন ক্ষমতাশালী হয়ে সুলতানের পুত্রকে হত্যা করে তখন সুলতানের আদেশে সৈদার শিরচ্ছেদ হয়।[১৪৩] ভূ-স্বামীদের ওপরে পীর ও গাজীদের উৎপীড়নের কাহিনী গানে লিপিবদ্ধ আছে। হামিজউদ্দীন নামে এক গাজী বীরভূমের বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। নিম্নকোটির জনসাধারণ পীর গাজীর প্রভাবে কখনও ভয়ে কখনও বা ভক্তিতে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। ১৪১৫ খ্রিঃ রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হবার পর একদিকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা অপরদিকে বাংলার পীর ফকির গাজীরা গণেশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলো। জৌনপুরের সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত হবার পর রাজা গণেশ সন্ধির শর্ত্তানুসারে অর্থদণ্ডের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কববার অঙ্গীকার করলেন।[১৪৪] গোলাম হুসেন সলিম "রিয়াজ-উস-সালাতিনে" রাজা গণেশকে মুসলিম বিদ্বেষী রূপে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু গণেশ কখনও মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি পীর, ফকির, গাজীদের অপ্রতিহত শক্তিকে কিঞ্চিত পরিমাণে খর্ব্ব করেছিলেন। সেই কারণে গোলাম হুসেন সলিম তাঁর চরিত্রকে ঐ ভাবে অঙ্কিত করেছিলেন। কিন্তু তারিখ-এ-ফেরিস্তায় রাজা গণেশের অনেক প্রশংসা আছে এবং তিনি যে মুসলমানদের অত্যন্ত সমাদর করতেন তার উল্লেখ আছে।[১৪৫]

স্বভাবতই শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বাংলার জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব ছিল তাই একের ওপর মুসলিম মানস সংস্কৃতিব প্রভাব পড়েছিল মন্থর গতিতে।

হুসেন শাহর শাসনকালে দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধটা পুরোপুরি প্রীতির সম্পর্কে পরিণত না হলেও প্রতিকূলতার তীব্রতা অনেকটা কমে এসেছিল। কিন্তু হুসেন শাহর সুবুদ্ধি রায়কে ধর্মচ্যুত করার ব্যাপারটাকে অনেকেই তার বৈরী মনোভাবের প্রকাশ বলে মনে করেন। এম আর তরফদারের মতে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সুলতান এই কাজটি করেছিলেন তাঁর বেগমের প্ররোচনায়।[১৪৬]

চৈতন্য জন্মের অব্যবহিত পরে গৌড়ে দুরাচার হাবসী শাসন শুরু হয়েছিল। হুসেন শাহ যখন হাবসী কুশাসন থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করলেন তখন তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সমাধান করলেন। ক্ষমতালোভী হাবসীরা হিন্দু জমিদার ও মুসলিম ওমরাহদের পর্যুদস্ত করে অপদার্থ ব্যক্তিদের অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করেছিল। হুসেন শাহ প্রথমেই পূর্ব্বতন ক্ষমতা বিচ্যুত হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় এবং ভূমিহীন ওমরাহদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।[১৪৭] চৈতন্য যুগের গোড়ার থেকে অর্থ্যাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতের পর্ব্ব শেষ না হলেও সমন্বয় যে শুরু হয়েছিল তা বোঝা যায় নবদ্বীপের কাজীর উক্তিতে। নগরকীর্ত্তনের দল যখন কাজীর বাড়ী চড়াও হয় তখন কাজী ঘরে পালিয়ে যান। তারপর ফিরে এসে বলেন ঃ

" নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।।"[১৪৮]

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমীকরণ কতখানি এগিয়েছিল। শুধু তাই নয় বৃন্দাবন দাস লিখেছেন স্থানীয় মুসলিমরাও কীর্ত্তনে যোগ দিতেন এবং তার আনন্দও উপভোগ করতেন।[১৪৯]

আগেই বলেছি যে হুসেন শাহর রাজ্যকালে প্রতিকুলতার তীব্রতা অনেক কমে এসেছিল বরং কিছু অনুকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতান ও সামন্তবর্গ এদেশেই বাস করতেন। বোধহয় অনেকেই বাংলা ভাষা শিখেছিলেন তা না হলে তারা বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা কি করে করেছিলেন? বাঙালী কবিরাও তাঁদের কাব্য রচনার ভূমিকাতে ঐ সব পৃষ্ঠপোষককারীদের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। রাজা গণেশের ছেলে যদু বা জালালউদ্দীন স্মৃতিকার বৃহস্পতিকে তাঁর বিভিন্ন রচনার জন্য "রায়মুকুট" উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৫০] তেমনি সুলতান বরবক শাহ "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচয়িতা মালাধর বসুকে "গুণরাজ খান" উপাধিতে সম্মানিত করেন।[১৫১] সমাজের উচ্চস্তরের হিন্দুরা সুলতানের দরবারে সম্মানিত পদ লাভ করে দেশীয় সমাজেও প্রতিপত্তি অর্জন

করেন। তাঁরা অনেকেই চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন। নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস সুলতান হুসেন শাহর চিকিৎসক ছিলেন। কেশব ছত্রী অঙ্গরক্ষক ও গোপীনাথ বসু মন্ত্রী ছিলেন।[১৫২]

শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত আচার্য্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রামকেলী প্রভৃতি নগরে যে বৈষ্ণব প্রেম ধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল তা সম্ভব হতো না যদি সুলতানের বিরোধিতা প্রবল হতো। সুলতান হুসেন শাহকেই গৌড় বাংলার কবিরা "জগৎ ভূষণ" ও "নৃপতি তিলক" বলে অভিহিত করেছেন। হুসেন শাহী বংশের শাসনকালেই নিত্যানন্দ কেবল ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম অঞ্চলে বণিকদের ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করে বেড়াননি নিম্নবর্গের জনসাধারণের মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেছিলেন।[১৫৩] দক্ষিণ রাঢ়ের বালাণ্ডা গ্রামের অধিবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে হুসেন শাহ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করে সুদূর চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর "নবী বংশ" কাব্যে লিখেছেন ঃ

"লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না নোঙরে।[১৫৪]

এই সমন্বয়ের ধারা পরবর্ত্তীকালে পরিলক্ষিত হয় বাউল সম্প্রদায়ে। নাথপন্থী ও বৌদ্ধসহজিয়া মতাবলম্বীরা যাদের কায়াসাধন ও দেহতাত্ত্বিক সাধনাই ছিল লক্ষ্য তারা এক সময়ে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কার ত্যাগ করতে না পেরে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও নিজেদের পুরনো প্রথায় সাধনা করে। তার ফলে হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাউল মতের উদ্ভব।[১৫৫]

ইরাণ থেকে আগত সুফী ধর্মবলম্বীরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার পর বাংলা দেশে এসে পৌছেছিল। ইবন বতুতার বর্ণনায় পাই যে বাংলাদেশে বহু সুফী বাস করতেন।[১৫৬] সুফী ধর্ম হচ্ছে প্রেমবাদ যে প্রেম আল্লাহর প্রতি প্রেম। সাধ্য আল্লাহ বটে কিন্তু এর মানবিকতাই প্রেম সাধনার প্রথম পাঠ। আহমদ শরীফের মতে "তুর্কী আফগান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার আগেও ইরাণী সুফী তত্ত্বের প্রভাবে ভারতে "ভক্তিবাদে"র উদ্ভব হয়"।[১৫৭] এ বিষয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন যে "রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোস কিছু হয়েছিল। ইহার পিছনে দরবেশ ফকিরদেরও প্রভাব ছিল এবং এই সুত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সুফি প্রভাবেব কিছু ছাপ পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"[১৫৮] কিন্তু প্রভাবটি পারস্পরিক। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে আগত সুফিদেব ওপর ভারতীয় যোগ ও বেদান্তের প্রভাব পড়তে থাকে। "ভারতীয় যোগচর্যা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা কিছু মুসলিম সুফীরা গ্রহণ করলেন

তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেওয়ার চেষ্টা হল তা অবশ্য কার্যত হয়, নামত। কেননা আরবী ফারসী পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত রইল এর ইসলামী রূপায়ন। যেমন নির্বাণ হলো ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা, হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোক কেন্দ্র।... ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়ম ও জপের রূপ নিল সুফির যিকর।"[১৫৯]

ভারতীয় সুফিমত একান্তভাবে আরব ইরাণী নয়। তার কারণ তুর্কী আগমনের আগে ও পরে ভারতবর্ষে যাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ধর্ম আচারিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে ধর্মাচারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ফলে মুসলিমরা তাদের চারপাশেই অবলম্বন খুঁজেছে। বেশীরভাগ মুসলিমরা এদেশেরই জনগণ বা তাদের বংশধর। ফলে ধর্ম, দর্শন, সংস্কার তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল, তার ওপর শিক্ষা প্রাপ্তি না হওয়াতে শরিয়তের সঙ্গে যোগ ছিল না। পীর, দরবেশ, আউলিয়া দ্বারা দীক্ষিত হবার দরুন মুসলিম সংস্কৃতি গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি, তার ফলে পীর পূজার প্রচলন হয়।[১৬০] আহমদ শরীফের মতে " ... এই পীরবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ-হিন্দুর গুরুবাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।[১৬১] সুফিমতের প্রাবল্যে সুফিতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখা গেছে সেখানেই তারা অংশগ্রহণ করেছে। এভাবে বৌদ্ধনাথ পন্থ, সহজিয়ার তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ত তন্ত্র, যোগ প্রভৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছে। তাই বাঙালী মরমীদের দর্শনে, ধর্মে ও আচারেও প্রচুর দেশীয় তথা ভারতীয় উপাদান রয়েছে।[১৬২] সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "... বাংলাদেশে ইসলামের সুফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। সুফিমতের ইসলামের সহিত বাংলার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নেই। সুফিমতের ইসলাম সহজেই বাংলার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।[১৬৩] এভাবেই বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনার মরমীদের উপমতগুলি সৃষ্ট হয়েছে। তাদের তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যমে হয়েছে ভারতীয় রূপকল্প -- আরাধ্যের প্রতীক হলেন রাধাকৃষ্ণ। নূর কুতুব আলমের বাংলা পদে রাধাকৃষ্ণ আছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলা যে সুফীতত্ত্ব প্রকটের যে দেশী রূপক সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা দেশে প্রেম পন্থী মুসলিম সাধকরা অল্পবিস্তর সুফী পন্থী।[১৬৪] সুফিমতে প্রেমই হলো ভগবানের পরম স্বরূপ। সুফি প্রেম ধর্ম ও চৈতন্য প্রেম ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করেছে তার প্রকাশ পাওয়া যায় বাংলা দেশের মুসলিম কবিদের রচনায়।[১৬৫] তাঁরা সেই সমন্বয়জাত প্রেম ধর্মের আদর্শের সঙ্গে অনেক জায়গায় মিলিয়ে নিয়েছেন। ফলে রাধার যে রাগ অনুরাগ, বিরহের আর্তি তা কবিদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে "পরম স্বরূপের" জন্য বিরহের আর্তিতেই প্রকাশ লাভ করেছে।

মুসলিম কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভনিতা লক্ষ্য করলেই এই কবিদের মূল ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৬] তাই সুফী গানে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা "পরম দয়িতের" জন্য চির বিরহ বোধের কান্না শুনতে পাই।

গুপ্ত যুগ থেকে বাঙালীর যে সংস্কৃতি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছিল তুর্কী আক্রমণের প্রভাবে তার বিশেষ রূপান্তর হয়নি। তার কারণ বাঙালীর মূল জীবনধারাকে অস্বীকার করে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি বা অনুষ্ঠিত হয় নি। নিঃসন্দেহে ইসলাম বাঙালী ধারার পোষকতা করেছে আর সেই ধারার সঙ্গে ইসলামের ধারাকে যুক্ত করতে মুসলিম সমাজবিদরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করেছেন। ফলে বাংলার মুসলমানরা আরববাদী মুসলিমদের ধারায় গড়ে ওঠেনি বাংলার লোকসমাজের ধারায় গড়ে উঠেছে। বাঙালী ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেই এই মিলন মিশ্রণ হয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস, খণ্ড - ১ম, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫২, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৬

২। রমেশচন্দ্র মজুমদার : হিস্ট্রী অফ এনসেন্ট বেঙ্গল, জি. ভরদ্বাজ এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২৩১

৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার : হিস্ট্রী অফ এনসেন্ট বেঙ্গল, জি. ভরদ্বাজ এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২৩১

৪। বখতিয়ার খলজীর নদীয়া আক্রমণের তারিখ নির্ণয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। সাম্প্রতিক কালে প্রোঃ এ. এইচ. দানী "ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলী" ১৯৫৪ এ আক্রমণের তারিখ নির্ণয় করেছেন ১২০৪ খ্রিঃ (পৃঃ ১৩৩ - ১৪৭)। কিন্তু প্রোঃ মহম্মদ মোহর আলির মতানুসারে আক্রমণের তারিখ ১২০৩ - ১২০৪ খ্রিঃ বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য "হিস্ট্রী অফ দ্য মুসলিমস অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১এ, ইমাম মহম্মদ ইবনে সৌদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, ১৯৮৫ পৃঃ ৫৪ - ৫৫ পাদটিকা।

৫। মীনহাজ-উস-সিরাজ : তবকাৎ-ই-নাসিরী (সম্পাদিত) নাসৌ লীজ, খাদিম হুসেন এবং আবদুল হাই খণ্ড ১ম বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৬৪, মূল পৃঃ ১৪০

৬। মীনহাজ-উস-সিরাজ : তবকাৎ-ই-নাসিরী (সম্পাদিত) নাসৌ লীজ, খাদিম হুসেন এবং আবদুল হাই খণ্ড ১ম বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৬৪, মূল পৃঃ ১৪৭

৭। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস খণ্ড ১ম, প্রথম সংস্করণ ১৩২৪ বি. এস, পুনর্মুদ্রন, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৭৬ - ২৭৮

৮। ঐ, খণ্ড ২য়, পৃঃ ২১

৯। মীনহাজ-উস-সিরাজ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫০

১০। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সম্পাদিত "হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষা -- বৌদ্ধগান ও দোঁহা", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯১৬

১১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৫৮

১২। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মার্জিত সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৯৮

১৩। রমেশ চন্দ্র মজুমদার "হিস্ট্রি অফ এনসেন্ট বেঙ্গল", কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৩৫২

১৪। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃপৃ ৭৪ -৭৭

১৫। নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, খণ্ড - ২, প্রথম প্রকাশন ১৩৫৬ পুনর্মুদ্রন ৩য় সংস্করণ, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৮০, পৃঃ ৬৯৪

১৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃত -- অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭

১৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত "বৃহদ্ধর্মপুরাণ" বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৯৭

১৮। পঞ্চানন তর্করত্ন · সম্পাদিত "ব্রহ্মকৈবর্ত্ত পুরাণ", কলিকাতা, ১৮২৭

১৯। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০

২০। মনমোহন চক্রবর্ত্তী : দ্য হিস্ট্রি অফ স্মৃতি ইন বেঙ্গল এন্ড মিথিলা জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল, ১৯১৫, এম. কে. বন্দোপাধ্যায় : স্মৃতি শাস্ত্রে বাঙালী, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ কলিকাতা, ১৩৫২, বি. এস.

২১। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮

২২। ঐ, পৃঃ ২৫৯

২৩। চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন (সম্পাদিত) বসন্তরঞ্জন রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,কলিকাতা, ১৩২৩, বি. এস.

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী : সম্পাদিত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা, ১৩৫৯, বি. এস.

২৫। মালাধর বসু : শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (সম্পাদিত) খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববদ্যালয়, ১৯৪৪

২৬। কৃত্তিবাস : রামায়ণ, সম্পাদিত, দীনেশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৯১৬

২৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "বাইশ কবির মনসা মঙ্গল বা বাইশা", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, ভূমিকা

২৮। বিজয় গুপ্ত : মনসা মঙ্গল সম্পাদিত বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য , ৩য় সংস্করণ, বাণীনিকেতন, বরিশাল

২৯। বিপ্রদাস : "মনসা বিজয়" সম্পাদিত সুকুমার সেন, বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৯৫৩

৩০। এস. কে. দে : আর্লি হিস্ট্রি অফ দ্য বৈষ্ণব ফেথ এন্ড মুভমেন্ট, প্রথম প্রকাশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬১ (ফার্মা কে এল) , পৃপৃ ঃ ৬৩ -৬৬, ৮৪, ৯৪

৩১। বৃন্দাবন দাস : শ্রী চৈতন্য ভাগবত, ৪র্থ সংস্করণ, প্রকাশক মৃনাল কান্তি ঘোষ, কলিকাতা, ৪৪০, গৌরাঙ্গ এরা

৩২। জয়ানন্দ : চৈতন্য মঙ্গল (সম্পাদিত) অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩০৭, বি. এস.

৩৩। **পরমেশ্বর দাস : "পান্ডব বিজয় কথা" সম্পাদিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় পান্ডব বিজয়ের নাম হয়েছে "কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত", ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত**

৩৪। শ্রীকর নন্দী : "অশ্বমেধ পর্ব্ব" (সম্পাদিত) বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩১২, বি. এস.

৩৫। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত খণ্ড ১ম, পৃঃ ২৭৩

৩৬। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত খণ্ড ১ম, পৃঃ ২৭৬

৩৭। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত খণ্ড ১ম, পৃঃ ২৭২

৩৮। মীনহাজ-উস-সিরাজ-আল-জুরজানি : তবকাৎ-ই-নাসিরী, প্রাগুক্ত

৩৯। জিয়াউদ্দীন বার্ণী : তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী মূল (সম্পাদিত) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৬২

৪০। ফেরিস্তা : তারিখ-ই-ফেরিস্তা, নওল কিশোর এডিশন লক্ষ্ণৌ, ১৮৬৪-৬৫, ইংরাজী অনুবাদ জন রিগস খণ্ড প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ - ১৯৬৬; কলিকাতা,১৯০৮, ১৯০৯ ও ১৯১০ পুনর্মুদ্রন কলিকাতা

৪১। শামসী সিরাজ আফিফ : তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী মূল (সম্পাদিত) মৌলভী ভিলায়েত হুসেন, বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৯০

৪২। গোলাম হুসেন সলিম : রিয়াজ-উস-সালাতিন, মূল (সম্পাদিত) মৌলভী আব্দুল হক আবিদ, বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৮৯০ - ৯১

৪৩। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত খণ্ড ১ম, পৃঃ ৩৫৯

৪৪। আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী, ইংরাজী অনুবাদ এইচ. এস. জ্যারেট পরিমার্জিত ও টীকা যোগ যদুনাথ সরকার, খণ্ড - ২, পুনর্মুদ্রিত এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ১৯৯০ পৃঃ ১৪১, ১৫৮ -১৫৯

৪৫। মমতাজুর রহমান তরফদার : হুসেন শাহী বেঙ্গল (১৪৯৩ -১৫৩৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮, পৃপৃ ঃ ১১৫ - ১১৬

৪৬। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত মূল, পৃঃ ১০৬

৪৭। জিয়াউদ্দীন বার্ণী প্রাগুক্ত

৪৮। ঐ, প্রাগুক্ত, মূল পৃ পৃঃ ৫৮৬ - ৫৯৬

৪৯। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : গৌড়ের ইতিহাস, খণ্ড - ২, মালদা, ১৯০৯, পৃঃ ৩৯

৫০। রিচার্ড এম. ইটন.: দ্য রাইজ অফ ইসলাম এন্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার (১২০৪ -১৭৬০), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, প্রথম ভারতীয় এডিশন, ১৯৯৪ (মূল প্রকাশকের ব্যবস্থায়) পৃঃ ১০৩

৫১। গোলাম হুসেন সলিম, মূল প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০

৫২। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯

৫৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃপৃঃ ৩২৪ - ৩২৭

৫৪। তরফদার, প্রাগুক্ত, ১০৪

৫৫। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০

৫৬। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫

৫৭। বল্লাল চরিত সম্পাদিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা-১, ১৯০৪

৫৮। সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রন ১৯৯১, পৃঃ ৫৬

৫৯। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত আদি ১২ /পৃ পৃঃ ১৩৭ - ১৩৮

৬০। শঙ্কর সেনগুপ্ত : বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়, প্রথম খণ্ড ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ২৬১

৬১। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত, খণ্ড প্রথম, পৃঃ ৩৬০, খণ্ড দ্বিতীয়, পৃঃ ৬৯৩

৬২। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০০

৬৩। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০

৬৪। শঙ্কর সেনগুপ্ত : প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭১

৬৫। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ পৃঃ ২৭৫ - ২৭৬

৬৬। অক্ষয় কুমার মৈত্র : সম্পাদিত "গৌড় লেখমালা", পৃ পৃঃ ৯১, ১০৪

৬৭। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭

৬৮। ঐ, পৃঃ ৩৩৪

৬৯। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ২১০

৭০। বিজয় গুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪

৭১। নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড) ভাগ ১, পার্ট - ১, কলিকাতা ১৩৩১, বি. এস. পৃ পৃঃ ১৯২ - ২০২

৭২। ঐ, পৃ পৃঃ ২০৫ - ২১০

৭৩। পঞ্চানন তর্করত্ন : বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ত্রয়োদশ অধ্যায়

৭৪। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯

৭৫। ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮

৭৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার : হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল, খণ্ড প্রথম, ১ম সংস্করণ, ১৯৪৩, পুনর্মুদ্রন বি. আর. পি. সি. ইন্ডিয়া লিমিটেড দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৫৮৬

৭৭। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন : এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড চতুর্থ, পৃঃ ২৪৩ এফ. এফ., অক্ষয়কুমার মিত্র — গৌড়লেখমালা, পৃ: ৯

৭৮। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪

৭৯। আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী, লক্ষ্ণৌ সংস্করণ, খণ্ড - ২, পৃঃ ৮২, ১১৩

৮০। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২১

৮১। শঙ্কর সেনগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০

৮২। তরফদার : প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬

৮৩। মুকুন্দরাম : "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" সম্পাদিত শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৫৩

৮৪। আনন্দ ভট্ট : "বল্লাল চরিত" সম্পাদিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯০৪
৮৫। মুকুন্দরাম . প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৪, পৃ পৃঃ ২৬৬ ২৭৩
৮৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার হিস্ট্রি অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল, পৃঃ ৪৭৮
৮৭। দুয়ার্তে বার্বোসা : দি বুক অফ দুয়ার্ত্তে বার্ব্বোসা, ১ খণ্ড, ইংরাজী অনুবাদ এম. এল. জেমস, হ্যাক লুয়েট সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯১৮ ও ১৯২১, পুনর্মুদ্রন নেন ডোলন লেচেনস্টাইন ক্রাক ১৯৭৬, পৃঃ ১৩৬ (২য় ভাগ)
৮৮। মীনহাজ-উফ-সিরাজ : প্রাগুক্ত, মূল পৃঃ ১৫৭
৮৯। বিপ্রদাস : প্রাগুক্ত, সুকুমার সেনের, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১৪
৯০। ঐ, কাণ্ডারাই যে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন তা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট
৯১। মুকুন্দরাম প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩
৯২। বার্ব্বোসা প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৮
৯৩। মীনহাজ উস সিরাজ প্রাগুক্ত, মূল পৃঃ ৪৮৬
৯৪। নীহার রঞ্জন রায় . প্রাগুক্ত খণ্ড প্রথম, পৃঃ ৩৩৬
৯৫। ঐ
৯৬। ঐ, খণ্ড দ্বিতীয়, পৃঃ ৭০৭
৯৭। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়"
৯৮। শশীভূষণ দাশগুপ্ত : অবস্কিয়র রিলিজিয়াস কাল্ট, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪৬, পুনর্মুদ্রন ১৯৬২, পৃঃ ৯১, কল্যাণী মল্লিক : নাথ গন্থ, কলিকাতা, পৃ পৃঃ ১৪ - ১৯
৯৯। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড - ৪, পৃঃ ২৪৩ এফ. এফ.
১০০। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভাগ ২য়, পৃঃ ১০০ এফ. এফ., গৌড়লেখ মালা, পৃঃ ৭০
১০১। গৌড়লেখ মালা, পৃঃ ১৪৭
১০২। নীহার রঞ্জন রায় : প্রাগুক্ত খণ্ড দ্বিতীয়, পৃঃ ৬৯১
১০৩। জীমূতবাহন : "কালবিবেক" (সংকলিত) প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিবলিওথিয়া ইণ্ডিকা সিরিজ, কলিকাতা, ১৯০৫
১০৪। জীমূতবাহন : "দায়ভাগ" সংকলিত ও অনুবাদিত এইচ. টি. কোলব্রুক, কলিকাতা, ১৮৬৮
১০৫। নীহার রঞ্জন রায় প্রাগুক্ত খণ্ড দ্বিতীয়, পৃঃ ৭১২; এন দাশগুপ্ত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম, কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃঃ ৫৯
১০৬। শশীভূষণ দাশগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯, এফ এফ.
১০৭। সুকুমার সেন মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, সংখ্যা - ৩৪, ১৯৬২, পৃঃ ৩৩
১০৮। সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্য একাডেমী দিল্লী, খণ্ড : ১ম, তৃতীয় সংস্করণ, অর্ব্বাচ

১০৯। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড - ১৪, পৃঃ ১৫৬
১১০। শামসুদ্দীন আহমদ : সম্পাদিত ও অনুবাদিত ইনসক্রিপসন অফ বেঙ্গল, খণ্ড - ৩, পৃঃ ১০৬ এফ. এফ., পৃপৃঃ ১১৮, ১৩২ এফ. এফ., এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড - ২৬, পৃঃ ১ এফ. এফ.
১১১। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত আদি ৯ / ১৮৯
১১২। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭
১১৩। সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, পৃঃ ৩৭
১১৪। যদুনাথ সরকাব (সম্পাদিত) "হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল", খণ্ড - ২, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ১৯৪৮. পুনর্মুদ্রন বি. আর. পি. সি. (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ১২১
১১৫। জয়ানন্দ : প্রাগুক্ত, বন্দনা
১১৬। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, আদি ২ / ১২ - ১৪
১১৭। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩
১১৮। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, আদি ১০ / ২০২
১১৯। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, আদি ২ / ৬৩
১২০। জয়ানন্দ : প্রাগুক্ত, নদীয়া খণ্ড :-

" শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল
ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল।।
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা।
নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা।।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে।।"

১২১। দীনেশ চন্দ্র সেন : চৈতন্য এন্ড হিজ এজ পৃ পৃঃ ১৬ - ১৮
১২২। মনমোহন চক্রবর্ত্তী, প্রাগুক্ত, পৃ পৃঃ ২৭৭ - ২৭৮
১২৩। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, আদি ১২ / ১৩৭ - ৩৮
১২৪। এস. কে. দে : প্রাগুক্ত, পৃ পৃঃ ৭৯ - ৮০
১২৫। দীনেশ চন্দ্র সেন : হিস্ট্রী অফ দ্য বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার, কলিকাতা, ১৯১১, পৃ পৃঃ ৫৬৬-৫৬৭
১২৬। শশীভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ পৃঃ ১১ - ১২
১২৭। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২য়, পৃঃ ৪২
১২৮। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২য়, পৃঃ ৪৪
১২৯। পি. সি. বাগচী : স্টাডিস ইন দ্য তন্ত্রস
১৩০। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২য়, পৃঃ ৪৩
১৩১। আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৪
১৩২। রিচার্ড এম. ইটন : দ্য রাইজ অফ ইসলাম এণ্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ পৃঃ ১১৩ - ১১৯
১৩৩। মহম্মদ শাহ নুরুর রহমান : হিন্দু এন্ড মুসলিম রিলেশন ইন মুঘল বেঙ্গল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০০১, পৃঃ ১২

১৩৪। সুকুমার সেন (অনুবাদ) মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
১৩৫। জয়ানন্দ : প্রাগুক্ত, নদীয়া খণ্ড, পৃঃ ১০৬
১৩৬। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, আদি ১৪ / ১৩২
১৩৭। জিয়াউদ্দীন বার্ণী : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬১
১৩৮। বজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭
১৩৯। যদুনাথ সবকার (সম্পাদিত) "হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল", খণ্ড - ২, পৃঃ ১০৪ - ১০৫
১৪০। কে. মজুমদার : ময়মনসিং-এর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯০৬
১৪১। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩
১৪২। অনিল চন্দ্র ব্যানার্জি : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১১০
১৪৩। যদুনাথ সবকার (সম্পাদিত) খণ্ড - ২য়, পৃঃ ১০২
১৪৪। গোলাম হুসেন সলিম : প্রাগুক্ত, মূল পৃ পৃঃ ১১০ -১১৩
১৪৫। ফেরিস্তা : তারিখ-ই-ফেরিস্তা, মূল নওল কিশোর প্রেস, পৃঃ ২৯৭
১৪৬। এম. আর. রহমান : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯
১৪৭। মোহর আলি : হিস্ট্রী অফ দ্য মুসলিমস ইন বেঙ্গল, খণ্ড ১এ, ইমাম মহম্মদ ইবনে সাউদ
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, ১৯, পৃঃ ১৯১
১৪৮। চৈতন্য ভাগবত, অন্ত ৫ / ৩৮১ - ৩৮৩
১৪৯। বৃন্দাবন দাস : আদি ১৭ / ৬৭
১৫০। সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
১৫১। যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত) খণ্ড - ২য়, পৃঃ ১৩৫
১৫২। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, পৃ পৃঃ ৮,৮২ (আদি) বিভিন্ন হিন্দু রাজকর্মচারী যারা হুসেন শাহের
অধীনে চাকরী করতো তাদের একটা সূচী পাওয়া যায় চৈতন্য ভাগবতে (মধ্য), ২০৫
(অন্ত) ৩১৬ ও ৩৫০, এবং চৈতন্য চরিতামৃতে পৃ পৃঃ ৭৬, ২৭৮, ২৯৮
১৫৩। বৃন্দাবন দাস : প্রাগুক্ত, (অন্ত) ৫ / ৩৮১ - ৩৮৩
১৫৪। আহমদ শবীফ দ্বাবা উদ্ধৃতি : বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৫৭
১৫৫। আহমদ শরীফ দ্বারা উদ্ধৃতি : বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২১১
১৫৬। যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত) খণ্ড - ২য়, (ইবন বতুতার বিবরণ) পৃঃ ১০২
১৫৭। আহমদ শরীফ : প্রাগুক্ত, খণ্ড - ২য়, পৃঃ ১৫১
১৫৮। সুকুমার সেন . বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ, পুর্ব্বার্দ্ধ
১৫৯। আহমদ শরীফ : প্রাগুক্ত, খণ্ড - ২য়, পৃঃ ১২০ - ১২১
১৬০। তরফদার : প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬
১৬১। আহমদ শরীফ : প্রাগুক্ত, খণ্ড - ২য়, পৃঃ ১৫৯
১৬২। এনামূল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ১৬৫ - ১৭৮
১৬৩। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ২৫ - ২৬
১৬৪। এনামূল হক : প্রাগুক্ত, পৃঃ
১৬৫। ওয়াই. এম. ভট্টাচার্য্য : বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুসা, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ পৃঃ ৩৮ - ৪২
১৬৬। ব্রজসুন্দর সান্যাল : মুসলমান বৈষ্ণব কবি, রাজসাহী, ১৯০৬, ভূমিকা

ইতিহাসের আদিবাসী এবং আদিবাসীর ইতিহাস ঃ সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা

শুচিব্রত সেন

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সমবেত সুধীবৃন্দ ঃ

আধুনিক ভারত বিভাগে সভাপতিত্বের আহ্বানের জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আজ বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা যে ব্যাপ্তি ও মান অর্জন করেছে তার সিংহভাগ কৃতিত্বের অধিকারী ইতিহাস সংসদ। আমরা যারা ষাটের দশকের প্রথম ভাগে মফঃস্বল বাংলা থেকে কোলকাতায় ইতিহাস পড়তে এসেছিলাম ইংরেজী ভাষার দাপটে প্রাথমিক ভাবে ইতিহাসের প্রতি ভালবাসাটাই তাদের উবে যেতে বসেছিল। সেই যুগে ব্যতিক্রমী মহান শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব মামুদ বাংলা ভাষায় ইতিহাস আলোচনা করে প্রথম আমাদের মধ্যে জাগিয়ে ছিলেন ইতিহাসকে ভালবাসার আকর্ষণ। এই সশ্রদ্ধ স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করছি আমার প্রবন্ধ পাঠ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় আদিবাসী প্রতিবাদী আন্দোলন ও তাদের সমাজ ও অর্থনীতির ইতিবৃত্ত তথ্য ও বিশ্লেষণে অধুনা এক সমৃদ্ধ অধ্যায়। অবজ্ঞা ও উপেক্ষার স্তর থেকে উঠে এসে এই জনজাতিরা লাভ করেছে স্বতন্ত্র চেতনার স্বীকৃতি। সময়ের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে এদের সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী। সভ্যতা বিকাশের পথে সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি অবশ্যই একই স্তরায়িত ছিল না। জীবনযাত্রা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা সমস্ত ক্ষেত্রেই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেই প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। কাজেই আদিবাসী মাত্রেই একই বন্ধনীভুক্ত সরলরৈখিক কাহিনী নয়। পূর্ব ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতালরা এক আদর্শ উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে; কেননা সার্বিক ভাবে এই গোষ্ঠী এক সমান্তরাল সভ্যতার প্রতিভূ, অথবা বলা যেতে পারে an equally valid way of life এর শরিক। আধুনিক যুগের সূচনা থেকে এদের সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য প্রচুর এবং বিশেষত ১৮৫৫ সাঁওতালি বিদ্রোহ এদের হাজির করেছে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে। ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসে অসভ্য বর্বর বর্ণিত সাঁওতালরা স্বাধীনত্তোর কালে নবতর বিশ্লেষণে পেয়েছে অন্য মাত্রা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাদের সম্পর্কিত অভিধায় ঘটেনি কোন পরিবর্তন।

সমাজের নীচের মহল বা অধুনা বহু ব্যবহৃত নিম্নবর্গে এদের অবস্থান সম্পর্কে কোন ইতিহাসকারের কোন দ্বিধা নেই।

জাতীয়তাবাদের অন্যতম উদগাতা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন হান্টারের Annals of Rural Bengal থেকে। এ তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি। ১৮৬৮ তে প্রকাশিত এই Annals এ আছে সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ, অথচ বঙ্কিমের আনন্দমঠ ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের উৎস খুঁজে পেল সন্ন্যাসী বিদ্রোহে এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে থাকল নীরব। এঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি যে অবহিত ছিলেন না তা নয়। হান্টারকে পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত করে তিনি অনার্য জাতি হিসাবে হো, মুণ্ডা, সাঁওতালদের চিহ্নিত করেন। বঙ্গদর্শণে প্রকাশিত বাঙ্গালীর উৎপত্তি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা সেই বাঙ্গালী। আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে।" (বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ ঃ শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রী সজনী কান্ত দাস ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ঃ আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃ-৩৪৬)। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে সাঁওতাল জাতির এই প্রান্তিক অবস্থানের কোন গুরুত্ব ছিল না। অধ্যাপক স্বপন বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ। দুই মলাটের মধ্যে তিনি সংগ্রহ করেছেন সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিবরণ। কোন কোন পত্রিকায় যখন তাদের অর্ধ-সভ্য, বর্বর এমন কি বন্য জন্তু হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে, হিন্দু পেট্রিয়ট বা মর্নিং ক্রনিকলের মত পত্রিকাগুলি তখন এই বিদ্রোহকে কিছুটা সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখেছিল, কিন্তু সামগ্রিক অবস্থানে এঁরা যে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর সে ব্যাপারে এদেরও কোন সন্দেহ ছিল না। ২,৮,১৮৫৫ তে হিন্দু পেট্রিয়ট লিখেছিল "Barbarians are incapable of conceiving a political purpose, and the movement of the Santhals is no exception to the general history of such irruptions. (সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ঃ স্বপন বসু ঃ কোলকাতা ঃ ২০০০ ঃ পঃ বঃ বাংলা একাদেমী,) অধ্যাপক বসুর লিখিত ভূমিকার সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায় যে সমকালের অস্থির পটভূমিতে বসে এর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রায় কাছাকাছি একই সময়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে বসে কার্ল মার্কস এই বিদ্রোহের মূল্যায়ণ করেছিলেন out break of the Santhals, a half Savage tribe হিসাবে। মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে পেশাদারী ঐতিহাসিকের কলমে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ নিঃসন্দেহে কালিকিংকর দত্তের The Santhal Insurrection. এই বিদ্রোহকে অভ্যুত্থান হিসাবে চিহ্নিত করে ঐতিহাসিক দত্ত এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু এটি যে মূলত সভ্যতার স্পর্শ বহির্ভূত একদল 'rude tribe' এর অভ্যুত্থান এ বিষয়ে তাঁর মনে

কোন সংশয় ছিল না। (K. K. Datta : The Santal Insurrection : University of Calcutta : 1940 : P 72) এই বই প্রকাশিত হওয়ার ৯ বৎসর বাদে রজনী পাম দত্ত তাঁর India Today গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে বর্ণনা করেছিলেন "as a primitive and spontaneous forms isolated act of revenge and violence হিসাবে। (সুমিত সরকার Marxian approach to history of Indian Nationalism : Cal : 1990 : P-9) এর পরেও আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে লেগে গেল আরও কয়েক বছর। ১৯৫০ এর পর থেকে এই ইতিহাস চর্চায় গবেষকরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলেন। আমরা পেলাম শশীভূষণ চৌধুরী, জগদীশ চন্দ্র ঝা, সুরেশ সিং এর মত প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে রণজিৎ গুহ মহাশয় ১৯৮৩ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর বই Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India। কৃষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে সূচিত হল এক বিতর্ক। নিম্নবর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীরাও। বৌদ্ধিক ঔজ্জ্বল্যে ও শাণিত ইংরাজীতে আদিবাসীরাও জাতে উঠলেন। ১৮৫৫ তে হিন্দু পেট্রিয়ট যা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল ১৯৮৩ তে তাকে স্বীকার করে নিয়ে এই ঐতিহাসিকরা আদিবাসী প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে থেকে খুঁজে আনলেন তাদের রাজনৈতিক চেতনার এক স্বকীয় অস্তিত্ব। সচেতন শ্রোতৃমণ্ডলী লক্ষ্য করবেন যে সাম্রাজ্যবাদী, জাতিয়তাবাদী এবং নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্তত একটি ক্ষেত্রে এক, আর তা হল সাঁওতাল আদিবাসীদের স্থান নীচের মহলেই, বিতর্কটা শুধু চেতনার রকমফের নিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আমরা খোঁজ রাখিনি এক আহত সাঁওতাল মানসিকতার যা কিনা অর্থনৈতিক শোষণ থেকে অনেক বেশি কার্যকর ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। কোন গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান কি বিচার্য শুধু তার অর্থনীতির নিরিখে? অথবা বিদ্রোহকালীন আচরণ কি তার সার্বিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন? প্রতিবাদের ইতিহাসের সঙ্গে প্রতিবাদহীনতার অসহায়তাকে না মেলালে সম্ভব নয় আদিবাসী মানসের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি।

এ প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আদিবাসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিষয়টিকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার দরকার আছে। সরকারী মহাফেজখানার তথ্যকে শুধুমাত্র উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করলেই আদিবাসীদের নিম্নবর্গীয় অবস্থান প্রমাণিত হয় না; আর এ জন্য আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় প্রধানত নৃতত্ত্বের দরবারে। নৃতত্ত্বীয় বিধান অনুসারে যে কোন জনগোষ্ঠীর ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে দুটি ধারণা বা concept কে কেন্দ্র করে, এর একটি সামাজিক, অন্যটি সাংস্কৃতিক। এ দুটিই তার আত্মপরিচয়ের শর্ত। যে জনগোষ্ঠী যত বেশী সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন তার আত্ম অহমিকা ততো বেশী তীব্র এবং স্ব-অস্তিত্বের বিশ্বাসে দৃঢ়। এই বিচারে যে কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর তুলনায়

সাঁওতাল জন সমাজ এক আদর্শ উদাহরণ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে বর্ণ হিন্দু পরিমণ্ডলের অনেক বাইরে সাঁওতালদের ছিল এক নিজস্ব সংস্কৃতি চেতনা, সেখানে কোন অংশে ছিল না আত্মগ্লানি, বরঞ্চ ছিল এক শ্লাঘা বোধ। অকারণ ছিল না এই শ্লাঘা বোধ। এক নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে এই সমতাপূর্ণ সমাজে ছিল না কোন জাতিভেদ, নারী স্বাধীনতা সুরক্ষিত এবং ভাষা, শিল্প ও সঙ্গীতে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। ভেষজ বিদ্যায় সাঁওতাল পারদর্শিতা এক স্বীকৃত সত্য আর যে পরিবেশ চেতনার ঢক্কা নিনাদে আজ চারদিক মুখরিত, সে চেতনা সাঁওতালদের মজ্জাগত। "কারাম বিনতি" অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষি, হস্তশিল্প সবেতেই বিরাজিত সাঁওতাল সভ্যতার স্বতন্ত্র অবদান। নীহার রঞ্জন রায় যাকে বলেছেন মানস সংস্কৃতি তার গঠনে ও রূপায়নে আদিবাসী প্রভাব স্বত্বেও বর্ণ হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক আত্মগর্বী সভ্যতা অপরিসীম উদ্ধত্যের সঙ্গে সাঁওতালদের চিহ্নিত করল অসভ্য ও জংলী নামে। সাঁওতাল সমাজের পক্ষে এই বিরুদ্ধ সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। আসলে সভ্যতা সম্পর্কীয় চেতনায় উভয়েরই ছিল যোজনব্যাপী দূরত্ব, তাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার নিরিখে এরা চিহ্নিত হলেন নিম্নবর্গ হিসাবে। পার্থ চ্যাটার্জীকে উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে হিন্দু শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন ব্রিটিশ প্রভাব মুক্ত থাকার জন্য তার inner domain বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গড়ে তুলেছিল এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সাঁওতালরাও তেমনি নিরক্ষর হওয়া স্বত্বেও স্ব-ঐতিহ্যস্থিত থেকে ব্রিটিশ এবং বর্ণ হিন্দু উভয় আধিপত্যবাদ থেকে তার সমাজ ও সংস্কৃতির জগতকে রেখেছিল মুক্ত। ইতিহাসের পাতায় বার বার দেখেছি সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছে নির্লজ্জ অমানুষতা, অথচ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ বিরোধী অসম যুদ্ধে শুধুমাত্র নৈতিকতার দায়ে সাঁওতালরা তীরের ফলায় বিষ ব্যবহার করে নি, যা বিস্মিত করেছিল সভ্য ইংরেজ লেখককে। বিবর্তনের ধারায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সভ্যতা গর্বিত প্রযুক্তির জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকলেও চিন্তার স্তরে, চেতনার স্তরে এবং মানসিকতার স্তরে মানবিক মূল্যবোধের ধারাবাহিকতার আধার হিসাবে অনায়াসেই গর্বিত হতে পারে।

বর্ণ হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলি যথা ডোম, হাঁড়ি, মুচি, মেথর ইত্যাদি যখন নিম্নবর্গ হিসাবে চিহ্নিত হন, তখন আপত্তির কোন কারণ নেই। চতুর্বর্ণাশ্রম যুগ যুগ ধরে তাদের জন্য যে স্থানটিকে নির্ধারিত করে রেখেছে এই নিম্নবর্গীয়রা সে স্থানটিকেই তাদের নিজস্ব জায়গা বলে মনে করে এসেছে। বর্ণাশ্রম প্রথার বাইরে সাঁওতাল সমাজ প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তাদের এই আরোপিত সামাজিক অবস্থানকে কখনই মন থেকে মেনে নেয় নি। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তাঁরা বলতেন "আবো দো হড় জাতি"। এছাড়াও তাঁদের চেতনায় বিরাজ করত "দেখু

খোনাং আবু গেবান সরেসা" অর্থাৎ আমরা হিন্দুদের চাইতে উঁচু জাতের মানুষ। হিন্দু সমাজের কোন নিম্নবর্গীয় মানুষ কল্পনাও করতে পারতেন না যে তারা ব্রাহ্মণদের চাইতে উঁচু স্থানের অধিকারী। প্রসঙ্গত স্মরণীয় প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বার্ণাড কোন এর যথার্থ উক্তি "অত্যাচারিত হয়েও উঁচু জাতের বিরুদ্ধে যে হাত তোলা সম্ভব ছিল না এর মূলেও রয়েছে বর্ণাশ্রম জনিত যুগ সঞ্চিত সংস্কার" (B. Cohn : Anthropologists among the Historians, P 565) আর এখানেই অন্যান্য নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গে সাঁওতাল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী যে সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ নিম্নবর্গীয় কৃষকচেতনা সম্পর্কে গ্রামশি বলছেন, "The peasant hates the civil servant, does not hate the state, for he does not understand it." (Prison Note Books) অথচ এ কথা আমরা সবাই জানি যে সাঁওতালরা ১৮৫৫ র বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বরূপ স্বঅভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাঁওতাল লেখকদের আলোচনা ও তাঁদের লিখিত পত্র পত্রিকাতেও ফুটে ওঠে নিম্নবর্গ হিসাবে তাদের অস্বীকৃতি। সাঁওতাল সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় তাই তাঁদের এই গভীর আত্ম-মর্যাদা আর সেই সাথে আহত মানসিকতার অসহায়তার দিকটি ভেবে দেখা উচিত।

এই আহত মানসিকতার খোঁজ পেতে গেলে আমাদের অনিবার্যভাবে দ্বারস্থ হতে হবে নৃতত্ত্বের। জনৈক নৃ-তাত্ত্বিকের মতে "...it is best to observe them by interacting with them intimately and over an extended period" (John Monaghan Peter Just : Social and cultural anthropology : A very short introduction-OUP, 2000; P-13) নৃ-তাত্ত্বিকের এই অভিমত সমর্থন পায় ইতিহাসকারের জবানীতেও এবং E. H. Carr ১৯৬৭ তেই জানান "History can not be written unless the historian can achieve some kind of contact with the mind of those about whom he is writing" (E. H. Carr : what is History : Penguin Books : 1967, P-24) আর ইতিহাস রচনায় মানসিকতার গুরুত্ব যে কতখানি সে কথা প্রতিধ্বনিত প্রখ্যাত ঐতিহাসির মার্ক ব্লখের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ, "Historical facts are in essence, psychological facts ... Even where the intrusion of these external factors seems most brutal, however, their action is weakened or intensified by man and his mind." (Marc Bloch : The Historians Craft : Manchester University Press : 1979 : P-194) এই বক্তব্যকেই আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্রঁদেল বলেন, "In every period, a certain view of the world, a collective mentality, dominates the whole mass of the society." (F. Braudel : A History of Civilisations: Penguin Books : USA. 1993; P-22) কাজেই আদিবাসী বা

সাঁওতালদের মন, মানসিকতা, যৌথ মনস্তত্ব এবং বিশ্ব শিক্ষার জ্ঞানার্জনে নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা হয় participant observation এক অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। এই participant observation থাকে না বলেই রাঢ় বঙ্গ বা গ্রামীণ জীবনের কৃষি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা হলেও জানা যায় না মেঘের বাত্, মুঠ, দাওন, পাই, আঁইড়ী, পাঁইড়ী, প্রভৃতি শব্দগুলির দ্যোতনাময় তাৎপর্য কৃষক জীবনে কতখানি নিবিড়। আমরা কজন জানি বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে খড়ের হিসাব এখনও রাখা হয় আঁটি, গণ্ডা, তাড়ি, পণ, কাহনের মাধ্যমে কিংবা আদিবাসী গাঁও বুড়াদের কথকথার উপস্থাপনার যে বিশেষ শৈলী এবং তার থেকে বেড়িয়ে আসে যে বিশেষ মেজাজ বা ঝোঁক তা কোন লিখিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, বা কোন মহাফেজখানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না তাদের এই দৃষ্টিকোণ। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে শতবর্ষাধিক প্রাচীন আদিবাসী বা সাঁওতাল জীবনের ক্ষেত্রে সমীক্ষাজাত পর্যবেক্ষণ জানা কি ভাবে সম্ভব? রণজিৎ গুহ মহাশয় তাঁর Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India গ্রন্থে জানাচ্ছেন "The information of some of these অর্থাৎ আদিবাসী প্রথা, লোক সঙ্গীত, উপকথা ইত্যাদি is not accessible to us either because it has not being recovered from the primary sources or because it is available only in a language not known to the author. (R. Guha : E. A. of P. Insurgency, OUP 1994 : P-13) বক্তব্যটি সর্বাংশে সত্য নয়, কেননা অধ্যাপক গুহ মিশনারীদের বর্ণিত বেশ কিছু লোককথার বিষয় উল্লেখ করেছেন। বস্তুত পক্ষে বহু ব্রিটিশ সরকারি অধিকর্তা ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা আদিবাসী মানস ও তাদের বিশ্ববিক্ষা সম্পর্কে যে বিবরণ সংগ্রহ করে গিয়েছেন তা কোন অংশেই অবহেলার বিষয় নয়। কোন সরকারি বা বেসরকারি বৃত্তি নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বসে এঁরা তথ্য সংগ্রহ করেননি। সেই সময়কার ভারতবর্ষের জলে জঙ্গলে পাহাড় ঘুরে আদিবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের ভাষা শিখে এরা খুঁজে এনেছিলেন তাদের প্রথা, সংস্কার, লোককথা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অসামান্য উপাদান। উদ্দেশ্য যাই হোক আদিবাসী ইতিহাস রচনার আকর হিসাবে এগুলির মূল্য প্রশ্নাতীত। কে অস্বীকার করবেন স্যার জন শোর থেকে শুরু করে বুকানন হ্যামিলটন, মন্টগোমারী মার্টিন, ই.জে, মান, আর্চার, বোদিং, বম্পাস, স্কেরফার্ড ও ম্যালি, রিসলে, হান্টন ডালটন প্রমুখদের ঐতিহাসিক অবদানকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এই বিবরণ আদিবাসী বা সাঁওতাল মানস বা তাদের বিশ্বাবিক্ষা পরিস্ফুট করে, আর এই বিশ্ববিক্ষা বা সাঁওতাল মানসে নিম্নবর্গ হিসাবে নিজেদের সামাজিক অবস্থানের কোন স্বীকৃতি নেই, বিপরীতে সব সময়ই তারা একটি অপর স্বতন্ত্র হিন্দু সমাজ বহির্ভূত অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এসেছে। বোদিং সাঁওতাল সংগ্রহ থেকে জানাচ্ছেন যে তারা মনে করত উঁচু জাতের ভিতরে থাকে জন্তুর আত্মা, এবং সুন্দর আত্মার নিবাস সাঁওতাল দেহে। আমি জানি না যে

বিদ্রোহের সময় এরা কি ভাবে এই জন্তু জাতীয়দের যুদ্ধ পদ্ধতি আত্মসাৎ বা appropriate করার কথা ভাবতে পারেন। বাঁকুড়ার সাঁওতালদের সম্পর্কে Culshaw র বিবরণে লক্ষ্য করবেন যে ব্রাহ্মণদের তৈরী রান্না সাঁওতাল রমণীরা গ্রহণ করতেন না, এবং যদি বা কোন সাঁওতাল পুরুষ হিন্দু গৃহে অন্ন গ্রহণ করত তাকে অন্ততপক্ষে সেই রাত্রে শয্যাগৃহের বাইরে থাকতে হতো। বর্ণ হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসার পর সাঁওতাল সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্গের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাদের আরও বেশী করে স্ব-সংস্কৃতিতে আস্থাশীল করে তুলেছিল। অন্যান্য অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মত এরা বর্ণ হিন্দু সমাজের জাতে ওঠায় ছিল না আগ্রহী। আর তার অন্যতম প্রমাণ বহু বিপর্যয় ও পরিবর্তনের মধ্যেও এদের গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র ও সংস্কৃতির মূল সুরটি আজও অব্যাহত। সাঁওতালদের নিজেদের জবানীতে অর্থাৎ আদিবাসীর ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের এক অতি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় কি উঠে আসে দেখা যেতে পারে ঃ প্রথমত কেন এই বিদ্রোহ

জানাম দিশম লাগিৎতো হো
দেলায়া পায়াবক তাবেন পে

জনমভূমির জন্য চল আমরা এগিয়ে যাই, আরও বলা হচ্ছে ঃ

স্ত্রী পুত্রের জন্য
জমি জায়গা বাস্তু ভিটার জন্য
হায় হায় ঃ এ মারা মারি, এ কাটাকাটি
গো মহিষ লাঙ্গল ধন সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব

আর একটি অনবদ্য সঙ্গীতে অধিকার বোধের সঙ্গে মিশে গেছে কাব্যিক সুষমা

মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে নি
মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে যাবে না
মাটি তাদের
যারা মাটির সন্তান হয়ে মাটিকে হাসায়
সিধু পাঠায় শালগিরা
কানু পাঠায় তীর
আমরা এসেছি আমাদের অধিকার রাখতে

আর এই অধিকারবোধে তারা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল তাদের শত্রুকে। স্মরণ করুন সেই বিখ্যাত গানটি

বণিক দস্যুরা
আমাদের ভূমি হরণ করেছে
সায়েবদের শাসন ভীষণ কষ্টদায়ক
আমরা যাব, কি আমরা থাকব?

বর্ণ হিন্দু কৃষক চেতনায় কিন্তু অত্যাচারী জমিদারদেরই প্রাথমিক শত্রু মনে করা হয়েছে, তার পিছনে ঔপনিবেশিক শক্তির ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক পথ। আর এখানেই বর্ণ হিন্দু নিম্নবর্গীয় কৃষক চেতনার সঙ্গে আমরা সাঁওতাল চেতনার একটা পার্থক্য লক্ষ্য করি, যার স্বীকৃতি অ-সাঁওতাল গ্রাম্য কবির লেখনীতেও প্রতিফলিত। লোকনাথ দত্তের বনবীর গাথা এরকমই এক কাব্য (১৩৩০, বঙ্গাব্দ)

প্রিয় জন্মভূমি, ঝাড়খণ্ড দেশ,
বিদেশী পীড়নে বিপন্ন আজ চল্ চল্ সবে রণ সাজে সাজি
স্বদেশ উদ্ধারে জীবন দিই
জানে তারা ইংরাজের একছত্র প্রভু-শক্তি
কিন্তু জানে সাঁওতালের, আত্মভোলা দেশভক্তি
লক্ষণে বুঝিল শেষে, সাঁওতাল নেতৃগণ রাজপদে আবেদন,
বৃথা অরণ্যে রোদন,
ক্ষোভে পঞ্চায়েতে মিলি, কৈল তারা শেষ যুক্তি
সাঁওতালেরি নিজ হস্তে, সাঁওতালেরি ক্লেশমুক্তি।

এ কথা ঠিক যে দরিদ্র জনগণের একটা অংশের সমর্থন তারা পেয়েছিল, কিন্তু সেই সমর্থনের উপর ভরসা করে তারা বিদ্রোহ করেনি। বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সংগঠন সর্ববিষয়েই সাঁওতাল একাধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। আরেকটা লোক সংগীতে এ কথাই বিধৃত ঃ

আমরা নিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
দেশের মাঝি ও পরাগনাইত রা
গ্রামের মোড়লরা
আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে,

কেউ পাশে দাঁড়াবে না,

তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব

এই অসাধারণ আত্মবিশ্বাস তাদের কে দিল? দিল এক মতাদর্শ যাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে শুভো ঠাকুরের নির্দেশ। যুগে যুগে বিদ্রোহের প্রয়োজনে ঈশ্বরের নির্দেশকে কাজে লাগান হয়েছে। গীতার এই বক্তব্য·

যদা যদা হি ধর্মস্য

গ্লানির্ভবতি ভারত

অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম

পরিত্রাণায় সাধুনাং

বিনাশায় চ দুস্কৃতাম

ধর্মসংস্থাপনার্থায়

সম্ভবামী যুগে যুগে

কিংবা যোয়ান অব আর্ক দেশরক্ষার আদেশ পান ঈশ্বরের কাছে। কাজেই বিদ্রোহে ধর্মভাব শুধু তথাকথিত নিম্নবর্গের একচেটিয়া নয়, আর আমাদের এই বক্তব্যের জন্য রণজিৎ গুহ পর্যন্ত অপেক্ষার দরকার নেই, তার অনেক আগে Frantz Fanon এর The Wretched of the Earth এর ভূমিকায় জাঁ পল সাঁত্রে মন্তব্য করেছিলেন (১৯৬১) "Under the amused eye of the settlers, they will take the greatest precautions against their own kind by setting up supernatural barriers, at times reviving old and terrible myths." আর তাই উপনিবেশবাদ বিরোধী আদিবাসী বিদ্রোহে ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় হতাশা আর অবজ্ঞার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত এক অস্ত্র। ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবেন এটি বাস্তবে কার্যকরী না হওয়া স্বত্বেও সাঁওতালরা হতোদ্যম হয়নি। ব্যাপক বিপর্যয় স্বত্বেও তারা আত্মসমর্পণ করেননি। সেখানে ধর্মভাবের উপরেও স্থান পেয়েছিল আত্ম-মর্যাদা রক্ষার লড়াই। আর তাই বিদ্রোহ শেষে হাজতে যাওয়ার পথে সাঁওতাল বন্দী বলে ওঠেন

কার আদেশ বেজে উঠল?

কার শক্তিতে রূপ সিং তাম্বলীকে তুমি কাটলে

সিধুর আদেশে মাগো

কানহুর শক্তিতে রূপসিং তাম্বলীকে

আমি কেটেছি।

তোমার হাতে হাতকড়ি বাজল

পায়ে তোমার লোহার বেড়ি,
তুমি চলেছ এখন সিউড়ি হাজতে।
আমার হাতে বাঁশি মাগো
পায়ে যেন নূপুর,
আমি যেন দেখতে চলেছি সিউড়ি মেলা।

বিদ্রোহের লক্ষ্য সম্পর্কেও সাঁওতাল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। ইংরাজ রাজত্বের অবসানে সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠা। এটি কোন কল্পিত অলীক রাষ্ট্র নয়। অতীতে বাস্তবে অবস্থিত এক রাষ্ট্রের চেতনা শুধু আদিবাসী মানসেই খুঁজে পাওয়া যায় এবং এক বিকল্প রাষ্ট্রের ধারণা থেকেই তাই প্রচেষ্টা ছিল সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠার, যেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে তার আত্ম-পরিচয়ের সঠিক ঠিকানা।

কাজেই কি নির্বাক জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতিতে কি সশস্ত্র সরব বিদ্রোহে নিম্নবর্গ অভিধার বিরুদ্ধে জায়মান সাঁওতাল প্রতিবাদ। পরিশেষে বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিবেদন সাহিত্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা তো এক স্বীকৃত সত্য। ঐতিহাসিকের কি বর্তায় এই দায়বদ্ধতা? যদি বর্তায় তাহলে প্রশ্ন কৃষক জীবন বা আদিবাসী রচনায় যে পণ্ডিতী ও বৌদ্ধিক স্বীকৃতি ঐতিহাসিক লাভ করেন তার নির্যাস কতটুকু ফিরে যায় আদিবাসী জীবনে? এই সমস্ত ঋদ্ধ গবেষণায় কতটা আলোকিত তাদের মানস? কৃষক বা আদিবাসী ইতিহাস যদি শুধুই সীমাবদ্ধ থাকে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর সন্নিকট বৃত্তে তাহলে শেষবিচারে সমাজ পরিবর্তনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে এই জ্ঞানচর্চার মূল্যায়ণ হবে কোন মাপকাঠিতে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ইতিহাসের পদ্ধতি — কিছু প্রশ্ন

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আজকে 'ভারত-বহির্ভূত ইতিহাস' বিভাগের আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের প্রথমে চিন্তা করা প্রয়োজন এই ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝব। এটা সার্বিকভাবে জরুরী বলে আমি মনে করছি, কারণ ইতিহাসের লেখা পড়তে গেলে প্রথমেই হোঁচট খেতে হয়, কারণ কিছু ক্রমানুবর্তিক বিবরণ ছাড়া তাতে আর যা থাকে, তা হ'ল ইতিহাস লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। যার অনেকটাই বিশ্বাস বা অজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে আর একটু ভাবতে আমি অনুরোধ করব ইতিহাসবেত্তা বন্ধুদের। কিছু ঘটনা সময়ের পরম্পরায় ঘটলেই তাদের মধ্যে কারণগত সম্পর্ক বা Causality প্রতিষ্ঠা করা যায় না, অন্য অনেক কিছু বিষয় সেক্ষেত্রে মূল্যবান হতে পারে। এই সত্যটি ভুলে গিয়ে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে বড় ধরনের ভ্রান্তি তৈরী হচ্ছে, তার অর্থ সম্যকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ক্যালেন্ডারে যে সময় লিপিবদ্ধ হয়, সেটি সময়ের পরিমাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি প্রতি ২৪ ঘন্টার পরিবর্তে প্রতি ৭২০ ঘন্টায় একটি দিনের হিসেব হত, তাহলে এখন একমাসে যা যা হয়েছে, তা সবই একদিনে হয়েছে বলে রেকর্ড বইতে ঢুকবে তথ্য হিসাবে। সেরূপ একটি শতাব্দী বা যুগের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অথচ বড় ঘটনা থেকে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বা কালবিন্যাস লক্ষ্য করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তের ঘটনার পরম্পরা সাজিয়ে দেখলে সেই উপলব্ধি না-ও হতে পারে। তার কারণ হ'ল প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অন্তঃসলিলা হিসাবে কাজ করে, চোখে পড়ে একটা Structural break যা নদীর ভাঙ্গনের মত একটি নূতন দিশার সূচনা করে। ইতিহাসের শিক্ষা বা laws of motion of history খুঁজতে গেলে এই epochic vision-র প্রয়োজন অন্যথায় হারিয়ে যাবে ইতিহাসবোধের মূল্যবান দিকগুলি শুধু তথ্যের জঙ্গলে। Microhistory করতে হলে যে জিনিষগুলি প্রয়োজন, যেভাবে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ থেকে Generelise করা সোজা প্রবণতা বাড়ছে, সেটি বন্ধ করা। সত্যিকারে ঐতিহাসিক গবেষণা সেটিকে সমৃদ্ধ করে না। অবশ্যই সময়ক্রম দেখতে হবে, কিন্তু সময়ক্রম ধরে কিছু অসম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ পেশ করলেই ইতিহাস চর্চা হয় না।

প্রশ্ন হ'ল, সংগঠিত সময়ক্রম ধরে যদি তথ্য সাজানো যায়, তাহলে ইতিহাসের

কতটুকু প্রয়োজন সাধিত হয়? সবটা না হ'লেও কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়, যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এই সাজানো তথ্যগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনার ধারার মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে পরীক্ষা করা যায় অথবা missing period সম্বন্ধে causality test -এর মাধ্যমে অনুমানগুলোকে যাচাই করে নেওয়া যায়। আধুনিককালে এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে cleometry নামের একটি উপধারার প্রবর্তন হয়েছে এবং তার মাধ্যমে বহু অপরিক্ষিত তথ্যের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ফলে নূতন ধরনের ইতিহাসচর্চার রূপরেখা অঙ্কন করা গেছে। এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের একটি পরোক্ষ ফল — এখন ইতিহাসের গবেষণার নব্যধারার মধ্যে এটি ব্যাপ্তি পেয়েছে। একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে শুধু পরিমাণযোগ্য তথ্যের বাইরেও অনেক Qualitative variable থাকে যাদের উপেক্ষা করা অনুচিত। এই দুই ধরনের variable -র মেলবন্ধন ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসের মাধ্যমেই ইতিহাসের নিহিত সত্যের উন্মোচন করা সম্ভব, যেটা শুধু একপেশে ভাবনার ফলে রূপায়িত হতে পারে না।

ইতিহাসের আমোঘ নিয়ম বা সত্য উন্মেষের তাগিদে time series পদ্ধতির ব্যবহার থেকে কিছু প্রবণতা বের করা যায় বা error correction mechanism -র মাধ্যমে অন্ধকারে হাতড়ানিটি অনেকটা বিন্যস্তভাবে করা যায়। সমস্যা হ'ল যে এই অতীত অন্ধকারে বিচরণ শুধু একটি পথের মাধ্যমে করলেই হয় না, একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের বিবর্তন ও পরিক্রমণ এতে এসে পড়ে। কাজের সুবিধার জন্য আমরা কিছু সূচক বেছে নিই, কিন্তু তাতে অন্যবিধ variable -র প্রভাব গৌণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয় না। এই পারস্পরিক প্রভাব আবার সরলরেখার পথ সব সময় নেয় না — অনেক সময় structural break বা non-liveanity দেখা যায়, যাকে epoch হিসাবে differentiate করা হয়ে থাকে। সব সময় অবশ্য বৈজ্ঞানিক উপায়কে অবলম্বন করে এই তফাৎ করা হয় না, প্রায়ই ad hocism বা চিন্তার স্বৈরাচার scientific method কে ছাপিয়ে যায়। এ বিষয়ে মননশীল ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যে ইতিহাস রচনায় আমরা ব্রতী হই না কেন, অতিরিক্ত সরলীকরণ বা অন্ধ বিশ্বাসের বিষয়ে সর্তক থাকা প্রয়োজন। গবেষণার বিভিন্ন স্তরে এ ধরনের প্রবণতা হয়ত মাঝে মাঝে দেখা দেবে, কিন্তু এর থেকে উত্তরণের মাধ্যমেই আমরা খুঁজে পাব ইতিহাসের সত্যকে।

ইতিহাসের প্রবণতা বা ধারাকে খুঁজে বের করার জন্য time series পদ্ধতির প্রয়োগ বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। যেক্ষেত্রে তথ্যের ধারাবাহিকতা নেই বা যেসব তথ্য হারিয়ে গেছে, অথবা error correction mechanism -এর মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে, যদিও সেই অনুমান সঠিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে।

সাহিত্য, সংস্কৃতি বা ভাবধারার অনুরণন সব সময় পরিমাপের বেষ্টনীতে ধরা পড়ে না। যদি একই সঙ্গে বহু ঘটনা ঘটতে থাকে, তবে তাদের প্রভাব পরস্পরের থেকে আলাদা করা হয়ত সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে কুশলতা বাড়ছে, সুতরাং ইতিহাস রচনায় কেবল রচয়িতার কি মনে হয়, তার ওপর নির্ভর করা সমীচীন হবে না। কিছু আপাত বিচ্ছিন্ন অথচ প্রায় সমসাময়িক ঘটনার টানাপোড়েনে ইতিহাসের ক্রম এবং সভ্যতার গতি কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে বা কি হতে পারত, সেটি খুঁজে বের করাই ইতিহাসের গবেষকদের মুখ্য কাজ বলে মনে করি। আশা করব, আগামী দুই দিনের আলোচনা থেকে আমরা সেই অভিজ্ঞানের সন্ধান পেয়ে যাব।

সিন্ধু সভ্যতার বিজ্ঞান ও কারিগরী উৎকর্ষতা

রূপক ঘোষাল

সিন্ধু সভ্যতার প্রত্যুষ বা সায়াহ্ন সম্পর্কে এই সভ্যতা নিজেই নীরব। এখানেও জানা যায়নি যে সিন্ধুলিপি কোন্ মূল ভাষা থেকে এসেছে।[১] সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতাগুলিতে এত উন্নত পরিপূর্ণ নাগরিক আচার সম্বলিত অত্যাধুনিক নগরীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।[২]

বহু পন্ডিতের গবেষণালব্ধ কাজকর্ম এই সভ্যতার বহু নতুন দিক তুলে ধরেছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো সিন্ধু-সভ্যতার বিজ্ঞান এবং এর উৎকর্ষতা। মূলত সিন্ধু ও ঘর্গর নদী উপত্যকায়, যে গ্রামীণ গোষ্ঠীর উদয়, তারাই বিস্ময়কর এই উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল।[৩]

এখন মূল আলোচনায় প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। সিন্ধু সভ্যতার বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে স্টুয়ার্ট পিগট বলেছিলেন যে সিন্ধুর বিশালতা ছিল, কিন্তু সে ছিল একা। এর সঙ্গে তৎকালীন সুমের বা মিশরের প্রযুক্তিগত কোন মিলই ছিল না এবং সিন্ধু-প্রযুক্তি ছিল আদিম এবং মধ্য-আমেরিকা বা প্রাক্-কলম্বীয় সভ্যতার সঙ্গে এর নাকি মিল পাওয়া গেছে।[৪] পিগটের ধারণা ভ্রান্ত।

সিন্ধু-প্রযুক্তি ও শৈল্পীক উৎকর্ষতার বিষয়ে আমরা প্রথমেই দেখবো কার্নেলিয়[৫] পুঁতির কর্তন, খোদাই, মসৃণতা, ধাতুশঙ্কব, বিশেষত ব্রোঞ্জ তৈরী, বিলুপ্ত মোম ঢালাই এর ব্যবহার, ধাতুর প্রাচুর্য্য, চৌকো সীলমোহরের উৎকর্ষ খোদাই, উচ্চ মানের মৃৎপাত্র নির্মাণ, পাথরের পাত্রাদি নির্মাণ এইসব কিছুর ব্যাপারে সেই সভ্যতার মানুষের পারদর্শিতা।[৬] হরপ্পার যন্ত্রবাদীদের সূক্ষ্ম ও উন্নত কলাকৌশল লক্ষণীয়। বিষয়টি মহেঞ্জোদাড়োর নগর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। ব্যাপক হারে কূপের উপস্থিতি এই সভ্যতার জলের গুরুত্বের দ্যোতক। বৃহৎ স্নানাগারের প্রযুক্তি ও স্থাপত্যকৌশলগত সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

আসকো পারপোলার মতে বৃহৎ স্নানাগারটি ব্যবহৃত হতো ধর্মীয় কাজে। পোড়া ইঁটে নির্মিত এই স্নানাগারের মধ্যেকার পুকুরটির জলনিরোধের জন্য এর মেঝে ও দেওয়ালে বিটুমেনের আস্তর ব্যবহৃত হয়েছিল।[৭] জল বেরোবার জন্য ভূগর্ভস্থ প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল।[৮] হরপ্পার শস্যাগারের অবস্থান নদীর তীরে হওয়ায় মনে হয় নদী পরিবহনের

সুবিধাকে তারা কাজে লাগাতো। শস্য রাখার জন্য এর পাশেই ছিল পোড়া ইঁটে বাঁধানো মঞ্চ।[৯] বাসগৃহগুলি বাসিন্দাদের আরামের দিকে তাকিয়ে তৈরী করা হতো। প্রতি বাড়ীতে বাঁধানো ইঁটের স্নানাগার ছিল। নলের মাধ্যমে বাড়ীর বর্জ্য জল রাস্তার ঢাকা নর্দমায় পড়তো। হরপ্পার জল-প্রযুক্তি বর্তমান প্রাচ্যের বহু উন্নত নগরীর তুলনায় অনেক উন্নত ছিল।[১০] পোসেলের মতে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত নগরীর সঙ্গে হরপ্পার উন্নতি তুলনীয়। নগর নির্মাণে ব্যবহৃত প্রতিটি ইঁটের আকার ছিল নির্দিষ্ট। ওজনের জন্য পাথরের ঘনকগুলি ছিল উচ্চমানের। ধাতু ও পাথরের ব্যবহার এবং মৃৎশিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তামার সঙ্গে টিন বা আর্সেনিক মিশিয়ে মিশ্রধাতু তৈরী হতো এবং সেই সময়ের ব্রোঞ্জের তৈরী নানান পাত্র, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।[১১]

সিন্ধু-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার বিষয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গবেষণার অবকাশ থাকলেও প্রাপ্ত তথ্যাদি আমাদের হরপ্পার অগ্নি-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার বিষয়ে চমৎকৃত করে। শিল্পকর্ম, যেমন পাথরের বালা তৈরীতে যে অত্যল্প শ্রমিক ব্যবহৃত হতো এবং এই শিল্পের পেছনে যে পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ফুটে ওঠে, তা থেকে সিন্ধুবাসীর রসায়নে বুৎপত্তির কথা জানা যায়।[১২] এই প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের উন্নত চিন্তা প্রণালীরই স্বাক্ষর বহন করে। খনিজের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বোঝাতে এম. ভিদেল ও এইচ. মিলার ''সিন্ধু প্রযুক্তির ঔৎকর্ষ'' এই প্রবচনটি ব্যবহার করেছেন।[১৩] এই প্রযুক্তি অগ্নি-প্রযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, পরিশ্রুতকরণ, ছিদ্রকরণ, মার্জন, ও এর উজ্জ্বলতাদান এবং নগর পরিকল্পনা, গভীর সমুদ্রে নৌ-অভিযান, জাহাজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, এইগুলির মধ্যে আমরা সেই সভ্যতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উৎকর্ষতা খুঁজে পাই। ধাতু বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। মিশ্রধাতু, পরিবর্তনশীল বা অনুঘটকের তফাৎ তারা জানতো। এই জ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লালিত হতো।

চূনের সঙ্গে জল আর বালি মেশালে যে মিশ্রণ তৈরী হয়, তা ইঁট ও পাথরকে পরস্পর ধরে রাখার ক্ষেত্রে ভীষণ উপযোগী। মহেঞ্জোদাড়োতে এই মিশ্রণটিই নির্মাণের ক্ষেত্রে আস্তর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৪] লোথালের পুঁতির কারখানার চুল্লির ভেতর থেকে কলিচুন পাওয়া গেছে।[১৫] স্টেয়াটাইট নিরুপণের ক্ষেত্রেও কলিচূনের ব্যবহার ছিল।

মেহেরগড়ের প্রথমদিককার মৃৎপাত্র হাতে তৈরী হতো। দুইভাগ জোড়া পাত্রগুলি ছিল চমৎকার।[১৬] ঝুড়ির আকৃতির পাত্রও পাওয়া গেছে। ঝুড়ির ভেতর মাটির প্রলেপ সহ চুল্লিতে প্রবেশ করানো হতো। ডি. কে. অঞ্চলে পাত্র নির্মাণের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বহু চুল্লির নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এখান থেকে পাত্রের অনেক ভাঙা অংশ পাওয়া

গেছে। প্রচুর পাত্র একসঙ্গে পোড়ানোর জন্যই চুল্লির ব্যবহার হতো। সাধারণত হরপ্পার মৃৎপাত্র খোলা আঁচেই পোড়ান হতো।[১৭] চুল্লি ব্যবহার কম ধোঁয়াযুক্ত জ্বালানী ব্যবহারের জন্য ছিল ব্যয়বহুল।[১৮]

হরপ্পার নগর পরিকল্পনায় যেমন একরূপতা দেখা যায়, তেমনই এর শিল্পীদের তৈরী দ্রব্যের মধ্যেও তা লক্ষণীয়।[১৯] পরিণত সিন্ধু সভ্যতায় সরল কুঠার, বাটালি, ছুরিকা, বর্শা-ফলক, তীরের ফলা, ছোট করাত ইত্যাদি তৈরীতে ঢালাই, কর্তন ও পেটাই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো।[২০] অশোধিত তামার পিন্ডকে চুল্লিতে দিয়ে গন্ধকের মিশেল যুক্ত করা হতো। এছাড়া তামার মধ্যেকার এ্যান্টিমনি ও আর্সেনিককেও পৃথক করা হতো। তামার সঙ্গে আর্সেনিক ও টিন মিশিয়ে শঙ্কর ধাতু প্রস্তুত করা হতো।[২১] তামা ও ব্রোঞ্জের পাত্রগুলি পরিণত সিন্ধু পর্যায়ে দুটি অংশের জোড় দেওয়ার মাধ্যমে তৈরী হতো। হরপ্পা সভ্যতায় সোনার ব্যবহার গহনা তৈরীতে ব্যাপকভাবে দেখা গেলেও[২২] রূপার ব্যবহার তুলনায় বেশী ছিল এবং এ দিয়ে অসাধারণ পাত্র নির্মিত হতো।[২৩] তবে সিন্ধু সভ্যতার বহুবর্ণে রঞ্জিত পাত্রের সংখ্যা খুবই কম।[২৪]

মেহেরগড়ে দুই পর্যায়ে ধীরগতিসম্পন্ন মৃৎশিল্পীর চাকা পাওয়া গেছে। চালকদন্ড ও নেহাই দ্বারা পাত্রনির্মাণ কৌশলে গতি আনা হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ে এই প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং সুক্ষ্ম লালবর্ণের মৃৎপাত্রের জন্ম হয়। হাতে ঘোরানো চক্রাকার ফলক পাত্র তৈরীতে নতুন মাত্রা এনেছিল। সিন্ধু যুগে পাত্র তৈরীতে ধাতব পাত প্রযুক্তি, কুন্ডলীকরণ, ধীর ও দ্রুত গতির চাকা এবং চালকদন্ড ও নেহাই প্রযুক্তি চালু ছিল। কিছু পাত্রের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো।[২৫] হরপ্পার কিছু পাত্র ছিল সন্দেহাতীতভাবে কুমোরের চাকে তৈরী। পাত্রের গায়ের দাগ থেকে একথা প্রমাণিত হয়। এগুলি ব্যাপক হারে তৈরী হতো।[২৬] পরিণত পর্যায়ে হরপ্পায় এক মিটার বা তারও বেশী লম্বা ও ব্যাসযুক্ত একধরনের পাত্র তৈরী হতো এর বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানোর মাধ্যমে, যাকে ম্যাকে "মাটির কুন্ডুলীকৃত সারিবদ্ধ অংশ" বলে অভিহিত করেছেন।[২৭] পাত্রগুলির তিনটি অংশ ছিল-নীচের অংশ, মধ্যাঞ্চল ও ওপরের প্রান্ত।[২৮] নীচের অংশটি একটি কুঁদযন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হতো। এই অংশটি মধ্যাঞ্চল ও ওপরের অংশকে ধরে রাখতো। পাত্রের মধ্যাঞ্চলে কাঁচা অবস্থায় দড়ি বেঁধে দেওয়া হতো। এরপর পাত্রটি শুকনো হতো ও পোড়ানোর সময় দড়িগুলিও পুড়ে যেতো। এরপর পাত্রটিকে ভালোভাবে মেজে ঘষে এর দাগগুলিও সুন্দরভাবে মুছে ফেলা হতো। তারপর একে মসৃণ ও নক্সাদার করা হতো। ঘষা মাজা, ঘূর্ণায়মান দন্ড ও নেহাই-এর সাহায্যে সঠিক আকারদানের মাধ্যমে পাত্রটি আরোও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে উঠতো। সিন্ধু যুগের প্রথম থেকেই এই ধরনের পাত্র দেখা যায়।

এরপর পাত্রটিতে রং করা, ছিদ্রকরণ ও তাপজনিত আঘাত থেকে একে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হতো। পাত্রগুলিতে ভিজে অবস্থায় মাটির প্রলেপ মাখানো হতো, মুখ বড় রাখা হতো এর রং বজায় ও বাষ্পীভবন ঠিক রাখার জন্য। পাত্রগুলি লাল বা ঘিয়ে রঙের হতো। চুল্লির ভেতরের উষ্ণতার ফারাক, অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদির ওপর পাত্রের রং নির্ভর করতো। রং ব্যবহৃত হতো, কালো, লাল, কমলা, সাদা, নীল ও হলুদ। তুলি দিয়ে রং করা হতো। রং পাওয়া যেতো লোহা বা ম্যাঙ্গানিজের অক্সাইড এবং ভুসোকালি থেকে।[২৯] শিল্পী জানতো কাঁচা অবস্থায় পাত্রের ওপর কোন্ রং পোড়ানো পাত্রে অন্যরকম হয়ে যাবে। যেমন গৈরিক হলুদ পোড়ানোর পর লৌহ-অক্সাইডে পরিণত হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করতো। সিন্ধুতে নিষ্প্রভ উজ্জ্বল বর্ণের পাত্রাদি থেকে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এই সভ্যতার যোগাযোগের ক্ষেত্রটি দুর্বল হয়েছে।[৩০] সিন্ধু সভ্যতায় প্রচুর পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া গেছে, যেগুলির পোড় ও গায়ের চিত্রগুলি চমৎকার। একটা পাখি মুখে মাছ নিয়ে গাছের ডালে বসে নীচে শিয়াল জাতীয় এক জন্তু — এই চিত্র[৩১] সম্বলিত পাত্রটি আমাদের কথামালার কথা মনে আনে।

কাঁচ না হলেও, সিন্ধুসভ্যতায় ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপসহ চীনামাটির পাত্র পাওয়া গেছে।[৩২] হরপ্পা সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে কালীবঙ্গানে এর প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৩৩] পরিণত পর্যায়ে এবং নগরোত্তর পর্যায়ে এর নির্দশন পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো, চাহ্নুদড়ো, হরপ্পা, লোথাল ও অন্যান্য অঞ্চলে এবং সাংহোল, আহার পর্ব - ১, নভদাতোলি ও নেভাসায়।[৩৪] এছাড়াও লাল অঞ্চলেও পাওয়া গেছে চীনামাটি।[৩৫] চিনামাটির পাত্র ছাড়াও তৈরী হতো সীল, বাক্স, বালা, পুঁতি ইত্যাদি। ভাট বালাগুলিকে কগ-চাকা (কগ হুইল) বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৬] সব পাত্র বা মূর্তি ভাঁটি বা চুল্লিতে পোড়ানো হতো না। যেগুলি পোড়ানো হতো, সেগুলির মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতো এবং বিষয়টি সিন্ধুবাসী ওয়াকিবহাল ছিল। সিন্ধু যুগের সব থেকে উন্নত ভাঁটি ছিল কূপী আকৃতির।[৩৭] প্রযুক্তির ক্ষুদ্র নিদর্শন হিসেবে এই ধরনের ভাঁটি অসাধারণ।[৩৮] দ্বিতল বিশিষ্ট এই ভাঁটির ওপরের অংশে পোড়ানোর দ্রব্য ও নীচের অংশে জ্বালানি রাখা হতো। সমস্ত নির্মাণটি ধরে রাখার জন্য ইঁটের দেওয়াল ছিল।[৩৯] দুটি তলের মাঝের মেঝেতে ছিদ্র থাকতো উত্তাপ ওপরে পৌছানোর জন্য। পোড়ানোর সময় সমস্ত ভাঁটি একটি অস্থায়ী গম্বুজে ঢাকা থাকতো। সামনে একটি শঙ্কু আকৃতির নির্গম নল থাকতো, এই অংশ জ্বালানি বোঝাই ও অগ্নিসংযোগের কাজে লাগতো। এটি অম্লজান (অক্সিজেন) চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করতো।

পোড়া ইঁট, যা সিন্ধুসভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা মহেঞ্জোদড়োয় বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে।[৪০] "সমান আকারের ইঁট" সিন্ধুসভ্যতার সম্পর্কে এটি প্রচলিত প্রবচন। বেশীরভাগ ইঁট হতো আয়তাকার, অর্দ্ধবৃত্তাকার ইঁটও সেখানে তৈরী হতো। কাঠের, ছাঁচ

ব্যবহৃত হতো ইঁট তৈরীতে এবং জমির ওপর সেগুলি শুকনো হতো। মাদুর জাতীয় কিছুর ওপর ইঁট শুকোবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৪১] সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসী যাঁরাই হোন না কেন, তাঁদের নগর নির্মাণ ও জীবনচর্যার সমগ্র বিষয়টিতে, নির্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল পোড়ামাটির ইঁট।[৪২] পোসেল দেখিয়েছেন যে ইঁট এতই মূল্যবান ছিল সেই সময় যে তা চুরি হতো।

তামা, টিন, আর্সেনিক, সীসা, সোনা ও রূপা ছাড়াও সিন্ধু সভ্যতায় ইলেকট্রাম (রূপা ও সোনার এক শঙ্করধাতু) ব্যবহার ছিল প্রতিদিনের।[৪৩] এই উপমহাদেশের বেলুচিস্তান ও রাজস্থানে তাম্রআকর পাওয়া যায়।[৪৪] মেহেরগড়-৩ পর্যায়ে যে তামার সীল, প্যাঁচালো মাথাযুক্ত কীলক ও ধাতু গলাবার মুচি পাওয়া গেছে, তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময় তামা ঢালাই-এর প্রচলন ছিল।[৪৫] সিন্ধুতে তামা ও ব্রোঞ্জের প্রয়োগবিদ্যা মুগ্ধকর।[৪৬] অগ্রবাল তামার তৈরী দ্রব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যার মধ্যে নানান কাজে ব্যবহৃত পাত্র, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ও গহনা রয়েছে বহু রকমের।[৪৭]

পরিণত হরপ্পার শুধুমাত্র ভাঁটি বা চুল্লিতেই যে ধাতু গলানো ও ঢালাই হতো তা নয়, সম্ভবত অন্য উপায়ও ছিল।[৪৮] ব্রোঞ্জ যুগে দক্ষিণ এশিয়ায় কিছু লোহার নিদর্শন থেকে শ্যাফার দেখিয়েছেন যে সেগুলি কাঁচা না ঢালাই লোহা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।[৪৯] লৌহ প্রাপ্তির এই অঞ্চলগুলির মধ্যে মুন্ডিগাক, সইদকালা টেপে, দেহ মোরাসি ঘুনডাই, আহার, চাহ্নুদড়ো ও লোথালের নাম পাওয়া যায়। নিকটপ্রাচ্য ও মিশরে সে যুগে প্রাপ্ত লোহা ওয়াল্ড বাউমের মতে ঢালাই বা গলানো লোহা।[৫০] তামা যারা গলাতে জানতো, তাদের পক্ষে লোহা গলানোও সম্ভব ছিল।[৫১] এক জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলিতে লোহা পরিশ্রুত করা হতো।[৫২] পরিবেশ-দূষণ এড়াতে ধাতু গলানো ও ঢালাই কারখানাগুলি শহরের বাইরে রাখা হতো। মতান্তরে, হরপ্পার কিছু অঞ্চলে ঢালাই কারখানা বহু শতাব্দী ধরে টিকেছিল এবং বিশেষ কাজের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাও তৈরী হয়েছিল।[৫৩] তবে, মনে হয় দূষণ এড়াতে এই কারখানাগুলি শহরের বাইরে থাকতো এবং কেন্দ্রাঞ্চলের (নগরীর) চাহিদা মেটাতো।[৫৪] কিন্তু মহেঞ্জোদড়োর পরবর্তী পর্যায়ে এর ভুপৃষ্ঠ বিনষ্টপাত্রের চিহ্নে ভর্তি ছিল।[৫৫] বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে, আরো গবেষণার প্রয়োজন।[৫৬]

স্টেয়াটাইট খুবই নরম এবং মোহ্'র কাঠিন্যের মান অনুযায়ী এটির ক্রমিক-১। সিন্ধুর কারীগররা এটির নমনীয়তার কারণে এটি পছন্দ করতো। তামা বা চ্যার্ট দিয়ে স্টেয়াটাইট কাটার কাজ খুবই ভালো হতো।[৫৭] তবে, স্টেয়াটাইট তাপ প্রয়োগে মোহ্'র মান অনুযায়ী 'চার' পর্যন্ত শক্ত হয়। সীল তৈরীতে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। সীলে

পালিশ ও রং করার জন্য গলানো স্টেয়াটাইটের প্রলেপ দেওয়া হতো।[৫৮] সীল তৈরীর প্রযুক্তি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল খুবই উন্নত।[৫৯] সীলগুলিকে নানান মাপে ও ঘনত্বে কাটা হতো।[৬০] তারপর একে সমান করা হতো। এই জন্য ধারালো যন্ত্র ব্যবহৃত হতো। তারপর সীলের ওপর গৈরিকক্ষালের একটি আস্তরণ দেওয়া হতো। এর আগে অবশ্য সীলের উপর বিষয়বস্তুর ছাপ তৈরী করা হতো। তবে, সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আরোও গবেষণার অবকাশ রয়েছে।[৬১] চূড়ান্ত পর্যায়ে সীলের ওপর স্টেয়াটাইটের প্রলেপ মাখিয়ে স্যাঁকা হতো। সীলটি শক্ত হয়ে উঠতো। সুন্দর ও উজ্জ্বলমসৃণ সীল এইভাবে প্রস্তুত হতো। সিন্ধু সভ্যতায় সীল থেকে যে সমস্ত যৌগিক প্রাণীর চিত্র আমরা পাই, সেগুলির কোন অস্থি পাওয়া যায়নি বলে এর অস্তিত্বের বিষয়টি কল্পনা বলেই মনে করা হয়। যৌগিক প্রাণী, যেগুলি সিন্ধু-সীল থেকে পাওয়া গেছে — মাথা বাঘের, শিং ষাঁড়ের, গবাদিপশুর পা ও তিনমাথা যুক্ত এক প্রাণী[৬২] যা সত্যিই অদ্ভুত। হিদার মিলার ও রত্নাগার পণ্য ও অন্যকাজে ব্যবহার হিসেবে সীলের দুটি ভাগ করেছেন।[৬৩]

স্টেয়াটাইটের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং সিন্ধুবাসীরা এই বিষয়টি জানতো। স্টেয়াটাইট দিয়ে পুঁতিও প্রস্তুত করা হতো। সেই সময়ের শত সহস্র পুঁতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু ধরনের পুঁতি তৈরীর জন্য নানান প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো। পুঁতি তৈরীতে হরপ্পায় যেসব পাথরের ব্যবহার ছিল সেগুলি হলো — এ্যাজেট, এ্যালাবাস্টার, ক্যারিংগোর্ন, জেড, লাইমস্টোন, ব্লাডস্টোন, চ্যালসেডোনি, হেমাটাইট, মুনস্টোন, প্লাজমা, চ্যার্ট, হর্ণব্লেন্ড, ল্যাপিসলাজুলি, ওনিক্স, কোয়ার্ৎজ এবং টারকয়েস ইত্যাদি।[৬৪]

সিন্ধু আমল থেকেই জহুরিকর্মে ভারত ছিল বিখ্যাত।[৬৫] পুঁতি তৈরীতে বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের পাথরের ব্যবহার খনির ওপর সিন্ধুবাসীর জ্ঞানের আধিপত্যের নিদর্শন। দোকানে পুঁতি বিক্রি হতো। মহেঞ্জোদড়োয় পুঁতির নিদর্শন পাওয়া গেলেও দোকান পাওয়া যায়নি।[৬৬] মুনির অঞ্চল ছিল পুঁতি তৈরীর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সর্ববৃহৎ নিদর্শন ক্ষেত্র।[৬৭] ম্যাকে পুঁতির উপাদান হিসেবে মাটি, ঝিনুক ও স্টেয়াটাইটের উল্লেখ করেছেন।[৬৮] মাটির পুঁতি পুড়িয়ে নেওয়া হতো। ডেনটালিম[৬৯] ঝিনুক থেকে তৈরী হতো সীল।

ম্যাকে দেখিয়েছেন পাথর থেকে কিভাবে একটা পুঁতি তৈরী করা হতো।[৭০] পুঁতির পালিশের পর এতে ছিদ্র করা হতো।[৭১] ছিদ্রের জন্য ব্যবহৃত হতো তুরপুন। অতি ক্ষুদ্র পুঁতিতেও ছিদ্র করা হতো। কেনোয়্যার বিষয়টিতে একটি উন্নত খোদাই কারিগরীর উপস্থিতির কথা বলেছেন।[৭২] পুঁতির উজ্জ্বলতা দানের ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো তা অজ্ঞাত। তবে কোন্ পাথর বা স্ফটিক তাপ প্রয়োগে কী বর্ণ ধারণ করে তখন সেই বিষয়টি জ্ঞাত ছিল।

পরিণত হরপ্পার নক্সাকাটা পুঁতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বাণিজ্য চলতো মধ্য এশিয়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে।[৭৩] হরপ্পাবাসীরা এর নকলও তৈরী করতো।[৭৪] পুঁতির ওপর নক্সাকাটার বিষয়টি বর্তমান সিন্ধুতেও প্রচলিত।[৭৫] কিরার (ক্যাপ্পারিস এ্যাফিল্লা) রসের সঙ্গে সোডা ও জল মিশিয়ে রং তৈরী হয়।[৭৬] কলমের সাহায্যে তা পুঁতির ওপর প্রয়োগ করা হয়। সেই পুঁতি শুকিয়ে ধাতব থালার ওপর রেখে, নীচে আগুন দিয়ে, পুরো শুকোবার পর আঁচ থেকে তুলে, ঠান্ডা করে, মেজে-ঘষে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়।[৭৭] স্টেয়াটাইটের সাহায্যে সিন্ধু আমলে এই নক্সাকাটা পুঁতির নকলও তৈরী হতো।[৭৮]

এইসব জিনিস ছাড়াও সিন্ধু-কারিগরীর নিদর্শন পাওয়া যায় কোয়ার্ৎজাইট ক্ষুর, লিথিয়াম ও চ্যালসেডোনির ক্ষুর, তুরপুন, ছুঁচ, উকো, চিরুনী ইত্যাদি থেকে।[৭৯] সিন্ধু সভ্যতার প্রযুক্তির বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকে 'স্টুককো'র কথা বাদ দিলে। এর অর্থ কলিচূন।[৮০] এর সঙ্গে জল মিশিয়ে স্টুককো সম্পূর্ণ হয়।[৮১] কলিচুন, বালি ও ঘৃতের মিশ্রণকে স্টুককো বা আস্তর বলা হতো প্রাচীন ভারতে।[৮২] এ থেকে তৈরী কালীবঙ্গানে প্রাপ্ত চোঙ জাতীয় পাত্রে সম্ভবত জল রাখা হতো।[৮৩] সিন্ধু সভ্যতায় স্টুককোর সঙ্গে আস্তর হিসেবে জিপসাম ব্যবহৃত হতো।[৮৪] জিপসামের শঙ্কু আকৃতির কোন অংশের প্রলেপ হিসেবে হরপ্পায় স্টুককো পাওয়া গেছে।[৮৫] দুটি ইঁটের মাঝের আস্তর এবং দেওয়াল ও মেঝের প্রলেপ হিসেবে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে জিপসাম যৌগের ব্যবহার দেখা গেছে।[৮৬]

টেরাকোটা বা মৃৎশিল্পের বিশেষ আঙ্গিক সিন্ধু প্রযুক্তির বিশেষ দিক। বিভিন্ন মূর্তি, চতুষ্কোণ বস্তু, শঙ্কু, চাকা গোলক ইত্যাদিতে টেরাকোটা ব্যবহার সেই আমলের বৈশিষ্ট্য।[৮৭] হরপ্পার টেরাকোটা মূর্তির নিজস্ব শৈলী ছিল।[৮৮] টেরাকোটা মূর্তিগুলি ধর্মীয় ও সাধারণ উদ্দেশ্যে (খেলনা ইত্যাদি) ব্যবহৃত হতো।[৮৯] সেই সময়কার টেরাকোটা শিল্পের প্রযুক্তিগত দিকটি সম্পর্কে আমরা স্টেল্লা ক্রামরিশ, এ.কে. কুমারস্বামী প্রমুখের লেখা থেকে জানতে পারি।[৯০] এগুলির অধিকাংশই ছিল হাতে তৈরী।[৯১] তবে টেরাকোটা পুঁতি তৈরী হতো ঢালাই পদ্ধতিতে। কুমোরেরা তাদের নিপুণ আঙুলের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর মৃন্ময় পাত্র ও মূর্তি তৈরী করতো।[৯২] পাত্র তৈরীর জন্য নদী বা পুকুরের নমনীয় মাটি ব্যবহৃত হতো[৯৩] এবং মাটির সঙ্গে মিশেল হিসেবে বালী, চুন ও অভ্র পাওয়া গেছে। শুকোবার সময় যাতে মৃন্ময় দ্রব্য ফেটে না যায়, মিশেল প্রয়োগের এটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। হরপ্পার মৃন্ময় পাত্র ও মূর্তিগুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য চুনও ব্যবহৃত হতো।[৯৪]

সিন্ধু অঞ্চলে অধিকাংশ মৃন্ময়মূর্তি হাতে তৈরী করা হতো। তারপর রোদে শুকিয়ে পোড়ানোর পর রঙ করা হতো। মহেঞ্জোদড়ো ও চাহ্নুদড়োয় কিছু ফাঁপা মৃন্ময় মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলি এই শিল্পের অগ্রগতির দ্যোতক।[৯৫] বলয় তৈরীর মাধ্যমে মৃন্ময়

মূর্তি, মূর্তি নির্মাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সসেজের[৯৬] আকৃতি দেওয়া মাটিকে আরোও লম্বা করে বলয় তৈরী করা হতো এবং বলয়গুলি থেকে মূর্তি তৈরী হতো।[৯৭]

কিছু মৃন্ময় পাত্র কুমোরের চাকে তৈরী হতো বোঝা যায়।[৯৮] এই ধরনের পাত্রের অর্দ্ধাংশ চাকে, বাকী অর্দ্ধাংশ আলাদা করে অন্য উপায়ে তৈরী করে জোড়া দেওয়া হতো প্রথমাংশের সঙ্গে। মহেঞ্জোদড়োর শিংওলা মুখোশ ও পুঁতি ছাঁচ ঢালাই এর মাধ্যমে তৈরী হতো।[৯৯] মৃন্ময় মূর্তির ক্ষেত্রে এর আকৃতি দানের পর এর সুক্ষ্ম অংশগুলির রূপদান করা হতো। যেমন চোখগুলি আলাদা তৈরী করে তারপর জোড়া দেওয়া হতো।[১০০] মূর্তির অলঙ্করণ সাধারণত খোদাই প্রযুক্তিতে হতো এবং মূর্তি তৈরীর পর শুকিয়ে নিয়ে একে আগুনে পোড়ানো হতো। মূর্তিগুলির রঙ হাল্কা বা গাঢ় গোলাপী, ধূসর বা কালো বর্ণের হতো।[১০১] রঙের প্রলেপ এর মসৃণতা দান করতো।

নগর নির্মাণে ইঁটের ব্যবহার সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম বিষয় এবং মহেঞ্জোদড়োয় পোড়া ইঁটের ব্যবহার ছিল বেশী।[১০২] বাড়ীর ভেতরকার স্নানাগারের সম্পূর্ণ নির্মাণের ক্ষেত্রেই পোড়া ইঁট ব্যবহৃত হতো। শৌচাগারে প্রাপ্ত তেকোনা মাটির বস্তু সম্ভবত শরীর পরিষ্কারে ব্যবহৃত হতো।[১০৩] সিন্ধু সভ্যতায় জলের বিশেষ ভূমিকার একটি প্রকাশ মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ স্নানাগার। এই পোড়া ইঁটের নির্মিত স্নানাগারটির মেঝে ও দেওয়ালের মধ্যে ২.৪ সেন্টিমিটার পুরু বিটুমেনের আস্তরন দেওয়া থাকতো।[১০৪] ভূগর্ভস্থ নালার জল নিরোধনেও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতো। স্নানাগারের পুষ্করিণীর সিঁড়িগুলিতে জিপসামের প্রলেপ দেওয়া হতো এবং বিটুমেনের প্রলেপ ও কাঠের আবরণে সিঁড়ির জলনিরোধ ক্ষমতা আরোও বাড়ানো হতো।[১০৫] স্নানাগারের দেওয়ালের একদিকে জিপসাম ও অন্যদিকে বিটুমেনের প্রলেপ দেওয়ার পর দুটি ইঁটের পাঁচিল দিয়ে আবার এগুলিকে ঢেকে দিয়ে জলনিরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ় করা হতো।[১০৬]

সিন্ধু সভ্যতার প্রযুক্তিগত উন্নতির অপর একটি বিষয় ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্প। এম এইচ অঞ্চলে প্রচুর সূতী ও পশম বস্ত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।[১০৭] মাটি, ঝিনুক বা চীনেমাটির তৈরী হাল্কা, গোলমাথা সুতাকাটার টাকু মহেঞ্জোদড়োতে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এইগুলি বিভিন্ন ধরনের হতো।[১০৮] এগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক টাকু এত সুক্ষ্ম হতো যে এর সাহায্যে পশমের তন্তুও বোনা যেতো।[১০৯] সুতোকাটা দক্ষকারীগরী অপেক্ষা বলা চলে গৃহকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূর্তির নিদর্শন থেকে কাপড়ের ওপর ছুঁচের দ্বারা সুতোর কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু, ছুঁচগুলি ভোঁতামুখের হতো বলে, কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ নিয়ে ম্যাকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এইচ আর বি এলাকার দুই নম্বর বিভাগের বাড়ী এক্স থেকে কাপড় রং করার জন্য মেঝের ওপর গাঁথা, ৮০ সেন্টিমিটার চওড়া ও গভীর দুইটি পাত্র পাওয়া গেছে।[১১০]

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কীভাবে সিন্ধু সভ্যতায় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হতো সেই প্রশ্নে প্রথমেই ওজন ও পরিমাপের বিষয়টি এসে পড়ে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো ও লোথালে যে দৈর্ঘ্য পরিমাপের স্কেল পাওয়া গেছে তার এক একটি দাগের মধ্যেকার দূরত্ব ৬.৭০৫৬ মিলিমিটার।[১১১] ব্রোঞ্জ, ঝিনুক বা হাতির দাঁতের স্কেলগুলির মাপ ছিল বর্তমান মিটারের দুই-তৃতীয়াংশ। সর্বত্র চালু ছিল দশমিক পদ্ধতি। পাথরের তৈরী ওজনের অনুপাত ছিল ১ : ২ : ৫ : ১০ : ২০ : ৫০ : ১০০ ইত্যাদি।[১১২] দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ওজনের প্রথমটির শুরু ১.২১৮৪ গ্রাম থেকে ৪০০৬৫ গ্রাম ও দ্বিতীয়টি ০.৮১৭ গ্রাম থেকে ৬৯০৩ গ্রাম পর্যন্ত। মূল্যবান বস্তু ওজনের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম থেকে ৩২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত একটি পরিমাপের বিভাগ পাওয়া গেছে। শাঁখ বা ঝিনুকের কম্পাস জাতীয় যন্ত্র পাওয়া গেছে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় কিম্বা নৌযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভবত এর ব্যবহার ছিল।[১১৩] একটা ব্যাপক বাণিজ্য হরপ্পার সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রাপ্ত ওজন ও পরিমাপের যন্ত্রপাতি থেকে অনুধাবন করা যায়।[১১৪] মার্শাল এবং হেমি ওজনের ধারা দুটিকে এভাবে দেখিয়েছেন, প্রথমটি - ১, ২, ৪, ৮ থেকে ৬৪ ও ১৬০ এবং দ্বিতীয়টি ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০ (উদাহরণ - ১৬০০×৫) এইভাবে।[১১৫] তখন এক ফুট ছিল ৩৭.৬ সেন্টিমিটার এবং এক হাত ছিল ৫১.৮ সেন্টিমিটার থেকে ৫৩.৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত।[১১৬]

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কম্পাসের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। বাণিজ্যের বিষয়ে লোথালের ২১৯×৩৭ মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং ৪.৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট বৃহৎ জলাধারটির কথা বলা যায়। এরপাশে ছিল ১৯৩০ বর্গমিটার মাপের একটি গুদামঘর। জলাধারের পুরো নির্মাণটিই ছিল পোড়া ইঁটের।[১১৭] এটি বন্দর ছিল না জলাধার সেই নিয়ে বিতর্ক আছে। লোথালে মাটির তৈরী জাহাজের নিদর্শন থেকে সেই সময় এর প্রচলন ছিল বোঝা যায়।[১১৮] দিলমান, মাগান ও মেলুহার সঙ্গে চলত বাণিজ্য।[১১৯] সিন্ধু সভ্যতায় তিন ধরনের নৌকার চল ছিল।[১২০] সমগ্র প্রাচ্যে এই বাণিজ্যের বিস্তার ছিল।[১২১] বাণিজ্যের পণ্য সম্ভার ছিল বিপুল।[১২২] দক্ষ নাবিকেরা কাঠের নৌকা তৈরী করতো। জলপথে পণ্য পরিবহনের বিষয়টি যে সহজ সেই জ্ঞান সেই সময়ের মানুষের ছিল।[১২৩] রূপার বহুল ব্যবহার হরপ্পাবাসীই করতো।[১২৪] নগর তোরণের কাছে পাথরের ওজন বহুল পরিমানে পাওয়া গেছে। তার থেকে এই জায়গায় যে বাণিজ্যের প্রাধান্য ছিল তা বোঝা যায়।[১২৫] এখানে বিনিময় প্রথাও চালু ছিল।[১২৬] সমুদ্র ছাড়াও নদী ও স্থল পথেও বাণিজ্য চলত।[১২৭]

সিন্ধু অঞ্চলে কৃষির জন্য সেচের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হতো। কৃষিতে লাঙ্গলের ব্যবহার ছিল। লাঙ্গলে ধাতুর ফাল লাগানোর ব্যাপারে সন্দেহ আছে।[১২৮] সারের সম্ভবত ব্যবহার ছিল। কালীবঙ্গানে একপাত্র জিপসাম পাওয়া

গেছে। সম্ভবত কৃষিক্ষেত্রের নোনা দূরীকরণে এর ব্যবহার ছিল।[১২৯] কৃষকেরা প্রয়োজনের অধিক খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম ছিল।[১৩০] সিন্ধু সভ্যতায় কার্পাস একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল এবং সূতীবস্ত্র ছিল সিন্ধুর রপ্তানী বাণিজ্যের অন্যতম উপকরণ। হরপ্পার শষ্যগোলার কারিগরী ও নির্মাণ শষ্যজাতকরণ ও সংরক্ষণের এক চরম উৎকর্ষতার পরিচায়ক। গম, বার্লি প্রধান খাদ্যশষ্য হলেও ধানের নিদর্শন পাওয়া যায়নি।[১৩১] তবে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে পাকিস্তানে ধান পাওয়া গেছে বলে এ ব্যাপারে আরোও গবেষণা প্রয়োজন।[১৩২]

নৌসারো দুই বি-তিন, আমরি তিন বি, ২৩০০-১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পায় আইনের লিপিবদ্ধকরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ঔষধ এই সমস্ত বিশেষায়িত ক্ষেত্রের ওপর অধ্যয়ন ও গবেষণা চলছে।[১৩৩] এই সমস্ত বিষয়ে অকাট্য প্রমাণের অভাব থাকলেও এই বিষয়গুলির চর্চা সিন্ধু সভ্যতার মানুষ করতো না এমন কথা বলা যায় না। কারণ, প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুকাল ধরেই এগুলির চর্চা ছিলো।[১৩৪] ইনস্টিট্যুটো ইতালিয়ানো পার ইল মেডিয়ে এদ এসত্রিমো ওরিয়েনতের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সিন্ধু সভ্যতার বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টির অস্তিত্বের ব্যাপারে গবেষণায় রত আছেন। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অকাট্য প্রমাণ মিলবে।

স্বল্প পরিসরে আলোচনা সংক্ষিপ্ত থাকলো। অনেক কিছু বাকী থেকে গেলো। তবু, সিন্ধু বাসীর বিজ্ঞান ও এর প্রায়োগিক বিষয়টিতে কী অসাধারণ জ্ঞান পুঞ্জিভূত হয়েছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পরিবেশ দূষণ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তাদের ধারণা ছিল। যদিও, এই প্রবন্ধে তা বিস্তারিত ভাবে দেখানো যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার, বিশেষত এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর গবেষণা এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আরোও নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটুক, সিন্ধু সভ্যতার অনালোকিত দিকগুলি আলোকিত হোক্।

সূত্র-নির্দেশ

১। আহমদ হাসান দানি, *ইন্ডিয়ান পেলিওগ্রাফি*, নতুন দিল্লী, ১৯৯৭, পৃঃ ১২।

২। রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দ্য ভেদিক এজ, *দ্য হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার অফ দ্যি ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল*, প্রথম খন্ড, দিল্লী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ পৃঃ ১৭২-২০১

৩। ভিনসেন্ট এ. স্মিথ, *দি অক্সফোর্ড হিষ্ট্রি অফ ইন্ডিয়া*, নবম সংস্করণ, ২০০২ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ পৃঃ ২৬-২৮

৪। গ্রেগরি এল. পোসেল, *দি ইন্দাস সিভিলাইজেশন, আ কন্টেম্পোরারি পার্সপেক্টিভ*, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৮৯

৫। কার্নেলিয়ন, কর্নেলিয়ন, চ্যালসেডোনির একটি অনুজ্জ্বল লাল বা লালচে-সাদা শ্রেণীর পাথর; চ্যালসেডোনি, একধরনের কোয়ার্ৎজ যাকে অ্যাজেট, ওনিক্স, টাইগার আই ইত্যাদি

আকারে পাওয়া যায় — দেল্লা টম্‌সন সম্পাদিত, দ্য কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্সনারী অফ কারেন্ট ইংলিশ, নবম সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯৯, ২১৬, ২৯৮

৬। গ্রেগরি এল. পোসেল, *দি ইন্দাস সিভিলাইজেশন, আ কন্টেম্পোরারি পার্সপেক্টিভ,* নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৮৯।

৭। আসকো পারপোলা, *ডিসিফারিং দি ইন্দাস স্ক্রীপ্ট*, কেম্ব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪, প্রথম কাগজ বাঁধাই প্রকাশন (পেপার ব্যাক) ২০০০, পৃঃ ৬

৮। ঐ, পৃঃ ৬

৯। ঐ, পৃঃ ৮

১০। ঐ, পৃঃ ৮

১১। ঐ, পৃ পৃঃ ৮-৯

১২। গ্রেগরি এল. পোসেল, ঐ, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৮৯।

১৩। ঐ, পৃঃ ৮৯

১৪। ঐ, পৃঃ ৮৯

১৫। ঐ, পৃ পৃঃ ৮৯-৯০

১৬। ঐ, পৃঃ ৯০

১৭। সিরিন রত্নাগর, *এনকুয়্যারিস ইনটু দ্য পলিটিকাল অরগ্যানাইজেশন অফ হরপ্পান সোসাইটি,* পুনে, ১৯৯১, পৃঃ ২৭

১৮। ঐ, পৃঃ ২৭

১৯। ব্রিজেত ও রেমন্ড অলচিন, *দ্য রাইজ অফ সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান,* কেম্ব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ১৯৩

২০। ঐ, পৃঃ ১৯৩

২১। ঐ, পৃঃ ১৯৩

২২। ঐ, পৃঃ ১৯৪

২৩। ঐ, পৃঃ ১৯৫

২৪। ঐ, পৃঃ ১৯৯

২৫। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৯০

২৬। ঐ, পৃঃ ৯০

২৭। ঐ, পৃঃ ৯০

২৮। ঐ, পৃঃ ৯০

২৯। ঐ, পৃঃ ৯১

৩০। ঐ, পৃঃ ৯১

৩১। এ. এল বাসাম সম্পাদিত, *আ কালচারাল হিষ্ট্রি অফ ইন্ডিয়া,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২ (প্রথম প্রকাশ, নিউ ইয়র্ক ১৯৭৫), পৃঃ ১৫

৩২। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৯১

৩৩। ঐ, পৃঃ ৯১

৩৪। ঐ, পৃঃ ৯১
৩৫। ঐ, পৃঃ ৯১
৩৬। ঐ, পৃঃ ৯১
৩৭। ঐ, পৃঃ ৯১
৩৮। ঐ, পৃঃ ৯১
৩৯। ঐ, পৃঃ ৯১
৪০। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪১। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪২। শ্রী পি. কে. গোগাই, *গড শিভা, দেভী এ্যান্ড তান্ত্রীক কাল্ট (টু বি ট্রেসড্ টু ভেদাস, উপনিশদাস এ্যান্ড দি ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন)*, বারাণসী, ভারত, ২০০১, পৃ পৃঃ ৩-৪
৪৩। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৯৩
৪৪। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪৫। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪৬। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪৭। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪৮। ঐ, পৃঃ ৯৩
৪৯। ঐ, পৃঃ ৯৩
৫০। ঐ, পৃঃ ৯৪
৫১। ঐ, পৃঃ ৯৪
৫২। ঐ, পৃঃ ৯৪
৫৩। ঐ, পৃঃ ৯৪
৫৪। ঐ, পৃঃ ৯৪
৫৫। ঐ, পৃ পৃঃ ৯৪-৯৫
৫৬। ঐ, পৃঃ ৯৫
৫৭। ঐ, পৃঃ ৯৫
৫৮। ঐ, পৃঃ ৯৫
৫৯। ঐ, পৃঃ ৯৫
৬০। ঐ, পৃঃ ৯৫
৬১। ঐ, পৃঃ ৯৫
৬২। এগবার্ট রিখটার উসানাস, *দি ইন্দাস স্ক্রিপ্ট এ্যান্ড দ্য রিগ-ভেদা*, দিল্লী, ২০০১, পৃঃ ১২২
৬৩। শুভাঙ্গনা আত্রে, *দি আর্কিটিপাল মাদার, আ মিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু হরপ্পান রিলিজিয়ন*, পুনে, ১৯৮৭, পৃঃ ৭
৬৪। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ২১৮
৬৫। ঐ, পৃঃ ৯৬
৬৬। ঐ, পৃঃ ৯৬

৬৭। ঐ, পৃঃ ৯৬
৬৮। বিমল চন্দ্র দত্ত, রূপার, *এনশিয়েন্ট কালচারাল কমপ্লেক্স অফ ইন্ডিয়া*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৮
৬৯। ডেনটালিয়াম, একধরনের টাস্ক ঝিনুক, টাস্ক, দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণাগ্র হাতির দাঁতের মতো ঝিনুক, গহনা হিসাবে ব্যবহৃত হতো-দেল্লা টমসন সম্পাদিত, দি কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্সনারী অফ কারেন্ট ইংলিশ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৬০, ১৫০৬
৭০। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৯৬
৭১। ঐ, পৃঃ ৯৬
৭২। ঐ, পৃঃ ৯৬
৭৩। ঐ, পৃঃ ৯৬
৭৪। ঐ, পৃঃ ৯৬
৭৫। ঐ, পৃঃ ৯৬
৭৬। ঐ, পৃঃ ৯৬
৭৭। ঐ, পৃঃ ৯৭
৭৮। ঐ, পৃঃ ৯৭
৭৯। বিমল চন্দ্র দত্ত, রূপার, তদেব, পৃঃ ১৯
৮০। কে. এম. ভার্মা, *স্টুককো ইন ইন্ডিয়া, ফ্রম প্রি মোহেঞ্জোদড়ো টাইমস্ টু দা বিগিনিং অফ দা ক্রিশ্চান এরা*, শান্তিনিকেন, ১৯৮৩, পৃঃ ৫
৮১। ঐ, পৃঃ ৭
৮২। ঐ, পৃঃ ৭ (ভূমিকার পৃষ্ঠানুক্রম অনুযায়ী)
৮৩। ঐ, পৃঃ ৫৯
৮৪। ঐ, পৃঃ ৬০
৮৫। ঐ, পৃঃ ৬১
৮৬। ঐ, পৃ পৃঃ ৬২-৬৩
৮৭। বিমল চন্দ্র দত্ত, রূপার, তদেব, পৃ পৃঃ ২১ ২৩
৮৮। শুভাঙ্গনা আত্রে, *দি আর্কিটিপাল মাদার, আ মিস্টিক এ্যাপ্রোচ টু হরপ্পান রিলিজিয়ন*, পুনে, ১৯৮৭, পৃঃ ১২
৮৯। ঐ, পৃ পৃঃ ১৩-১৫
৯০। ভিভা ত্রিপাটী, অজিত কে. শ্রীভাস্তভা *দি ইন্দাস টেরাকোটাস*, দিল্লী, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬৯
৯১। ঐ, পৃঃ ১৬৯
৯২। ঐ, পৃ পৃঃ ১৬৯-১৭০
৯৩। ঐ, পৃঃ ১৭০
৯৪। ঐ, পৃঃ ১৭০
৯৫। ঐ, পৃঃ ১৭১
৯৬। গরু বা শুকরের মাংসের কিমা মসলাসহ ঐ প্রাণীদের পরিশ্রুত নাড়ীর মধ্যে পুরে, দুইদিকে বন্ধ করে, রান্নার জন্য প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ — দেল্লা টমসন সম্পাদিত, দি কনসাইজ

অক্সফোর্ড ডিক্সনারী অফ কারেন্ট ইংলিশ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬, পৃঃ ১২২৭

৯৭। ভিভা ত্রিপাটী, অজিত কে. শ্রীভাস্তভা, তদেব, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭১

৯৮। ঐ, পৃঃ ১৭১

৯৯। ঐ, পৃ পৃঃ ১৭১-১৭২

১০০। ঐ, পৃঃ ১৭২

১০১। ঐ, পৃঃ ১৭২

১০২। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, পৃঃ ৯৯

১০৩। ঐ, পৃ পৃঃ ১০৬-১০৭

১০৪। ঐ, পৃঃ ১৮৯

১০৫। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, *ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস*, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৯

১০৬। ব্রিজেত ও রেমন্ড অলচিন, *দ্য রাইজ অফ সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান*, কেম্ব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ১৮০

১০৭। সিরিন রত্নাগর, তদেব, পৃঃ ২৭

১০৮। ঐ, পৃ পৃঃ ২৭-২৮

১০৯। ঐ, পৃঃ ২৮

১১০। ঐ, পৃঃ ২৮

১১১। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, তদেব, পৃঃ ১০৭

১১২। ঐ, পৃঃ ১০৭

১১৩। ঐ, পৃ পৃঃ ১০৭-১০৮

১১৪। ব্রিজেত ও রেমন্ড অলচিন, দ্য রাইজ অফ সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান, কেম্ব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, দক্ষিণ এশিয়ায় ফাউন্ডেশন বুক কর্তৃক প্রকাশিত, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ১৬৯

১১৫। ঐ, পৃঃ ১৮৫

১১৬। ঐ, পৃঃ ১৮৫

১১৭। আসকো পারপোলা, তদেব, পৃঃ ১১

১১৮। ঐ, পৃঃ ১২

১১৯। ঐ, পৃ পৃঃ ১২-১৩

১২০। গ্রেগরি এল. পোসেল, তদেব, পৃঃ ২১৮

১২১। ঐ, পৃঃ ২২১

১২২। ঐ, পৃ পৃঃ ২১৭ ২১৯

১২৩। রণবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লী ২০০১, পৃ পৃঃ ১০৩-১০৪

১২৪। ঐ, পৃঃ ১০৪

১২৫। হিমাংশু প্রভা রায়, *দি আর্কিওলজি অফ সিফারিং ইন এনশিয়েন্ট সাউথ এশিয়া*, কেম্ব্রীজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইউ. কে., ২০০৩, পৃঃ ১০১

১২৬। ঐ, পৃঃ ১০১
১২৭। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, তদেব, পৃ পৃঃ ১০৮-১১০
১২৮। ঐ, পৃঃ ১০৫
১২৯। ঐ, পৃ পৃঃ ১০৫-১০৬
১৩০। রঞ্জিত প্রতাপ সিংহ, *এগ্রিকালচার ইন প্রোটোহিষ্টরিক ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ৬৫।
১৩১। নয়নজ্যোতি লাহিড়ী সম্পাদিত, *দা ডিক্লাইন এ্যান্ড ফল অফ দি ইন্দাস সিভিলাইজেশন*, নতুন দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ৩৬৯
১৩২। ঐ, পৃঃ ৩৭৯
১৩৩। আসকো পারপোলা, তদেব, পৃঃ ২৪
১৩৪। ঐ, পৃঃ ২৪।

কার্ত্তিকেয় কল্পনা ঃ বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও বৈপরীত্য

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে এই প্রবন্ধে উল্লিখিত সমস্ত সূত্রেরই পর্যাপ্ত পরিপূরক তথ্য পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্বে — সেগুলি এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়নি। আলোচনা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত ঃ অপরদুটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক বিষয় — কার্ত্তিকেয় প্রাগার্য দেবতা কিনা এবং ইরানীয় দেবতা শ্রৌষ-র সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ও পারস্পরিক প্রভাব (যা নিয়ে প্রভূত গবেষণা করেছেন টি. জি. আরাভুমুথন[১] এবং সুকুমার সেন[২]) — এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

আমার আলোচনার সূত্রপাত বৈদিক যুগে যখন অন্য সব প্রাচীন সভ্যতার মতই এদেশেও দেবকল্পনার মূলে ছিল বিপর্যয়ের ত্রাস ও বহুবিধ সাফল্যের আকাঙ্খা। ঋগ্বেদে যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র। পাশাপাশি তাঁর দহনক্ষমতা দ্বারা শত্রুদের বিনষ্ট করতে সক্ষম বলে ঋগ্বেদে বিভিন্ন স্থানে[৩] অগ্নিও যুদ্ধদেবতা রূপে আরাধ্য।

ঋগ্বেদে 'কুমার' শব্দের উল্লেখ আছে ১৭ বার তবে তখন তা কার্ত্তিকেয়র সমনাম নয়। কার্ত্তিকেয় কল্পনার কিছু উপাদান ঋগ্বেদে ছিল ঠিকই — কিন্তু তখনও পর্যন্ত আর্যমানসে যুদ্ধদেবতারূপে ইন্দ্রের কোনো বিকল্প ছিল না।

ঋগ্বেদে অগ্নি সম্পর্কে প্রযুক্ত 'কুমার' অভিধানটি[৪] পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয় কার্ত্তিকেয়র সঙ্গে। পরবর্তীকালে জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্গে কার্ত্তিকেয়র সংযোগের সূত্রটিও পাওয়া যায় ঋগ্বেদে অগ্নি প্রসঙ্গে প্রযোজ্য বিশ্ববিদ, বিশ্ববেদস, কবিক্রতু প্রভৃতি বিশেষণে। ঋগ্বৈদিক আখ্যানে অগ্নির মাতৃসংখ্যা একাধিক — কোথাও সংখ্যাটি২[৫], কোথাও ১০[৬] — এছাড়া অগ্নি যে গুহাজাত বা গুহাবাসী একথাও ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলে একাধিকবার উল্লিখিত।[৭] পরবর্তীকালে স্কন্দের মাতৃ সংখ্যার আধিক্য ও 'গুহ' বিশেষণটি তাঁর রূপকল্পনায় সংযোজিত হওয়ার সূত্র এখানেই।

ঋগ্বেদের অপর একটি স্তোত্রে[৮] দেখি রুদ্রের সঙ্গেও কুমারকে সম্পর্কিত করার প্রচেষ্টা — এখানে স্তোত্রকার রুদ্রের প্রতি প্রণত যেমন কুমার তাঁর পিতার প্রতি। পরে স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় নামক এই দেবতার অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে ওঠে তার সাথে ঋগ্বেদে উল্লিখিত যম, সোম, মরুৎ প্রমুখ দেবতাদের কিছু বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

ঋগ্বেদে অগ্নি একজন শুভকারী দেবতা — তিনি নারীকে গর্ভধারণের উপযুক্ত করেন[৯] এবং ভক্তকে সন্ততি প্রদান করেন।[১০] গর্ভদোষ নিবারণের জন্য ও সদ্যোজাতর মঙ্গলকামনায়[১১] — অশুভশক্তির বিরুদ্ধে তাঁকে আহ্বান করা হয়।[১২]

অপরপক্ষে রুদ্র একজন ভয়ানক দেবতা — তিনি রোষের বশবর্তী হয়ে প্রজাদের জীবন ও সম্পতি বিনাশ করেন।[১৩] তিনি যাতে শিশুদের রোগ বা আঘাত — কোনরূপ ক্লেশ না দেন সেজন্য বারবার তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হচ্ছে। শিশুদের রক্ষাকারী অগ্নি ও ক্ষতি সাধনকারী রুদ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দুটি সম্মিলিত হয়ে পরবর্তীকালে কার্ত্তিকেয় চরিত্রের বৈপরীত্যরূপে বিদ্যমান।

কুমারের বিকাশ স্পষ্টতর হচ্ছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। এই সময় যখন একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ অর্থনীতি - সংস্কৃতি, আর্যজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল, তখন যুদ্ধের পরিবর্তিত চরিত্রের প্রেক্ষিতেও দেবচিন্তনের বিবর্তন ঘটছিল। এর ফলস্বরূপ ইন্দ্রকে ছাপিয়ে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন কার্ত্তিকেয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নির্মিত ও সম্প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এখানে অগ্নির যে নটি রূপের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে রুদ্র, পশুপতি, মহাদেব প্রভৃতির উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এখানে অগ্নি ও রুদ্র অভিন্ন এবং নবমটি কুমার[১৪]। অগ্নিচয়ন অধ্যায়ে অগ্নি রুদ্র এবং কুমারের এই রকম অভিন্নতার কাহিনীই অগ্নিকুমারকে পরবর্তীকালে শিবপুত্ররূপে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। যখন অগ্নির জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী এবং শিবের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্দ্ধমান তখন শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া কার্ত্তিকেয়র গুরুত্ব বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে।

ঋগ্বেদে এক স্থানে[১৫] অগ্নিকে 'চিত্রশিশু' বলে অভিহিত করা হয়েছিল — শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি কুমারকে 'চিত্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিচয়ন অধ্যায়ে[১৬] পাচ্ছি যে কুমার — অগ্নির উদ্দেশে প্রজাপতি একটি ছাগ নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এই জীবটি বিশেষভাবে অগ্নির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই উপাদানটি বিকশিত হয় মহাভারতে যেখানে কার্ত্তিকেয় স্বয়ং নৈগ মেষরূপে অজানন। অনুশাসন পর্বে[১৭] দেখি দেবসেনাপতিরূপে কার্ত্তিকেয়র অভিষেককালে অগ্নি তাঁকে আশীর্বাদের স্মারকরূপে একটি ছাগ দিয়েছিলেন।

শিশুদের হিতকারী ও অনিষ্টকারী দুটি বৈশিষ্ট্যই কার্ত্তিকেয়র চরিত্রে ফুটে ওঠে গৃহ্যসূত্রে। পারস্পর গৃহ্যসূত্রে[১৮] কুমারের উল্লেখ পাই শিশু এবং তার মাতার অনিষ্টকারী রূপে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে[১৯] গর্ভকালের চতুর্থ মাসে পালনীয় সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নেজমেষকে আহ্বান করা হচ্ছে।

স্কন্দ নামটির উল্লেখ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে[২০] যা সনৎকুমারের সমার্থকরূপে উল্লিখিত। উপনিষদীয় দর্শনের প্রবক্তরা অনেকেই ছিল ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত, একথা স্বীকার করলে ব্রহ্মজ্ঞানী সনৎকুমার (যিনি নারদের শিক্ষাগুরু) এর সঙ্গে যুদ্ধ দেবতা স্কন্দের সমান্তরাল অভিন্নতা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সূত্রসাহিত্য রচনাকালের প্রায় সমসাময়িক পর্বেই আনুমানিক ৬০০-২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল অথর্ববেদের পরিশিষ্টাংশের অন্তর্গত স্কন্দযাগ বা ধূর্তকল্প অধ্যায়টি। 'ধূর্ত' শব্দটির প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় আর্য পরিশীলনের মান অনুযায়ী এই দেবতা সর্বতো সংস্কৃত নন — 'ভগবান দেবো ধূর্ত' বলে তাঁকে একাধিকবার উল্লেখ করা হচ্ছে। স্কন্দের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের যে পদ্ধতি এখানে বর্ণিত আছে তাতে ধরা পড়ে লৌকিক উপাসনারীতির সনাতন প্রতিচ্ছবি। এই পর্বে তাঁর ভক্তদের চেতনার রঙে তাঁর অবয়ব রূপ পাচ্ছিল যা কার্ত্তিকেয় মূর্তি নির্মাণের সহায়ক হয়। তিনি লোহিতগাত্র ষড়ানন, দশলোচন, সুবর্ণবর্ণ ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গে আছে ঘন্টা পতাকা, তাঁকে বহন করে ময়ূর। যাবতীয় বৈপরীত্যসহ তাঁর চরিত্র নির্মিত হচ্ছে — তিনি একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দ, নির্মল ও ধূর্ত। তাঁর পরিচয় নিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কাহিনীর সঙ্গে যে রচয়িতা পরিচিত তা তাঁর অসহায় সমর্পণে ধরা পড়ে;

আগ্নেয়ম্ কৃত্তিকাপুত্রম্ ঐন্দ্রম্ কে চিদ্ অধীয়তে।
কে চিৎ পাশুপতম্ রৌদ্রম্ যো সি সো সি নম'স্তুতে।।

কার্ত্তিকেয়র পরিচিতি নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনীগুলি আরো বিশদে আলোচিত হয়েছে মহাকাব্যদুটিতে। মহাভারতের তিনটি পর্বে আরণ্যক, শল্য ও অনুশাসন পর্বের মোট ১৫টি অধ্যায়ে[২১] এবং রামায়ণের আদিকান্ডে (অধ্যায় ৩৭-৩৮) কার্ত্তিকেয় পরিচিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। মহাভারতের ক্রমান্বয়িক পর্বগুলিতে তাঁর পিতৃপরিচিতি অগ্নি থেকে শিবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অগ্নিচয়ন অধ্যায় প্রভৃতি (যেখানে রুদ্র ও অগ্নিকে অভিন্ন মনে করা হয়)-র ফলে এই পরিবর্তন সহজেই সম্ভব হয়েছিল।

আরণ্যকপর্বে তিনি প্রধানত পাবকী, পাবকাত্মজ বা বহ্নিনন্দন — শল্যপর্বে তাঁর আগ্নেয় ও রৌদ্র দুটি পরিচয়ই স্বীকৃত ও অনুশাসনপর্বে তিনি রুদ্রের পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পরিচিতি নিয়ে যে সংশয় তার সাক্ষ্য আছে আদিপর্ব ও শল্যপর্বের দুটি শ্লোকে।[২২] তবে তাঁর আগ্নেয় পরিচয়টি যে দীর্ঘকাল ভক্তমানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ আনুমানিক খ্রিষ্টিয় প্রথম শতকের রচনা বুদ্ধচরিত ও খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতকের নাগার্জুনিকোন্ডা লেখ সেখানে তাঁকে 'হুতবহতনয়' বলা হয়েছে।

মহাভারতে দেবসেনাপতিরূপেও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন কার্ত্তিকেয় — পাশাপাশি 'দেবসেনাপতি' শব্দটি আরণ্যকপর্বে রূপকার্থে ব্যবহৃত যেখানে প্রজাপতির কন্যা দেবসেনার স্বামীরূপে কার্ত্তিকেয় উল্লিখিত।[২৩] এরকম আরেকটি রূপকের উল্লেখ করতে

পারি। কার্ত্তিকেয় প্রসঙ্গে 'কুমার' শব্দটি প্রযোজ্য — সাধারণভাবে একজন অবিবাহিত যুবাপুরুষকে বোঝাতে যেমন, তেমনই; সমান্তরালভাবে 'কু' বা অশুভশক্তির, যেমন মহিষাসুর বা তারকাসুরের[২৪] নিধনকারীরূপে কুমার বলে চিহ্নিত।

আরণ্যকপর্বে কার্ত্তিকেয়র ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার একটি আকর্ষণীয় সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কার্ত্তিকেয়র ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে থাকলে শঙ্কিত দেবতারা ইন্দ্রের কাছে আবেদন করেন। ইন্দ্র স্কন্দকে আক্রমণ করলে বজ্রের আঘাতে আহত হবার পরিবর্তে উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে তাঁর — দুজন আর্যদেবতার মধ্যে অভূতপূর্ব সম্মুখসমরে পরাজিত হন দেবরাজ। মহাভারতের ভাষায় ঃ—

ভয়াদিন্দ্রস্ততঃ স্কন্দং প্রাঞ্জলি শরণম গতঃ। পরাজিত ইন্দ্র (বাহুবল এবং জনপ্রিয়তার নিরিখেও) এরপর দেবরাজ হবার জন্য কার্ত্তিকেয়কে আহ্বান জানালেন — কার্ত্তিকেয় তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে দেবসেনাপতিপদেই তাঁর সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন।

সাধারণ মানুষের জন্য বিনয়ের পাঠটি এখানে লক্ষণীয়। মহাকাব্যগুলিতে কার্ত্তিকেয়র বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছিল মনে করলে দেখি পুরাণে এসে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম বায়ুপুরাণে স্কন্দের জন্ম ও কীর্তির যে বর্ণনা আছে,[২৫] তা শল্যপর্বের কাহিনীর অনুবর্তী। বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মান্ড পুরাণেও তাই। বিষ্ণুপুরাণে বিশাখ শাখ, নৈগমেয়কে স্কন্দের সহোদররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে শল্যপর্বের কাহিনীর মূল কাঠামোয় কিছু নতুনমাত্রা সংযোজিত হয়েছিল পুরাণগুলিতে। বামনপুরাণে কার্ত্তিকেয়র পরিচয় অগ্নি ও কুটিলার পুত্ররূপে — এই কাহিনী অন্য কোথাও নেই।

পুরাণগুলির রচনাকাল পর্যন্ত কার্ত্তিকেয় সম্পর্কে আলোচনা ও কল্পনা স্তব্ধ হয়ে যায়নি — তাই এই পর্যায়েও আমরা কিছু নতুন কাহিনী পাচ্ছি। বরাহপুরাণের ২৫নং অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ফলে সৃষ্ট পরমতত্ত্ব অহংকারের কথা - শিব ও উমার পুত্ররূপে কার্ত্তিকেয় এই অহংকারের স্বরূপ। স্কন্দ যে সে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন বোঝা যায় তাঁর নামাঙ্কিত বৃহদাকার স্কন্দপুরাণটি থেকে।

অর্থশাস্ত্রে[২৬] নগরীর কেন্দ্রভাগে যে সকল দেবতার 'কোষ্ঠান' নির্মাণের কথা আছে— তার মধ্যে অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত ও বৈজয়ন্তের উল্লেখ আছে — সম্ভবত এগুলি সবই স্কন্দের সমনাম।

পতঞ্জলির তথ্য থেকে জানা যায়, তাঁর সময়ে শিব, স্কন্দ, বিশাখ প্রমুখের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল 'সম্প্রতি পূজার্থে'। এখানে স্কন্দ ও বিশাখের ভিন্ন অস্তিত্ব স্বীকৃত। বৃহৎ সংহিতাতেও স্কন্দ ও বিশাখের পৃথক উল্লেখ আছে।

গুপ্ত শাসনকালে কার্ত্তিকেয়র জনপ্রিয়তা তুঙ্গ স্পর্শ করে। প্রথম কুমারগুপ্ত কার্ত্তিকেয় বা ময়ূরজাতীয় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। ৪১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কুমারগুপ্তের রাজ্যের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ধ্রুবশর্মা, বিলসাদের একটি কার্ত্তিকেয় মন্দিরের (স্বামী মহাসেনের আয়তন বলে উল্লিখিত) একটি প্রতোলী নির্মাণ করিয়েছিলেন। গুপ্তযুগে কার্ত্তিকেয় কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, রাজবংশের কয়েকটি নাম কুমারগুপ্ত, কুমারদেবী, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি এবং কালিদাসের কালজয়ী কাব্য কুমারসম্ভবম তার সাক্ষ্য বহন করে।

আলোচনার শেষপর্বে এসে কার্ত্তিকেয়র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের যদি সারসংক্ষেপ করার চেষ্টা করি, বৈপরীত্যগুলি আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

ঠিক যেমন সমাজে কখনও কখনও একই মানবচরিত্রের দ্বৈতসত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায় আমাদের, তেমনই কার্ত্তিকেয় নামক দেবতার রূপকল্পনা — যা শেষ পর্যন্ত আসলে সংবেদনশীল ভক্তমানুষের কল্পনাই — সেই কল্পনার মধ্যেও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্ববিরোধী বলে মূল্যহীন নয় — গুরুত্বপূর্ণ এক দেবতার জটিল চরিত্র নির্মিতিতে বাস্তব সচেতনতার প্রতিফলন মাত্র।

যে কার্ত্তিকেয় প্রবল পরাক্রমশালী যুদ্ধদেবতা, মুদ্রার অপর পিঠে তিনিই অহিংস — জ্ঞান ও বিদ্যার শান্ত তাপস ব্রহ্মজ্ঞানী সনৎকুমার। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুণেই তিনি ব্রহ্মণ্য বা সুব্রহ্মণ্য। এই কারণেই তাঁকে মহাযোগী যোগীশ্বর, ধর্মাত্মা, প্রশান্তাত্মা, শুচি ইত্যাদি বলা হয়েছে মহাভারতে। তাঁর এই শুচিতা প্রায় শুচিবায়ুগ্রস্ততায় পর্যবসিত হয় তাঁর নারীসঙ্গবিতৃষ্ণার তথ্যে। বিক্রমোর্বশীয় (চতুর্থ অংক) ও কথাসরিৎসাগর[২৭] থেকে জানা যায় তাঁর মন্দিরে পর্যন্ত নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আবার এই দেবতাই দেখি ব্রহ্মপুরাণ (৮১ অধ্যায়) ও স্কন্দপুরাণের একস্থানে এতদূর প্রণয়শীল হয়ে উঠেছেন যে দেবতারা তাঁর মাতা পার্বতীর কাছে নালিশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। গণিকাসমাজে কার্ত্তিকেয় প্রধানত প্রেমের দেবতারূপেই আরাধ্য।

স্কন্দ কার্ত্তিকেয় নেজমেষ - নৈগমেষ - নৈগমেয় রূপে একজন শুভঙ্কর দেবতা যিনি বন্ধ্যা মহিলাদের পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। তিনি শিশুদের রক্ষাকারী দেবতাও - আবার পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (১.১৬.২৪), বনপর্বের ২২৮নং অধ্যায়ে দেখি তিনি সদ্যোজাত শিশুদের বিব্রত করছেন।

অনুশাসনপর্বে (৮৮.২৬) তাঁকে স্পষ্টত রাক্ষসদের নেতা বলে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে এই আর্যদেবতার চরিত্রে কিছু অনার্য বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছিল। স্কন্দযাগ ছাড়াও মৃচ্ছকটিক এবং কথাসরিৎসাগরের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় কুমার কার্ত্তিকেয় স্বয়ং একটি মাত্রায় ধূর্ত — চোর এবং দুর্বৃত্তদের আরাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত — আজও গ্রামবাংলার সমাজে কার্তিকপুজোর রাতে চুরির আধিক্যের মধ্যে তাঁর চরিত্রের বৈপরীত্য স্বীকৃত।

সূত্র-নির্দেশ

১। T. G. Aravamuthan, *'Gods of Harappa', Journal of the Bihar Research Society,* ১৯৪৮.

২। সুকুমার সেন *'Indian Sraosha and Indian Skanda Indo Iranica,* Vol IV, No I, জুলাই ১৯৫০

৩। *ঋগ্বেদ* ঃ ১.২৭.৭, ১.৫৯.৫, ৪.৪.৪, ৬.৮.৫, ৮.৪৩.২১, ৮.৭৩.৮

৪। তদেব ৫.২

৫। তদেব ১.৩১.২

৬। তদেব ১.৯২.২

৭। তদেব ১.৬৫.১, ১.৬৫.২, ১.৬৭.৩, ১.৬৭.৪

৮। তদেব ২.৩৩ ১২

৯। তদেব ৩.৩ ১০, ১০.৫১.৩

১০। তদেব ৩.১.২৩, ১ ৬৪ ৪

১১। তদেব ১০.১৬২

১২। *ঋগ্বেদ* ১০.৮৭.১ *অথর্ববেদ* ৫.২৯

১৩। *ঋগ্বেদ* ১.১১৪.৭-৮, ২.৩৩.১

১৪। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৬.১.৩.১-২০

১৫। *ঋগ্বেদ* ১০.১.২

১৬। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৬.২.১.৫

১৭। *মহাভারত* ১৩.৮৬.১৫.২৫

১৮। *পাবস্কর গৃহ্যসূত্র* ১.১৬ ২৪

১৯। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* ১.১৪.৩

২০। *ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৭ ২৬ ২

২১। আরণ্যকপর্ব, অধ্যায় ২১৩-২২১,' শল্যপর্ব অধ্যায় ৪৩-৪৫, অনুশাসনপর্ব' অধ্যায় ৮৩, ৮৪, ৮৬

২২। আদিপর্ব ১.১৩৬.১৩ (মহাভারত)

আগ্নেয় ঃ কৃত্তিকাপুত্রো রৌদ্রো গাঙ্গেয় ইত্যপি শ্রূয়তে ভগবান দেব ঃ সর্বগুহ্যাময়ো গুহঃ।

শল্যপর্ব ৯.৪৬.৯৮ ৯৯ (মহাভারত)

কেচিদনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসূতম প্রভুং।

সনৎকুমারং সর্বেষং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজং।।

কেচিন মহেশ্বরসূতং কেচিতপুত্রং বিভাবসোঃ

উমায়ঃ কৃত্তিকানাং চ গঙ্গায়াশ্চ বদুন্ত্যত।।

২৩) *মহাভারত* ৩.২১৩-২২১

২৪) বনপর্বে কেবল মহিষাসুরের উল্লেখ আছে; অনুশাসনপর্বে উল্লেখ শুধু তারকাসুরের, দুই অসুরেরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে শল্যপর্বে।

২৫) *বায়ুপরাণ* ৭২ ২০-৫০

২৬) *অর্থশাস্ত্র* ২.৪.১৭

২৭) কথাসরিৎসাগর ৯.৫.১৭৪

ভারতীয় আর্যদের বিবাহ বৈশিষ্ট্য ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন

চিরকিশোর ভাদুড়ি

বিবাহ মানব সমাজে প্রচলিত একটি সুপ্রাচীন প্রথা। Westermarck তাঁর History of[১] Human Marriage গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বেদে বিবাহ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়নি। সেইজন্যে এই ব্যাপারে তথ্যাদি সংগ্রহ করবার কারণে বেদ পরবর্তী সাহিত্য অথবা স্মৃতিশাস্ত্র কিংবা পুরাণের ওপরে নির্ভর করতে হয়। মনুসংহিতা খুবই প্রামাণ্য গ্রন্থ অবশ্য আর্যদের বিবাহের নানা উদাহরণ মহাকাব্য গুলিও সরবরাহ করেছে।

[২]মনু বলেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে বিবাহ করবেন। বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবেন।

[৩]মনুর বিধান বিবাহযোগ্য কন্যা পাত্রের মাতৃকুলের সপিন্ড হবেন না এবং তার পিতৃকুলের পরিবারভুক্ত হবেন না।

একজন দ্বিজ স্ববর্ণে বিবাহ করবেন [৪]তিনি ইচ্ছা করলে পরবর্তী নিম্নবর্ণ থেকেও কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়া পত্নী প্রথমার সম মর্যাদা সম্পন্ন হবেন না। [৫]মনু ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে শূদ্র কন্যা বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রতিলোম এবং অনুলোম এই দুই ধরনের বিবাহেই স্মৃতিকারদের আপত্তি ছিল।[৫ক]

[৬]মনুর বিধান, বিবাহযোগ্য কন্যা সুরূপা, সুকেশী এবং শারীরিক ক্রটিহীনা হবেন।

কোন অসুস্থ, পারিবারিক পরিচয়হীনা অথবা ভ্রাতৃহীন মেয়েকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সকলকে মনু[৭] অনুরোধ করেছেন।

[৮]তিনি আরও বলেছেন, যে মেয়ের পরিবারে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান মান্য করা হয় না অথবা যে মেয়ে কোন সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে, এমন কোন মেয়েকেও কারুর বিবাহ করা উচিৎ নয়।

[৯]মনুর মতে, পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী স্ববর্ণে বিবাহ অনুষ্ঠানে পালন করা হবে। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যখন কোন ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করবেন সেইক্ষেত্রে ঐ ক্ষত্রিয় মেয়েটি

বিবাহ চলাকালে, হাতে একটি তীর ধারণ করবেন, পাত্রী যদি কোন বৈশ্য কন্যা হন, তাহলে তিনি একটি বেত্রদন্ড হাতে করে দাঁড়াবেন, আর পাত্রী যদি শূদ্র কন্যা হন, তাহলে তিনি স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রের কোন একটি অংশ ধারণ করে থাকবেন।

ডঃ [১০]কর্নেট মনে করেন, ভারতীয় আর্যদের বিবাহে অভিন্ন বর্ণ (idendity of Caste) এবং গোত্রভেদ (difference of *gotra*) হচ্ছে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

বিবাহ সংস্কৃত শব্দ। এই শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে বিবাহ করবার পরে স্বামী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, আহার এবং পরিধেয়র পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যেহেতু স্ত্রীকে স্বামীর হাতে সম্প্রদান করা হয়, সেইহেতু মনে করা হয়ে থাকে স্ত্রীর ওপরে তাঁর সার্বভৌম অধিকার বর্তে গিয়েছে। এইজন্যই স্বামীর আর এক নাম ভর্তা বা পালক। অবশ্য ঐ অধিকার বলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দিতে পারেন না অথবা হত্যা করতে পারেন না, তার জন্যে শাস্ত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে আর্যদের বিবাহের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হোল। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে আর্য বিবাহ আট ভাগে বিভক্ত (১) আর্য, (২) দৈব, (৩) ব্রাহ্ম, (৪) গন্ধর্ব, (৫) পাজানাত্য, (৬) আসুর, (৭) রাক্ষস, এবং (৮) পৈশাচ। পৃথিবীর আর কোন প্রাচীন সভ্য দেশে বা আর্য অধিকৃত অন্য দেশে এত রকম বিবাহ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়নি।

অবশ্য উল্লিখিত আট রকমের বিবাহ প্রথার একত্র সহাবস্থানের উল্লেখ বেদ অথবা অন্য কোন পরবর্তী সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। বেদে কিংবা পরবর্তী সাহিত্যে যে যে বিবাহ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। যেমন ঋগবেদে[১১] বলা হয়েছে, বিমদ তাঁর প্রেমিকাকে তার বাড়ী থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে এনে বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং এইটিকে রাক্ষস[১২] বিবাহ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমানকালে আমাদের বিবাহের যে দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য -- পাণি গ্রহণ এবং সপ্তপদী, যেই দুইটি যে আদি বৈদিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। ঋগবেদের বিবাহ সুক্ত (১০৮৫) পড়ে আমরা তার প্রমাণ পাই। অবশ্য [১২]Westermarck মনে করেন পাণি গ্রহণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন আর্য জাতির বিবাহে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। [১৪]ঋগবেদে যম-যমীর উপাখ্যান পড়ে আমরা মনে করতে পারি ঐ যুগে গন্ধর্ব বিবাহ হয়ত প্রচলিত ছিল। ঋগবেদের বিবাহ সুক্তে সেই যুগের ভারতীয় আর্যদের বিবাহ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। [১৫]বিবাহ সুক্তে সেই যুগে আর্য বিবাহে যৌতুক প্রথা প্রচলিত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগবেদে একটি বিচিত্র বিবাহের উল্লেখ আমরা পাই। সেটি হল রাজা পুরুরবা এবং অপ্সরা উর্বশীর বিবাহ। কতকগুলি শর্ত মেনে নিয়ে পুরুরবা উর্বশীকে বিবাহ করেছিলেন

এবং বিবাহের অনেকদিন পরে (সন্তানদি হওয়ার পরে) সামান্য একটি শর্ত অমান্য করার অজুহাতে উর্বশী বিবাহ ভঙ্গ করে প্রস্থান করেন। এই বিবাহকে চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ বা Contractual form of marriage হিসেবে [১৬]পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন। এই ধরনের চুক্তি বিবাহের উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যবতী এবং কুরুরাজ শান্তনু অথবা রাজা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা অথবা শান্তনু এবং গঙ্গা দেবীর বিবাহে মহাভারতে উল্লিখিত বিবাহগুলি বর্ণিত হয়েছে। রাজকীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এই বিবাহ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ তাঁরা বহুবিবাহে বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন। কোন কোন [১৭]পণ্ডিত এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ঋগবেদের যুগে বিবাহ সুদৃঢ় ভিত্তিক ছিল। উর্বশী পুরুরবার বিবাহ বিস্তৃতভাবে [১৮]ব্রহ্মা এবং বায়ু[১৯] পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঋগবেদের দশম মন্ডলে (১০.৯৫) রাজা পুরুরবা এবং উর্বশীর মধ্যেকার এই বিবাহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং বিবাহ ভঙ্গে তাঁর হাহাকার হৃদয় স্পর্শ করে। উল্লেখ্য, এই ধরনের বিবাহ স্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত অনুসারে ভঙ্গ হয়ে যেত।

আরও একটি বিচিত্র বিবাহ প্রণালীর সন্ধান আমরা প্রাচীন শাস্ত্রে পাই। স্বয়ম্বর নামক ঐ বিবাহ প্রথা শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। এই ধরনের বিবাহে রাজকন্যার পিতা বিভিন্ন দেশের রাজাদের তাঁর গৃহে আসবার আমন্ত্রণ জানাতেন। সমবেত ঐ রাজাদের মধ্য থেকে রাজকন্যা তাঁর পছন্দমত রাজাকে স্বামীত্বে বরণ করতেন। সুতরাং এই ধরনের বিবাহে স্বামী নির্বাচনে ক্ষত্রিয় রাজকন্যার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ছিল। [২০]মহাভারত পড়ে আমরা জানতে পারি রাজকন্যা দময়ন্তী স্বয়ম্বর সভা থেকে তাঁর স্বামী হিসেবে রাজা নলকে বেছে নিয়েছিলেন। [২১]কুন্তীভোজ রাজার পালিতা কন্যা কুন্তী এই একই প্রক্রিয়ায় কুরুরাজ পান্ডুকে স্বামীকে বরণ করেছিলেন।

প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্যদের বিবাহে বিচ্ছেদের কোন স্থান ছিল না। বিবাহকে তাঁরা পবিত্র সংস্কার বলে মেনে চলতেন। প্রাচীন শাস্ত্রে এমন বহু উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যেখানে আমরা দেখি অবস্থার বিপাকে স্বামী স্ত্রী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদিন কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁদের বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাঁরা পরে পুনর্মিলিত হয়েছেন। মহাভারতে এবং পুরাণে এই রকম কতকগুলি উদাহরণের সম্মুখীন আমরা হই। প্রাচীন কালে আর্যদের মধ্যে এক বিবাহ যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি বহুবিবাহও প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে মেয়েদের একটু বেশী বয়সে বিবাহ হত, তবে কমবয়সে মেয়েদের বিবাহের উদাহরণও বেদে পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েরা অবিবাহিতাও থেকে গিয়েছেন। [২২]মহাভারত পড়ে আমরা জানতে পারি অবিবাহিতা মেয়েরা পিতৃগৃহে খুব ভালভাবে লেখাপড়া শিখতেন। বিশেষ করে রাজা দুষ্মন্তর রাজসভায় শকুন্তলা যে সব কথাবার্তা বলেছিলেন, তা থেকে এই যুক্তির স্বপক্ষে ইতিবাচক

সাড়া পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিবাহ বৈশিষ্ট্য উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করে বলা যাবে। [২৩]রামায়ণ পড়ে আমরা জানতে পারছি, রাজা দশরথ-পুত্রগণ একটি করে বিবাহ করেছিলেন। মহাভারতেও এক বিবাহের অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। যেমন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র[২৪] গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেছিলেন। ঋষি অগস্ত্য[২৫] ঋচিক[২৬] চ্যবন[২৭] প্রমুখ একটি করে বিবাহ করেছিলেন। উল্লিখিত ঋষিরা প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদের বিবাহ করেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে প্রাচীনকালে অনুলোম বিবাহ নিন্দনীয় হলেও প্রেমজ বিবাহে কিংবা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে এই বিবাহে সমাজ সহনশীল ছিল। মহাকাব্য এবং পুরাণে[২৮] বলা হয়েছে রাজা যযাতি অসুর গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন। এটি প্রতিলোম বিবাহ। মহাভারত[২৯] পড়ে আমরা আরও জানতে পারি মধ্যম পান্ডব ভীম অনার্য কন্যা হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন, তৃতীয় পান্ডব অর্জুন[৩০] বিবাহ করেছিলেন নাগকন্যা উলুপীকে।

এতক্ষণ ধরে ওপরে আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি প্রাচীন আর্যদের বিবাহ প্রক্রিয়া নানা বৈচিত্র্য মিশ্রিত ছিল, কিন্তু একটি সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা বন্ধনে বাঁধা ছিল। স্মৃতিকারেরা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেছেন এই বিবাহ ধারা যেন নিষ্কলুষ এবং সুসংবদ্ধ থাকে, কিন্তু যুগে যুগে রাজশক্তি নিজ প্রয়োজনে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী পথেও চলাফেরা করেছেন। ঋগবেদে[৩১] বিবাহ সুক্তে বিবাহ চলাকালীন পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বামী নব বিবাহিতা স্ত্রীর সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন। নব বিবাহিতা বধূ যে এক সুখী, বিশাল যৌথ পরিবারে কর্ত্রী হতে চলেছেন, এই বিবাহ[৩২] সুক্তে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ [৩২]মনুপরবর্তীকালে এই সুপারিশ করেছেন, নারী জীবনের বিভিন্ন পর্বে যথাক্রমে পিতা, স্বামী এবং পুত্রের ওপরে নির্ভরশীল থাকবে তার আর্থিক স্বাধীনতা তাঁর মতে অনভিপ্রেত। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ভারতীয় বিবাহে বিচ্ছেদের কোন স্থান ছিল না। [৩৩]রামায়ণ পড়ে আমরা জানতে পারি, অযোধ্যা রাজ রামচন্দ্র তাঁর ধর্মপত্নী সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আবার কিছুদিন পরে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। মুনি গৌতম[৩৪] নিজের স্ত্রী অহল্যাকে ভ্রষ্টাচারের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কয়েক বছর পরে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ব্রহ্ম[৩৫] পুরাণে বলা হয়েছে, অত্রি মুনির পুত্র সোম বৃহস্পতি মুনির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করেছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে তাবাকে তিনি স্বামী গৃহে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। বরাহ [৩৬]পুরাণে আমরা পড়েছি কোশল রাজপুত্র প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করে কোন কারণে তাঁর ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রাচীন আর্যদের বিবাহ প্রথার বৈশিষ্ট্য স্মৃতিকারদের অনুশাসন তথা বেদ ও পরবর্তী সাহিত্যে

কিভাবে শৃঙ্খলা ভিত্তিক রূপ পেয়েছিল আলোচ্য প্রবন্ধে তারই একটি রূপরেখা টানবার চেষ্টা করা হোল। পরিশেষে উর্বশী-পুরুরবার বিবাহ প্রসঙ্গে কোন কোন পন্ডিত পুরুরবাকে প্রকৃতই রাজকীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেনে নিতে চাননি বরঞ্চ তাঁকে অর্ধ-পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় আর্য রাজাদের যে বংশপঞ্জী মহাকাব্য এবং পুরাণে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং যাস্ক তাঁর নিরক্ত গন্থে উর্বশী পুরুরবার প্রেমোপখ্যান নিয়ে যে আলোচনা করেছেন। তাতে করে পুরুরবার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, উপরন্তু উর্বশীর সঙ্গে তাঁর তথাকথিত সম্পর্ককে একটি উপকথা বলে মনে হয়। যাই হোক, এই রকম চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। যখন মহাকাব্যের এবং পৌরাণিক যুগেও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে তখন মেনে নিতেই হবে এই ধরনের বিবাহ প্রাচীন ভারতে যুগে যুগে অনুষ্ঠিত হয়েছে অবশ্য এই যুক্তিও দেখান হয়ে থাকে যে উর্বশী যেহেতু অপ্সরা, অতএব তিনি মানবিক বিবাহ শর্তাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন না। যাই হোক, উর্বশী পুরুরবা এবং পরবর্তী মহাকাব্যের যুগে শান্তনু সত্যবতী অথবা শান্তনু - গঙ্গার বিবাহ কাহিনী সত্যসন্ধিৎসু গবেষকদের মনে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। Westermarck.E – *The History of Human Marriage*, Landon - 1901, Ch I and III. PP 8-24 and PP 39-50.

২। Manava Dharsna Sãstra (Jolley I. Ed) London 1887.III.4

৩। *usapinda cayã cayã mãtur, a sagotra cayã pitur* - Ibid III 5

৪। Ibid III 12-13.

৫। Ibid III.14

৬। Ibid III.10

৭। Ibid III.II

৮। Ibid III.7

৯। Ibid III.43-44

১০। "The Normal conditions of marriage for the three higher Castes were identity of caste and differnce of *gotra*, that is to say a caste was sub divided into a number of groups or *gotras*, each of which was supposed tobe descended from a mythical or semi - mythical person, usually a *rise* or legendary saint and a man normally took for wife a girl belonging to a *gotra* other than his own but forming a part of the same caste."

১১। Barmet H. D., *Antiequliteis of india* - Calcutta, 1964. P 164.

১২। ঋগবেদ, ১.১১২.১৯, ১১৬.১, ১১৭.২০ প্রমুখ।

১৩। Mackdonel and keith (Ed), *The Vedie index of names and Subjects* Vol 1, London 1912. P483.

১৪। Westermarck E, *Early bileifs and their social influnce*, London 1932, Ch IX, PP 131-32.

১৫। *ঋগবেদ*, ১০.১০

১৬। তদেব, ১০.৮৫.১৩

১৭। Sastri H. C, T*he social Back ground of the forms of Marriages in Ancient India*, Ch III PP 143-44.

১৮। Ibid, PP 138-39

১৯। তর্করত্ন পঞ্চানন সম্পাদিত, *ব্রহ্মপুরাণ*, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা ১০.১.৯, ১০১ তম অধ্যায়।

২০। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, *বায়ুপুরাণ*, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, ৯১তম অধ্যায়।

২১। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ (সম্পাদিত), মহাভারত, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, বনপর্ব, ৪৭.২৫-২৮।

২২। তদেব, ১.১০৬.৯,

২৩। তদেব, ১.৮৮ তম অধ্যায়।

২৪। গৌড়ীয় সংস্করণ কলকাতা, রামায়ণ ৭৩ তম, ৭৫ তম সর্গ।

২৫। *মহাভারত*, ১.১০৪ তম অধ্যায়।

২৬। তদেব, বনপর্ব, ১-৮-২৬ তদেব বনপর্ব

২৭। তদেব, বনপর্ব, ৮১.১-৮।

২৮। তদেব, বনপর্ব, ৯৬-২১-২৯।

২৯। তদেব, বনপর্ব, ১০১.৩৬-৩৮. ৪৮-৫১ ইত্যাদি।

৩০। তদেব, ১.৬৯ তম অধ্যায়।

৩১। *মহাভারত*, ১.১৪৯ তম অধ্যায়।

৩২। *ঋগবেদ*, ১০.৮৫.৩৬।৩২। তদেব, ১০.৮৫.২৬, ৪৩,৪৬।

৩৩। *মানব ধর্মশাস্ত্র* ৫।১৪৮ ও ৯।৩।

৩৪। *রামায়ণ*, উত্তরাকান্ড ৫০ তম সর্গ।

৩৫। *রামায়ণ*, ১.৪৯ ও ৫০ তম সর্গ।

৩৬। *ব্রহ্মপুরাণ*, ৯ম অধ্যায় ৩৭, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত) ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, বরাহপুরাণ ১২৬ তম অধ্যায়।

লৌকিক দেবীপূজা ঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

দূর্ব্বা আইন দাস

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ আদি মধ্যযুগের রচনা। নারদ ও নারায়ণের কথোপকথনের মাধ্যমে এই গ্রন্থের গ্রন্থনা[১]। এই পুরাণে বেশ কয়েকজন দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, তুলসী, স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা, ষষ্ঠী, মঙ্গল-চন্ডী, মনসা, সুরভি, রাধা, দুর্গা ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন এককভাবে আরাধ্যা, কয়েকজন যজ্ঞাদি বিভিন্ন পূজা পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। আলোচ্য পুরাণটিতে এঁদের উৎপত্তি, কার্যকারিতা ও ক্ষেত্রবিশেষে পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। দৈনন্দিন পূজার্চনার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন লৌকিক দেবী এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

পুরাণে উল্লিখিত পূজা-পদ্ধতি, রীতির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কিছু আচার ছিল বিশেষভাবে গার্হস্থ্য জীবনে অন্তঃপুরবাসিনীদের অবশ্য পালনীয়। যজ্ঞাহ্নিক এর সাথে জড়িত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পূজা-পদ্ধতি, রীতির সংজ্ঞারূপে নারীর ভাবমূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'স্বাহা'[২], 'স্বধা'[৩], 'দক্ষিণা'[৪]। সকল কাজে হবির্দ্দান বিষয়ে স্বাহা, পিতৃগণের দানের ক্ষেত্রে স্বধা এবং অন্যান্য কাজে দক্ষিণাই প্রধান। কথিত আছে যে সৃষ্টির আগে দেবতাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হবি দেবগণের আহার্য্য হিসাবে স্থির করে দেন। তাতে কিছু অসুবিধা দেখা দিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রকৃতির পূজা করলে সর্বশক্তি রূপিনী প্রকৃতি দেবী, দাহিকা শক্তিরূপে অগ্নির স্ত্রী স্বাহা নামে পরিচিতা হলেন। তিনি এই বর দেন যে, যে ব্যক্তি মন্ত্রের শেষে স্বাহা উচ্চারণ করবেন তাঁর হবি দেবতাগণ গ্রহণ করবেন। তখন থেকে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' উচ্চারিত হলে সকল অভিলষিত ফললাভ হয়।

সৃষ্টির আগে ব্রহ্মা পিতৃচতুষ্টয় ও তেজঃস্বরূপী পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করেন। এই সাতজনের আহার্য নির্ধারণ করেন ব্রহ্মা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বস্তু ও তর্পণ। কিন্তু পিতৃগণ আহায পেতে ব্যর্থ হলে ব্রহ্মা নিজের মন থেকে স্বধা নামের এক কন্যা সৃষ্টি করেন। এঁকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করেন ও ব্রাহ্মণগণকে নির্দেশ দেন মন্ত্রের শেষে স্বধা শব্দ উচ্চারণ করে পিতৃদান করতে। সেই থেকে এই প্রথা প্রচলিত।

স্বাহা, স্বধার মতই আর এক দেবী দক্ষিণা। শ্রীরাধা তাঁর সখী সুশীলাকে অভিশাপ দেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন পুণ্যে এই সুশীলা দক্ষিণারূপে খ্যাতি পান। পরে শ্রীকৃষ্ণ

দক্ষিণাকে ব্রহ্মার হাতে ও ব্রহ্মা যজ্ঞের হাতে তাঁকে সমর্পণ করেন সৎ কর্মসমূহের সম্পূর্ণতার জন্য। দক্ষিণা সৎ কর্মসমূহের ফলদায়িনী। তাই যে কোন যজ্ঞে বা পূজায় দক্ষিণা প্রদান অবশ্য কর্তব্য।

তুলসী[৫] ছিলেন ধর্মধ্বজরাজ ও মাধবীর কন্যা। অপরূপ রূপ লাবণ্যের অধিকারিণী এই নারীর তুল্য কোন কিছু না পাওয়াতে এঁর নাম হয় তুলসী। পূর্ব্বজন্মে ইনি গোলকের রাধিকার সখী ছিলেন। এক সময়ে রাধা তাঁকে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত দেখে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপেই তাঁর রাজকন্যা রূপে জন্ম হয়। এই জন্মে তাঁর সঙ্গে শঙ্খচূড় নামক দৈত্যের বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের অত্যাচারে পর্যুদস্ত দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ শঙ্খচূড় রূপে তুলসীর সতীত্ব হানি করেন, কারণ তাঁর এই বর ছিল যে পত্নীর সতীত্ব নাস না হলে তাঁর মৃত্যু হবে না। এরপর শ্রীকৃষ্ণ তুলসীকে বর দেন এবং সেই থেকে তুলসী গন্ডকীনামে প্রসিদ্ধ পবিত্র নদী এবং তুলসী নামক পবিত্র বৃক্ষ। তুলসী সকল পুষ্প ও পত্রের মধ্যে পূজোর শ্রেষ্ঠ উপচার এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয়। শুধু তাই নয়, তুলসী পুণ্যদায়িনী। তাই মৃত্যুর সময় তুলসীর জল পেলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে ঠাঁই পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই শালগ্রাম থেকে তুলসীপত্র পৃথক করা অন্যায়। শুধু তাই নয়। প্রকৃত জ্ঞানী শালগ্রাম, তুলসী ও শঙ্খচূড়কে পৃথক করেন না। উপরে বর্ণিত চার দেবীর ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় — চার জনেরই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। কিছু প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রথম তিনদেবী সৃষ্টি হয়েছেন। শঙ্খচূড়কে হত্যার জন্য তুলসী সৃষ্ট হয়েছেন, বা বলা ভাল ব্যবহৃত হয়েছেন — অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই দেবীদের কার্যকারিতা দেবগণের সৃষ্ট। আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য যে দক্ষিণা ও তুলসীর ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের স্পর্শে তাঁরা পবিত্রতার অধিকারিণী হন। অর্থাৎ সতীত্বের তৎকালীন প্রচলিত ধারণা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই দেবীরা দেব বা ব্রাহ্মণ দ্বারা সতীত্ব হানি হওয়া সত্ত্বেও মাঙ্গলিক রূপে স্বীকৃতি পেলেন।

তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন — 'মঙ্গলচন্ডী'[৬], সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর পতি মনুষ্যরাজ মঙ্গলের অভীষ্টদায়িনী ও আরাধ্যা এই দেবী। বিষ্ণুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধের জন্য মঙ্গলচন্ডীর পূজা করেছিলেন। মঙ্গলবার দেবীর পূজার সময়। প্রথমে তিনি মহাদেবের দ্বারা, দ্বিতীয়বারে মঙ্গলগ্রহের দ্বারা, তৃতীয়বারে মঙ্গল রাজার দ্বারা, চতুর্থবারে রমনীগণ দ্বারা ও পঞ্চমবারে মঙ্গলাকাঙ্খী মানুষের দ্বারা পূজিতা হন।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র পত্নী ষষ্ঠীদেবী[৭]। প্রিয়ব্রত রাজার মৃত পুত্র সন্তানকে পুনর্জীবন দান করেন তিনি। তাঁরই কথামত রাজা প্রতিমাসে শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজার প্রচলন করেন। সেই থেকে পুত্রের (সন্তানের) কল্যাণের জন্য ষষ্ঠীদেবীর

পূজার প্রচলন হয়। শুধু তাই নয়, জন্মবন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীও সন্তানবতী হয় ষষ্ঠীদেবীর দয়ায়।

কশ্যপমুনির মন থেকে উৎপন্না মনসাদেবী[৮] একদিকে শৈবা ও অন্যদিকে বৈষ্ণবী। তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী ও আস্তিক মুনির মাতা। জন্মেঞ্জয় রাজার সর্পযজ্ঞে তিনি সাপেদের জীবন বাঁচান। তাই তিনি নাগেশ্বরী। তাঁর দ্বাদশ নামের সাহায্যে সকল সর্পভয় থেকে মুক্ত থাকা যায়। সর্পভয় থেকে মুক্তির জন্য কশ্যপ মুনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন মনসা ছিলেন তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কৃষ্ণ, মহাদেব ও কশ্যপ তাঁর পূজা করেন। তখন থেকে দেব, মনু, মুনি, নাগ ও মানব সকলেই তাঁর পূজা শুরু করেন।

মঙ্গলচন্ডী, ষষ্ঠী, মনসা কিন্তু পূর্বোক্ত দেবীদের মতো নিষ্ক্রিয় নন। আদি মধ্যযুগের বঙ্গে প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও তার সঙ্গে এই অঞ্চলে মধ্যযুগে প্রচলিত চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিন দেবীই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সক্রিয় — ষষ্ঠী সন্তানাদির ক্ষেত্রে, মনসা সর্পজাত বিপদের ক্ষেত্রে এবং মঙ্গলচন্ডী সার্বিক মঙ্গলের প্রশ্নে। বলা যেতে পারে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা জনিত ব্যাপারে এঁদের কার্যকারিতা দেখা যায়। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়—মঙ্গলচন্ডী ও ষষ্ঠী পরবর্তীকালে একইরূপে বর্তমান থাকলেও মনসার ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচকতার আর্বিভাব[৯] হয় যা আলোচ্য পুরাণে অনুপস্থিত।

দেবীদের কার্যকারিতার ক্ষেত্র-বিশেষ প্রসঙ্গে দেবী সুরভির[১০] কথা উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন গোগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি গোলোকে উৎপন্না হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ পরিবৃতা রাধার সঙ্গে বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করছিলেন। তখন দুগ্ধ পানের ইচ্ছা হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা দ্বারা বামদিক থেকে দুগ্ধবতী মনোহারিণী সবৎসা সুরভি ধেনুকে সৃষ্টি করেন। সুরভি থেকে লক্ষকোটি কামধেনুর উৎপত্তি হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিন শ্রীকৃষ্ণের কথা মত সুরভির পূজা হয়।

মনসা ও সুরভি দেবীদ্বয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয়েই একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে প্রধানা; যেমন মনসার সঙ্গে ওঝাদের এবং দেবী সুরভির সঙ্গে গোপালক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

আলোচিত প্রত্যেক দেবীই মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে বা জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্তা। দেবী পূজার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব প্রয়োজন পূরণ। আধ্যাত্মিক উত্তরণ অপেক্ষা পার্থিব প্রয়োজন মেটানই প্রধান। এই ক্ষেত্রে একদিকে মঙ্গলকাব্য ও অন্যদিকে বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে পৌরাণিক ধর্মাচরণের সাদৃশ্য দেখা যায়[১১]। বেদ — উপনিষদ — পুরাণ এইভাবে স্তরবিন্যাস করলে তাই সহজেই ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে একটি গতিশীলতা / পরিবর্তনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁদের ওপর মনুষ্যত্ব আরোপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মতই কাম, ক্রোধ, হিংসা তাঁদের মধ্যে রয়েছে। এখানে দেবীর রূপ শান্ত, সমাহিতা, সর্বংসহা নয়; রাধা, মনসা, চন্ডী এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

আলোচিত দেবীদের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ধারার অস্তিত্ব দেখা যায়। স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা বৈদিক পূজা-পদ্ধতি ও যাগযজ্ঞের সঙ্গে যুক্তা। তুলসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষ্ণুর সঙ্গে। মঙ্গলচন্ডী ষষ্ঠী ও মনসা কিন্তু লৌকিক স্তর থেকে উৎপন্না এবং সম্ভবত প্রাক্ বৈদিক কাল থেকেই এঁদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বৈদিক ভাবধারা সম্পন্ন ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বাংলা বহুদিনই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ফলে বাংলায় গড়ে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, বৈদিক ধারণার বাইরে থাকা এক স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত তিনদেবীর সৃষ্টি বলে মনে হয়। এঁদের কিন্তু কখনও কোনও বৈদিক দেবতার সঙ্গিনী বা অনুগামিনী হিসাবে দেখান হয় না। এঁরা স্বয়ং সম্পূর্ণা। তবে মনসাকে কখনও কখনও শিবের সঙ্গে যুক্তা করা হয়। যদিও তা অনেক পরবর্তীকালীন প্রয়াস। ক্রমশ বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে এঁরাও সম্পৃক্তা হয়ে ওঠেন এবং বৈদিক দেবীদের সঙ্গে সমাসনে অধিষ্ঠিতা হন। তবে এঁরা ছিলেন মানুষের অনেক কাছাকাছি। জনগণের দৈনন্দিন জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ ছিল এঁদের কার্যকারিতার ক্ষেত্র। তাই এঁরাই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতকে মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসা, চন্ডী ইত্যাদি দেবীদের প্রাধান্য। শুধু তাই নয়, ব্রতকথা, পাঁচালী, মহিলাদের পালনীয় পূজার মধ্যেও এই দেবীদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জনজীবনের খুব কাছাকাছি থাকার জন্যই এঁদের প্রাধান্য ধারাবাহিকভাবে বলবতী হয়ে উঠতে থাকে। উপরোক্ত দেবীদের মধ্যে চারজন নিষ্ক্রিয়; দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট, দেবতাদের দ্বারা পূজিতা[১২] ও পরে মানুষের দ্বারা পূজিতা। তবে যুগধর্ম অনুযায়ী সব ক্ষেত্রেই পূজা-পদ্ধতির মধ্যে ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, ধর্মের বিষয়টি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, ধ্রুপদী নয়, পারিপার্শ্বিক জীবনের লৌকিক স্তর খুব বেশী করে এর মধ্যে প্রতীয়মান। মাটির কাছাকাছি লৌকিক স্তরের দেবীরূপ পাওয়া যাচ্ছে। আদি মধ্যযুগের বঙ্গে এই ব্যাপারটি স্বাভাবিক। বাংলায় চিরদিন একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধর্মীয় আচার-আচরণের স্বতন্ত্র বাতাবরণ ছিল যা মধ্যযুগে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বঙ্গে অনেক পরে প্রবেশ করেছে। এই অঞ্চল আদিকাল থেকে প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। আবার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর অববাহিকা জুড়ে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত আরণ্যক অঞ্চল নানা উপজাতীয় গোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল। এদের মধ্যে লৌকিক স্তরের ধর্মভাবনা, রীতি-নীতি যা প্রচলিত ছিল তার কিছু কিছু পরবর্তীকালে নবাগত

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়। দেবীপূজার প্রাধান্য সম্ভবত এই ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা থেকে উৎপন্ন। ধর্মীয় বিভিন্নতার চিহ্ন আদি মধ্যযুগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় — বৌদ্ধ, জৈন, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য একই সাথে অবস্থান করেছে যে তাই-ই নয়; এই এক একটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে যাদের আচার প্রণালী ও পূজাবিধি ধ্রুপদী সংস্কৃতির থেকে অনেকটাই পৃথক। এই বিধি ও বিশ্বাস সজীব। স্বতঃস্ফূর্ত এক জীবনযাত্রার পরিচয় বহন করে।

সূত্র-নির্দেশ

১। আচার্য শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,* কলকাতা, ১৩৯১ সন।

২। তদেব, ১৬২-১৬৪

৩। তদেব, ১৬৪-১৬৬

৪। তদেব, ১৬৬-১৬৮

৫। তদেব, ৯৯-১২৩

৬। তদেব, ১৭১-১৭২

৭। তদেব, ১৬৯-১৭১

৮। তদেব, ১৭৩-১৭৭

৯। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে দেখা যায় চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজালাভের আসায় মনসা বিভিন্ন অন্যায় কাজও করেছিলেন; কারণ চাঁদের দ্বারা পূজিতা হলে তবেই তাঁর পূজার প্রচার ঘটত পৃথিবীতে।

১০। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,* ১৭৭-১৭৮

১১। রমেশ চন্দ্র দত্ত, *ঋগ্বেদ সংহিতা,* ১৯৭৬, ১৯৯৩ (জুন), কলকাতা, পৃঃ৭৫

১২। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা যথাক্রমে মহাদেব ও হরির দ্বারা পূজিতা হন (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পৃঃ ১৭১ ও ১৭৩)

মথুরা শৈলীর বুদ্ধমূর্তি ঃ সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত

গৌরীশংকর দে

মথুরা ভারতের অন্যতম প্রাচীন নগর। রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, দীপবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে মথুরা ভারতের সাতটি প্রাচীন নগরের অন্যতম ছিল। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' থেকে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ প্রায়ই মথুরায় যেতেন। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্ম মথুরায় বিস্তার লাভ করে। সম্রাট অশোকের সময়ে এই নগরের 'নটবর বিহারে' উপগুপ্ত আমন্ত্রিত হন। খ্রিঃ চতুর্থ শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এখানে বহু বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের অনেকগুলি বাণিজ্যপথের মিলনবিন্দু ছিল মথুরা; তাছাড়া, ধর্ম ও শিল্প চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত মথুরার ভাস্কর্যস্রোত ছিল অব্যাহত।

কুশাণদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল তিনটি — উত্তর আফগানিস্তানে অবস্থিত ব্যাকট্রিয়া, বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত পেশোয়ার (প্রাচীন পুরুষপুর) এবং মথুরা। কুশাণ আমলে তিনটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র। তবে তিনটি কেন্দ্র শিল্প বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ব্যাকট্রিয় শিল্পে গ্রিক চরিত্র প্রধান ছিল পেশোয়ারের গান্ধার শিল্প ছিল গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের মিশ্রণ (greek in form but Indian in spirit ভাস্করের অন্তর ছিল ভারতীয়, কিন্তু তাঁর হাত দুটি ছিল গ্রীক)। আর মথুরার শিল্প ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য নির্ভর। মথুরার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ সম্পূর্ণ ভারতীয়।

মথুরা শৈলীর ভাস্কর্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রথমত, মথুরা শৈলীর ভাস্কর্য ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী[১], ভারহুত ও সাঁচী শিল্প ধারার উত্তরাধিকার। গান্ধার শিল্পের পাশাপাশি স্বাধীন ও সমান্তরাল ভাবে মথুরা শিল্প গড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়ত, সিকরির লাল চুনা পাথর (The spotted red sandstone, usually called the Agra or Sikri red sandstone) এই শিল্পের প্রধান উপকরণ।[২]

কুশাণ যুগ ছিল ভারতীয় শিল্পের এক অসাধারণ সৃজনশীল যুগ। কুশাণ রাজগণের

আমলে, খ্রিঃ প্রথম শতক থেকে খ্রীঃ তৃতীয় শতক অবধি ভাস্কর্য শিল্পের কর্মশালা ও রত্নাগার রূপে মথুরা দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে। মথুরার দক্ষ ভাস্করেরা নির্মাণ করেন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্তি। বৈদিক ধর্ম ছিল প্রতীক আশ্রয়ী। অথচ মানুষের আদলে মূর্তি নির্মাণের বাসনা ও আগ্রহ ভারতীয় শিল্পীদের বরাবরই ছিল। কিন্তু বৈদিক অনুশাসনের প্রভাবে এই নির্মাণস্পৃহা প্রকাশের কোন পথই এতকাল পায়নি। খ্রিঃ প্রথম শতকে এই সুপ্ত ধারা প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করে।[৪] বিভিন্ন ধর্মসংশ্লিষ্ট দেব-দেবীর মানবোপম মূর্তি নির্মাণ করে মথুরা শিল্পীগণ ভারতীয় শিল্পে দিক-পরিবর্তন সূচিত করেন।

কুশাণ যুগে মথুরায় নির্মিত বিভিন্ন মূর্তির বিশেষ চাহিদা ছিল। ভারতের নানা স্থানে এখান থেকে মূর্তি চালান যেতো। মথুরা শৈলীর বিভিন্ন মূর্তি তাই আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের সাঁচী, বিহারের রাজগীর ও পাটনা, উত্তর প্রদেশের সাহেত-মাহেত (প্রাচীন শ্রাবস্তী), পশ্চিমে তক্ষশীলা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে।[৫]

মথুরা শৈলীর কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি বাংলার নানা প্রত্ন-স্থল থেকেও সংগৃহীত হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার মহাস্থান (প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধননগর) থেকে প্রাপ্ত একটি দেবমূর্তি (কার্তিকেয়?)।[৬] মূর্তিটি বলতে দেহকান্ড (forso)। লাল পাথরে তৈরি। উত্তর ২৪-পরগণা জেলায় অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় (খনা-মিহিরের) ঢিপি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি।[৭] এই মূর্তিটিও সাদা ছোপযুক্ত লাল পাথরে তৈরি যা মথুরা শিল্পের অন্যতম পরিচিত লক্ষণ। বর্তমান লেখক একই উপাদানে নির্মিত যুগ্ম সিংহ চন্দ্রকেতুগড় থেকে উদ্ধার করেছেন। গঙ্গা-যমুনা নদীপথে মথুরার সঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ের অবশ্যই যোগাযোগ ছিল। রক্তিম প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলি তার অভ্রান্ত নিদর্শন।

পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে মথুরার ধ্বংসস্তূপ ও ভগ্নাবশেষের আকর্ষণ অসাধারণ। এখানকার একটি ঢিবি থেকে পাওয়া গিয়েছিল কণিষ্কের মস্তকহীন বিখ্যাত ভগ্ন মূর্তিটি। তেমনি মথুরার কাটরা টিলা নামক একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে এক ব্রাহ্মণ একটি প্রস্তর-মূর্তি উদ্ধার করেন। এই মূর্তিটি 'কাটরা বোধিসত্ত্ব' নামে সুপরিচিত।[৮] প্রত্ন-তত্ত্ব সর্বক্ষণের উত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ ভোগেল ১৯০৭-৮ খ্রিষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে মূর্তিটির উল্লেখ করেছেন। এই মূর্তি বর্তমানে মথুরা চিত্রশালায় সংরক্ষিত। মূর্তিটি আনুমানিক ১৩০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। কুশাণ যুগের এক অসাধারণ ভাস্কর্য। সিকরির লাল পাথরে তৈরি সিংহাসনে বোধিসত্ত্ব উপবিষ্ট। মূর্তিটির পাঠপীঠে একটি লিপি আছে। লিপির অক্ষর খ্রিঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লেখমালানুক্রমণী' (পৃঃ৪৮) গ্রন্থে উক্ত লিপি ও তার তর্জমা প্রকাশ করেছেন। লিপিটি হল ঃ

১। বধুরখিতস মাতরে অমোহা — আসিয়ে বোধিসচো পতিঠাপিত

২। সাহা মাতা পিতিহি — সাকে বিহারে

৩। সবসত্তানা হিতসু খায়ে

লিপিটির তর্জমা হল ঃ

"বুদ্ধরক্ষিতের মাতা তামোহাআসি এই বোধিসত্ত্বমূর্তি তাঁর মাতাপিতার সঙ্গে নিজের বিহারে (মন্দিরে) সর্বসত্ত্বের হিতসুখের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা করলেন।"[৯]

কাটরা টিলার মূর্তিটি যোগী মূর্তি। দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রায় উন্নত। বাম হস্ত জানুর ওপর ন্যস্ত। ডান কাঁধে কোন আবরণ নেই। মূর্তিটি সামনাসামনি উপস্থাপিত। গুম্ফহীন। উন্নত বক্ষ ও বৃষস্কন্ধ অপরিসীম পার্থিব শক্তি ও উৎসাহের দ্যোতক। উন্মুক্ত দৃষ্টি। স্মিত হাসি। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ভারতীয়। পরিধানে স্বচ্ছ মসলিন। মস্তকের পশ্চাতে জ্যোতির্বলয়। দুপাশে চামরধারী দুই পুরুষ পার্শ্চচর। জ্যোতির্বলয়ের ঊর্ধে দুই পাশে দুই উড়ন্ত বিদ্যাধর। সকলের ঊর্ধে বোধিবৃক্ষ। সিংহাসনের নিচের দিকে তিনটি সিংহ উৎকীর্ণ।[১০]

সাম্প্রতিক কালে বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে মথুরার কাটরা বুদ্ধের অনুরূপ একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেছেন। মথুরার মূর্তির সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই, বরং অনেক দিক থেকেই অভিন্ন। চন্দ্রকেতুগড়ের মূর্তিটিও লিপিযুক্ত। তবে, যেখানে মথুরার মূর্তিটি রক্তিম প্রস্তরে নির্মিত, সেখানে চন্দ্রকেতুগড়ের বুদ্ধমূর্তি অগভীরভাবে (in low relief) ইষ্টকফলকে উৎকীর্ণ। চন্দ্রকেতুগড়ের টেরাকোটা শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় এই ফলকে পরিস্ফুট। কাটরা বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে শিল্পীর সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্যই ছিল; না হলে তার সঙ্গে এমন নিকট সাদৃশ্য সম্ভব নয়।

প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় ছিল মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্র, যদিও বৌদ্ধ ও জৈন নিদর্শন এই প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ নিদর্শন এই স্থানটি থেকে সামান্যই সংগৃহীত হয়েছে। সেই দিক থেকে আলোচ্য মূর্তিটি যথেষ্ট মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ।

কাটরা লাল পাথর কুশাণ যুগ

সূত্র-নির্দেশ

১। Auboyer Jeannine : *Daily Life in ancient India,* New Delhi, 1994, p.16.

২। Saraswati, S. K. : *Early sculpture of Bengal,* New Delhi, 1975 (2nd ed.), p.11.

৩। Roy, C. Craven : *Indian Art*, New york, 1987 (reprint), p. 108.

৪। Saraswati, cited above, p. 11.

৫। Roy, C. Craven, cited above, p. 108; Saraswati, p. 11.

৬। Saraswati, p. 11.

৭। Ghosh, D. P. : *Studies In Museum and Museology In India,* Calcutta, 1968, p. 46.

৮। Coomaraswamy, A. K. : *History of Indian and Indonesian Art,* fig. 84; Kramrisch Stella : *Indian Sculpture,* fig. 81; Saraswati, S. K. : *Survey of Indian Sculpture* (1st ed.) fig. 53; Rowland Benjamin : *Art and Architecture of India,* p. 46.

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস ঃ *লেখমালানুক্রমণী* ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৭-৪৮।

১০। Roy, Craven, cited above, p. 109.

প্রত্ন-অনুসন্ধানে উদ্ভিদবিদ্যার কতিপয়প্রয়োগ

শুভ্রদীপ দে

জলবায়ু, মাটি, প্রাণী, উদ্ভিদ, ভূ-সংস্থান প্রভৃতি পরিবেশ — নির্দেশক। কালনিরূপণে, পরিবেশের অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক উভয় যুগেরই পরিবেশ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

প্রত্ন অনুসন্ধানে উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োগ প্রধানত চার রকমের ঃ

১) পরাগরেণু বিশ্লেষণ।

২) বৃক্ষ - বলয় কালক্রম বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

৩) লাইকেনমিতি।

৪) অন্যান্য পদ্ধতি ঃ

১) *পরাগরেণু বিশ্লেষণ* আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি তিন বিষয়ে সাহায্য করে ঃ

ক) *কালনিরূপণে*, খ) *পরিবেশ নির্ণয়ে*, এবং গ) *মানুষের কার্যকলাপ - নির্ধারণে*।

অতীতযুগের আবহাওয়া বা গাছপালা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করে, বিশেষত ফুলের পরাগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতির দ্বারা জানা গেছে যে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ শতকেই রাজস্থান ও কাশ্মীরে কৃষিকাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যে বিজ্ঞানের দ্বারা পরাগ - রেণু সম্বন্ধে তথ্যাদি এবং তাদের উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা যায় তাকে রেণু বিদ্যা বা *প্যালিনোলজি* (palynology) বলা হয়। *উদ্ভিদের অঙ্গ-সংস্থান*[১]।

বিভিন্ন স্তর থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাচীন উদ্ভিদেব পরাগরেণু (pollen grain) থেকে প্রত্ন-উদ্ভিদবিদের (Palynologist) সাহায্যে জানা যেতে পারে প্রাচীন কালে একটি অঞ্চলে কী ধরনের গাছপালা ছিল। তা থেকে আবার অতীত আবহাওয়া সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। আবহাওয়ার বিযয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্লিস্টোসিন যুগে — যে যুগে মানব বিবর্তনের অধিকাংশ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংঘটিত হয়েছিল — পৃথিবী পৃষ্ঠের আবহাওয়ায় ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং পর্যায়ক্রমিক শীতল ও উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজমান ছিল।[২]

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু বর্তমান ছিল। একেক ধরনের জলবায়ুতে কয়েকটি নির্ধারিত উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল। ফলে সেই সব উদ্ভিদের পরাগরেণু বিশ্লেষণ করে তাদের পরিচয় জানা গেলে একটি বিশেষ স্তরের একটি আপেক্ষিক সময়কালও নিরূপণ করা যায়।

ভারতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেছে।

পশ্চিম রাজস্থানে কয়েকটি লবণ হ্রদ (সম্বর, লুণকারাণসর ইত্যাদি) থেকে আহরিত বৃক্ষরেণু বিশ্লেষণ করে জানা গেছে ঃ

১) ১০ হাজার বছর এবং তার আগে আবহাওয়া অতীব শুষ্ক।

২) ১০ হাজার বছর থেকে ৯,৫০০ বছরের মাঝে উচ্চ বৃষ্টিপাত।

৩) ৯,৫০০ বছর থেকে ৫,০০০ বছরের মাঝে কম বৃষ্টিপাত।

৪) ৫,০০০ থেকে ৩,০০০ বছরের মাঝে কম বৃষ্টিপাত।

৫) এর পর থেকে, আবহাওয়া এই অঞ্চলে বর্তমানের মতো, অর্থাৎ শুষ্ক এবং উপ শুষ্ক।[৪]

আরেকটি উদাহরণ — কিছু *উদ্ভিদ রেণুর পরম্পরা* (pollen profile) থেকে ধারণা করা হয়েছে, ১৭ হাজার বছর আগে কাশ্মীর উপত্যকায় আবহাওয়া উষ্ণ অথবা বর্তমানের তুলনায় উষ্ণতর ছিল।[৫]

খ) ডেনড্রোক্রোনলজি বা ট্রি রিং মেথড্ বা বৃক্ষবলয়ের সাহায্যে কালনির্ণয়বিদ্যা নামে পুরাকালের সন-তারিখ নির্ণয়ের নতুন একটি পদ্ধতি বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতির ভিত্তিভূমি হলো, কোন বৃক্ষের কান্ডকে আড়াআড়িভাবে কাটলে যে বৃত্তাকার দাগগুলি দেখা যায় সেগুলির গণনা। সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষায় বৃক্ষের বৃদ্ধি শীত-বসন্তের তুলনায় বেশি। বেশি বৃদ্ধির সময় কোষগুলি পাতলা কোষপ্রাচীর সম্পন্ন থাকে। আর কম বৃদ্ধির সময় কোষগুলি আকারে ছোট হয় ও কোষপ্রাচীর মোটা হয়ে যায়। ফলে দুটি বেশি বৃদ্ধির (অর্থাৎ দু বছর) বৃত্তের মধ্যে একটি বিভেদকারী বৃত্ত গঠিত হয়। তাই, বাৎসরিক বৃত্তগুলিকে চেনা যায়। *বৃদ্ধি বলয়* (growth ring) সমান নয়। কারণ প্রত্যেক বছর একই হারে বৃক্ষের বৃদ্ধি ঘটেনি। এই বৃদ্ধি নির্ভর করে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বৃক্ষের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। এই যুক্তি দ্বারা বিভিন্ন বলয়কে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং এটাই হলো এই পদ্ধতির চাবিকাঠি। একটি অধুনাকাটা গাছের বলয় পর্যবেক্ষণ ও গণনা করা হল। তারপর তার চাইতে পুরনো একটি গাছের বলয়গুলির তুলনামূলক বিচার করে আগের গাছের প্রাচীনতর বলয়গুলির সঙ্গে শেষোক্ত গাছের নবীনতর বলয়গুলির সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়

এবং সেখান থেকে বৃত্তসংখ্যা গণনা করা হয়। এইভাবে ক্রমাগত প্রাচীন গাছের সাহায্যে সময়ের দিকে পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব।[৬]

বৃক্ষ-বলয় পদ্ধতি প্রয়োগে হরপ্পা-যুগের নগর-বসতিগুলির বয়স? জানা যাচ্ছে। সিন্ধু সভ্যতার বয়স আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেছে।[৭] এই পদ্ধতির সাহায্যে আরিজোনাতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) পুয়েব্‌লোদের (Pueblo) একটি প্রাচীন আবাসস্থল ১৯০০ বছরের পুরনো ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।

এই পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষে পাইন গাছ সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই পদ্ধতির দ্বারা এ যাবৎ ৭৩০০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের প্রত্নস্থলের সময় জানা গেছে।[৮]

লাইকেনমিতি

লাইকেন হ'ল এক বিশেষ উদ্ভিদ গোষ্ঠী — একই দেহে যথাক্রমে শৈবাল ও ছত্রাক। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় লাইকেন হ'ল ছত্রাকজীবী এবং আলোকজীবীর স্থায়ী স্ব-নির্ভর সহাবস্থান।

লাইকেনের বৃদ্ধির আনুপাতিক হার কম বলে, লাইকেনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে অনেক অপসৃয়মান হিমবাহ ও ভগ্নস্তূপের আনুমানিক বয়স নির্ণয় করা যায়।[৯]

এই পদ্ধতির সাহায্যে কিছু কিছু পাথরের মূর্তির বয়স অনুমান করা হয়েছে (ঐ, ৩০)।

যেমন Easter Island -এর প্রস্তর মূর্তির বয়স এর দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। প্রাচীন এথেন্সের Acro-Polis ও Delos -এর প্রাচীন মন্দিরগুলিতে জন্মানো লাইকেন থেকে এই সব প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণের সঠিক কাল নিরূপণ সম্ভব হয়েছে।[১০] প্রাচীন চিত্রাবলী, প্রস্তর মূর্তি, মর্মর মূর্তি, বাইজানটাইন গির্জার রঞ্জিত কাঠের জানালা প্রভৃতির উপরে জন্মানো লাইকেন থেকে তাদের বয়স জানা গেছে।[১১] প্রাচীন মিশরে মমী তৈরী করে বাক্সে ভরার সময় packing material রূপে লাইকেন ব্যবহার করা হতো। এই লাইকেনের প্রাচীনত্ব কার্বন ১৪ পরীক্ষার দ্বারা সঠিকভাবে জানা গেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট মমীগুলির বয়স সুনির্দিষ্ট স্থিরীকৃত হয়েছে।

অন্যান্য পদ্ধতি সমূহ ও তাদের প্রয়োগ

শস্যের দানা কিংবা তার টুকরো অনেক সময় মাটির মধ্যে মিশে থাকে। থাকে বীজ ও পুষ্পরেণু। এই সব থেকে প্রাচীন কালের উৎপন্ন শস্য; জলবায়ু, প্রাচীনকালের মানুষের খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই সব নিদর্শন পাওয়া গেছে শুষ্ক ভাবে বা জলের তলা থেকে পোড়া বা আধপোড়া অবস্থায়। পৃথিবীর বহুস্থানেই খাদ্যশস্যের দানা দগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। পৃথিবীর বহু জায়গায় এবং

ভারতে ধ্বংসাবশেষের নীচে পোড়া চাউলের অস্তিত্বের খবর আছে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রাম মেহেরগড়ে উৎপন্ন হতো কুল ও খেজুর[১৩], বুনো যব ও চাষ করা যব। এগুলিও উদ্ভিজ নিদর্শন থেকে জানা গেছে।

তাম্রাস্মীয় যুগের অন্যতম প্রত্নস্থল পাণ্ডুরাজার ঢিবি (বর্ধমান জেলা) থেকে প্রাপ্ত এক শ্রেণীর ফিকে লাল রং-এর কিংবা ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের গায়ে ধান এবং ধানের খোসা অথবা শীষের ছাপ দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্যেই যে প্রথম ধান্য প্রথম চাষযোগ্য হয়ে উঠেছিল এই ধারণার সপক্ষে উক্ত নিদর্শন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত নিদর্শন। অঙ্গারীভূত খুঁটির মূল আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের নাভডাটোলি থেকে।[১৪] জানা যাচ্ছে বাড়িঘরের অবস্থা। বাংলাদেশের অন্তর্গত লালামাই পাহাড় থেকে ফসিল কাঠের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। হরপ্পায় সাজানো ইটে বাঁধানো, মাঝখানে গর্ত করা গোলাকার একটি জায়গাকে সনাক্ত করা হয়েছে 'শস্যাগার' রূপে; কারণ এখান থেকে পাওয়া গেছে যব ও গমের খড়, তুঁষ, পোড়া গমের দানা ও খোসা ছাড়ান যবের দানা।

চন্দ্রকেতুগড়ের অধিবসতির প্রথম পর্বে টালির ছাদবিশিষ্ট কাঠ ও বাঁশের ভবনাদির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যাচ্ছে নগরায়ণের আগেকার অবস্থা।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে দুরকম গমের দানা। কালিবাঙ্গান থেকে পাওয়া গেছে গম ও যব। লোথাল ও রঙ্গপুরে উৎখননে কাদামাটি ও মৃৎপাত্রে ধানের তুষ লেগে থাকতে দেখা গেছে। হরপ্পা সংস্কৃতির অন্যান্য কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে কলাই, তিল ও সর্ষের দানা ও বীজ। হরপ্পা থেকে পাওয়া গেছে সূতীর কাপড়ের একটি টুকরো। জানা যাচ্ছে কার্পাস তুলোর চাষ হরপ্পাতেই প্রথম।[১৫] এই তুলো *গেসিপিয়াম আরবোয়িম্* নামক কার্পাসজাত। সম্প্রতি মেহেরগড়ে খননের মাধ্যমে হরপ্পা সভ্যতার দু হাজার বছর আগেই তুলার উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। আরো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, প্রাচীন কালের প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, উষ্ণতা ও আর্দ্রতার তারতম্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া যায় তার একটি হল 'প্রত্নোদ্ভিদ বিদ্যা' (*প্যালিওবোটানি*)। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখে যায় প্রাচীন তুষারস্তরের ধারাবাহিকতায়, হ্রদের নীচের মৃত্তিকায় এবং বৃক্ষে।

প্রাচীন আবহাওয়া বিশ্লেষণের পেছনে আছে একটি বড় বৈজ্ঞানিক জগৎ। ভারতে প্রাচীন প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে গবেষণা এখনো শৈশবস্তরে। উদ্ভিদবিদ্যা এই বিষয়ে এবং পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১। শর্মা, রামশরণ ঃ *প্রাচীন ভারত* (অনুবাদ ঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ৫।

২। ভট্টাচার্য, সুনীলকুমার ঃ *উদ্ভিদের অঙ্গ-সংস্থান,* পৃঃ ২৭৬; সমাজপতি ও কুমার ঃ উদ্ভিদবিদ্যা, ১ম খন্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৪।

৩। মুখোপাধ্যায়, দীপক ঃ *প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির রূপরেখা,* কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ঃ ৬।

৪। চক্রবর্তী, দিলীপকুমার ঃ ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ২০।

৫। তদেব, পৃঃ১৮।

৬। মুখোপাধ্যায়, দীপক, পৃঃ ১২ ১৩।

৭। বন্‌গার্দ - লোভিন ঃ *প্রাচীন ভারত* (অনুবাদ ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মস্কো পৃঃ২২)।

৮। হোসেন, মোশারফ ঃ *প্রত্নতত্ত্ব,* ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ৫০-৫১।

৯। সাঁতরা, সুভাষচন্দ্র ঃ *লাইকেন,* কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৩০।

১০। দে শুভ্রদীপ ঃ *গ্রীনগোল্ড,* হাবড়া, ২০০০, পৃঃ ২৯-৩১।

১১। তদেব, পৃঃ ২৯।

১২। তদেব, পৃঃ ৩০।

১৩। চক্রবর্তী, পূর্বে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬০।

১৪। *ভারতের প্রত্নতত্ত্ব,* কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৭৩।

১৫। দাশগুপ্ত, অমল ঃ *মানুষের ঠিকানা,* (৩য় সং) কলকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৪৬।

প্রাচীন বাংলার দেবকোট

অরূপ দাস

ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত প্রাচীন বাংলার দেবকোট আদি ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীনে বাংলার প্রাচীন নগরী দেবকোট আজও ইতিহাসের সাক্ষী।

হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি', পুরুষোত্তমের 'ত্রিকান্ড শেষ' প্রভৃতি গ্রন্থে দেবকোট, বাণপুর, উমাবন, শোণিত পুর প্রভৃতি কোটিবর্ষেরই বিভিন্ন নাম। তাদের মতে এই কোটিবর্ষ বা দেবকোটের খ্যাতি ও মর্যাদা কৌশলী, মথুরা, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগরের চেয়ে কম নয়।

মুসলমান আধিপত্যের পর পুরাতন কোটিবর্ষ নগরেই দেবীকোট - দীবকোট - দীওকোট নামে নতুন নগরের পত্তন হয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দেবকোট-দীবকোট-দীওকোট -এর বর্ণনা করা যায়।

ধ্বংসাবশেষ হতে অনুমান হয় এই নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০০ এবং প্রস্থে ১৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল। নগরটি চারিদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পূর্বে, উত্তর ও দক্ষিণে পরিখা এবং পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী। পূর্ব দিকে প্রধান নগর দ্বার এবং নগর হতে নগরোপকাট যাবার জন্য পরীক্ষার উপর সেতুর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, নগরের ঠিক কেন্দ্র স্থলে এখনও সুউচ্চ স্তুপ বর্তমান এবং জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও এই স্তুপ রাজবাড়ী নামে জাগ্রত; বোধ হয় এখানেই ছিল রাজপ্রাসাদ। নগর ও প্রাচীরের বাইরে এখনও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তুপ ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

প্রাচীন বাংলার দেবকোট নগরীতে পালরাজ, কম্বোজ রাজ ও তুর্কী শাসকরা বিভিন্ন সময় শাসন করেছে। বাণগড় থেকে পাওয়া তৃতীয় বিগ্রহ পালের একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে প্রথম মহীপালদেব এখানে শাসন করতেন এবং তিনি মহীপাল দীঘি নামে একটি দীঘি খনন করে ছিলেন।[১]

নারায়ণ পালের তাম্রলেখ থেকে জানা যায় যে এখানে নারায়ণ পাল ছাড়াও বিভিন্ন পাল রাজারা শাসন করেছেন। পরবর্তী সময়ে তুর্কী-আফগান সূচনা কালে ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি দেবকোট দখল করেন এবং দেবকোটকে নগরের রূপ দিয়ে মুসলিম ধর্মের আধিপত্য বিস্তার করেন।[২]

১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মে ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি ইসলামের বিজয় পতাকা দেবকোট তথা বাণগড় তথা দিনাজপুরের মাটিতে প্রোথিত করেন। দেবীকোট তুর্কীদের মুখের উচ্চারণে বাংলার মানচিত্রে সেদিন থেকে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে দেবকোট, দেওকোট দীওকোটকে রাজধানী করে তিনি প্রথমে এখানকার হিন্দু দেবাগুলিকে ধ্বংস করেন। প্রচুর হিন্দু রাজত্বকালের বিভিন্ন আবাসগৃহ এবং বিভিন্ন করণগুলিকে মসজিদ ও মাদ্রাসায় পরিণত করেন।[৩]

ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজিই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন এই দেবকোট অঞ্চল থেকে করেছিলেন। দেবকোট জয় করে তিনি কামরূপ দখলের প্রস্তুতি নেন এবং মেছ উপজাতির দলপতিকে তিনি দেবকোট মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত করে আলী মেছ নাম দেন। এই আলী মেছকে সঙ্গে করেই তিনি কামরূপ অভিযানে যান। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন।[৪]

দেবকোটে ফিরে এসে ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছু দিন পর মৃত্যু হয়। মতান্তরে কারও কারও মতে আলিমর্দান নামে বখতিয়ারের এক দুঃসাহসী ও দুধর্ষ আমির তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।[৫]

ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির মৃত্যুর পর তাঁরই তিনজন সহযোগী মহম্মদ শিরন খিলজি, আলিমর্দান খিলজি ও হুসানউদ্দিন ইওয়াজ খিলজি শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১২০৬ থেকে ১২২৭ সাল পর্যন্ত তাঁরা দেবকোটে শাসন কাজ পরিচালনা করেছিলেন। শাসনকর্তা মহম্মদ শিরন খিলজি ও আলিমর্দান খিলজির শাসন আমলেও মুসলিম রাজ্যের রাজধানী ছিল দেওকোট। তাদের পরবর্তী শাসনকর্তা সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজির শাসনকালের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেওকোটই ছিল তাঁর রাজধানী। ১২২৯ সালে দেবকোট রাজধানীর মর্যাদা হারায় এবং ওই বছরেই দেওকোট থেকে রাজধানী লখনৌষিতে স্থানান্তর করা হয়।[৬]

সূত্র-নির্দেশ

১। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* - আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ঃ ৩০১।

২। ঐ

৩। অকপর্ট - সম্পাদন, পার্থসারথি মৈত্র, দেবকোটে বখতিয়ার খিলজি, ধনঞ্জয় রায়, পৃষ্ঠা ১০৫, ১০৬।

৪। নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঃ *Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet* (Indian History Querterly, Vol IX, 1993); পৃষ্ঠা ঃ ৪৯।

৫। মিনহাজউদ্দিন রচিত *তবকাত-ই-নাসিরি* ঃ আবুল কালাম মোহম্মদ ঃ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত; পৃষ্ঠা ঃ ৪২, ৪৩।

৬। আবুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল) ঃ ঢাকা, বাংলা একাডেমি; নভেম্বর; ১৯৭৭।

প্রাচীন বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যসম্ভারে সমাদৃত বস্ত্র ও অশ্ব

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

এই নিবন্ধের ভূমিকায় প্রথমেই স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা—

'যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি, বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যতো'

প্রাচীন বঙ্গের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যেও তারা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্ভারে সমাদৃত বস্ত্র ও অশ্ব।[১] কিন্তু শব্দসংখ্যার সীমাবদ্ধতার জন্য শুধু মাত্র ঘোড়া ব্যবসার ওপরই আলোকপাত করা হচ্ছে। এই ঘোড়া ব্যবসা কেমন করে হতো এ বিষয়ে নিবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আছে ইতিহাস অনুসন্ধান ১৬ খণ্ডে পৃষ্ঠা ১৪৩-১৫০ এ ও দীর্ঘ, অধিক তথ্যসম্বলিত আলোচনা রয়েছে ২০০৩ সালে মহীশূরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রাচীন ভারতীয় বিভাগে 'A New light on the Kambojas and their horse trade in Ancient India' নামক নিবন্ধে। ঘোড়ার লাভজনক ব্যবসা প্রসঙ্গে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী লেখ পাঠোদ্ধারে ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশ্লেষণী সমীক্ষায় বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।[২] রণবীর চক্রবর্তী প্রত্নসমীক্ষায় (ভল্যুম ওয়ান) পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।[৩] গৌরীশংকর দে চন্দ্রকেতুগড় থেকে অজস্র প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত প্রত্ননিদর্শনে জাহাজের ওপর ঘোড়ার প্রতিচ্ছবিও দেখা গিয়েছে। রণবীর চক্রবর্তী প্রত্নসমীক্ষায় (ভল্যুম ওয়ান) একটি সিলে (seal) জাহাজের ওপরে একটি ঘোড়ার প্রতিচ্ছবিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৪] ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রণবীর চক্রবর্তীর মনোজ্ঞ আলোচনার ভিত্তিতে পরিস্ফুট হয় যে, ঘোড়া বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্যতম লাভজনক ব্যবসার পণ্য ছিল। উল্লেখনীয় এই যে, দক্ষিণ পশ্চিম দুটি বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্তি ও চন্দ্রকেতুগড় থেকে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘোড়া রপ্তানী হত।[৫] এই ঘোড়া ছিল যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত। এই বিরল যুদ্ধাশ্ব ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল

থেকে স্থলপথে ব্যবসায়ীরা বঙ্গে আনতো ও সেখান থেকে ঐ দুটি বন্দর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানী হ'ত। এখন প্রশ্ন ওঠে এই ঘোড়া ব্যবসা ও শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাশ্ব তৈরী কোন্ জনগোষ্ঠীর অবদান? এ প্রসঙ্গেও নিবন্ধকার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তার উপরিউক্ত প্রবন্ধ দুটিতে।[৬] তারই ভিত্তিতে বলা যায় বহির্দেশ থেকে ভারতে তথা বঙ্গে আগত উপজাতিগোষ্ঠীর অন্যতম কম্বোজ নামক গোষ্ঠীভুক্ত জনগণ এই ঘোড়া ব্যবসার অধিকারী ছিল। মহাভারতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, জাতকে, অর্থশাস্ত্রে, রঘুবংশে, পুরাণে যথা বিষ্ণু, ব্রহ্মান্ড, বায়ু ইত্যাদি থেকে জানা যায় যে কম্বোজরা বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল এবং এক্ষেত্রে অশ্ব তাদের সহায়ক ছিল।[৭] তাদের অশ্ব ছিল সুদক্ষ, সুপরিচালিত এবং শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতি অর্জন করেছিল। মহাভারতের বর্ণনা থেকে জানা যায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কিরাত নৃপতি ভগদত্ত অন্যান্য উপহারের সংগে যুধিষ্ঠিরকে অশ্ব উপহার দিয়েছিল।[৮] তাদের এই অশ্ব বাতাসের দ্রুত গতির মতো বিচরণ করতো। সভাপর্বে আরোও উল্লিখিত আছে যে কম্বোজ জনগোষ্ঠীর যুধিষ্ঠিরকে তিনশত নানা রং এর অশ্ব উপহার দিয়েছিল।[৯] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কম্বোজদের শক্তিশালী ঘোড়া কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করে সার্থকতা অর্জন করেছিল।[১০] জৈন সূত্র থেকে অবগত হওয়া যায় যে, কম্বোজদের ঘোড়া অন্যান্য সকলের ঘোড়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১১] তাদের ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা, দ্রুতগতিতে বিচরণ ও কোন রকমের শব্দে ভীত ত্রস্ত না হওয়া প্রকৃতই লক্ষণীয় বিষয় ছিল।[১২] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জাতকে রঘুবংশে, পুরাণে যথা বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে কম্বোজগোষ্ঠী তাদের সুদক্ষ, সুনিপুণ, সুপরিচালিত অশ্বকাহিনীর জন্য বিখ্যাত ছিল। পাল রাজা দেবপাল তাঁর সৈন্যবাহিনীতে কম্বোজদের অশ্ব নিয়ে অশ্ববাহিনী গঠন করেছিলেন।[১৩] দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় 'কম্বোজেসু' --- অর্থাৎ কম্বোজদেশের অশ্ব দ্বারা গঠিত অশ্ববাহিনী নিয়ে তিনি দিগ্‌বিজয় করেছিলেন।[১৪] দেবপালের নালন্দা লেখতেও কম্বোজ দেশের ঘোড়ার কথা পাওয়া যায়।[১৫] এই ঘোড়া সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম ভারতের অর্থাৎ আফগানিস্থান, কাবুল, কান্দাহারের কম্বোজ উপজাতিগোষ্ঠীর।[১৬] আবার মিনহাজ-উস্ সিরাজ তাঁর তবকৎ-ই-নাসিরিতে তিব্বত কম্বোজদের বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] আবুল ফজল তাঁর আইন-ঈ-আকবরীতে তনঘন ঘোড়া বঙ্গের বলে অভিহিত করেছেন।[১৮] বরাহমিহির তনঘন (Tanghan) নামে এক গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন ও তাদের ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন চণ্ডীতে উল্লেখ করেছেন যে, মুঘল আমলে বঙ্গে এই তনঘন ঘোড়ার খুব বেশী দাবী ও সমাদর ছিল।[২০]

এই প্রসঙ্গে লুসাই পার্বত্য অঞ্চল, তিব্বত, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উত্তর বঙ্গ হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ পর্যন্ত স্থলপথের নির্দেশ ও ব্যবহারের কথা বলা দরকার। চিত্ররেখা গুপ্ত তাঁর 'Horse and Horse Headed Deity of North-Eastern India'

প্রবন্ধে ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত পথের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[২১] তিনি বিশেষ করে আসাম থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে উত্তর বঙ্গে প্রবেশের পথের বিশদ আলোচনা করেছেন। ব্যবসায়ীরা এই পথেই তাদের ব্যবসা চালাতো। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে, ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি লখনৌতি থেকে তিব্বত পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা নয়।[২২] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পশ্চাতে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিব্বত থেকে লখনৌতি পর্যন্ত ব্যবসা চালানোর পথটি নিজেদের অধিকারে রাখাই মূলত অর্ন্তনিহিত কারণ। মিনহাজের তবকৎ-ই-নাসিরিতে বর্ণিত আছে যে, সমসাময়িক মুসলমানগণ এই অঞ্চলের ঘোড়ার ব্যবসায় প্রলুব্ধ হয়েছিলেন।[২৩] এমন কি এই তবকৎ-ই-নাসিরিতে বর্ণিত আছে যে, করবট্টন বা করমবতান অথবা কামরূপ বা আসামে ঘোড়া ব্যবসার কেন্দ্র বিন্দু ছিল।[১৪] সেখানে প্রতি দিনে ১৫০০ শত ঘোড়া বিক্রয় করা হ'ত। এই সকল ঘোড়া তনঘন ঘোড়া নামে পরিচিত ছিল এবং ঐ সকল ঘোড়া আসাম থেকে তিব্বতের মধ্য দিয়ে লখনৌতিতে আনা হত।[২৫] এই সকল তথ্য থেকে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কম্বোজদেশ বা কম্বোজদের আবাসস্থল তিব্বত, হিমালয়ের পাদদেশ, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল অর্থাৎ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল বলে নির্ধারিত করা যায়। এই অঞ্চলের কম্বোজদের ঘোড়ার খ্যাতি ছিল। ব্যবসায়ের জন্য এই ঘোড়ার সমাদর ও চাহিদা ছিল। সে কারণে প্রভূত চড়া দামে এই ঘোড়া বাজার বিক্রী হত। এইভাবে দেখা যায় রপ্তানী বাণিজ্যে দক্ষ, নিপুণ, বলিষ্ঠ ঘোড়ার সমাদর ছিল ও বলা বাহুল্য লাভজনক ব্যবসাও ছিল। স্থলপথে উপরিউক্ত পথের নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী। তিনি তাঁর Archaeology of Eastern India গ্রন্থে বলেছেন উত্তরবঙ্গের সংগে অর্থাৎ মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরে সংগে রূপনারায়ণ নদের অববাহিকা ও মেদিনীপুরের সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চল স্থলপথে যুক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর কথা উদ্ধৃত করলাম — 'There was a major arterial route in West Bengal which linked the entire area from the Barind tract in the North in modern Maldah and West Dinajpur to the Rupnarayan delta and the coastal Midnapur in the South.[২৬] এই পটভূমিকায় আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, হাওড়া - খড়গপুর রেলপথে কোলাঘাট ষ্টেশনের আগে ঘোড়াঘাটা নামে একটি ষ্টেশন আছে। সন্নিকটে রূপনারায়ণ নদ। নামকরণের সংগে লোককথা ও কিংবদন্তী ইতিহাসের তথ্য উদ্ঘাটনে সহায়ক। ঘোড়ার ঘাট বা কেন্দ্র নদীপথে ঘোড়া কেনাবেচার স্থান বা কেন্দ্র/হয়তো ঘোড়ার রমরমা ব্যবসা এভাবে চলতো। অতএব দেখা যাচ্ছে কম্বোজগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম দিক থেকে স্থল পথে উত্তর ভারত ও বিহারের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বন্দরে তাদের ঘোড়া নিয়ে আসতো। আবার বঙ্গে কম্বোজগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বঙ্গের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গে কম্বোজগোষ্ঠী

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, পালরাজাদের উচ্ছেদ করে তাদের রাজ্য অধিকার করা, দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করার সংগে সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নিজেদের স্থান করে নেওয়া, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা, বঙ্গের ধর্মীয় রীতি নীতি, পূজা পদ্ধতি যেমন শিব পূজা, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করা ইত্যাদি নানাভাবে বঙ্গের অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীর সংগে মিলে মিশে বাঙালী অর্থাৎ বঙ্গের জনগণের সংগে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।[২৭] বঙ্গের অর্থনীতিতেও তাদের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পরিশেষে নিবন্ধের শিরোনামকে রূপায়িত করে বলা যায় সামুদ্রিক বাণিজ্যে অশ্ব খুবই লাভজনক পণ্য রূপে পরিগণিত হ'তো।

যাই হোক দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বন্দর থেকে তা তাম্রলিপ্তই হোক বা চন্দ্রকেতুগড়ই হোক না কেন সেখান থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে মালয় উপসাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরে যুদ্ধাশ্ব রপ্তানী হতো। সেখান থেকে যুদ্ধাশ্ব চীনেও চলে যেত। ট্রাপগো (trappaga) নামক ঘোড়া বহনকারী এক ধরনের জাহাজ করে ঘোড়া রপ্তানী হতো।[২৮] মনে হয় প্রাচীন বঙ্গে সম্ভবত তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ পাল সেনযুগ পর্যন্ত এইভাবে ঘোড়ার ব্যবসা চলতো। এমন কি মধ্যযুগীয় বাংলায় ঠিক এমনিভাবে রম্‌রমা ঘোড়ার ব্যবসা চলতো। নিঃসন্দেহে বলা যায় ঘোড়া ব্যবসা বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত ও দৃঢ় করেছিল। প্রকৃতই কবির কথায় বলা যায় বাণিজ্যে বসতি লক্ষী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশ্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সবিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই অশ্ব ব্যবসায় কম্বোজনামক উপজাতিগোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে ও বঙ্গের উত্তরে তিব্বত, হিমালয়ের সানুদেশ, আসাম, লুসাই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বঙ্গে প্রবেশ করে ঘোড়া ব্যবসায় সবিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। কারণ তারাই ঘোড়াকে ঠিক মতো শিক্ষা দিয়ে দক্ষ, সুনিপুণ, ক্ষিপ্র যুদ্ধাশ্ব উপহার দিয়েছিল। এই ব্যাপারে তাদেরই একচেটিয়া ভূমিকা ছিল। এইভাবে দেখা যায়, কম্বোজগোষ্ঠী প্রাচীন বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে প্রাচীন ভারত বিভাগে যে নিবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল তার শিরোনাম ছিল 'প্রাচীন বঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্ভারে সমাদৃত বস্ত্র ও অশ্ব'। কিন্তু শব্দসংখ্যার পরিমিত সীমাবদ্ধতার জন্য সামুদ্রিক বাণিজ্যে বস্ত্র আলোচনা করা সম্ভব হ'ল না সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়।

২। বি. এন. মুখার্জী ঃ ডিসাইফারমেন্ট অব দি খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী স্ক্রিপ্ট, (*মান্থলি বুলেটিন অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি*, ১৮ (XVIII), নং ৮, আগষ্ট ১৯৮৯); খরোষ্ঠী এ্যাণ্ড খরোষ্ঠী —

ব্রাহ্মী ইন্সক্রিপসন্‌স্‌ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল (*ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন*, ১৯৯০, পৃঃ ২৩, ৬৪-৬৫-৬৮, নং ১১, পৃঃ ৪৭, নং ৬ পৃঃ ৪৫ ইত্যাদি)

৩। রণবীর চক্রবর্তী ঃ প্রত্নসমীক্ষা, ভল্যুম ওয়ান, ম্যারিটাইম ট্রেড ইন আর্লি হিস্টোরিক্যাল বেঙ্গল-এ সিল ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়, (পৃঃ১৫৫-১৫৯) পৃঃ ১৫৬ (প্রত্নসমীক্ষা, কলিকাতা ১৯৯২)

৪। তদেব

৫। মজুমদার, আর, সি ঃ *হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট বেঙ্গল*, পৃঃ ৩৩৯-৩৪০, ৩৪৫ (চন্দ্রকেতুগড়ের জন্য পৃঃ৬১২,৬২৩,৬৪৬); *ইণ্ডিয়ান আরকিওলজি ১৯৫৭-৫৮*, পৃঃ ৭২ (প্লেট LXXXVII — এ এক্সাভেশন এ্যাট চন্দ্রকেতুগড়, পৃঃ ৩৪৫; সম্পাদনা ঘোষ, এ ঃ *এ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়ান আরকিওলজি*, ভল্যুম টু, পৃঃ ৯৫-৯৬ (দিল্লী, ১৯৮৯)

৬। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা ঃ বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক গঠনে ও সংস্কৃতিতে কম্বোজ উপজাতির অবদানের সমীক্ষা, পৃঃ ১৪৩-১৫০ (ইতিহাস অনুসন্ধান, সংখ্যা ১৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কোলকাতা, ২০০২); এ নিউ লাইট অন দি কম্বোজস এ্যাণ্ড দেয়ার হর্স ট্রেড ইন এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া, (ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, মহীশূর অধিবেশনে, ২০০৩ ডিসেম্বরে পঠিত)।

৭। ল, বি, সি ঃ *সাম ক্ষত্রিয় ট্রাইব্‌স্‌ ইন এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া*. পৃঃ ২৩২-২৫৬ (কলিকাতা, ১৯২৪); মহাভারত ঃ সভাপর্ব, চ্যাপ্টার ৫১, ত, চ্যাপ্টার ৪৮, ১৯, ভীষ্মপর্ব, চ্যাপ্টার ৯, ৬৫-৬৬; রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র ঃ *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া*, পৃঃ ১৫০ (কলিকাতা, ১৯৫০); বিষ্ণুপুরাণ ৫ (V), ২৯; *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*, ১১ ১৬, ৪৯; বায়ুপুরাণ, ৮৮, ১২২; মুদ্রারাক্ষস, এ্যাক্ট ৩; সামশাস্ত্রী, আর (অনুবাদক) ঃ *কোটিল্যাস অর্থশাস্ত্র*, পৃঃ ৪৫৫ (মহীশূর, ১৯৬৭) রঘুবংশ, চ্যাপ্টার চতুর্থ, ভার্স ৬৯-৭০; ফসবল ঃ *জাতক*, ভল্যুম চতুর্থ (IV), পৃঃ৪৬৪

৮। *মহাভারত*, সভাপর্ব, XLIX, ১১-১২; গুপ্ত চিত্ররেখা ঃ হর্স এ্যাণ্ড হর্স হেডেড ডিটি অব নর্থ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, পৃঃ১০৫ (এডিটেড মিশ্র, পি, কে ঃ স্টাডিজ ইন হিন্দু এ্যাণ্ড বুধিস্ট আর্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯)

৯। *মহাভাবত*, সভাপর্ব, চ্যাপ্টার ৫১, ৪; 'ল, বি, সি ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০।

১০। *মহাভারত*, ভীষ্মপর্ব, চ্যাপ্টার ৭১, ১৩; ল, বি, সি; পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৪০।

১১। জৈন সূত্র, *সেকরেড বুক অব দি ইস্ট*, পার্ট টু, পৃ ঃ ৪৭; ল, বি, সি ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৪১।

১২। তদেব

১৩। মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১৪-১৩০, ১১৭, ১২২-১২৩ (কম্বোজেসুচ); *ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি* ভল্যুম ২১, ১৮৯২, পৃ ঃ ২৫৩ (মুঙ্গের কপার প্লেট অব দেবপাল) এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ১৭ (XVII) ১৯২৩-২৪, পৃ ঃ ৩১০-৩২৭ (নালন্দা কপার প্লেট অব দেবপাল, পৃ ঃ ৩২৬ সেনাবাহিনীর জন্য)।

১৪। মাইতি এ্যাণ্ড মুখার্জী ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১৪-১৩০, ১১৭, ১২২-১২৩ (কম্বোজেসু); *ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি*, ভল্যুম ২১, ১৮৯২, পৃ ঃ ২৫৩ (মুঙ্গের কপার প্লেট অব দেবপাল); সরকার, দীনেশ চন্দ্র পাল, *সেনযুগের বংশানুচরিত*, পৃ ঃ ৬৯ (কলিকাতা, ১৯৮২)

১৫। *এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা*, ভল্যুম ১৭ (XVII) পৃ ঃ ৩১০-৩১৮ (নালন্দা কপার প্লেট অব দেবপাল)

১৬। চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা ঃ *পূর্বোক্ত*, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট টু, পৃ ঃ ৫৬০; সরকার দীনেশ চন্দ্র (এডিটেড), *সিলেক্ট ইন্সক্রিপসন্‌স্‌ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন*, ভল্যুম টু, পৃ; ঃ ৭৪, লাইন ১৮ (কম্বোজেসু); *পাল সেন যুগের বংশানুচরিত*, পৃ ঃ ৬৯; এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা (XVII) ১৭, পৃ ঃ ৩১৮; রায় হেমচন্দ্র ঃ *দি ডায়নাস্টিক হিস্ট্রি অব নর্দান ইণ্ডিয়া*, ভল্যুম ওয়ান, পৃ ঃ ৩১১, ফুট নোট (কলিকাতা, ১৯৩১); রায়চৌধুরী, এইচ, সি ঃ *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া*, পৃ ঃ ১৪৮, ১৫০ (কলিকাতা, ১৯৫০)

১৭। এলিয়ট এ্যাণ্ড ডাওসন (এডিটেড) ঃ *হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স্‌ ওন হিস্টোরিয়ান্স*, ভল্যুম টু, পৃ ঃ ৩০৮ (রিপ্রিন্ট আলিগড়, ১৯৫২)

১৮। জ্যারেট, এ, এন (ইংরাজী অনুবাদ) ঃ *আবুল ফজলস আইন-ঈ আকবরি* পৃ ঃ ১৪০ (রিপ্রিন্ট কলিকাতা, ১৯৯৭); সরকার, জে, এন, রিভাইসড) ঃ আইন-ঈ-আকবরি, পৃ ঃ ১৪০ (রিপ্রিন্ট কলিকাতা, ১৯৯৩)

১৯। দাশগুপ্ত, কল্যাণ কুমার (এডিটেড) ঃ *দি টপোগ্রাফিক্যাল লিস্ট অব দি বৃহৎসংহিতা অফ জে এফ ফ্লাট*, পৃ ঃ ৯৭ (কলিকাতা, ১৯৭৩)

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, আর এ্যাণ্ড চৌধুরী, বি (এডিটেড) ঃ *মুকুন্দরাম'স কবিকঙ্কণ চণ্ডী*, পৃ ঃ ২৯৮ (কলিকাতা, ১৯৯২)

২১। গুপ্ত চিত্ররেখা ঃ হর্স এ্যাণ্ড হর্স হেডেড ডিটি অব নর্থ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১০১।

২২। তদেব

২৩। এলিয়ট এ্যাণ্ড ডাওসন (এডিটেড) ঃ পূর্বোক্ত, ভল্যুম টু, পৃ ঃ ৩০৮।

২৪। তদেব

২৫। তদেব

২৬। চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার ঃ *আরকিওলজি অব ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া* পৃ ঃ ২০৭ (দিল্লী, ১৯৯৩)

২৭। রায়, হেমচন্দ্র ঃ পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, পৃ ঃ ৩০৮-৩০৯; চন্দ, রমাপ্রসাদ ঃ জার্নাল অব দি *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, নিউ সিরিজ ১৯১১, ভল্যুম ৭, পৃ ঃ ৬১৯ এফ, এফ (বাণগড় স্তম্ভ লেখ)

এফিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ২২ (XXII) ১৯৩৩-৩৪, পৃ ঃ ১৫১-১৫৮ (ইর্দা কপার প্লেট অব নয়পালদেব); ল, বি, সি ঃ *সাম ক্ষত্রিয় ট্রাইব্‌স্‌ ইন এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া*, পৃ ঃ ২৩৬-২৫৬ (কলিকাতা, ১৯২৪); চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা ঃ পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান পার্ট টু, পৃ ঃ ৫৬১-৫৬৫।

২৮। চক্রবর্তী, রণবীর ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫৮।

বিহারে রেবন্তপূজা

বিজয় কুমার সরকার

সূর্যদেবতার অন্যতম পুত্র এবং গুহ্যকাধিপতি রেবন্ত হিন্দুধর্মের অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায়ের (minor) দেবমণ্ডলীর মধ্যে সুপরিচিত। তবে বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত, এমনকি হরিবংশপুরাণ (অধ্যায় ৯) এবং নরসিংহ পুরাণে তার কোনও উল্লেখ নেই। অথচ এই সকল গ্রন্থসমূহে সন্তানসন্ততিসহ সূর্যের পরিবারের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়, সূর্যপুত্ররূপে রেবন্তের কাহিনী ও পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল পরবর্তীকালে।

সূর্যদেবতার অন্যতম পুত্ররূপে রেবন্তের উল্লেখ পাওয়া যায় গুপ্ত ও তৎপরবর্তীযুগের পুরাণসমূহে। সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে তার জন্ম সম্পর্কে একটি বিস্তারিত অ্যাখ্যায়িকাও পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তা এই ঃ "বিশ্বকর্মা পুত্রী সংজ্ঞার সূর্যের সঙ্গে বিবাহ হয়। সূর্যের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করা সংজ্ঞার পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন তিনি এক ছায়াপ্রতীক সৃষ্টি করে সেই ছায়াকে সূর্যের নিকট রাখেন এবং কঠোর তপস্যার্থে বনগমন করেন। সূর্য কিছুদিন এই চাতুরী বুঝতে পারেননি। ঘটনাক্রমে শ্বশুর বিশ্বকর্মার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা পরিজ্ঞাত হয়ে সূর্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে নির্গত হন। সংজ্ঞা তখন অশ্বিনী মূর্তি, ধারণ করে উত্তর কুরু অঞ্চলে বিচরণ করেছিলেন। সূর্যও অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্ব ও অশ্বিনীরূপে সূর্য ও সংজ্ঞার মিলনের ফলে প্রথমে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পরে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করলেন। রেবন্ত জন্মকালেই অশ্বারূঢ় কবচমণ্ডিত ও ধনুর্বাণ খড়্গ চর্ম প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন।[১]

রেবন্ত সম্পর্কে আরও দুচারটি তথ্য পৌরাণিক সাহিত্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। শিবপুরাণে[২] রেবন্তকে 'ভিষগ্বর' বা চিকিৎসক বলা হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের মতে, রেবন্ত সূর্যের মতই অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীনরূপে উপস্থাপিত হবেন।[৩] স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে রেবন্তকে প্রদত্ত সূর্যের বরদানের বর্ণনা থেকে রেবন্তের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু কথা জানা যায়।[৪] বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে, সাধারণত অরণ্য বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড, শত্রু, দস্যু প্রভৃতির ভীতি নিবারণার্থে ত্রাণকর্তারূপে রেবন্তকে অর্চ্চনা করবার প্রথা ছিল। তাছাড়া তিনি অধিক কল্যাণ, সুখ, রাজ্য, আরোগ্য কীর্তি, উন্নতি প্রভৃতিও দান করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও[৫] প্রায় অবিকল অনুরূপ বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। স্কন্দ

পুরাণের প্রভাসখন্ডে[৬] দেখা যায়, সূর্য স্বয়ং পুত্র রেবন্তকে অশ্বদের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করছেন। ঐ একই পুরাণের আবন্ত্যখন্ড থেকে জানা যায়, সমস্ত অশ্বশালাতে বিশেষ করে রেবন্তের পূজা করার বিধি ছিল।[৭] প্রভাসখন্ডে আরও বলা হয়েছে, রাজা অশ্ব বৃদ্ধিমানসে তার আরাধনা করবেন।[৮] আবন্ত্যখন্ডের অন্যত্র স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ভক্তিভরে রেবন্তেশ্বরের পূজা করলে অশ্ব, বিজয়, যশ প্রভৃতি লাভ হয়।[৯] সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রেবন্তকে বিশেষ করে অশ্বের অধিরক্ষক দেবতা মনে করা হত। অগ্নি পুরাণে রেবন্তকে 'অশ্বারোহী' রূপে বর্ণনা করবার সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে অশ্বারূঢ় রেবন্তের স্বর্ণমূর্তি দান করলে দাতার কখনও মৃত্যু হয় না।[১০] রেবন্তের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় কালিকাপুরাণে। এই পুরাণের বর্ণনা অনুসারে, রেবন্ত দ্বিভুজ, কবচমন্ডিত এবং শুভ অশ্বে আরূঢ়; তিনি উজ্জ্বলকান্তি ও তার কেশরাশি শুক্ল বস্ত্রে সংযত; তার বাম হস্তে কশা ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ।[১১] দুর্গাপূজার পরে যে সপ্তদিবসব্যাপী নীরাজন অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তার সপ্তম দিবসে রেবন্ত পূজার বিধান কালিকাপুরাণে দেওয়া হয়েছে।[১২] আশ্বিন মাসে সামরিক প্রস্তুতির অঙ্গ রূপে সাধারণত এই নীরাজন অনুষ্ঠান পালন করা হত। এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন প্রধানত রাজা ও সেনাপতিরা। কারণ, এই সময়ই দিগ্বিজয় যাত্রা ইত্যাদির পক্ষে প্রশস্তকাল। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, সৈন্যগণের কুচ্‌কাওয়াজ, যুদ্ধাভিনয় প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হত। রাজা তার যুদ্ধাশ্বকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "সে সত্যের দ্বারা ভাস্কর ও যে সত্যের দ্বারা রেবন্তকে তুমি বহন কর, সেই সত্যের দ্বারা তুমি আমাকেও বহন কর"।[১৩] কোনও কোনও মতে, উপসংহারে রেবন্ত পূজা না হলে, নীরাজনবিধি অসম্পূর্ণ থাকত। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখন্ডে ভার্যা উমার প্রতি শিবের উক্তি থেকে জানা যায়, কতিপয় পূজানুষ্ঠানের পরে পরে অশ্বারূঢ়, রাজ্যভট্টারক রেবন্তের ভক্তি আপ্লুত দর্শন অবশ্যকর্তব্য, কারণ তাতে সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে মুক্তি ও পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে।[১৪]

রেবন্তের পূজাপদ্ধতির বড় একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কয়েকটি প্রধান দেবদেবীর পূজার অঙ্গস্বরূপ অধিকাংশ সময়ে তার পূজা করা হত। পুরাণে সূর্যের সঙ্গে রেবন্তের অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দেখা যায়। কালিকা পুরাণের মতে, প্রতিমাকারে বা ঘটে স্থাপন করে, যেভাবেই রেবন্তের পূজা করা হোক না কেন, তা সূর্যপূজার বিধিতেই সম্পাদন করতে হবে।[১৫] স্কন্দ পুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে, রবিবার সপ্তমী, তিথি (পৌরাণিক সৌরধর্মের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিন) তে রেবন্তপূজা কর্তব্য।[১৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, রঘুনন্দন তার 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে (রচনাকাল খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) উল্লেখ করেছেন যে, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মী পূজার পূর্বে দ্বারোপান্তে বিত্তশালী এবং অশ্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক রেবন্তের পূজা কর্তব্য।[১৭]

পুরাণ ছাড়াও আরও কতিপয় সাহিত্যগ্রন্থে রেবন্ত ও তার পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহির তার 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে নানা দেবমূর্তির লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রেবন্তের উল্লেখ ও নিম্নলিখিত বর্ণনা করেছেন ঃ

রেবন্তোহশ্বরূঢ়ো মৃগয়া ক্রীড়াদি পরিবার ঃ[১৮] ভাস্কর্যের দিক থেকে বরাহমিহিরের এই বর্ণনার মূল্য অপরিসীম। তাছাড়া এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রেবন্ত অন্ততঃপক্ষে উত্তর ভারতের দৈবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। জয়ানক তাঁর পৃথ্বীরাজ বিজয় গ্রন্থে সূর্যের পুত্রদের মধ্যে রেবন্তরও উল্লেখ করেছেন।[১৯] হিমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণিতে রেবন্তের সানুচর মৃগয়াদৃশ্যের উল্লেখ নেই। তিনি শুধু এইটুকুই বলেছেন ঃ পৃষ্ঠস্থঃ সূর্যবৎ কার্য রেবন্তশ্চ তথা প্রভুঃ।[২০] উদ্যোতন সূরীর কুবলয়মালা গ্রন্থে (জালোর, রাজস্থান ঃ ৭৭৮ খ্রিঃ) স্কন্দ পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুরূপ অবিকল ঢঙে রেবন্তপূজার ফল বর্ণনা করা হয়েছে।[২১] চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের রচনা বলে কথিত অশ্বশাস্ত্রে রেবন্তকে অশ্বের দেবাধিপতি বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে রেবন্তের অষ্টবিংশ নাম উচ্চারণ করলে স্বীয় অশ্বসমূহ অশুভ আত্মার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।[২২]

গুপ্তযুগের কোনও লেখে (inscription) রেবন্তের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাছাড়া, মধ্যযুগের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে যে বিভিন্ন রাজবংশ দেখা যায়, একমাত্র কলচুরী বাদে অন্য কোন রাজবংশীয় লেখে রেবন্ত ও তার পূজা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লিখিত হয়নি।[২৩] প্রারম্ভিক মধ্যযুগের যে সকল শিলা বা তাম্রলিপিতে রেবন্তের উল্লেখ দেখা যায়, দু-একটি বাদে তার প্রায় সবগুলিতে রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, সেনাপতি ও যোদ্ধাগণ রেবন্তের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছেন বিভিন্ন প্রকৃতির বলশালী অশ্ব পরিচালনা প্রসঙ্গে। সুতরাং এর থেকে মনে হয় যোদ্ধাদের দেবতা হিসাবে রেবন্তের ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ ঘটছিল।

ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পেও রেবন্তের উপস্থিতি নেহাৎ নগন্য নয়। প্রাচীনতম অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্তকালীন রেবন্তমূর্তি পাওয়া গিয়েছে রাজস্থানের অন্তর্গত চিতোরের নগরী, উত্তর প্রদেশের উথাও জেলার নেওয়াল এবং বিহারের ভাগলপুর ও গয়া জেলায়। রেবন্তের সর্বাধিক মূর্তি দেখা যায় রাজস্থানে। এর সম্ভাব্য কারণগুলি নিম্নরূপঃ (ক) সূর্যের মূর্তিপূজক ইরানীয় মগ ব্রাহ্মণগণের ভারতের উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমান্তে পদার্পণ এবং এই সকল অঞ্চল তাদের কর্মক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ, (খ) ব্যবসা-বাণিজ্য মানসে দূর-দূরান্তে গমনকারী রাজস্থানী ব্যবসায়ী কুলের মনে দস্যু-তস্করের আশঙ্কা এবং (গ) যুদ্ধকার্যে অশ্বের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা। জনৈক পণ্ডিতের মতে, খ্রিষ্টের জন্মের পরবর্তী কয়েক শতকে অশ্ব যখন যুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

হয়ে ওঠে, সম্ভবত সেই সময়েই রেবন্তপূজা জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।[২৪] যাই হোক, রেবন্তের পূজা ও মূর্তি খুব সম্ভবত রাজস্থান থেকে যমুনা ও গঙ্গা বেয়ে ক্রমশ উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বিস্তারলাভ করে।

এখনও পর্যন্ত বিহার থেকে এমন কোন লেখ আবিষ্কৃত হয়নি যা থেকে রেবন্ত সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই ঘাটতি মিটিয়েছে ঐ প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত প্রচুর রেবন্তমূর্তি। এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিহারে একদা রেবন্তপূজা বেশ জনপ্রিয় ছিল। বিহারে রেবন্তের প্রাচীনতম মূর্তি পাওয়া গিয়েছে ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জের জাহাঙ্গীরা পাহাড়ে এবং গয়া জেলার পাচারে। পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন সুলতানগঞ্জের মূর্তিটিকে স্যার এ. কানিংহাম বিষ্ণুর কল্কি অবতারের মূর্তি বলে ব্যাখ্যা করেন।[২৫] কিন্তু বরাহমিহির তার বৃহৎ সংহিতায় রেবন্তের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে এ হেন মূর্তিকে রেবন্তের বলে প্রথম নির্দিষ্ট করেন পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।[২৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কল্কি মূর্তি থেকে রেবন্তের স্বতন্ত্র মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে শিকারী দলের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকেই বিদ্যাবিনোদ নির্দেশ করেছেন এবং তার এই নির্দেশ শুধুমাত্র বরাহমিহির প্রদত্ত অতি সংক্ষিপ্ত এক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু অন্তত ন্যূনপক্ষে এমন তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, যেখানে রেবন্তের সঙ্গে মৃগয়া দৃশ্যের কোনও সম্পর্কই নেই।[২৭] এইসব গ্রন্থমতে, রেবন্ত হবেন, সূর্যের মতো, যদিও উভয়ের কোনও সাধারণ আয়ুধেরই উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং কতিপয় আয়ুধের উপর ভিত্তি করে সূর্যের সঙ্গে রেবন্তের সাদৃশ্যও কল্কি থেকে তার স্বাতন্ত্রের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

সুলতানগঞ্জের[২৮] রেবন্ত যথারীতি অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন; মোচাকৃতি মুকুটে মস্তক শোভিত ও আজানু পাদকায় পদদ্বয় আবৃত। ছয় পুরুষ-অনুচর পদব্রজে তার অনুগমন করছেন। অশ্বের পশ্চাদ্দেশে এক অনুচর তার শিরোপরে ছত্রধারণ করে আছেন। ছত্রধারীর বামদিকে এক অনুচরের দুইপাশে একটি করে কুকুর। রেবন্তের সম্মুখে অনুচরত্রয় মৃদঙ্গ ও করতাল বাদনে রত। ষষ্ঠজন সম্ভবত জল বহনকারী। ছত্রধারীর পশ্চাতে এক অনুচর সম্ভবত একটি মৃত পশু বহন করে চলেছে। মৃগয়াশেষে শিকারসহ প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যই এখানে উৎকীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি রেবন্ত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে গয়া জেলার পাচারে।[২৯] মনোরম মুকুটে শোভিত রেবন্তের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্কন্ধে এসে পড়েছে। ছত্রে রয়েছে একটি উড্ডীয়মান নিশান এবং অশ্বের সাথে সাথে একটি কুকুরও ধাবমান। গুপ্তকালীন ভাস্কর্যের সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্যই যেন এখানে প্রস্ফুটিত। নালন্দার নিকটবর্তী হিলসা গ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তযুগের শেষের কিংবা পাল যুগের প্রথম দিককার একটি রেবন্তমূর্তি।[৩০] অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী এটিকে

চিহ্নিত করেছিলেন "চিরতরে পিতৃগৃহ পরিত্যাগমানসে স্বীয় অশ্ব কণ্ঠকপৃষ্ঠে সমাসীন ভগবান বুদ্ধের" মূর্তি বলে।[৩১] কিন্তু রেবন্ত মূর্তি রূপে এর সঠিক চিহ্নিতকরণ করেন জে. এন. সমাদ্দার।[৩২] এখানে রেবন্তের বাম হাতে রয়েছে একটি পদ্মফুল এবং মোটামুটি বৃহদাকারের তরবারিসহ কোমরে কোমরবন্ধ। ছত্রধারীর ডানহাতে একটি চামর এবং বামহাতে জলের একটি কলস। পাদপীঠে ধাবমান দুটি কুকুর ও ঘোড়ার নীচের দিকে একটি বরাহমূর্তি। এখানে রেবন্তের মৃগয়াক্রীড়াদিরত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে বলে মনে হয়।

বিহার থেকে প্রাপ্ত নবম শতাব্দী অর্থাৎ পালযুগের চারটি রেবন্তমূর্তির উল্লেখ করেছেন বি. এ. শর্মা।[৩৩] তিনটি মূর্তিতে পূর্বভারতীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। চতুর্থ মূর্তিটিতে সানুচর অশ্বারূঢ় রেবন্ত। ছত্রের উভয় দিকে রয়েছে একটি করে পাখি এবং একেবারে বামদিকে চঞ্চুতে গোক্ষুরসর্পধারী একটি ময়ূর। পাদপীঠে খোদিত পলায়মান বরাহ একটি কুকুর ও একজোড়া হরিণ। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গমনের ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট। পাটনা শহর থেকে প্রাপ্ত একটি মূর্তিতে নৃত্যরত অনুচরসহ সঙ্গী পরিবেষ্টিত ও হস্তে পানপাত্র ও অশ্ব বল্গাধৃত রেবন্ত এবং দৃশ্যপটে কয়েকটি বানর মূর্তিও।[৩৪]

জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত দশম শতাব্দীর এক মূর্তিতেও রেবন্তের মৃগয়া ক্রীড়ার দৃশ্য। অনুচর, শিকারী কুকুর ও গভীর জঙ্গলের মধ্য থেকে বরাহ নিষ্কাশন মানসে বাদ্যভাণ্ড বাদনের পরিচিত দৃশ্য। ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত দশম শতাব্দীর বিহারের এক রেবন্ত মূর্তিতে[৩৬] দেখা যায়, দেবতার দক্ষিণ হস্তধৃত পানপাত্রে তার এক নারী অনুচর মদ্য পরিবেশনে রত এবং তার বাম করে যথারীতি অশ্বের বল্গা। উর্দ্ধে দক্ষিণ কোণে এক অনুচরের স্কন্ধে একটি মৃত বরাহ এবং আর এক অনুচরবাহিত দীর্ঘ এক দণ্ড থেকে দোদুল্যমান একটি ক্ষুদ্র বরাহ। দেবতার বাম পায়ের নীচে একটি কুকুর। পাদপীঠে কুকুর বিতাড়িত পলায়মান বরাহের দিকে তীর নিক্ষেপরত এক অনুচর। তার পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত চার অনুচরের মধ্যে দুইজন বাদ্য বাদনরত। হোলাশগঞ্জ থানার দাফতু গ্রামের সূর্যমন্দিরে খোদিত দেখা যায় দশম শতাব্দীর অর্থাৎ পালযুগের একটি রেবন্ত মূর্তি।[৩৭] আঁটো জামা ও আজানু পাদুকা পরিহিত অশ্বারূঢ় দেবতার হস্তদ্বয়ে যথারীতি পানপাত্র এবং অশ্বরজ্জু; রয়েছে তরবারিও। অনুচর অনুচরীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রেবন্তের বামদিকে দণ্ডায়মান এক কাবড়বাহক এবং ডানদিকে দণ্ডায়মান দুই অনুচর-একজনের দণ্ডে বাঁধা দুটি বন্যশূকর এবং দ্বিতীয় জনের স্কন্ধে আর একটি শূকর। পাদপীঠে বিদ্যমান দুজন বাদক, এক ধনুর্ধর এবং বরাহের পশ্চাদ্ধাবনকারী একটি কুকুর। ভারতীয় যাদুঘরে প্রদর্শিত একাদশ শতাব্দীর একটি মূর্তিতে[৩৮] উপস্থাপিত সানুচর রেবন্ত; দেবতার

সম্মুখভাগে তরবারি ও অসিচর্ম হাতে দুই অনুচর। পাদপীঠে দৃষ্ট হয় অঞ্জলী মুদ্রা হস্তে এক ভক্ত, একদল গায়কবাদক এবং একেবারে বামকোণে পলায়মান একটি বরাহ। বিহার থেকে প্রাপ্ত ভারতীয় যাদুঘরের যে মূর্তিটিকে বিদ্যাবিনোদ কল্কির পরিবর্তে প্রথম রেবন্তমূর্তি বলে সঠিক চিহ্নিতকরণ করেন তার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ অশ্বারূঢ় দেবতার অনুসরণকারী দুই কুকুরের মধ্যে একটি অশ্বের সঙ্গে ছুটে চলেছে, অন্যটি একটি হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করছে। অশ্বের সম্মুখভাগে দুটি কৃষ্ণসার মৃগ; এক ধনুর্ধারী হরিণের দিকে শর নিক্ষেপে উদ্যত। আরও বিদ্যমান দুজন ঢোল ও দুজন ঝাঁঝ - বাদক, একজন ছত্রধারী, দুজন বাংঘি দণ্ড বাহক ও একজন জলবাহক। একজন বরাহ সদৃশ কোন পশু বহন করে চলেছে এবং আগে আগে চলেছে আরও কতিপয় সশস্ত্র অনুচর।[৩৯]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে বিহারের রেবন্ত মূর্তিগুলির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভাজন ধরা পড়ে। মূর্তি শিল্পশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে রেবন্ত মূর্তিকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বরাহমিহিরের বর্ণনানুসারী ''মৃগয়াক্রীড়াদি পরিবার' বিশিষ্ট অশ্বারূঢ় রেবন্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রথম শ্রেণীকে আবার দুটি ভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) এক ধরনের মূর্তিতে মৃগয়াকার্য প্রকৃতই সংঘটিত হতে দেখা যায়; (২) আর এক ধরনের মূর্তিতে মৃগয়া শেষে মৃগয়ালব্ধ পশু নিয়ে শিকারী দলের প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্যে রেবন্ত সানুচর শিকারী নন। স্কন্দপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুসরণে এখানে তিনি ত্রাতা ও দাতারূপে অবতীর্ণ। তিনি তার ভক্তদিগকে অরণ্য, বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড, শত্রু ও দস্যু তস্করের নিদারুণ ভীতি থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে উত্তরোত্তর কল্যাণ, সুখ, রাজ্য, আরোগ্য, কীর্তি ও উন্নতি প্রদান করেন। বিহার থেকে প্রাপ্ত রেবন্ত মূর্তিগুলিতে প্রথম শ্রেণীর দুটি ভাগই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিফলন একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ প্রতিবেশী বাংলাদেশেই রেবন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন দস্যু তস্কর সৃষ্ট বিপদের পরিত্রাতা রূপে।[৪০] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বৃহৎসংহিতার রচয়িতা বরাহমিহির নিজে ছিলেন মাগধী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত জ্যোতিষী রূপে তার প্রভাব ও সুখ্যাতি এবং 'দেশোয়ালী ভাই' এর প্রতি অটুট আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধার কারণেই সম্ভবত বিহারের শিল্পী তথা ভক্তগণ রেবন্ত মূর্তি উপস্থাপনে বৃহৎসংহিতার নির্দেশকে কখনও লঙ্ঘন করেননি। বাংলা ও বিহারের রেবন্তমূর্তিতে আর একটি লক্ষণীয় পার্থক্য হল এই যে, বঙ্গদেশে রেবন্তের দৃষ্টি তথা অশ্বের পদচারণা বাম অভিমুখে অথচ বিহারে তা দক্ষিণমুখী। রেবন্তমূর্তি নির্মাণে বাংলা-বিহারের পাল যুগের শিল্পীগণ আবার উত্তরভারতীয় ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। তবে মধ্যযুগের সূচনাপর্বে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের রেবন্ত মূর্তিতে যে কখনো কখনো দণ্ডী-পিঙ্গল বা নবগ্রহের মূর্তি দেখা যায়, তার অনুকরণ বিহার-বঙ্গের শিল্পীরা কখনও

করেনি। রেবন্ত প্রসঙ্গে বঙ্গ-বিহার সম্পর্কিত একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এখানে উল্লেখ করতেই হয়। বিহারে রেবন্তমূর্তির উদ্ভব ঘটে অন্তত পক্ষে পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে। অথচ বাংলাদেশের প্রাচীনতম রেবন্তমূর্তি হল নবম খ্রিষ্টাব্দের। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রেবন্তের মূর্তিপূজা বিহার থেকে ক্রমশ বঙ্গদেশ প্রসারলাভ করে এবং এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বিহারী যজমানদের সঙ্গে বঙ্গদেশে আগত শাকদ্বীপি তথা সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ।[৪১]

বিহার থেকে প্রাপ্ত অধিকাংশ রেবন্ত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে গয়া জেলাতে। সুতরাং রেবন্তের পূজা যে সেখানে বেশ জনপ্রিয় ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর রেবন্তের আরাধনা যে সূর্য পূজার অনুষঙ্গ বা অংশ রূপেই ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, তাও বোধ করি নির্দ্ধিধায় বলা যায়। পুরাণে রেবন্তের জন্মবিবরণ, তার অশ্বাসন, আজানু পাদুকা, কোমর বন্ধ, তরবারি, বর্মপরিধান, রবিবার সপ্তমী তিথিতে সূর্যপূজাবিধানে তার অর্চ্চনা, সূর্যমন্দিরগাত্রে তার মূর্তি নির্মাণ ইত্যাদি থেকেই সূর্যের সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তার সম্পর্কে জানা যায়। আর বলাই বাহুল্য, মূর্তি-মন্দির সহযোগে সূর্যের ব্যাপক পূজা ভারতবর্ষে প্রচলন করেন ইরান থেকে আগত শাপদ্বীপি মগ ব্রাহ্মণেরা। এই মগ ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীনকাল বিশাল সংখ্যায় বাস করতেন গয়া অঞ্চলে। বৃহৎ সংহিতাপ্রণেতা মগ বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই মনে হয়। তার নামের দ্বিতীয় অংশ মিহির' হল সূর্যবোধক সুপরিচিত পারসিক শব্দ। মধ্যযুগে মগধে বা বিহারে এই পারসিক মগ ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ দৃষ্ট হয়।[৪২] তাছাড়া, গয়া জেলার গোবিন্দপুর থেকে প্রাপ্ত ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে ও মগব্রাহ্মণগণ উল্লিখিত হয়েছেন।[৪৩] এই শিলালেখে সূর্যের দেহ থেকে মগ ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ও লিপিলেখকের পিতা ও খুল্লতাত কর্তৃক মগধরাজ বর্দ্ধমানের অধীনে চাকুরী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, গয়া অঞ্চলের মূর্তিগুলি স্থানীয় উজ্জ্বল কষ্টিপাথরেই নির্মিত হত।

মৃগয়া কেন্দ্রিক রেবন্তমূর্তিতে আমরা প্রায় সব সময়েই শিকারোপযোগী প্রাণী হিসাবে উপস্থিত দেখি বন্য শূকরকে ঃ বৃহৎ শূকর, ক্ষুদ্র শূকর, পলায়মান শূকর, আহত বা নিহত শূকর। এখন প্রশ্ন হল, বনে বাঘ, সিংহ, হরিণ এবম্বিধ কতশত প্রাণী থাকতে রেবন্ত শিকাররূপে বরাহকেই নির্বাচন করলেন কেন? সূর্যপুত্র রেবন্তের পক্ষে বিগগেম অর্থাৎ বাঘ, সিংহ সদৃশ বড় পশু শিকার করাই তো শোভনীয় ছিল। কিন্তু রেবন্ত যে দেবতা; বৈবিদস্যু ইত্যাদির ভয় থেকে তার উপাসকমণ্ডলীকে রক্ষা করাও যে তার অন্যতম বৃহৎকর্তব্য। আর অরণ্য সংলগ্ন বা নিকটবর্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করেন এবং মূলত শস্যউৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, বন্যবরাহ ব্যতীত আর কোন প্রাণী কি তাদের পক্ষে আরো ভয়ানক শত্রু রূপে গণ্য হতে পারে? বর্তমানে দার্জিলিং জেলার

সিঙ্গালীলা ও সিঞ্চেল বনবস্তির ভুক্তভোগীরা মর্মে মর্মে বরাহবৈরীতা উপলব্ধি করছেন।[৪৫] এই প্রাণী সাধারণত রাত্রিবেলা শষ্যক্ষেত্রে আসে এবং সমগ্র জমির মাটি একেবারে ওলটপালট করে দেয়; যেন ট্রাক্টরে চাষ করা হয়েছে। পরিণামে কৃষককে শষ্য উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হয়। দিনে রাতে সময়ে অসময়ে তার মারাত্মক আক্রমণের শিকারও হতে হয়। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি, আলোচ্য সময়ে বন্যবরাহ উপদ্রুত উপরোক্ত শ্রেণীর অগণিত মানুষেরা জীবন ও শষ্যের নিরাপত্তা-প্রাপ্তি-মানসে রেবন্ত-পূজা করতেন এবং রেবন্ত ও সদলবলে ক্ষুদ্র বৃহৎ একের পর এক বরাহ নিধন করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেন। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত বরাহকে জঙ্গল থেকে উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে এসে পশ্চাদ্ধাবন করে মারার যে কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্তি তার অপনোদনেই তো জলপূর্ণ কলস ও পানপাত্রের উপস্থিতি। কাজেই ভক্তের প্রয়োজনেই ভগবান রেবন্তের বরাহশিকার এবং ফলশ্রুতিতে ভাস্কর্যে তার প্রতিফলন। "..... মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবি শিকারী কৌমোর লোকায়ত দেবতা ছিলেন এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাহার সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অশ্বারূঢ় বলিয়া সূর্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ হন।[৪৬] রেবন্ত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড নামক উপজাতির এক অতি প্রিয় দেবতা। এই গোণ্ডেরা পশুশিকার ও মৃগয়ালব্ধ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত অনুরাগী ছিল।[৪৭]

উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে পরিশেষে আমরা কয়েকটি কথা বলতে পারি। ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি অঞ্চলে প্রথমে রেবন্তের মূর্তিপূজার সূচনা হয়, বিহার প্রদেশ তাদের অন্যতম। কোনো অঞ্চলে কোনো বিশেষ দেবতার মূর্তি প্রাচুর্য্যকে তার অধিক জনপ্রিয়তার মানদণ্ড হিসাবে যদি ধরা হয়, তাহলে রাজস্থানের পরেই বিহারের নাম উল্লেখ করতে হয়। ন্যূনপক্ষে পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ গুপ্তযুগে বিহারে রেবন্তের মূর্তিপূজার সূচনা হলেও সমগ্র পালযুগে তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এই শতাব্দীত্রয়ে বিহারে রেবন্ত মূর্তি তেমন দৃষ্ট হয় না। গুপ্ত ও পালরাজগণের দীর্ঘকালীন ধর্মসহিষ্ণু সুশাসনই যে বিহারে ঐ যুগদ্বয়ে রেবন্ত পূজার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, তা বলা, বোধ করি, অসংগত হবে না। ব্রাহ্মণ্যমতে রেবন্ত পূজার সূচনা ও বৃদ্ধি যেহেতু সূর্যপূজার অনুষঙ্গ রূপেই সেইহেতু মগধ তথা গয়া অঞ্চলের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণেরাই বিহারে রেবন্তপূজার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদানরূপে অশ্বের আবির্ভাব, ব্যবসায়ী কুলের দস্যু তস্কর ভীতি ইত্যাদি রেবন্তপূজার অনুপ্রেরক কারণ হলেও শষ্যোৎপাদনে বরাহের বিধ্বংসী উপস্থিতি বিহারে রেবন্ত পূজার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। রেবন্ত মূর্তি নির্মাণে ও কল্পনায় উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসৃত হলেও

বিহারের ভক্ত ও শিল্পীগণ আঞ্চলিক স্বকীয়তা বলিষ্ঠভাবেই বজায় রেখেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

সূত্র-নির্দেশ

১। এইচ. এইচ. উইলসন, *দি বিষ্ণুপুরাণ* (III, ২, ২-৭), পৃ ঃ ২১৪-১৫; পার্জিটার, এফ.ই., মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১০৫.৫-১২), CVIII পৃঃ ৫৭৫।
২। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১১/৬৪ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭৯)।
৩। ৩য়, ৭০.৫।
৪। *স্কন্দপুরাণ*, প্রভাসখণ্ড, ১/১১/২১৭-১৮ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩)।
৫। *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*, ১০৮/২১-২২ (নিরপেক্ষ ধর্মসত্তা সং, পৃ ঃ ১৫১)।
৬। *স্কন্দপুরাণ*, প্রভাসখণ্ড, ১/১১/২২৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩)
৭। ২/৫৬/২৬ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩)।
৮। ১/১৬০/৪ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮৩২)।
৯। ২/৫৬/৩২ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ৩০৭৩)।
১০। ২১১/১৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪০০)।
১১। *কালিকাপুরাণ*, ৮৫/৪৭-৪৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪)।
১২। *কালিকাপুরাণ*, ৮৫/৪৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ৫৫৪)।
১৩। *কালিকাপুরাণ*, ৮৫/৬৬, (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ৫৫৬)।
১৪। *স্কন্দপুরাণ*, ৭৯, ৭৮.৬।
১৫। *কালিকাপুরাণ*, ৮৫/৪৯ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ৫৫৪)।
১৬। *স্কন্দপুরাণ*, প্রভাসখণ্ড (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮৩২)।
১৭। *তিথিতত্ত্বম* (অষ্টবিংশতি তত্ত্বানি শ্রীরামপুর সং, প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৮৭।
১৮। *বৃহৎ সংহিতা*, ৫৮/৫৬ (কার্ন সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩২২)।
১৯। *পৃথ্বীরাজবিজয়*, সর্গ ১।
২০। *চতুর্বর্গচিন্তামণি*, ব্রতখণ্ড, পৃঃ১৩৭।
২১। *কুবলয়মালা* (সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা, বোম্বাই, (U.S. ২০১৫). পৃঃ ৬৮।
২২। *অশ্বশাস্ত্রম*, P.7 VV. 1-6।
২৩। বি. এন. শর্মা, *আইকনোগ্রাফী অফ রেবন্ত*, পৃঃ ৩৫-৩৯।
২৪। ভগবন্ত সহায়, আইকনোগ্রাফী অফ মাইনর হিন্দু এ্যাণ্ড বুদ্ধিষ্ট ডেইটিজ, পৃঃ ৮৯।
২৫। এ. এস. আর, খণ্ড ১৫, পৃঃ ২৩।
২৬। জ্যারন্‌ল অভ্ দী এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল ১৯০৯, পৃপৃঃ ৩৯১-৩৯২।
২৭। *বিষ্ণুধর্মোত্তর*, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৭০.৫.৫৩। ভবিষ্যপুরাণ, অধ্যায় ৯.৫.৮২; চতুর্বর্গচিন্তামনি, ব্রতখণ্ড, পৃঃ ১৩৭।
২৮। এস. সহায় এর প্রবন্ধ, "অ্যা রেয়্যার স্কাল্‌পচ্যার অভ্ রেবন্ত ফ্রম সুলতানগঞ্জ," *জ্যারন্‌ল অভ্ বিহার রিসার্চ সোসাইটি*, খণ্ড XLVII, পার্টস ১-৪, ১৯৬, পৃপৃ ২১১-২১২।

২৯। শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫৫।

৩১। এস. এম. শাস্ত্রীর প্রবন্ধ, *"দী হিলসা স্ট্যাচু ইনস্ক্রিপ্শানস্ অভ্ দী থার্টি ফিফ্‌থ ইয়ার অভ্ দেবপাল, জার্নাল অভ্ বিহার এ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি*, ১০,১ এবং ২, পৃ ৩২।

৩২। জে. এন. সমাদ্দার এর প্রবন্থ, "অ্যা নোট অন্ রেবন্ত", *জ্যারনল অভ্ বিহার এ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি*, খণ্ড ১৪, ১, পৃ ১৩৪।

৩৩। শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

৩৪। সহায় এস., প্রাগুক্ত. পৃঃ ৯৪।

৩৫। শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃপৃ ৫৬-৫৭।

৩৬। ঐ

৩৭। ঐ, পৃঃ ৫৫।

৩৮। ঐ, পৃঃ ৫৭।

৩৯। পণ্ডিত বিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদের প্রবন্ধ, "অ্যান ইলাস্ট্রেটেড্ নোট অন অ্যান ইণ্ডিয়ান ডাইট কলড্ রেবন্ত", *জ্যারনাল অভ্ এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল*, অক্টোবর, ১৯০৯, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৯ (নিউ সিরিজ)।

৪০। নীরদ বন্ধু সান্যাল এর প্রবন্ধ "অ্যা নিউ টাইপ অভ্ রেবন্ত ফ্রম দী দিনাজপুর ডিস্ট্রিক", *ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল ক্যোয়ারট্যারলী*, খণ্ড ৩, ১৯২৭, পৃপৃ ৪৬৯-৭২।

৪১। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর প্রবন্ধ, "বঙ্গের আদিমতম সপ্তশতী ও শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৮, পৃপৃ ২৬৫-৬৬।.

৪২। বিদ্যাবিনোদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯১, পাদটিকা-২।

৪৩। *এপিগ্র্যাফিয়া ইণ্ডিকা*, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩০।

৪৪। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী তাপসকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৪৫। *দি. স্টেটস্‌ম্যান*, ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃঃ ১।

৪৬। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৬২৭।

৪৭। শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃপৃঃ ৫৮-৫৯।

বৃহৎ সংহিতা ও অমরকোষে পরিবেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

নূপুর দাশগুপ্ত

বর্তমানে আমরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পরিবেশ সচেতনতা বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য তত্ত্ব বলতে যে বিষয়গুলি বুঝি সেই উপলব্ধি প্রাচীন ভারতে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল না — তার প্রয়োজন ও অনুভূত হয়নি, তবুও, জীবন কৃষি নির্ভর হওয়ায় এবং কৃষি - কার্য যে গভীর ভাবে প্রকৃতি - নির্ভর তা সম্যক উপলব্ধি হওয়ায় - প্রাকৃতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ, এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য করে প্রাকৃতিক পরিবেশের পূর্বাভাষ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যদিও ধ্রুপদী শিক্ষার স্তরে স্থান পায়নি প্রাচীনকালে, তবু বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত কৃষিকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা ক্রমে কালে কালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এক সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনায় মাত্রা পেয়েছে।

সাধারণভাবে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে গণ্য এই অর্থশাস্ত্রে কৃষি ব্যবস্থার উপর যে আলোকপাত হয়েছে তা কোন সামঞ্জস্যহীন, অবাস্তব ধারণা নয়। গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে কৃষির বিকাশ যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা এই অঞ্চলে জনবিকাশ, জনপদের সংখ্যা ও আকারের বৃদ্ধি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এই সময় চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র ও উত্তর ভারতীয় চকচকে, মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতির বিকাশ দেখা যায় সমগ্র গাঙ্গেয় অববাহিকা জুড়ে। সাথে সাথে হস্তশিল্পের বিকাশ ও হস্তশিল্প এবং কৃষিজাত পণ্যবস্তুর বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গেই কৃষিতে প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটে। তবে এই জ্ঞান প্রধানত কৃষিজীবি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা। ছিলও তাই। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের রাজনৈতিক দর্শনের পিছনে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করায় রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় আলোচনায় রাষ্ট্রের অর্থকরী দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। অর্থশাস্ত্রে বিবিধ বিষয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে লব্ধজ্ঞান পরিবেশন করা হয়েছে। কৃষি পদ্ধতি, কৃষি প্রযুক্তি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি সম্বন্ধেও আলোকপাত ঘটেছে।

অর্থশাস্ত্রের রচনাকালের প্রায় দু-তিনশো বছর পরে, গুপ্তযুগে রচিত বরাহমিহিরের

বৃহৎসংহিতা ও অমরসিংহের অমরকোষের মত অমূল্য ঐতিহাসিক সূত্রে এই ধরনের চর্চ্চার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। যদিও এর মধ্যে প্রায় তিনশো বছর অতিক্রান্ত তবুও স্পষ্ট বোঝা যায় সমাজের শিক্ষিত বৌদ্ধিক পরিমন্ডলের একটি স্তরে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনমুখী চর্চার কিছু ধারা ক্রমশ বয়ে চলেছিল। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মধ্যবর্তীকালে সংকলিত চরক সংহিতাই এর সাক্ষ্য বহন করে। মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে প্রাকৃতিক স্থিতাবস্থার প্রয়োজনীয়তা এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে মহামারী রোগের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দূষণের কথা বলা হয়েছে।

বৃহৎসংহিতার অন্তর্গত অধ্যায় সমূহে সামগ্রিকভাবে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের একটি ঐতিহ্য প্রতীয়মান। এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল কৃষি পদ্ধতি সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা, প্রবর্ষণ (অধ্যায় - ২৩), সদ্যোবৃষ্টি লক্ষণ (অধ্যায় - ২৮), ভূমিকম্প লক্ষণ (অধ্যায় - ৩২), পরিবেশ লক্ষণ (অধ্যায় - ৩৪), শস্যজাতক (অধ্যায় - ৪০) এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ (অধ্যায় - ৫৫) অধ্যায়গুলি পাঠ করলে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বৃহৎসংহিতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় জ্যোতিষবিদ্যার যে প্রভাব রয়েছে, তা থেকে উপরোক্ত অধ্যায়গুলি কিছুটা মুক্ত। বরং স্বাভাবিক দৃষ্টিতে, সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক পূর্বাভাষের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৃহৎসংহিতার এই প্রতিবেদনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও তথ্য এখানে আলোচনা করা যাক। যেমন প্রবর্ষণ অধ্যায়ে বর্ণিত বর্ষমানের কথাটি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে পূর্বেই জানা যায় যে বৃষ্টি মাপার প্রচলন সম্ভবত মৌর্য যুগেই ঘটেছে। বৃহৎসংহিতায় বৃষ্টির পরিমাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এক হাতের মাপের একটি পাত্র, যা সাধারণ ভাবে পঞ্চাশ পল জল ধারণ করে, তা বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হলে, ধরে নিতে হবে যে পতিত জলের পরিমাণ এক আঢ়ক।[২]

সদ্যোবৃষ্টি লক্ষণ অধ্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে যা বৃষ্টির পূর্বাভাষ বহন করে। তার মধ্যে একটি উল্লেখ করা যাক — আকাশ যদি গোনেত্র সদৃশ হয় এবং জলে লবণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, কাকের ডিমের বর্ণের মেঘ আকাশে দেখা দেয়, বাতাস স্তব্ধ হয়, ব্যাং বার বার ডেকে ওঠে, মাছ জল ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে - তাহলে শীঘ্রই বৃষ্টিপাত ঘটবে বলে ধরে নেওয়া যায়।[৩] এর মধ্যে কয়েকটি লক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় - বিশেষ করে ঝড় বৃষ্টির পূর্বকালে বাতাস স্তব্ধ হয় — জলপূর্ণ মেঘে বাতাসের গতিবিধি বন্ধ হয়। পুকুরের জলের তলায় অম্লজানেব (অক্সিজেন) অভাব ঘটে — সেই অবস্থায় পুকুরের মাছ অক্সিজেন নিতে পুকুরের উপরের স্তরে ভেসে ওঠে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে পরিবেশ লক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে — যা প্রাকৃতিক পরিবেশের গভীর পর্যবেক্ষণের

সূচক।[৪] তাছাড়া বৃহৎসংহিতাই সম্ভবত প্রথম সাহিত্যিক সূত্র যার মধ্যে ভূমন্ডলের বা আবহস্তরের একটি অস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্যোতিষবিদ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচলিত ধারাও। তবু কিছু কিছু বর্ণনা প্রাকৃতিক পরিবেশের দীর্ঘ ও গভীর পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্য বহন করে। পরিবেশ লক্ষণের সাথে মহামারীর যোগাযোগের একটি চিন্তাধারাও পাওয়া যায়।[৫]

তবে বৃক্ষায়ুর্বেদ অধ্যায়ে পরিবেশের প্রতি গভীর নিবিষ্টতা বিশেষরূপে প্রতীয়মান। বৃহৎসংহিতায় এই অধ্যায়টির অন্তর্ভুক্তিই প্রমাণ করে উদ্ভিদ সংক্রান্ত আগ্রহ ও পরিচর্যার প্রচলন প্রাচীন ভারতে বহুল মাত্রায় ছিল। এই (পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়) অধ্যায়ে মানব সমাজে বৃক্ষের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এবং এই উপযোগিতার কথা ভেবে বৃক্ষ পরিচর্যার বিষয়টি অনুপুংখ বর্ণিত। এই বর্ণিত বৃক্ষ সকলই ফল দায়ক নয়, সুতরাং খাদ্যের কথা ভেবে পরিচর্যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পরিবেশ রক্ষাই প্রধান ছিল। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন সাধারণভাবে সব গাছের কথাতেই বলা হয়েছে যে - ঘি, উশীর, তিল, মধু, বিড়ঙ্গ, ক্ষীর ও গোবর দিয়ে গাছের মূল থেকে শাখায় স্কন্ধ অবধি প্রলেপ লাগিয়ে তারপর রোপন করলে ফল লাভ হয়।[৭] সময় বুঝে ও প্রয়োজন মত বৃক্ষে জলসেচন করতে বলা হয়েছে।[৮] উল্লেখযোগ্য - বৃক্ষ রোপন কালে রোপিত বৃক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমান দূরত্ব রাখার কথা বলা হয়েছে — যাতে সব গাছ সমান ভাবে বেড়ে উঠতে পারে।[৯]

উদ্ভিদের নানা জাতীয় রোগের ও সেই রোগ নিরাময়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে। শীতে গাছের রোগ হয় - পাতা পাণ্ডুবর্ণ হয়ে ওঠে, শাখাকোষ থেকে স্রাব নির্গত হয়। তখন সে স্থানটি চিরে, সেখানে ঘি, পাক, বিড়ঙ্গ, ক্ষীরজল ইত্যাদির মন্ড লাগিয়ে তার চিকিৎসা করার নির্দেশ রয়েছে।[১০] বৃক্ষের ফল নষ্ট হলে অথবা ফলোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কুলথ, মাষ কলাই, মুগ, তিল ও যবশৃত শীতল জলে ভিজিয়ে সেই জল গাছের গোড়ায় দিতে বলা হয়েছে।[১১] বিভিন্ন প্রকার সারের মিশ্রণ বর্ণিত এই অধ্যায়। যেমন - একপ্রকারের কথা উল্লেখ করি - চারা, বীজ বা বৃক্ষের পোড়া চাল, মাষ কলাই, তিলচূর্ণ, ছাতু ও পুতিমাংস ভেজানো জলে ধুয়ে তারপর সেই বীজ বা চারা হলুদের কাঠে সেঁক দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।[১২]

এইরূপ অনুপুঙ্খ বর্ণনা বাস্তব অভিজ্ঞান লব্ধ। সুতরাং একথা বলা যায় যে বৃহৎসংহিতায় প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক কালে প্রচলিত উদ্ভিদ পরিচর্যার রীতি। চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ে যেমন কৃত্রিম জলাশয় খনন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে জলাশয়ের চারপাশে নানা ধরনের বৃক্ষ রোপণের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে।[১৩] সবথেকে উল্লেখযোগ্য মনে হয় জলাশয় শোধনের প্রসঙ্গটি। কূপের মধ্যে অঞ্জন, মুস্ত, উশীর, রাজ

কোশাতক, আমলক ও কতক ফলের চূর্ণ একত্র করে নিক্ষেপ করার নির্দেশ রয়েছে। কূপের জল যদি কলুষ, কটু, লবনাক্ত, বিরস বা দুর্গন্ধযুক্ত হয় তবে ঐ সব দ্রব্যচূর্ণ দ্বারা সে জল নির্মল, সুরস, সুগন্ধি ও নানা গুণযুক্ত হবে।[১৪] জলদূষণ বর্তমানে এক দারুণ সংকট। প্রাচীন যুগেও সম্ভবত জল দূষণ কোথাও কোথাও প্রকট ছিল। তাৎপর্যের বিষয় হল এই যে বৃহৎসংহিতায় এ বিষয়গুলির অবতারণা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে এক ধরনের মূল্যায়নের কথা বলে। খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর এই গ্রন্থে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের যে প্রতিচ্ছবি রয়েছে তা প্রাচীন ভারতীয়ের বাস্তবিক জীবনের গভীরে প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত এক জীবনযাত্রা থেকে জাত এক মূল্যবোধের স্বীকৃতি বহন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অপরিসীম নির্ভরতার বিষয়টি বিশদভাবে অনুভূত।

গুপ্তযুগেরই অপর এক অভিধানিক শব্দকোষ অমরসিংহ বিরচিত অমরকোষ। এই গ্রন্থে বাস্তবিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিশদ পর্যবেক্ষণের চিত্র আরও প্রোজ্জ্বল। অমরকোষে প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক উপাদান এবং প্রাণীবাচক সংজ্ঞা ও নামের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রাণীর শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে, যা লক্ষ্য করলে স্পষ্টতই সে যুগে প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ গভীর জ্ঞানের প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। এই রচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বারিবর্গ অধ্যায়।[১৫] যার মধ্যে বিভিন্ন পরিমাপ ও আকারের প্রাকৃতিক জলাধারের বর্ণনা রয়েছে সমুদ্র থেকে নদী বা জলোদগম পর্যন্ত। সমগ্র বিবরণটি নিরীক্ষণ করলে ভৌগলিক পরিমন্ডল সংক্রান্ত নামবাচক শব্দের উৎপত্তি ও প্রচলন দেখা যায়। এছাড়া বারিবর্গের অন্তর্গত বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নাম রয়েছে। মৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে মূল জাতিগুলির নাম করা যাক - গড়ুই, বোদাল, শিশুক, নলমীন, চিলিচিম (চিংড়ি) প্রোষ্ঠন বা পুঁটি, রোহিত, মদগুর থেকে তিমি পর্যন্ত। আবার জলজন্তু বলতে কর্কট, কামঠ, গ্রাহ বা হাঙ্গর, কুম্ভীর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতির শঙ্খ ভেক, এমন কি গন্ডুপদ, মহীলতা অর্থাৎ কেঁচোর পুংলিংগ ও স্ত্রীলিংগ অবধি উল্লেখিত।[১৬]

বারিবর্গে যেমন নদীবাচক বা সমুদ্রবাচক শব্দের অন্তর্ভুক্তি ভৌগলিক জ্ঞান প্রথাবদ্ধ হওয়ার দিকে নির্দেশ করে তেমনই ভূমিবর্গেও এই ধরনের ইঙ্গিত দেখা যায়।

বিশিষ্ট ভৌগলিক উপাদান স্বরূপ বারিবর্গে উল্লেখিত[১৭] নদনদীর মিলনস্থল। সম্ভেদ বা সঙ্গম, জলনির্গমন পথ - প্রণালী, দ্বীপ, নদীর তট বালুকাময় বা কর্দ্দমময়, নদীর বাঁক - বক্র বা পুটভেদ, ইত্যাদি যেমন পাওয়া যায়, তেমনই ভূমিবর্গে বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা বাচক শব্দও পাওয়া যায়। প্রশস্ত মৃত্তিকা বাচক - মৃৎসা, সর্বশষ্যোৎ পত্তিযোগ্যা মৃত্তিকা - উর্ব্বরা ক্ষারমৃত্তিকা - উষ।[১৮] আবার বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট স্থলের বিভাজন করা

হয়েছে। নির্জল দেশের নাম মরু, পতিত ভূমি - খিল, কর্দমযুক্ত স্থান-পঙ্কিল, জলময় স্থান - অনূপ, শর্করাময় স্থান (কাঁকরময়) - শর্করিল, সিকতাময় স্থান-সৈকত ইত্যাদি।[১৯]

এরপর শৈলবর্গে পর্বতবাচক শব্দের তালিকায় বিভিন্ন দৈর্ঘের পর্বত এবং পর্বতের বিভিন্ন উপাঙ্গের নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। মহীধ্র ও শিখরিন মাল্যবন্ত, হিমবন্ত্, নিষধ, বিন্ধ্য ইত্যাদি[২০], অর্থাৎ উচ্চশিখর যুক্ত ও হিমবাহ বিশিষ্ট থেকে জঙ্গলাকীর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাহাড়ের কথাও বলা হয়েছে।

আশ্চর্যের কথা আধুনিক ভূগোলে যেভাবে উচ্চ, মধ্য ও প্রান্ত পর্বতশ্রেণীর কথা বলা হয় সেরকমই অমরকোষে পর্বতের উচ্চস্থান - প্রপাত, মধ্যস্থল - কটক, মূলপর্বতের চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র পর্বত বলতে পাদ বা প্রত্যন্ত পর্বতের শ্রেণী বিভাজন ও নির্দিষ্ট নামকরণ ঘটেছে। পর্বতের উপরিস্থিত সমভূমি - অধিত্যকা ও নিম্ন সমভূমি - স্নু বা প্রস্থ নামে অভিহিত।[২১] এইভাবে বিভিন্ন ভৌগলিক বৈশিষ্ট ও আকার সম্পর্কে ধ্যানধারণা নথিবদ্ধ ও নামকরণের মাধ্যমে তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। গুপ্তযুগের এই দীর্ঘ তালিকার প্রতিবেদন ভৌগলিক জ্ঞান প্রথাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়।

তবে বনৌষধিবর্গের মতো দীর্ঘ তালিকা অমরকোষে আর নেই। বস্তুত গুপ্তযুগের বহু আগে থেকেই গাছ গাছড়া সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান চলেছিল কৃষক ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে। চিকিৎসা, খাদ্য, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৃক্ষাদির উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় মানুষ অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। উদ্ভিদ জ্ঞানের চর্চাও বহুল প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্রেও ওষধি বৃক্ষের বিশেষ উদ্যান সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা আলোচিত হয়েছে। চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় প্রাপ্ত সুদীর্ঘ আলোচনায় ওষধিবৃক্ষ ও নানা প্রকার উদ্ভিদের বর্ণনা ও তাদের গুণাগুণের বর্ণনা সেকথাই বলে। অমরকোষে আভিধানিক ধারায় বিভিন্ন অরণ্যবাচক শব্দ, যথা অটবী, অরণ্য, বিপিন ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ ও উদ্ভিদের জাতিগত পরিচয় ও এই জাতির অন্তর্ভুক্ত গাছের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি জাতির নাম দেওয়া হল ঃ[২২]

অঙ্কুরবাচক

বৃক্ষবাচক

বানস্পত্য

বনস্পতি

ওষধি

ফলেগ্রহি (ফলজনক)

বন্ধ্য বা অফল (বন্ধ্যা বৃক্ষ জাতি)

ফলবন্ত্, ফলিন (ফলযুক্ত বৃক্ষবাচক)

স্ফুট (প্রস্ফুটিতের বাচক)

স্থান (নেড়া গাছ)

স্তব, গুল্ম (কান্ডহীন বৃক্ষ)

বল্লী, ব্রততী (লতাবাচক)

গুল্মিনী (বহুশাখা ও পত্রযুক্ত লতা)

বনৌষধিবর্গের ১১ নম্বর পংক্তি থেকে ৮২ নং শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ বৃক্ষজাতির শ্রেণী উল্লেখিত।

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন বৃক্ষাদির সমাবেশে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বনানীর বর্ণনাও রয়েছে। অভিধানে এই শব্দগুলির অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে কৃত্রিম বনানী ও উদ্যান সাধারণ ভাবেই জনসন্নিবেশের অন্তর্গত ছিল। পরিবেশ উন্নয়নের চিন্তা বা মনোরম প্রকৃতি যে মানুষের কাম্য - কৃত্রিম উদ্যান সৃষ্টি সে কথাই স্পষ্ট করে। বনৌষধি বর্গে[২৩] বর্ণনা রয়েছে গৃহারাম, নিষ্কুট-গৃহসমীপস্থ কৃত্রিম বনবাচক শব্দ। আরাম বা উপবন কৃত্রিম বনবাচক সাধারণ শব্দ। বৃক্ষবাটিকা অমাত্য ও বেশ্যার গৃহসমীপস্থ উপবন বাচক। আক্রীড় রাজার সাধারন উপবন। প্রমোদবন - রাজার অন্তঃপুরস্থ বিহারকানন। বৃহৎসংহিতায় এরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মানব সমাজের পক্ষে পরিবেশ উন্নয়নের কথা ভেবেই নির্দেশ রয়েছে গৃহসংলগ্ন উপবনে বা গৃহের অগ্রে অরিষ্ট, অশোক, পুন্নাগ, শিরীষ ও প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি মাঙ্গল্য বৃক্ষসকল রোপন করা প্রয়োজন।[২৪] গাছ গাছড়ায় বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে বিস্তৃত ও অনুপুংখ জ্ঞান তৎকালীন ভারতীয়ের আয়ত্তে ছিল তা বোঝা যায় বৃক্ষজাতির সুদীর্ঘ তালিকা থেকে।

একইরকম গভীর নিরীক্ষার অভিজ্ঞান পাওয়া যায় পশু পক্ষীর ক্ষেত্রেও। অমরকোষের সিংহবর্গের তালিকায় উল্লেখিত প্রজাতির নাম থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়। সিংহজাতি, ব্যাঘ্রজাতি, শূকরবাচক থেকে তৃণভোজী পশু যথা কপিজাতি, হরিণজাতি, মহিষবাচক, এমনকি গৃহপালিত পশু যথা মার্জার, ছোট প্রাণী. কীট-পতঙ্গ ও সবশেষে অসংখ্য পাখির প্রজাতির শ্রেণীবদ্ধ তালিকা[২৫] অমরকোষের আভিধানিক যথার্থ প্রমাণ করে। কয়েকটি পতঙ্গের উল্লেখ করা যাক - সরট বা কাকলাস, গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকটিকি, লূতা, উর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা, নীলাঙ্গু ও ক্রিমি, কর্নজলৌকস্ বা কানবিছা, বৃশ্চিক, অলিন বা দ্রুন অর্থাৎ চেলাবিছা ইত্যাদি।[২৮] অসংখ্য পক্ষী প্রজাতির বর্গ ও তার অন্তর্গত পক্ষী গোষ্ঠীর নাম একইভাবে সানুপুঙ্খ নিরীক্ষণের পরিচায়ক। আরও বেশি উল্লেখযোগ্য সিংহবর্গের ৯৬ শ্লোক থেকে ১০৩ শ্লোকে বর্ণিত পক্ষীর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের বিভাগ ও

নাম, জন্মাবধি বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ের নাম, পক্ষীরা যেভাবে সংঘবদ্ধ হয় সেই জোটের বিভিন্ন নাম যথা - দ্বন্দ্ব, যুগ, সমূহ, ব্যূহ, ব্রজ, স্তোম, সমুদয় সমবায়, চয়, বৃন্দ ইত্যাদি।

ইদানীং বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও প্রযুক্তির বিকাশ সম্বন্ধীয় গবেষণা ভারতীয় ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে স্বীকৃত। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ স্বনামধন্য ভারতবিদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে উন্মোচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সম্পর্কে বহুপূর্বেই আলোকপাত করেছেন। প্রাচ্যবিদ্ থিবোট, ফিলিওজাট, এ্যালবার্ট বার্ক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক সানা উল্লাহ্ ম্যাকে, সাংকালিয়ার প্রতিবেদনে স্পষ্টই প্রাচীন ভারতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত বহুল পরিমানে বর্তমান। কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞানের আধুনিক শৈলীটি নিতান্তই নবীন। ১৯৫০ এর দশক থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক এমনকি ইতিহাসগত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক এক পরিশীলিত বিদ্যাচর্চায় পরিণত। আধুনিক যুগের দূষিত পরিবেশ, অতি ব্যবহারের দীর্ন প্রাকৃতিক পরিমন্ডল, সবই নতুন প্রজন্মের সামনে মহাসংকটের আকার ধারণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, যখন পরিবেশ বিদ্যার বিষয়গুলি মানবসমাজের সামনে অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে ধরে, তখন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসার যে দৃষ্টান্ত বৃহৎসংহিতা বা অমরকোষে প্রতিফলিত তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের গভীরতার এই দিকটি ও ভারতীয় দর্শনের মূলে নিহিত প্রকৃতি পরিমন্ডলে সমস্থিত মানবজীবনের নিবিড়তার বোধ থেকে জাত এক বিশ্ব দর্শন আমাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা, পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবহারিক শীলতার চর্যায় অনুপ্রাণিত করে।

সূত্র-নির্দেশ

১। *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম*, ২,১,৩, ২,১,১, ২,২৪, ১-১১।

২। *বৃহৎসংহিতা*, ২৩ অধ্যায়, ১ ও ২।

৩। ঐ, ২৮, ৪।

৪। ঐ, ৩৪, ১-৭।

৫। ঐ, ৩৪, ৭ ও ২২।

৬। ঐ, ৫৫।

৭। ঐ, ৫৫, ৭।

৮। ঐ, ৫৫, ৯।

৯। ঐ, ৫৫, ১২, ১৩।

১০। ঐ, ৫৫, ১৪, ১৫।
১১। ঐ, ৫৫, ১৫।
১২। ঐ, ৫৪, ১১৮, ১১৯।
১৩। ঐ, ৫৫, ২১।
১৪। ঐ, ৫৪, ১২১, ১২২।
১৫। *অমরকোষ*, প্রথম কান্ড, বারিবর্গঃ, ৩৪-১৫৪ শ্লোক।
১৬। ঐ, শ্লোক ৭৯-১০৪।
১৭। ঐ, শ্লোক ৪২-৫২।
১৮। *অমরকোষ*, দ্বিতীয় কান্ড, শ্লোক, ৩-৮।
১৯। ঐ, শ্লোক ২২ ২৭।
২০। *অমরকোষ*, দ্বিতীয় কান্ড, শৈলবর্গ শ্লোক, ১-৬।
২১। ঐ, ৯ ১১।
২২। *অমরকোষ*, দ্বিতীয় কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ, শ্লোক, ১১ ২৪।
২৩। ঐ, শ্লোক, ৩-৭।
২৪। *বৃহৎসংহিতা*, ৫৫ অধ্যায়ে - ৩।
২৫। *অমরকোষ*, দ্বিতীয় কান্ডে, সিংহাদিবর্গ।

রোম-ভারত বাণিজ্যে মৃৎপাত্রের ব্যবহার

শ্রাবণী দত্ত

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এবং তার পরেও ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক নাগাদ ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য শুরু হয়। এই বাণিজ্য পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্য ও পূর্বপ্রান্তে চীনের হান সাম্রাজ্যের মধ্যে হত। রোমের ক্ষমতা বিস্তার ও এক বৃহৎ শাসব গোষ্ঠীর উদ্ভব হওয়ায় বিলাস দ্রব্যের চাহিদা রোম সাম্রাজ্যে ও রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিলাস দ্রব্যের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে সবচেয়ে বেশী কদর ও চাহিদা ছিল রেশমের। এই রেশম কেবলমাত্র চীনেই উৎপাদিত হত। বুলনয়ের রচনায় রেশম পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

রোম - ভারত বাণিজ্যে যে পণ্যগুলির লেনদেন হত, প্লিনির ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া, 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি'[২] ও টলেমীর[৩] ভূগোল থেকে তার খানিকটা আন্দাজ করা যায়। এই বিদেশী গ্রন্থ থেকে আমদানি ও রপ্তানীযোগ্য সামগ্রীর তালিকা পাওয়া সম্ভব।[৪] প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননও আমাদের এই বিষয় আলোকপাত করে। রোমে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মধ্যে বিলাসব্যসন দ্রব্যের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এই জাতীয় পণ্য অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রীত হত, যার ফলে এই রপ্তানীতে নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের বিপুল লাভের সম্ভাবনা ছিল।[৫]

পশ্চিম এশিয়া তথা রোম থেকে ভারতে আমদানীর তালিকাটি ক্ষুদ্রতর ও পণ্যের তালিকাতেও বৈচিত্র্য স্বল্প। এই তালিকায় সুরার উল্লেখ আছে। ইটালীয়, লাওডিসীয় ও আরবী সুরার আমদানীর বিষয় পেরিপ্লাসে বর্ণিত হয়েছে। মালাবারেও বিদেশী সুরা আমদানী হত। ভারতবর্ষে সুরা আমদানীর অপর সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে প্রচুর পরিমাণ পানপাত্র ও পানীয় রাখার জারের উল্লেখ করা যায়। সুরা রাখার পান-পাত্রগুলি 'এ্যাম্ফোরা' নামে খ্যাত। এগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এই বাণিজ্য সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। বহুপ্রকার মুদ্রা ছাড়া ভারত-রোম বাণিজ্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ প্রমাণ হল পশ্চিম দুনিয়া থেকে আগত বিভিন্ন প্রকারের মৃৎপাত্র; যথা এ্যারাটাইন ওয়্যার, রুলেটেড-ওয়্যার এবং এ্যাম্ফোরা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে এই মৃৎপাত্রগুলির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে মৃৎপাত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্যার মার্টিমার হুইলার[৬] প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন উৎখননের ফলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর দ্বারা দক্ষিণ-ভারতীয় সভ্যতাগুলির তারিখ নির্ণয় করার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আরিকামেদুর উৎখননের ফলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলি পরীক্ষা করে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন যে এই অঞ্চলটির সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। উৎখননের ফলে এখানে তিনপ্রকারের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

এ্যারাটাইন মৃৎপাত্রকে 'red glazed ware' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে কারণ এই পাত্রগুলির রং গালার রং থেকে ঘন লাল কমলা রংয়ের ব্যবহার করা হয়েছে। ইতালির এ্যারোটিয়াম (Arretium) অধুনা এ্যারাজোতে (Arezzo) এই ধরনের মৃৎপাত্র তৈরী হত বলে এই ধরনের মৃৎপাত্রের নাম এ্যারাটাইন পাত্র। এই ধরনের মৃৎপাত্রের প্রচলন খ্রিঃ পূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত ছিল। ইতালির পুটগুলি, মোডেনা, রিমিনিতে এই ধরনের মৃৎপাত্র নির্মিত হত। এই মৃন্ময় পাত্রগুলি টেরা সিজিলাটা (stamped poteary) নামে পরিচিত ছিল কারণ সীলমোহরের ছাপ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল।[৭]

ভারতবর্ষে আরিকামেদুতে এই ধরনের মৃৎপাত্র সর্বপ্রথম দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান আরিয়ানকুপ্পাম নদীর মোহনাতে যে এ্যারেটাইন পাত্রের সর্বশেষ নমুনা পাওয়া গেছে মোট ৪৫-৫০ খ্রিষ্টাব্দের। এই মৃৎপাত্রের অনেক ছোট ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে যার উপর পাতার অঙ্কন (leaf pattern) পাওয়া গেছে। অন্যান্য পেয়ালা ও থালার ভগ্নাংশে এই মৃৎপাত্রগুলির উপর সাধারণভাবে প্রচলিত রুলেট-এর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাই অনুমান করেছেন যে এই বৈশিষ্টগুলি অনেক পরবর্তীকালের। তাই ২০-৫০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময় আরেকামেদুতে এই এ্যারাটাইন পাত্র পাওয়া গেছে।

মর্টিমার হুইলারের রিপোর্টের মাধ্যমে জানা গেছে যে এ্যারাটাইন মৃৎপাত্রের বাইশ রকম নমুনা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটিতে VIBII (VIBIE অথবা VIBIF), ITTA এবং CAMVRI শব্দটির শীলমোহরের ছাপ আছে। একটির উপরিভাগে গোলাকার সূক্ষ্ম রুলেটের চিহ্ন আছে। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে এখানে একটি মৃৎপাত্রের টুকরো আবিষ্কার হয়েছিল হাল্কা লাল পালিশ যুক্ত ধূসর লাল বর্ণের। এটির উপর বাইরের দিকে এবড়ো খেবড়ো রুলেটের চিহ্ন রয়েছে।

রোম সাম্রাজ্যে উন্নতমানের দুইধরনের 'টেরা সিজিলাটা' পাওয়া গেছে। এই দুই ধরনের পাত্রগুলি এইরূপ—

রোম সাম্রাজ্যের প্রথম ধরনের 'টেরা সিজিলাটা' সাধারণ এবং দ্বিতীয়টি ছাঁচে তৈরী

অলঙ্কারযুক্ত মৃন্ময়পাত্র। উৎপাদিত দ্রব্যগুলি উচ্চমানের ছিল। প্রাপ্ত নমুনা পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় যে এগুলি "Table Service" অর্থাৎ ভোজ্য খাদ্য পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হত। ক্যাটিনি (বড় পাত্র) এবং ক্যাটলি (রেকাব) নামক দুই ধরনের (থালা) খাদ্য রাখবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। সব ধরনের পেয়ালা। পানপাত্র এবং বাটি প্যারোপসাইড নামে অভিহিত হত। ১৯৬৮ খ্রিঃ One এবং Comfort এর মিলিত প্রচেষ্টায় 'Campus Vasorum Arretinorum' -এর অন্তত ২৬০০ বিভিন্ন ধরনের সীলমোহর (Stamp) অথবা সই (Sigilla) সংগ্রহ করেছেন যা সাধারণত পাত্রের গাত্রে ছাপ দেওয়া হত। সীলমোহরগুলি পরীক্ষা করে মৃৎপাত্রগুলির নির্মাণের তারিখ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। সূচনাকালে এ্যারাটাইন মৃৎপাত্রের উপর গোল অথবা আয়তাকার সীলমোহর ব্যবহৃত হত। আরিকামেদুতে সিজিলাটা 'বি' এবং সিজিলাটা ইটালিকা এই দুই ধরনের নমুনা পাওয়া গেছে।[৮] কম্ফর্ট[৯] মন্তব্য করেছেন, এই দুই ধরনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। প্রথম বিভাগটি (Eastern Sigillata B) বিভাগটির ক্ষেত্রে এশিয়া মাইনর-এ বিশেষত ট্রালেস শহরাঞ্চলে এর নমুনা পাওয়া গেছে।' আরিকামেদু থেকে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের অংশের নমুনা থেকে হেস (Hayes) অনুমান করেছেন যে এগুলি সম্রাট অগাস্টাসের পরবর্তীকালের অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সিজিলাটা ইটালিকার বহু অংশ ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে যেগুলি (থালা, রেকাব) হল্টর্ণ প্যাটার্ণ পাত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি ১০ এবং ২০ খ্রিষ্টাব্দে উৎপাদিত হয়েছিল।

এই ধরনের সূক্ষ্ম এবং সুন্দর রোমক টেবিলের উপর রক্ষিত ভোজ্যদ্রব্যের পাত্রের (tableware) উপস্থিতি পণ্ডিতেরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হতে পারে এগুলি সুদূর রোম সাম্রাজ্য থেকে আমদানী হত ভারতে আঞ্চলিক অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে। কম্ফর্ট অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। রোমানদের একটি গোষ্ঠী মালাবার উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল।[১০] এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল মুক্ত পুরুষেরা অথবা বণিকরা যারা প্রতীচ্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। অন্যভাবে, বলা যেতে পারে, যে এই বণিকরা ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে পণ্যের আমদানী রপ্তানী করত। এই ধরনের মৃৎপাত্রের প্রভাব ভারতবর্ষের আঞ্চলিক মৃৎপাত্রের উপর পড়া স্বাভাবিক বিশেষ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত রুলেটেড মৃৎপাত্রের উপর। কম্ফর্ট উপলব্ধি করেছেন যে আরিকামেদুতে খুড় দেওয়া পেয়ালাগুলি এ্যারাটাইন ও এ্যরাটাইন-পূর্ব যুগের কিন্তু যে পেয়ালাগুলির নীচে খুড় পাওয়া যায়নি সেগুলি আঞ্চলিকভাবে নির্মিত হয়েছে। এই ধরনের অনুকরণীয় বা 'imitation pottery' হুইলারের মতে, আঞ্চলিক পাত্রগুলির থেকেও ভিন্ন, সেই কারণে তিনি এগুলির আমদানী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

হেলেনীয় যুগে মৃন্ময় পাত্রের উপর এই ধরনের ছাপ দিয়ে অলঙ্কার করার পদ্ধতি রুলেটেড অলঙ্কারের উদ্রেক করে। এই পদ্ধতিতে নির্মীয়মান মৃন্ময় পাত্রটির ভেজাগাত্রে ঘূর্ণিয়মান দাঁতবিশিষ্ট চাকা দ্বারা সুষম বিদ্ধকরণযুক্ত অলঙ্করণ ঘটানো হত। এই ধরনের পদ্ধতিতে মৃন্ময়পাত্রের বাইরে ও ভিতরে অলঙ্কার করা হত রোম যুগের শেষ পর্যন্ত। ভিতরের অংশ পালিশ করা হত। অনেক সময় এই পালিশ N. B. P. (উত্তরের কৃষ্ণবর্ণ পাত্রের) পাত্রের সমতুল্য ছিল যদিও অনেকক্ষেত্রেই নিকৃষ্টমান লক্ষ্য করা যায়। এ্যারাটাইন পাত্রগুলি ভগ্নাংশ উজ্জ্বল পালিশযুক্ত। এই ধবনের পদ্ধতি মৃৎপাত্রগুলি অগভীর এবং মসৃণ থালায় এবং অগভীর বাটিতে লক্ষ্য করা যায়। রুলেট অঙ্কনগুলি অতিক্ষুদ্র ত্রিভুজ, হীরক এবং সামন্তরিক ক্ষেত্র, গোঁজাকৃতি (wedge) খাড়া অর্দ্ধচন্দ্র (upright crescent), বিন্দু অথবা ডিম্বাকার ফুটকি চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রতিটি স্তরে ত্রিভুজ অঙ্কনটি অতি প্রচলিত। রুলেটিং পদ্ধতি ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রথম শুরু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মগিরি, চন্দ্রাবল্লি, অমরাবতী, শালিহুণ্ডাম, উরাইয়ুর, নাট্রামেডু, সেঙ্গামেডু ও কাঞ্চীপুরমে। শিশুপালগড় ও তমলুকেও পাওয়া গেছে। শিশুপালগড়েরও উপরিস্তরের নমুনাগুলি নিকৃষ্টমানের এবং ওই অঞ্চলেরই নির্মিত।

রোম সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত উচ্চ-গ্রীবাযুক্ত দুই হাতল-বিশিষ্ট মৃন্ময় পাত্র বিশেষকে এ্যাম্ফোরা নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীক, রোমান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রাচীন লোকেরা পানীয়ও সহজে পচনশীল ও ধ্বংসশীল দ্রব্যাদি এ্যাম্ফোরার মাধ্যমে স্থানান্তর করা হত। মাছ, সসে ডোবানো মাছ (garum), ফল, বাদাম, ভিনিগার, মধু, অলিভ তেল প্রভৃতি পচনশীল পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ করে এমন মৃৎপাত্রে ভরে ভালভাবে মুখ এঁটে দেওয়া হত যেগুলি প্রতিকূল উত্তাল সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য ও দুর্গম পথ অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট শক্তপোক্ত ছিল। এই পাত্রগুলি এঁটেলমাটি দ্বারা নির্মিত হওয়ার জন্য এগুলি তৈরী করার জন্য ব্যয় সঙ্কোচন করা সম্ভব হত। গড়পড়তা এদের উচ্চতা ছিল এক মিটার এবং শূন্য অবস্থায় এদের ওজন ছিল চল্লিশ পাউণ্ড। রোমান যুগে এগুলির মধ্যে ছ গ্যালন তরল পদার্থ সংরক্ষিত হত।

দৈনিক ব্যবহারের জন্য এ্যাম্ফোরার প্রচলন কিন্তু হয়নি। দেশ থেকে দেশান্তরে কোন বিশেষ পদার্থ এ্যাম্ফোয়ার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হত। এ্যাম্ফোরা - amphi (দুইদিকে) এবং ফেরিন (pherein) অর্থাৎ বহন করা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যে তৈল এবং সুরা পাঠানোর জন্য এ্যাম্ফোরার ব্যবহার করা হত। কয়েকটি মৃন্ময়পাত্রের ভিতরের অংশের রাসায়নিক পরীক্ষা করে রেসিনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কুম্ভকারেরা এ্যাম্ফোরার আকৃতির পরিবর্তনের দিকে কোনওভাবে নজর না দিয়ে এর কার্যকারিতার উপর বেশী গুরুত্ব দিত।

উত্তর-আফ্রিকা, ইতালি ও দক্ষিণ স্পেনে প্রাপ্ত এ্যাম্ফোরার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একেক ধরনের এ্যাম্ফোরা একেক জায়গায় পাওয়া গেছে। বহু এ্যাম্ফোরার গাত্রে অঙ্কিত লেখ পাঠ করে বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে, যেমন—পাত্রে কী ধরনের পণ্য আছে, যেমন জানা যায় তেমন উৎপাদকের নাম, তাঁর ভূসম্পত্তির অবস্থান ও কন্সালদের রাজত্বকাল জানা গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠী অথবা খামারের কথাও জানা গেছে। কোনও বিশিষ্ট এলাকায় বাণিজ্যের তীব্রতা, বিশেষ কোন সংস্থার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং সেই এলাকার দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রাক্-এ্যারাটাইন সময়ের ও এ্যারাটাইন পরবর্তীকালের এ্যাম্ফোরাও আরিকামেদুতে পাওয়া গেছে।[১১] ভারতের উত্তর পশ্চিমদিকের তক্ষশিলার সিরকাপ শহরে শক-পহ্লব আমলের এ্যাম্ফোরার উপরিভাগ পাওয়া গেছে। অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলের মহাবলিপুরামের দক্ষিণে বাসবসমুদ্রমে হাতলযুক্ত এ্যাম্ফোরা পাওয়া গেছে।

দাক্ষিণাত্যে ভূমধ্যসাগরীয় এ্যাম্ফোরার নকল পাওয়া গেছে। লালবর্ণ ছাড়াও এগুলি যথেষ্ট অনুজ্জ্বল, লম্বাটে, শঙ্কুর আকৃতি বিশিষ্ট, হাতলবিহীন এবং এর বেধের পরিমাপ ২-৩ সেন্টিমিটার। চন্দ্রকেতুগড়ের ধূসরবর্ণের এ্যাম্ফোরা রোমের এ্যাম্ফোরার সদৃশ। কাঞ্চীপুরমের ক্ষতিগ্রস্ত এ্যাম্ফোরা সারিবদ্ধ সাজানো হয়েছে। নাট্রামেডুতে এ্যাম্ফোরাও এই ধরনের।

রোম ভারত বাণিজ্যের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ভারতীয়রা রোমান মৃৎপাত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এগুলি নকল করতে লাগল। এর ফলে ভারতীয় শিল্প শৈলী বৈদেশিক প্রভাবযুক্ত হল এবং নতুন শিল্পসৃষ্টি হল।

সূত্র-নির্দেশ

১। চীনের রেশম স্থলপথে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মধ্য-এশিয়ার টাকলামাকান মরুভূমির মধ্য দিয়ে, বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে পামির মালভূমি ও ইরান হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছত। সেখান থেকে রোমে ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শাসক ও বিত্তবান গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে যেত। যেহেতু এই পথে যে সব সামগ্রী আনা নেওয়া হত তার মধ্যে রেশমের গুরুত্ব ও দাম ছিল সর্বাধিক সেই কারণে এই পথের নামকরণ করা হয়েছিল রেশম পথ বা সিল্ক রোড।

২। ৭৯/৮০ ১১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

৩। ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের রচনা।

৪। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই তিনখানি গ্রন্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই গ্রন্থগুলিতে আছে ভারতের বিভিন্ন বন্দর, পোতাশ্রয়, আমদানি রপ্তানি দ্রব্য এবং খনিজ সম্পদ, জীবজন্তুর তথ্য।

৫। প্লিনি তার গ্রন্থে অনুতাপ করে বলেছেন যে, ভারতীয় পণ্য রোমের বাজারে একশত গুণ চড়া দামে বিক্রী হত আর ভারতীয় পণ্যের দাম মেটাতে প্রতি বছর অসংখ্য রোমক মুদ্রা ভারতে চালান যেত।

৬। *এ্যান্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* বুলেটিন অফ দি আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, নম্বর ২, জুলাই ১৯৪৬, মর্টিমার হুইলার, 'আরেকামেডু ঃ এ্যান ইন্দো-রোমান ট্রেডিং স্টেশন অন দি ইষ্ট-কোষ্ট অফ ইণ্ডিয়া,' দিল্লী।

৭। *এ্যান্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* বুলেটিন অফ দি আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, নম্বর ২, জুলাই ১৯৫৬, 'আরেকামেডু ঃ এ্যান ইন্দো - রোমান ট্রেডিং স্টেশন অন দি ইষ্টকোষ্ট অফ ইন্ডিয়া, দিল্লী।

৮। কে. কেনইয়ন এই শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

৯। Howard Comfort (Terra Sigillata at Arikamedus Rome and India, পৃঃ ১৩৪), "Hurra discase, all varieties were loosely bound together by a tradition of red surface called Glauzten Flin, by two leading techniques of moulded enterior decoration or of wheet made plain tableware, and by the very common (though not universal) practice of manufactures names stamped on the upper face of the bottom."

১০। ক্যানানোরের নিকটবর্তী মুজিরিম বন্দরে রোমক জাহাজগুলির শুধু আনাগোনা ছিল না, সেখানে সম্ভবত রোমক বণিকদের একটি স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের রচনা ট্যাবুলা পিউটিনজেরিয়ানা গ্রন্থে মুজিরিসে রোমক সম্রাট অগাস্টাসের স্মৃতিতে গড়া এক মন্দিরের উল্লেখ আছে। রোমকরা তাদের সম্রাটদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। মুজিরিসে রোমকদের স্থায়ী বসতি না থাকলে সেখানে ঐ জাতীয় মন্দির গড়ে উঠত না। কিমিনো, আর, এম "দি ট্যাবুলা পিউটিনজেরিয়ানা" "এন্সিয়েন্ট রোম এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১০-১১, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪।

১১। হুইলার আরেকামেড় সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

i) Pre-Arretine ie finds from the layers underlying those which yielded Arretire Pottery and ascribable to the end of the 1st century BC or the beginning of the (1st ad.),

ii) "Arretine" i.e. finds from the layers yeilding Aretine pottery and other equivalent layers of the first half of the 1st Century Aw. (mainly C Aw-20-50);

iii) 'Post - Arretine' ie finds from all the upper layers, which is the absence of any significant sub-division will be dealt with together. They are of the mid or late (1st Aw.)

কলচুরি রাজনীতিতে মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের প্রভাব

সঙ্গীতা মিশ্র

ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম ও রাজনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ধর্ম ও রাজনীতির এই সম্বন্ধটি পরিবর্তিত হয়েছে। গুপ্তযুগে আমরা রাজন্যবর্গ দ্বারা মন্দির এবং ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করার উদাহরণ পাই। পরবর্তীকালে আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মঠ' বলে আর একটি সংস্থার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। রাজনীতিতে ধার্মিক মঠগুলির ভূমিকা খুবই সুস্পষ্ট ভাবে আমরা দেখতে পাই কলচুরি যুগে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল রাজনীতি এবং শাসন ব্যবস্থায় ধর্মগুরু ও ধর্মসংস্থাগুলির ভূমিকাকে উদ্‌ঘাটিত করা, তাই এই ধরনের প্রবন্ধ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কলচুরি বংশের ইতিহাস এবং গোলকী মঠের মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজন্যবর্গের সম্পর্ককে, অন্যতম উদাহরণ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং আর্যাবর্তের নানা স্থানে কয়েকটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এই সব রাজ্যগুলির মধ্যে বুদ্ধরাজের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কলচুরি বামরাজ, স্বাধীন কলচুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিস্তৃতির দিক থেকে কলচুরি সাম্রাজ্য ছিল নর্মদা থেকে গোমতী পর্যন্ত, যার মধ্যে বর্তমান বুন্দেলখন্ড, বাঘেলখন্ড, মধ্যপ্রদেশের সাগর এবং জব্বলপুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমদিকে সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসাবে কালিঞ্জর গুরুত্ব পেলেও বামরাজের রাজত্বকালেই রাজধানী কালিঞ্জর থেকে ত্রিপুরীতে স্থানান্তরিত হয়।

কট্টচূরি অথবা পূর্ব কলচুরিরা শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রথম তিনজন কলচুরি রাজাগণ কৃষ্ণরাজ, শংকরগণ এবং বুদ্ধরাজকে কলচুরি লেখমালাগুলি তে "পরমমহেশ্বর" বলা হয়েছে। শংকরগণের আভোণ পত্রে কৃষ্ণরাজকে তাঁর জন্ম থেকেই পশুপতির ভক্ত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।[১] বুদ্ধরাজের রাণী অনন্তমহায়ীকে বিশেষভাবে পাশুপত সম্প্রদায়ের অনুগামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

চেদি দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব থাকলেও শিবই ছিলেন কলচুরিদের রাজকীয় দেবতা। উত্তর কলচুরিদের প্রতিষ্ঠাতা বামরাজ, শিবের অনন্য ভক্ত ছিলেন। প্রথমে বামরাজ নিজেকে কালিঞ্জরে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী সময়ে এই বংশটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় — একটি সরযূপারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অপরটি চেদিতে। এই দুই শাখাই ছিল শৈব ধর্মের অনুগামী। সরযূপারের শাখাটি নিজেদের রাজচিহ্ন হিসেবে

বেছে নেয় "নন্দী" কে। অপরদিকে ত্রিপুরীর কলচুরিরা "গজলক্ষ্মী"কে তাদের রাজচিহ্ন করলেও নন্দী তাদের চার্টারগুলির সীল-মোহরে অপরিবর্তিত থেকে যায়।

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত কলচুরি সাম্রাজ্যে শৈব ধর্ম ছিল প্রধান ধর্ম। প্রথম যুবরাজদেবের রাজত্বকালে তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং তিনি মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের আচার্যদের আমন্ত্রিত করে চেদি দেশে নিয়ে আসেন। তাঁর রাজত্বকালে আগত আচার্যদের সহায়তায় গুর্গী, চন্দ্রেহে, বিলহরী, ভেরাঘাট ইত্যাদি স্থানে একাধিক শৈব মন্দির এবং মঠ নির্মাণ করা হয়।

পরবর্তীকালে শৈব আচার্যেরা কলচুরি রাজাদের রাজগুরু হয়েছিলেন। প্রবোধশিবের চন্দ্রেহে শিলালেখ, প্রথম যুবরাজদেবের বিলহরী শিলালেখ এবং দ্বিতীয় কোকল্লদেবের গুর্গী শিলালেখ থেকে আমরা এই শৈব রাজগুরুদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাই। শিলালেখগুলি থেকে জানা যায়, এই রাজগুরুরা কলচুরি রাজাদের ধর্মীয় গুরুও ছিলেন, আর সেই সঙ্গে কলচুরি রাজনীতিতে তাঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁরা রাজাদের কাছে সম্মানীয় ছিলেন এবং তাঁদের মতামত ভিন্ন কোন রাজকার্য হত না। লেখগুলিতে বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের সঙ্গে রাজগুরুদের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে তাদেরকে গ্রাম এবং ভূমি দান করার কথা বলা হয়েছে। জয়সিংহের কলচুরি সংবৎ ৯২৬ এর জব্বলপুর শিলালেখ তে বলা হয়েছে যে, জয়সিংহের রাজগুরু বিমলশিব, "সব সময় রাজা দ্বারা নানা ধরনের উপযুক্ত রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন এবং তিনি রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারে নজরদারী রাখতেন —পৃথ্বীপালেন নিত্যং ব(ব)হুলসমুচিতে কার্যজাতে নিযুক্তোপ্যাঅত্তে নৈব জাড্যং (কথম) পি বিধিভন্নিত্যনৈমিত্তিকেষু"।[২]

কাকতীয় শাসনকর্ত্রী রুদ্রাম্বার মলকাপুরম প্রস্তর স্তম্ভলেখ (শক্ সংবৎ ১১৮৩) থেকে কলচুরি রাজাদের রাজগুরুদের সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মত্তময়ূর সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যদের প্রাচীনতম বিবরণ রণোদ শিলালেখ[৩] থেকে পাওয়া যায়। এই শিলালেখ গোয়ালিয়রে রণোদ (প্রাচীন অরণিপদ্র) থেকে পাওয়া গেছে। এই শিলালেখটির বর্ণনা অনুযায়ী, "ভগবান শিব ব্রহ্মার উপর অতি প্রসন্ন হন, যার ফলে একটি মুনি বংশের উৎপত্তি হয়। মহান আচার্য কদম্বগুহাধিবাসী, শংখমঠিকাধিপতি, আমর্দকতীর্থনাথ এই পরিবারেই সদস্য। আমর্দকতীর্থনাথের শিষ্য পুরন্দর উপেন্দ্রপুরে তপস্যায় রত ছিলেন। রাজা অবন্তিবর্মন তাঁর যশ এবং খ্যাতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁকে নিজের রাজ্যে আনতে ইচ্ছুক হন। তিনি যথাসম্ভব চেষ্টার ফলে আচার্যকে প্রসন্ন করতে সফল হন এবং তাঁকে নিজরাজ্যে নিয়ে আসেন। আচার্য পুরন্দর অবন্তিবর্মাকে শৈব ধর্মে দীক্ষিত করেন আর রাজা নিজের সমস্ত রাজ্য এবং রাজ্যৈশ্বর্য মুনিকে অর্পণ করেন। আচার্য পুরন্দর অবন্তিবর্মনের সৌজন্যে মত্তময়ূর নগরে একটি বিরাট এবং সমৃদ্ধ মঠের নির্মাণ করান। তিনি আর একটি মঠের নির্মাণ করান অরণিপদ্রের তপোবনে।

এই শিলালেখ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, মুনিবংশের পঞ্চম সদস্য পুরন্দর অষ্টম শতকের কাছাকাছি মত্তময়ূর বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজা অবন্তিবর্মনের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে কলচুরি রাজা, দ্বিতীয় যুবরাজদেবের বিলহরী শিলালেখতে প্রথম যুবরাজদেবের মহিষী নোহলার পিতৃবংশের বিবরণ পাওয়া যায়। চৌলুক্য অথবা চালুক্য সিংহবর্মার পৌত্র এবং সধন্বের পুত্র অবনিবর্মার পুত্রী ছিলেন নোহলা যাঁর বিবাহ হয়েছিল কলচুরি প্রথম যুবরাজদেব সঙ্গে।[৪] এই যুবরাজদেব আর নোহলা মত্তময়ূর বংশের আচার্যদের নিজের রাজ্যে আমন্ত্রিত করেন। সেই সঙ্গে নিজেদের রাজ্যে শিব মন্দির এবং মঠের নির্মাণ করান, ও তাঁদের উদ্দেশ্যে অনেক গ্রাম দান করেন। নোহলা নিজে অবনিবর্মা অথবা অবন্তিবর্মার দেশের ছিলেন বলে মত্তময়ূর বংশের আচার্যদের চেদি রাজ্যে আমন্ত্রিত করেছিলেন - এইটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অবন্তিবর্মনের রাজধানী মত্তময়ূর নগর গোয়ালিয়র অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ছিল, কারণ সুরবায়া, রণোদ, মহুয়া (প্রাচীন মধুমতী) কদ্বাহা, তেরহী ইত্যাদি স্থানগুলিতে এই সম্প্রদায়ের শিলালেখ, দেবালয়, মঠ এবং সরোবর রয়েছে, যেগুলির নির্মাণের সময় সম্ভবত দশম শতক। এর থেকে আমরা স্পষ্ট অনুমান করতে পারি যে, গোয়ালিয়রের দক্ষিণ প্রান্তে মত্তময়ূর নগর ছিল।

উপরোক্ত প্রায় সমস্ত শিলালেখগুলিতে মত্তময়ূর আচার্যদের বংশপঞ্জিকার উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পঞ্জিকার আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, এগুলি বংশপরম্পরায় না হয়ে, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় রচিত হয়েছে। লেখমালা ভেদে এই তালিকার অল্প-বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও — ভি. ভি. মিরাশী তাঁর 'কর্পাস ইন্সক্রিপ্সনস ইন্ডিক্যারম' -এর ভূমিকায় মত্তময়ূর আচর্যদের যে তালিকা দিয়েছেন, তা হল—
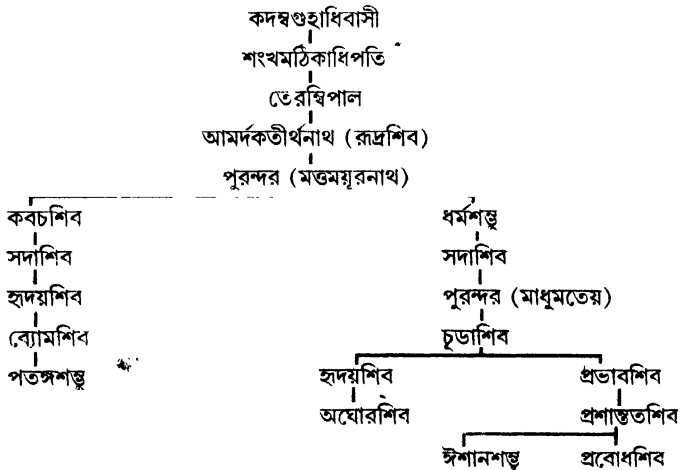
কবচশিব থেকে পতঙ্গশম্ভু পর্যন্ত আচার্যরা অরণিপদ্র শাখার আচার্য ছিলেন। মত্তময়ূরনাথের (পুরন্দর) চতুর্থ বংশের দ্বিতীয় পুরন্দর মধুমতীতে মত্তময়ূর বংশের আর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ফলে এই শাখাটির আচার্য-শিষ্য পরম্পরাকে বলা হয় মাধুমতেয়। দ্বিতীয় কোকল্লদেবের 'গুর্গী শিলালেখে' বলা হয়েছে যে, প্রথম যুবরাজদেব পুরন্দর মাধুমতেয়র প্রশিষ্য প্রভাবশিবকে নিজের রাজ্যে আমন্ত্রিত করেন। গুর্গীতে প্রভাবশিবের জন্য অকৃপণ দানে একটি বিশাল মঠের নির্মাণ করেন। প্রভাবশিবের শিষ্য প্রশান্তশিব এই মঠের নিকট একটি মন্দিরের নির্মাণ করেন এবং শোন নদীর ধারে ও বারাণসীতে আর দুটি মঠের নির্মাণ করেন। প্রশান্তশিবের শিষ্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা দেশে-দেশে ভ্রমণ করে জনসাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং নিজ-নিজ রাজাদের জন্য আনুগত্য প্রদর্শনের কথা বলতেন।

প্রথম যুবরাজদেবের মহিষী নোহলা শৈব আচার্য ঈশ্বরশিবকে, তাঁর জ্ঞানের হেতু তাঁকে 'নিপানীয়' আর 'অম্বিপাটক', গ্রামদুটি দান করেন। যুবরাজদেব এবং নোহলার পুত্র দ্বিতীয় লক্ষণরাজ শৈব আচার্য হৃদয়শিবকে নিজরাজ্যে আমন্ত্রিত করেন এবং তাঁকে বৈদ্যনাথ মঠের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই মঠটি নোহলেশ্বর নামে পরিচিত ছিল। পরে হৃদয়শিব তাঁর শিষ্য অঘোরশিবকে এই মঠের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

কলচুরি শিলালেখগুলি থেকে, কলচুরি রাজাদের সময়ের মত্তময়ূর বংশের রাজগুরুদের বিবরণ পাওয়া যায়। জয়সিংহের জব্বলপুর শিলালেখে পুরুষশিব - যশঃকর্ণ, শক্তিশিব - গয়াকর্ণ, কীর্তিশিব - নরসিংহ এবং বিমলশিব - জয়সিংহের উল্লেখ রয়েছে। বিমলশিবেরই প্রশিষ্য ছিলেন বিশ্বেশ্বরশম্ভু, যিনি কাকতীয় রাজ্যে মঠ স্থাপনা করেন এবং কাকতীয় রাজাদের ধর্মগুরু হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

ত্রিপুরী থেকে দশ মাইল দূরে ভেবাঘাটে, মত্তময়ূব সম্প্রদায়েব আর একটি শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে নর্মদারতীরে একটি গোল মন্দিরের নির্মাণ করা হয়, যেখানে চৌষট্টি যোগিনীদের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। এই মন্দিরটির নিকটেই একটি মঠের স্থাপনা হয় যাকে বলা হয় 'গোলকী মঠ'। রুদ্রাম্বার মলকাপুরম শিলালেখতে[৫] বলা হয়েছে যে ভাগীরথী এবং নর্মদার মাঝখানে ডাহল মন্ডলে দুর্বাসা মুনির বংশে সদ্‌ভাবশম্ভু ছিলেন। কলচুরি যুবরাজদেব তাঁকে তিন লক্ষ্য গ্রাম দান করেন। এই শৈব আচার্য গোলকী মঠের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমস্ত গ্রাম এই মঠটিকে উৎসর্গ করেন। তাঁর শিষ্য সোমশম্ভু পরে মঠের আচার্য হন এবং সোমশম্ভুপদ্ধতি রচনা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন বামশম্ভু, যিনি সমস্ত কলচুরি রাজাদের দ্বারা পূজিত হতেন। বামশম্ভুর পরে কীর্তিশম্ভু, বিমলশম্ভু এবং ধর্মশম্ভু মঠের আচার্য হন।

গোলকী মঠ থেকে মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের প্রচারের জন্য আচার্যদের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে

পাঠান হত। ফলে পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রান্তে মত্তময়ূর সম্প্রদায়ের মঠগুলির স্থাপনা হয়। কলচুরি শিলালেখগুলি থেকে আমরা এই আচার্যদের জীবন যাপনের ধারা সম্বন্ধে অবগত হই। এই আচার্যরা অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন — তাঁরা অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক কর্মে নিমগ্ন থাকতে ভালবাসতেন বলে জনকোলাহল থেকে দূর নির্জন স্থানে থাকতে পছন্দ করতেন। তাই তাঁদের জন্য নদীর কূলে মঠ নির্মাণ করা হত। যেখানে শান্ত পরিবেশে তাঁরা সাধনা করতেন। তাঁরা মঠের সম্পত্তিকে জনকল্যাণের কাজে লাগাতেন।

কলচুরি লেখমালাগুলিতে এই মঠগুলির কার্যকলাপের সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু রুদ্রাম্বার মলকাপুরম শিলালেখ থেকে, আমরা বিশ্বেশ্বর গোলকী মঠের বিস্তৃত বিবরণ পাই। গোলকী মঠের আচার্য ধর্মশম্ভুর শিষ্য বিশ্বেশ্বরশম্ভু, কাকতীয় রাজা গণপতিদেবের রাজ্যে দুটি অগ্রহার স্থাপন করেন এবং 'বিশ্বেশ্বর গোলকী' নামের একটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠের কার্যপদ্ধতি এবং নিয়মের সম্পূর্ণ বিবরণ উক্ত লেখখানি থেকে পাওয়া যায়। যে হেতু বিশ্বেশ্বরশম্ভু পূর্বে গোলকী মঠের প্রধান আচার্য ছিলেন, তাই তিনি গোলকী মঠের কার্যপদ্ধতিকেই অন্ধ্র দেশেও অনুসরণ করেছিলেন। এই শিলালেখ থেকে আমরা আরও বিবরণ পাই[৬] যে; কাকতীয় রাজা গণপতিদেব এবং তাঁর পুত্রী রুদ্রাম্বা, বিশ্বেশ্বরশম্ভুকে দুটি গ্রাম দান করেন। গৌড় প্রদেশের দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বগ্রামের বিশ্বেশ্বরশম্ভু এই অগ্রহারটিতে 'বিশ্বেশ্বর গোলকী', নামে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে তিনি একটি মন্দির, একটি ভোজনশালা - যেখানে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল সকলকেই আহার দেওয়া হত, একটি আরোগ্যশালা, প্রসূতিশালা এবং একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন - যেখানে সংস্কৃতের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হত। এই অগ্রহারে ষাটটি ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত যাদেরকে তামিল দেশ থেকে আনা হয়েছিল। অগ্রহারটিতে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাও ছিলেন যারা বেদ, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন এবং সাহিত্যের পন্ডিত ছিলেন। অগ্রহারে একটি চিকিৎসক থাকত এবং হিসেব রাখার জন্য একটি কায়স্থ। রান্নার জন্য মঠে দুজন ব্রাহ্মণ রাধুনী ছিলেন। এছাড়া 'বীরভদ্র' বলে দশজন লোক থাকত গ্রামের সুরক্ষার জন্য. আর থাকতো 'বীরমুষ্টি' বলে কুড়ি জন সেবক বা বেয়ারা। অগ্রহারে আরো দশজন শিল্পী থাকত যারা স্বর্ণকার, তাম্রকার, লৌহকার, ছুতোর, মূর্তিকার, কুম্ভকার, কর্মকার এবং নাপিতের কাজ করত। এদের একজন প্রমুখ আধিকারিক হত যাকে বলা হত 'স্থপতি'। মন্দিরে দশ জন নর্তকী, আট জন বাদক, চৌদ্দো জন গায়ক-গায়িকা, ছয় জন ঢাকি, আর একজন ছিল 'কাশমীরিয়ান', মনে হয় তিনি ছিলেন সঙ্গীত নির্দেশক। একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখার জন্য।

এই সমস্ত কর্মচারীদের নিজেদের জীবনযাপনের জন্য ভূমি দেওয়া হত। তাঁরা বংশানুক্রমে নিজ-নিজ কার্যে নিযুক্ত হতেন এবং এই জমি ভোগ করতেন। মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমি পেত এবং তাঁরা লোক রেখে নির্দিষ্ট কার্য করাতে পারত। এই কার্যগুলি যথার্থ সম্পাদনার জন্য এক আচার্য দায়িত্বে থাকতেন, যাকে ১০০ নিষ্ক "আচার্যভোগ" বলে দেওয়া হত। বিশ্বেশ্বরশম্ভু এই সমস্ত ব্যাপারগুলির দেখাশোনা করতেন। শিলালেখতে আরও বলা হয়েছে যে যারা সুন্দর এবং সুস্থ ভাবে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরা সমস্ত পবিত্র জলে স্নানের পুণ্য লাভ করতেন এবং যাঁরা দায়িত্ব পালন ঠিক মত করতেন না তাঁদেরকে শেষ জীবন অনাহারে কাটাতে হত এবং তাঁরা আঠেরোটি নরকের পাপদুষ্ট হতেন। এই নির্দেশটি বিশ্বেশ্বরশম্ভু একটি সূর্যগ্রহণে, কৃষ্ণায় স্নানের পর ঘোষণা করেছিলেন।

এই একই ধরনের শাসন পদ্ধতি আমরা কলচুরি শাসন ব্যবস্থায়ও দেখতে পাই। কলচুরি রাজ্যেও কর্মচারীদেরকে তাঁদের পারিশ্রমিক রূপে ভূমিই দেওয়া হত। ফলে আমরা কলচুরি লেখমালা থেকে প্রাপ্ত কলচুরি শাসন ব্যবস্থা এবং "বিশ্বেশ্বর গোলকীর" কার্যপদ্ধতির সঙ্গে অভূতপূর্ব সাদৃশ্য পাই। যা থেকে আমরা স্পষ্টত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, কলচুরি রাজনীতিতে মত্তময়ূর আচার্য তথা সম্প্রদায় এবং এই মঠগুলির গভীর ও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল।

কলচুরি সাম্রাজ্যে এই ধরণের ব্যবস্থায় আমরা একটি বিশিষ্ট সংস্থার সন্ধান পাচ্ছি যা তখনকার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, আর সে সংস্থা হচ্ছে, 'মঠ'। অগ্রবর্তী সময়ে আমরা অগ্রহার এবং দেবদানের উদাহরণ পাই, সেগুলির আকার ছিল লঘু। কিন্তু মঠ বলে সংস্থাটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য এবং ব্রাহ্মণদের সৌজন্যে সমাজ এবং রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। যেমন আমরা মলকাপুরম স্তম্ভলেখ থেকে এই উদাহরণ পাই যে, গৌড় এবং তামিল দেশ থেকে কয়েক জন ব্রাহ্মণ মিলে অন্ধ্র প্রদেশে এমন একটি সমাজ তৈরী করেন যা হয়ে যায় স্থানীয় সমাজের ভিন্ন। একটি মিলিত সংস্কৃতি অন্ধ্রের ঐ মঠটিকে ঘিরে বিকশিত হয়। এই ধরনের মঠগুলির মধ্যে সমাজকে বাঁধা রাখার ক্ষমতা ছিল বলে এরা আশ্রয়দাতা রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

কলচুরি রাজত্বে এই ধরনের ধার্মিক সংস্থাগুলির উপস্থিতি এক ধরনের অভূতপূর্ব শাসন ব্যবস্থাকে উপস্থাপিত করে। এই ধরণের শাসন ব্যবস্থায় রাজা এবং ধার্মিক গুরুরা পরস্পর নির্ভর ছিলেন। রাজা এবং প্রজার যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ধর্ম। রাজাদের সৌজন্যে রাজকার্য চালাতেন এই ধর্মগুরুরা। যে ভূমি ধর্মগুরুদের দান করা হত তার কর নেওয়ার অধিকার একমাত্র তাদের উপর ন্যস্ত থাকত, এখানে রাজপরিবারের

হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই ছিল না। এই যুগে ছোট-ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায় রাজধর্মে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বিভিন্ন ধরনের রাজব্যবস্থাকে অবলম্বন করে। অর্থাৎ রাজাদের আশ্রয় পেয়ে এই ধর্ম সম্প্রদায়গুলি একটি রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করত এবং ধর্মের সাহায্যে রাজারাও হতেন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী।

সূত্র-নির্দেশ

১। *কর্পাস ইন্সক্রিপ্সনস ইন্ডিক্যারম,* চতুর্থ খন্ড, পৃ-৪১, পঃ৪-৫।
২। ঐ পৃ-৩৩৬, শ্লোক ৪০।
৩। *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা,* প্রথম খন্ড, পৃ-৩৫৫, শ্লোক ৬ ও ৭।
৪। *কর্পাস*, চতুর্থ খন্ড, পৃ ২১১-১২, শ্লোক-৩৩-৩৭।
৫। ডি সি সরকার, *সিলেক্ট ইন্সক্রিপ্সনস* ঃ পৃ ৫৭৪-৫৯১।
৬। অন্ধ্র হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি-র জার্নাল, চতুর্থ খন্ড, পৃ-১৫৩-৫৪।

প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনে উল্লিখিত মহত্তর গোষ্ঠী

সায়ন্তনী পাল

প্রাচীন বাংলার জমি ক্রয় বিক্রয় ও দান সংক্রান্ত তাম্রশাসনগুলি গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজের উপর কিছু আলোকপাত করে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমভাগ থেকে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এই সমস্ত তাম্রশাসনগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে রাজত্বকারী গুপ্ত, পাল, সেন, চন্দ্র, বর্মন ও অন্যান্য রাজবংশ দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে জমিদান করার পর শাসনকর্তার পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশ জারী করা হত প্রদত্ত জমি বা গ্রামে বাসবাসকারী জনগণের উদ্দেশ্যে। প্রথমদিকে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটিতে বিষয় বা জেলার প্রশাসনিক কার্যালয় এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করত এবং সেই সময় এইসব গ্রামবাসীদের একাংশও তাতে অংশ নিত। এই ধরনের কয়েকটি গ্রামীণ গোষ্ঠী ছিল ব্রাহ্মণ, মহত্তর এবং কুটুম্বিরা।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্তরাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ, মহত্তর ও কুটুম্বিরা ছিল গ্রামের মুখ্য অধিবাসী, এদের বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়, যেমন গ্রামাষ্টকূলাধিকরণ বা অষ্টকূলাধিকরণ নামক গ্রামীণ পরিষদের সদস্য হিসাবে (ধনাইদহ তাম্রশাসন, ৪৩২/৩৩ খ্রিষ্টাব্দ, দামোদরপুর তাম্রসাসন, ৪৮২ খ্রিষ্টাব্দ)[১], বীথী (জেলার চেয়ে ক্ষুদ্র একটি বিভাগ। গ্রামসমষ্টি) নামক প্রশাসনিক বিভাগের কার্যালয়ের সদস্য হিসাবে (কলাইকুড়ি - সুলতানপুর তাম্রশাসন, ৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দ),[২] জমিদানের নির্দেশ শ্রবণকারী হিসাবে (পাহাড়পুর তাম্রশাসন, ৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)[৩] এবং প্রদত্ত জমি পরিমাপের সময় উপস্থিত সাক্ষী হিসাবে (দামোদরপুর তাম্রশাসন, ৪৮২ খ্রিষ্টাব্দ)[৪]। লক্ষ্য করা গেছে যে কলাইকুড়ি ও জগদীশপুর তাম্রশাসনে বীথী অধিকরণের সদস্য হিসাবে মহত্তর ও কুটুম্বিদের অনুপাত যথাক্রমে ৮:৭৬ এবং ৪:২৮। এছাড়া প্রথম তাম্রশাসনটিতে উমযশ নামক এক ব্যক্তি হলেন বীথী মহত্তর কিন্তু নয় বছর পরে প্রদত্ত দ্বিতীয় তাম্রশাসনটিতে তিনি একজন কুটুম্বি। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে বীথীর প্রশাসনিক বিভাগের কার্যালয়ের সদস্য হিসাবে মহত্তররা ছিল কুটুম্বিদের উর্দ্ধতন।[৫] সুতরাং গুপ্তরাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে দেখা যাচ্ছে মহত্তররা কুটুম্বিদের সাথে নিজ নিজ গ্রামে জমিসংক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যাপারে যেমন সক্রিয়

ভূমিকা নিত, তেমনি বীথী নামক প্রশাসনিক বিভাগের কার্যালয়েরও তারা সদস্য ছিল। অন্যদিকে উমযশের দৃষ্টান্তটি থেকে মনে হয় মহত্তররা কার্যালয়ের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকতেন। তবে গুপ্তরাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে কুটুম্বিদের জমিদান করতে দেখা গেলেও মহত্তরদের এ ভূমিকায় দেখা যায় না।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে রাজত্বকারী ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায় মহত্তররা বিষয়াধিকরণ বা জেলা পরিষদের সদস্য হয়েছেন কিন্তু কুটুম্বিরা এখানে অনুপস্থিত। ধর্মাদিত্যের তৃতীয় বর্ষের ফরিদপুর তাম্রশাসনে[৬] এদের প্রত্যেকের আলাদাভাবে নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং এদের সংখ্যা ১৮, এদের মধ্যে দুইজনকে (বিষয় মহত্তর ঘোষচন্দ্র এবং অনাচার) পরবর্তী রাজা গোপচন্দ্রের ১৮ বর্ষে প্রদত্ত তাম্রশাসনেও[৭] একই ভূমিকায় দেখা যায়। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে কুড়ি বছর ধরে তারা জেলা পরিষদে নিজেদের সদস্যপদ বজায় রেখেছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে গুপ্তযুগে মহত্তররা শুধুমাত্র গ্রামসমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তীকালে আরো উচ্চতর পর্যায়ে অর্থাৎ জেলার শাসনপরিষদেও তারা সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে কুটুম্বিদের কিন্তু গ্রামসমাজের বাইরে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। তাই অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন যে "কুটুম্বিরা তাদের গ্রামীণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই স্থিত ও আবদ্ধ ছিল।"[৮] অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আলোচ্য ফরিদপুর তাম্রশাসনগুলিতে জেলা পবিষদের সদস্য হিসাবে মহত্তরদের উপস্থিতির ঘটনাটিকে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় 'মহত্তরদের উত্থান' হিসাবে দেখেছেন।[৯] অন্যদিকে তাম্রশাসনগুলির সম্পাদক এফ. ই. পার্জিটার 'বিষয় মহত্তর' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন 'বিষয়ের অগ্রগণ্য ব্যক্তি' হিসাবে।[১০] সুতরাং এটাও হতে পারে যে এইসব বিষয় মহত্তররা আদৌ গ্রামের মহত্তরদের সাথে এক নন। এরা জেলার অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসাবে হয়তো আলাদাভাবেই নির্বাসিত হয়ে অধিকরণের সদস্য হয়েছিলেন। তাছাড়া তাম্রশাসনগুলিতে জমিদানের নির্দেশ শ্রবণকারী হিসাবে গ্রামের প্রধান বাসিন্দাদের উল্লেখ নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে গ্রামের মহত্তররা কি ভূমিকা পালন করতেন তা স্পষ্ট নয়।

গ্রামীণ সমাজে মহত্তরদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি তাম্রশাসন, এগুলি হল গোপচন্দ্রের জয়রামপুর ও মল্লসারুল এবং শশাঙ্কের এগরা তাম্রশাসন।[১১] এগুলিতে দেখা যায় জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রভাবশালী একদল মানুষ বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। এই দলটির মধ্যে একটি গোষ্ঠী হলেন মহামহত্তর ও মহত্তরেরা। অন্যান্যরা হলেন অগ্রহারী (অগ্রহারের মালিক), প্রধান, মহাপ্রধান প্রভৃতিরা। এই তিনটি শাসনে দেখা যায় যে মহামহত্তর এবং মহত্তরেরা হলেন এই

দলটির মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক এবং অগ্রগণ্য। উল্লেখযোগ্য এই যে মল্লসারুল শাসনাটিতে মহত্তর হিমদত্ত নামে একজনকে অগ্রহারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণরাও ছিলেন এবং তারা অগ্রহার অর্থাৎ নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। মহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে মহামহত্তর ও মহত্তর এই শ্রেণীবিভাগ নিশ্চই গ্রামসমাজে তাদের আপেক্ষিক প্রভাবের উপর নির্ভর করত এবং জমির মালিকানা হয়তো এ ক্ষেত্রে একটি নির্ধারক ছিল। যাই হোক, তাম্রশাসনগুলিতে প্রাপ্ত তথ্য বিচার করে বলা যায় যে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষে এবং সপ্তম শতকের প্রথমে মহত্তররা পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে প্রদত্ত রাজা দেবখড়্গের প্রথম আশরাফপুর তাম্রশাসনে[১২] অবশ্য মহত্তরদের এক ভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়। এই তাম্রশাসন দুটিতে প্রদত্ত জমির খণ্ডগুলি নির্দেশ করতে গিয়ে তাদের ভুজ্যমানক (ভোক্তা) এবং কৃষ্যমানক (কর্ষক) এই দুই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে একশ্রেণীর মানুষ জমির স্বত্ত্ব ভোগ করত এবং অন্য একশ্রেণীর মানুষ তা কর্ষণ করত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের হাতে জমির স্বত্ত্বাধিকার ছিল না, অর্থাৎ এরা ছিল ভূমিহীন কৃষক। দেখা যায় একটি জমিখণ্ডের ভূজ্যমানক ছিলেন শ্রী শর্বান্তর নামে এক ব্যক্তি এবং তার কৃষমানক ছিলেন মহত্তর শিখর ও অন্যান্যরা। সুতরাং বলা যায় যে সব মহত্তররা সম্পদশালী ছিলেন না, তাদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকও ছিল। তবে এই ধরনের উদাহরণ এই একটিমাত্রই হওয়াতে একে ব্যতিক্রম বলে ধরে নেওয়াই ভাল। এই উদাহরণটি থেকে এও বোঝা যায় যে একমাত্র জমির মালিকানা বা সম্পত্তির উপর নির্ভর করে কেউ মহত্তর হিসাবে বিবেচিত হতো না।

খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শুরু থেকে প্রকাশিত পালরাজাদের তাম্রশাসনে জমিদানের নির্দেশ শ্রবণকারী হিসাবে যাদের উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে গ্রাম সমাজের 'পুরোগ' অর্থাৎ অগ্রগণ্যদের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছেন যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, মহত্তর বা মহত্তম এবং কুটুম্বিরা (মহত্তরের স্থানে কিছু ক্ষেত্রে মহত্তম শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে)। ধর্মপালের খলিমপুর তাম্রশাসনে[১৩] অবশ্য একটু অন্যরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানে গ্রামের অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসাবে মহত্তরদের উল্লেখ নেই, তাদের এখানে বিষয় ব্যবহারী অর্থাৎ জেলার কর্মচারী শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে এবং এদের সাথে রয়েছেন জ্যেষ্ঠ কায়স্থ (প্রধান করনিক/কায়স্থ শ্রেণীর মুখপাত্র) এবং দশগ্রমিক (দশটি সমষ্টিবদ্ধ গ্রামের প্রধান), ইউ. এন. ঘোষাল শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটিকেই বিবেচনা করে বলেছেন যে মহত্তররা ছিলেন শাসনসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী, এটি কোন ব্যক্তিবিশেষের উপাধি নয়।[১৪] অনুরূপভাবে মল্লসারুল তাম্রশাসনে উল্লিখিত অগ্রহারী মহত্তর শব্দটিকেও অগ্রহারের রক্ষণাবেক্ষণকারী

হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অগ্রহারী মহত্তর হলেন অগ্রহারী অর্থাৎ অগ্রহারের মালিকদের মধ্যে প্রধান। সুতরাং মল্লসারুল লেখতে উল্লিখিত অগ্রহারী মহত্তর হিমদত্ত ছিলেন একটি অগ্রহারের মালিক, তার রক্ষণাবেক্ষণকারীমাত্র নন। তাছাড়া পালদের অধিকাংশ তাম্রশাসনেই মহত্তরেরা ব্রাহ্মণ ও কুটুম্বিদের সাথে গ্রামের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যেই উল্লিখিত হয়েছেন। সুতরাং তাদেরকে পুস্তপালদের মতো সরকারী কর্মচারী[১৬] বলে ধরে নেবার কোন যুক্তি নেই।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বাংলাদেশের তাম্রশাসনগুলিতে মহত্তরদের উল্লেখ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে রাজত্বকারী রাত, খড়্গ ও দেববংশের তাম্রশাসনে কুটুম্বি ও প্রধান, চন্দ্রবংশের তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণোত্তর (মুখ্য ব্রাহ্মণগণ)[১৭] ও ক্ষেত্রকর এবং সেন, বর্মন এবং অন্যান্য বংশের তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোত্তর এবং ক্ষেত্রকরদের উল্লেখ দেখা যায় জমিদানের নির্দেশ শ্রবণকারী হিসাবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু ক্ষেত্রে মহত্তর হিসাবে দু-একজন ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়, যেমন শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে[১৮] একটি মঠের একজন মহত্তর ব্রাহ্মণ ছিলেন জমির প্রাপক দামোদরদেবের মেহার তাম্রশাসনে[১৯] জনপদ মহত্তরদের নির্দেশ শ্রবণকারী হিসাবে সম্ভাষণ করা হয়েছে ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে 'মহত্তর' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জমিদানের দলিলস্বরূপ তাম্রশাসনগুলিতেই। বৃহস্পতি স্মৃতিতে বলা হয়েছে ঃ "যারা সৎ, বেদ ও ধর্মজ্ঞানী, কর্মঠ এবং আত্মসংযমী, সদ্বংশজাত ও কর্মদক্ষ, তারাই মহত্তম হিসাবে নিযুক্ত হবেন। সমষ্টির (সমূহ) কল্যাণের জন্য দুই, তিন বা পাঁচজন পরামর্শ করবেন এবং তাদের উপদেশ গ্রামবাসী, শ্রেণী ও গণ মান্য করবেন।" এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে কিছু কিছু নিবন্ধে মহত্তম শব্দটির জায়গায় মহত্তর শব্দটি লেখা হয়েছে, অর্থাৎ বৃহস্পতি স্মৃতি থেকে জানা গেল যে মহত্তরেরা হলেন গ্রামীণ সমাজের নেতৃস্থানীয় নির্বাচিত এক গোষ্ঠী যারা গ্রামসমাজের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন। অর্থশাস্ত্রে গ্রামবৃদ্ধি নামে এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে। এরা ছিলেন গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ, এরা জমি ক্রয়-বিক্রয়ের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকতেন, গ্রাম সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকতেন ইত্যাদি। সংখ্যায় এরা একাধিক হতেন।[২০] বাংলায় প্রাপ্ত আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনগুলিতেও মহত্তরদের এই ধরনের ভূমিকাতেই দেখা যায়।

ভারতের অন্যান্য অংশে প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলিতেও মহত্তরদের সমমর্যাদাভুক্ত গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে, যেমন দাক্ষিণাত্যের তাম্রশাসনগুলিতে মহাজন নামক গোষ্ঠী ছিল গ্রামের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, জমির দাতা ও প্রাপক এবং জমিদানের সাক্ষী।[২১] আঞ্জানেরি তাম্রশাসনের মহল্লকরা হলেন গ্রাম ও নগরের শাসনব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চকূলের সদস্য।[২২] আসামের

তাম্রশাসনগুলিতে মহল্লকদের পঞ্চায়েতের সদস্য বা নগরীর মুখ্য ব্যক্তি হিসাবে দেখা যায়।[২৩] অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে গুপ্তযুগ থেকেই মহত্তর বা সমপর্যায়ভুক্ত অন্যান্য গোষ্ঠীরা গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিত।

গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণরাও ছিলেন কারণ একমাত্র তারাই অগ্রহারের মালিক হতে পারতেন। এছাড়া 'শর্ম্ম' পদাধিকারী ব্যক্তিরাও ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই মনে হয়, যেমন, ধনাইদহ তাম্রশাসনের মহত্তর দেবশর্ম্ম। অন্যদিকে পালদের তাম্রশাসনে প্রথমে ব্রাহ্মণ এবং তারপরে মহত্তরদের পৃথক উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে কিছু অ-ব্রাহ্মণ মহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুটুম্বিদের থেকে মহত্তরদের স্বাতন্ত্র্য ছিল সামাজিক মর্যাদায়, সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয়। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বদানের ক্ষমতাবলেই মহত্তরেরা অষ্ট। গ্রামাষ্টকূলাধিকরণ নামক গ্রামীণ পরিষদ, বীথী অধিকরণ নামক গ্রামসমষ্টির পরিষদ এবং সর্বোপরি বিষয়াধিকরণ নামক জেলা পরিষদের সদস্য হয়ে বসেন। কুটুম্বিরা কিন্তু এ ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি।

রামশরণ শর্মার মতে উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতে মহত্তরদের উত্থান সামন্ততন্ত্রের পথে অগ্রসর আদি মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।[২৪] তার মতে গুপ্তযুগ থেকেই গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে আপেক্ষিক প্রভাবশালীতা এবং জমির মালিকানার ভিত্তিতে এক ধরনের বিভাজন গড়ে উঠতে থাকে।[২৫] তবে আমাদের আলোচ্য প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে সবসময় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। ৪৩২/৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ধনাইদহ তাম্রশাসনই হল বাংলার প্রাচীনতম তাম্রশাসন। এতে দেখা যায় মহত্তররা অষ্টকূলধিকরণ নামে গ্রামীণ পরিষদের সদস্য। সুতরাং বলা যায় গুপ্তযুগের আগে থেকেই সম্ভবত বাংলার গ্রামীণ সমাজে মহত্তররা বিশেষ এক স্থান লাভ করেছিল। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত প্রচারিত পালদের তাম্রশাসনে তারা জমিদানের নির্দেশ শ্রবণকারী হিসাবে সম্ভাষিত হতে থাকে। তবে বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব অংশে প্রচারিত তাম্রশাসনগুলিতে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে আর মহত্তরদের নিয়মিত উল্লেখ পাওয়া যায় না। এদের স্থলে ব্রাহ্মনোত্তর নামে এক গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের সাধারণত মুখ্য ব্রাহ্মণগোষ্ঠী বলেই মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে প্রচুর জমিদানের ফলে ব্রাহ্মণরা এইসময় বাংলায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিমালিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই মহত্তর গোষ্ঠীভুক্ত অ-ব্রাহ্মণরা ধীরে ধীরে পশ্চাৎবর্ত্তী হয়ে পড়ে এবং তাদের স্থান নেয় ব্রাহ্মণরা। ফলে মহত্তর গোষ্ঠীটি হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ প্রধান এবং তারাই ব্রাহ্মনোত্তর নামে তাম্রশাসনগুলিতে সম্ভাষিত হতে থাকে। ব্রাহ্মনোত্তর গোষ্ঠী যে ব্রাহ্মণদের থেকে পৃথক ছিল তা

তাম্রশাসনগুলিতে (সেন, বর্মন প্রভৃতি বংশের) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মানোত্তদের পৃথক উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়।

সুতরাং প্রাচীন বাংলার মহত্তররা ছিল গ্রামসমাজে নেতৃস্থানীয়, জমিসংক্রান্ত বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী এবং সামাজিকভাবে অগ্রগণ্য। মাহাতো, মেহেতা, মালহোত্র প্রভৃতি পদবীগুলি 'মহত্তর' শব্দসম্ভূত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।[২৬] তবে মহত্তরদের সবক্ষেত্রে ভূমিকেন্দ্রিক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলে সনাক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।[২৭] কারণ কুটুম্বিরা মূলত ভূমিকেন্দ্রিক এক গোষ্ঠী হলেও গ্রামসমাজে মহত্তরদের প্রভাব সম্ভবতঃ শুধুমাত্র ভূমির মালিকানার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে প্রচারিত বাংলার বহুসংখ্যক তাম্রশাসনগুলির মধ্যে মাত্র দুটিতে মহত্তরদের ভূমিমালিক হিসাবে দেখা যায়।[২৮] অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষক হিসাবে মহত্তরদের উল্লেখ রয়েছে আশরাফপুর তাম্রশাসনে। সুতরাং বৃহস্পতি স্মৃতি এবং আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনগুলির ভিত্তিতে বলা যায় পান্ডিত্য, বংশকৌলিন্য, নেতৃত্বগুণ, সামাজিক মর্যাদা - এসবই মহত্তরদের কুটুম্বি ও অন্যান্য সম্পন্ন গ্রামবাসীদের থেকে আলাদা করেছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১। ডি. সি. সরকার, *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্ বিয়ারি; অন ইন্ডিয়ান হিস্টরি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, পৃপৃ ২৮৭-২৮৯ এবং পৃপৃ ৩৩২-৩৩৪।

২। ঐ, পৃপৃ ৩৫২-৩৫৫।

৩। ঐ, পৃপৃ ৩৫৯-৩৬২।

৪। ঐ, পৃপৃ ৩৩২-৩৩৪।

৫। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়, *আসপেক্টস্ অফ রুরাল সেট্‌লমেন্টস্ অ্যান্ড রুরাল সোসাইটি ইন আর্লি মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া*, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ ৪৩।

৬। ডি. সি. সরকার, ঐ, পৃপৃ ৩৬৩ ৩৬৭।

৭। ঐ, পৃপৃ ৩৭০-৩৭২।

৮। রণবীর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ, "কুটুম্বিকস অফ আর্লি ইণ্ডিয়া", *পেজ্যান্টস ইন ইণ্ডিয়ান হিস্টরি*, প্রথম সংখ্যা, পৃ ১৮৯।

৯। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ ৪৯।

১০। এফ. ই. পার্জিটারের প্রবন্ধ, "থ্রি কপার প্লেট গ্রান্টস্ ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল," *ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি*, ৩৯ সংখ্যা, ১৯১০, পৃ. ১৯৭।

১১। ডি. সি. সরকার, ঐ, পৃপৃ ৫৩০-৫৩১, ৩৭২-৩৭৭; দ্বিতীয় খণ্ড, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃপৃ ৭২৭-৭৩০।

১২। জি. এম. লস্করের প্রবন্ধ, "আশরাফপুর কপার প্লেটস্ অফ দেবখড়্গা," *মেমোয়ার্স অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল*, প্রথম সংখ্যা, নং ৬, ১৯০৬, পৃপৃ ৮৫-৯১।

১৩। ডি. সি. সরকার, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃপৃ ৬৩-৬৯।

১৪। ইউ. এন. ঘোষাল, *কন্ট্রিবিউশনস্ টু দি হিস্টরি অফ্ হিন্দু রেভিনিউ সিস্টেম*, কলিকাতা, ১৯৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃপৃ ২৭০-৭১।

১৫। অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, *দি পিপল্ অ্যাণ্ড কালচার অফ বেঙ্গল ঃ এ স্টাডি ইন অরিজিনস্*, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, কোলকাতা, ২০০২, পৃ ১৪৮।

১৬। ঐ,

১৭। এন. জি. মজুমদার, *ইনস্ক্রিপশনস্ অফ বেঙ্গল*, তৃতীয় খণ্ড, রাজশাহী, ১৯২৯, পৃ ৬৬।

১৮। ডি. সি. সরকার, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃপৃ ৯২-১০০।

১৯। ঐ, পৃপৃ ১৪০-১৪৫।

২০। ইয়ামাজাকি তোশিত্তর প্রবন্ধ, ''সাম আসপেক্টস অফ ল্যাণ্ড সেল ইনস্ক্রিপশনস্ ইন ফিফ্থ অ্যাণ্ড সিকসথ্ সেঞ্চুরী বেঙ্গল,'' *এ্যাক্টা এশিয়াটিকা*, নং ৪৩, অগস্ট ১৯৮২, পৃপৃ ১৭-৩৬।

২১। আর. এস. শর্মা, *আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি ঃ এ স্টাডি ইন ফিউডালাইজেশন*, কোলকাতা, ২০০১, পৃ ৯।

২২। ভি. ভি. মিরাশী সম্পাদিত, *কর্পাস ইনস্ক্রিপশনাস্ ইন্ডিকেরাম*, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম ভাগ, ১৯৫৫, পৃ ১৬৫।

২৩। মুকুন্দ মাধব শর্মা, *ইনস্ক্রিপশনস্ অফ আসাম*, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি ১৯৭৮, পৃ ১৪৯।

২৪। আর. এস. শর্মা, ঐ, পৃপৃ ১৯৬-১৯৭।

২৫। ঐ, পৃ ২৯।

২৬। ঐ, পৃ ১৯৬।

২৭। রণবীর চক্রবর্তী, ঐ, পৃ ১৮৭।

২৮। ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর ও গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য, ডি. সি. সরকার, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃপৃ ৩৬৭-৩৬৯ এবং পৃপৃ ৩৭২-৩৭৭।

সেন বংশীয় তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে চতুরক

রজত সান্যাল

এক

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদি মধ্যযুগীয় পর্বের শেষাংশে, আনুমানিক খ্রিষ্টিয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙ্গলার আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির অধীনে সমসাময়িক আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা সাম্প্রতিক ইতিহাস দর্শনের একটি মূল প্রতিপাদ্য। এই পর্বে বাঙ্গলার সেন বংশীয় রাজগণ দ্বারা প্রচারিত মোট বারোটি তাম্রশাসন[১] অবশ্যই মৌলিক ঐতিহাসিক উপাদানরূপে বিবেচিত। আদি মধ্যযুগীয় বাঙ্গলায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রচরিত্র সংক্রান্ত বিতর্ক উত্থাপনের পাশাপাশি, সেন রাজবংশের অধীনে দক্ষিণ বাঙ্গলার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংগঠনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রেও এই ভূমি-হস্তান্তরের দলিলগুলির অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষেপে সেন বংশের পাঁচটি অভিলেখ[২] উল্লিখিত একটি শব্দের ব্যাখ্যার দ্বারা দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙ্গলার রাজতান্ত্রিক প্রশাসনের গাঠনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কিছু সমস্যা একটি খণ্ডচরিত্রের সাহায্যে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই বিবর্তনশীল পুনর্বিন্যাসের মূলগত চরিত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই সমসাময়িক অভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থার একটি বিশেষ আঙ্গিকের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হবে।

দুই

প্রাচীন বাঙ্গলায় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে প্রচারিত তাম্রশাসনগুলিতে আঞ্চলিক শাসনযন্ত্রের বিন্যাসের একটি প্রবহমান ধারা পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক রাষ্ট্র সংগঠনের অন্তর্গত একাধিক ভূ-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভাগ-উপবিভাগের বহু নাম বাঙ্গলার আদি মধ্যযুগীয় তাম্রপট্টোলিগুলিতে বর্তমান। শাসনযন্ত্রের বাস্তব ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন এই বিভাগ-উপবিভাগগুলিকে তাদের কার্যগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট শ্রেণীক্রমে সজ্জিত রাখা হত। গুপ্তযুগীয় তাম্রপট্টগুলিতে প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়, সেখানে গুপ্তরাষ্ট্র সরাসরি ভুক্তি নামক প্রাদেশিক প্রশাসনিক এককের কার্যসংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। আদি মধ্যযুগীয় বাঙ্গলার গ্রামীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে স্তরবিন্যাস বিধিকে আলোকিত করে সেখানে কার্য ও গঠনের উর্দ্ধক্রমানুসারে

গ্রাম, বিষয়/বীথি, ভুক্তি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকৃত দান করা হয়েছে। বিষয়/বীথির সাথে গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ ও গ্রামের কার্য ও গঠনগত আন্তসম্পর্ক এবং অভ্যন্তরীণ নির্ভরশীলতাও সাম্প্রতিক ইতিহাস দর্শনের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশেষ বৈশিষ্ট।[৩] গুপ্তোত্তর-প্রাক-পাল পর্বের অভিলেখগুলিতে ক্রমাগত এই সরল স্তরবিন্যাসের চরিত্র গাঠনিক ও কার্যমূলক পরিবর্তনশীলতার সম্মুখীন। অব্যবহিত গুপ্তোত্তর পর্বে গ্রামীণ রাজনৈতিক স্তরে ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর রাজতান্ত্রিক প্রশাসনিক স্তরের কার্যনির্বাহী সমিতির অংশরূপে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। অষ্টম নবম শতকের পাল অভিলেখগুলিতে প্রশাসনিক এককের কার্যগত চরিত্রের পরিবর্তনের পাশাপাশি ক্রমাগত রাষ্ট্র ও গ্রামের মধ্যবর্তী রাজনৈতিক সংগঠনের গাঠনিক চরিত্রেও অনুবর্তনশীল খণ্ডীভবনের চিত্র সুস্পষ্ট।[৪] খণ্ডীভবনের এই পর্বে বিষয়ের ন্যায় উচ্চতর প্রশাসনিক এককের গাঠনিক অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও বিষয়াধিকরণ নামক কার্যগত রাষ্ট্রসংগঠনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়।[৫] দ্বাদশ শতকীয় আঞ্চলিক শক্তিগুলি দ্বারা প্রচারিত অভিলেখমালায় এই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস এক নতুন মাত্রা লাভ করে। ক্রমাগত বিষয় নামক গুরুত্বপূর্ণ জেলান্তরীয় প্রশাসনিক বিভাগের গঠনিক অস্তিত্বও বিপর্যস্ত হতে আরম্ভ করে। পরিবর্তে, অবিন্যস্ত এক শ্রেণীক্রমের মধ্যে অদ্যাবধি অপরিচিত কিছু ভূ-রাজনৈতিক এককের আবির্ভাব হয়।[৬] স্পষ্টতই, গ্রামস্তরীয় সম্পত্তি হস্তান্তর সংগঠন ও মূল রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অন্তবর্তী ভূ-রাজনৈতিক এককের কার্যগত মূল্য অকিঞ্চিতকর হয়ে পড়ে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে সেন বংশের অভিলেখগুলির সাক্ষ্যে ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রশাসনে পরিকাঠামোগত এই পুনর্বিন্যাসের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।[৭]

তিন

সেন শাসনক্রমের শেষে লক্ষ্মণসেন ও বিশ্বরূপসেনের শাসনকালের মোট নয়টি তাম্র শাসনে[৮] পুন্ড্রবর্ধন, বর্ধমান ও কঙ্কগ্রাম নামক ভুক্তির মধ্যে এক বা একাধিক অদ্যাবধি অপরিচিত ভূ-রাজনৈতিক স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।[৯] লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় থেকে সপ্তবিংশ রাজ্যাঙ্কের মধ্যে সম্পাদিত চারটি এবং বিশ্বরূপসেনের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত একটি তাম্রশাসনে চতুরক নামক একটি ভূ-রাজনৈতিক (প্রশাসনিক?) স্তরের নাম আত্মপ্রকাশ করে এবং এই পর্বের বিভিন্ন নবোদ্ভুত আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্তরের মধ্যে কেবলমাত্র চতুরক নামক স্তরটিকেই সর্বাধিক সংখ্যক অভিলেখে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে (আঃ ১১৭৯ খ্রিঃ) সম্পাদিত গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিমখাটিকার বেতড্ডচতুরকে বিড্ডার নামক গ্রামে ভূমি

হস্তান্তরের নির্দেশ পাওয়া যায়।[১০] লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কের (আঃ ১১৭৯খ্রিঃ) সুন্দরবন তাম্রপট্টে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত খাড়িমন্ডলে কান্তল্লপুর নামক চতুরকের অন্তর্গত মন্ডলগ্রামে ভূমি হস্তান্তরিত হতে দেখা যায়।[১১] লক্ষ্মণসেনের ষষ্ঠ রাজ্যবর্ষে (আঃ ১১৮৩ খ্রিঃ) সঙ্কলিত শক্তিপুর তাম্রশাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তির (বর্ধমানভুক্তি থেকে উত্তররাঢ়কে পৃথকীকৃত করে কঙ্কগ্রামভুক্তির জন্ম দেওয়া হয়েছিল, এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও স্বীকৃত)[১২] দক্ষিণবীথিতে মধুগিরিমন্ডলের অন্তর্গত কুমারপুর চতুরকের বারহকোণা নামক গ্রামের কিয়দংশ হস্তান্তরের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে।[১৩] লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষাংশে তাঁর সপ্তবিংশ রাজ্যাঙ্কের (আঃ ১২০৪-৫ খ্রিঃ) রাজাবাড়ী/ভাওয়াল/ইণ্ডিয়া অফিস তাম্রশাসনে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে বশচশ নামক আবৃত্তির অন্তর্গত বটুম্বিচতুরকে ভূমি হস্তান্তর ঘোষিত হয়েছে।[১৪] বিশ্বরূপসেনের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে (আঃ ১২২০-২১ খ্রিঃ) সম্পাদিত মধ্যপাড়া/সাহিত্য পরিষৎ তাম্রপট্টে সাকুল্যে তিনটি পৃথক চতুরকের মধ্যে মোট এগারোটি ভূখণ্ড দানের কথা বলা হয়েছে। পুন্ড্রবর্ধনের মধ্যে মধুক্ষীরক নামক আবৃত্তির অন্তগর্ত নবসংগ্রহ চতুরকের অন্তঃপাতী অজিকুলপাটকে, ঐ ভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী লাউহণ্ড চতুরকের দেউলহস্তী নামক গ্রামে এবং ঐ একই ভুক্তির মধ্যে স্থিত ইন্দ্রদ্বীপের অন্তগর্ত উরা চতুরকের অন্তগর্ত ঘর্ঘরকাট্টিপাটকে এই সকল ভূমি হস্তান্তর নির্দেশিত হয়েছে।[১৫]

উপযুক্ত সাক্ষ্যের নিরীখে চতুরকের গাঠনিক ও কার্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একাধিক অভিলেখে চতুরকের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগীয় সাহিত্যে শব্দটির উল্লেখ দেখা যায় না। অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্রের আদিমধ্যযুগীয় টীকাগ্রন্থ এবং অমরকোষেও চতুরক শব্দের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। কেবলমাত্র লেখপদ্ধতি নামক ত্রয়োদশ শতকীয় গ্রন্থে গ্রামীণ ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত দেশাচারের প্রেক্ষাপটে চতুরক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬] লেখপদ্ধতির সম্পাদকদ্বয় অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে চতুরক শব্দের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সম্পাদকের ভাষায় চতুরক শব্দের অর্থ।

এ পাবলিক প্লেস ইন এ ভিলেজ অর এ পুলিশ স্টেশন; প্রোব্যাব্লি, এ ট্যাকস ফর দ্য মেইনটেনেন্স অব্ এ পুলিশ স্টেশন; এ স্মল টেরিটোরিয়াল ইউনিট।[১৭]

বাঙ্গলার আদি মধ্যযুগীয় ইতিহাস দর্শনেও চতুরক শব্দের সঠিক প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন চতুরক বর্তমানের চৌকি, চক; বোধ হয় চতুরিকা গোড়ায় ছিল চারিটি গ্রামের সমষ্টি।[১৮] মানিয়ের উইলিয়ামস্ তাঁর অভিধানে চতুরিকা নামক ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ অথবা বর্গক্ষেত্রকার ভূ-ক্ষেত্রের উল্লেখ করলেও চতুরক শব্দকে অভিধানে স্থান দেননি।[১৯] দীনেশ চন্দ্র সরকার পর্যবেক্ষণের

পরিবর্তে সরাসরি লেখপদ্ধতিকে উদ্ধার করেছেন এবং সেই অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন।[২০] কিন্তু অভিলৈখিক সাক্ষ্যের সাপেক্ষে উপরের পর্যবেক্ষণগুলির কিছু ত্রুটি উল্লেখণীয়। প্রথমত, লেখপদ্ধতি অনুসরণে প্রদত্ত অর্থে চতুরককে গ্রামের একাংশরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, তাম্রশাসনে সর্বত্রই গ্রাম চতুরক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এককরূপেই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নীহাররঞ্জনের চারিটি গ্রামের সমষ্টি নিছক মূল চতুঃ শব্দপ্রসূত ব্যাখ্যামাত্র। সুতরাং প্রশ্ন হল, আদি মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্র বিন্যাসে চতুরকের স্থান কোথায়? অপরিহার্য দ্বিতীয় প্রশ্ন, চতুরকের গাঠনিক ও কার্যমূলক প্রকৃতি কি?

চার

ব্যুত্পত্তিগতভাবে চতুরক শব্দের নিহিত অর্থ দ্বিবিধ। চতুর + ণ্বুল্ (প্রত্যয়) = চতুরক = প্রশাস্তৃপুরুষ/আরক্ষক অর্থাৎ যিনি সুরক্ষা দান করেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলও (যেরূপ সূর্যের সারথী অরুণ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় ক্রমে অরুণ সূর্যের অপর নামরূপে বৈধতা পেয়েছে) চতুরক। অন্য অর্থে চতুর + বুঞ্(প্রত্যয়) = চতুরক = চত্বরের কর গ্রহণ করেন যিনি অথবা চত্বরের অধিবাসীবৃন্দ দ্বারা প্রদেয় কর। সুতরাং লেখপদ্ধতি প্রদত্ত অর্থসমূহের মধ্যে দুটি অর্থ ব্যকরণসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এই গ্রহণযোগ্যতার নিরীখে একথা স্পষ্ট যে, চতুরক একটি আঞ্চলিক (প্রশাসনিক-ভৌগোলিক) স্থাননাম এবং সম্ভবত এই স্থাননামের মধ্যে প্রচলিত করও ঐ শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হত। আক্ষরিক অর্থে চতুরককে আধুনিক থানা শব্দের মধ্যযুগীয় প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। চতুরকের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য চতুরক-সম্বলিত তাম্রশাসনগুলির ভৌগলিক বিস্তারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। এই বিস্তার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় (মানচিত্র দ্রষ্টব্য) প্রথম তিনটি তাম্রশাসনে ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ভূমিদান নির্দেশিত, চতুর্থ ক্ষেত্রে পদ্মা ও মেঘনার মোহনায় তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান (প্রদত্ত ভূখণ্ডের বর্তমান অস্তিত্বও প্রমাণিত)[২১] এবং পঞ্চম ক্ষেত্রে উভয় নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিদান করা হয়েছে। মোট পাঁচটি তাম্রশাসনে সাতটি চতুরকের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যপাড়া তাম্রশাসনেই তিনটি পৃথক চতুরকের অস্তিত্ব বর্তমান এবং লক্ষণীয়, এই তাম্রপট্টেই রাজধানীর (বিক্রমপুর) সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থানে একত্রে এগারোটি ভূখণ্ড প্রদত্ত হয়েছে।

পাঁচ

বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনায় চতুরক সংক্রান্ত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়টি হল প্রশাসনিক শ্রেণীক্রমে চতুরকের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থান।[২২] কখনও চতুরক প্রত্যক্ষভাবে ভুক্তির অন্তর্গত; কখনও খাটিকার অন্তর্গত; কখনও মণ্ডলের অন্তর্গত; কখনও আবৃত্তি/বৃত্তির আবার অন্য কোন ক্ষেত্রে সরাসরি রাজধানীর আঞ্চলিক-ভৌগলিক

সীমার খণ্ডাংশমাত্র। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের পরবর্তীকালীন অভিলেখগুলিতে বিষয়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ উপ-বিভাগের প্রশাসনিক অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে অপসৃয়মান। একই সাথে বিভিন্ন প্রশাসনিক এককের কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীগুলির নামও শেষ দিকের হস্তান্তরপত্রগুলিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী উপবিভাগগুলির কার্যগত অস্তিত্ব ক্রমাগত মূল্যহীন এবং দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আঞ্চলিক রাষ্ট্রচরিত্রে কেন্দ্রিকতার সঙ্কটকেই প্রকট করে।

ছয়

এমতাবস্থায় চতুরক নামক ভৌগলিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এককের ক্রমবর্ধনশীলতা অবশ্যই সেন শাসনতন্ত্রের অধীনে দক্ষিণবঙ্গে আঞ্চলিক রাজশক্তির প্রয়োজনানুগ ও আপাতভাবে অবিন্যস্ত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের চরিত্রকেই পরিস্ফুট করে। স্পষ্টতই বিক্রমপুরকেন্দ্রিক সেন শাসনে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় বদ্বীপ অংশে চতুরকের মত ক্ষুদ্র প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে রাষ্ট্রিয় সুরক্ষা প্রদানের দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা চলেছিল। করপ্রদান সংক্রান্ত কার্যবিধির সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের অর্থনৈতিক সংগঠনও চতুরকের ক্রিয়াশীলতার দ্বারা প্রভাবিত হয় কারণ, থানার ন্যায় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দ্বারা কর প্রদানের ন্যায় সামাজিক বিধিকে সম্ভবত বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়েছিল। মুসলিম আক্রমণ এবং উত্তরবঙ্গের সার্বিক অস্থিরতার ফলস্বরূপ বিশ্বরূপসেনের শাসনকালে সেন শাসনযন্ত্র উত্তরবঙ্গ ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে বিক্রমপুরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে একাধিক চতুরকের অস্তিত্ব (মধ্যপাড়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত বিক্রমপুর সন্নিহিত তিনটি চতুরকের একত্র অবস্থান স্মরণযোগ্য) দ্বিবিধভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়ায় একাধিক পৃথক প্রশাসনিক এককের উপস্থিতিতেও রাষ্ট্রের আঞ্চলিক কেন্দ্রিয় চরিত্র এবং একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাবিধানের প্রবণতাও অক্ষুন্ন থাকবে। দ্বিতীয়ত চতুরকগুলির অভ্যন্তরীণ কার্যগত চরিত্রের জন্যই যে আঞ্চলিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগঠনকেও অবিকৃত রাখা সম্ভব হবে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চতুরককে একটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক এককের অভিধা প্রদান করা যায় কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেন শাসনক্রমের শেষ পর্বের অধিকাংশ উপকূলীয় তাম্রশাসনে চতুরকের উপস্থিতি কি সেই সম্ভাবনার দিকেই অঙ্গুলীনির্দেশ করে? সঠিকভাবে চূড়ান্ত মন্তব্য করা এই মুহূর্তে যুক্তিসঙ্গত না হলেও সম্ভাবনার ইঙ্গিতকে অবান্তর বলা যায় না।

চতুরকের কার্যগত প্রকৃতি অবশ্যই পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এই আঞ্চলিক এককের ভিন্নমুখী অর্থনৈতিক চরিত্র থাকাও অস্বাভাবিক নয়। উত্তরভারত, দক্ষিণভারত ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের আদি মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও অভিলৈখিক সাক্ষ্যে মণ্ডপিকা

নাগরম্, পেণ্ঠা, বেলাকুল, প্রভৃতি মধ্যবর্তী চরিত্রের বাণিজ্যকেন্দ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৩] যদিও চতুরক সংক্রান্ত বর্তমান তথ্যের সাপেক্ষে শব্দটির এই ধরনের চরিত্র প্রমাণিত হয় না। বর্তমান নিবন্ধে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা এবং উপাদানের চরিত্রের উপর ভিত্তি করে একটি সমস্যাকেন্দ্রিক প্রকল্প নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। শব্দটির ভিন্নতর অর্থনৈতিক অস্তিত্ব ভবিষ্যতে প্রমাণিত হলে ইতিহাস ও ইতিহাসচর্চা উভয়ই উপকৃত হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। এগুলি হল- (i) বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন (তাঃ শাঃ) (ii) বিজয়সেনের দেওপাড়া, শিলালেখ (iii) বল্লালসেনের নৈহাটী তাঃ শাঃ, (iv) লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাঃ শাঃ, (v) লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাঃ শাঃ (vi) লক্ষ্মসেনের সুন্দরবন তাঃ শাঃ, (vii) লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল/রাজাবাড়ী/ইণ্ডিয়া অফিস তাঃ শাঃ (viii) লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাঃ শাঃ (ix) লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাঃ শাঃ (x) বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া/সাহিত্য পরিষদ তাঃ শাঃ (xi) বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাঃ শাঃ (xii) কেশবসেনের ইদিলপুর তাঃ শাঃ।

২। এগুলি হল যথাক্রমে (i) লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাঃ শাঃ, (ii) লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাঃ শাঃ (iii) লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাঃ শাঃ (iv) লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল/রাজবাড়ী/ইণ্ডিয়া অফিস তাঃ শাঃ এবং (v) বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া/সাহিত্য পরিষৎ তাঃ শাঃ।

৩। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *রুরাল সেটলমেন্টস্ এন্ড রুরাল সোসাইটি ইন আর্লি মিডাইভাল ইন্ডিয়া*, কলকাতা, ১৯৯০; পৃঃ ৪৬-৪৭।

৪। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃঃ ৫১।

৫। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ; পৃঃ ৫৩-৫৪।

৬। ভোজবর্মনের বেলাব/বেল্ওয়া তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য। এখানে খণ্ডল নামক এক ভূ-রাজনৈতিক একক মণ্ডলের নিম্নবর্তী স্তরে ক্রিয়াশীল। ননীগোপাল মজুমদার - ইন্সক্রিপশসন্ অব্ বেঙ্গল, খণ্ড III, রাজশাহী, ১৯২৯, পৃঃ ১৪-২৪ দ্রষ্টব্য।

৭। উপযুক্ত ২ নং সূত্রে উল্লিখিত তাম্রশাসনগুলিতে চতুরক, আবৃত্তি/বৃত্তি ও পাটক নামক নতুন ভৌগলিক আঞ্চলিক স্তরগুলির আবির্ভাব উল্লেখ্য।

৮। সেন শাসনকালের তিনটি ভুক্তিতে অর্থাৎ পুন্ড্রবর্ধন, বর্ধমান ও কঙ্কগ্রাম ভুক্তির মধ্যে ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত নির্দেশ এই শাসনগুলির দ্বারা ঘোষিত করা হয়েছে।

৯। উপর্যুক্ত পাঁচটি তাম্রশাসন ও নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*; আদি পর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; পৃঃ ৩৪১ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১০। ননীগোপাল মজুমদার, *ইন্সক্রিপশসন্ অব্ বেঙ্গল,* খণ্ড III রাজশাহী, ১৯২৯; পৃঃ ৯২-৯৮।

১১। ননীগোপাল মজুমদার, ঐ, পৃঃ ১৬৯-১৭২

১২। চিত্ররেখা গুপ্ত, *ল্যান্ড মেজারমেন্ট এন্ড ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম ইন বেঙ্গল আন্ডার দ্য সেনস* (দেবলা মিত্র সম্পাদিত একস্‌প্লোরেশনস্ ইন আর্ট এন্ড আর্কিওলজি অব্ সাউথ এশিয়া গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধ)। কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৫৭৩-৫৯৩।

১৩। দীনেশ চন্দ্র গাঙ্গুলি, *শক্তিপুর কপার প্লেট অব্ লক্ষ্মণসেন* (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা খণ্ড, XXI গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধ)। দিল্লী, ১৯৩১-৩২, পৃঃ ২১১-২১৯।

১৪। এইচ. এল. র‍্যাগুল্, *ইন্ডিয়া অফিস কপার প্লেট অব্ লক্ষ্মণ সেন* (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড XXVI গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধ)। দিল্লী, ১৯৪১-৪২; পৃঃ ১-১৩।

১৫। ননীগোপাল মজুমদার, ঐ; পৃঃ ১৪০-১৪৮, এই পাঁচটি তাম্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ব্যারি এম. মরিসন, *পলিটিক্যাল সেন্টারস্ এন্ড কালচারাল রিজিয়ন্‌স্ ইন্ আর্লি বেঙ্গল*, অ্যারিজোনা, ১৯৭০; পৃঃ ৪৬-৫৪ দ্রষ্টব্য।

১৬। চিমনলাল ডি. দালাল ও গজানন কে. শ্রীগোণ্ডেকর সম্পাদিত লেখপদ্ধতি, বরোদা ১৯২৫; পৃঃ ৯, সংশ্লিষ্ট অংশে বলা হয়েছে *চটাপকমলমার্গণমাঙ্গ; লীয়কচতুরক পতিতং দেশাচারেণ দানব্যম্।* স্বসীমামধ্যে মার্গো লোহমায়ো রক্ষণীয়ঃ। পট্টকোদ্রস্মাণাং ব্যবস্থা যথা।

১৭। চিমনলাল ডি. দালাল ও গজানন কে. শ্রীগোণ্ডেকর - ঐ; পৃঃ ১০১।

১৮। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃঃ ৩৪১।

১৯। মনিয়ের উইলিয়ামস্, ঐ, *সংস্কৃত ইংলিশ ডিকশনারি*, দিল্লী; পৃঃ ৩৮১।

২০। দীনেশ চন্দ্র সরকার, *ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফিক্যাল গ্লসারি*, দিল্লী, ১৯৬৬, পৃঃ ৬৮-৬৯।

২১। ব্যারি এম. মরিসন, ঐ, পৃঃ ৫২।

২২। নীহাররঞ্জন রায়, ঐ, পৃঃ ৩৪১।

২৩। বিশদ আলোচনার জন্য রণবীর চক্রবর্তী, *ট্রেড এ্যাণ্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি*, দিল্লী, ২০০২; পৃঃ ১৭, ২০, ২১ এবং ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খশিল্প ঃ একটি নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা

সুদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্খ আসলে একটি জলজ অমেরুদন্ড প্রাণী; এরা মোলাস্কা অর্থাৎ কোমল বা নরম দেহবিশিষ্ট গ্যাসট্রোপোডা তথা উদরপদী শ্রেণীর অন্তর্গত। এ প্রাণীর গায়ের বাইরের আবরণই হল তার খোলস বা shell। সমুদ্রজাত এ প্রাণীটির আকার ও রঙবৈচিত্র্য বিভিন্ন ধরনের। কখনো তারা সাদা রসুনের মত রঙের; কখন বা দুধফেনা রঙের; কখন বা ফিকে হলুদ; আবার শঙ্খ অনেকসময় সাদা ও হালকা পীত আভাযুক্তও হয়ে থাকে। শঙ্খনির্মিত শিল্পবস্তুগুলির মধ্যে বালা জাতীয় অলঙ্কার; ছোট বড় মাপবিশিষ্ট ঔষধ বা অন্য পানীয় গ্রহণের পানপাত্র; অথবা জলশঙ্খ বা বাদ্যশঙ্খ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রাচীনকাল থেকেই। তবে এসকল বস্তুর মধ্যে আংটি, ব্রেসলেট, ব্রোচ, মালা, ঘড়ির চেন, সেফটিপিন্, চুলের কাঁটা জাতীয় অলঙ্কার সামগ্রী ছাড়াও আতরদানি, রুমালদানি, ছাইদানি বা কলমদানির সংযোজন এ তালিকায় শঙ্খশিল্পীদের কারিগরী কুশলতারই পরিচয়বাহী। তবে আলোচ্য এ প্রবন্ধটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত শুধুমাত্র বাদ্যশঙ্খের উপরিতলের কারুকার্যের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনাই করা হযেছে।

এক

বাদ্যশঙ্খগুলির উপরিতলের কারুকার্য সাধারণত দু'ধরনের — প্রথমত, খোদাই (incision বা engraving) এবং দ্বিতীয়ত, নতোন্নত তক্ষণকর্ম (bas-relief)। সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা শাঁখাটি প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড ও জলের দ্রবণে ডুবিয়ে পরিস্কার করা হয়। তার ফলে সামুদ্রিক কালো আস্তরণ ওঠে শাঁখের বহির্ভাগে এক ধরনের জ্যোতি বা দীপ্তি চোখে পড়ে। এরপর শাঁখের গায়ের ফাটা বা পোকায় খাওয়া অংশগুলি নাইট্রিক এ্যাসিড, মোম ও জিঙ্ক পাউডারের বিশেষ দ্রবণ সহযোগে ভরাট করে নেওয়া হয়। অবশেষে শাঁখের মসৃণ বহির্গাত্রে লোহার রেত দিয়ে পছন্দমাফিক নক্শা আঁকা হয়। সাধারণত ধারালো কোন মাধ্যমের সাহায্যে শক্ত জমির উপর রেখাচিত্র অঙ্কন করাকেই খোদাই বা উৎকীর্ণ কর্ম বলা হয়ে থাকে। ধারালো মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয় সরু পাথরের ডগা, সূঁচের মত অগ্রভাগযুক্ত ছুরি, নরুণ এবং বাটালি।

রিলিফ (relief) মোটামুটিভাবে ফলকের উপরে উৎকীর্ণ কোন চিত্রের চারপাশের জমি সামান্য চেঁছে ফেলে করা হয়ে থাকে। চেঁছে ফেলা জমি যদি সামান্যমাত্রায় হয়, তাহলে তা হলো অগভীর রিলিফ (Basso-relievo); তুলনামূলক বেশি অংশ চেঁছে দিলে তা হয় অনতিগভীর রিলিফ (Mezzo-relievo) আর যখন উৎকীর্ণমূর্তি বা বস্তুর স্থূলত্বের অর্ধেকাংশ জমি থেকে প্রায় অনেকটাই বেরিয়ে থাকে তখন তা গভীর রিলিফ (Alto-relievo) এর পর্যায়ভুক্ত। রিলিফকর্মটি যখন আবার পৃষ্ঠপট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে এক নিজস্ব সত্তায় বিশিষ্টরূপ ধারণ করে যার ত্রিমাত্রিকতা সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান তখন তা পূর্ণমন্ডন ভাস্কর্যের (sculpture in the round) রূপ ধারণ করে। এখানে আলোচিত কারুকার্যময় শাঁখের অলঙ্করণের সবটাই অগভীর রিলিফ অর্থাৎ Bas-relief প্রকৃতির। এধরনের তক্ষণকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার রেখাচাতুর্য; যাকে শিল্পের পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে লতা-শৈলী বা Phantstyle। বাদ্যশঙ্খের উপরিতলে বা রিলিফ বা নতোন্নত তক্ষণকলার দ্বারাই নানান দেবদেবীর চিত্ররূপ, পৌরাণিক কাহিনী বা মহাকাব্যের নানা উপাখ্যানের রূপায়ণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেখার এই স্বচ্ছন্দ্য গতিময়তার সর্বজনীন আবেদন শঙ্খশিল্পে বিবরণ-ধর্মী এক শিল্পরূপ (Narrative art) কেই যেন তুলে ধরেছে। আবার, ফুল লতাপাতার নক্শা সৃষ্টিতে যেন আলপনার দ্বিমাত্রিক পরিভাষা ফুটে উঠেছে।

দুই

পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খশিল্প প্রধানত বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এমনকি কলকাতার বাগবাজার অঞ্চল, আর্মহার্স্ট স্ট্রীট চত্বর বা ভবানীপুরের শাঁখারিপাড়া অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় হুগলী তথা ভাগিরথীর উত্তরদিকের জেলাগুলিতে শঙ্খশিল্পের সেরকম প্রসার ঘটেনি। ভারত মহাসাগর তীরবর্তী উপকূল অঞ্চল তামিলনাড়ু, রামেশ্বর, তুতিকোরিন বা শ্রীলঙ্কার জাফনা অঞ্চল থেকে কাঁচামাল হিসেবে প্রচুর মাত্রায় শঙ্খ আমদানি করা হয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গে এমনকি বাংলাদেশেরও ঢাকা, পাবনা, বাখরগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট অঞ্চলের শঙ্খশিল্পকেন্দ্রগুলিতে।

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বহুঘর শাঁখারী বংশপরম্পরায় শাঁখা তৈরীর পাশাপাশি বাদ্যশঙ্খের উপর কারুকার্য আজও কম-বেশী চাহিদা অনুযায়ী করে থাকেন। অলঙ্কৃত বাদ্যশঙ্খগুলির বিষয়বৈচিত্র্য নানান ধরনের ঃ (১) দুর্গা বা কালীর মুখবিহুর; (২) লক্ষ্মী-নারায়ণ; (৩) রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে ঘিরে সংকীর্তনরত দুই পুরুষ; (৪) রাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তিরূপ; (৫) অনন্তশয়ানে বিষ্ণু; (৬) একই শঙ্খের উপর শিব, কালী বা লক্ষ্মীর মূর্তিরূপ পাশাপাশি; (৭) বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি;

(৮) মহাভারতের কর্ণবধদৃশ্য; ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া কেবলই পদ্মফুল অথবা শুধুমাত্র ফুল লতাপাতার নকশা সম্বলিত শঙ্খের প্রাচুর্যতা লক্ষণীয়।

নদীয়ার শঙ্খনগর অঞ্চলের এক শিল্পীর হাতে তৈরী দেবী দুর্গার মুখমন্ডলমধ্যে ভ্রুগুলিসহ দুটি নয়ন, ওষ্ঠাধর বা নাসিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিবুকের গড়নভঙ্গিমা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে রচিত। কর্ণাভরণ, কণ্ঠাহার বা মুকুটসহ দেবীমূর্তির ত্রিনয়নও রিলিফে যথেষ্ট পারিপাট্যের প্রকাশ। শঙ্খনগরের অপর এক নিদর্শনে চর্তুভুজ নারায়ণ বামে লক্ষ্মীসহ সমপদে দাঁড়িয়ে। দেবতার উপরের ডানহাতে চক্র, বামহাতে শঙ্খ, নীচের বামহাতে গদা ও ডানহাতটি অভয়মুদ্রায় স্থাপিত। সাধারণত ব্রাহ্মণ্য মূর্তিশাস্ত্র অনুযায়ী দেবতার গলার বনমালাটি জানুদেশ পর্যন্ত প্রসারিত থাকার কথা। তবে এক্ষেত্রে তা নেই — বনমালাটি কটিদেশ পর্যন্তই সম্প্রসারিত। ব্রাহ্মণ্য মূর্তিনির্মাণ ও শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে শিল্পীর জ্ঞানসঙ্কীর্ণতারই প্রকাশক এ মূর্তিটি। দেবতারা দুজনেই সামান্য অলঙ্কারে সজ্জিত; বেশভূষাতেও দক্ষিণী প্রভাব চোখে পড়ে। দেবী লক্ষ্মীর বামহাতে পদ্ম ও ডানহাতটি অভয়মুদ্রায় প্রদর্শিত। বিষয় নির্বাচন ধর্মীয় হলেও বর্তুলতা বা মন্ডনগুণের (plasticity) জড়তা কাটিয়ে শিল্পী অপরিসর স্থানেই রৈখিক নিয়মানুবর্তিতাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

বিষয়বস্তুর বিভাজন অনুসারে রাধাকৃষ্ণের উপস্থাপনা বাগবাজারের শিল্পী ননীগোপাল শূরের হাতে এক অনবদ্যরূপ লাভ করেছে। এক অলিন্দে বংশীবাদনরত কৃষ্ণ রাধার পাশে দাঁড়িয়ে। পাশের অলিন্দে গৌড়ীয় পুরুষ উর্দ্ধবাহুতুলে সংকীর্তনরত ভঙ্গিমায়। শিল্পী এখানে কৃষ্ণের বংশীবাদনরূপের সাথে দীর্ঘ মালা পরিহিত রূপের প্রতিও সমান দৃষ্টি রেখেছেন। কারুকার্যের বিচারে বলা যেতে পারে শাঁখের মধ্যবর্তী অংশটি ছাড়াও উপর ও নীচের কারুকার্য অত্যন্ত সাবলীলভাবে রূপায়িত। তবে রেখার গতিময়তা এক্ষেত্রে খানিকটা ব্যাহত হয়েছে অলিন্দের বিভাজনে। যদিও এক্ষেত্রে উপস্থাপনার অভিনবত্ব অপরাপর শিল্পবস্তু থেকে এটিকে এক পৃথক সত্তা দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জিতপুর অঞ্চলের এক অজ্ঞাতনামা শিল্পী নিপুণহাতে শঙ্খের উত্তলপৃষ্ঠে অগভীরভাবে উৎকীর্ণ করেছেন রাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলমূর্তি। অগভীর রিলিফ কর্মে রেখাচাতুর্যের সঞ্চরণশীল দ্যোতনা এক অনবদ্য প্রকাশরূপ পেয়েছে এ শিল্পের মাধ্যমে। কলমকাঁটাযুক্ত বাটালি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মূল চিত্ররূপের আশপাশের অংশটি ফুল, লতাপাতা নকশা দ্বারা। জিতপুর অঞ্চলের ও তার আশপাশের শঙ্খশিল্প দেশে ও বিদেশের বাজারে আজও তাই পসার জমিয়ে রেখেছে।

তিতকুটি শাঁখের উপর অলঙ্করণের বৈচিত্র্যময় সম্ভার চোখে পড়ে বিষ্ণুপুর থেকে সংগ্রহ করা শাঁখগুলিতে। নান্দনিক বিচারে অতুলনীয় এ ধরনের বেশ কয়েকটি শাঁখের

মধ্যে অনন্তশয়ানে বিষ্ণুর মূর্তিরূপটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। চর্তুর্ভুজ বিষ্ণুর পিছনের ডানহাতে চক্র, বামহাতে শঙ্খ, সামনের বামহাত পদ্মসহ কটিপরি ন্যস্ত এবং সামনের ডানহাত অভয়মুদ্রা সম্বলিত। গদাটি দেবতার সামনে রাখা। বিষ্ণুর নাভি থেকে আবির্ভূত হয়েছে পদ্ম। লক্ষ্মীদেবী পদসেবায় নিয়োজিত। বিষ্ণুর গাত্রালঙ্কার, বনমালা, জ্যোতিষচক্র এমনকি পরিধেয় বস্ত্রটিও যথেষ্ট আলঙ্কারিক। অনন্তনাগকে ঘিরে এ স্থানে গণেশ, বৃষসহশিব, চতুর্মুখী ব্রহ্মার উপস্থিতি সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ভারতীয় রিলিফগুলিকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে গুপ্তযুগের ধ্রুপদী শিল্পকলার পর্যায়ভুক্ত খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের শেষদিকের দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরের গভীরভাবে খোদিত রিলিফে (Alto-relievo) উৎকীর্ণবিষ্ণুর অনন্তশয়ান মূর্তিরূপটিই প্রসঙ্গত স্মরণীয়। দেওগড়ের এ মূর্তি ও বর্তমানে আলোচিত বিষ্ণুপুরের মূর্তিরূপের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো বিষ্ণুপুরের মূর্তিতে হনুমানের উপস্থিতি। যা ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্যকলার কোন নিদর্শনেই পাওয়া যায়নি। ব্রাহ্মণ্য মূর্তিশাস্ত্রে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার দাশরথি রামের সহচররূপে হনুমানের আবির্ভাব বিষ্ণুর সময়কাল থেকে বহুযুগ পরে। অনন্তশয়ানে বিষ্ণুমূর্তিতে হনুমানের উপস্থাপনা বিষ্ণুপুব অঞ্চলের স্থানীয় কাহিনীর প্রভাবসঞ্জাত নাকি শিল্পী গোপাল নন্দীর কল্পনাপ্রসূত তা এখনও গবেষণাধীন। বিষ্ণুর মূলমূর্তির আশপাশের কোন অংশই শিল্পী ফাঁকা রাখেননি; সেখানেও স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্রহরণ দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন অতি নিপুণভাবে সুচারুরেখার সামঞ্জস্য বিধানে। শাঁখের মধ্যবর্তী অংশটি ছাড়াও উপরের ও নীচের অংশটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন শিল্পী এবং সেক্ষেত্রে ফুল, লতাপাতার আলঙ্কারিক সূক্ষ্মকারুকার্য ছাড়াও দশাবতার মূর্তিসকল বিশেষ বৈশিষ্টবাহী। এমনকি শাঁখের উপরিভাগের অংশটিও তিনটি প্যানেলে বিভক্ত করে তাতে বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৌতূহলী দর্শকমুখের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে। সেই খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রাচীন ভারহুত শিল্প থেকে শুরু করে পট্টডকলের মন্দিরগাত্রের সর্বত্রই এই শিল্পসুচারুতা এক লক্ষণীয় বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের শঙ্খশিল্পীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ কারুকার্যতার প্রতি তুলনামূলক বেশী নজর দিয়ে থাকেন। এমনই শাঁখের উপর কালী, শিব, গজলক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবতাদের বাস-রিলিফ উৎকীর্ণ। এ ধরনের অপর একটি শাঁখে আবার অন্যান্য দেবতাদের পাশাপাশি দেখা যায় বিষ্ণুর বরাহ অবতারকে। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, শাঁখের মুখের কাছের অংশটিতে ছোট ছোট ফুলের মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে।

বাঁকুড়ার হাটগ্রাম অঞ্চলের শঙ্খশিল্পীগণ তক্ষণকলায় অনেক বেশী পারদর্শী। মহাভারতের কর্ণবধ দৃশ্য এখানকার শিল্পীর হাতের পরশে অসামান্য রূপ লাভ করেছে। কর্ণবধ দৃশটিতে তীরবেগে ধাবিত অর্জুনের রথের সারথির আসনে শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অর্জুনকে বাঁহাত তুলে বিপরীত দিক থেকে আগত সূর্যপুত্র কর্ণকে দেখাচ্ছেন বধ করার

জন্য। রথের উপস্থাপনা ও ঘটনার গতিশীলতা নিপুণহাতে খোদিত কারুকার্যকে এক বিশেষমাত্রা দিয়েছে। অন্যদিকে মানবদেহ বা অশ্বমন্ডলীরূপায়ণে রেখার সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতা দৃশ্যরূপটিকে অনেক বেশী বাস্তবানুগ করে তুলেছে। এক্ষেত্রে অর্জুন বা কৃষ্ণের পার্শ্বরূপ (profile representation) উৎকীর্ণ করার ক্ষেত্রেও শিল্পীর নিপুণহাতের রেখাচালনা বিশেষ নজর কাড়ে। নন্দনতত্ত্বের বিচারে বলা যেতে পারে যে, এ বিশেষ শঙ্খটির রূপায়ণে শিল্পীর কৌণিক মাত্রাজ্ঞানের (sense of angularity) পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জুনের তীর নিক্ষেপকে কেন্দ্র করে অশ্ববাহিত কর্ণের কোণাকুনি অবস্থান বাস্তবিকই শিল্প আবেদনক্ষম। দৃশ্যের আশপাশও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণ দ্বারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর জেলার পাত্রসায়ের বা রায়বাঘিনীর শিল্পীরা আবার শাঁখের ওপর প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটিয়ে এক ধরনের পদক তৈরী করে থাকেন; যেগুলির শিল্পসুষমা অপরূপ। ঐ জেলার ঘটুগেড়িয়া অঞ্চলের শিল্পীরা কিন্তু শঙ্খবলয়ের উপর নানা রঙ ব্যবহার করে বিবিধ নকশা করে থাকেন। হাটগ্রামের শঙ্খশিল্পীরা অবশ্য ভাঙা শাঁখার টুকরা গালার দ্বারা জুড়ে জুড়ে মনোরম বালা করে থাকেন যা শিল্প বিচারের নিরিখে এক অনবদ্য সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জিতপুর অঞ্চলের বাদ্যশঙ্খের উপর ছয় বা আটপাপড়িযুক্ত খোদাইকর্ম (incision) রিলিফের তুলনায় অধিক প্রাণবন্ত। তবে মুর্শিদাবাদ ছাড়াও এধরনের শিল্পকর্ম অন্যান্য জেলার শিল্পীরাও বহুল সংখ্যায় করে থাকেন। পুরুলিয়া, বর্ধমান, হাওড়া-হুগলীর বা মেদিনীপুরের শিল্পকলাগুলিও কমবেশি এধরনের বিবরণ-ধর্মী।

তিন

পশ্চিমবঙ্গের নানান জেলার শঙ্খশিল্পীদের কারিগরী কুশলতাও এশিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা শঙ্খশিল্পের প্রাচীনত্ব জানার কৌতূহলকে যেন আরও বাড়িয়ে তোলে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে বা প্রত্ন-নজিরের তথ্যসমূহ নাড়াচাড়া করলে দেখা যায় সেই প্রাক্-হরপ্পা সংস্কৃতির সময়কাল থেকেই অর্থাৎ মেহেরগড় সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই শঙ্খকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। এমনকি হরপ্পা সংস্কৃতির হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো ছাড়াও লোথাল, বালাকোট, নাগেশ্বর ধোলাভিরা, মাকরান উপকূল অঞ্চলের সুৎকাজেনদোর থেকে আলহাদিনো পর্যন্ত নানান প্রত্নস্থানে পাওয়া সামুদ্রিক শঙ্খ ও শঙ্খজাত সামগ্রী ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে শঙ্খকে এক বিশেষ শিল্পবস্তুব স্থান করে দিয়েছে। শঙ্খবলয়ের ব্যবহার ছাড়াও মৃতদেহ সৎকারের কাজে প্রয়োজন শঙ্খের বৃহদাকার চামচ (ladle) অথবা ওষুধ বা অন্য কোন পানীয় গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের শঙ্খের চামচ সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। তবে মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া বাদ্যশঙ্খের ঔপর খোদাইকর্মের নিদর্শনরেখা থাকলেও তাতে কোন চিত্ররূপ

উৎকীর্ণ হয়নি। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটি নয়, তাই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে আদি ঐতিহাসিকযুগে (proto-historic age) ব্যবহৃত শঙ্খগুলি প্রধানত আরবীয় সমুদ্র উপকূল অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করা হোত এবং বালাকোট বা নাগেশ্বর অঞ্চল শঙ্খনির্মিত শিল্পবস্তু তৈরীর কেন্দ্রস্থলরূপে পরিচিত ছিল।

রামায়ণ মহাভারত; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বা কলিকাপুরাণ; মনসামঙ্গল বা অন্যান্য লোকসাহিত্যে এমনকি আধুনিক সাহিত্যেও শঙ্খ এক অনবদ্য শিল্পবস্তুর উপাদানরূপে বর্ণিত আছে। তবে আনুমানিক খ্রিষ্টিয় প্রথম শতকে রচিত Silappadikaram নামক তামিল মহাকাব্য থেকে জানা যায় দক্ষিণ ভারতে শঙ্খশিল্পের ব্যাপক প্রসারের কথা। দক্ষিণ উপকূলীয় মান্নার উপসাগর অঞ্চলে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে শঙ্খশিল্পের কথা জেমস্ হরনেলের রচনা থেকেও জানা যায়। 'মাদুরাই কাঞ্চি' নামক তামিল কবিতাটিতে পান্ড্যরাজ্যের উপরাজধানী কোরকাই শহরে শঙ্খশিল্পের বিকাশের কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের শালিহুনদমে (শাঁখের উপর) খ্রিষ্টিয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা ঐ স্থানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিকাশের কথা জানা যায়। ঐ সময়ে প্রচলিত দাতার নামসহ দানলিপি পরবর্তীকালে শ্রীহট্ট জেলার অনুরূপ এক দাতার নামসহ দশাবতার রিলিফ বিশিষ্ট শঙ্খের (খ্রিঃ ১৭শ-১৮শ শতাব্দী) কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সমুদ্র উপকূলবর্তী নানান পোতাশ্রয় বা বন্দরের আশপাশেই শঙ্খশিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের শঙ্খশিল্পীরা প্রধানত তাঞ্জোর থেকে আসেন। তবে মহীশূর কুদাপ্পা, বেলারী, অনন্তপুর, কুরনুল, হায়দ্রাবাদ আবার গুজরাট - কাথিয়াবাড় সহ মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নানা ধরনের শঙ্খ ঐ সকল অঞ্চলের শঙ্খশিল্পকে বিকশিত করে। প্রাচীনকালের শঙ্খ বা শঙ্খনির্মিত শিল্পবস্তুসকলই মধ্যযুগীয় ইসলামীয় সংস্কৃতির স্রোতে খানিকটা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। ভারতের কচ্ছ কাথিয়াবাড় সহ গুজরাট তামিলনাড়ুর পর সম্ভবত চর্তুদশ শতাব্দীতে শঙ্খশিল্পের কেন্দ্রস্থল সমুদ্রের পূর্ব উপকূলীয় রেখা বরাবর বঙ্গদেশে স্থানান্তরিত হয়। হরনেলের মতে, বঙ্গদেশের ঢাকাকে কেন্দ্র করেই নতুনভাবে পূর্বভারতে শঙ্খশিল্প বিকাশ লাভ করে। বঙ্গদেশের শঙ্খকাররা দুভাবে পরিচিত — শাঁখারী ও শঙ্খবণিক। শাঁখারীরা শঙ্খশিল্পের ধারক ও বাহক আর শঙ্খবণিকরা শঙ্খের ব্যবসায়িক দিকটি নিয়ন্ত্রণ করেন কেবল। তবে ঠিক কবে থেকে বঙ্গদেশের বিশেষজ্ঞ পূর্ববঙ্গের ঢাকায় শঙ্খশিল্পের বিকাশ ঘটে তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

তবে অত্যন্ত লাভজনক এই শিল্প সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে মন্দার শিকার হয়। চর্তুদশ শতক থেকেই পূর্ববাংলায় শঙ্খশিল্পের

বিকাশ ঘটলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচ বণিকদের একচেটিয়া মাদ্রাজ থেকে কাঁচামালরূপে শাঁখ সরবরাহের কথা জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের থেকে বঙ্গদেশ হয়ে স্থলপথে তিব্বত, চীন বা নেপাল পাড়ি দিত এই শঙ্খ। কর্ণাটকের সঙ্গে যে দ্বাদশ - ত্রয়োদশ শতক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল তা ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী শঙ্খশিল্পীরা আরও একবার প্রমাণ করে দেয়। তবে সপ্তদশ শতকে আদিগঙ্গার নাব্যতা হ্রাস পেলে ক্রমশ ব্যবসা বাণিজ্য পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য শিল্পের মত শঙ্খশিল্পের বাজারও ঢাকাকে কেন্দ্র করে রঙপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর এমনকি বাংলাদেশের দিনাজপুরে ছড়িয়ে পড়ে। এপার বাংলার জেলাগুলির আলোচনা তো বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। ট্যাভারনিয়ের সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন যে, ঐ সময়ে ঢাকা-পাবনা অঞ্চলে তিনি অন্তত দু'হাজার শাঁখারীকে দেখেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আবার শাঁখার চাহিদা বাড়ালে পুনরুজ্জীবিত এই শাঁখাশিল্প নগরকেন্দ্রিক এক ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়, যা অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ এক কারুকৌশল সমৃদ্ধ শিল্পবস্তুরূপে সমাদৃত হতে থাকে। পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে শঙ্খশিল্প বিশেষত বাদ্যশঙ্খের উপর কারুকার্য অনেক বেশী দ্যোতনাময়। যদিও স্মৃতিকুমার সরকার তাঁর পরিশ্রমলব্ধ এক গবেষণাপত্রে মন্তব্য করেছেন যে শঙ্খশিল্পের ক্ষেত্রেই একমাত্র যান্ত্রিক উৎপাদন ঘটেনি। তবে বর্তমানে শাঁখ কাটবার জন্য চিরাচরিত শাঁখের করাতের পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও শাঁখায় বা শঙ্খনির্মিত বিভিন্ন শিল্পবস্তুতে কারুকার্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে হস্তানির্মিত শিল্পপ্রয়াসই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় বহন করে। ধর্মীয় দ্যোতনার প্রকাশ যে বাদ্যশঙ্খ তার উপরিতলের কারুকার্য যেমন শিল্পরসিকের মন কাড়ে, তেমনই গবেষকের দৃষ্টিতে তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতেও সচেতন হয়। শঙ্খশিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরে লোকশিল্পের পরিচয়বিশিষ্ট এ ধরনের একটি শিল্পের মধ্যে দিয়ে জীবিকার তাগিদ অথবা প্রয়োজন ভিত্তিক শিল্পরচনার প্রয়াস অনায়াসেই চোখে পড়ে।

সূত্র-নির্দেশ

১। যোনাথন মার্ক কেনোয়ের, *এনসিয়েন্ট সিটিস অব্ দ্য ইন্ডাস ভ্যালী সিভিলাইশেসন*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৯৮।

২। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম ও ২য় খন্ড কলিকাতা, ১৯৩৫, পুনঃমুদ্রণ ১৯৯৩।

৩। জে. বি. ট্যাভারনিয়ের, *ট্যাভারনিয়েরস ট্রাভেলস ইন্ ইন্ডিয়া*, ২য় খন্ড, লন্ডন, ১৮৮৯।

৪। শিপ্রা সরকার, *শঙ্খশিল্প*, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫। স্মৃতিকুমার সরকারের প্রবন্ধ, ফ্রম অটোনমি টু সাবার্ডিনেশনঃ এ স্ট্যাডি অব্ দ্য চেঞ্জিং

অর্গানাইজেশন অব্ আর্টিসানল প্রোডাকসান ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল দ্য কেসেস অব্ দ্য কাঁসারিস্ এ্যন্ড দ্য শাঁখারিস', *দ্য ক্যালকাটা হিস্টোরিকাল জার্নাল*, ভল্যুম ১৬, নং ২, কলিকাতা, ১৯৯৪।

৬। সৌগত চট্টোপাধ্যায়, *অথ শঙ্খশিল্পকথা*, কলিকাতা, ২০০০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ অধ্যাপক সৌগত চট্টোপাধ্যায়, বেলদা কলেজ মেদিনীপুর।

বিজ্ঞান চর্চা ও প্রাচীন ভারতীয় নারী একটি সমীক্ষা

অনিতা বাগচী

সম্প্রতি বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে গণ্য হচ্চে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সিংহ ভাগ সময় মানুষ ব্যয় করেছে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের প্রয়াসে আর এই প্রয়াস থেকেই এসেছিল প্রযুক্তির ব্যবহার। অগ্রগতির ধাপে ধাপে সে তৈরী করেছে পাথরের বিভিন্ন হাতিয়ার। হাতিয়ার গুলো উন্নীত হয়েছে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর পর্যায়ে। পাথর মসৃন করার কৌশল আয়ত্ত করার ফলে সহজ হয়েছে খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। জমিকর্ষণ, বপন, রোপন ও পশু পালন—এই বিবিধ কার্যাবলী প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিচায়ক।

সাধারণ ভাবে এটি একটি স্বীকৃত মত যে কৃষিকাজ নারীদের আবিষ্কার।[১] Sowing of crops was largely the work of women who are credited with the discovery of agriculture. কৃষিকার্য আবিষ্কার প্রসঙ্গে বার্নালের[২] মত বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি মনে করেন ইতিহাসের তিনটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন, আগুনের ব্যবহার শেখা ও তড়িৎ আবিষ্কার। এই তিনটি আবিষ্কার একই রকম গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি প্রকরণ উদ্ভাবন ও এর ক্রমোন্নতির ফল স্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। এই বর্দ্ধিত উৎপাদন আবশ্যিক ভাবেই সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সংরক্ষণের সমস্যাই আর একটি আবিষ্কারের পথ সুগম করেছিল। এরই ফলশ্রুতি হল মৃৎপাত্র নির্মাণ। আর মজার সত্যটি হল এই যে মৃৎপাত্র নির্মাণ কৌশলও মেয়েদের উদ্ভাবন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সুতো কাটা ও বয়নশৈলীর আবিষ্কার এর কৃতিত্ব। তৃণলতার সাহায্যে মাদুর বোনা, সুতোকাটা ও বয়নকার্য মূলত মহিলারাই করতেন। এই প্রসঙ্গে বার্নালের[৩] মতটি আলোচনা করলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীদের সহজাত দক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। বার্নেল মন্তব্য করেছেন— "The forms of patterns produced in weaving and number of threads involved in producing them are essentially of a geometrical naturc, leading to a deeper understanding of the relation, between form and number." অর্থাৎ বয়নের সময় নকশা নির্মাণকল্পে বিন্যস্ত তন্তু সমূহ আবশ্যিক ভাবেই একটি জ্যামিতিক নকশায় আবদ্ধ থাকে যা বয়নকারীর,

আকার ও সংখ্যার সাযুজ্য সম্পর্কে নিবিড় উপলব্ধির পরিচায়ক। এই উপলব্ধ জ্ঞানই বয়ন প্রযুক্তির পূর্বাভাস দিয়েছিল। অতএব বলা যায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পথে নারীরা এগিয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। এই অংশগ্রহণ ছিল মানব সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার একটি অংশ। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হরপ্পা সংস্কৃতি পর্যন্ত লিখিত উপাদানের অভাবে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের বিষয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নেই। তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বৈদিক যুগ ও পরবর্তী সময়ের জন্য কিছু উপকরণ ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছে। বৃক্ষ পরিচর্যা থেকেই মূলত উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্ভিদ[৪] বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিল এর তিনটি শাখা যথা—কৃষিবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান ও উদ্যানবিদ্যা। ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদবিদ্যাই বৃক্ষায়ুর্বেদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাশরের বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

প্রাচীন ভারতে চতুর্থ শতক থেকেই কৃষিপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে। উদ্যানবিদ্যা বৃক্ষায়ুর্বেদের একটি শাখা হিসেবে গণ্য হয়। উদ্যান বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল উদ্যান নির্মাণ ও পরিচর্যা এবং সর্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত উদ্যান বা কানন তৈরি করা। এর উদ্দেশ্য ছিল নগরবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও মনোরঞ্জন সাধন করা। এই সব বাগান ও প্রমোদ কাননগুলিকে নগরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হত। এর তত্ত্ববধানের ভার ছিল আরামাধিপতি[৫] নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উপর ন্যস্ত।

বাৎসায়ন[৬] প্রতিটি গৃহের লাগোয়া জায়গায় গৃহকর্ত্রীর তত্ত্বাবধানে গৃহ উদ্যান নির্মাণের কথা বলেছেন। এই উদ্যানে কুব্জক, আমলক, মল্লিকা, জাতী, কুরন্টক, নবমালিকা, তগর, নন্দাবর্ত্ত ও জবাফুলের গাছ এবং এছাড়াও আর যে সব গাছে বহুপুষ্প হয় তাও রোপন করার কথা[৭] বলা হয়েছে। (কুব্জ আমলক মল্লিকা জাতী কুরন্টক নবমলিকা তগর নন্দাবর্ত্ত জবা গুল্মান্যাংশ্চ বহুপুষ্পান্ বালকোশীরক পাতালিকাংশ্চ বৃক্ষবাটিকায়াংচ স্থণ্ডিলানি মনোজ্ঞানি কারয়েৎ)। গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব ছিল সবজি বাগিচা তৈরী করা। নিম্নোক্ত সূত্রটি থেকে তা জানা যায়[৮] ঃ

"মূলকালক পালঙ্কী দমনাপ্রাতকৈর্বারুক
ত্রপুস বার্ত্তাকু কুষ্মাণ্ড অলাবু সূরণ
শুকনাসা - স্বয়ংগুপ্তা - তিনপর্ণিক
অগ্নিমন্থ - লশুন পলাণ্ডু - প্রভৃতীনাং
সর্বৌষধীনাঞ্চ বীজ গ্রহণং কালে
বাপশ্চ।।"

অর্থাৎ মলূক, আলু, পালংশাক, দোনা, আম্রতক, এর্ব্বারুক, ত্রপুস, বার্ত্তাকু, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, সূরণ, শুকনাসা, স্বয়ংগুপ্ত, তিলপর্ণিকা, অগ্নিমন্থ, লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতির বীজ যথাসময়ে সংগ্রহ করে রাখবে এবং উপযুক্ত সময়ে বপন করবে। তাছাড়াও গৃহের কঙ্করমুক্ত স্থানে হরিত ও শাকক্ষেত্র এবং ইক্ষু, জীরক, সর্ষপ, অজমোদ, শতপুষ্পা, তমালতরু ও বংশাদি রোপন করার কথা বলা হয়েছে।

পরিপূতেষু চ হরিত শাকব প্রণিক্ষুস্তম্বাঞ্জীরক
সর্ষপাজমোদ শতপুষ্পা তমাল গুল্মাংশ্চ কারয়েৎ[৯]।

বাৎস্যায়ন প্রদত্ত বিস্তৃত তালিকা থেকে একথা অনুমান করা সহজ যে বিভিন্ন বৃক্ষ, লতা, ফুল ফল ও সবজি সমূহের বৈশিষ্ট্য ও চাষ সম্পর্কে সে কালের নারীরা সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। উদ্যান চর্চার মাধ্যমে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে তারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। অর্থশাস্ত্রে কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ সীতাধ্যক্ষ পদের জন্য কৃষিতন্ত্র গুল্ম - বৃক্ষার্য়ুবেদে জ্ঞান আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে। সীতাধ্যক্ষকেও সঠিক ঋতুতে সর্বপ্রকার বীজ সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে[১০] শুক্রনীতিতেও উদ্ভিদ বিদ্যায় দক্ষতা আরামাধিপতি বা উদ্যান আধিকারিকের আবশ্যিক গুণ বলে মনে করা হয়েছে।[১১] সুতরাং তুল্যমূল্য বিচারে নারীরা যে দৈনন্দিন পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক সাফল্যের অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন তা অনস্বীকার্য। বীজ সংগ্রহ, বীজ নির্বাচন ও বীজ প্রক্রিয়াকরণের উপর উত্তম অঙ্কুরোদগম ও তার বৃদ্ধি নির্ভর করে। এবিষয়ে অসংখ্য নির্দেশাবলী উদ্ভিদবিদ্যার গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। বৃক্ষসংক্রান্ত অভিজ্ঞতালব্ধ যাবতীয় তথ্যপঞ্জী সন্নিবিষ্ট হয়েছে বৈদিকসাহিত্য থেকে শুরু করে অর্থশাস্ত্র, বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, কৃষি-পরাশর, পরাশরের বৃক্ষায়ুর্বেদ বা অমরকোষ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে। বৃক্ষাদিব অসুখ ও চিকিৎসা বিষয়ে বহু তথ্য বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ ও উপবন বিনোদ থেকে পাওয়া যায়।

সম্ভবত বৃক্ষায়ুর্বেদের প্রণেতা পরাশর এবং অগ্নিবেশ সমসাময়িক ছিলেন। চরকসংহিতার সূত্রস্থানে উভয়েরই নাম উল্লিখিত হয়েছে। চরক এর কাল নিরূপণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সাধারণ ভাবে তাঁকে সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। চরক যদি প্রথম কণিষ্কের সময়ের হয়ে থাকেন তবে পরাশরকে তাঁর অগ্রবর্তী বলে নির্ণয় করাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব বৃক্ষায়ুর্বেদের অনুশীলন ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। বাৎস্যায়ন[১২] নারীদের জন্য যে চৌষট্টিকলাবিদ্যার অনুশীলন অপরিহার্য বলেছেন তার মধ্যে বৃক্ষায়ুর্বেদ একটি কলা হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও চৌষট্টিকলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গন্ধযুক্তি অর্থাৎ নানারকমের গন্ধদ্রব্য তৈরি করা যার জন্য রসায়ন বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন হত। পট্টিকা - বেত্র - বাণ বিকল্প

কিংবা তক্ষকর্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্য রূপ্য ও রত্ন পরীক্ষা ধাতুবাদ যন্ত্রমাতৃকা এগুলি সবই প্রযুক্তি ভিত্তিক কলা। বাৎস্যায়নের সূত্রে যে চিত্রের আভাস আমরা পাই তার নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। সমাজের প্রতিটি নারী চৌষট্টিকলায় পারঙ্গমা হয়ে উঠতেন এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক নারী যে বিষয়গুলোতে তাঁদের উৎকর্ষের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

দেওপাড়া লিপিতে[১৩] উল্লেখ আছে যে গ্রাম্য ব্রাহ্মণ মেয়েরা মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মরকত চিনতেন না। তারা পরিচিত ছিলেন কার্পাস বীজ, শাক পত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ব - বীজ বা কুষ্মাণ্ড পুষ্পের সাথে। তাই নগর বাসিনীরা সম্প্রতি বিত্তবান হয়েছেন এমন ব্রাহ্মণদের স্ত্রীদের মুক্তা, মরকত, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি চিনিয়েছিলেন কার্পাস বীজ ইত্যাদির সাথে এদের সাদৃশ্য থেকে। সুতরাং একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে গৃহবধূরা আবহমান কাল ধরেই এই বিশেষ চর্চায় নিজেদের যুক্ত রেখেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি জোরালো প্রমাণ আমরা পাই খনার বচন[১৪] থেকে। খনার প্রবচন গুলো কৃষিবিদ্যায় নারীদের গভীর জ্ঞানের দ্যোতক। খনার পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। তবে তিনি বরাহমিহিরের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন বলে লোক কথায় প্রচার আছে এবং সুপ্রাচীন কাল থেকেই বংশ পরম্পরায় এই প্রবচন গুলো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত। নীহার রঞ্জন[১৫] রায়ের কথা এই খানে উদ্ধৃত করা যাক —

"কোন কোন ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন শস্যের জন্য কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়াতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষিপ্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা খবর এই বচন গুলিতে পাওয়া যায়।"

এক এক রকম চারাগাছের জন্য এক এক রকম চাষ প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে খনা কথিত একটি প্রবচন উদ্ধৃত করা যেতে পারে[১৬] ঃ

যোল চাষে তুলা, তার অর্দ্ধেক মূলা।
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক জি. পি. মজুমদারেব[১৭] মন্তব্য স্মর্তব্য — "The soundness of the directions becomes at once manifest when one takes into consideration that cotton plant has an elaborate root system, radish is a herb, paddy is a surface feeder and betle is a climber that produces numerous adventitious aerial roots." "অর্থাৎ এই নির্দেশগুলো একটু বিশ্লেষণ করলেই প্রণেতার গভীর জ্ঞান সহজেই প্রতীয়মান হয় যে কার্পাস গাছের মূল

হল জটিল ও বিস্তৃত, মূলো হল গুল্মমূল শ্রেণীভুক্ত, ধান মাটির উপরিতল থেকেই জল আহরণ করে আর পানগাছ একটি লতা যা শূন্যে অস্থানিক মূল ছড়িয়ে দেয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে সবুজ পাতাই হল গাছের রান্নাঘর। গাছের উৎপাদনশীলতা পাতার সজীবতার উপর নির্ভর করে। সম্ভবত অভিজ্ঞতার নিরিখে খনা এই বৈজ্ঞানিক সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি বলেন[১৮]—

লাগিয়ে কলা না কাট পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।

খনার প্রবচন প্রকৃত পক্ষে এক অফুরন্ত জ্ঞানের আকর। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এর বিস্তৃত আলোচনা প্রায় অসম্ভব। আর একটি মাত্র প্রবচন উদ্ধৃত করেই খনার বিষয়ে আলোচনার ছেদ টানব। খনা বলেছেন—

দিনে রোদ রাতে জল
দিন দিন বাড়ে ধানের বল।।

আধুনিক বিজ্ঞান — অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা এই রকম দেওয়া সমীচীন যে দিনের বেলা রোদের সাহায্যে গাছ তার খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে ও খাদ্য মজুত করে, চারা গাছের বৃদ্ধির কাজটি সারা হয় রাতে। তাই রাতের বেলায় জলসেচ জরুরী। এইভাবে সহজ বোধ্য ভাব ও ভাষার মাধ্যমে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে লোকের মুখে মুখে এই সব প্রবচনগুলো আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু এই সাদামাঠা প্রবচনগুলোর আড়ালেই লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের গভীর সত্যগুলি। আর এই কারণেই খনার অসাধারণ অবদান অনস্বীকার্য।

উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চ্চা বিজ্ঞানের আর একটি শাখার জন্ম দিয়েছিল। সেটি হল ভেষজ বিজ্ঞান যা আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত। ঋক্‌বেদের যুগ থেকেই এই বিদ্যার চর্চা প্রসার লাভ করে। তবে এই চর্চার ক্ষেত্রে বৌদ্ধপণ্ডিতদের দান অপরিসীম। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে এই বিষয়ে উপলব্ধ জ্ঞান ও বিভিন্ন তথ্যাদির সংকলনের কাজ শুরু হয়েছিল। এর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি হল ভেল সংহিতা চরক সংহিতা ও শুশ্রুত সংহিতা।

বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সংঘের জন্য ঔষধ ও বিহারের কথা বলেছিলেন।[২০] ভিক্ষুদের অসুখ হলে সহযোগী সন্ন্যাসীরা পরিচর্যার কাজটি করতেন। মঠের অভ্যন্তরে অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্য আরোগ্যশালার ব্যবস্থা ছিল। এই সেবার কাজে গৃহী শিষ্যরাও অংশ নিতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুরুষদের পাশাপাশি গৃহবাসিনী শিষ্যারাও সক্রিয় অংশ নিতেন। এই প্রসঙ্গে বারাণসী নগরীর ভক্তিমতী শিষ্যা সুপ্পিয়া'র ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।[২১]

একদা আকাসগোত্ত নামে একজন বৌদ্ধ চিকিৎসক একজন বৌদ্ধভিক্ষুকে শল্যপচার করেছিলেন ভগন্দর রোগ নিরাময়ের উদ্দেশে। সুপ্পিয়া ভিক্ষুটির আরোগ্যর জন্য তার নিজের উরুদেশ থেকে একখণ্ড মাংস কেটে দান করেছিলেন। চিকিৎসার স্বার্থে এটি প্রয়োজন হয়েছিল। বিষয়টিকে শুধুমাত্র পরোপকার ধর্মের নিরিখে মূল্যায়ন করলে এই মহীয়সী নারীর মল্যায়নে ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা। বরং একজন রোগীর নিরাময় কল্পে সমকালীন চিকিৎসাব্যবস্থার প্রয়োগ - এ একজন নারীর অসামান্য সহযোগিতার প্রমাণ হিসেবে বিচার করা যেতে পারে।

বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের যুগে অঙ্গ-পতঙ্গ দান ও তার ব্যবহার একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই দান করার জন্য দাতার যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞান মনষ্ক চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে। স্বভাবতই সেই প্রাচীন যুগে চিকিৎসার স্বার্থে একজন নারীর এই দুঃসাহসিক সহযোগিতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১১.৪.৫৫)[২২] দুর্গের অভ্যন্তরে ভৈষজগৃহ বা আরোগ্যশালা নির্মাণের নির্দেশ আছে। এর সাথে চিকিৎসক, শল্য উপকরণাদি, প্রতিষেধক তেল, ক্ষতস্থান বাঁধার পটি এবং পথ ও পানীয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের সহযোগে একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এখানেও মহিলাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আমরা দেখতে পাই। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি-তে খাদ্য ও পানীয় নির্বাচন ও প্রস্তুত করা মূল চিকিৎসা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ ধরনের একটি দায়িত্ব যে মহিলারা যথাযথ ভাবেই পালন করতেন তার ইঙ্গিত অর্থশাস্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে।

নারীদের বিজ্ঞান চেতনা প্রসঙ্গে অশোকাবদানের[২৩] একটি গল্প তুলে ধরা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গল্পটি এরকম—একবার সম্রাট অশোক অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাণী তিসসরক্ষা রোগটি নির্ণয় করেন ও তার প্রতিষেধক নির্বাচন করেন। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন পদ্ধতিটি অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত। রাণী অপর একজন সদৃশ লক্ষণ যুক্ত রোগীর ওপর পর্যায়ক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করেন ও অবশেষে সঠিক ঔষধটি নির্ণয় করেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানর এই প্রণালীটি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি। অশোকাবদানের ঘটনাটি সত্য হলে তিসসরক্ষার সহজাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নারীদের বিজ্ঞান চেতনা ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রাচীন যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে নারীদের জীবন ক্রমশই গার্হস্থ্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের আবর্তে আবর্তিত হতে থাকে।[২৪] তাদের বিদ্যাচর্চার সুযোগ ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে। অসংখ্য নারীর মেধা ও দক্ষতার অপচয় ঘটে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের প্রতিভা ও মেধার ইতিহাস সংরক্ষণেও ছিল উদাসীন। তাই আদি মধ্যযুগের শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থগুলিতে লক্ষ্য করা যায় নারীদের নাম বর্জন করার প্রবণতা।[২৫] কিন্তু এই সার্বিক

অবক্ষয়ের চিত্রের মধ্যেও কিছু সংখ্যক মহিলা তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজশেখরের (নবম শতক) মন্তব্য থেকে জানা যায় তাঁর সময়ে বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারী বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষত সাহিত্যে তাদের প্রতিভার সাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়েও অসাধারণ বুৎপত্তির নজীর সৃষ্টি করেছিলেন এরূপ নারীর সংবাদ ও এযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা হিসেব রুসার নাম স্মরণীয় তিনি স্ত্রীরোগের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৬] অষ্টম শতকে বইটি আরবি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। বইটি আরবদুনিয়ায় যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল। সমসাময়িক কালে আরবের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ছিল ভুবনখ্যাত। আর এই যুগে ভারত ও আরব — দুটি দেশের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানীর পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের গুণমান বৃদ্ধির প্রয়াস চালান। এই লেনদেন এর প্রয়াসে রুসার অবদান সহজ কথায় বলা যায় — মনোমুগ্ধকর।

প্রাচীন কালের সূচনা পর্বে স্ত্রীশিক্ষার যে আশা ব্যঞ্জক চিত্রটি আমরা দেখতে পাই ক্রমেই সেটি ক্ষীণ হয়ে আসে। এক প্রতিকূল সামাজিক আবহাওয়া তৈরী হয়। কিন্তু সময়ের স্রোতের বিপরীতে গিয়ে যে কতিপয় নারী নিজেদের বিজ্ঞান চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন তাঁরা নূতন আলোর দিশারী। বিজ্ঞান বিশেষত কৃষিবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যায় নারীদের অবদান একটি ঐতিহাসিক সত্য। তাই কবি রাজশেখরের উপলব্ধিই[২৭] হউক একবিংশ শতকের মানুষের সর্বজনীন উপলব্ধি — Culture is connected with soul and not with sex. সংস্কৃতির আত্মীয়তা আত্মার সাথে, লিঙ্গের সাথে নয়।

সূত্র-নির্দেশ

১। এম. এস. রানধাওয়ার প্রবন্ধ, "দি নিওলিথিক কালচার ঃ ইনভেনশন অব পলিশড স্টোন ইমপ্লিমেনটস্", *ডিসকভারি অব এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড ডমিসটিকেশন অব অ্যানিম্যালস*, প্রকাশিত রানধায়া এট অল (সম্পাদিত), পাবলিকেশনস্ এ্যাণ্ড ইনফরমেশন ডাইরেক্টরেট, নিউদিল্লী ১৯৬৯, পৃঃ ২৮৪।

২। জে. ডি. বার্নালি, *সায়েন্স ইন হিষ্ট্রি*, ভলির্উম এক; *দি ইমার্জেন্স অফ সায়েন্স*, লণ্ডন, ১৯৬৯ (প্রথম প্রকাশ লণ্ডন ১৯৫৪), পৃঃ ৯২।

৩। তদেব পৃঃ ৯৬।

৪। জি. পি. মজুমদারের প্রবন্ধ, "দি হিষ্ট্রি অব বোটানি এ্যাণ্ড অ্যালায়েড সায়েন্স" (*এগিকালচার, মেডিসিন, আর্বরি হরটিকাল্চার ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া সি. ২০০০ বি. সি. টু ১০০ এ. ডি.)* ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *দি হিষ্ট্রি অব সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়াঃ দি বিগিনিং*, কলকাতা ১৯৮৬, পৃঃ ৩৬৫।

৫। বিনয় কুমার সরকার (অনু), *দি শুক্রনীতি*, নিউদিল্লী, ১৯৭৫, পৃঃ ৮০।

৬। পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত) ও মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, *বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্র*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ১৩৯৮ সন, পৃঃ ১১৩।

৭। তদেব, পৃঃ ১১৪।

৮। তদেব, পৃঃ ১১৬।

৯। তদেব, পৃঃ ১১৩।

১০। আর. জি. বসাক, *দি অর্থশাস্ত্র অব কৌটিল্য* (বাংলা অনু), ভল ১, কলকাতা ১৯৬৪।

১১। বি. কে. সরকার, *দি শুক্রনীতি* (ইং অনুঃ) ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট করপোরেশন, পৃঃ ৮০।

১২। *বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্র*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

১৩। এন. জি. মজুমদার (সম্পাদিত), *ইনসক্রিপশনস্ অব বেঙ্গল*, ভল ৩, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি রাজশাহী বেঙ্গল ১৯২৯, পৃঃ ৫৪।

১৪। সুরেশ চৌধুরী (সংগৃহীত), *খনার বচন বা জ্যোতিষ সার*, কলিকাতা ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

১৫। নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, প্রথম খণ্ড ১৯৮০, প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ, পৃঃ ১৫৮।

১৬। সুরেশ চৌধুরী (সংগৃহীত), *খনার বচন*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

১৭। জি. পি. মজুমদার, *বনস্পতি ঃ প্ল্যানটস্ এ্যাণ্ড প্ল্যান্ট লাইফ এ্যাজ ইন ইণ্ডিয়ান ট্রিটাইজেস এ্যাণ্ড ট্র্যাডিশনস্*, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, পৃঃ ১৬।

১৮। *খনার বচন*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

১৯। তদেব পৃঃ ১২।

২০। এম. এফ. মূলার (সম্পাদিত), *দি সেক্রেড বুকস্ অব দি ইস্ট*, ভল ১৩, পার্ট ১, রিপ্রিন্ট, দিল্লী ১৯৯৬, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

প্রাচীন ভারতে শ্রেণী শাসনের বিবর্তন

অনুরাধা ঘোষ

বিংশ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী চর্চা শুরু হলে সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনের ইতিহাসকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ যুগে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের সমাজ ও বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এই সব সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন পন্ডিতগণ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের যথার্থ ব্যাখ্যা করেননি। তাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়নের তাগিদ অনুভব করেন এদেশের অনুসন্ধিৎসু পন্ডিতগণ, যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ধর্মানন্দ কোশাম্বি। বর্তমান নিবন্ধে বিবেকানন্দ ভ্রাতা যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ও যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতা ও পরবর্তীকালে মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী ডঃ দত্তর ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর আধিপত্য নিয়ে চিন্তাভাবনার দিকটি তুলে ধরার প্রয়াস করেছি।

১৯২৫ সালে প্রবাসকালীন জীবনের পর স্বদেশে ফিরে ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির নব মূল্যায়নের তাগিদ অনুভব করে ভারততত্ত্বের বিভিন্ন দিকের ওপর গবেষণা চালান। মার্কসীয় দ্বন্দ্ব ভারততত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন, ''মানব সমাজে যেদিন হইতে শ্রেণী সমূহ উদ্ভুত হইয়াছে --- নানা প্রকারের স্বার্থে এখানে দ্বন্দ্ব করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।''[১]

বেদত্তোর কাল থেকে এই শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ ও জৈন, বৌদ্ধ গ্রন্থাদির তুলনামূলক পাঠের ফলে জানা যায়। ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাহ্মণ শ্রেণী সংঘর্ষের একাধিক নিদর্শন বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বেন রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ নিষিদ্ধকরণ পুরুরবা কর্তৃক ব্রহ্মধন অপহরণ, নহুষ কর্তৃক এক হাজার ব্রাহ্মণদের রথ টানার উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বহন করে। আবার পরশুরাম কর্তৃক একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করণের ঘটনা রক্তক্ষয়ী শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বহন করে।

সুতরাং পরশুরামের কাল থেকে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী সংগ্রাম চলছিল তার সমাপ্তি ঘটল ক্ষত্রিয় শ্রেণীর জয়লাভের মধ্যে। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, পশুবলি, ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্যবাদকে বর্জনের আহ্বান জানালেন, জনগণকে শোনালেন অহিংসা, প্রেম ও শান্তির বাণী। ব্রাহ্মণ্যবাদীর নিপীড়নের উদ্যত খড়গ প্রতিবাদী ধর্মমতের সামনে থমকে দাঁড়ায়। বুদ্ধ ও মহাবীর রোপণ করলেন এক মহাবিপ্লবের বীজ। তাঁদের সাম্যবাদী আদর্শ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল।

শ্রেণী সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয় শুদ্রবংশীয় সম্রাট মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক ক্ষত্রিয়কুল বিনাশসাধন ও আর্যবর্তব্যাপী শুদ্র সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে। বিষ্ণুপুরাণের মতে বিশ্বস্ফটিক নামে জনৈক ব্যক্তি সমস্ত রাজকুলের ধ্বংস সাধন করে জেলে, বর্বর, যদু, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিদের ক্ষমতায় উন্নীত করবেন।[২] ডঃ দত্তের মতে ইনি খুব সম্ভবত মহাপদ্মনন্দই হবেন যাঁর সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের বিরোধ ঘটেছিল এবং তাঁর মহাবৈপ্লবিক কর্মদ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যশ্রেষ্ঠত্ব আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আর্যাবর্তব্যাপী এই শূদ্রাধিপত্যের মাধ্যমে যে সমাজ বিপ্লব ঘটেছিল তা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রক্ষণশীলতার পাথরের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। ডঃ দত্তের মতে গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণ কৌটিল্য ব্রাহ্মণাধিপত্য বজায় রাখতে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় শূদ্রবংশীয় জঙ্গলী সর্দারের সাহায্য গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেননি। চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে তিনি ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র যে শ্রেণীভুক্তই হোন না কেন তিনি একজন ব্রাহ্মণের কাছে রাজপদ লাভে ঋণী ছিলেন এবং সম্ভবত ব্রাহ্মণদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের দাবী পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকলেও শূদ্রদের কিছু কিছু ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ডঃ দত্তর অনুমান শূদ্রদের বৌদ্ধ ধর্মের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'আর্যত্ব রূপ' ঘুষ দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র আশোকের আমলে ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার ও সুবিধা বহুলাংশে খর্ব হল অশোকের 'ব্যবহার সমতা ও দন্ড সমতা' নীতি প্রয়োগের ফলে। শূদ্রদের সঙ্গে তাঁদের কোন পার্থক্য থাকলো না। যে ব্রাহ্মণরা ভূদেব বলে পূজিত হতেন অশোক তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলের মধ্যে ক্ষোভাগ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল তা একদিন দাবানলে পরিণত হল অশোক প্রপৌত্র বৃহদ্রথের সময়। ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের হাতে বৃহদ্রথের মৃত্যু হল এবং শুরু হল ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার যুগ।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এই প্রথম ব্রাহ্মণবর্ণের ব্যক্তির ক্ষমতা দখল করার তলে ব্রাহ্মণরাও শাসকশ্রেণীর পর্যায় উন্নীত হলেন। শুঙ্গযুগে রচিত মনুস্মৃতি ও বশিষ্ঠ স্মৃতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও শূদ্র বিদ্বেষের চরম প্রকাশ ঘটেছে। মনুস্মৃতিতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের একটা বিকৃত মনোভাব ও শূদ্রের প্রতি মনুর জিঘাংসাবৃত্তির প্রকাশ লক্ষিত হয়।[৩] কাণ্বযুগেও ব্রাহ্মণ্যাধিপত্যের ধারা বজায় থাকে।

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয়। মধ্যএশিয়া থেকে আগত শকক্ষত্রপ, পার্থিয়, কুষাণ ও বাহ্লিক দেশীয় হেলেনিক জাতিসমূহ ভারতে এসে বসতি স্থাপন করে ভারতীয় জনসমুদ্রে মিশে যায়। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই সাম্যভাবাপন্ন বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কারণ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজে এঁরা 'ম্লেচ্ছ' বলে গণ্য হতেন। কুষাণ আমলে বৌদ্ধ ধর্ম নূতন তেজপ্রাপ্ত হয়।

উত্তর ভারতে যখন শক, কুষাণ ও সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ বৌদ্ধ ধর্মমত গ্রহণ করেছিল সামাজিক নিপীড়নের হত থেকে উদ্ধারের আশায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন দক্ষিণ ভারতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হল। দাক্ষিণাত্যের 'অন্ধ্রভৃত্য' রূপে পরিচিত ব্রাহ্মণ্যধর্মী সাতবাহন রাজাগণ বৌদ্ধধর্মী বিদেশী শকক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হলেন। শক সাতবাহন সংঘর্ষই এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সাতবাহন পরবর্তী দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলি চোল, চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকুট থেকে মধ্যযুগের বিজয়নগর রাজবংশ পর্যন্ত প্রত্যেকেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক ছিল।

কুষাণ পরবর্তী যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনরুত্থান। মধ্যভারতের নাগবংশীয় শৈব ধর্মাবলম্বী ভারশিব ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের বাকটক বংশের রাজত্বকালে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান ঘটে ও গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। পশ্চিমভারতের শকক্ষত্রপগণ হিন্দুধর্ম অবলম্বন করে ও হিন্দুদের মত 'সিংহ' পদবী গ্রহণ করে, যেমন—তৃতীয় রুদ্র সিংহ। কিন্তু হিন্দু ধর্মগ্রহণ ও ব্রাহ্মণ রাজবংশের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন সত্ত্বেও তারা ব্রাহ্মণ্য জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাদের ধ্বংস করেন।

তবে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূর্ণ প্রতাপ থাকলেও বেদ বিরোধী ধর্মের প্রভাব একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অহিংসা, জীবে দয়া, শূদ্রদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন প্রভৃতি ধ্যান ধারণাগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মভুক্ত হয়। এই নব ব্রাহ্মণ্যবাদই পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে পরিণত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের বন্যায় ভারতীয় সমাজ যখন প্লাবিত হচ্ছিল, যখন বৈদিক ক্রিয়া কান্ডে যুগে ফেরা সম্ভব ছিল না, তখন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যধর্ম উপনিষদ বা বেদান্ত দর্শনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছিল, এই যুগসন্ধিক্ষণে রচিত হয় শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য যুগে রচিত এই ধর্মগ্রন্থে চাতুবর্ণের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হল গুণ ও কর্মানুসারে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে একই আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ থেকে। এভাবে একদিকে পুরোহিত শ্রেণীর গগনচুম্বী দাবী অন্যদিকে বেদান্তদর্শন, গীতার উদারপন্থী মতবাদ দুই বিপরীত ধর্মীয় দ্বন্দ্বে সমাজ জীবন আলোড়িত হতে থাকে।

গুপ্তযুগে রচিত নারদ, পরাশর, বিষ্ণু, অত্রি, বৃহস্পতি প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতাগণের রচনায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মনস্তত্ত্বে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এগুলিতে অব্রাহ্মণ

ও বৌদ্ধবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন পীতপোষাকধারী বৌদ্ধভিক্ষু ও তান্ত্রিকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজের সংসর্গ এড়িয়ে চলা প্রভৃতি। এভাবে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য সূচিত হয়। গুপ্তযুগ থেকেই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন দেখা যায় বৈশ্যশ্রেণীর হাতে এবার রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হয় হর্ষবর্ধনযুগেও বৈশ্য শ্রেণীর প্রাধান্য বজায় থাকে। বৈশ্য শ্রেণীর পেশাতেও পরিবর্তন সূচিত হল ক্রমশ কৃষিকার্য, পশু পালনের চেয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই তাঁরা আকৃষ্ট হলেন।

হর্ষপরবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজপুত জাতির আর্বিভাব। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে অগ্নিকুল মতবাদের পিছনে লুকানো সত্যকে ডঃ দত্ত আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। রাজপুত দেহে দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাতি শক ও হুণদের রক্ত বহমান বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। ডঃ দত্তের ধারণা জৈন ও বৌদ্ধ শক্তির ধ্বংস সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিদেশী জাতিগুলোকে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করেছিলেন যজ্ঞ বা শুদ্ধিক্রিয়ার মাধ্যমে। মধ্য পশ্চিম ভারতে শক ও হুণদের একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল বলে ঐস্থানেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি। গুজরাটের আবু পাহাড়ের জৈন ও বৌদ্ধদের ধ্বংস কামনায় এক যজ্ঞ করেন ও ঐ যজ্ঞাগ্নি থেকে পারমার, প্রতিহার, চৌহান ও চালুক্য এই চার কুলের উৎপত্তি হয়, যারা নিজেদের ''অগ্নিকুল সম্ভূত'' বলে মনে করেন।[৭]

পূর্ব ভারতে বিশেষত বঙ্গ ও মগধ আর্যকৃষ্টি যুক্ত হলেও ঐ স্থানের অধিবাসীরা গোঁড়া বৈদিক পৌরোহিত্যবাদ গ্রহণ করেনি অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতি কখনোই গভীরভাবে শিকড় গড়তে পারেনি। সেখানে অনার্য সংস্কৃতিরই প্রাধান্য ছিল। বাংলার শূদ্রবংশীয় পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মী, তবে তাঁরা পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পাল যুগের শেষ ভাগে দক্ষিণ ভারত থেকে অনেক ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে।

কর্ণাটক থেকে আগত 'ব্রাহ্মক্ষত্রিয়' রূপে পরিচিত সেন রাজাগণ ছিলেন কানাড়ী ব্রাহ্মণ। সেনযুগে বৌদ্ধ দলন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ লাভ করে। সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হল। একদিকে পতিত ও গরীব বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মীরা এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ অভিজাতগণ উভয়ের মধ্যে তীব্র শ্রেণীসংঘর্ষ চলতে থাকে। পালযুগে ডোম, বাগদী, হাড়ি প্রভৃতি বৌদ্ধজাতিগুলি উঁচুস্তরাভিষিক্ত ছিল। সেনযুগে তারা অতি নিম্নস্তরে অবনমিত হল সেনরাজাদের সঙ্গে সাধারণ লোকের দুস্তর শ্রেণীগত ব্যবধান থাকার ফলে আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানকালে শঙ্করাচার্যের গুরু কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় কয়েক সহস্র বৌদ্ধকে হত্যা করানো হয়। রাজশক্তির আনুকূল্যে ব্রাহ্মণরা গরীব বৌদ্ধদের ওপর যে ভীষণ সামাজিক অত্যাচার শুরু করে বৌদ্ধরাও তার প্রতিশোধ গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল এবং বিদেশী বিধর্মী তুর্কী আক্রমণ

ঘটলে তারা ব্রাহ্মণ্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুর্কীদের সহযোগিতা করেছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তা না হলে মাত্র ১৪ জন অশ্বারোহী দ্বারা বঙ্গবিজয় সম্ভব হত না। বক্তিয়ার খলজীর নদীয়া অভিযানের সঙ্গেই সেন বংশের বিয়োগান্তক পতন ঘটে।

এই ভাবে ভারতীয় সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ডঃ দত্ত দেখিয়েছেন শ্রেণীসংঘর্ষের ধারণা অন্য দেশ থেকে ধার করা নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এখানেও উচ্চনীচ ভেদ, শাসক শাসিত শ্রেণী ছিল যাদের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ চলেছিল এখানে সর্ববর্ণের লোক ভ্রাতৃভাবে কালযাপন করেনি। যেহেতু ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধর্মীয় দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছিল সেজন্য রক্ষনশীল শ্রেণীস্বার্থে প্রণোদিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে সংঘর্ষ ঘটতো তা ধর্ম সংগ্রাম বলে নিরূপিত হত। হিন্দু যুগ থেকে মুসলমান যুগ পর্যন্ত আমরা এই চারটি বর্ণের মধ্যে শ্রেণী সহযোগিতার বদলে শ্রেণীবিবাদ, বিভিন্ন শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করি এর ফলে ভারতবাসী কোনদিন সমস্বার্থ সমহৃদয়ের অধিকারী হতে পারেনি এবং নিখিল ভারতীয় একজাতীয়তা অর্জন করতে পারেনি।

সূত্র-নির্দেশ

১। ভূ. না. দত্ত, *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি*, ৩য় খণ্ড, ১-২, ১৯৮৩।
২। তদেব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩।
৩। তদেব, পৃঃ ১২।
৪। B. N. Dutta, *Rise of the Rajputs* (In *Journal of Bihar and Orissa Research Society*, 1941 Vol-27 PP 34-39).

ঘট-লেখমালায় চট্টগ্রামের গ্রামসমাজ
(খ্রিঃ দশম শতক)

কৃষ্ণেন্দু রায়

এক

অধুনা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিষয় বোঝার চেষ্টা হচ্ছে। সেটি হল গুপ্তোত্তর পর্বে (খ্রিঃ ৬০০-১২০০খ্রিঃ), যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিমধ্য পর্বও বলা হয়ে থাকে, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কীভাবে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা লাভ করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে (আঃ খ্রিঃ পূঃ ২৩৬ অব্দ — খ্রিঃ পূঃ ২৩৬ খ্রিঃ পূঃ) যে জায়গা ছিল অটবী[১], গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে (খ্রিঃ৩৩৫—৭৬খ্রিঃ) সেই জায়গা পরিণত হয়েছিল অটবী-রাজ্যে[২]। অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রসার চলতে থাকে। গুপ্তোত্তর পর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মত বাংলাদেশেও আঞ্চলিক/স্থানীয় রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে — শশাঙ্ক (খ্রিঃ ৬০০), খড়্গ (আঃ ৬২৫ খ্রিঃ - ৭০৫ খ্রিঃ), রাত (আঃ ৬৪০ খ্রিঃ — আঃ ৬৭০ খ্রিঃ, দেব (আঃ ৭২০ খ্রিঃ — আঃ খ্রিঃ ১০ম শতক) ইত্যাদি। এই ধরনের স্থানীয় রাজশক্তির উত্থান প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। সেটি হল ভক্তি-আশ্রয়ী ভাবাদর্শের জনপ্রিয়তা ও প্রসার। প্রসঙ্গত, ভক্তিবাদের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে যে-ব্যক্তির পরমেশ্বরে অকৃত্রিম ভক্তি আছে — *যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ*।[৩] এর সঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। তাহল যাকে ঈশ্বর বরণ করে নেন — *যমেবৈষ বৃনুতে* — তিনি-ই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন, ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন — *তেনলভ্যঃ*।[৪] তাহলে ভক্তিবাদের মূলভাবটি দাঁড়াল এইরকম — ঈশ্বরের নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলে, তবেই ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করা যাবে। ভক্তি-আশ্রয়ী ভাবাদর্শের এই ভাবটিকেই আদিমধ্যকালীন স্থানীয় রাজশক্তিগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সমর্থন করে, পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। উদ্দেশ্য, স্থানীয় এলাকায় মানুষের নিকট রাজশক্তিকে বৈধ করে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে রাজশক্তিগুলি জমিদানের মাধ্যমে আদিমধ্যকালীন ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে (ব্রাহ্মণ্য *মঠ* বা বৌদ্ধ *বিহার*) সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। স্থানীয় সামাজিক মানুষের কাছে রাজশক্তিগুলি বৈধ হিসেবে মান্যতা পেত। আবার, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও স্থানীয়/আঞ্চলিক সমাজের

বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিকীকরণ ঘটত, সামাজিক অবস্থান দৃঢ়তর হত।[৫] এই প্রেক্ষিতেই, সম্ভবত চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত, আলোচ্য লেখমালাটির কয়েকটি বাক্যাংশের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

দুই

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে *সাউথ এশিয়ান আর্কেওলজি* পত্রিকায় গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য একটি তামার ঘট-লেখর খবর দেন। তামার ঘটটি ৩০.৪ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট। ঘটটির গায়ে গৌড়ীয় লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে মোট ১৯ লাইন লেখা আছে। লিপিতত্ত্বের বিচারে ঘটটির তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে খ্রিষ্টীয় দশম শতক। চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে মনে করা হলেও ঘট-লেখটির প্রকৃত প্রাপ্তিস্থান জানা যায়নি। ঘট-লেখটিতে রাজা হিসেবে অত্তাকরদেবের নাম পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই অত্তাকরদেব সমতট অঞ্চলের (অধুনা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ) দেব রাজবংশের কোন রাজা ছিলেন কিনা, বলা শক্ত। আবার, অত্তাকরদেব চন্দ্ররাজ ত্রৈলোক্য চন্দ্রের (আঃ ৯০৫ খ্রিঃ — ২৫ খ্রিঃ) অধঃস্তন কোন সামন্তরাজা ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও চূড়ান্তভাবে কিছু বলা কঠিন।[৬] তবে যেটুকু বলা যেতে পারে তাহল অত্তাকরদেব হরিকেল অঞ্চলের (অধুনা চট্টগ্রাম) একজন স্থানীয় শাসক ছিলেন। এই শাসকেরই উক্ত ঘট-লেখর কয়েকটি বাক্যাংশ বর্তমানে আলোচ্য বিষয়।

তিন

লেখটিতে একটি বৌদ্ধবিহারের নাম পাওয়া যায় — *বেল-বিহার*।[৭] এই বিহারের পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। বিহারটির পূর্ব দিকে ছিল *কুবাসী জোলা*।[৮] এখন, জোলা বা *জোলক*[৯] শব্দের অর্থ হল ছোট-খাটো খাল। কাজেই প্রসঙ্গত বোধ হয় খাল বা নিম্নভূমি এলাকায় বসবাসকারী কোন সামাজিক গোষ্ঠী। সামাজিক দিক থেকে বোধ হয় তাদেরকে প্রান্তীয় করে রাখা হয়; তাই কুবাসী। বিহারটির পশ্চিম দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে — *পশ্চিময়োর* .... *উপজায়মান - ক্ষেত্রম*।[১০] এখন, *উপজায়মান* শব্দটির অর্থ হল উৎপাদনে বা উৎপত্তিতে বৃদ্ধির ভাব।[১১] যেহেতু *ক্ষেত্র* শব্দের সঙ্গে একত্রে *উপজায়মান* শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব প্রসঙ্গত বলা চলে *বিহারটির* পশ্চিম দিকে বৃদ্ধ্যভাব যুক্ত জমি ছিল; এবং এই বৃদ্ধি শস্যোৎপাদনে ঘটেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। সামাজিক নজরে উক্ত প্রান্তীয় মানুষেরাই সম্ভবত *বিহারটির* পশ্চিম দিকের ঐ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে অধিক (উপ....) পরিমাণে ফসল ফলিয়ে বিহারবাসী সন্ন্যাসীদের অন্ন সংস্থান করত বলে মনে হয়। তাদের এই সামাজিক অবদানটি লক্ষণীয়। সীমানার প্রসঙ্গক্রমে এবারে আরেকটি বাক্যাংশে মনোনিবেশ করা যাক। বাক্যাংশটি এইরকম — *সংবাস বসনতঃ প্রাপিচত্বারিংশৎ পদা*।[১২] সংবাদ শব্দের

অর্থ, একত্রে বসবাসকারী মানুষের কোন বসতি এলাকা।[১৩] *বসনতঃ* শব্দটি আক্ষরিক অর্থে বোঝায়, বাসস্থান/বসতি (এলাকা) থেকে।[১৪] এই অর্থে আলোচ্য লেখমালার *সংবাস বসনতঃ* অংশটিকে *অমরকোষে* (আঃ খ্রিঃ ষষ্ঠ শতক) *পুরবর্গে* গ্রাম প্রসঙ্গে উল্লিখিত শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে; প্রাসঙ্গিক পর্যায়টি হল — *সমৌ সংবসথ(র) গ্রামৌ*।[১৫] অর্থাৎ *সংবসথ* শব্দটি গ্রামবাচক। প্রসঙ্গত অতএব বুঝতে অসুবিধা হয় না *সংবাস বসনতঃ* ছিল উক্ত প্রান্তীয় জনবসতিপূর্ণ গ্রামীন এলাকা। এই বসতি এলাকা থেকেই ৪০ পদ (*চত্বারিংশৎ পদা*) (জমি) উক্ত বৌদ্ধবিহারে পৌঁছেছিল (*পাপি*)।[১৬] অতএব একথা সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, উক্ত বিহারটি নিকটবর্তী কোন লোকালয় থেকে ৪০ *পদ* জমি লাভ করেছিল। বর্তমান বিঘার হিসাবে ৪০ *পদ* প্রায় ৫০ বিঘা জমির সমান।[১৭] প্রসঙ্গত দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে ঃ প্রথমত, এই লোকালয়ের নাম কী ছিল? দ্বিতীয়ত, লোকালয়টি কোথায় অবস্থিত ছিল? তথ্যাল্পতা থাকলেও আলোচ্য লেখমালায় এই বিষয়ে যে-সামান্য তথ্য উপস্থিত আছে, সেইটুকুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রশ্নদুটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। লোকালয়টির নাম প্রসঙ্গে বর্তমান লেখমালায় একটি শব্দের উল্লেখ আছে — *তুর্পুঙ্গম-ক্ষেত্র*।[১৮] এখন, পল্লী বা গ্রামসমাজ অর্থেও *ক্ষেত্র* কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়।[১৯] তাহলে এই অনুমান করা যেতে পারে যে, উক্ত পল্লী বা গ্রামসমাজের নাম ছিল তুর্পুঙ্গম। গ্রামটির অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচ্য লেখমালার তথ্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। উক্ত বিহারটির উত্তর সীমানা উল্লেখ করে বলা হয়েছে — *উত্তরেণ শিলাপাহিঃ*।। *তুর্পুঙ্গম - ক্ষেত্র* এবং পূর্ব সীমানা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে সেখানে ছিল কুবাসী জোলা — *পূর্বেনকুবাসী জোলা*।[২০] শিলাপাহিঃ বা *শিলাপড্ডিঃ*[২১] আক্ষরিক অর্থে পায়ে চলা পাথুরে বা কাঁকুরে ভূমি? তা যদি হয়, তাহলে বিহারটির উত্তর দিকে পাথুরে ভূমি ছিল বলে অনুমান করা চলে। তাহলে সেই কারণেই কি প্রান্তবাসীরা (*কুবাসী*) উক্ত বৌদ্ধবিহারের পশ্চিম দিকে উর্বরভূমিতে ফসল ফলাতে যেত? এবং সেটা বোধ হয় নিয়মিত ঘটনা ছিল যে-কারণে ক্ষেত্রটি সবসময়েই শস্যোৎপত্তিমান (*উপজায়মান*) থাকত। যা হোক প্রান্তবাসীদের বসতি স্থলের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বর্তমান লেখামালায় যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে মনে হয় উক্ত বিহারটির পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোন এক জায়গায় অবস্থিত ছিল। ফসল উৎপাদনকারী উক্ত গ্রামবাসীদের বৈষয়িক অবস্থা কেমন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে কিছু ইঙ্গিত বর্তমান লেখমালায় উপস্থিত। এবার সে দিকে নজর ফেরানো যাক।

বর্তমান লেখমালায় *সংবাস বসনতঃ* .... বাক্যাংশটির ঠিক পরেই উল্লেখ করা হয়েছে *ইন্দ্রনাথ-সম্প-পঞ্চ-দশ-পদানি*।[২২] *সম্প* শব্দটিকে যদি *সম্প(দ)* অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে বাক্যাংশটির অর্থ দাঁড়ায় ঃ ইন্দ্রনাথ নামের ঐ ব্যক্তি ১৫ *পদ* (আঃ ১৯ বিঘা)

ভূ-সম্পদের মালিক ছিলেন। সম্ভবত তিনি উক্ত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তার ঐ ভূ-সম্পত্তি বোধ হয় উক্ত বৌদ্ধ *বিহারকে* দান করে দেন; কারণ সেইরকমের একটি ইঙ্গিত বর্তমান লেখতে আছে — *স্ববীর ধর্মদত্ত হস্তে প্রতিপাদিতম্*।[২৩] অনুরূপ আরেকটি বাক্যাংশকে লক্ষ্য করা যাক — *তুর্পুঙ্গ-পোত-সংঘটস্যাং নাগদত্ত-সম্বন্ধ-গুবা-বৃক্ষ-আদি-বাটিকা দত্ত্বা দ্বাসিতি (দ্বাবিংশতি?) - পদিকাক্ষেত্রম* ....।[২৪] পোত শব্দের অর্থ গৃহস্থান।[২৫] কাজেই তুর্পুঙ্গ-পোত বলতে পূর্বোল্লিখত বসতবাটি বহুল তুর্পুঙ্গম গ্রামকেই বোধ হয় বোঝানো হয়েছে। উক্ত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন নাগদত্ত। তাঁর দখলে (সম্বন্ধ)[২৬] ছিল ২২ পদ বা প্রায় ২৭১/২ বিঘা এবং (সম্ভবত ১) *বাটিকা* (লেখতে অবশ্য *বাটিকার* পরিমাণের কোন উল্লেখ নেই) বা প্রায় ৬০ বিঘা জমি। অর্থাৎ মোট ৮৭১/২ বিঘা জমি। সুপারিগাছ সহ (*গুবা-বৃক্ষাদি*......) বোধ হয় পণ্যশস্যে ভরা ছিল সেই জমি। সেই জমি-ই নাগদত্ত উক্ত বিহারে ভগবান বুদ্ধের পূজার উদ্দেশ্যে দান করে দেন (*বুদ্ধ ভট্টারকস্য পূজার্থম্* .... *দত্তম্*)[২৭] যাহোক্ গ্রামটির মানুষের বৈষয়িক অবস্থা প্রসঙ্গে এতগুলি কথা উঠল। প্রসঙ্গটি ছেড়ে যাবার আগে দু-একটি মন্তব্য হয়তো অসঙ্গত হবে না।

উপরোক্ত বৈষয়িক অবস্থার প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত থেকে বলা চলে তুর্পুঙ্গম গ্রামের কিছু মানুষ বিত্তশালী ছিলেন। তথাপি তারা সমাজের নজরে ছিলেন কুবাসী। তাদের সেই সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাবার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে দান ও কর্মসূত্রে তারা সম্পর্ক স্থাপন করে থাকতে পারেন। আলোচ্য ঘট-লেখতে 'জমিদার' গোছের ইন্দ্রনাথ ও নাগদত্তের উল্লেখটি বোধ হয় কোন সামাজিক প্রক্রিয়ার ইঙ্গিতবাহী। সেটি হল উক্ত বিহারটির মাধ্যমে স্থানীয় গ্রামসমাজের মানুষের সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন। এমন ধারণা করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে আলোচ্য ঘট-লেখটি একটি সরকারী দলিল। আত্তাকরদেবের রাজদরবারের পক্ষ থেকে উক্ত *বিহারে* কোন জমি দান করা *হয়নি*। তাহলে ব্যক্তিগতভাবে জমিদানের বিষয়টিকে সরকারী দলিলে নথিভুক্ত করা হল কেন? উত্তর খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে।

সম্ভবত ইন্দ্রনাথ ও নাগদত্ত উক্ত গ্রামে প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে বৌদ্ধবিহারটির সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত স্থানীয় সমাজে অত্তাকরদেব তাঁর রাজশক্তিকে গ্রাহ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই উক্ত দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির দানের বিষয়টিকে সরকারী দলিলে নথিভুক্ত করান; শুধু তাই নয়, বিহারবাসী সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য উক্ত *বিহারে* একটি মঠিকাও নির্মাণ করিয়ে দেন (মঠিকা কারিতা ....বেল-বিহার সম্বদ্ধ)।[২৮] বৌদ্ধবিহার, দেব রাজশক্তি এবং স্থানীয় গ্রাম সমাজে বসবাসকারী

মানুষের মধ্যে খ্রিষ্টীয় দশম শতকের চট্টগ্রামে এইভাবেই পারস্পরিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বৌদ্ধবিহার ও দেব রাজশক্তি স্থানীয় গ্রাম সমাজের মান্যতা লাভ করে।

সূত্র-নির্দেশ

১। সরকার ডি. সি, *সিলেক্ট ইন্‌স্‌ক্রিপশানস্* খণ্ড ১, কোলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩৫, লাইন নং ৭।

২। সরকার ডি. সি, *সিলেক্ট ইন্‌স্‌ক্রিপশানস্* খণ্ড ১, কোলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ২৬৫, লাইন নং ২১।

৩। সেন, অতুল চন্দ্র প্রমুখ (সম্পাঃ), *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪০৩, মন্ত্র ৬.২৩।

৪। সেন, অতুল চন্দ্র প্রমুখ (সম্পাঃ), *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১০১, মন্ত্র ১.২৩।

৫। চট্টোপাধ্যায়, বি. ডি. 'হিস্ট্রিওগ্রাফি, হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস সেন্টার্স আর্লি মিডিয়াভ্যল নর্থ ইন্ডিয়া সারকা এ. ডি. ৭০০-১২০০', ইন দেশাই ভি. এন ও ম্যাসন ডি (সম্পাঃ), *গডস্, গার্ডিয়ানস্ অ্যাণ্ড লাভার্স টেম্পল স্কাল্পচার্স ফ্রম নর্থ ইন্ডিয়া* (এ. ডি. ৭০০ - ১২০০), আহমেদাবাদ, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৯।

৬। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, 'অ্যান ইন্সক্রাইভড মেটালভাস্ মোষ্ট প্রোব্যবলি ফ্রম চিট্টাগঙ, বাংলাদেশ', *সাউথ এশিয়ান আর্কেওলজি* (এরপর থেকে সাএআ হিসেবে উল্লিখিত), পৃঃ ৩২৮-২৯।

৭। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, 'অ্যান ইন্সক্রাইভড মেটালভাস্ মোষ্ট প্রোব্যবলি ফ্রম চিট্টাগঙ, বাংলাদেশ', সাউথ এশিয়ান আর্কেওলজি (এরপর থেকে সাএআ হিসেবে উল্লিখিত), পৃঃ ৩৩৫, লাইন নং ৮খ।

৮। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, 'অ্যান ইন্সক্রাইভড মেটালভাস্ মোষ্ট প্রোব্যবলি ফ্রম চিট্টাগঙ, বাংলাদেশ', সাউথ এশিয়ান আর্কেওলজি (এরপর থেকে সাএআ হিসেবে উল্লিখিত), পৃঃ ৩৩৫, লাইন নং ৯খ।

৯। সরকার, ডি. সি. *ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফিক্যাল* গ্লোসারি (এরপর ইএগ্লো), দিল্লী, ১৯৬৬, পৃঃ ১৩৬।

১০। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, সাএআ, পৃঃ ৩৩৩, লাইন নং ৯-১০।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮, পৃঃ ৪২১, স্তম্ভ ১, তুলনীয় পৃঃ ৩৯৩, স্তম্ভ ১-২।

১২। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সাএআ*, পৃঃ ৩৩৩, লাইন নং ১৩।

১৩। উইলিয়ামস্ স্যার মনিয়ের-মনিয়ের, *এ স্যান্সক্রিট-ইংলিশ ডিকশন্যারি* (এরপর স্যা.ই.ডি), পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ১১১৪, স্তম্ভ নং ৩।

১৪। উইলিয়ামস্ স্যার মনিয়ের-মনিয়ের, *এ স্যান্সক্রিট-ইংলিশ ডিকশন্যারি* (এরপর স্যা.ই.ডি), পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ৯৩২, স্তম্ভ নং ৩।

১৫। ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্‌গুরুনাথ বিদ্যানিধি, অমর কোষ, কোলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১১৫, দ্বিতীয় কাণ্ড, পুরবর্গ, পর্যায় ৫৫।

১৬। উইলিয়ামস্‌, স্যার মনিয়ের মনিয়ের, স্য.ই.ডি, পৃঃ ৭০৭, স্তম্ভ নং ২।

১৭। প্রসঙ্গত একটি কথা স্মরণীয়। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে জমি জরিপের ক্ষেত্রে *পাটকের* হিসেবে পরিবর্তিত হয়; ১০ দ্রোণে ১ পাটকহত(*দশদ্রৌণিক........ পাটক*, সরকার ডি. সি, *এপিগ্রাফিক ডিসকভারীস ইন ইষ্ট পাকিস্তান, এ.ডি.ই.পা*), কোলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৬৮, লাইন নং ৫৪, এবং *পদ*হল ১ পাটকের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ *পদ* = ১/৪ *পাটক*, সরকার ডি.সি, ই. এ. গ্রো, পৃঃ ২২৩, ঐ, এ. ডি. ই. পা, পৃঃ ৩৩, এখন, ১ পাটক = ১০ দ্রোণ বা ৫ বিঘা, অতএব ১ *পদ* = ৫/৪ বিঘা, অতএব ৪০ *পদ* = ৫০ বিঘা (সরকার ডি. সি, *এ. ডি. ই. পা*, পৃঃ ৩৩, মূল প্রবন্ধে অন্য জায়গায় উল্লিখিত *পদকে* বিঘায় পরিণত করার ক্ষেত্রেও এই হিসেবই অনুসরণ করা হয়েছে, ১ বাটিকা = ২০ একর (সরকার ডি. সি, *ইএগ্রো*, পৃঃ ৩৬৮)। এখন, ১ একর = ৩ বিঘা (কম বেশী), অতএব ২০ একর = ৬০ বিঘা।

১৮। ভট্টাচার্য গৌরীশ্বর, *সাএআ*, পৃঃ ৩৩৩, লাইন নং ১০।

১৯। উইলিয়ামস্‌, স্যার মনিয়ের মনিয়ের, *স্য. ই. ডি*, পৃঃ ৩৩২, স্তম্ভ ১। তুলনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহরিচরণ, *পূর্বোল্লিখিত*, খণ্ড ১, পৃঃ ১২২১, স্তম্ভ ১।

২০। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ. আ.*, পৃঃ ৩৩৫, লাইন নং ৯খ।

২১। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ. আ.*, পৃঃ ৩৩৫, লাইন নং ১০, ১৩।

২২। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ. আ.*, পৃঃ ৩৩৫, লাইন নং ১৪।

২৩। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ. আ.*, পৃঃ ৩৩৫, লাইন নং ১৬।

২৪। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ. আ.*, পৃঃ ৩৩৬, লাইন নং ২।

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ, পূর্বোল্লিখিত, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩০৬, স্তম্ভ ১।

২৬। উইলিয়ামস্‌, স্যার মনিয়ের মনিয়ের, *স্য. ই. ডি*, পৃঃ ১১৭৭, স্তম্ভ ৩।

২৭। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ. আ.*, পৃঃ ৩৩৬, লাইন নং ১-২।

২৮। ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, *সা. এ আ.*, পৃঃ ৩৩৩-৩৫, লাইন নং ৭গ — ৮খ।

ভারতীয় গণিতের উৎস সন্ধানে

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের জগৎ সভায় গণিতের প্রাঙ্গনে ভারতের অবদান অকিঞ্চিৎকর। অথচ প্রাচীন ভারতের গণিত চর্চার ইতিহাস যেন কালের ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা এক ইতিবৃত্ত। বৈদিক ঋষিগণ যে গণিত চর্চার শুরু করেছিলেন তার ধারা অব্যাহত ছিল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই আমরা পেয়েছি আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর, ভাস্কর প্রমুখ গণিতবিদদের।[১]

বৈদিক সভ্যতা বলতে আমরা মূলত আর্যসভ্যতাকেই বোঝাই।[২] এদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩] তাই ধর্ম কর্মের জন্য প্রয়োজন হত নানাধরণের যজ্ঞাদি ক্রিয়া কান্ড।[৪] এই যজ্ঞানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল যজ্ঞবেদী নির্মাণ।[৫] এই বেদি নির্মাণ সংক্রান্ত সূত্রগুলি শুল্ব সূত্রে নিহিত আছে।[৬] আর যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিনির্দেশগুলি রয়েছে 'বেদ'-এর 'ব্রাহ্মণ' অংশে।[৭] বেদী নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হত পোড়ানো ইঁট। কাঁচা ইঁট পোড়ানোর সময় স্বাভাবিক নিয়মেই ইটের সঙ্কোচন ঘটে। অথচ যজ্ঞবেদীর জন্য প্রয়োজন পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট আকারের ইঁট। তাই ইঁট পোড়ানো হত খুবই সতর্কতার সঙ্গে যাতে ওই সঙ্কোচনের পরেই ইটের নির্দিষ্ট আকার ঠিকঠাক থাকে। এটা কখনই সম্ভব হত না যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আর্যরা পারদর্শী না হতেন।[৮]

নানা আকারে ইঁট ব্যবহৃত হত এই সব বেদী নির্মাণ কালে। নির্দিষ্ট মাপের নানা আকৃতির ইঁট তৈরীর জন্য জ্যামিতি তথা গণিতের জ্ঞান আবশ্যিক। সুতরাং বলা যায় যজ্ঞবেদী নির্মাণের সময় ব্যবহৃত ইঁটের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকেই হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব। জ্যামিতির সাথে সাথেই বিকাশ ঘটেছিল বীজগণিতের। বেদী সংক্রান্ত জ্যামিতিক সমস্যা থেকে উদ্ভুত একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের প্রয়োজন হত।[৯] এ ব্যাপারে যে আর্য ঋষিগণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই শুল্ব সূত্রে একঘাত, দ্বিঘাত ও সহ সমীকরণ সমাধান করা হত জ্যামিতির সাহায্যে।[১০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে ভারতীয় জ্যামিতি ইঁট প্রযুক্তিরই ফসল। তাই বৈদিক যুগের গণিত চিন্তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের যেতে হবে আরেকটু পিছনে। যেতে হবে তাম্র তথা ব্রোঞ্জ যুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যুগে, হয়ত বা তারও আগে।

অতি প্রাচীন কালে ভারত ভূমি কি মনুষ্য বর্জিত ছিল? এনিয়ে পণ্ডিত মহলে অবশ্য বিতর্ক বিদ্যমান। নৃতাত্ত্বিক ডাঃ হাটনের মতে আর্যদের বহুপূর্বে ভারতের মাটিতে যাদের আগমন ঘটেছিল তারা হল দ্রবিড় ভাষী ও খেড়োয়াড়ী ভাষী আদিম মানুষ। নব্য প্রস্তর যুগের অবসানে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্রাবিড় সভ্যতা। সম্ভবত এই দ্রাবিড় সভ্যতারই আরেক নাম ব্রোঞ্জ সভ্যতা।[১১]

ভারত ভূমিতে সভ্যতা বিকাশের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে যা বৈদিক সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন। এর বিস্তৃতি ঘটেছিল প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই।[১২] প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতার উন্মেখ হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ বা ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময়ে।[১৩] পশ্চিম পাঞ্জাবের (অধুনা পাকিস্তান) হরপ্পা, সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো ও চান্‌হুদড়ো ছিল এই সভ্যতার প্রধান পীঠস্থান। হরপ্পা আবিষ্কৃত হয় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে।. এর ঐতিহাসিক পরিচয় প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন পুরাতত্ত্ববিদ দয়ারাম সাহ্‌নী।[১৪] ইনি একজন ভারতীয়। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন মহেঞ্জোদড়ো। ইংরেজ গবেষক এরনেষ্ট ম্যাকে (Ernest Mackay) আবিষ্কার করেন চান্‌হুদড়ো।[১৫] পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় খনন কার্য চালিয়ে আরও কিছু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলির সবকটি হরপ্পা সভ্যতার অনুরূপ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পাঞ্জাবের রোপার, গুজরাটের সুরকোটরা, ধোলাবীরা, উত্তর রাজস্থানের কালিবাদান, উত্তর প্রদেশের আলমগীরপুর প্রভৃতি।[১৬] এছাড়াও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা থেকে সিন্ধু প্রদেশের আরও বহুস্থানে এই সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজে পান। উত্তর ও দক্ষিণ বেলুচিস্তানে স্যার অরেলস্টাইন এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। সিন্ধু উপত্যকার বিশেষত্ব সম্বলিত টেরাকোটা আবিষ্কৃত হয় বক্সার ও পাটনার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে। এ থেকে অনুমান করা যায় সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।[১৭] কিছুদিন আগে মুম্বাইয়ের লোথাল এবং বাংলার বেড়াচাঁপাতেও সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।[১৮]

সিন্ধু সভ্যতা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন উপত্যকা অঞ্চলেই তখন মানব সভ্যতা গড়ে উঠবার চেষ্টা চলছিল। ইরাকের ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন সুমের সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।[১৯] এমনকী এদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ছিল — সম্ভবত বেলুচিস্তান ও পারস্যের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে অথবা আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে দিয়ে জলপথে। বর্তমানে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়োর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে সাগরের কাছে লোদানে এক বিশাল ডক্ ইয়ার্ডের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।[২০]

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনা ছিল দেখার মতো। সেখানকার সমস্ত রাস্তাই ছিল চওড়া ও সোজা। ছিল উন্নতমানের পয়ঃপ্রণালী। ধ্বংসাবশেষ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাড়ি ঘরগুলি ছিল পোড়া ইঁটের তৈরী। পয়ঃপ্রণালী, পাকা রাস্তা, জলাধার, বাড়িঘর তৈরিতে যে সব ইঁট ব্যবহৃত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকটির আকৃতিই ছিল কোনো না কোনো জ্যামিতির আকার বিশিষ্ট — কোনোটি কীলকাকৃতির, কোনোটি বা চতুস্তলাকৃতির,[২১] কোনোটি সমকোণী ত্রিভূজাকৃতির আবার কোনোটি পিরামিডাকৃতির।

পাঁচ হাজার বছর আগে স্থাপিত কোনো নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যখন অসংখ্য মূর্তি, ছবি, চিত্রিত মৃৎপাত্র, শীলমোহর, স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায় তখন অস্বীকার করার উপায় নেই সে যুগে ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলার পর্যাপ্ত চর্চা ছিল।[২২]

মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও চানহূদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে ছোট বড় নানারকমের বাটখারা মত জিনিস। এগুলি যে ওজন মাপার জন্য ব্যবহৃত হত এব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অতি ক্ষুদ্র ওজন থেকে বড় ও ভারী সব রকমের ওজনই মাপা যেত এই সব বাটখারা দিয়ে। বড় বাটখারাগুলি ছিল ঘন আকৃতির। আর ছোট ওজনগুলি দেখতে চোঙের মত। এই বাটখারাগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। ছোট থেকে বড় হিসেবে এদের পারস্পরিক অনুপাত যথাক্রমে ১, ২, $^{৮}/_{৩}$, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০ এবং ১২৮০০ সংখ্যাগুলির অনুপাত।[২৩] সিন্ধু সভ্যতায় ব্যবহৃত ওজন বর্তমান মেট্রিক পদ্ধতির একক গ্রামে প্রকাশ করলে সব থেকে ছোটটির মান দাঁড়ায় ০.৮৭৫০ গ্রাম, আর বৃহত্তমটির ১০৯৭০ গ্রাম।[২৪] ১৬ সংখ্যাটি দ্বারা সূচিত ওজনটি ছিল প্রধান বড় একক।[২৫]

এই ওজনটি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো উভয় জায়গাতেই যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া গেছে। মনে করা হয়, ব্যবসা - বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি বহুল ব্যবহৃত হত। এই বাটখারাটির মান ১৩.৬৪ গ্রাম ওজনের ঠিক ১৬ গুণ। ভারতে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হবার আগে মাপজোক ও হিসেব নিকাশের ক্ষেত্রেও ১৬-এর প্রাধান্য দেখা যেত। তাই মনে প্রশ্ন জাগে একদা ১৬ সংখ্যাটি ধরে আমরা যে হিসেব করতাম (১৬ আনায় এক টাকা, ১৬ ছটাকে এক সের ইত্যাদি), তা কি সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক মানব গোষ্ঠীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া?

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো থেকে কয়েকটি ভাঙা দাঁড়িপাল্লা পাওয়া গেছে যেগুলির পাল্লা দুটি তামার আর দন্ডটি পিতলের তৈরি। দাঁড়ি পাল্লাগুলির আকৃতি দেখে মনে হয় এগুলি দিয়ে খুব হাল্কা অথচ মূল্যবান জিনিস (সম্ভবত স্বর্ণালঙ্কার) ওজন করা হত। মহেঞ্জোদড়ো থেকে একটি নলাকৃতি (cylindrical) পাত্র ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গেছে, হরপ্পাতেও পাওয়া গেছে একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত দণ্ড যেগুলি মাপনী ছাড়া আর কিছুই নয়। মহেঞ্জোদড়োতে

প্রাপ্ত মাপনীটি একটি সম্পূর্ণ মাপনীর ভগ্নাবশেষ। এই মাপনীটির গায়ে নিখুঁতভাবে সমদূরত্বে অনেকগুলি দাগ কাটা আছে। বিশ্ববিশ্রুত ভারত পুরাতত্ত্ববিদ ড. ম্যাকে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন ৬.৬২ ইঞ্চি লম্বা এই মাপনীটির সাহায্যে দৈর্ঘ্য মাপার যে ব্যবস্থা ছিল তার একক ছিল ০.২৬৪ ইঞ্চি। এছাড়াও মাপনীর গায়ে যে দাগগুলি আছে তা পাঁচটি করে দাগে (১.৩২ ইঞ্চি) পরপর বিভক্ত। এগুলি দেখে ম্যাকের ধারণা মাপজোকের ক্ষেত্রে সে যুগের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ দশমিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় ছিল।[২৬] সাম্প্রতিককালে গুজরাটে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন আমলের একটি কারখানা। পন্ডিতরা মনে করেন এটি সিন্ধু সভ্যতা আমলের। ভগ্নাবশেষ থেকে পাওয়া নিদর্শনগুলি থেকে অনুমান করা হয় এখানে তৈরি হত তামার নানারকম ফলা, খাঁজকাটা যন্ত্র যা সব ছিল বর্গ ষড়তলাকৃতির (Square parallelopiped)।

মহেঞ্জোদড়োর ভগ্নাবশেষ থেকে সে যুগের লিপির যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় সিন্ধু সভ্যতার সময় লেখার একটা প্রচেষ্টা ছিল, যদিও তা ছিল একেবারেই প্রাথমিক অবস্থা। চিত্রলিপির অনুকরণে সে যুগে লেখার যে চেষ্টা করা হয়েছিল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ওই লিপির পাঠ ও মর্মোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি।[২৭] তবে চিত্রগুলিতে নানারকম চিহ্ন ও প্রতীকের সঙ্গে স্বরচিহ্নবোধক রেখার (strokes) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। লিপি হল বাণীর রৈখিক প্রতিরূপ। তাই অনুমান করা হয় উচ্চারণ ধ্বনির পার্থক্য ঘটানোর জন্যই ওই সব চিহ্ন ও রেখার ব্যবহার করা হত।

সম্ভবত খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ বা ২০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।[২৮] সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে খুঁজে পাওয়া নিদর্শনগুলো থেকে মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার যুগের অধিবাসীগণ উচ্চমানের প্রযুক্তি স্থপতি, নৌবিদ্যা ও নানাপ্রকার যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জ্যামিতি বা গণিত বিদ্যা ও জরীপ বিদ্যার সুগভীর জ্ঞান না থাকলে এ সব সম্ভব হত না। তাই আজ একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না, যে প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তার শুরু সেই প্রাক্ বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সময় থেকেই।

সূত্র-নির্দেশ

১। সমরেন্দ্রনাথ সেন, *বিজ্ঞানের ইতিহাস* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৫৫) পৃ. ২৯ (দ্বিতীয় খণ্ড)।

২। রমাতোষ সরকার, *প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা,* বেস্টবুক্স, কলকাতা, ১৯৯২ (প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৫), পৃ: ৫৩।

৩। নন্দলাল মাইতি, *প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ১৭।

৪। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৫৫।
৫। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৬৬।
৬। নন্দলাল মাইতি, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ১৯।
৭। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৫৮।
৮। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৬৬।
৯। সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৯০ (প্রথম খণ্ড)।
১০। সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৯০ (প্রথম খণ্ড)।
১১। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৩৫।
১২। প্রশান্ত প্রামাণিক, *হরপ্পার অনার্য গরিমা,* জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, জানুয়ারি, ২০০৪, পৃ: ৫২।
১৩। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৩৩।
১৪। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৩৩।
১৫। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৩৫।
১৬। প্রশান্ত প্রামাণিক, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৬৪।
১৭। প্রশান্ত প্রামাণিক, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৬৪।
১৮। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৩৫।
১৯। প্রশান্ত প্রামাণিক, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৬৪।
২০। প্রশান্ত প্রামাণিক, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৮০।
২১। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত. পৃ: ৪০।
২২। সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৫২ (প্রথম খণ্ড)।
২৩। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৪৫।
২৪। সমরেন্দ্রনাথ সেন, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৫৩ (প্রথম খণ্ড)।
২৫। রমাতোষ সরকার, পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৪৫।
২৬। সমরেন্দ্রনাথ সেন. পূর্ব উল্লিখিত, পৃ: ৫৩ (প্রথম খণ্ড)।
২৭। শ্রী রাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্ব ভূষণ, *মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা,* প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬১, পৃপৃ: ১-৪।
২৮। শঙ্কর হাজরা. *হরপ্পা নগরে বসতি করিনু,* কসমোস্ক্রিপ্ট , কলকাতা, ১৯৯১, পৃ: ১২৫।

উণগ্রামের মন্দিরগুলির সময়ানুক্রমিক পর্যালোচনা

স্বাতীমন্ডল অধিকারী

মধ্যপ্রদেশের খারগোজ জেলার উণগ্রামে বেশকিছু প্রাচীন মন্দির বর্তমান উনের মন্দিরগুলির সময়ানুক্রম নির্ণয় করার পথে বাধাস্বরূপ দুটি সমস্যা বর্তমান। প্রথমত তারিখযুক্ত লেখমালার অনুপস্থিতি , দ্বিতীয়ত কালের প্রকোপে মন্দিরগুলি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। উপরোক্ত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গঠনশৈলী, ভূমিতল ইত্যাদিব ওপরে নির্ভর করে নিমার্ণের সময় অনুমান করা সম্ভব হয়। গঠনশৈলীর দিকে তাকালে মনে হয়, মন্দিরগুলি পরমার রাজবংশের শাসনকালে (আনুঃ ৮০০-১৩০৫ খ্রিঃ) নির্মিত হয়। এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে, যখন চৌবারা ডেরা নং১ মন্দিরটিতে একটি আংশিক পঠনযোগ্য লেখতে পরমার নৃপতি উদয়াদিত্যের নাম পাওয়া যায়। পরমার শাসকগণ শিল্পসংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন, মালবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মন্দির নির্মিত হয়।

চৌবারা ডেরা নং ১-এর অন্তরালগত লেখটি আংশিক পঠনযোগ্য, যেখানে পরমার শাসক উদয়াদিত্যের নাম পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিকগণ এর ওপর নির্ভর করে উদয়াদিত্যকে চৌবারা ডেরার নির্মাতা মনে করেন। কিন্তু এই অনুমান নির্ভুল বলা যায়না। যেহেতু লেখটির বাকী অংশ অপঠনযোগ্য তাই এই লেখমালাটিকে নির্দিষ্ট করে মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত লেখ বলা যায়না। এই লেখটি মন্দিরের সংস্কাবক বা দান সংক্রান্তও হতে পারে। লক্ষণীয়, এটি একটি চার পংক্তির ছোট লেখমালা। সাধারণতঃ পরমার শাসক মন্দির প্রাতিষ্ঠালিপিগুলি মাত্র চার পংক্তির হতনা, তাছাড়া এর সূচনা ও উপসংহারে যথাক্রমে 'স্বস্তি' ও 'মঙ্গলম মহাশ্রী' শব্দগুলি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ উদায়াদিত্য নির্মিত উদয়পুরের (জেলা-বিদিশা, মধ্যপ্রদেশ)। নীলকন্ঠেশ্বর মন্দিরের লেখটিব কথা বলা যায়। এখানে প্রতিষ্ঠাতার নাম, লেখটির রচয়িতার নাম, নির্মাণের তারিখ, মন্দিরের পতাকা উত্তোলন ও তার তারিখ, পরমার বংশপঞ্জী ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা বর্তমান। পরমা যুগের মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত লেখর এই সমস্ত বৈশিষ্টগুলি চৌবারা ডেরার চার পংক্তির এই ছোট লেখটিতে আশা করা যায়না। তাই, উদয়াদিত্যের নামযুক্ত এই আংশিক পঠনযোগ্য লেখটির ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে আশা যায় না যে চৌবারা ডেরা নং ১ মন্দিরটি উদয়াদিত্যের নির্মিত।

এখন প্রশ্ন হল, চৌবারা ডেরা নং ১ মন্দিরটি কোন পরমার শাসকের সময়ে নির্মিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে উদয়পুরের নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরটির ওপরেই পুনরায় নির্ভর করতে হয়। উপরোক্ত মন্দির ভূমিজ শৈলীর মন্দিরের একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত উদাহরণ। ১০৮০ খ্রিঃ এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। নীলকণ্ঠেশ্বরের তুলনায় চৌবারা ডেরার বেদীবন্ধে মোল্ডিং এর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য কম। নীলকণ্ঠেশ্বরের জঙ্ঘায় ভদ্র, রথ ও কর্ণ ব্যতীত সলিলান্তরগুলিও ভাস্কর্যশিল্পে মন্ডিত। কিন্তু চৌবারা ডেরার ভদ্র অংশে সলিলান্তরে এই ভাস্কর্যশিল্পের সূক্ষ্ম প্রয়োগ চোখে পড়েনা। নীলকণ্ঠেশ্বরে মন্ডপটি একটি গুড়মন্ডপ যার তিনদিকে প্রবেশদ্বার বর্তমান। চৌবারা ডেরার প্রবেশদ্বারা মাত্র একটি। গঠনবৈশিষ্ঠ, ভাস্কর্যশৈলীর সূক্ষ্মতা, অলঙ্করণের প্রবণতার হার, ইত্যাদি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। চৌবারা ডেরা নং ১ নীলকণ্ঠেশ্বরের পূর্বে নির্মিত হয়। তাই, আশা করা যায়, এটি উদয়াদিত্যের কোন পূর্বপুরুষ দ্বারা নির্মিত হয়।

উদয়াদিত্যের পূর্ব পুরুষ ভোজ (আনু ১০০০-১০৫৫ খ্রিঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত নির্মাতা। তিনি শুধুমাত্র মন্দির নির্মাণ করেননি, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ নামে ধারা নগরীতে একটি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও মন্দির নির্মাণ করেন, যার বর্তমান নাম ভোজশালা। ভোজশালার স্তম্ভগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র খোদাই করা রয়েছে, এছাড়া রয়েছে সর্পবন্ধ লেখ, যেখানে একটি সাপের কুন্ডলীকৃত শরীরের বিভিন্ন অংশে স্বরও ব্যাঞ্জনবর্ণ খোদিত রয়েছে। অনুরূপ সর্পবন্ধ লেখ ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত লেখ চৌবারা ডেরার মন্ডপগাত্রে বর্তমান। তাই, সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে চৌবারা ডেরা নং ১ মন্দিরটি ভোজের দ্বারা নির্মিত হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশৈলীর মধ্যে সবিশেষ মিল থাকায় মনে হয়, চৌবারা ডেরা নং ১ ও মহাকালেশ্বর নং ২ একই সময়ে নির্মিত হয়। এই অনুমান সঠিক বলে মনে হয়, কারণ, দুটি মন্দির একই ভূমিতলে নির্মিত হয়। বর্তমানে, উভয় মন্দিরে পীঠ রয়েছে মাটির তলায়। উভয় মন্দিরে একপ্রকার পাথরের ব্যবহার হয়েছে। দেওয়ালে স্থানীয় বেলেপাথর এবং ভারবাহী অংশে-যেমন দ্বারের সর্দল, স্তম্ভের শীর্ষ ইত্যাদিতে অপেক্ষাকৃত শক্ত লাল বালিপাথরের ব্যবহার দেখা যায়। উভয় মন্দির মোটামুটি সমকালীন, তবে চৌবারা ডেরা নং ১, মহাকালেশ্বর নং ২-এর সামান্য আগের নির্মাণ হলে মনে হয়। কারণ, চৌবারা ডেরার কুম্ভ মোল্ডিং এর অলঙ্করণে শুধুমাত্র ডায়মন্ড অলঙ্করণ দেখা যায়। অথচ, মহাকালেশ্বর নং ২-তে কুম্ভ মোল্ডিং-এর অলঙ্করণে বৈচিত্র অধিক-এখানে মিথুন যুগল, দেবদেবী এবং নর্তকী চোখে পড়ে।

মন্দিরে ভূমিতলের ওপর নির্ভর করে বলা যায়, মহাকালেশ্বর নং ১ চৌবারা ডেরা নং ১ ও মহাকালেশ্বর নং ২-এর পরে নির্মিত হয়। মহাকালেশ্বর নং ২ ও মহাকালেশ্বর

নং ১-উভয় মন্দিরের ভদ্রে নটরাজ, অন্ধকান্তক ও চামুন্ডা মূর্তি বর্তমান। উভয় মন্দিরের এই মূর্তিগুলির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত মন্দিরে চামুন্ডার সঙ্গে একটি শবদেহ ও একজন ভক্ত বর্তমান, দ্বিতীয় মন্দিরে শবদেহ ও ভক্তের সংখ্যা চার। অন্ধকান্তকের ক্ষেত্রে প্রথম মন্দিরে চামরধারিণী অনুপস্থিত, দ্বিতীয় মন্দিরে দুটি চামরধারিণী বর্তমান। প্রথম মন্দিরে নটরাজের পাশে দুইজন মৃদঙ্গবাদক বর্তমান, দ্বিতীয় মন্দিরে বাদক ও ভক্ত সংখ্যা চার। মহাকালেশ্বর নং ১-এর তুলনায় মহাকালেশ্বর নং ২-এর মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুভার ও নমনীয়, অপরদিকে মহাকালেশ্বর নং ২-এর মূর্তিগুলিতে স্বতঃস্ফূর্ততা কম, এরা অধিক প্রথানুগত। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয়, মহাকালেশ্বর নং ১, মহাকালেশ্বর নং ২-এর পরবর্তী রচনা। মোল্ডিং এর সংখ্যা, বৈচিত্র, অলঙ্করণের প্রয়োগনৈপূন্য ও প্রবণতার দিকে তাকালে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকেনা যে মহাকালেশ্বর নং ১, উদয়পূরের নীলকণ্ঠেশ্বরের পূর্ববর্তী। তাই বলা যায়, উদয়াদিত্যের কোন পূর্বপুরুষের সময়ে মহাকালেশ্বর নং ১ নির্মিত হয়। ইনি হয়ত ছিলেন ভোজ্য স্বয়ং বা তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী জয়সিংহ।

ভূমিতল ও শিখরের শুকবাসায় স্থিত নটরাজমূর্তির তুলনা করলে মনে হয়, মহাকালেশ্বর নং ১ ও চৌবারা ডেরা নং ১-এর প্রাঙ্গনে অবস্থিত নামহীন ছোট মন্দিরটি একই সময়ে তৈরী হয়।

একটি তারিখহীন, অর্ধভগ্ন আংশিক পঠনযোগ্য, অনেক পরবতী সময়ের লেখর ওপরে নির্ভর করে বল্লালেশ্বর মন্দিরটিকে রাজা বল্লালের সময়ে নির্মিত বলে মনে করা হয়ে থাকে। রাজা বল্লালের পরিচয় নিয়ে ইতিহাসিবাদের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। বল্লালের মৃত্যু ঘটে ১১৫১ খ্রিঃ মধ্যে গুজরাটনরেশ কুমারপাল চালুক্য তাঁকে যুদ্ধে নিহত করেন। যদি বল্লালেশ্বর সত্যই রাজা বল্লালের নির্মাণ হয়ে থাকে, তবে বলা যায়, ১১৫১ খ্রিঃ মধ্যে বল্লালেশ্বর নির্মিত হয়। ভাস্কর্যশৈলী, বেদীবন্ধের মোল্ডিং ও দ্বারের সর্দলে সপ্তমাতৃকা প্যানেল দেখলে মনে হয়, এটি একাদশ শতাব্দীর রচনা।

উণে নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরটি একটি উঁচু কৃত্রিমভাবে নির্মিত বেদীর ওপরে তৈরী। মালবে, বিশেষত উণে, ভূমিজ মন্দিরে এই বৈশিষ্ট চোখে পড়েনা। মনে হয়, এই প্রবণতা, গুজরাট থেকে মালবে আসে ও ভূমিজ মন্দিরে প্রযুক্ত হয়। যার থেকে মনে হয়, এটি মহাকালেশ্বর নং ১ ও বল্লালেশ্বরের পরবর্তী রচনা। এখানে বরন্ডিকার মোল্ডিং একটি সরু কার্জিকা দেখা যায়, যা একটি নতুন সংযোজন। এই মন্দিরের রথিকা পূর্বে উল্লেখিত মন্দিরগুলির তুলনায় অধিক অলঙ্কৃত। তাই মনে হয় নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরটি পূর্বে উল্লেখিত উণের মন্দিরগুলির অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনা।

হটকেশ্বর মন্দিরটির গর্ভগৃহ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই এর সময় নির্ণয় করা কঠিন। তবে ভূমিতল দেখলে মনে হয়, এটি উণের প্রথমদিকের মন্দিরগুলির একটি।

উণের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মন্দিরটি হল ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। অর্ধভগ্ন এই মন্দিরের দেবীবন্ধের মোল্ডিং, মহাকালেশ্বর নং ১-এর মত হলেও কলম মোল্ডিং-এর ওপরে ও নীচে দিপ্তিকার সংখ্যা তিন। মহাকালেশ্বর নং ১ এর সংখ্যা দুই। তাই মনে হয়, এটি মহাকালেশ্বর নং ১ পরবর্তী রচনা।

উণের জৈন মদির চৌবারা ডেরা নং ২-এর গঠনশৈলীতে একাদশ শতাব্দীর গুজরাটের চালুক্য মন্দিরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পীঠ অংশে গজথর ও নরথরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১১৪৩ খ্রিঃ গুজরাট নরেশ কুমারপাল চালুক্যের মালব আক্রমণের পরে মালবের মন্দিরগঠনশৈলীতে চালুক্য প্রভাব পড়ে। তাই বলা যায়, ১১৪৩ খ্রিঃ পরে এই মন্দির নির্মিত হয়।

গোলেশ্বর মন্দিরটিতে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্কর মূর্তির পীঠে এর প্রতিষ্ঠার সাল উল্লেখ করা হয়েছে। যার ওপর নির্ভর করে বলা যায়, এই মন্দিরটির নির্মাণ ১২০৬ খ্রিঃ সম্পূর্ণ হয়।

সুতরাং বলা যায়, ভোজের সময় থেকেই উণে মন্দির নিমার্ণের সূচনা হয়। দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে এই ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকে।

সূত্র-নির্দেশ

১। এইচ.ভি.ত্রিবেদী— *করপাস ইন্সক্রিপশনাম ইন্ডিকেরাম ইন্সক্রিপশনস অফ দ্য পরমারাস*; খন্ড-সপ্তম; ভাগ-দ্বিতীয়, নিউ দিল্লী; ১৯৭৮

২। কৃষ্ণদেব- '*ভূমিজ টেম্পলস*'; *স্টাডিজ্য ইন ইন্ডিয়ান টেম্পল আর্কিটেকচার*'; দিল্লী; ১৯৭৫

৩। জে.এন.ব্যানার্জী-*দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনগ্রর* নিউ দিল্লী, ১৯৮৫

৪। এম.এ.ঢাকি, সেইন্টার-*এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইন্ডিয়ান টেম্পল আর্কিটেকচার;* নর্থ ইন্ডিয়া, বিগিনিংস অফ মিডিয়াভেল ইন্ডিয়াস, খন্ড দ্বিতীয়, ভাগ তৃতীয়; ১৯৯৮

৫। এম.ডি.খারে--- '*উণ-এ্যান ইম্পর্ট্যান্ট সেন্টার অফ পরমার আর্ট এ্যান্ড আর্কিটেকচার; আর্ট অফ পরমারস অফ মালয়া;* দিল্লী

সারাংশ

ভারতীয় আর্য সমাজে নিম্নবর্গের ভূমিকা

সুপম মুখার্জী

সংস্কৃত ভাষাভাষী ভারতীয় আর্যদের সামাজিক গঠন পরবর্তীকালে যে আকার ধারণ করেছে তা কিন্তু আদপেই ছিল না। আসলে সমাজ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন হয়েছিল। দক্ষতা বা কর্মক্ষমতাকে বা যোগ্যতাকে নির্ভর করেই সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আর্য-সামাজিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা পূর্বের যোগ্যতা কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্থলে নিয়ে আসে জন্মকৌলীন্য কেন্দ্রিক এক ব্যবস্থা ফলে যে দক্ষতা বা যোগ্যতা একদিন সমাজ পরিচালক নির্ণয়ের মাপকাঠি ছিল, সেখানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থপর মনোবৃত্তি থেকে জন্ম হয় এক উচ্চ-নীচ ভেদাভেদমূলক সমাজ ব্যবস্থা। ফলে কর্মজীবী সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদার হানি ঘটে। যদিও বাস্তবে তাদের যোগ্যতা এবং সমাজগঠনে ভূমিকা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেই যোগ্যতার কথা বলা হয়নি — সেই সাথে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বৈশ্য বিশেষত - শূদ্র সম্প্রদায়েরও এক প্রকার যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। উদ্বৃত্ত ভোগকারী উচ্চবর্ণ নিজেদের স্বার্থে সামাজিক বিধি নিষেধ পরবর্তীকালে চালু করলেও পূর্বে কিন্তু প্রত্যেক বর্ণেরই অবশ্য পালনীয় কিছু কর্তব্য ছিল এবং তা থেকে ভ্রষ্ট হলে উচ্চবর্ণকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আর নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের আচরিত কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চললে প্রশংসিত হত। মনুসংহিতার যুগেও এর প্রমাণ স্পষ্ট, কাজেই নিম্নবর্ণও যে আর্য সমাজ গঠনের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত তাতে সন্দেহ নেই। শ্রী হর্ষের নৈষধচরিতে বলা হয়েছে — যজ্ঞ যদি কর্ম হয় — সেকাজে ব্রাহ্মণ ব্রতী হলে ক্ষত্রিয় হয় যজমান অর্থ যোগান দেয় বৈশ্য আর যজ্ঞীয় দ্রব্য নির্মাণের মধ্য দিয়ে শূদ্র তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

সুক্ষ্ম ভূমি ও মালঝিটার অঞ্চলের নদনদীর ইতিকথা ঃ-

শ্রীঅরবিন্দ মাইতি

স্মরণাতীত কাল থেকে তাম্রলিপ্ত আন্তর্জাতিক বন্দর হিসাবে পূর্ব ভারতে স্বীকৃত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎ-সিং প্রমুখ বহু পর্যটক তাম্রলিপ্ত ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ দেখেছেন ও ভ্রমণ করেছেন, এখান থেকে বিদেশযাত্রা করেছেন,

এদের সকলের বিবরণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে দক্ষিণপূর্ব রাঢ়ের এই অঞ্চল প্রাচীন বাংলার বৈদিশিক বাণিজ্যের প্রবেশ দ্বার ছিল। ভাগীরথী-র দক্ষিণ পশ্চিমের অংশকে কখনো বলা হয়েছে সুহ্ম ভূমি বা সুবহ্ম যা পরবর্তীকালে মালঝিটা নামে পরিচিত। ক্যানিংহাম তার Ancient Geography of India তে সমুদ্র থেকে মাত্র ৮ মাইল দূরে তাম্রলিপ্তর অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান তমলুক সমুদ্র থেকে ৩০ মাইলেরও বেশী দুরে অবস্থিত। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে তাম্রলিপ্তকে সমুদ্র নিকটবর্তী বন্দর হিসাবে চিহ্নিত করলেও মালঝিটার কোন উল্লেখ তাতে নেই? এই অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। এর আগে হয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত পলৌরা পথ ধরে জল পথে সিংহল যাত্রা করেছিলেন এবং মাত্র ১৫দিনে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই যাত্রাপথে তিনি বহুসংখ্যক চর বা দ্বীপের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সমুদ্রযাত্রায় নদীর নাব্যতা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেনি, যে কারণে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১০ম শতাব্দীতে এসে তাম্রলিপ্ত বন্দরের এই সুবিধাজনক অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে যায়। চরগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করে। বর্তমান মহিষাদল সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পটাসপুর, ভগবানপুর, খেজুরা, কাঁথি এগরার কিছু অংশ ও রামনগর ভূমিগঠন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ফলশ্রুতি স্বরূপ তাম্রলিপ্ত বন্দর অবলুপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ভূগোলবিদদের মতে গঙ্গা ভাগীরথীর সৃষ্টি বহু পূর্ব থেকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ (দ্বারকেশ্বর— শিলাই), কপিসা (কংসাবতী) কেলেঘাই, সুবর্ণরেখা নদীর অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন গঙ্গার নিম্ন প্রবাহ রাজমহল পাহাড় থেকে বেরিয়ে অজয়, দামোদর ও রূপনারায়ণের নিম্ন গতিতে প্রবাহিত হতো তখন পদ্মা নদী পদ্মা খাল রূপে পরিচিত ছিল। বর্তমান নিম্ন রূপনারায়ণের গতিপথে সরস্বতী গঙ্গা প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে চলিত। কালক্রমে পদ্মার প্রধান জলধারা বাহিত হওয়ায় সরস্বতী শুষ্ক হয়। সৃষ্টি হয় উপরোক্ত চড়াগুলি। প্রথমে এগুলি চড়া ও দ্বীপ আকারে সৃষ্টি হলেও পরে মূল ভূখন্ডের সংগে যুক্ত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য যে কপিসা (কংসাবতী) ও কেলেঘাই যার মিলিত রূপটি বর্তমান হলদি নদী নামে পরিচিত এবং রসুল পুর নদী যাদের অস্তিত্বের কথা পূর্বেই বলেছি। এগুলি নদী হিসাবে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বর্তমান যা মূল হুগলীর উপনদী হিসাবে প্রবাহিত হচ্ছে, গঙ্গানদীর ব্যাপক পলিক্ষেপণের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। উপরোক্ত ভূমি সৃষ্টির পিছনে গাঙ্গেয় পলি সিংহভাগ থাকলেও কংসাবতী, কেলেঘাই, রসুলপুর, বীরকুল ও সুবর্ণরেখা নদীগুলি পলিক্ষেপণ ও সমুদ্রস্রোতের আগত বালুকারাশি (সাবমার্চ পদ্ধতিতে) এই ভূমি গঠনে বিশেষ সাহায্য করেছে। তাম্রলিপ্ত পলৌরা (পিপ্পলাপত্তন) জল পথটি ক্রমাগত অবলুপ্তি হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবলুপ্তির পরে

যেমন সপ্তগ্রাম বন্দরের অভ্যুদয় ঘটেছিল। ঠিক অনুরূপভাবে গঙ্গার (হুগলী) নিম্নগতিতে হিজলী, খেজুরী, কাঁথি বড়বাজার ও বান্‌জা (মাজনা) প্রভৃতি বন্দর ও গঞ্জের—সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে পর্তুগীজ ও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

সুহ্মভূমির কথা উঠলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে ৬ষ্ঠ শতকের মহাকবি দণ্ডীর দশকুমার চরিত উপাখ্যানের কথা মনে করিয়ে দেয়। কবি সেখানে স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন সুহ্মভূমির রাজধানী ছিল দামলিপ্ত। দামলিপ্ত কি তাম্রলিপ্তরই নামান্তর? হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় মালঝিটার গুরুত্ব স্বীকাব করেননি কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত নিম্ন রাঢ়ের এই অঞ্চলের দু দুটি তাম্রলেখ পাওয়া গেছে— এক জয়রামপুর, কপারপ্লেট অপরটি মহিষাদলে প্রাপ্ত তাম্রলিপি, মালঝিটার জনবসতির গুরুত্ব সম্পর্কে এর পরেও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?

ধর্ম সমাজ ও নারী

কল্যাণী মন্ডল

নৃতত্ত্ব মানব প্রজাতিকে (Human Race) দৈহিক কাঠামো, হাড়, মায়ার খুলি, চুল এবং বর্ণের নিরিখে প্রধানত চারভাগে ভাগ করেছে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকারগণ নারী-পুরুষের প্রকৃতি বিন্যাস করেছেন অঙ্গের আকৃতি ও যৌনবাসনার উপরভিত্তি করে। পুরুষ ধর্মশাস্ত্রকারগণ প্রায় সকলেই নারীকে মনে করেছেন চিরন্তন ভোগের সামগ্রী। কাম দায়িনী বলেই নারী 'কামিনী' রমনযোগ্য বলেই নারী 'রমনী'। নারীদেহ একাধারে পুরুষের পক্ষে প্রলুব্ধকর ও অশৌচের উৎস, এই নিরিখে নারী 'ভোগ্যা'। অন্যদিকে শিশুকে মাপকাঠি হিসেবে এবং সঙ্গম পটুত্বকে সামনে রেখে তারা পুরুষকে ফেলেছেন 'ভোক্তা'র দলে। এই নিরিখেই সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান, সম্মান ও মূল্য নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর লোকাচার ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মোড়কে।

এই সমাজে নারীর পরিচয় মূলত চারটি — জননী, জায়া, ভগিনী ও কন্যা। ধর্ম নামক সর্বব্যাপী আগ্রাসনের সাহায্যে পিতৃতন্ত্র নারীর জীবনচক্র নিয়ন্ত্রণের অবাধ কর্তৃত্ব পেয়েছে। 'পুরুষ প্রভু'র এই নিশ্চিদ্র একনায়কতন্ত্রে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুরোধ-অনুযোগ, অপারগতা-বিদ্রোহ কার্যত নিষিদ্ধ। ধর্ম-সংবিধানগুলি অনড়-অটল। তবে পুরুষতন্ত্র তার ইচ্ছা এবং সুবিধামত সংবিধান ব্যাখ্যা করতে বা তাতে উপধারা যোগ করতে পারে। তাই জননী, জায়া, ভগিনী ও কন্যা-রূপা নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, লোকাচার ও সমাজ কী দৃষ্টিতে দেখেছে এবং কীভাবে ব্যবহার করেছে তার ব্যাখ্যা থাকবে নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসারে—

১। নারীর সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্মমতগুলির ব্যাখ্যা।

২। নারীর সতীত্ব সম্পর্কে ধর্মমত ও লোকাচার তথা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী।

৩। অতিথি সেবায় নারীকে ব্যবহার করা।

৪। নারীর মাতৃত্ব ও ঋতুস্রাব সম্পর্কে ধর্ম ও লোকাচার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী।

৫। নারীর বৈধব্যব্রত।

৬। দেবদাসীরূপে নারীকে ব্যবহার করা।

৭। ভোগের সামগ্রীরূপে নারীকে 'খেলনা' করে দেওয়া।

৮। নারীর জন্য অবরোধ প্রথা।

৯। অসূর্যম্পর্শা হিসেবে নারীকে দেখা।

১০। 'অবলা' এবং 'অবোলা' হিসেবে নারীকে দুর্বল ও স্থবির করে রাখা।

বিভিন্ন ধর্মমত, লোকাচার ও সমাজে নারীর অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হবে—'ধর্ম সমাজ ও নারী' নামাঙ্কিত প্রবন্ধে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে চিনদেশের সম্বন্ধ, প্রেক্ষাপট — বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

জয়িতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শুধু তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। খ্রিষ্টের জন্মের প্রথম সহস্রাব্দে ভারতে নগরায়ন শুরু হয়েছিল। নগরায়ন মূলত শিল্পভিত্তিক ছিল। তৎকালীন শিল্প কৃষিকেন্দ্রিক ছাড়াও সুকুমার কারিগরী আর বস্ত্রবায়ন শিল্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারের প্রয়োগ জানা ছিল। তার ফলে ভারতের প্রাচীন যুগ থেকে বণিকেরা নৌপথে বা স্থলপথে দেশ দেশান্তরে পাড়ি দিতেন। সেই সময় এরোপ্লেন, কম্পিউটার, টেলিফোন, প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা উপলব্ধ ছিল না। বহুদিন ধরেই সওদাগরেরা নৌকা বেয়ে বিপণন সম্ভার নিয়ে দেশ দেশান্তরে যেতেন। খ্রিষ্টোত্তর যুগেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। তাই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়— যথা শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ইত্যাদি।

চিনদেশের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্থলপথে এবং জলপথে — উভয়পথেই সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত স্থলপথে দুটি পথ ছিল—একটি কাশ্মীর, গান্ধার, বার্মিয়ান, হিন্দুকুশ পেরিয়ে আর অন্যটি ছিল আসামের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ চিনে যাবার রাস্তা।

নানাকিং এ যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যায় তার সবগুলি বৌদ্ধ সম্পদ নয়। অন্যদিকে জলপথে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে সুমাত্রা ও জাভাদ্বীপ হয়ে দক্ষিণ চিনে যাওয়ার রাস্তার উল্লেখ মেলে। এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে প্রাচীন চিনের সঙ্গে ভারতের জনসংযোগ কিভাবে হয়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস করা যাবে।

গুপ্তযুগে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিবৃত্ত

নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের বিশেষত তাম্রলিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। গুপ্ত-রাজ্যের গোড়াপত্তনের কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পুন্ড্রবর্ধন, রাঢ়, সুহ্ম ওপ্রাচীন বঙ্গ এবং সমতট গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বাংলা থেকে প্রাপ্ত গুপ্তকালীন তাম্রশাসন গুলিতে বিশদভাবে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে সে যুগে কৃষি অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। গুপ্তযুগীয় বাংলার এক উল্লেখযোগ্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য হল 'অগ্রহার' ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই যুগের অমূল্য নিদর্শন গুপ্ত মুদ্রা, বিশেষত গুপ্ত রাজাদের স্বর্ণমুদ্রা (দীনার)। এগুলি শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্ববহ নয়, সৃজনশীলতা এবং শিল্পকলারও উৎকর্ষতার প্রতীক। বঙ্গের (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) ইতিহাসে গুপ্তযুগ তাই একটি বিশিষ্ট যুগ। প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গুপ্তরাজাদের অধীনস্থ আলোচ্য এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণা নিবন্ধটি গুপ্তযুগের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সম্যক তথ্যনিষ্ঠ চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরার আন্তরিক প্রয়াস মাত্র।

ভারতীয় সাহিত্যে পিতা পুত্রীর সম্পর্ক

শংকররঞ্জন মজুমদার

পাশ্চাত্য পুরাণে ইলেকট্রা কমপ্লেক্স একটি বহু পরিজ্ঞাত বিষয়। ভারতীয় সাহিত্যেও এর বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদে উষা ও রুদ্রর যে সম্পর্ক তার মধ্যে এ সম্পর্কের সূচনা। ঋগ্বেদের ১.৯২:১১; ৩.৬১.৪; ৭.৭৫.৫ -এ উষা সূর্যের পত্নী। আর ১.১২৩.১০; ৪.৫১.১-এ উষা সূর্যের কন্যা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রুদ্র হলেন প্রজাপতি।

ঋগ্বেদের ১০.৬১ তে পিতা কর্তৃক যুবতী কন্যাকে সম্ভোগের বর্ণনা পাই। ব্রাহ্মণের যুগে এই নিয়ে দেবতাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মা তার মানস কন্যা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে কামনা করেন। এরই কিঞ্চিৎ ভিন্নতা যোধ হয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেখানে শুম্ভ নিশুম্ভ দেবী চণ্ডীকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিল। পরিণাম শুম্ভ নিশুম্ভ বধ।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে সাহিত্যে শিব কর্তৃক কন্যা মনসা ও চণ্ডীতে আসক্তির প্রকাশ দেখি।

এছাড়াও বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যেও উক্ত সম্পর্কের বীজ নিহিত আছে।

মহামানব বুদ্ধের দষ্টিতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

জিনবোধি ভিক্ষু

পুরুষশাসিত সমাজে নারী বেশীভাগ ক্ষেত্রে অবহেলিত হলেও নারী জাতির ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক, কি রাজনৈতিক, কি সাহিত্য, দর্শন, চিন্তায়, কি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিকতায় নারীর অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দৈনন্দিন সংসারে তারা একাধারে বধূ-মাতা-কন্যার ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে নারী হলো বিশ্বকল্যাণের উৎস। শিক্ষা - দীক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে যোগ্য হলেও কেবল নারী হওয়ার কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ করে। সাংবিধানিকভাবে নারীর সম-অধিকার থাকলেও ব্যক্তিগত আইনে নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা নেই।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বিশ্বমানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের আবির্ভাব, রাজঐশ্বর্যের পার্থিব ভোগ সম্পদ পরিত্যাগ সদ্যজাত পুত্র এবং পরমাসুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ, আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, বহুজনের হিতসুখ, মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশে সদ্ধর্মবাণীর শুভউদ্বোধন এক নবদিগন্তের সূত্রপাত হয়েছিল। তখন থেকে মহামানব বুদ্ধ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের পাশাপাশি নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মানুষের নৈতিকজীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত না হলে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারেনা। এর অভাবে একজন মানুষ মানুষ নয়। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হলে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। তখন মানবতা,

মানবপ্রেম, সহানুভূতি, উদারমনোভাব, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মানবকল্যানজনক চেতনার উদ্বোধন ঘটে। এতে নর-নারী ভেদাভেদ থাকে না। মহামানব বুদ্ধ নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদা দানে কতটুকু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়াই নিবন্ধের উপজীব্য বিষয়।

প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটিতে জীবনের প্রবাহ

সমীর ঈশা

সুপ্রাচীন কালথেকে সহজ সরল মাধ্যম হিসেবে ভারতবর্ষের শিল্পে পোড়ামাটির ব্যবহার প্রায় ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে। নদীমাত্রিক স্থানে অতি সহজেই নরম মাখনের মত মাটি পাওয়া যায় এবং তারই কারণে সাধারণ মানুষ তার শৈল্পিক আশা আকাঙ্খা, তার প্রয়োজন ও পরিবেশের নানা ছবি পোড়ামাটির (টেরাকোটা) কাজে ধরে রেখেছে যা আজ রসিক এবং গবেষকদের অধ্যয়নের বস্তু।

গাঙ্গেয় বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপকভাবে মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির শিল্পের ব্যবহার হতে থাকে। প্রকৃতির হাতে বাধ্য হয়েই হোক বা সারল্যের প্রমাণস্বরূপই হোক বাঙালী-শিল্পীমন মন্দিরের সম্মুখভাগে (Facade) এবং গাত্রে সমাজজীবনের নানা ছবি, লোকনৃত্য, লোকগাথা ধর্মীয় উপাখ্যান ইত্যাদি পোড়ামাটির ইঁটওফলকের দ্বারা গ্রথিত অলঙ্করণে রূপময় করে রেখেছে। এইরূপ স্থাপত্যে দুই একটি প্রাচীন ফলক বা ইট পাওয়া গিয়েছিল পূর্ববঙ্গের বোগরা জেলার মহাস্থানের নিকটবর্তী গোবিন্দধাম বা গোবিন্দভিটার খননকার্যে। এর মধ্যে একটি গোলাকার যার মধ্যে মিথুন, চিত্ররূপের উপস্থাপনা বর্তমান, এবং অপরটিতে আছে, মকরের রূপ। শৈলীগত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই ফলকদুটিকে গুপ্ত যুগের আঙ্গিনায় ফেলা যায়।

সুতরাং, বঙ্গভূমির পোড়ামাটির শিল্প যে সুপ্রাচীন তার সাক্ষ্য মেলে মৌর্য্য ও শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির মূর্তি ও অলঙ্কৃত ফলকের আবিষ্কারের মাধ্যমে। এর অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে মিদনাপুরের তাম্রলিপ্ত ও ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপা ও হরিনারায়ণপুরে, মুর্শিদাবাদের গুটগ্রামে, বাঁকুড়া জেলার পোখর্নে এবং আরও অনেক স্থানে যেমন পূর্ব বাংলার অধুনা বাংলাদেশ দিনাজপুর জেলার "বাণগড়" বোগরা জেলার—মহাস্থান ঢাকার-সাভার এবং কুমিল্লার মীনমতি প্রভৃতি স্থানে।

এই শিল্পের সর্বাধিক এবং ব্যাপক ব্যবহারের হদিস মেলে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে। এই মন্দিরটি চৌমুখবিশিষ্ঠ সর্বতভদ্র মন্দির। কুমিল্লা জেলার ময়নামতীর বৌদ্ধবিহারটি এরই সমসাময়িক। উক্ত দুই স্থানেই তৎকালীন

সমাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের হাসি-কান্নার, নানারূপ ক্রীড়া ও উপক্রীড়া, আনন্দ-উল্লাস অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত মৃৎশিল্পের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। এই অদ্ভুত সুন্দর মূর্তিগাথা গ্রামীণ জীবনযাত্রার অতি সাধারণ বিষয় থেকে আরম্ভ করে তার সমস্ত খুটিনাটি এবং পশুপক্ষী, জীবজন্তু ও পুষ্পপত্র সবকিছু যেন গতিশীল ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হতে হতে এক মুহূর্তের জন্য পোড়ামাটির-রূপসজ্জায় ধরা পড়ে, থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেছে।

এ ছাড়াও ঐ সমস্ত মন্দিরে সরল গ্রামীণ শিল্পীর ধর্মভিত্তিক কল্পনা, বিশ্বাস, চেতনা, ভক্তি এবং আরও কত কিছু—যেমন জনপ্রিয় গল্পগাথা ও মহাকাব্যের নানা নাটকীয় ঘটনা এই মৃৎশিল্পের মধ্যেদিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, পঞ্চতন্ত্র, হীতপোদেশ প্রভৃতির থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে তারসঙ্গে স্বাধীন ফলকে কাল্পনিক জন্তু, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বিষ্ণু, গণেশ, কৃষ্ণ, মঞ্জুশ্রী, পদ্মাপানী, তারা প্রভৃতি সবকিছুই একই সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর সরল জীবনযাত্রার আঙিনায় প্রবেশ এবং একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে-সাধারণ টেরাকোটা শিল্পী কেবলমাত্র তার সারল্যের গুণে যাবতীয় কঠোর ধর্মীয় বাধানিষেধ ও রাজকীয় আড়ম্বরের অনুশাসন অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, জনপ্রিয় ধর্মগন্ডির মধ্যেই একটা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

পালরাজাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এই জনপ্রিয় শিল্পের ধারাবাহিকতা বেশ কিছুটা ব্যহত হলেও তার আবার নিজস্ব সঞ্জীবনী শক্তিতে জাগ্রত হয়ে অনাড়ম্বর ভাবে নতুন করে প্রকাশিত হয় রত্ন মন্দিরের গায়ে এবং মাটির পুতুল শিল্পে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরের সম্মুখের প্রবেশমুখে এবং সম্মুখভাগের দেওয়ালে টেরাকোটার কাজের দ্বারা পর্যাপ্তরূপে অলঙ্কৃত করা হত। কিন্তু এই প্রথার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঘটে বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় ও জোড়বাংলার মন্দিরে এবং দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দিরে। এই দুই মন্দিরের সর্বাঙ্গ গ্রাম্য নববধূর ন্যায় টেরাকোটার অলঙ্কার রাজিতে ভূষিত, শুধু তাই নয়, মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার দেওয়াল-গাত্রে, ছাদ এবং দালানেও পোড়ামাটির অলঙ্করণের অতুলনীয় আভরণ দেখা যায়।

শুধুমাত্র দেবদেবীই নয় বা মানব মানবীই নয়, নানাবিধ ছক, তন্ত্রকাঠামো এবং আল্পনার নক্সাও উৎকীর্ণ করা হল মন্দির গাত্রে, কিন্তু এই নক্সা উপরিভাগে নয় তলদেশে, অনেকসময় স্তম্ভের গোড়ায় পাড়হিসেবে।

বৈষ্ণব মন্দিরে আবার কৃষ্ণের বীরত্বের কাহিনী অপেক্ষা নানাবিধ গোপিনী সহযোগে কৃষ্ণলীলা এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমে ও বিরহের কাব্যিক ভাস্কর্য-চিত্রণ প্রাধান্য লাভ করেছিল। রাসমন্ডল, নবনারীকুঞ্জ, দানলীলা, রাধার বিরহের দৃশ্য, ত্রিভঙ্গ বা নৃত্যরত বংশীধারী

কৃষ্ণরূপ, অসংখ্য মন্দিরের সদরের বহির্ভাগে দেয়া যায়। এইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-মুর্শীভঙ্গার নন্দীমন্দির, কান্তনগর মন্দির এবং হেতমপুরের দেওয়ানজী মন্দির।

কৃষ্ণ ছাড়াও বিষ্ণুর দশাবতারের দৃশ্য, ব্রহ্মার জন্মগ্রহণ, শৈব ধর্মের নানা উপাখ্যান, শৈব এবং তার বিভিন্নরূপ ঃ—যেমন হরগৌরী, বটুকভৈরব, তৃপদভৈরব, আবার শাক্তগোষ্ঠীর দেবী ও তার নানারূপ যেমন চন্ডী, কালী, ছিন্নমস্তা, দুর্গা মহিষাসূরমর্দিনী, অন্যপূর্ণা ইত্যাদির বিষয়বস্তু নিয়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্য অলংকৃত হয়েছে আরো অনেক মন্দির গাত্রে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে যদিও মন্দির গাত্রে টেরাকোটা শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মাশ্রীয় তবুও বিষয়বস্তুর ধরণ ও উপস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে গ্রামীণ বাংলার সাধারণ জীবনযাত্রার ন্যায় সহজ সরল অভিব্যক্তিতে ভরপুর। দূরুহ ধর্মীয় নিয়ম বিধির কঠোরতা বা আড়ষ্টতা তাকে স্পর্শ করেনি। সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রাচুর্যময় ঐশ্বর্যশালী মানুষের সঙ্গে সরল ধর্মভীরু শিল্পবোধের এক অদ্ভুত মিলন ঘটেছে সমকালীন ও পরবর্তীকালের নানা মন্দিরগাত্রের শিল্পকলায়, যদিও এই সমস্ত মন্দিরগুলির বেশীর ভাগই, নির্মিত হয়েছিল বাংলার জমিদার-সম্প্রদায় ও নানা ধর্মগোষ্ঠীর সম্মিলিত আর্থিক সাহায্যে।

শিল্পের তৎকালীন পৃষ্ঠপোষক রাজারাজড়া এবং জমিদার শ্রেণী আর নেই। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে সেই প্রাচীন টেরাকোটাশিল্প এবং স্থাপত্য অতীতের মধ্যে বিলীন হতে চলেছে, যা কিছু উদাহরণ আজও বেঁচে আছে তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে করুণভাবে মৃতপ্রায়। আগ্রাসী প্রযুক্তি ও বিপন্ন, সমৃদ্ধ, হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার শ্রোতে আমরা ভেসে যাচ্ছি, রূঢ়বাস্তবতার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার সময় এবং তাগিদ নেই।

কিছুদিন আগে পুর্ণবোধশক্তি সম্পন্ন এবং আবেগপূর্ণ এক পাগলের প্রলাপ শুনে মেদিনীপুরের পাথরায় গিয়েছিলাম। ঐতিহ্যপূর্ণ মৃৎশিল্পে অলস্কৃত রত্নমন্দিরের দূরবস্থা দেখে মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হল। ক্লান্ত শরীরে যখন স্টেশনে ফিরছিলাম তখন হঠাৎ দেখলাম এক গ্রামীণ মৃৎশিল্পী পোড়ামাটির পুতুল ইত্যাদির পসরা সাজিয়ে পথের ধারে বসে আছে। কি বিস্ময়কর। এক নিরাশা এত প্রতিকুল পরিবেশে এখনো সেই সহজ সরল মানুষের শিল্পভাষা মরতে-মরতেও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে বাংলার একান্ত আপন পোড়ামাটির পুতুলে, বেঁচে আছে-যামিনী রায়ের ছবিতে, বেঁচে আছে বাংলার তাঁতের শাড়ীর নক্সায় এবং আরও কত কিছুর মধ্যে। এমন করেই আজও চলেছে বাংলার পোড়ামাটির শিল্পে বাঙালীর জীবনপ্রবাহ।

কামতা-কোচ রাজ্যের অর্থনীতি, কৃষি ও বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র বণিক সম্পর্ক (১৫৫৫-১৭৭৩)

পার্থ সেন

১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আক্রমণে কামরূপে সেন রাজবংশের পতন ঘটে। হোসেন শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কামরূপের ভূঁইরা দুর্বল হয়ে পড়লে কোচ জনগোষ্ঠীভুক্ত বিশ্বসিংহ 'কামতেশ্বর' উপাধি ধারণ করে কামরূপের রাজা হন।[১] বিশ্বসিংহ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য মহারাজা নরনারায়ণের সময় (১৫৩৪-১৫৮৭)[২] উত্তর পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। মহারাজা নরনারায়ণের সাম্রাজ্যের সীমানা—পূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমানা, উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে মিথিলা অথবা তীরভুক্তির সীমান্ত এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩] তবে মহারাজা নরনারায়ণের কামতা কোচ রাজ্যের এই ভৌমিক বিস্তার সম্ভবত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। মহারাজা নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করে পরাস্ত হলে উত্তর পূর্ব অঞ্চলের অধিকাংশ করদ রাজ্যগুলি নারনারায়ণকে কর প্রদান করা বন্ধ করে দেয়।[৪] মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কামতা কোচ রাজ্যে কৃষি শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি এবং বিস্তার ঘটে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে মহারাজা নরনারায়ণ মুদ্রার প্রবর্তন করে। কামতা-কোচ রাজ কর্তৃক প্রবর্তিত নারায়ণী মুদ্রা সমগ্র উত্তরবঙ্গ আসাম এবং ভূটানে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত।[৫]

কৃষি ছিল কামতা-কোচ রাজ্যের জনগণের প্রধান উপজীবিকা। মুসলিম ঐতিহাসিক এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণে কামতা-কোচ রাজ্যের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং কৃষিজ পণ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে "Kochbihar is well known for its excellent Water, mildness of the Climate, its fresh vegitation and flowers oranges are plentiful as also other fruits and vegetables."[৬] ১৩৬৫ সালে প্রবর্তিত সিকন্দর শাহের মুদ্রায় কামরূপকে 'চাউলিস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের পশ্চিমাংশ মাথাভাঙ্গার দক্ষিণাংশ কোচবিহারের উত্তরাংশ এবং সমগ্র তুফানগঞ্জ অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল।[৮] অনান্য বিভিন্ন প্রকারের ধানের সাথে কামতা-কোচবিহারের শালী ধানেরও উৎপাদন হত। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই অহোম এবং অনান্য জনজাতি ভাল

শালী ধান উৎপাদন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল।[৯] কোচ এবং বড়ো-কাছারি জনগোষ্ঠী কোদাল দিয়ে জমি চাষে অভ্যস্ত থাকায় অনান্য ধানের তুলনায় শালী ধান কম উৎপাদন করত।[১০] তবে ধীরে ধীরে ভূঁইয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কোদালের পরিবর্তে এই সময় লাঙলের প্রচলন করা হয়।[১১] এ রাজ্যে উৎপন্ন গম নিম্নমানের ছিল।[১২] উন্নত মানের মুগ ডাল এবং সরিষার ব্যাপক চাষ হত।[১৩] সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কোচবিহারে তামাক চাষের প্রচলন হয়।[১৪] গোসানীমারী, আদাবাড়ী, পানিগ্রাম, বারবাঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে তামাকের চাষ হত।[১৫] কামতা কোচ রাজ্যে উৎপন্ন তামাক বার্মায় রপ্তানি করা হত।[১৬] রঙ্গপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নীল চাষের প্রচলন ছিল। এখানকার কৃষকরা তাদের উৎপান্ন নীল ভূটিয়াদের কাছে বিক্রী করত।[১৭] কামতা কোচবিহারে ব্যাপক তুলোর উৎপাদন হত। বিশ্বসিংহের পিতা হরিয়া মন্ডল চিক্না গ্রামে তুলো উৎপাদন করতেন।[১৮] কামতা কোচ রাজ্যে উৎপন্ন উন্নত মানের বিভিন্ন পণ্যের প্রশংসা আমরা স্টিফেন ক্যাসেলার বিবরণে পাই। তিনি লিখেছেন "Kochbihar is famous for its fruits, which are better here than I have seen them in India and specially for its oranges of every Kind"[১৯] ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় লাল রঙের গালা উৎপন্ন হত এবং গালা দিয়ে সূতী কাপড় লাল করা হয়।[২০]

মধ্যযুগে কামতা কোচ রাজ্যে হস্ত শিল্প এবং শ্রম শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। শিল্পবিকাশে কোচ রাজাগণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজা নরনারায়ণ ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অহোম রাজের কাছে প্রচুর সংখ্যক কারিগর প্রেরণ করেছিলেন।[২১] ইটের দালান নির্মাণে এ রাজ্যের কারিগরদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। অহোম রাজ রুদ্রসিংহ কোচবিহার থেকে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের জন্য ঘনশ্যাম নামে জনৈক কারিগরকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘনশ্যামের তদারকিতে আসামে বহু ইটের দালান নির্মিত হয়েছিল।[২২] সিল্ক এবং পশম জাতবস্ত্র নির্মাণের জন্য কামতা-কোচ রাজ্যের যথেষ্ট সুনাম ছিল। সিল্কের কাপড় প্রস্তুত কারকদের কোচবিহারে কাটানী বলা হত।[২৩] কামরূপের সুয়ালকুচী রেশমবস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। র‍্যালফ ফীচ উল্লেখ করেছেন "এখানে রেশম আর কস্তুরি প্রচুর পাওয়া যায়, আর সূতী কাপড়ও"।[২৪] মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় বরনগরে রেশম শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছিল।[২৫] নারায়ণপুর বয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শঙ্করদেবকে তাঁর শিষ্য মাধবদেব নারায়ণপুরের তৈরী একটি সুন্দর বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন।[২৬] মহারাজা নরনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শঙ্করদেবকে বড়পেটার তাঁন্তীকুচী এলাকার তাঁতীদের তদারকি করার জন্য গোমস্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।[২৭] কোচবিহার এবং আসাম থেকে মুগা রেশম বাংলাদেশ ভূটান, তিব্বত এবং মোঘল ভারতে রপ্তানি হত।[২৮] পাট থেকে মেখলী নামে এক প্রকার বস্ত্র তৈবী হত। মেখলীগঞ্জে মেখলী কাপড় তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল।[২৯]

কামতা-কোচ রাজ্যে স্বর্ণকার, কামার, কুমোর প্রভৃতি কারিগর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কামার সম্প্রদায় লোহা দিয়ে দৈনদিন প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করত। লোহা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী করত। তবে কামার সম্প্রদায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোচবিহারের কৃষক সম্প্রদায় কৃষি কাজে কাঠের লাঙল ব্যবহার করত। সম্ভবত লোহা কম পাওয়া যেত বলেই কৃষকরা কাঠের লাঙল ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।[৩০] কোচবিহারে মৃৎ শিল্পের অস্তিত্ব থাকলেও এখানকার কুম্ভকাররা এঁটেল মাটির জন্য নিম্ন মানের মাটির জিনিষ তৈরী করত।[৩১] এন্ডি সুতো দিয়ে বলরামপুরের মহিলারা উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী করত।[৩২] কামার শ্রেণী ছিল কোচ এবং কলিতা সম্প্রদায়ভুক্ত। হাতির দাঁতের কাজের জন্য বড় পেটার সুনাম ছিল। সারথে বাড়ী ছিল পিতলের কাজের জন্য বিখ্যাত।[৩৩] কাঠের নৌকা তৈরীতে কোচ শিল্পীদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে এখানকার শিল্পীরা নানা রকম আসবাবপত্র প্রস্তুত করত। বৈষ্ণবসত্র ভাল কাঠ এবং বাঁশের আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিত।[৩৪]

কামতা-কোচ রাজ্যের সাথে ঢাকা, সিরাজগঞ্জ মানিকগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, তিব্বত, ভূটান, চীন এবং মোঘল ভারতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তামাক, কাঠ, সরষের তেল ধান চাল নদীপথে সিরাজগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জে রপ্তানি হত। বস্ত্র, লবণ, নানা প্রকারের বাসন, শর্করা, মসল্লা ইত্যাদি পণ্য আমদানী করা হত।[৩৫] তামাকের ব্যবসা মগ ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করত। এঁরা মেখলিগঞ্জ এবং লালবাজার থেকে তামাক ক্রয় করত।[৩৬] ভূটানী ব্যবসায়ীরা চীনের পশম, গরমকাপড়, সোনারগুড়ো, পাহাড়ী লবণ ইত্যাদি পণ্যের বিনিময়ে লোহা, গালা, চাল, রেশম, শুটকি মাছ, মহিষের সিং ইত্যাদি পণ্য নিয়ে যেত।[৩৭] হাজো, ওদালভাড়, পাজ্জা, বড়ভিটা বদরগঞ্জ রঙ্গপুর ইত্যাদি মেলাগুলিতে ভূটানী ব্যবসায়ীরা পণ্য কেনা বেচা করত। ভূটানী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই কামতা-কোচরাজ্য চাল এবং তিব্বতের সাথে পণ্য বিনিময় করত।[৩৮] র‍্যালফ ফীচে উল্লেখ করেছেন যে চীন থেকে এদেশে গোলমরিচ আমদানী করা হত।[৩৯] কোচবিহারের উত্তরে কারাপাটন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বর্তমান কামরূপের উত্তর সীমান্তে জিগানপুর একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এখান থেকে কোচরা চীন, তিব্বত, ভূটান এবং আসামের সাথে পণ্য বিনিময় করত। কাছাড় সিলেট, জয়ন্তিয়া ইত্যাদি দেশের সাথে কামতা-কোচ রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্যিক সুবিধার্থে ঐ তিন রাজ্যকে মহারাজা নরনারায়ণ মুদ্রা তৈরী করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪০] তবে ছোট ছোট লেনদেনের ক্ষেত্রে কড়ি এবং বাদামকেও বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত।[৪১] পণ্য বিনিময় প্রথার মাধ্যমেও বাণিজ্যিক আদান প্রদান হত। আসাম মোঘল সীমান্তে ঘৃতকুমারী কাঠ, গোলমরিচ, মৃগনাভি, সোনা এবং বিভিন্ন হাড়ের পশমের

বিনিময়ে কামতা-কোচ রাজ্যের বণিকরা লবণ সোডা গন্ধক এবং অনান্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করত।[৪২] বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার 'হাদিরাচোকী' নামক স্থানে কামতা-কোচ রাজ্যের সাথে বাংলা দেশের পণ্য বিনিময় হত।[৪৩] ভূটানী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোচ রাজগণ কর আদায় করতেন।[৪৪]

বাহির্বাণিজ্য ছাড়াও হাট এবং মেলাগুলি ছিল কামতা কোচ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র। রঙ্গপুর, ধরওয়ানী, পাঙ্গা, বড়াভটা, বদরগঞ্জ, বিরাটমেলা ছিল রাজ্যের উল্লেখযোগ্য মেলা।[৪৫] চৈত্রমাসের অশোকাষ্টমীতে বসত কোচবিহারের গদাধর মেলা।[৪৬] মেলাগুলি সাধারণত শীতকালে বসত এবং মাস খানেক ধরে চলত। মেলা এবং হাটগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষপত্রের সাথে জামাকাপড়, কম্বল, গরুগাড়ি ইত্যাদি বিক্রী হত।[৪৭] হাটের মালিকানা ছিল রাজার। হাটগুলিকে নীলামে ডেকে সর্বোচ্চ নীলামদারকে পাঁচ বছরের জন্য লীজ দেওয়া হত।[৪৮] সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে কৃষকের কাছ থেকে অধিক উদ্বৃত্ত আহরণের জন্য এবং কৃষককে অধিক ফসল ফলনের জন্য আগ্রহী করে তোলার জন্য রাষ্ট্র হাটগুলি বসাত।

নদীপথ এবং সড়ক পথ উভয় পথেই বহির্বাণিজ্য এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলত। মহারাজা নরনারায়ণ আসামের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগের জন্য গোঁহাই কামাল আলী সড়ক নির্মাণ করেছিলেন।[৪৯] ব্রহ্মপুত্র নদী ছাড়াও গোঁহাই কামাল আলী সড়ক দিয়ে আসামের সাথে কোচবিহারের বণিকরা বাণিজ্য করত। আসামের সাথে কোচবিহারের বাণিজ্য অত্যন্ত লাভজনক ছিল। কারণ আসাম থেকে কোচবিহারের বণিকরা সস্তায় মূল্যবান জিনিষপত্র সংগ্রহ করত।[৫০] সড়কপথে মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকার সাথেও কোচবিহারের যোগাযোগ ছিল। বেনারসের সাথেও কোচবিহারের যোগাযোগ ছিল।[৫১] র‍্যাল্‌ফ ফিচ তাঁর বিবরণে কচ্ছিঘাটকে এ রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কচ্ছিঘাট বন্দর সম্ভবত বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার চেছাকাটা তালুকে অবস্থিত ছিল।[৫২] কামতা-কোচ রাজ্যে নদীপথে বাণিজ্য করার জন্য বণিককে ঘাটকর নামক একপ্রকার কর দিতে হত।[৫৩] উল্লেখ্য হাট, ঘাট এবং বাজার থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব শরিয়তী মহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫৪]

কামতা-কোচ রাজ্যে ছোট বড় দুধরনের বণিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বড় ব্যবসায়ীদের সওদাগড় বলে অভিহিত করা হত। ছোট বণিকদের ব্যাপারী বলা হত। তবে এই রাজ্যে ছোট বড় উভয় সম্প্রদায়ের বণিককে 'মুদই' বলা হত।[৫৫] ব্যাপারী বা ছোট বণিকরা সাধারণত লবণ, তামাক, চিনি ইত্যাদি পণ্যের বাণিজ্য করত। তাদের মূলধন ১০ টাকার বেশী ছিল না।[৫৬] অপরদিকে সওদাগর বা বড় বড় বণিক সম্প্রদায় সোনা, পশম, মুদ্রা, লবণ, সরষা, কাঠ ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল। কোন কোন

সওদাগড়ের চারলক্ষ টাকা পর্যন্ত পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। কখনো কখনো একাধিক ব্যক্তি একত্রে ব্যবসা করতেন। ভবানন্দ কলিতা সাতজন বণিকের সঙ্গে যুক্ত ভাবে ব্যবসা করতেন। ভবানন্দ কলিতা বাংলাদেশ, ভূটান, গারোপাহাড় এবং আসামের সাথে ব্যবসা করতেন।[৫৭] বণিকদের নানা ধরনের বাণিজ্যকর রাষ্ট্রকে দিতে হত। তবে কখনো কখনো রাজা বণিকদের কর মুকুব করে দিতেন।[৫৮]

কামতা-কোচবিহারে সুনির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। কৃষিকাজের সাথে সকলেই তেলভাঙ্গা, ধান ভাঙ্গা, বস্ত্রবয়ন, ঝুড়ি বানানো ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত ছিল। ফলে আলোচ্য সময়ে আমরা কারিগর সম্প্রদায়ের গিল্ড এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে সনোয়াল (সোনা ধৌত কারক) গিল্ড বা খেলের অস্তিত্ব ছিল। যদিও মাহাতির লোকই সনোয়ালের কাজ করত। মোঘল ভারত যেতে যে সমস্ত দক্ষ কারিগর আসামে আসত তারাও গিল্ড বা যেন গঠন করত।[৫৯] মহারাজা প্রাণ নারায়ন (১৬৩২-১৬৬৫) মন্দির নির্মাণের জন্য দিল্লী থেকে রাজমিস্ত্রী ডেকেছিলেন।[৬০] ভূটান এবং তিব্বতের বাণিজ্যিক লেনদেন কামতা-কোচ রাজ্যের অনুকূলে থাকলেও মোঘল ভারতের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন মোঘল ভারতের অনুকূলেই ছিল। কারণ কামতা-কোচবিহারের কোন ইউরোপীয় সোনা পাওয়া যায়নি।[৬১] অমলেন্দু গুহ উল্লেখ করেছেন যে আলোচ্য সময় বড় ব্যাঙ্কার, দালান এবং মহাজন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আসামে ছিল না।[৬২] কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা দেখি যে ঢাকার মহাজন গোলাপ রায় কোচবিহারের রাজার হয়ে ৩৫০০০০ টাকার জামিনদার হচ্ছে।[৬৩] এ ঘটনা থেকে সহজেই বলা যায় যে কোচবিহারে মহাজনী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।

উপরের আলোচনা একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে কামতা-কোচবিহার রাজ্যের গ্রামীন অর্থনীতি পুরোপুরি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না। লবণের জন্য এ রাজ্যের গ্রামবাসীদের ভূটানের পাহাড়ী লবণের উপর নির্ভর করতে হত।[৬৪] মহারাজা নরনারায়ণের আমলে যে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছিল তার ফলে এ রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। কৃষি এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে বৈষ্ণব ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ধান উৎপাদনের জন্য কোদালের পরিবর্তে লাঙলের প্রচলনের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব সত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৬৫] বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শঙ্কর দেবের শিষ্য মাধবদের নিজেও সুপারির ব্যবসা করতেন।[৬৬] আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিছু কিছু হস্ত শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে কোচ রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে কোচ রাজ্যের বিভাজন, ক্রমাগত ভূটিয়া আক্রমণ ইত্যাদি কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই রাজ্যের বণিক পুঁজি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়নি। মুসলিম কারিগরদের দৌলতে এ রাজ্যে পিতলের বাসন নির্মাণ, ছোট দানার চিনি উৎপাদন এবং সুগন্ধি দ্রব্য

উৎপাদন সম্ভব হলেও[৬৭] পরবর্তী কালে উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতমানের প্রযুক্তি উৎভাবন বা প্রয়োগ কোনটাই সম্ভব হয় নি। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-কোচ চুক্তি দ্বারা কোচবিহারের রাজ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালে এরাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যে মারোয়ারী এবং ইউরোপীয় বণিকদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

সূত্র-নির্দেশ

১। খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, *কোচবিহারের ইতিহাস*, পুনর্মুদ্রন, ১৯৯০, কোলকাতা-১, পৃঃ ৮৭।

২। ঐ, পৃঃ ১০১।

৩। ঐ, পৃঃ ১২৩।

৪। *ডি নাথ, হিস্ট্রী অব দি কোচ কিংডম ১৫১৫-১৬১৫*, দিল্লী ১৯৮৯, পৃঃ ৭৬।

৫। নিকোলস রোডস, *দি কয়েনেজ অব কোচবিহার*, শঙ্কর কে, বোস, পৃঃ ভূমিকা, ১০, ধুবরী, ১৯৯৯।

৬। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪৭।

৭। *ক্যাটালগ অব দি কয়েনস ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম*, ভলিয়্যুম **দ্বিতীয়, পৃঃ** ১৫২, এ্যান্ড পার্ট সেকেন্ড, প্লেট-১, নং ৩৮।

৮। এইচ এন. চৌধুরী, *কোচবিহার স্টেট এ্যান্ড ইটস ল্যান্ড রেভিনিয়ু সেটেলমেন্ট*, কোচবিহার, ১৯০৩, পৃঃ১৬৫।

৯। অমলেন্দু গুহ, *দি মিডিয়াভেল ইকনমি অব আসাম, ইন দি কেমব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, কলি ১ সম্পা, তপন রায় চৌধুরী এ্যান্ড ইরফান হাবিব, পৃঃ৪৮১। দিল্লী, পুনর্মুদ্রন ১৯৮৪।

১০। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪৪।

১১। ঐ পৃঃ ১৪৪।

১২। ডব্লু. ডব্লু হান্টার, *স্টেটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল*, ভলি ১০, দিল্লী ১৯৭৪, পৃঃ ৩৮২।

১৩। *দি ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া*, ভলি ১০ অকসফোর্ড, ১৯০৮, পৃঃ ৩৮৪।

১৪। খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩।

১৫। ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কোচবিহারের ইতিহাস*, সম্পা ৬, পৃঃ২৫, কলি ১৯৮৭

১৬। শচীনদেব ঘোষাল 'কৃষি অর্থনীতিতে কোচ রাজাদের ভূমিকা' *কোচবিহার পরিক্রমা* সম্পা,, নীরোজ বিশ্বাস দ্বিগবিজয় দে সরকার, কোচবিহার ১৯৮৪, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৯।

১৭। বাবু রামচন্দ্র দাস, *রিপোর্ট অন দি স্টেটিসটিকস অব বঙ্গপুব ১৮৭২-৭৩*, দ্বিতীয় খন্ড, কলি ১৮৭, পৃঃ ১৪।

১৮। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪৯।

১৯। ওয়েসেলস, *আর্লি জেসুইট ট্রাভেলার্স ইন সেন্ট্রাল এশিয়া*, হেগ্‌ ১৯২৪, পৃঃ ১২৮।

২০। *তাভিনিয়ার্স ট্রাভেলস ইন ইন্ডিযা*, সম্পা ভি. বল, ভলি দ্বিতীয় লন্ডন, ১৯২৫, পৃপৃ ২৮১ এ২৮।

২১। শ্যামল চন্দ্র গুহ রায়, *স্টাডি অব সাম এ্যাস্পেক্ট অব দি হিস্ট্রী অব কামতা-কোচবিহার।* অপ্রকাশিত পি.এইচ, থিসির্স, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃঃ ২২৭।
২২। ই. এ. গেইট, *হিস্ট্রি অব আসাম,* কলিকাতা ১৯০৬, পৃঃ ১৬৫।
২৩। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ২৫০।
২৪। *অসীম কুমার রায়, বঙ্গবৃত্তান্ত,* কলিকাতা ১৯৮৮, পৃ ১৩৪।
২৫। এম. কে ভুঁইয়া, *উয়েভিং ইন আসাম,* ইন মর্ডান রিভিয়্যু, ১৯৪৮, পৃঃ ৪৬৫।
২৬। *কথা গুরু চরিত* সম্পা, ইউ. সি. লেখারা, নলবাড়ি, ১৯৫২, পৃ ৮৬।
২৭। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৫১।
২৮। ঐ, পৃঃ ১৫০।
২৯। *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটেয়ার্স,* কোচবিহার দুর্গাদাস মজুমদার, সম্পা পৃঃ ৮৫, কলি ১৯৭৭।
৩০। পার্থ সেন, *ষ্টাডি অব সাম এ্যাস্পেক্ট অব দি হিস্ট্রি অব কামতা কোচবিহার সিন্স* ১৭৭২, *টু দি অ্যাকসেসন অব শিবেন্দ্রনারায়ণ,* অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি থিসিস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃপৃঃ ১৪১-৪৩।
৩১। ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত.* পৃ ১৯।
৩২। ঐ, পৃ ১৯।
৩৩। ডি. নাথ *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৫১।
৩৪। ঐ. পৃঃ ১৫২।
৩৫। ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ২০।
৩৬। *ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া,* পৃঃ ৩৮৫।
৩৭। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৫৪।
৩৮। ঐ, পৃঃ ১৫৪।
৩৯। অসীম রায়, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৩৪।
৪০। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃপৃঃ ১৫৪-১৫৫।
৪১। অসীম রায়, *পূর্বোক্ত,* ১৩৪।
৪২। ডি. নাথ. *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ১৫০।
৪৩। খাঁন চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ ৫৩।
৪৪। *রিপোর্ট অন ভুটান,* পেম্বারটন, কলি ১৮৩৯, পৃ ৪৯১।
৪৫। *ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার্স, রঙ্গপুর,* জে.এ, ভাস (সম্পা), এলাহাবাদ, ১৯১১, পৃ-৯৪।
৪৬। ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ২১।
৪৭। জে. এ. ভাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।
৪৮। এইচ. এন. চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২।
৪৯। খাঁন চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।
৫০। এম নিয়োগ, *শঙ্কর এ্যান্ড হিস টাইমস,* গৌহাটী, ১৯৬৫, পৃ ৭৯।
৫১। ডি. নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃ: ১৫৭-১৫৮।

৫২। অসীম রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৩৪ এবং দ্রষ্টব্য ই. এ. গেইট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯।
৫৩। ডি. নাথ. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৭।
৫৪। এইচ. এন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫২।
৫৫। ডি. নাথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।
৫৬। *কোচবিহার সিলেকট রেকর্ডস*, ভলি দ্বিতীয়, পৃঃ ৪৫।
৫৭। ডি. নাথ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।
৫৮। এম. নিয়োগ, পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৮।
৫৯। অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃপৃ ৪৯৩-৯৪।
৬০। দুর্গাদাস মজুমদার পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।
৬১। অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯১-৪৯২।
৬২। ঐ, পৃ পৃপৃ ৪৯২।
৬৩। সুশীল চৌধুরী, *ট্রেড এ্যান্ড কমার্সিয়াল অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গল*, (১৬৫০-১৭২০), কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ৯৫-৯৬।
৬৪। অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮৭।
৬৫। ঐ, পৃ ৪৮৭।
৬৬। এম. নিয়োগ, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮।
৬৭। অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃপৃ ৪৯৪-৯৫।

মধ্যযুগীয় বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ প্রযুক্তিগত প্রভাব

ইমতিয়াজ আহমদ

১২০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সময়কালকে বাংলায় মধ্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচশত বছরের বাংলা প্রধানত দুটি শাসনকালে বিভক্ত ঃ সুলতানি এবং মোগল শাসন। সুলতানি বাংলা এবং মোগল বাংলার সীমানা প্রায় অভিন্ন ছিল। প্রখ্যাত মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলার যে সীমানা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে গঠিত অঞ্চলটি সুলতানি বাংলা এবং সুবা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল মোগল বাংলার সীমানা উল্লেখ করে বলেন, সুবা বাংলা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম হতে তেলিয়াগড় পর্যন্ত চারশ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে হুগলি জেলার মান্দারণ পর্যন্ত দুশো ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তিনি আরো বলেন যে, সুবা বাংলা পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল।[১] সুলতানি ও মোগল বাংলায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল। ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদগণ বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, স্বাধীন সুলতানি আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮) এবং মোগল আমলে (১৫৭৬-১৭৫৭) এদেশের শস্যসম্পদ, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি এবং শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশকে একটি ধনসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশে পরিণত করেছিল।[২] অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নিরাপদ রাস্তাঘাট, পণ্যের উচ্চ মান এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্থাপিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৩] এতদসত্ত্বেও প্রযুক্তিগত অবস্থা তথা কারিগরি অবস্থার উন্নয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১. কৃষি

কারিগরি উন্নয়ন প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে কৃষি উৎপাদনের কথা চলে আসে। অসংখ্য নদীবাহিত

ও মৌসুমি বায়ু বলয়ভুক্ত এদেশ প্রাচীনকাল থেকে কৃষি সমৃদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের ভারতে সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়। জল উত্তোলনের জন্য টিনের চোঙের পরিবর্তে ফার্সি চাকার প্রবর্তন করা হয়। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে বাংলাদেশেও অনুরূপ চাকার প্রচলনের কথা জানা যায়।[৪] নদীর স্রোত দ্বারা এ চাকা চালিত হতো। নতুন কারিগরিসম্পন্ন এই চাকার প্রবর্তনের ফলে ব্যাপক পরিমাণে অব্যবহৃত ও অকর্ষিত জমি সেচযুক্ত চাষের আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। আবুল ফজল উল্লেখ করেন, এদেশের জমি এত উর্বর যে, একই জমিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়, ধান গাছের ডগাগুলো এক রাত্রে এক হাত বেড়ে উঠে।[৫] এ বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয়। মোগল রাজদরবারের ঐতিহাসিক বাংলার জমির অসাধারণ উর্বরতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে তুলে ধরেছেন। ইবন বতুতা থেকে বার্ণিয়ের পর্যন্ত যে সব বিদেশি পর্যটক মধ্যযুগীয় বাংলায় এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই বাংলার জমির উর্বরতা এবং বিপুল ফসল উৎপাদনের কথা বলেছেন। ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ের উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে ধান, চাল এত বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, পার্শ্ববর্তী এবং দূরের দেশসমূহে এখান থেকে ধান রপ্তানি করা হয়ে থাকে। গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে নৌকাভরা ধান রপ্তানি হয় পাটনায় এবং সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে, মুসলিপট্টমে ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে যায়।[৬] তাছাড়া সিংহল এবং মালদ্বীপেও বাংলাদেশ থেকে ধান চাল রপ্তানি হতো। কবি কৃষ্ণদাসের 'কমলামঙ্গল' এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে এদেশে উৎপন্ন হতো এমন শতাধিক জাতের ধানের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[৭]

২.

মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির পরেই ছিল শিল্পের অবস্থান। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প প্রধান ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই মসলিন ও অন্যান্য চিকন সূতি বস্ত্রের জন্য এদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে বাংলায় দুকুল (খুব নরম এবং সাদা, সম্ভবত মসলিন), পত্রোর্ণ (চিকন বস্ত্র), এবং ক্ষৌম (মোটা বস্ত্র) উৎপন্ন হওয়ার কথা অবগত হওয়া যায়।[৮] পেরিপ্লাস গ্রন্থে গঙ্গা নদীর তীরে গাঙ্গেয় বন্দর থেকে ইউরোপে মসলিন কাপড় রপ্তানির কথা বলা হয়েছে।[৯] নবম শতাব্দীর আরব বণিক সুলাইমান ও দশম শতাব্দীর ইবনে খুরদাদবিহ্ ভারতের রহমি দেশে উন্নত কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক গবেষকগণ রহমি দেশকে প্রাচীন বঙ্গ দেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[১০]

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে মসলিন এবং নানা ধরনের মোটা বস্ত্র তৈরি হলেও এর বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভাবে কারখানাগুলোর

উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি ছিল বলে মনে হয় না। বাংলায় বস্ত্রশিল্পে এই শূন্যতা পূরণ হয় মধ্যযুগে। বাংলার সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় চরকা, তুলা ধুনন যন্ত্র প্রভৃতি নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রচলন ঘটে। বিভিন্ন শহরে, বন্দরে ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয়ে থাকে, বাংলার এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে শিশু বা বয়স্ক লোকেরা কাপড় তৈরিতে হাত লাগাতো না।[১১]

বাংলার বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নতির ছোঁয়া লাগে 'চরকা' প্রবর্তনের মাধ্যমে। পারসিক 'চরখহ' থেকে বাংলা চরকা শব্দটির উৎপত্তি।[১২] মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় চরকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরই যে পারস্য থেকে এ অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পে ঐ নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটে তা সিদ্ধান্ত করা যায়। উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর পারস্য থেকে আমির-ওমরাহগণের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিল্পী-কারিগরদেরও আগমণ ঘটে। তাদের মাধ্যমেই রাজধানী দিল্লীসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত কলকারখানায় নানা রকম পারসিক প্রযুক্তির প্রচলন ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে চরকার প্রচলন হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ভারতের অন্যতম প্রদেশ বাংলাতেও সম্ভবত একই সময় চরকায় প্রচলন শুরু হয়। পর্তুগিজ পর্যটক বার্বোসার বিবরণে বাংলায় চরকায় সুতা কেটে বস্ত্র বয়নের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[১৩] চরকায় অবশ্য তকলি বা টাকুর ন্যায় সুক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করা যেত না, মোটা ও মাঝারি বস্ত্র তৈরি হতো, কিন্তু এর উৎপাদন ক্ষমতা তকলি বা টাকুর তুলনায় ৫/৬ গুণ বেশি ছিল।

মধ্যযুগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হচ্ছে ধুনন যন্ত্র। বাংলায় এই যন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে সাধারণত লাঠি বা কাঠি দিয়ে তুলা ধুনা ও পরিষ্কার করা হতো। তুলাধুনন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে দ্রুত তুলা পরিষ্কার করা ও পেঁজার কাজ সম্পন্ন হতো। তুলাধুনন যন্ত্রের প্রচলন ছিল পারস্যে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চতুর্দশ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষের কোথাও তুলাধুনন যন্ত্রেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে পারস্য হতে যে এর আমদানি হয়েছিল তা অনুমিত হয়। ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদারও পারস্য থেকে তুলাধুনন যন্ত্রের আমদানি হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৪] একটি কাঠের কাঠামোর সঙ্গে যন্ত্র যোগ করে তৈরি একটি ধনুক এবং কাষ্ঠনির্মিত এক বা একাধিক রেস্তা বা মুগুর নিয়ে এ যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ হতো।[১৫] চরকা এবং ধুনন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে বাংলায় বস্ত্রশিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। চৌদ্দ শতক হতে সতের শতকের মধ্যে বাংলায় বস্ত্রের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে এর প্রকারভেদ এবং রঙের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় এবং চীনা পর্যটকদের বিবরণে বাংলার বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্তিগত প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া

যায়। চীনা গ্রন্থ 'য়িং-য়া শ্যং-ল্যান'[১৬] -এ বাংলায় পি-সিহ (প্রস্থ ৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৫৬ ফুট), মান-চে-তি (প্রস্থ ৪ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট), শা-না-পা-ফু (প্রস্থ ৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২০ ফুট), হিন-পেই-তুং-তা-লি (প্রস্থ ২ ফুট ৫/৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট), শা-ত-উর্‌হ্ (প্রস্থ ৪ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট), ম-হেই-ম-লেহ্ (প্রস্থ ৪ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২০ ফুট) নামক ছয় প্রকারের সুক্ষ্ম তুলার কাপড় উৎপন্ন হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।[১৭] পর্তুগিজ পর্যটক বারবোসা বাংলার বয়নশিল্প সম্পর্কে উল্লেখ করেন, এদেশে প্রচুর সুতা আছে। তাবা সূক্ষ্ম ও চিকন অনেক প্রকারের বস্ত্র তৈরি করে। এ সব বস্ত্র তারা নিজেদের ব্যবহারেব জন্য বঙিন করে এবং ব্যবসায়ের জন্য সাদা রাখে।[১৮]

সূতি বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রেশম বস্ত্রের প্রযুক্তিগত উন্নয়নও মধ্যযুগীয় বাংলায় বিকাশ লাভ করেছিল। সুলতানি যুগের আগে এদেশে রেশমের জন্য গুটি পোকার চাষ হতো না। বন্য গাছপালা থেকে রেশমের গুটি সংগ্রহ করা হতো।[১৯] পনের শতকের গোড়ার দিকে চৈনিক বিবরণে প্রথম বাংলায় তুঁত গাছে রেশম কীট পালন এবং গুটি তৈরির প্রক্রিয়ার কথা জানা যায়।[২০] উল্লিখিত তথ্য থেকে সুলতানিযুগে বাংলাতে তুঁত গাছ থেকে রেশম গুটি উৎপাদনের বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। রেশম কীটের লালন এবং মুগা বা রেশমি সুতা তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন হলে বাংলায় রেশম সুতা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। গুজরাটেব কাম্বে, আহমদাবাদ ও সুরাটে বাংলা থেকে প্রেবিত অপরিমার্জিত সুতা দিয়ে মার্জিত রেশম তৈবি হতো।[২১] কাঁচামালের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যই পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে এদেশে রেশম শিল্প প্রায় পরোপুরিভাবে বিকাশ লাভ করে।

বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চিনি অন্যতম ছিল। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে বাংলায় ইক্ষুর চাষ, চিনি তৈরি এবং বিদেশে রপ্তানি সম্পর্কে জানা যায়। উৎপাদন শিল্পের এই শাখাটির সাফল্য এত ব্যাপক ছিল যে, আখের চাষ এবং চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া অধ্যয়নের জন্য সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীন সম্রাট তাই সুং (৬২৭-৬৫০খ্রি.) বিহারে একদল চীনা ছাত্রকে প্রেরণ করেছিলেন।[২২] সুলতানিযুগে এ শিল্পটির পদ্ধতিগত আরো বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন ধরনেব চিনির উৎপাদন শুরু হয়। এ সময় লাল চিনি ছাড়াও সাদা চিনি এবং দানাবাঁধা চিনি (মিসরি) তৈরি হতো। কণার আকারে দানাবাঁধা মিসরি, চিনির শুভ্রতা আনয়ন এবং স্ফটিকীকরণ জাতীয় পেশাদারী শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে সুক্ষ্ম প্রকৌশলগত ক্রিয়া শক্তির প্রমাণ বহন করে।

সমকালীন বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে বাংলায় তৈরি চিনির গুণগত দিক এবং ভিন্নতার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। চীনা বিবরণে এদেশে দানাদার চিনি, সাদা চিনি এবং চিনির রস দিয়ে পাক করা নানা রকমের সংরক্ষিত ফলের কথা বলা হয়েছে।[২৩] বারবোসা

তাঁর বিবরণীতে এদেশে উন্নতমানের সাদা চিনি উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। বারবোসা বলেন যে, সে সময় চিনি ছিল বাংলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং এর আকার ছিল পাউডারের মত।[২৪] বার্ণিয়ের রচনাতেও বাংলায় উৎপাদিত চিনির ব্যাপক উৎপাদন এবং গুণগত মানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। বার্ণিয়ের বলেন, বাংলাদেশে রয়েছে চিনির প্রাচুর্য। গোলকুন্ডা, কর্ণাটকে এ চিনি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া মক্কা ও বসরা হয়ে এ চিনি আরব ও মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) এবং বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে যায়। নানা রকমের মিষ্টি উৎপাদনের জন্যও বাংলা বিখ্যাত বলে বার্ণিয়ের উল্লেখ করেছেন।[২৫]

১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলার উদ্বৃত্ত চিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, মালাবার, সুরাট, সিন্ধু ও ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে রপ্তানি হতো। বিদেশে এ চিনির রপ্তানি হতো মাসকট, মক্কা, জেদ্দা এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহে। এক তথ্যে জানা যায়, ইংরেজগণ কর্তৃক কলকাতা অধিকৃত হবার পূর্ববর্তী সময়ে (১৭৫৬খ্রি.) বাৎসরিক চিনি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ মন। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে যে সাধারণ ক্রমাবনতি ঘটে এবং পশ্চিম ভারতের বাজারে জাভায় উৎপাদিত চিনির যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তার ফলে এ লাভজনক ব্যবসায় ভাঁটা পড়ে।[২৬]

মধ্যযুগীয় বাংলার আর একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প ছিল কাগজ শিল্প। সম্ভবত চীনে প্রথম কাগজের প্রচলন হয়। তারপর আরব দেশসমূহে এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় কাগজের প্রচলন শুরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত চীনা পর্যটকদের বিবরণে গাছের ছাল থেকে হরিণের চামড়ার মত মসৃণ ও মোলায়েম কাগজ তৈরির কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২৭] ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিবরণীতে বাংলায় কাগজ তৈরির এরূপ তথ্য প্রকাশিত না থাকায় ধারণা করা যায়, সুলতানিযুগের প্রারম্ভে বাঙালিরা কাগজ তৈরির নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করেছিল। অন্যান্য বিবরণী থেকেও এই প্রযুক্তির আয়ত্বের কথা প্রতীয়মান হয়। হুসেইন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫১৯খ্রি.) একডালা দুর্গে তিন খন্ডে সহীহ বুখারির অনুলিখনের কাজ এবং নুসরৎ শাহের রাজত্বকালের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৫৩১-৩২ খ্রি. গৌড়ে ইরানি রীতিতে নিজামির ‘শরফনামা’র কয়েকটি অনুকাহিনীর চিত্রণের কথা মমতাজুর রহমান তরফদার উল্লেখ করেছেন।[২৮] এ তথ্য থেকে পনের ও ষোল শতাব্দীতে প্রথাসিদ্ধভাবে বাংলায় কাগজের ব্যবহার স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মধ্যযুগীয় বাংলায় জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তিরও উন্নতি ঘটে। প্রাচীনকাল থেকে বাঙালিরা সমুদ্রগামী জাতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। নদীমাতৃক, খাঁড়িপ্রধান, বারিবহুল এবং

বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশ এই বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌ অভিযান পরিচালনার জন্য নৌযান ও জাহাজের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রাচীন লিপিমালা বলতে এদেশে নৌকা ও জাহাজ তৈরির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৯]

বাংলায় সুলতানি শাসনের সুবাদে পশ্চিম এশিয়ার ও পূর্ব আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলে এদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশের পথে অগ্রগতি ঘটে। তাছাড়া ওলন্দাজ ঐতিহাসিকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন যে ক্রুসেড পরবর্তী আমলে রন্ধনকার্য, ঔষুধ তৈবি ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য রেনেসাঁকালীন ইউরোপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মোঙ্গলদের বাগদাদ ধ্বংসের ফলে বাগদাদের পথের পরিবর্তন হয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে লোহিত সাগর হয়ে গুজরাটের কাম্বে বন্দরের দিকে প্রলম্বিত হয়। লোহিত সাগরীয় পথটি পূর্ববর্তী পথ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এ পথে পশ্চিম এশীয় বণিকদের মাধ্যমে ইউরোপের পণ্য ব্যাপকভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসতে থাকে এবং অনুরূপভাবে এতদঞ্চলের মসলা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য ইউরোপে যেতে থাকে।[৩০] পশ্চিমে গুজরাটের কাম্বে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের প্রধান বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠে। বর্দ্ধিত বাণিজ্যপথের মাঝখানে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় আরব ও গুজরাটি বণিকদের পাশাপাশি বাঙালি বণিকদেরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। তাছাড়া তোমে পিরেসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বাংলায় ইরানি, ইতালীয়, তুর্কি ও আরব বণিকগণ এবং পশ্চিম ভারতের চৌল, দাভোল ও গোয়া থেকে আগত বণিক শ্রেণী বাংলায় বাস করতো।[৩১] মধ্যযুগে নৌশিল্পে কারিগরি ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল বলেই বাঙালি বণিকদের পক্ষে জাহাজযোগে বিশাল, উত্তাল সমুদ্র এবং ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত সম্ভব হয়েছিল।

বিভিন্ন পর্যটক, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বিবরণীতে মধ্যযুগীয় নৌকা-জাহাজের গঠনপ্রণালী, আকার-আয়তন প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মমতাজুর রহমান তরফদার অজ্ঞাতনামা এক পর্তুগিজ লেখকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, গঙ্গা নদীতে দৃশ্যমান বড় জাহাজগুলোর গলুই এর অংশগুলো পর্তুগিজ ও ল্যাটিন জাহাজের অনুরূপ অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। নৌযানগুলির ডেক ও উপরিকাঠামো ছিল, কিন্তু মাস্তুল ছিল না। জাহাজগুলো ছিল প্রশস্ত তলদেশবিশিষ্ট, আকারে বড় এবং অগভীর জলেও চলতে সক্ষম।[৩২] স্পেনীয় জাহাজের অলঙ্করণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছাঁচরেখা, চলমান দুই শত দাঁড়, সামনের গলুইসংলগ্ন ইউরোপীয় ধাচের খাম্বা এবং জাহাজের গায়ের বিভিন্ন অংশের চিত্রণ পর্তুগিজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৩৩] আবুল ফজল বলেছেন, সামরিক

কার্যে ও মালপত্র বহনের জন্য বাংলার জাহাজগুলো উপযোগী ছিল। মীরজুমলা আসাম আক্রমণের সময় (১৬৬২ খ্রি.) ২৪টি ক্ষুদ্র জলযান ছাড়াও প্রায় তিন শত বড় জাহাজ ব্যবহার করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী শিহাবউদ্দীন তালিশের বিবরণে কোসা, জলবা, গুরাব, পরিনদা, বজরা, পাতিলা, সালব, পালীল, ভরবালাম, খর্ৎগিরি, মহলগিরি প্রভৃতি জাহাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[৩৪] জাহাজগুলোর নাম দেখে এগুলোর মধ্যকার কতকগুলো যে বাণিজ্যিক পরিবহণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো তা অনুমিত হয়। বাংলার মোগলদের এই নৌবহরগুলো বাংলার তৈরি ছিল এবং নৌপ্রযুক্তিবিদগণও এদেশের লোক ছিলেন বলে ঐতিহাসিক তরফদার মত প্রকাশ করেছেন।[৩৫]

মঙ্গলকাব্য থেকেও মধ্যযুগীয় নৌশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়, যদিও ঐতিহাসিক বিচারের মানদণ্ডে এগুলোকে কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিদেশি পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের তথ্যের সঙ্গে পর্যালোচনা করে এসব কবি-সাহিত্যিকদের বর্ণনার ভিতরেও সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় এসব উৎসের উল্লেখ করা। অযৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। মঙ্গল কবিদের মধ্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দ, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রমুখদের বর্ণনায় বাংলার নৌশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। মঙ্গলকবিদের বর্ণনা অনুযায়ী জাহাজগুলো এমন বড় বড় হতো যে, এক একটি জাহাজ তৈরি করতে এক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতো। কাঁঠাল, পিয়াল, তাল, শাল, গাঁম্ভারি, দেবদারু প্রভৃতি কাঠ দিয়ে বাংলার নৌকা ও ডিঙাসমূহ (জাহাজ) তৈরি হতো। বণিকদের কোনো কোনো ডিঙা দৈর্ঘ্যে ২০০ হাত এবং প্রস্থে ৪০ হাত পর্যন্ত হতো। বড় আকারের জাহাজ গমনকালে বৃষ্টিপাত হলে যুগপৎভাবে কোনো জাহাজে বৃষ্টি, আবার কোনো জাহাজে রোদ পরিলক্ষিত হতো। নৌকাগুলোতে একাধিক কক্ষ থাকতো। এগুলোর কোনোটিতে জাহাজের মালিক, কোনোটিতে গাবর (নৌকা চালক), কাঁড়ারি (প্রধান মাঝি), মিরবহর (নৌকার প্রধান কর্মচারী), সুত্রধর (কারিগর) ডুবারী ও পাইক থাকতো। ডিঙাগুলোর ভিতরে ও বাইরে জলরোধক ব্যবস্থা থাকতো। ডেকের নিচে আবাসিক প্রয়োজনে কতকগুলো কক্ষ নির্মাণ করা হতো। জাহাজে মাস্তুলসংলগ্ন এলাকায় কম্পাস রাখার কক্ষ, প্রার্থনা কক্ষ, কেবিন, গুদাম ও রান্নাঘর থাকতো।[৩৬] বাণিজ্য এবং নৌবহরের কাজে ব্যবহৃত জাহাজের পৃথক পৃথক নাম থাকতো। যেমন, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জাহাজগুলোর নাম ছিল শশীমুখী, শঙ্খচুড়, গজকূল, মকরমুখী ইত্যাদি। আবার রণকাজে ব্যবহৃত জাহাজগুলোর নাম ছিল সর্বজয়া, রণজয়া, রণভূমি ইত্যাদি।[৩৭] অনেক জাহাজে কারখানা, তন্দুর ও বাজার থাকতো। জাহাজের আকার আকৃতি দেখে জাহাজগুলোর নাম রাখা হতো। যেমন যেসব জাহাজের গলুই চাঁদের মতো হত সেগুলোর নাম রাখা হতো শশীমুখী বা চন্দ্রমুখী,

আবার যেগুলোর আকার সিংহের মুখের মতো সেগুলোর নাম হতো সিংহমুখী। আকারে আয়তনে বড় জাহাজের যাত্রীরা বেশ কিছুকাল পরে একে অন্যাকে জানতে পারতো। এসব তথ্য মধ্য যুগে বাংলার নৌশিল্পের বিকাশকে যে স্পষ্ট করে তোলে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

৩. মুদ্রা

বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান মুদ্রা ব্যবস্থা। পাল ও সেন আমলে মুদ্রার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। লেনদেনের জন্য কড়ির ব্যবহার এবং পণ্যের বিনিময় হতো। বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সুলতানগণ মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চালু করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মোগলদের আধিপত্য স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার দিল্লির অধীনস্থ এবং স্বাধীন সুলতানগণ প্রায় প্রত্যেকে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রা ব্যবস্থা করেছিলেন। অঙ্কিত মুদ্রার অধিকাংশ ছিল রৌপ্য ও জিতলের (রৌপ্য ও তামার মিশ্রণে তৈরি মুদ্রা)। বাংলার সুলতানগণ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষেও অনেক সময় স্বর্ণের মুদ্রা অঙ্কন করতে দেখা যেতো। তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল বিরল ঘটনা।

বাংলায় প্রচলিত মুদ্রাসমূহ দিল্লী সুলতানগণের মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সুলতানি বাংলার মুদ্রাগুলোতে ধাতুর বিশুদ্ধতা সব সময়ই পরিলক্ষিত হতো। এর প্রধান কারণ ছিল, সম্ভবত বিদেশি বণিকদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা। বাংলায় প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, টাকা তৈরির জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কারিগরদের ধাতুবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব ও ছাঁচ ব্যবহারের কৌশলসহ বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হতো।[৩৮] মানসম্মত মুদ্রাধিক্যের ফলে লেনদেন সহজ হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

৪. স্থাপত্য

প্রাসাদ, দালানকোঠা ও সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে ভারতে দুটি উন্নত প্রযুক্তির আমদানি করা হয়। এ দুটি হলো কংক্রিট (চুন, বালি, সুরকি, পাথরকুচি প্রভৃতির সমন্বয়ে মিশ্রিত পদার্থ) এবং মর্টার (চুন, বালি ও জল মিশ্রিত সংযুক্তিকরণ মশলার পলেস্তারা)[৩৯]। কংক্রিট ও মর্টারের ব্যবহার বাংলার মত অঞ্চল যেখানে পাথর পাওয়া যায় না, সেখানে গৃহনির্মাণ শিল্পে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুলতানি ও মোগল আমলে বাংলায় তৈরি বিভিন্ন প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ, বুরুজ, দালানকোঠা প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রযুক্তি দুটোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আদিনা মসজিদ, চিকা মসজিদ, কোতওয়ালী দরওয়াজা, দাখিল দরওয়াজা, তাঁতীপাড়া মসজিদ, ফিরোজ মিনার, কদমরসুল ভবন, বড় সোনা

মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্য কর্মগুলো প্রধানত ইট ও চুনসুরকির মশলার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। চীনা রাজদূত ও পর্যটক ফেইসিন পান্ডুয়াতে সুলতানের রাজ প্রাসাদ ইট ও সুরকির গাঁথুনীতে এবং ঘরগুলোর অভ্যন্তরভাগ চুনকামকরা অবস্থায় দেখেন।[৪১] উন্নতমানের দালানকোঠা নির্মাণের ফলে শহর বন্দরগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নতমানের আবাসন সুবিধাও বৃদ্ধি পায়, যা উন্নত অর্থনীতির অন্যতম মাধ্যম ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যাপ্ত ও উন্নত আবাসন সুবিধা থাকায় বিদেশী বণিকরা এদেশে আসতে ও বসবাস করতে আগ্রহী হতো।

নগরায়ণ ব্যবস্থা বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম ছিল। হিন্দুযুগেও নগরায়ণ প্রথা গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে স্থাপিত শহরগুলোর মধ্যে উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধন (বগুড়ার মহাস্থান), ঢাকার নিকটে (মাজার), সুবর্ণগ্রাম ও বিক্রমপুর, কুমিল্লার কর্মান্ত, ফরিদপুরের কোটালীবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রাক-সুলতানি আমলে নির্মিত শহরগুলো কখনও সামরিক প্রয়োজনে, কখনও শাসনকার্যের সুবিধার্থে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে স্থান বিশেষের তীর্থ মহিমা থাকায় জনবসতি বিস্তার লাভ করে, পরে সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রও সৃষ্টি হয়।[৪২] পাহাড়পুর এবং ময়নামতির ধ্বংসাবশেষগুলো থেকে মনে হয়, ওগুলো এই শ্রেণীর শহরের ধ্বংসাবশেষ। মধ্যযুগে সুলতানি আমলে সামরিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় প্রয়োজন ছাড়াও শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। নগরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ছোটবড় অসংখ্য বন্দরেরও উদ্ভব ঘটে। ঐসময়কার নগর ও বন্দরগুলোর মধ্যে পান্ডুয়া, ফিরোজাবাদ, লখনৌতি, ফতেহাবাদ, মুয়াজ্জামাবাদ, সোনারগাঁ, সাতগাঁ, চাটগাঁ উল্লেখযোগ্য ছিল।

প্রাচীন আমলের ন্যায় মধ্যযুগেও নগরগুলো সাধারণত নদীর ধারে হতো, প্রত্যেকটি নগরই প্রাকারবেষ্ঠিত থাকতো এবং প্রাকারের পরেই পরিখা থাকতো। এসব নগরের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, রাস্তাঘাট থাকতো এবং এর সন্নিকটেই প্রার্থনা স্থান, বাজার ও উপযুক্ত স্থানে প্রমোদ-উদ্যান থাকতো। শহর ও বন্দরগুলোর বাড়িঘর, বাজার-হাট, দোকান-পাট, সবকিছু সৌন্দর্যমন্ডিত ও সুশৃঙ্খলভাবে থাকতো। ইবন বতুতা, মা হুয়ান, ফেইশিন, ভারথেমা, বারবোসা প্রমুখ - এর বিবরণী পাঠে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।[৪৩] নগরায়ণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাট বাজার বাণিজ্যকেন্দ্র প্রভৃতি অধিকহারে গড়ে উঠে যা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাটের উন্নতি, মূল্য তদারকির ব্যবস্থা প্রভৃতি সুলতানি শাসনামলে

দ্রব্যমূল্যের দাম কমিয়ে ও স্থিতিশীল রেখে সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রাকে সহজলোভ্য করে তোলে। ইবনে বতুতাসহ সমকালীন চীনা ও ইউরোপীয় পর্যটক এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এর সত্যতা মেলে। বাংলার উৎপাদিত দ্রব্যের সস্তাদাম ও সহজলভ্য জীবনের প্রতিফলন সমকালীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যগুলোতেও ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিগণ লেখেন যে, চৈতন্যের বিয়ে অনুষ্ঠান সামান্য কিছু কড়ি দিয়েই সম্পন্ন হয়, তথাপি এটাকে তাঁরা জাকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হিসাবে উল্লেখ করেন। কবি মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে জিনিসপত্রের মূল্য সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। একটি দাসীর বাজার করার কথা বলতে গিয়ে কবি লেখেন, দুর্বলা দাসী ৫০ কাহন (১০ তাম্র মুদ্রা) কড়ি নিয়ে বাজারে যায়। সে একটি লম্বা লাউ ও একটি কুমড়া কেনে ১০০ কড়িতে, এক ঝুড়ি আম কেনে ১০০ কড়িতে, একটি রুই ও অন্যান্য ধরনের মাছ যেমন চিতল, বোয়াল ও ৬৪১টি চিংড়ি কেনে। চতুরা দাসী একটি খাসী ছাগল কেনে ৮ কাহন কড়িতে এবং সে ১০ ঝুড়ি কড়ি সের দরে সরিষার তেল ক্রয় করে।

মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবন বাংলার অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়। কৃষিপণ্যের বিপুল উৎপাদন, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, মুদ্রার আধিক্য প্রভৃতির ফলে পণ্যের প্রাচুর্য, মূল্যস্বল্পতা ও সহজলোভ্যতা বাংলার জনগণের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে সমগ্র মুসলিম আমলে বাংলার কোথাও দুর্ভিক্ষ হয়নি। সমগ্র মধ্যযুগ এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বাংলাদেশকে সরকারী কাগজপত্রে ভারতের স্বর্গ বলা হয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। Abul Fazl, *The Ain-I-Akbari,* অনুবাদ H. S. Jarrett নিউ দিল্লী, তিন খন্ড, ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৩০।

২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, কলকাতা : ২য় খণ্ড, মধ্য যুগ (চতুর্থ সং, ১৯৮৭ পৃঃ ২১৬-২১৭।

৩। আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* দ্বিতীয় সং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩, পৃঃ ১৩২-১৩৩।

৪। Ibn Battuta, *Travels in Asia and Africa, 1325-1354,* অনুবাদ H. A. R. Gibb, London : ১৯৫৩, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ২৭১।

৫। আবুল ফজল, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩০।

৬। Francois Bernier, *Travels in the Mogol Empire : A D. 1556-1668,* অনুবাদ, এ. কনষ্টেবল।

৭। মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ ১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃঃ ২১০।

৮। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪০০, পৃঃ ১৪৭।

৯। তদেব।

১০। H. M. Elliot and Dowson, *The History of India, as told by its own Historians,* কলিকাতা। পুনর্মুদ্রণ, খণ্ড ১ পৃঃ ৩৬১।

১১। Robert Orme, Historical Fragments of the Moghal Empire, জে. পি. গুহ (সম্পাঃ), দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮, পৃঃ২৬৩।

১২। বাংলা একাডেমী *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান,* ২য় সং, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, চমন-চরৈবেতি, চরকা।

১৩। মমতাজুর রহামন তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী. ১৯৯৩, পৃঃ ১৩।

১৪। তদেব।

১৫। তদেব।

১৬। বিভিন্ন তথ্য এবং পর্যালোচনার ভিত্তিতে সুখময় মুখোপাধ্যায় 'য়িং-য়্যা শ্যং-লান' নামক গ্রন্থটির একাংশের লেখক মা হুয়ান এবং অপরাংশের লেখক কুও সুং লি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

১৭। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬),* ঢাকা ২০০০, পৃঃ ৬১৩-৬১৪।

১৮। এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, ১২০৩-১৫৭৬, (Social and Cultural History of Bengal, Vol. 1, 1203-1576) অনু, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, ৩৪৭।

১৯। আব্দুল্লাহ্ ফারুক, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৮।

২০। সুখময় মুখোপাধ্যায, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬১৪।

২১। M. R. Tarafadar, Trade, *Technology and Society in Medieval Bengal,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫, পৃঃ ৭২।

২২। ইফতেখার-উল-আউয়াল, "দেশী শিল্পের অবস্থা", সম্পা, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,* ২য় খণ্ড, *অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ২য় প্রকাশ, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০০, পৃঃ ৩৯৬।

২৩। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬১৩।

২৪। *তদেব,* পৃঃ ৬৩০, ইফতেখার-উল-আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৬।

২৫। বার্ণিয়ার, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪৩৬।

২৬। ইফতেখার-উল-আউয়াল, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৯৬।

২৭। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬১৪।

২৮। মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন,* পৃঃ ২৮।

২৯। নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৫২।

৩০। মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস* ও *ঐতিহাসিক,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ১৪২।

৩১। Tome Pires, *The Suma Oriental,* অনুঃ ও সম্পাঃ Armando Cortesao, Vol. II. লণ্ডন, ১৯৪৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭০-৭১।

৩২। মমতাজুর রহমান তরফদাব, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন,* পৃঃ ২৫।

৩৩। তদেব, পৃঃ ২৭।

৩৪। Blockmann, *Journal of The Asiatic Society of Bengal,* ১৮৭২, খণ্ড ৬১, পৃঃ ৭৩।

৩৫। মমতাজুর রহমান তরফদার, মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন, পৃঃ ২৭-২৮।

৩৬। *তদেব,* পৃঃ ২৭।

৩৭। ইমতিয়াজ আহমেদ, ''মধ্যযুগীয় বাংলায় নৌশিল্পের বিকাশ ঃ উৎস মঙ্গলকাব্য'', *সাহিত্যিকী,* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুস্ত্রিংশৎ খন্ড ঃ চৈত্র ১৪০৮, পৃঃ ৮০-৮৭।

৩৮। মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন,* পৃঃ ২৪।

৩৯। এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত,* ৩৬২।

৪০। কুমুদ রঞ্জন দাস, ''সুলতানি আমলে বাংলায় অর্থনৈতিক বিকাশ'', *ইতিহাস অনুসন্ধান ৮,* সম্পা, আব্দুল ওয়াহাব আহমুদ, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃঃ ৩২।

৪১। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬১৭।

৪২। আব্দুল্লাহ্ ফারুক, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১০-২১১।

৪৩। ইবন বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭-২৭১, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬১২, ৬১৭, ৬২৮-৬২৯।

১৭৩৭ সালে দক্ষিণ বাংলায় একটি ঝড় ঃ ফরাসী প্রতিবেদন

অনিরুদ্ধ রায়

এগারই অক্টোবর রাতে (ফরাসী ক্যালেন্ডার - ইংরাজী পয়লা অক্টোবর) দক্ষিণ বাংলায় অকস্মাৎ বিশাল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বহু লোক ও পশু নিহত হয়। বহু সংখ্যক জাহাজ ও নৌকা বিনষ্ট হয়। এখানে অপ্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শী ফরাসীদের চিঠিপত্র থেকে এই ঝড় ও ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়া যায় চন্দননগর থেকে ১৬ অক্টোবরের চিঠি থেকে। এতে বলা হচ্ছে যে ১১ অক্টোবর রাতে এক ভয়াবহ ঝড়ে চন্দননগরের সামনে নোঙর ফেলা জাহাজগুলির ক্ষতি হয়েছে। *ইউনিয়ো* জাহাজের সব মাস্তুল চলে গিয়েছে এবং এর অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়েছে ফলতার উপকূল থেকে। আগস্ট মাসে *বেনোয়া* জাহাজের ক্ষতি হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে সেটি কাদার মধ্যে ডুবে আছে।[১] *সেন্ট ফ্রাঁসোয়া* জাহাজ এর অনেকখানি অংশ রঙ্গফুলীর কাছে দেখা যাচ্ছে। তবে এই জাহাজের আটত্রিশ জন খালাসী ও অন্যান্য লোকেরা বেঁচে গিয়েছে। *গ্যানজেস* জাহাজের পাইলট লা চেনাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুপ্লেক্স দুদিন আগে একটি জাহাজ কিনেছিলেন, সেটি কলকাতার সামনে দাঁড়ানো ছিল। এটি পাড়ে আছড়ে পড়লেও অক্ষত অবস্থায় আছে। ইংরাজদের বাইশটা জাহাজের মধ্যে চারটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আরো দুটি ডুবে গিয়েছে। কলকাতায় ওলন্দাজদের চারটি জাহাজ ছিল, সম্ভবতঃ সবগুলিই রক্ষা পেয়েছে। মুসলমান বণিকরা কয়েকটি জাহাজ হারিয়েছে তাদের অর্থ ও মাল সমেত। প্রায় পঞ্চাশটি জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ে। ফরাসীদের ছোট জাহাজ ডিলিজেন্টকে একটা খালের মধ্যে পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুজন ছিল বালেশ্বর বন্দরে, তারাই কেবল বেঁচেছে। এদের সঙ্গে একজন পাইলটও ছিল। ঝড়ের ফলে একটা বড় সংখ্যক গ্রাম ধ্বংস হয়েছে এবং ডাঙায় পনের ফুট পর্য্যন্ত জল উঁচু হয়ে এসেছিল। অসংখ্য গবাদি ও অন্যান্য পশু সহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক জলে ডুবে গিয়েছে। অধিকাংশ বসতিতে কোন লোক নেই। কলকাতায় বহু ইঁটের বাড়ী পড়ে গিয়েছে। কোন কুঁড়েঘর বা কোন গাছ [illegible] নেই। তিনটি ফরাসী জাহাজ — *লিস, মৌর* ও *ট্রিটন* আগেই রওনা হয়ে

গিয়েছিল। তাদের কোন খবর এখনো আসেনি।[২] পরে জানা যায় যে ইংরাজরা ত্রিশটা ছোট বড় জাহাজ হারিয়েছে।'

এক ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় যেটি দুপ্লেক্সের চিঠি থেকে পৃথক। সেন্ট জর্জ নামে এই ফরাসী বলছেন যে জীবনে এরকম জোরালো ঝড় তিনি আর দেখেননি। পাঁচশ টনের দুটি ইংরাজ জাহাজ মাল সমেত ধ্বংস হয়েছে এবং ওদের একটি লোকও বাঁচেনি। এদের চারটি জাহাজের মধ্যে দুটি একেবারে ভেঙে গিয়েছে, আর দুটি মাল সমেত বালেশ্বরের খাঁড়িতে ধ্বংস হয়েছে। ওলন্দাজ কোম্পানীর চারটি জাহাজের মধ্যে দুটি ডুবে গিয়েছে এবং অন্য দুটি ফলতার বন্দরে ভেঙে পড়ে আছে। ফরাসী ডিরেক্টর দুপ্লেক্সের একটি জাহাজ কুলপীর দুই মাইল দূরে ডুবে গিয়েছে। কেবল মাত্র পনের জন লোক বেঁচেছে। ওদের মধ্যে একজন ছিলেন মাদাম দ্য সুরভিই এব ছেলে যে চন্দননগরে এসে ঐ জাহাজ আসার খবর দেয়। জেলেদের একটা ছোট নৌকায় একজন ছিল সে বেঁচে গিয়েছে এবং পরে একটা ছোট জায়গায় ঐ নৌকা নোঙর ফেলে। ঐ রাতের ঝড়ে সম্ভবত এই নদীতে দুহাজার নৌকা লোকজন সমেত ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েকটা জায়গায় জলোচ্ছাস প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হয়েছিল। ষাট টনের একটা নৌকা ডাঙায় প্রায় চার মাইল দূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিল এবং নদীর পাড়ের সব থেকে উঁচু গাছের উপর দিয়ে চলে যায়। নদী থেকে বহু দূরে পরে একটা ছশ টনের জাহাজ পাওয়া যায়। গ্রামের ভিতরে অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যে এটি ছিল। জলোচ্ছাসের ফলে সব জায়গাটাই একটা বিশাল সমুদ্রের মত মনে হচ্ছিল। পরের দিন নদীর পাড়ে একশ কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ মানুষের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং এগুলির মধ্যে মিশে রয়েছে অসংখ্য গরু, মোষ, ঘোড়া, বাঘ, এমনকি কুমীরের মৃতদেহ। চারপাশের সমস্ত জমিই মৃতদেহতে পরিপূর্ণ। কেবল চন্দননগরের বন্দরটি রক্ষা পেয়েছে। মাত্র তিনটি জাহাজেব কিছু ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের বেগ এত ছিল যে দুপ্লেক্সের জাহাজের মাস্তুল ও পাল চলে গিয়েছে। কুঠির বাগানের কয়েকটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। গোলগোথার (কলকাতা) দুশটি বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'''[৪]

আরো খবব আসতে থাকলে দুপ্লেক্স আর একটা বড় চিঠি লেখেন। বালেশ্বর বন্দরে একটি সুলুপ ও একটা ছোট নৌকা বেঁচে গিয়েছে। ঐ একই বন্দরে ফ্রাঁঙ্কেরী পরিচালিত *মৌর* জাহাজটিও বেঁচে গিয়েছে, যদিও এর মাস্তুল ও নোঙরের শিকল ছিঁড়ে গিয়েছে। *হোরো* ও *পন্ডিচেরী* জাহাজ দুটির বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কেবল ছিদ্র হয়ে জল ঢুকছে। *সেন্ট ফ্রাঁসোয়া* জাহাজটির অধ্যক্ষ ছিলেন লা রিভিয়ের। এটি রঙ্গফুলীর কাছে ডুবে গিয়েছে বলে খবর এসেছে। একজন পাইলট লা চেনাই ও একজন অফিসারকে পাওয়া যাচ্ছে না। আশীজনের মধ্যে আটত্রিশ জনকে বাঁচানো গিয়েছে।''' ফলতার ডিরেক্টর

জাহাজের মাত্র দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুপ্লেক্স ভেবে পাচ্ছিলেন না যে এর প্রতিকার তিনি কি ভাবে করবেন, কারণ চন্দননগরে মাত্র একটা সুলুপ ও দুজন পাইলট আছে। কয়েকজন মুসলমান বণিকের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, কারণ তারা নূতন কর এড়ানোর জন্য জাহাজ থেকে তাদের টাকাপয়সা আনেনি। এই নূতন কর বসানোর জন্য ফতেচাঁদ সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এদের ঐ জাহাজগুলি টাকা শুদ্ধ ডুবে গিয়েছে। এরা নিজাম-উল-মূলকের কাছে ফতেচাদেঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে রাজার টাঁকশাল আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।[৬] দুপ্লেক্সের মনে হয়েছিল যে এর ফলে দিল্লীতে নবাবের অবস্থা খারাপ হবে। এর কারণ এই যে গুজব ছড়িয়েছে যে নবাবকে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। নিজাম-উল-মূলক হচ্ছেন নবাবের প্রচন্ড শত্রু এবং নবাবকে ধ্বংস করার জন্য সব কিছু করবেন। এর ফলে হাজী আহমদ ও ফতেচাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবাব যে গোষ্ঠী তৈরী করেছেন, সেটি একটু বেকায়দায় পড়েছে।

দুপ্লেক্সের ঐ চিঠিতে ঝড়ের ফল কি হয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আরো কয়েকটি সমসাময়িক ফরাসী চিঠির সারাংশ নীচে দিচ্ছি।

দুপ্লেক্সের ৩০ নভেম্বর ১৭৩৭ সালের চিঠি থেকে জানা যায় যে ঐ ঝড়ের ফলে চাল ও অন্যান্য শস্যভর্তি জাহাজগুলি রওনা হতে পারছে না। কোম্পানীর জাহাজ *ফোর্ট সেন্ট লুই* একটা পাথরে ধাক্কা খেয়েছে। বহু চেষ্টার পর এটিকে হিজলী নদীতে নিয়ে আসা হয়েছে। ওখানে পাইলটরা ওকে রক্ষা করে। এই দুর্ঘটনার কথা শোনা মাত্র সাহায্য পাঠানো হয়েছিল। জাহাজটি অবশ্য দুভাগে ভেঙে গিয়েছিল এবং একে বাঁচানোর আর কোন আশা নেই। যা কিছু শস্য ও অন্য সামগ্রী ওর মধ্যে ছিল — চাল, গম, সোরা ইত্যাদি সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু কয়েক বাক্স মোম বেঁচেছে। সিনিয়র বেনোয়াও এই জাহাজে ছিলেন।[৭]

চন্দননগর জাহাজটি দুর্ঘটনা ছাড়াই আসতে পেরেছিল। খালাসীদের আর মনোবল নেই। জাহাজটিকে নদীর মোহনায় নিয়ে আসা হয়েছে। জাহাজের মধ্যে এক ফুটেরও বেশী জল। একটা বড় দুর্ঘটনা হত যদি জাহাজটি আরো বেশী সময় সমুদ্রে থাকত।[৮]

১১ থেকে ১২ অক্টোবরের তান্ডবে বরানগর থেকে "পামিয়ারের পয়েন্ট" পর্য্যন্ত যত জাহাজ ছিল সব পাড়ে আছড়ে পড়েছে। কলকাতা সম্পূর্ণভাবে উথাল পাতাল হয়ে গিয়েছে। ঐ শহরের সব বাড়ী ভেঙে গিয়েছে। সমুদ্রের জল দশ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে পাড়ে এসেছিল। ফরাসীদের চারটে জাহাজ নদীতে ছিল। মসিয়ো দ্য ভিলনোভ ও তাঁর সহযোগীদের জাহাজ *লু ফ্রাঁসিস* তার দড়িদড়া ও অন্যান্য সব কিছু রঙ্গফুলীর কাছে হারিয়েছে। *ইউনিয়ো* বসোরা থেকে আসছিল। ফলতার কাছে পাড়ের উপরে গিয়ে পড়ে। সিনিয়র বেনোয়া একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে যান। একটা ইংরাজ জাহাজ

সবে এসেছিল। এটি সব লোক সমতে বেঁচে যায়। অন্যান্য সব জাহাজই এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিল। ঐ সব জাহাজগুলির সব মাস্তুলই ভেঙে গিয়েছে। ঐ একই দৃশ্য কুলপীতে দেখা যায়। ইউরোপগামী চারটি জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। বালেশ্বরের খাঁড়িতে দুটি জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। এই নদীতে এগারটা ইউরোপগামী জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। কেবল মাত্র দুটি জাহাজ ইউরোপে ফিরতে পারবে। ফলতাতে ওলন্দাজদের চারটি জাহাজ ডাঙায় উঠে পড়েছে। দুটি যাত্রা করতে পারবে, অন্য দুটির মাস্তুল ভেঙে গিয়েছে। কয়েকদিন হল এই দুটিকে কোনক্রমে চুঁচুড়াতে নিয়ে আসা হয়েছে। দুটির অবস্থা এত খারাপ যে আর কিছুই করা যাবে না।

ফরাসী কোম্পানীরও ক্ষতি হয়েছে। ঐ সব জাহাজের ক্ষতি ছাড়া বড় দুটো জাহাজের পাইলটদের পাওয়া যাচ্ছে না। এ বছরের জুলাই মাসে শেষ ঝড় হয়েছিল যখন *ফিলিবার্ট* জাহাজের ক্ষতি হয়, যদিও ঐ জাহাজের খালাসীদের বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। এবারকার ঝড়ে *ডিলিজেন্ট* জাহাজের ক্ষতি হয়েছে। দুজন ছাড়া সব মুসলমান খালাসী মারা গিয়েছে।[৯]

প্রথম জাহাজটির মাস্তুল চলে গেলেও জাহাজটিকে বাঁচানো গিয়েছিল। দ্বিতীয় জাহাজটিতে ছিলেন জাঁ দ্য রুট। এখনো পর্য্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আশা করা যায় যে এটা গঞ্জাম জেলার উপকূলে পড়েছে। দ্বিতীয় পাইলট লা চেনাই *ফ্রাঁসোয়া* জাহাজের সঙ্গে ডুবে গিয়েছেন। ঐ জাহাজে ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন সিনিয়র লা রিভিয়ের। এই দুজন দক্ষ পাইলটের মৃত্যু কোম্পানীর পক্ষে একটা বড় ক্ষতি। এরা প্রজা হিসাবে খুব ভালো ছিলেন। যাই হোক, "অন্যদের তুলনায় আমরা বেঁচে গিয়েছি।" ফরাসীদের তিনটি জাহাজ ডাঙায় উঠেছিল। ঐ গুলিকে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন এগুলি ফরাসী বন্দরে রয়েছে। মাস্তুলের কাজ চলছে, যাতে এগুলিকে যাত্রার জন্য তৈরী করা যায়।[১০]

কত অসংখ্য লোক ও পশু মারা গিয়েছে তা গণনা করা যায় না। গঙ্গার মোহনার পুরোটাই জলের তলায় চলে গিয়েছে। জাহাজগুলিকে উঁচু ডাঙার উপরে পাওয়া গিয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় বাঘ ও অনান্য পশুর মৃতদেহ দেখা যায়। বাতাসে মৃতদেহের গন্ধ এত বেশী ভাসছে যে জাহাজের উপরে কষ্টের সঙ্গে হাঁটা যায়। কত নৌকা ধ্বংস হয়েছে তা গণনার অতীত। এর ফলে জাহাজে মাল তোলা বা নামানোর জন্য কোন নৌকা পাওয়া যাচ্ছে না। "এ সব সত্ত্বেও আমরা আবারও বলছি যে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান এবং অন্যদের তুলনায় আমাদের ক্ষতি খুব সামান্য।" তবে এই বিশাল ক্ষতি থেকে কোম্পানীর লাভ হবে। কারণ এই সময়ে ইংরাজদের মাত্র তিনটা জাহাজ ও ওলন্দাজদের একটি মাত্র জাহাজ রয়েছে। এগুলিই এই বছর ওদের মাল নিয়ে ইউরোপে যাবে।[১১]

নভেম্বর মাসের শেষে *ওরিয়েন্ট* জাহাজ থেকে ব্রিটন জাহাজের ক্যাপ্টেন সেন্ট জর্জ একটি চিঠি লেখেন। এতে উনি লেখেন যে ভাঁটার টানের বিরুদ্ধে খালাসীদের সহযোগিতায় ওঁর জাহাজ গঙ্গা দিয়ে উঠে আসছিল। ১১ অক্টোবরের আগে পর্য্যন্ত উনি খারাপ কিছু পাননি। ঐ রাত থেকে বাতাসের জোর বাড়তে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এত জোরে বাতাস বইতে থাকে যে উনি এর আগে আর পাননি। চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, প্রায় ষাট মাইল পর্য্যন্ত, গঙ্গা নদী প্যারিসের সেইন নদীর মত বন্ধ হয়েছিল। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে পাঁচশো টনের দুটো ইংরাজ জাহাজ সব মাল সমেত ধ্বংস হয়েছে। একজন লোক মাত্র বেঁচে গিয়েছিল। ইংরাজদের চারটে বড় জাহাজের মধ্যে দুটি ছিল গোলগোথার (কলকাতা) সামনে ও দুটি ছিল কুলপীতে। এগুলি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গিয়েছে। বালেশ্বরের খাঁড়িতে এদের দুটি জাহাজ মাল সমেত ধ্বংস হয়েছে। ওলন্দাজদের দুটো জাহাজ ডুবে গিয়েছে এবং অন্য দুটি ফলতাতে ভেঙে পড়ে আছে। কুলপী থেকে দুমাইল উপরে মসিয়ো দুমোর একটা সুলুপ ধ্বংস হয়েছে। ও'র পনের জন লোক উদ্ধার পেয়েছে। মনে হচ্ছে এর মধ্যে একজন হচ্ছে মাদাম দ্য সুরভি'র ছেলে, যে চন্দননগরে এসেছিল জাহাজ আসার খবর নিয়ে। জেলেদের একটা ছোট নৌকা করে যখন সে যাচ্ছিল, তখন প্রচন্ড ঝড় তাকে ডাঙায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঐ নদীতে ঐ রাত্রেই প্রায় দুহাজার নৌকা ধ্বংস হয়েছে। অধিকাংশ নৌকাই মাল সমেত ডুবে গিয়েছে। ছেলেটি ভালো এবং ওঁর মার প্রার্থনার জন্য বেঁচে গিয়েছে।[১২] কোন কোন জায়গায় জল চল্লিশ ফুট অবধি উঁচু হয়ে উঠেছিল। দুশ টনের উপরে কয়েকটা নৌকা প্রায় চার মাইল ডাঙার মধ্যে চলে গিয়েছিল। ছশ টনের একটি জাহাজকে গ্রামের প্রায় আধ মাইলের কাছে পাওয়া গিয়েছে। এর চারপাশে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। প্রচন্ড ঝড়ে জল এতই উত্তাল হয়েছিল যে মনে হয়েছিল যেন সমুদ্র অশান্ত হয়ে আসছে। ১৩ সকালে দেখা যায় যে ডাঙার একশ কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ লোকের ও অগণিত পশুর, যেমন গরু, বলদ ইত্যাদি, ঢেকে রয়েছে। অনেক গন্ডার ও বাঘের মৃতদেহ দেখা যায়। সারা গ্রামাঞ্চলই মৃতদেহতে ভরা। এই রাতে চন্দননগর বন্দরই বেঁচে গিয়েছে। ফরাসীদের তিনটে জাহাজ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। এই প্রচন্ড ঝড়ে ফরাসী কুটির দেওয়ালের একটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। কলকাতার দুশটি বাড়ী পড়ে গিয়েছে, অনেকগুলির অবস্থা বেশ খারাপ।[১৩]

তিরিশে নভেম্বর ১৭৩৭ সালে চন্দননগর থেকে পন্ডিচেরীতে পাঠানো একটা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ঝড়ের খবর আগেই পাঠানো হয়েছে। এই ঝড়ের জন্য ফরাসীরা বিষন্ন হয়ে আছে। গঙ্গায় ঝড় আসে ১১ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে অকস্মাৎভাবে। এই ধরনের ঝড় ফরাসীরা আগে কখনো দেখেনি। এর ফলে

গঙ্গার জল দশ ফুট থেকে বিশ ফুট উঁচু হয়ে যায় কয়েকটা জায়গায় প্রধানত ফলতার দিকে। ওখানে যে জাহাজগুলি ছিল সেগুলি ডুবে যায়। একটা মালবাহী নৌকা অন্য একটা নৌকার উপরে উঠে যায়। ফরাসীদের অবশ্য বিশেষ দুর্ভাগ্য হয়নি। *ফ্রাঁসোয়া* জাহাজটি ধ্বংস হয়েছে। ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন লা রিভিয়ের প্রাণ হারিয়েছেন রঙ্গফুলীর দিকে যাবার পথে বালেশ্বরে দুটি নৌকা ডুবে গিয়েছে।

ফরাসীদের এখন মাত্র একটাই নৌকা মাল যাতায়াতের জন্য রয়েছে। পন্ডিচেরী একটি নৌকা চেয়েছিল। এই ঝড়ের ফলে ঐ নৌকা পাওয়া এখন অসম্ভব। পন্ডিচেরী *ট্রিটন* জাহাজ চন্দননগরে পাঠিয়েছিল। ঐ জাহাজের জন্য ফরাসীরা খুবই চিন্তিত হয়ে আছে। অনেক আগেই চন্দননগরে পৌছানো উচিত ছিল। পন্ডিচেরী *রেইন* জাহাজ পাঠিয়েছিল। সেটিও এসে পৌঁছায়নি এবং ফরাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।[১৪]

বুরবোঁ দ্বীপের অধ্যক্ষ লা বুর্দ্দোনের কাছে মসিয়ো দ্য ফ্রাঁঙ্কেরী একটা চিঠি পাঠিয়ে জানাচ্ছেন যে ভগবানের অসীম করুণায় উনি ঠিকমত এসেছেন। বলা যায় যে মানুষের স্মৃতিতে এই ধরনের ঝড় আর পাওয়া যায় না। চন্দননগরের সামনের জাহাজগুলো ছাড়া গঙ্গা নদীর বাকী সব জাহাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রিভিথেরের জাহাজটিও একেবারে ভেঙে গিয়েছে। দশটি ইংরাজ জাহাজের ক্ষতি হয়েছে। পাঁচটি ওলন্দাজ জাহাজের মধ্যে দুটির মাল নেবার ক্ষমতা নেই, বোদ্রানের অধীনে ছোট ফরাসী জাহাজ *ট্রিটন* বাঁচেনি, কারণ এ পর্য্যন্ত এর কথা শোনা যাচ্ছে না। যেটি বিস্ময়ের যে উনি ঝড়ের মধ্যে সাতফুট নাগাদ নোঙর করেছিলেন। কয়েকটির শিকল ছিঁড়ে গিয়েছে। দুটি বড় ইউরোপীয় জাহাজ, একটি পারস্য থেকে ও অন্যটি বোম্বাই থেকে আসছিল ও বালেশ্বরের খাঁড়িতে নোঙর ফেলেছিল। এ দুটিই ডুবে গিয়েছে। কেবল এদের কাঠগুলি জলে ভাসতে দেখা যায়। জাঁ দ্য রূট একটা নৌকায় ছিলেন, তাঁর কি হল জানা যাচ্ছে না। নদীতে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকা ডুবে গিয়েছে। কয়েকটা নৌকা ডাঙায় গাছের উপরে রয়েছে। গাছের ডালপালা কেটে এগুলি নামানো হয়েছে। এই অসাধারণ দুর্ভাগ্য থেকে কেবল চন্দননগর বেঁচে গিয়েছে। গোলগোথার (কলকাতা) বহু সংখ্যক বাড়ী পড়ে গিয়েছে এবং কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ মারা গিয়েছে। "আমি এই সব দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী"।[১৫]

১৭৩৭ সালের তিরিশে নভেম্বর চন্দননগর বুঁরবো দ্বীপে পাঠানো একটি চিঠিতে বলছে যে এগারই ও বারই অক্টোবর প্রচন্ড ঝড় আসে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম থেকে। এটি ওলন্দাজদের এখানকার কুঠি থেকে 'ফলতা পয়েন্ট' পর্য্যন্ত সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। "মানুষের স্মৃতিতে এরকম ঝড়ের কথা আর কখনো পাওয়া যায় না।" ফরাসীরা বেঁচে গেলেও ক্ষতি হয়েছে দ্য লা রিভিয়েরের অধীনে বসোরা থেকে আসা *ফ্রাঁসোয়া*

জাহাজ ডুবে গিয়েছে। ফরাসীদের এক পাইলট নৌকা করে রঙ্গফুলীর দিকে হচ্ছিল, সে হারিয়ে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ত্রিশ/বত্রিশ জন লোক, যারা জ্যাঁ দ্য রুটের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, মারা গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওদের কোন খোঁজ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফরাসীদের আরেকটা নৌকাও ডুবে গিয়েছে। যতগুলি ইউরোপীয় জাহাজ চন্দননগরে ছিল বেঁচে গিয়েছে। ফরাসীদের একটা মালবাহী নৌকার সব মাল নষ্ট হয়েছে। ইংরাজদের এগারটা ইউরোপীয় জাহাজ ছিল। এদের মধ্যে মাত্র দুটি যাত্রা করতে পারবে। কলকাতার বাড়ীগুলি ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। ঐ জায়গায় গঙ্গা দশ ফুট উঁচুতে উঠে যায়। অনান্য জায়গার কোথাও কোথাও জল বিশফুট পর্য্যন্ত উঠে যায়। ফরাসীদের ব্যক্তিগত যে কয়েকটি জাহাজ নদীতে ছিল সবগুলিই নষ্ট হয়েছে। এগুলি সবই ডুবে গিয়েছে। ঝড়ের কয়েকদিন আগে পন্ডিচেরী *ট্রিটন* জাহাজ পাঠিয়েছিল। এর জন্য ফরাসীরা চিন্তিত হয়ে আছে। এছাড়া পন্ডিচেরী *রেইন* জাহাজ চন্দননগরে পাঠিয়েছিল। তার জন্যও ফরাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ২৮ অক্টোবরের মধ্যে ফরাসীরা তাদের জাহাজগুলি যাত্রা করার মত অবস্থায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।[১৬]

ঝড়ের কিছুকাল পরে পন্ডিচেরী ও চন্দননগরের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৭৩৮ সালের আঠার ফেব্রুয়ারীর একটি চিঠিতে পন্ডিচেরী চন্দননগরকে ভর্ৎসনা করে বলে যে তারা ঝড়ের বিবরণ পেয়েছে ইংরাজদের কাছ থেকে। ১৯ ডিসেম্বর চন্দননগর থেকে লেখা চিঠি (এখন এ চিঠি পাওয়া যায় না) থেকে ঝড়ের সংবাদ জানতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে বিশদ বিবরণ ছিল না। এর থেকে মনে হয় যে তিরিশে নভেম্বর ১৭৩৭ সালে চন্দননগর থেকে লেখা চিঠি তারা পায় নি।[১৭] এরপর অবশ্য আর কোন চিঠিতে এ বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। বিশদ বিবরণ পন্ডিচেরী পেয়েছিল বিশে জানুয়ারী ১৭৩৮ সালে যখন *হোরো* জাহাজ পন্ডিচেরীতে এসে পৌছায়।[১৮]

এখানে বিভিন্ন ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণগুলি দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে ঐ সব বর্ণনার মধ্যে নানাধরনেব ফারাক রয়েছে। একটি চিঠিতে বলা হচ্ছে যে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন যে পঞ্চাশ হাজার লোক মারা গিয়েছে। ইংরাজদের কতগুলি জাহাজ ছিল সে সম্পর্কে ফরাসী চিঠিগুলি একমত নয়। এমনকি ওলন্দাজদের জাহাজের সংখ্যা নিয়েও একমত নয়। কিন্তু এই ঝড়ে দক্ষিণ বাংলার যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এ সম্বন্ধে সব ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শীই একমত। আশ্চার্য্যের বিষয় যে দুপ্লেক্স এর মধ্যে ভাবছেন যে এই ঝড়ের ফলে ফরাসী কোম্পানীর সুবিধা হয়েছে কারণ ইংরাজরা দুটি মাত্র জাহাজ মাল নিয়ে এবছর পাঠাতে পারবে ও ওলন্দাজরা একটিও পাঠাতে পারবে কিনা সন্দেহ। এর থেকে দুপ্লেক্স অনেক বেশী

চিন্তিত ছিলেন ফতেচাঁদ জগৎশেঠের কূটকৌশলের বিষয় নিয়ে, কারণ ফতেচাঁদ ফরাসীদের বাধা দিচ্ছে মুঘল টাঁকশালে সরাসরি রূপো নিয়ে মুঘল মুদ্রা তৈরী করার আদেশ পেতে।

ফরাসী কুঠির দেওয়ালের অংশবিশেষ ও কয়েকটি জাহাজের মাস্তুল ভাঙা বা নোঙরের শিকল ছেঁড়া ছাড়া ফরাসীদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। সেগুলি তারা কিছুদিনের মধ্যেই যাত্রা করার মত অবস্থায় নিয়ে আসে। ফরাসীরা তখন অনেক বেশী চিন্তিত ছিল মালবাহী নৌকা পাবার জন্য, কারণ প্রায় সব নৌকাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমনকি কোম্পানীর হতাহতের কোন তালিকা করেছিল বলে জানা যায় না। দুজন দক্ষ পাইলটকে পাওয়া যাচ্ছিল না, এটাই ফরাসীদের কাছে বিপর্য্যয় বলে মনে হচ্ছিল। কেবল সেন্ট জর্জের চিঠিতে মানবিকতার আভাষ পাওয়া যায়, যেটি দুপ্লেক্সের চিঠির মধ্যে নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়া সম্পর্কেও দুপ্লেক্সের চিঠি বেশ উদাসীন। বরঞ্চ অন্যদের দেখায় তার আভাষ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে বাঘ ও গন্ডার যে তখন দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর ছিল, তাদের মৃত্যুর বর্ণনা থেকে সেটা জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে গন্ডারের উপস্থিতি নিয়ে এক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী যা লিখেছেন[১৯] সে অবস্থা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত ছিল বলে ধরা যেতে পারে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর দক্ষিণবঙ্গে জঙ্গল কেটে বসতি করার প্রয়াস যে বিশেষ এগোয়নি সেটা বলা যায়।

নদীর পাড়ে স্বভাবতই জনসমাগম বেশী হলেও, মনে হয় কলকাতার নীচে ফলতা পর্য্যন্ত বসতি চলছিল, যদিও সেটি উপরের অংশের তুলনায় কম বলে মনে হয়। কলকাতা ছাড়িয়ে ঝড় আর উপরের অংশের বেশী ক্ষতি করেনি। এই ঝড়ের সঙ্গে যে জলোচ্ছ্বাস ছিল সেটাও পরিষ্কার। ফরাসী প্রতিবেদন থেকে মনে হয় বালেশ্বরেরও বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ঝড়ের তাণ্ডব ছিল প্রধানত কলকাতা থেকে ফলতা ছাড়িয়ে কিছুদূর পর্য্যন্ত। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের বর্ণনা এর সঙ্গে মিলালে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার আরো পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাবে। উল্লেখযোগ্য যে নিম্নবঙ্গে মুসলমানরাই যে প্রধান খালাসী ছিল তাব উল্লেখ আছে, যারা গ্রামাঞ্চলের থেকে আসছে। অন্যান্য বর্ণনা থেকে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর চেহারাটাও পাওয়া যাবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। *বিবলিওথেক নাশিওনাল* (প্যারিস), ফন্দ ফ্রাঁন্সে ৮৯৮০, দুপ্লেক্সের চিঠি পন্ডিচেরীকে, চন্দননগর, ১৬ অক্টোবর ১৭৩৭, ফোলিও ৪১ (এই তারিখ থেকে দশদিন কমালে ইংরাজী তারিখ পাওয়া যাবে)।

২। ঐ, দুপ্লেক্সের চিঠি মসিয়ো কোর্টকে, চন্দননগর, ১৬ অক্টোবর ১৭৩৭, ফোলিও ৪০-৪১।

৩। ঐ, দুপ্লেক্সের চিঠি রাভেটকে লেখা, চন্দননগর, ২২ অক্টোবর ১৭৩৭, ফোলিও ৪১খ।

৪। *আরচিভ দ্য মিনিস্টেয়ার দা এ্যফেয়ার ও এঞ্জের* (প্যারিস), ফন্দ অশি, খন্ড ৬, ফোলিও ১২-১৩।

৫। *বিবলিওথেক নাশিওনাল* (প্যারিস), ফন্দ ফাঁসে ১৯৮০, দুপ্লেক্সের চিঠি কাশিমবাজারে বুরাটকে লেখা, চন্দননগর, ২৩ অক্টোবর ১৭৩৭, ফোলিও ৪২।

৬। *আরচিভ নাশিওনাল ও কলোনীয়াল* (ফ্রান্স), চন্দননগর কাউন্সিল থেকে প্যারিসে কোম্পানীকে লেখ চিঠি, ৩০ নভেম্বর ১৭৩৭, ফোলিও ৩৯।

৭। ঐ, ফোলিও ৩৯-৩৯খ।

৮। ঐ, ফোলিও ৪০।

৯। ঐ, ফোলিও ৪১-৪১খ।

১০। ঐ, ফোলিও ৪২-৪২খ।

১১। ঐ, ফোলিও ৪২খ।

১২। ঐ, *লা ওরিয়েন্ট* জাহাজ থেকে লেখা মসিয়ো সেন্ট জর্জ এর চিঠি, ৩০শে নভেম্বর ১৭৩৭, ফোলিও ৪৪।

১৩। ঐ, ফোলিও ৪৪-৪৪খ।

১৪। ঐ, চন্দননগর খেকে পন্ডিচেরীকে লেখা চিঠি, ৩০শে নভেম্বর ১৭৩৭, ফোলিও ৪৫-৪৫খ।

১৫। ঐ, মসিয়ো দ্য লা ফ্রাঙ্কেরীর চিঠি লা বুরর্দ্দনকে, ৩০ নভেম্বর ১৭৩৭, ফোলিও ৪৫-৪৫খ।

১৬। ঐ, চন্দননগর থেকে বুরবঁ দ্বীপে লেখা চিঠি, ৩০ নভেম্বর ১৭৩৭, ফোলিও ৪৭-৪৭খ।

১৭। *করেসপন্ডস দু কনসাই সুপিরিয়র দ্য পন্ডিচেরী আভেব ল কনসাই দ্য চন্দননগর,* পন্ডিচেরী, ১৯১৫-১৬, তিন খণ্ড, খণ্ড দুই, (১৭৩৮-১৭৪৭), পন্ডিচেরী থেকে চন্দননগরকে লেখা চিঠি ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৭৩৮, পৃঃ ৩-৪।

১৮। ঐ, পৃঃ ৩।

১৯। টমাস বাউরী, *এ জিওগ্রাফিকাল একাউন্ট অফ কানট্রিস রাউন্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল,* ১৬৬৯-১৬৭৯, (আর. সি. টেম্পল সম্পাদিত), নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ২২০-২২২, যেখানে বিভিন্ন জন্তু ও গন্ডারের কথা বলছেন।

কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গ

ক্ষীরোদ চন্দ্র বর্মণ তপু

প্রাচীনকাল থেকে বাঙালী জাতি শৈল্পিক চেতনা প্রকাশের জন্য অন্যান্য উপাদানের ন্যায় মাটিকে[১] উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছে। বাংলার প্রাচীন সভ্যতায় পোড়ামাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যে মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলকে (Terracotta Plaque) বাঙালী মৃৎশিল্পের চরমোৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা হল কান্তজী মন্দির। ঐতিহাসিক মেহরার আলীর ভাষায়, কান্তজী মন্দিরে ব্যবহৃত অলঙ্কৃত পোড়ামাটির ফলকগুলি তৎকালীন বাংলার লোকায়ত শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন........কান্তজী মন্দিরের পর এমন সুন্দর শিল্পচাতুর্যপূর্ণ মন্দির বাংলাদেশে আর নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায় না।[২] বস্তুত যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির গৌরবে বাংলাদেশ বিশ্বে গৌরবান্বিত তার মধ্যে বাংলাদেশের মন্দির শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন 'কান্তজীর মন্দির' অগ্রগণ্য। চিরঅম্লান-স্থাপত্যকলা, বিচিত্রমূর্তি খচিত টেরাকোটায় সমগ্রগাত্র সুশোভিত, শিল্পশৌকর্যমণ্ডিত কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে রামায়ণ-মহাভারত-পৌরাণিক কাহিনীচিত্র, দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, নারী, পুরুষ, কিন্নর, ঋষি, যোগী, পুরোহিত, যোদ্ধা, শিকারী, গায়ক, বাদক, নর্তকী, গাছপালা, ফুলফল, লতাপাতা ছাড়াও মৃৎশিল্পীর প্রাত্যহিক দৃশ্যমান অভিজ্ঞতায় সমকালীন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানাদিক বিচিত্রভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকে আচ্ছাদিত কান্তজী মন্দির ধর্মীয় ভাবব্যঞ্জনায় তাৎপর্যপূর্ণ হলেও যুগপৎ সন্নিবেশিত তৎকালীন ইউরোপীয় আগন্তুকদের সম্বন্ধীয় পোড়ামাটির ফলকগুলি আমাদের বিস্মিত করে তোলে।

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসে এবং ব্যবসার নিমিত্তে বিভিন্নাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয়রা শুধু নবাগত বলেই নয়, তাদের অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বাংলার লৌকিক মানসকে আকৃষ্ট করেছিল গভীরভাবে, যার জন্য সমকালে লোক-শিল্পের প্রায় প্রতিটিক্ষেত্রেই উপস্থিতি ঘটে ইউরোপীয় ভাবধারা। কান্তজী মন্দিরে মৃৎশিল্পী ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও ইউরোপীয়দের অনুসঙ্গ পোড়ামাটির ফলকে উপস্থাপিত করে ইতিহাস ও

স্বদেশ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের ভাষায় '১৮ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত এই মন্দিরের ফলকচিত্র কলা ঐতিহাসিকগণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'[৩]

কান্তজী মন্দির বাংলাদেশের দিনাজপুর শহর থেকে একুশ কিলোমিটার উত্তরে ঢেপা নদীর পশ্চিম তীরে কান্তনগরে অবস্থিত। এ কারণে মন্দিরকে কান্তনগর মন্দির বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া মন্দিরের উপাস্য দেবতা 'কান্ত' (শ্রীকৃষ্ণ) বিধায় মন্দিরটি কান্ত মন্দির, কান্তজীর মন্দির বা কান্তজীউ মন্দির নামেও পরিচিত। দিনাজপুর গেজেটিয়ারের কথায়, মন্দিরযুগের কান্তনগরের চেয়েও অনেক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ছিল মহা অতীতের কান্তনগর। কিন্তু কান্তনগরের ঐতিহাসক গুরুত্বের চেয়ে শিল্পরীতি-পদ্ধতি ও পোড়ামাটির শিল্পে উপস্থাপিত সৌন্দর্যে কান্তজী মন্দির স্বীয় গুণ মাধুর্যে ভাস্বর ও বহুলালোচিত। কান্তজী মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন দিনাজপুরের তৎকালীন জমিদার মহারাজা প্রাণনাথ রায়। দিনাজপুর গেজেটিয়ারে মন্দির নির্মাণের আরম্ভকাল উল্লেখ করা হয়েছে ১৭০৪[৪] খ্রিষ্টাব্দ। অনেক বিশেষজ্ঞ ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দকে মন্দির নির্মাণের সূচনাকাল হিসেবে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভিত্তিদেশের উত্তর-পূর্ব কোণায় সংস্থাপিত নির্মাণ সম্পর্কিত শিলালিপি হতে কান্তজী মন্দিরের নির্মাণকার্যের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। শিলালিপির[৫] সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অনুবাদ হল — প্রাসাদতুল্য অতিরম্য সুরচিত নবরত্ন[৬] দেবালয়ের নির্মাণকার্য নৃপতি প্রাণনাথ কর্তৃক আরব্ধ হয়। রুক্মিণীকান্তের (শ্রীকৃষ্ণ) তুষ্টি (ও) পিতার সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্ত ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে) নৃপতি রামনাথ কান্তের নিজনগরে (কান্তনগর) কান্তের (শ্রীকৃষ্ণ) উদ্দেশ্যে এ মন্দির উৎসর্গ করেন।[৭] ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা স্বীকৃত যে দিনাজপুরের তৎকালীন জমিদার রাজা প্রাণনাথ রায় মূল কান্তজী মন্দিরের নির্মাণকার্য ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ করার পর পরলোক গমন করলে তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র (পোষ্যপুত্র?) রাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে আগত ইউরোপীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের নিমিত্তে বাংলায় ছড়িয়ে পড়েন। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার জন্য নিজস্ব রক্ষী বাহিনী ছিল। তাছাড়া নিজেদের সুরক্ষিত করার জন্য ইউরোপীয়রা দুর্গও গড়ে তোলে। ইউরোপীয় সৈন্যদের মার্চ করার দৃশ্য এবং বন্দুক দিয়ে পশু শিকার ইত্যাদি কার্যাবলীর মাধ্যমে তাদের শৌর্য-বীর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনায় ইউরোপীয়দের পারদর্শিতা ও সাহসিকতার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকরা এদেশীয় শাসকদের সেনাবাহিনীতে উচ্চ স্থানগুলি দখল করে। সৈনিক, যোদ্ধা হিসেবে তাদের বীরত্বের খ্যাতি সমকালে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার শাসকদের আনুগত্য লাভ করে প্রশাসনিক কাজকর্মে উচ্চ পদে আসীন হন অনেক ইউরোপীয়। এদেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্য

ইউরোপীয়দের করায়ত্ব হলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। দেশীয় শাসক, অভিজাতদের ন্যায় বিলাসবহুল জীবন-যাপন আরম্ভ করেন।

ইউরোপীয় বণিকদের সাথে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য খ্রিষ্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে। তাদের প্রভাবে বহুলোক খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এভাবে ইউরোপীয়রা এদেশে এসে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন যা লোক-মানসের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া তাদের নতুন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন-যাত্রা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার বাংলার লোক-মানসকে প্রভাবিত করেছিল। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির শিল্পে ধর্মীয় এবং বাংলার সমসাময়িক জীবনযাত্রার ফলকচিত্রের সাথে ইউরোপীয়দের ফলকচিত্রগুলির সহাবস্থানের কারণ সম্বন্ধে শ্রাবণী বসু লিখেছেন-'.. দেশীয় নবাবগণের মত তাঁরাও বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন, কাজেই গ্রামীণ জনগণের কাছে এরা শুধুমাত্র বণিক ব্যবসায়ী নন, তাদের চোখে ইউরোপীয়রা ক্ষমতাবান, আর্থিক সংগতিপূর্ণ এক একটি নবাব। কাজেই শিল্পীরা তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে নবাব বা রাজপুরুষের পাশাপাশি ইউরোপীয়গণকেও সমমর্যাদা দিয়ে ভাস্কর্যে (পোড়ামাটির ফলকে) জায়গা করে দিয়েছেন।'[৮]

ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ইউরোপ থেকে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তিও এদেশে আসে। তারা এ দেশবাসীর ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চালাত। দাস ব্যবসা, দস্যু-বৃত্তি ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি অপকর্মের জন্য বাঙালীরা তাদের ভয়ের ও ঘৃণার চোখে দেখতেন। মেহরার আলী লিখেছেন — 'বস্তুত যে যুগে কান্তজী মন্দির নির্মিত হয়, তখন সময়টা ছিল দস্যু বৃত্তিধারী ইউরোপীয় বণিকদের বাংলায় অনুপ্রবেশের যুগ। নামে মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া বিদেশী বণিকদের অন্যকর্ম ছিল শোষণ, লুণ্ঠন এবং নারী ধর্ষণ ইত্যাদি অমানবিক অপকর্ম যা, তৎকালীন বাংলার জনজীবনে ভয়ানক উৎপাত হয়ে দেখা দিয়েছিল।'[৯] বহু হিন্দু-মুসলমানকে বলপূর্বক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এক্ষেত্রে পর্তুগীজরা ছিল বেশি ভয়ঙ্কর। পর্তুগীজরা বাংলার ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। বহু নর-নারী, শিশুদের ধরে নিয়ে তারা দাক্ষিণাত্য ও ইউরোপীয় বাজারে বিক্রি করে দিতেন। পর্তুগীজ জলদস্যুদের বলা হত হার্মাদ। দস্যুরূপে জলপথে এদের বিক্রম ছিল প্রচণ্ড। এদের লুণ্ঠনের কবলে পতিত হয়ে অনেকে মালামাল এমনকি প্রাণও হারাত।

তাদের নৈতিক চরিত্রও ছিল নিম্নমানের। পুরুষ ইউরোপীয়দের তুলনায় নারী ইউরোপীয়দের সংখ্যা অপ্রতুল ছিল বিধায় এদেশীয় নারীদের সংসর্গ লাভের আকাঙ্খা তীব্র ছিল তাদের। এদেশীয় নারীদের নিয়ে অনেক ব্যাভিচারী কর্মকাণ্ডে তারা লিপ্ত হত।

তাদের ব্যভিচারী জীবন যাত্রার জন্য এদেশে ফিরিঙ্গ রোগের সৃষ্টি হয়।[১০] সমকালীন সাহিত্য ও ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাপ্ত ইউরোপীয়দের বাংলায় নিষ্ঠুর অত্যাচার, নির্মম বর্বরতা ও পাশবিক নির্যাতনের বিবরণগুলি আমাদের শিহরিত করে। তাদের নির্যাতন সমকালীন বাঙালী মৃৎশিল্পীদের সংবেদনশীল মনোজগতকে আলোড়িত করবে — এটাই স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য ইউরোপীয়দের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলার শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে বহুযুদ্ধে অগ্রসর হলেও তাদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনায় দক্ষতার নিকট জয়লাভ সম্ভব হয়নি। এমনি প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্পী ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে সমাজচেতনা জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলকে ইউরোপীয়দের স্থান দিয়ে স্বীয় অবস্থানে থেকে স্বদেশ-চেতনার ও দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত কান্তজী মন্দিরের দেয়ালে সংযোজিত পোড়ামাটির ফলকে ইউরোপীয়দের উৎকীর্ণ করে মৃৎশিল্পী যে সমাজ-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের অবিভূত করে। মেহরাব আলী বর্ণনা দিয়েছেন, 'মন্দিরের আর একটি আকর্ষণীয় চিত্রকর্ম হল পর্তুগীজ পোষাকধারী মনুষ্যচিত্র।[১১] ইউরোপীয়দের মূল উপজীবিকা ছিল ব্যবসা। তারা বড় বড় জাহাজে করে দ্রব্যাদি আমদানী-রপ্তানী করত। তাছাড়া যুদ্ধে জাহাজ ব্যবহার করে বীরত্ব দেখাত। ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ সৈনিক বহন করছে এরূপ দৃশ্য এ মন্দিরের ফলকচিত্রে দেখা যায়। সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈনিক ছাড়াও এদেশীয় সৈনিকদের সাথে ইউরোপীয় সৈনিকদের একত্রে কাজ করার দৃশ্য চিত্রায়নের প্রয়াস দেখা যায়। এরূপ একটি ফলকচিত্র সম্বন্ধে মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন লিখেছেন '... সেখানে একজন ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত মানুষকে মোগল পোশাক পরিহিত একজন পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে হাতিতে উঠতে দেখা যাচ্ছে।[১২] অভিজাত শ্রেণীর অবসর বিনোদন হিসেবে শিকার খুবই সমাদৃত ছিল। দেশীয় অভিজাতদের ন্যায় ইউরোপীয়রাও বিনোদন কর্ম হিসেবে পশুশিকার উপভোগ করত। কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে ইউরোপীয়দের পশু শিকারের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ হয়েছে। ইউরোপীয়দের পশুশিকার মৃৎশিল্পীদের মানস আকৃষ্ট করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন জুলেখা হক। দস্যুবৃত্তিধারী ইউরোপীয়দের অত্যাচার, উৎপাত ও লুণ্ঠন দেশীয়দের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ক্ষুব্ধ সমাজে বসবাসকারী মৃৎশিল্পীগণ সেই দস্যুদের অঙ্কন করেছেন কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে। মেহরাব আলী লিখেছেন, 'অন্তত ১৫টি দস্যু প্রকৃতির ইউরোপীয় মনুষ্যমূর্তি সম্বলিত টেরাকোটা মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত। উত্তর দেয়ালে বোম্বেটে দস্যু জাহাজ সম্বলিত টেরাকোটাও রয়েছে একাধিক।[১৩] ইউরোপীয়দের সাথে দেশবাসীর সান্নিধ্যের ফলে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় হয়। যেমন ইউরোপীয়রা বাংলার অভিজাত শ্রেণীর আদব-কায়দা নকল করতে থাকেন

ঠিক তেমনি ইউরোপীয়দের পোশাক-আচার-আচরণে দেশীয় অভিজাতরাও প্রভাবিত হন। ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত দেশীয়দের নানা ভঙ্গিমায় দেখা যায়। জমিদারসহ অভিজাতশ্রেণী, সৈন্য, রাজকর্মচারী প্রভৃতি শ্রেণীর এদেশীয়লোকদের ইউরোপীয় আঁটোশাটো শার্ট, প্যান্ট, ট্রাউজার, টুপী প্রভৃতি পোশাক পরিধৃত পোড়ামাটির ফলক দেখা যায় এ মন্দির গাত্রে। এ দেশীয়দের পরিধান হিসেবে ইউরোপীয় টুপীর ব্যবহার বেশী দেখা যায়। লম্বা পাইপে ধুমপানরত অবস্থায় একজন ইউরোপীয় সৈনিককে এ মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে চিত্রায়িত করেছেন মৃৎশিল্পী।[১৪]

ইউরোপীয়দের বিভিন্ন দিক কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে মৃৎশিল্পী সংস্থাপিত করলেও উক্ত ফলকগুলিতে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বতন্ত্র বৈশিষ্টগুলি অনুপস্থিত।[১৫] এটাও স্মর্তব্য মৃৎশিল্পীগণের পক্ষে বিদেশীদের জাতিগত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ করা প্রযুক্তিগতভাবে দুঃসাধ্য। কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে অনেক ফলক পরিদৃষ্ট হলেও এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সেইসব ফলকে উৎকীর্ণ ইউরোপীয়দের সকল প্রসঙ্গাবলীর আলোচনা করার অবকাশ নেই।

কান্তজী মন্দিরটি বিভিন্ন সময়ে ঝড়, ভূমিকম্প এবং দুষ্কৃতিকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবেষক, ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকগুলির বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হওয়া আবশ্যক। কেননা, পোড়ামাটির ফলকগুলি কালের বিবর্তনে ক্ষয় হচ্ছে, এতে আসল অবয়ব হারিয়ে যাচ্ছে।

পোড়ামাটির ফলকে সুসজ্জিত অনিন্দ্য সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল কান্তজী মন্দির যেমন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে স্বমহিমায় প্রশংসিত সেই তুলনায় সমকালীন সমাজ ও ইতিহাস সচেতন মৃৎশিল্পীর অঙ্কিত ইউরোপীয়দের প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী আলোচনা, গবেষণা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে বাংলায় ইউরোপীয়দের ইতিহাস আলোচনায় পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গাবলীর গুরুত্ব অনেক। এ দিক দিয়ে কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ইউরোপীয় বিষয়াবলী এবং মৃৎশিল্পীর ইতিহাস চেতনার গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ।

সূত্র-নির্দেশ

১। নীরু শামসুন্নাহারের প্রবন্ধ, "পোড়ামাটির ফলকে বাংলার লোকায়ত জীবনালেখ্য", সামিনা সুলতানা (সম্পাদিত), *ইতিহাস, সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে*" ঢাকা ঃ ২০০৩।

২। মেহরাব আলী "কান্ত মন্দির" ঢাকাঃ *ইতিহাস*, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬, পৃঃ ১৩৯।

৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম "মৃৎশিল্প ও বাংলাদেশ" ঢাকা ঃ *শিল্পকলা*, একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০১, পৃঃ ৫৫।

৪। মন্টোগোমারী মার্টিন এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, "In 1704 the first foundation was laid. In 1713 a larger building commenced and in 1722 the foundation of the finest part was begun." ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ভলিয়ম-৩, পৃঃ ৬২৮।

৫। একখণ্ড গাঢ় শিলাফলকে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি হল ঃ-
শ্রী শ্রী কান্ত ঃ
শাকে বেদাব্ধি কালক্ষিতি পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদঞ্চ্যতিরম্য সুরচিত নবরত্নাখ্য মস্মিন্ন কার্য্যাৎ।
রুক্মিণ্যা ঃ কান্ততুষ্টৌ সমুদিত মনসা রামনাথেন আজ্ঞা
দত্ত ঃ কান্তায় কান্তস্য তু নিজ নগরে তাত সংকল্প সিদ্ধৌ।
শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাখ্যার জন্য দেখুন মেহরার আলী রচিত *কান্তজীর মন্দির* এবং নাজিমউদ্দিন আহমদ রচিত *ইপিক স্টোরিস ইন টেরাকোটা ডিপিক্টেড অন কান্তনগর টেম্পল*, ঢাকা, ১৯৯০।

৬। চতুষ্কোণিক (৫২´x৫২´) ত্রিতল মন্দিরে প্রথম ও দ্বিতীয় তলার উপর চারটি করে এবং তৃতীয় তলার ছাদোপরি সর্বাপেক্ষা উঁচু চূড়াসহ নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিল বলে মন্দিরটি নবরত্ন মন্দির বলে খ্যাত। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরটির নয়টি চূড়াই ধ্বসে পড়ে নবরত্নাখ্য অলঙ্করণ বিনষ্ট হয়ে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের নবরত্ন মন্দিরের চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাংলাদেশ প্রত্ন সম্পদ*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ১২৭।

৮। শ্রাবণী বসু, "মধ্যযুগের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে ইউরোপীয়দের সমাজ জীবন," *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৬, কলকাতা, পৃঃ ১৬৬।

৯। মেহরাব আলী, কান্তজীর মন্দির (সংক্ষেপিত সংস্করণ), দিনাজপুর, ১৯৯৫, পৃঃ ১৬

১০। শ্রাবণী বসু, "সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ইউবোপীয়দের জীবন যাত্রা", ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, কলকাতা, পৃঃ ১৪৬।

১১। মেহরাব আলী, *কান্তজীর মন্দির*, দিনাজপুর, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৬।

১২। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন, "কান্তজীর মন্দির ঃ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ সমসাময়িক জীবন চিত্র", ড. শরীফ উদ্দীন (সম্পাদিত), দিনাজপুর ঃ *ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকাঃ ১৯৯৬, পৃঃ ৩৭৮।

১৩। মেহরাব আলী, *কান্তজীর মন্দির* (সংক্ষেপিত সংস্করণ), পৃঃ ১৬।

১৪। নাজিমউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

১৫। জুলেখা হক, *টেরাকোটা ডেকোরেশন অব লেট মেডিইভাল বেঙ্গল পট্রেয়াল অব এ. সোসাইটি*, ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮০ পৃঃ ৩৯-৪০।

প্রাক-আধুনিক ভারতে মন্দির অপবিত্রকরণ/লুণ্ঠন/ধ্বংসসাধন ঃ ইতিহাসের একটি বিতর্কিত অধ্যায়

অঞ্জন সাহা

সাম্প্রতিক কালে বাবরি মসজিদের ধ্বংসসাধন ও তৎপরবর্তী মন্দির রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আদি-মধ্যযুগীয় এবং মধ্যযুগীয় ভারতে মন্দির ধ্বংসসাধন/অপবিত্রকরণ, একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয়।

মুসলিম শাসকদের দ্বারা মন্দির ধ্বংসসাধন সংক্রান্ত যে সকল তথ্য সাধারণত "হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা" উপস্থাপিত করে থাকেন, (উদাহরণ ঃ- Sita Ram Goel, Hindu Temples . What Happened to them, খণ্ড ৩২, নিউ দিল্লী, ১৯৯০-৯১) তা প্রধানত হেনরি এলিয়ট ও জন ডাওসন কর্তৃক সম্পাদিত "History of India as told by its Own Historians" গ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮৪৯ খ্রিঃ) গ্রন্থটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের 'মহানুভবতা', 'ন্যায়-বিচার', ও 'সুদক্ষ শাসনপ্রণালীর' সাথে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের 'নিষ্ঠুরতা' ও 'বর্বরতার' মধ্যে প্রতিতুলনা এবং ভারতবাসীকে ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল সম্পর্কে সচেতন করা—যা গ্রন্থটির মুখবন্ধে স্পষ্টই প্রতিফলিত হয়েছে। তুর্ক-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে গজনীর সুলতান সবুক্তগীন ও মামুদ বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও মন্দির লুণ্ঠন করেছেন সত্য, কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল খুরাসানে তাদের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান অব্যাহত রাখা — ধর্মীয় উন্মাদনা নয়।[১] অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনী ছিল গজনীর সৈন্যবাহিনীর মেরুদন্ডস্বরূপ — মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে ঐ বাহিনীর উপযুক্ত অস্ত্রসজ্জা ও নিয়মিত বেতনদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হত ভারতবর্ষ এবং ইরানের সমৃদ্ধ নগরীগুলি লুণ্ঠনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ছিল গজনীর অর্থনীতির মূলভিত্তি।[২]

প্রকৃতপক্ষে মন্দির অপবিত্রকরণ/ধ্বংসসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর রাজনৈতিক

কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিনাশকে জনসমক্ষে প্রকটিত করা। আলোচ্য সময়কালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও ব্যবস্থাপনা, ঐশ্বরিক ও রাজকীয় কর্তৃত্বের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে উপস্থাপিত করত। মন্দিরগুলি ছিল ঈশ্বর এবং রাজার যৌথ সার্বভৌমত্বের প্রতীক। হিন্দু রাজবংশগুলির বৈধতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকত রাজকীয় মন্দিরের সাথে, যেখানে পূজিত হতেন রাষ্ট্রদেবতা (সাধারণত বিষ্ণু বা মহেশ্বর)। ঐ মন্দির লুণ্ঠিত বা অপবিত্র হলে সংশ্লিষ্ট রাজবংশের বৈধতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকের অবসান ঘটত।[২(ক)] আদি মধ্যযুগীয় ভারতে রাজা এবং রাজকীয় মন্দিরের নৈকট্যের প্রমাণ স্বরূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠ শতাব্দীতে বচিত বৃহৎ সংহিতার একটি স্তোত্র, যাতে বলা হয়েছে যে কোন শিবলিঙ্গ বা শিবমন্দির যদি আপাত দৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই গুরুতর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় অথবা ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হয়, তবে তা সংশ্লিষ্ট রাজা ও রাজ্যের আসন্ন ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী।[৩] অতএব রাজকীয় মন্দির ও বিগ্রহের লুণ্ঠন বা ধ্বংসসাধন, যার সূচনা হয়েছিল ষষ্ঠ/সপ্তম শতকে, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে চালুক্য রাজধানী বাতাপি থেকে একটি গণপতি বিগ্রহ লুণ্ঠিত হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পল্লব বংশের প্রথম নরসিংহ বর্মন কর্তৃক। অষ্টম শতকে কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের রাষ্ট্রদেবতা বিষ্ণু-বৈকুণ্ঠ বিগ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আক্রমণকারী পাল-সেনাবাহিনীর দ্বারা। নবম শতাব্দীতে পান্ড্য রাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ তাঁর রাজধানীতে একটি স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিস্থাপিত করেন, যেটি লুণ্ঠিত হয়েছিল তাঁর সিংহল দ্বীপ আক্রমণকালে। এমনকি তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পরও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে উদয়গিরির একটি বালকৃষ্ণ মূর্তি বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের লুণ্ঠনের শিকার হয়।[৪]

পূর্বোক্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের আক্রমণের বহু পূর্বেই রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত মন্দিরগুলি প্রায়শই শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হত। তুর্কী আক্রমণকারীরা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সেই প্রথাকেই অনুসরণ করেছেন মাত্র। দিল্লী সুলতানী ও মুঘল রাজত্বকালে, ১১৯২ থেকে ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে, সুনির্দিষ্টভাবে আশিটি মন্দির অপবিত্রকরণ/ধ্বংসসাধনের দৃষ্টান্ত চিহ্নিত করা সম্ভব, যেগুলির সত্যতা ঐতিহাসিক প্রমাণাদির দ্বারা স্বীকৃত।[৪ক] সাধারণভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটত সামরিক অধিনায়ক অথবা শাসন কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দেশে, যুদ্ধ বিগ্রহের সময়কালে। যেমন ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে তুঘলক বংশের শাসনকালে অন্ধ্রের ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় নরপতি দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেব সুলতানী সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করায় যুবরাজ জুনা তাঁকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করে রাজধানীর কেন্দ্রে অবস্থিত স্বয়ম্ভূশিব মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন।

অনুরূপ ভাবে ১৩৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফিরুজ শাহ্ তুঘলক উড়িষ্যা আক্রমণকালে (প্রতিপক্ষ তৃতীয় ভানুদেব) পুরীর প্রখ্যাত জগন্নাথ মন্দির অপবিত্র করেন।[৫]

অবশ্য তুলনীয় ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রথম তিন মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করেছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালে ক্ষমতা বিস্তারের সংগ্রামে মুঘলদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন আফগান শক্তি, যাঁরা কখনই উপাসনাগৃহকে রাজকীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক অথবা অংশভাগী রূপে স্বীকার করেননি, এবং সম্রাট আকবরের ধর্মসহিষ্ণুতা এবং ঔদার্যের মহান আদর্শ সমসাময়িক মানদণ্ডের বিচারে একান্তই দুর্লভ ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে আধিপত্য বিস্তারের বাসনায় মুঘল রাজশক্তি মন্দির ধ্বংসসাধনে দ্বিধান্বিত হয়নি। বাংলার সুবাদার এবং ঔরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে পার্শ্ববর্তী কোচবিহার রাজা ভীমনারায়ণের মন্দিরগুলির পূর্ণ ধ্বংসসাধন করেন, কেননা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ক্রমাগত নানা গোলযোগের সৃষ্টি করছিলেন।[৬] পরবৎসর আসামকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুঘল বাহিনী মীর জুমলার নেতৃত্বে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং তাঁর নির্দেশে গারহগাঁওয়ের বৃহৎ মন্দিরটি বিধ্বস্ত করে সেই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।[৭] কিন্তু মুঘল শাসনাধীন ভারতে মন্দির ধ্বংসসাধন/অপবিত্রকরণ প্রধানত সংশ্লিষ্ট শত্রুপক্ষীয় হিন্দু রাজাদের কর্তৃত্বের বৈধতার অবসানের উদ্দেশ্যে এবং নতুন শাসনতন্ত্র স্থাপনের লক্ষ্যে পরিচালিত হত, প্রজাপীড়নের উপলক্ষ্যে নয়। তাই কোচবিহারের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চলাকালীন সুবা বাংলার প্রধান কাজী সুপষ্ট ভাষায় আদেশ দেন যে, মুঘল সৈন্যরা অন্যায়ভাবে অকারণে সাধারণ প্রজাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে শাস্তিস্বরূপ তাদের অঙ্গচ্ছেদ করা হবে।[৮]

সঙ্গত কারণে প্রশ্নের অবকাশ আছে যে কোন অঞ্চল সেখানকার বাসিন্দাসমেত বিজয়ী রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হলে কি ঘটত? এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে ইসলামীয় রাষ্ট্রকাঠামো বাস্তববোধ ও দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় সাধারনত প্রাচীন মন্দিরসমূহের সুরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হত।[৮ক] যেমন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি লেখ অনুসারে ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের বিদর জেলার একটি শিবমন্দির ব্যাপকভাবে সংস্কারের আদেশ দেন এবং যার ফলে সেখানে পুনরায় নিয়মিতভাবে পূজার্চনা শুরু হয়, যা স্থানীয় গোলযোগের দরুন সাময়িকভাবে স্থাপিত ছিল।[৯] শুধুমাত্র তাই নয়, সুলতানের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে জিজিয়া প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তি মুসলিম শাসিত রাজ্যে মন্দির নির্মাণের অধিকারী।[১০] সুলতান সিকন্দর

লোদীর সমসাময়িক মুসলমান আইন বিশারদরাও প্রাচীন মন্দিরগুলি ধ্বংসসাধনের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

মুঘল যুগে সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও মুঘল রাজতান্ত্রিক আদর্শের মুখ্য স্থপতি আবুল ফজলের অভিমত এই সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য এবং একটি বৃহৎ বহু জাতি ধর্ম ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী। তাঁর মতে সুলতান মামুদের ভারতভূমি আক্রমণকালীন ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও লুণ্ঠনের জন্য প্রধানত দায়ী কিছু ধর্মোন্মাদ, যাঁরা ভারতবর্ষকে "ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটি বিধর্মীদের দেশ" হিসেবে উপস্থাপিত করে তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন।[১১] আকবরের রাজত্বকাল থেকে মুঘল রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত মন্দিরগুলি সম্রাটদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হত এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হত ঐ ধারণা অনুসারে। সম্রাট আকবর উচ্চপদস্থ রাজপুত রাজকর্মচারীদের তাঁদের কর্মস্থলে এমনকি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণের অনুমতিও প্রদান করেন, এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অম্বর রাজ মানসিংহের দ্বারা নির্মিত বৃন্দাবনের গোবিন্দ দেব মন্দির।[১২] সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বেনারসের হিন্দু মন্দিরগুলির ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সুরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য স্থানীয় মুঘল কর্মচারীদের লিখিত নির্দেশ দেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে শরিয়ত অনুসারে প্রাচীন মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন নিষিদ্ধ, যদিও তিনি নূতন মন্দির নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[১৩] নিঃসন্দেহে এটি আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতির সুস্পষ্ট বিচ্যুতি, অবশ্য ঐ আদেশনামা সত্ত্বেও ভারতের অন্যত্র বহু সংখ্যক নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছিল।[১৪] এমনকি যখন কোন পরাভূত রাজা বা তাঁর বংশধররা উত্তম রূপে বিজয়ী রাজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন, সেই পরিস্থিতিতেও সর্বদা আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকত তাঁদের সাথে সম্পর্কিত দেবালয়গুলির সুপ্ত রাজনৈতিক গুরুত্বের পুনরুজ্জীবনের — যাতে সেগুলি তাদের পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই মুসলিম শাসনাধীন রাজ্যে কোন পদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী আনুগত্যহীনতার লক্ষণ প্রদর্শন করলে শাস্তিস্বরূপ শাসন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে প্রায়শই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত দেবালয় অপবিত্র করা হত।[১৪ক] বিশেষত মন্দিরগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দরুন কোন বিদ্রোহী রাজকর্মচারী যদি মন্দির বিশেষের পৃষ্ঠপোষক হতেন, তবে সেক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষ মন্দিরটিকেও শাস্তিদানের উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করতেন। বিজাপুরের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী শাহজী ভোঁসলের পুত্র শিবাজী ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কোঙ্কন উপকূলস্থিত একটি দুর্গ বলপূর্বক অধিকার করায় বিজাপুর সুলতান যথার্থভাবেই ঘটনাটিকে একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য

করেন এবং তাঁকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন আফজল খান। কিন্তু শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে বিজাপুর সেনাপতি প্রথমে তুলজাপুর (ওসমানাবাদ, মহারাষ্ট্র) নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং দেবী ভবানীর প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির অপবিত্র করেন, কেননা তিনিই ছিলেন শিবাজীর আরাধ্যা দেবী।[১৫] ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মথুরা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে জাঠ সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদের সাথে সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত হন মথুরার ফৌজদার আবদুন নবি। এমতাবস্থায় বিদ্রোহী দলনেতা গোকলা একটি রক্তাক্ত যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হওয়ায় সম্রাটের আদেশে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় এবং মথুরার বীর সিং বুন্দেলার আনুকূল্যে নির্মিত কেশবদেব মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে সেই স্থলে একটি ইদগা নির্মিত হয়।[১৬] ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বিনষ্ট হয় ওরছায়া (টিকমগড়, মধ্যপ্রদেশ) অবস্থিত একটি অতি বৃহৎ মন্দির, কারণ এটির পৃষ্ঠপোষক বীর সিং বুন্দেলার পুত্র রাজা ঝুঝর সিং সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে বিদ্রোহী অথবা আনুগত্যবিহীন মুসলমান রাজকর্মচারীরা কিরূপ শাস্তি ভোগ করতেন? সাধারণভাবে বলা চলে যে, প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিণতি ছিল প্রাণদন্ড এবং অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হিসেবে তাঁদের পদাবনতি ঘটানো হত। যেমন ১৫৬৭ খ্রিঃ উজবেক বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বাহাদুর খান সম্রাট আকবরের নির্দেশে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন।[১৭] সুলতানী আমলেও গিয়াসউদ্দিন বলবন এবং মহম্মদ বিন তুঘলক যথাক্রমে বাংলাদেশে তুঘ্রিল খান এবং গুলবর্গায় বাহাউদ্দিন গুরসাপের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ অতি নির্মমভাবে দমন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তবে এই সকল ক্ষেত্রেও বিজয়ী শাসন কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত মসজিদ বা দরগাগুলিকে আক্রমণ থেকে অব্যাহতি দিতেন — কারণ শাসক ও শাসিত উভয়পক্ষই ইসলামীয় উপসনাস্থলগুলিকে রাজনৈতিক সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বহীন হিসেবেই স্বীকার করতেন।

মসজিদেব তাৎপর্য ছিল স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের রাজকীয় অনুগ্রহধন্য মন্দির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম শাসকেরা ইসলামীয় উপাসনালয়ের সাথে কোন অচ্ছেদ্য ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন না এবং একটি বিশেষ অঞ্চলে রাজকীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবেও জনমানসে তাদের আদৌ কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। অন্যদিকে প্রাক-আধুনিক যুগে হিন্দু রাজ-মন্দির পূজিত রাষ্ট্র-দেবতা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে রাজধানী নগরী পরিভ্রমণ করতেন, রাজা এবং রাজবংশীয়দের উপস্থিতিসহ। তাই রাজানুগ্রহপুষ্ট দেবালয়সমূহ শান্তি ও সমৃদ্ধির কালে যেমন রাজকীয় ছত্রচ্ছায়ায় সুরক্ষিত থাকত, যুদ্ধবিগ্রহ চলাকালীন সেগুলি প্রায়শই শত্রুসেনার আক্রমণের অন্যতম

লক্ষ্যে পরিণত হত। অপরপক্ষে ইসলামীয় উপাসনাস্থলগুলি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে সেগুলির অপবিত্রকরণ বা ধ্বংসসাধন পৃষ্ঠপোষক রাজবংশের ক্ষমতার অবলুপ্তির বার্তা বহন করত না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মসজিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সচেতন অবমাননা তুলনামূলকভাবে অতি বিরল দৃষ্টান্ত। যেমন, ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে রাণা ভীমসিংহ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গুজরাট আক্রমণ করেন এবং আমেদাবাদে অবস্থিত কিছু সংখ্যক মসজিদ ধ্বংস করেন।[১৮] এমনকি মুসলিম শাসনকে উৎখাত করে তথাকথিত হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়ও (উদাহরণ ঃ মারাঠা, বিজয়নগর) মসজিদ আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়নি, বরং বিজয়নগর সম্রাটরা তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত প্রভূত সংখ্যক মুসলমানের সুবিধার্থে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে মধ্য ও আদি মধ্যকালীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির ধ্বংসসাধন/অপবিত্রকরণ সংক্রান্ত ঘটনাবলী একটি সুনির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেছে—যা যথেষ্ট যুক্তিসংগত এবং আদৌ ধর্মান্ধতার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, বরং এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বাস্তববোধ। যার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যবর্তী তথাকথিত অনিবার্য "সভ্যতা সংক্রান্ত ব্যবধানের" (Civilisational Divide) ধারণাটিকে অনায়াসে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিদ্ধ করা সম্ভব।

সূত্র-নির্দেশ

১। C. E. Bosworth, *The Later Ghaznavids, Splendour and Decay : The Dynasty in Afghanistan and Northern India, 1040-1186,* নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃঃ ৩২-৬৮।

২। Satish Chandra, *Medieval India,* প্রথম খণ্ড, দিল্লী সুলতানাত, ১২০৬-১৫২৬, নিউ দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ২১-২২।

২ক। Richard M. Eaton, "Temple desecration in premodern India" in *Frontline,* খণ্ড ১৭, নং ২৫, ২২ ডিসেম্বর ২০০০, পৃঃ ৬৪।

৩। Richard H. Davis, *Lives of Indian Images,* দিল্লী, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৩।

৪। তদেব, পৃঃ ৫১-৮৩।

৪ক। তদেব, পৃঃ ৬৬, ৬৮, ৬৯।

৫। Henry M. Elliot & John Dowson, *History of India as Told by its Own Historians,* তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪।

৬। Khafi Khan, *History of Alamgir,* অনুবাদ S. Moinul Haq করাচী, ১৯৭৫, পৃঃ ১৪২-১৪৩।

৭। Jagadish Narayan Sarkar, *Life of Mir Jumla,* কলিকাতা, ১৯৫২।

৮। কাফী খান, প্রাগুক্ত।

৮ক। Richard M. Eaton, "Temple desecration" and Indo-Muslim states, *ফ্রন্টলাইন,* খণ্ড ১৭, নং ২৬, ৫ জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৭০।

৯। P. B. Desai, "Kalyan Inscription of Sultan Muhammad, Saka 1248", *Epigraphia Indica* 32, ১৯৫৭-৫৮, পৃঃ ১৬৫-১৬৮।

১০। Ibn Batuta, *Travels in Asia & Africa : 1324-1354,* অনুবাদ এইচ. এ. আর গিবস, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬, পৃঃ ২১৪।

১১। Abul Fazl, *The Ain-i-Akbari,* তৃতীয় খণ্ড, অনুবাদ এইচ. এস জ্যারেট, সম্পাদনা, যদুনাথ সরকার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯২৭, পৃঃ ৩৭৭।

১২। Catherine B. Asher, "The Architecture of Raja Man Singh : a Study of Sub-Imperial Patronage" in Barbara Stoler Miller (Ed.), *The Powers of Art : Patronage in Indian Calture,* অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৯২, পৃঃ ১৮৩-২০১।

১৩। *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* ১৯১১, পৃঃ ৬৮৯-৬৯০।

১৪। Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier : 1204-1760,* New Delhi অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭, পৃঃ ১৮৪-১৮৫, ২৬৩।

১৪ক। তদেব, পৃঃ ৭৪।

১৫। Surendranath Sen (Ed.) Siva Chatrapati কলিকাতা, ১৯২০, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯-১০।

১৬। Satish Chandra, *Medieval India,* দ্বিতীয় খণ্ড, মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬-১৭৪৮, নিউ দিল্লী, ২০০৩, পৃঃ ২৯০-২৯১।

১৭। তদেব, পৃঃ ১০২।

১৮। R. C. Majumdar (Ed.), *The Mughal Empire,* ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৭৪, পৃঃ ৫১।

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ও সূচনাকাল — একটি সমীক্ষা

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ও সূচনাকাল নিয়ে বির্তক আছে। অনেকে বলেছেন বঙ্গাব্দের প্রবর্তক আকবর বাদশা। পঞ্জিকাকাররাও এক সময় ঐ মত পোষণ করতেন এবং পঞ্জিকায়ও লেখা হত। সাধারণ মানুষজন এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। নয়ের দশকে (বাংলার ১৪০০ সন) ঐ বির্তক আবার শুরু হয়। এই বির্তক তোলার ব্যাপারে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অবদান ছিল। উপরোক্ত বিষয় নিয়ে তিনি পত্র পত্রিকায় লেখেন। অনেকেই তাকে সমর্থনও করেন। স্থানীয় পত্র পত্রিকা ছাড়া, তিনি *ওভারল্যান্ড দৈনিক পত্রিকা, দেশ* ও *উদ্বোধন পত্রিকাতেও* লেখেন। ১১ অগ্রহায়ণ ১৪০০ বঙ্গাব্দে *ওভারল্যান্ড পত্রিকার* চিঠিপত্রের কলামে প্রথম তিনি লেখেন। ৩ বৈশাখ, ১৪০১ বঙ্গাব্দে ঐ পত্রিকাতেই 'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক কে' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। *উদ্বোধন* পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যা, ১৪০২ ও *দেশ* পত্রিকার চিঠিপত্রের কলামে (জুন, ১৯৯৫) তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। ১৪০৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তিনি *বঙ্গাব্দের উৎসকথা* প্রকাশ করেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সকল আলোচনার মাধ্যমে দু'টি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

১) সম্রাট শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক

২) শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের সূচনা কালই বঙ্গাব্দের প্রবর্তনকাল।

বহু বিদগ্ধ মানুষ তাঁর মতকে সমর্থন করেছেন। এতে সর্বসাধারণের কাছে একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সত্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে যেতে পারে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রয়াস একেবারে মূল্যহীন বলা যাবে না। কেউ কেউ ওর সাথে এক মত হন নি। সুতরাং এখানে অন্য মত ও সিদ্ধান্ত নিয়েও আলোচনা করতে হবে। তাছাড়া আলোচ্য বিষয়টি একটি সমীক্ষা। আলোচনা দুটি পর্বে ভাগ করে করা হবে। প্রথম পর্ব হবে বঙ্গাব্দের প্রবর্তককে নিয়ে, দ্বিতীয় পর্বে হবে বঙ্গাব্দের সূচনাকাল নিয়ে।

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বিষয়ক আলোচনা ঃ এক সময় বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে আকবর বাদশাহের নাম সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের নামের পক্ষে কিছু কিছু মত আছে। কিন্তু বঙ্গাব্দের প্রবর্তকদের মধ্যে সর্বশেষ নাম যুক্ত হয়েছে রাজা শশাঙ্কের — যেটি প্রচারিত করেন সুনীল কুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু প্রত্যেকটি দাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি সহকারে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্তে পৌঁছানই হবে সব থেকে বড় কাজ।

কোন যুগ বা কাল সূচনার পিছনে সর্বদা একটা উদ্দেশ্য কাজ করে। সেইজন্য কোন মহান ব্যক্তির জন্ম দিন, বা তাঁর কর্মারম্ভের দিন-ক্ষণ দিয়ে করা হয় কোন যুগের সূচনা। এইভাবেই নির্দিষ্ট হয় কোন বংশের সূচনা। এইভাবেই এসেছে খ্রিষ্টাব্দ শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, হিজরী অব্দ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ও সূচনা কালের সন্ধান পাওয়া যাবে, যুক্তিগ্রাহ্য ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে। কেউ কেউ মনে করেন আকবর বাদশাই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। তাঁদের মতে আকবরের সিংহাসন লাভের বৎসর (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ), থেকে তিনি বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন রাজস্ব প্রদানের সুবিধার কথা বিবেচনা করে। ৯৬৩ হিজরী (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে চন্দ্র বৎসরের পরিবর্তে সৌরবৎসর হিসাবে দিন গণনা আরম্ভ করে, বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন। এটি ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

১৫৫৬ খ্রিঃ আকবর দিল্লী অধিকার করেন সত্য কিন্তু তাদের গৌড় বঙ্গ অধিকার করতে অনেক বছর লেগে যায়।[১] ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আকবর দাউদ খাঁকে পরাজিত করে গৌড় রাজ্যের অধিকার নেন। ঐ সময় গৌড়বঙ্গের বহুস্থান বিশেষ করে সমতট আকবরের অধিকারের বাহিরে ছিল। এই সমতটেই বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল, পুন্ড্রবর্ধন অবস্থিত ছিল। তাছাড়া সমগ্র গৌড় বঙ্গ তখনও বঙ্গদেশ হিসাবে পরিচিত ছিল না।

গৌড় অধিপতি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৪৯৪-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।[২] তিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, 'হিন্দু বিদ্বেষীও' ছিলেন না। তবে, হুসেন শাহ যে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন এ কথা প্রমাণের অভাবে মানা যায় না। বরং তিনি সর্বক্ষেত্রে হিজরী অব্দ ব্যবহার করতেন। সুতরাং, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে এক্ষেত্রে সহমত পোষণ করা যায়।

পিতার মৃত্যুর পর নসরৎ শাহ ১৫১৯ খ্রিঃ বা ৯২৫ হিজরীতে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিও বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন বলে কোন সরকারী নথিপত্রে প্রমাণ মেলে না। সুতরাং নসরৎ শাহকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

"মহা সেনগুপ্ত প্রায় ৫৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্তী গুপ্তরাজাগণ হীনবল হইয়া পড়েন, ফলে এই সুযোগে গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] '৬০৬ অব্দের পূর্বে শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ...।'[৪] কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটী. ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নগর বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। হর্ষচরিত অনুসারে ... গৌড় বলিতে উত্তরবঙ্গ বুঝায়। সুতরাং মগধ গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল...।[৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার

উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্গরাজ্য শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা বলা যায় না'।[৬] হিউয়ান-চৌয়াং 'শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ৬৩৮ অব্দে (ইংরাজী অব্দ) বাংলা পরিভ্রমণ করেন। তিনি কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ), সমতট (পূর্ববঙ্গ), এবং তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলা) এই পাঁচটি রাজ্য ও তাদের রাজধানীর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রাজার নাম উল্লেখ করেননি...।'[৮] হিউয়ান চুয়াং কর্ণসুবর্ণ হয়ে সমতটে অসেন। হিউয়ান চুয়াং অনুসারে 'এ রাজ্যটির আয়তন তিন হাজার লি মত ছিল। ... রাজধানীর পরিধি ২০লি।'[৯] সমতটের ঐ রাজবংশ ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিল।[১০] 'ইউয়ান চোয়াং এর অবস্থান কালে সমতট দেশের রাজপুত্র, মহামতি শীলভদ্র নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের মহাস্থবির ছিলেন।'[১১]

উপরের তথ্য সমূহ থেকে স্পষ্ট যে, সমতট শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল না। সমতট একটি পৃথক রাজ্য ছিল। 'মুসলমানেরা এই দেশ জয় করিয়া সমস্ত বিজিত প্রদেশটি বঙ্গাল নামে অভিহিত করে। মুসলমান যুগের শেষভাগে গৌড়দেশ বলিতে সমস্ত বাংলাকেই বুঝাইত।'[১২] এই সমতট রাজ্যের মধ্যেই বঙ্গাল বঙ্গ প্রভৃতি ছিল। তবে, শশাঙ্কের সময় সমতট স্বাধীন রাজ্য ছিল কিনা বলা যায় না। শশাঙ্ক উত্তর-পূর্ব ভারতে অভিযান করে 'কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অধীশ্বর' হয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে, সমতটের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকা স্বাভাবিক ছিল না। সমতটের স্বাতন্ত্র্য যখন বজায় থাকতে পারত দুটি কারণে - ১) সমতট তখন শশাঙ্কের অনুগত কোন সামন্ত রাজার অধীনস্ত হলে, বা ২) সমতট, তখন যে, স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজবংশের অধীন ছিল, সেই বংশের জ্ঞানগরিমাকে সম্মান করে, তাঁদের কোন বিরুদ্ধাচারণ না করার জন্যে।

সুতরাং যে রাজ্য তাঁর (শশাঙ্কের) অধিকারভুক্ত ছিলেন না, সেই রাজ্যের একটি অংশের নাম নিয়ে একটি অব্দ প্রচলন করা অবাস্তব। তাছাড়া কোন তাম্রশাসন, পাথরে খোদিত কোন লিপি বা শশাঙ্ক প্রবর্তিত কোন মুদ্রায় বঙ্গাব্দের উল্লেখ নেই। শশাঙ্ক কোন অবস্থায় বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হতে পারেন না। কিন্তু শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিছু লোক নিম্নে কয়েকটি মত উদ্ধৃত করে, তার যথার্থতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রথমেই সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। তবে তিনি যে যুক্তিতে বঙ্গাব্দের অন্য প্রবর্তকদের দাবী নসাৎ করেছেন, শশাঙ্কের ক্ষেত্রে সেই সকল যুক্তি এড়িয়ে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে শশাঙ্কের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে একটি ধর্মীয় আবেগের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, সমস্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিকে তিনি আড়াল করেছেন। সুনীল বাবুর মতে *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদকর্মে হিজরী সনের অবলুপ্তি, 'তারিখ-ই-ইলাহী' অব্দের প্রবর্তন প্রভৃতি কথা থাকলেও বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের উল্লেখ নাই। ইতিহাসেও বঙ্গাব্দের প্রবর্তক

হিসাবে আকবরের নাম মেলে না। তাই বলাযেতে পারে আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক নন।[১৩] তিনি আরো উল্লেখ করেছেন "কোন বাদশাহী ফরমানেও আকবর কর্তৃক বাংলা সন প্রবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি, আকবর নিজেও কোন দিন বঙ্গাব্দ /বাংলা সন বা সাল প্রবর্তন করেছেন বলে দাবী করেননি।"[১৪] সুনীল বাবু বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হুসেন শাহ্-র দাবী বাতিল করার জন্য লিখেছেন 'তিনি এ সন বা অব্দ প্রবর্তন করলে তাঁর আমলের সরকারী নির্দেশনামা মসজিদের প্রতিষ্ঠিত ফলক ইত্যাদিতে এর উল্লেখ পাওয়া যেত। কিন্তু সেরূপ কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না।'[১৫]

ইনি শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য লিখলেন "৫৯৩ খ্রিঃ ৬ এপ্রিল সোমবার সূর্যোদয়কালে অথাৎ ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ সোমবার ... গৌড়বাংলায় শশাঙ্ক তাঁর স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন। সোমবার দিনটি শৈব্যধর্মাবলম্বীদের পরম পবিত্র দিন এবং দিনটি শিবের জন্ম দিন বলেও বিশ্বাস। তাই বিশ্বাসই তাঁরা স্বাধীন রাজত্বের সূচনার দিনটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে।"[১৬] তিনি অবার লিখেছেন "সম্প্রতিক কালে কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে খনন কাজের ফলে শশাঙ্কের মূদ্রা সহ অন্যান্য কিছুনিদর্শন আবিষ্কৃত হলেও তাঁর স্বাধীন রাজত্বের সূচনা কাল নির্দেশক কোন তথ্য বা নিদর্শন মেলেনি।"[১৭] তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, " আত্মভোলা, প্রচার বিমুখ শশাঙ্ক অমিতশক্তির অধিকারী হয়েও, রাজকোষ করায়ত্ব থাকা সত্ত্বেও গৌড়বাংলায় স্বাধীন রাজত্বের সূচনা কালের স্মারক হিসাবে করাননি কোন স্মৃতিফলক, রাখেননি কোন লিখিত বিবরণ এবং লেখেননি কোন আত্মজীবনী।"[১৮]

সুনীল বাবুর যুক্তিতে 'পাথুরে প্রমাণের ঘাটতি থাকলেও একমাত্র বিশ্বাসই শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।'[১৯] কিন্তু সুনীলবাবুর বিশ্বাসে অন্যজনের বিশ্বাস নাও থাকতে পারে। বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে হোসেন শাহের উপর যদি কারও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে থাকে, সে বিশ্বাস কি শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নেবেন? অনুরূপভাবে কেবল বিশ্বাস নির্ভর হয়ে শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। কিন্তু ঐ বিশ্বাসের পিছনে যুক্তি ও প্রমাণ থাকলে, তবেই বিশ্বাস সত্যে আবদ্ধ হবে। কিন্তু বিশ্বাস যদি যুক্তি তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে সত্য থেকে বহুদূরে ভাবনির্ভর হয়ে পড়ে, তা'হলে সেই বিশ্বাস কখনই শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

উপরে উল্লখিত ভাবনির্ভর অগভীর যুক্তি ও তত্বের উপর দাঁড় করান আপাত সত্যের কাছে বিদ্বজনেরা কি ভাবে আত্ম সমর্পন করেছেন দেখা যাক।

১) সম্পাদকীয় স্তম্ভ উদ্বোধন - ১৪০২ বঙ্গাব্দে ৪র্থ সংখ্যা

'তাঁহার সিংহাসন আরোহণ ৫৯৩ খ্রিঃ হইয়া থাকিতে পারে। এই ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে

বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে মাইল প্রস্তারের মত একটি অব্দাঙ্ক। অযৌক্তিক নয় ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দকে সম্রাট শশাঙ্কের গৌড়বঙ্গের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে আরোহণ বর্ষ বলিয়া নির্দ্ধারণের অনুমানটিও। ...যৌক্তিকতা প্রমাণিত হলে, অনুমান প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২) অতুল সুরের মতে, '...শশাঙ্ক কর্তৃক বঙ্গাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল, এই মতবাদের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ করে বঙ্গবাসীর পক্ষে বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠা করা খুবই যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্ত।'[২০]

৩) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ''শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বঙ্গাব্দের উৎস কথা' পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। ....এ সম্পর্কে লেখকের তথ্যপ্রমাণ সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ বলে আমার ধারণা।[২১]

৪) বৈদ্যনাথ বসুর (প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ফলিত গণিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মত ''নিরলস সাধনায় বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে, বিভ্রান্তির আড়াল থেকে বঙ্গাব্দের উৎসমুখটিকে আলোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।''[২২]

৫) রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের (প্রাক্তন অর্ধিকর্তা, জাতীয় গ্রন্থাগার) মতে, শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে শেষ কথা বলিয়াছেন। বঙ্গাব্দের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।'[২৩]

একমাত্র দিলীপ কুমার বিশ্বাস (প্রাক্তন সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি) বাদে বাকিরা বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে শশাঙ্কের নাম মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তার ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা না করে মেনে নিয়েছেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, বাংলাদেশ বলিতে যা বুঝাত' শশাঙ্কের সময় বাংলাদেশকে সেই ভাবে বুঝাত না। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি পৌরাণিক কালে। প্রহ্লাদপৌত্র ত্রিভূবনজয়ী দৈত্যরাজ বলিবিষ্ণুর ষড়যন্ত্রে পাতাল বা রসাতলে বাস করতে বাধ্য হন। বলির রাজ্য রসাতল তাঁর চার পুত্র, বান, সুক্ষ, অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। বলির পুত্রদের অধিকৃত রাজ্য তাঁদের নামানুসারে পরিচিত হয়ে যায় (মহাভারতে দষ্ট্রব্য ১.১০৪-৫৫, ১.১০৪.৫১-৫৩, ১.১০৪.৫১-৫৪)। বঙ্গ বা বাংলা নামের আদি উল্লেখ এ অঞ্চলে এই ভাবেই হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ''খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বা তারও আগে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' নামে পৃথক দুটি দেশের অস্তিত্বের কথা বহু শিলালিপিতে উল্লেখ আছে।''[২৩ক] ঐতিহাসিকদের মতে 'বঙ্গাল' দেশের নাম থেকে বাঙ্গালা বা বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

গুপ্তযুগে গৌড় বলতে আধুনিক কালের বাংলাকে বুঝাত। কখনও কখনও গৌড় বলতে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গকেও বুঝাত। পাল যুগের বৃহৎ রাজ্যের পঞ্চগৌড়ের এক

গৌড়স্থলবাংলাদেশ। সুলতানী আমলেও সমস্ত বাংলাদেশ গৌড় নামেই পরিচিত ছিল। মুঘল যুগের শেষেই সমগ্র গোড়দেশ 'বাংলা' নামস্থায়ী ভাবে পায়। ইতিপূর্বে কখনই আধুনিক কালের সমগ্র বাংলাকে বঙ্গ, বাঙ্গালা বা বাংলা নামস্বরূপ ব্যবহার করা হয়নি।

অবশ্যই বঙ্গাব্দ গণনার একটি সূচনা বিন্দু থাকবে। সেই দিনটি হবে বঙ্গাব্দের প্রথম মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ বৈশাখ। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকে চৈত্র মাসের শেষ দিনটি হলে, বঙ্গাব্দের ১ম বর্ষ পূর্ণ হবে বা প্রথম বঙ্গাব্দ হবে। সুনীল বাবু ১ম বঙ্গাব্দের আরম্ভ দিনটি (১ বৈশাখ) গৌড়বঙ্গের স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যুক্তি হিসাবে সুনীল বাবুর প্রথম বক্তব্য হল —

১) '৫৯৩ খ্রিঃ ৬ এপ্রিল সোমবার অর্থাৎ প্রথম বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ সোমবার। ওই দিনই গৌড়বাংলায় শশাঙ্ক তার স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন। সোমবার দিনটি শৈব ধর্মাবলম্বীদের পরম পবিত্র দিন এবং দিনটি শিবের জন্ম দিন।'[২৪]

২) মত পরিবর্তন করে করেন - '৫৯৪ খ্রিঃ ৫ এপ্রিল, সোমবার ......বঙ্গাব্দের আদি বিন্দু।'[২৫]

৩) সুনীল বাবু ১৯৯৭ খ্রিঃ প্রকাশিত বঙ্গাব্দের উৎস কথা বই অনুসারে '১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১২ এপ্রিল, ৫৯৪) সোমবার সূর্যোদয় কালে - বঙ্গাব্দের আদি বিন্দু। .....তাই শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের সূচনা ও বঙ্গাব্দের গণনা শুরু একই দিনে হয়েছে-বলা যায়। অতএব আপাতত প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও আনুষঙ্গিক প্রমাণে প্রমাণিত যে, শশাঙ্কের আমলেই বঙ্গাব্দের সূচনা।'[২৬]

উপরোক্ত মত থেকে শশাঙ্কের রাজ্য আরোহণের বৎসর এবং রাজ্য আরোহণের দিন প্রকৃত পক্ষে কি ছিল নির্ধারণ করা দরকার। সুনীল বাবুর প্রথম দুটি মন্তব্যে বঙ্গাব্দের সূচনা দিন ও শশাঙ্কের রাজ্যারম্ভের সূচনা দিন একই যতটা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, তাঁর বই এর বক্তব্য অত জোরাল নয় বলে মনে হল।

সুখময় সরকার তাঁর নিবন্ধে সুনীল বাবুর শশাঙ্কের রাজ্য আরোহণের বৎসরকে সমর্থন করে লিখেছেন —".....শশাঙ্কের রাজ্যভিষেক হয় আনুমানিক ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে। আনুমানিক কথাটা মনে রাখতে হবে। ওটা তেরো বছর আগেও তো হতে পারে অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিঃ শশাঙ্কের রাজ্যভিষেক হয়েছিল....।"[২৭] সুখময় সরকারের এই প্রবন্ধ লেখার পরে সুনীল বাবু তার বক্তব্য থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। তা'হলেও সরকারের যুক্তি মানা সম্ভব না কারণ, তাঁর যুক্তি মত যেমন 'ওটা তেরো বছর আগেও হতে পারে' তেমনি 'ওটা তেরো বছর পরে হওয়ার যুক্তি সমান ভাবে থাকে। সুতরাং, সিদ্ধান্তে পৌছনর এই যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়। তা'ছাড়া, যেখানে একটি সূচনা বছর এবং দিন-ক্ষণ নির্ণয়ের ব্যাপার, সেখানে বারো তেরো বছরের পার্থক্য গ্রহণ যোগ্য নয়। আনুমানিক

ব্যবধান বড়ো জোর এই দুই বছরের হতে পারে। ইতিহাসের পাতায় উঠে আসা মতগুলি সমীক্ষা করা যেতে পারে। শশাঙ্কের রাজ্যরাম্ভ কাল সম্পর্কে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠার বক্তব্য হল—'আর্যাবর্তে বাঙ্গালীর এই প্রথম সাম্রাজ্য। তিনি ৬১৯-৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে 'মহা সেনগুপ্ত প্রায় ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।'[২৮] আবার সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের *প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে* (২য় খণ্ড) আছে — '৬০৬, খ্রিষ্টাব্দের অল্পকাল আগে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা ছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রণিত বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের ৩৫ পৃঃ অনুসারে '৬০৬, খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিরণ চৌধুরীর *ভারতের ইতিহাস কথায়* (প্রাচীন যুগ) ২০৩ পৃষ্ঠা) আছে কালচুরীদের আক্রমণের ফলে — '৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মহা সেনগুপ্ত থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।' সুতরাং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কোন অবস্থায় শশাঙ্ক ৫৯৩ বা ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করেছিলেন মেনে নেওয়া যায় না। এটি সুনীল কুমার বন্দোপাধ্যায়ের কষ্ট কল্পনার ফল ছাড়া কিছু নয়।

বঙ্গাব্দের সূচনা দিবস ও অব্দ এবং শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের দিবসও অব্দ একই বলে, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বহু তথ্য ও যুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শশাঙ্কের রাজ্যারোহণ অব্দ মানা সম্ভব হযনি। সে ক্ষেত্রে, শশাঙ্কের রাজ্যারোহণ দিবস সংক্রান্ত আলোচনা অর্থহীন। ফলে, শশাঙ্কের রাজ্যারোহণের সঙ্গে বঙ্গাব্দ আরম্ভের কোন যোগসূত্র রইলো না। সুতরাং শশাঙ্ক সংক্রান্ত আলোচনার পরিবর্তে বঙ্গাব্দের আরম্ভের অব্দ ও সূচনা কাল নিয়েই আলোচনা করতে হবে। তবে বঙ্গাব্দ বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর '*বঙ্গাব্দের উৎসকথা*' বইতে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু মূল্যবান কাজ করেছেন। যেমন বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ তালিকা বঙ্গাব্দ ও খ্রিষ্টাব্দ তালিকা প্রভৃতি। কিন্তু তার বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত কিনা বলা যায় না।

ধরা যাক, বাংলা বৎসর ১৪১০ বঙ্গাব্দ। বছরের প্রথম দিন ১ বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল ২০০৩, মঙ্গলবার। সুতরাং এই দিন থেকে ১৪১০ বৎসর পূর্বে কোন এক দিন ছিল বঙ্গাব্দের সূচনা দিন অর্থাৎ ১ বৈশাখ (১ম বঙ্গাব্দের প্রথম দিন)। ১ম বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ কি বার ছিল জ্ঞাতব্য বিষয়। বঙ্গাব্দ গণনার সূত্রপাত কি করে হল, বঙ্গাব্দের প্রথমদিন কোন বিশেষ ঘটনার সাক্ষী কিনা, ইত্যাদি জানার থাকতে পারে। যে সূত্রে বর্তমান নিবন্ধ, সেই সূত্রানুসারে খ্রিষ্টাব্দের প্রেক্ষাপটে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গাব্দের প্রথম দিনের বার নির্দেশ করেছিলেন। তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন প্রথমে তিনি স্থির করেন ৫৯৩ খ্রিঃ ৬ এপ্রিল, সোমবার, সেটাকে পরিবর্তন করে, তিনি দ্বিতীয় বার

স্থির করেন ৫৯৪ খ্রিঃ ৫ এপ্রিল, সোমবার ১ম বঙ্গাব্দের প্রথম দিন। কিন্তু তাঁর, *বঙ্গাব্দের উৎস কথা* বইতে তিনি ঐ দিন ও বার স্থির করেন ১২ এপ্রিল, সোমবার ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং তিনি ১ম বঙ্গাব্দের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দিনের কোন তারিখ ও কি বার, ইংরাজী খ্রিষ্টাব্দ অনুসারে নির্দেশ করে একটি চার্টও সংযোজন করেছেন। কিন্তু শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১ম বঙ্গাব্দের প্রথম দিন সোমবার করার পক্ষে বিশেষ যুক্তি হলো যে, 'বঙ্গাব্দের সূচনা সোমবার। শৈব্যধর্মাবলম্বী হিসাবে সোমবার দিনটি শশাঙ্কের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'[২৯] শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *ওভারল্যান্ডের* প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'সোমবার দিনটি শৈব্য ধর্মাবলম্বীদের পরম পবিত্র দিন এবং দিনটি শিবের জন্মদিন বলেও বিশ্বাস।[৩০] বার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এমন একটি যুক্তি, সত্যে পৌছানর পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। তা'ছাড়া প্রত্যক্ষ পদ্ধতি, মাস ও বার ধ্রুবক পদ্ধতিতে তাঁর নির্ধারিত বার সমর্থিত হয়নি। কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, তার নির্দেশও নেই।

সূত্র-নির্দেশ

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার—*বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)* - (সংস্করণ ১৯৮৮), পৃ: ১২৬।
২। তদেব, পৃ: ৯০।
৩। তদেব, পৃ: ৩৪।
৪। তদেব, পৃ: ৩৫।
৫। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—*বাংলার ইতিহাস*, পৃ: ৮০-৮১।
৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
৭।
৮। তদেব, পৃ: ৪২।
৯। হিউয়েন সাং-এর দেখা ভারত (সংকলক প্রেমময় দাশগুপ্ত) পৃ: ১৪৯।
১০। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
১১। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ: ৮৯।
১২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
১৩। সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"বঙ্গাব্দের প্রবর্তক কে?" *ওভারল্যান্ড* তাং ১৭-৪-১৯৯৯।
১৪। সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—*বঙ্গাব্দের উৎস কথা*, পৃ: ৩৪।
১৫। তদেব, পৃ: ৩৫।
১৬। *ওভারল্যান্ড পত্রিকা*, তাং ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৪।
১৭। *বঙ্গাব্দের উৎস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮।
১৮। *ওভারল্যান্ড পত্রিকা*, তাং ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৪।
১৯। *উদ্বোধন*, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা, দেশ, জুন, ১৯৯৫ (চিঠি পত্র)।

২০। *দেশ*, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৯৫।
২১। *বঙ্গাব্দের উৎস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১ (পরিশিষ্ঠ)।
২২। তদেব, পরিশিষ্ঠ।
২৩। তদেব, পৃঃ ১।
২৩ক। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
২৪। *ওভারল্যান্ড*, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৪।
২৫। *উদ্বোধন*, ১৪০২ বঙ্গাব্দ ৪র্থ সংখ্যা, *দেশ*, জুন ১৯৯৫ (চিঠি পত্র)।
২৬। *বঙ্গাব্দের* উৎস *কথা*-প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।
২৭। উদ্বোধন, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, ১২ সংখ্যা
২৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত।
২৯। বঙ্গাব্দের উৎস কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।
৩০। *ওভারল্যান্ড*, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ সংখ্যা।

নদীর পারে সুতানুটি

উত্তরা চক্রবর্ত্তী

গ্রাম সুতানটি তৈরী হয়েছিল, গোবিন্দহর এবং কলিকাতার সাথে সাথে।

শেঠ-বসাক তন্তুব্যবসায়ীর গোবিন্দপুরে তাঁতিদের নিয়ে এসে বসতি করিয়াছিল গোবিন্দপুরের কিছু উত্তরে গঙ্গার ধার ঘেঁষে।[১] সুতার নুটি তৈরী করার জন্য গ্রামের নাম হল সুতানুটি। গোড়াতে সুতানুটি তাঁতীদের গ্রাম ছিল।

নদীর পারের সুতানুটি গ্রামের অবশ্যই নদীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁতের কাপড় বা সুতো, যাই তৈরী হক, নদীর পথে বাণিজ্যের পণ্য হিসেবে, জাহাজ ঘাটায় সওদাগর, ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছনর দরকার ছিল। যে সময় সুতানুটি হাট গ্রাম তৈরী হল, সে সময় গঙ্গার মূল প্রবাহ কিছুটা পূব দিকে, আজকের শুকিয়ে যাওয়া আদিগঙ্গা বা টালির পালার খাত ধরে বয়ে যেত। সওদাগর, ব্যবসায়ীদের নৌকাগুলি এই প্রবাহ ধরে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছত, ছত্রভোগের কাছে নদী সমুদ্রে পড়ত।[২] ষোল শতক পর্যন্ত পশ্চিমপারের বেতোর ছিল জাহাজঘাটা। নদীপথ দিয়ে যেসব ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করত। তারা সমুদ্রেও পারি দিত কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সঠিক তথ্যও পাওয়া মুশকিল। কিন্তু নদীর প্রবাহ, বাণিজ্য পথ হিসেবে নদীর গুরুত্ব এই নিয়ে কোনো বিতর্ক সম্ভবত নেই। নদীর জন্যই নদীর পারে সুতানুটি গ্রাম গড়ে ওঠে। নদীর পূর্ব পার যেখানে উঁচু, নদীর গতি যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মুখে সুতানুটির পত্তন হয়। বাঁকের কিনারায় নৌকা বাঁধার সুবিধা, মানুষ জনের নামা ওঠাও সহজ—এই সব প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধাগুলিকে গ্রামের পত্তনকারী শেঠ-বসাক ব্যবসায়ীরা কাজে লাগিয়ে ছিল। ষোল শতকের পর্তুগীজ বণিকরা সুতানুটি গ্রামের নদীর ঘাটে নোঙ্গর করত কিনা তার কোন হদিশ নেই। কিন্তু পনেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের শেষাশেষি প্রায় দেড়শো বছরের মধ্যে নদীর ধারে সুতানুটি গ্রামের হাটের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬৭৬ সালে স্ট্রেইনগাম মাস্টার এবং ১৬৭৯ সালে ক্যাপ্টেন স্ট্রাফোর্ড, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে, গঙ্গার মোহনা দিয়ে ঢুকে ভিতর পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যর সুযোগ অনুসন্ধান করেন। মাস্টার এবং স্ট্রাফোর্ডের রির্পোটে বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোবিন্দপুর এবং শেঠ-বসাক ব্যবসায়ীদের প্রচুর উল্লেখ রয়েছে।[৩] কিন্তু স্বাভাবিক

কারণেই, ইংরেজরাও পর্তুগীজদের অনুসরণ করে প্রথমে হুগলিতেই কুঠি তৈরী করে। ঠিক দশ বছর পর কোম্পানির নবতম এজেন্ট জোব চার্নক, হুগলি থেকে গঙ্গার দক্ষিণগামী স্রোত ধরে পৌঁছান সুতানুটিতে। কোম্পানির সমকালীন চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, চার্ণকের সঙ্গে শেঠ-বসাকদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছিল আগেই। সুতানুটি হাটের কর্ম ব্যস্ততাও তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৬৮৬ থেকে ১৬৯০ এই কয়েক বছরের নিত্য আনাগোনা থেকে চার্ণক ঠিক করে ফেললেন নদীর পারের সুতানুটিই ইংরেজদের কুঠি বাড়ীর সব চাইতে ভালো জায়গা। কল্পনা করা যেতে পারে, নদীর পারের গাছের ছায়া ঢাকা, উঁচু ডাঙ্গার কোণ ঘেঁষে নৌকা বাঁধার ঘাট আর ঘাটের পরই, সুতোর আর কাপড়ের হাট, চার্ণকের ব্যবসায়ী মনকে টেনেছিল। সুতানুটির ঘাটে তিনি সেই যে নৌকা বাঁধলেন, ইতিহাসে তাই লেখা হয়ে রইল। সুতানুটি গ্রামকে প্রথম গুরুত্ব দিলেন জোব চার্ণক।[৩]

সুতানুটি ঘাট এবং সুতানুটি গ্রাম, সতেরো দশকের কোম্পানির চিঠিপত্রে অনবরত উল্লেখ পেয়েছে।

কলিকাতা বড়বাজার বা গোবিন্দপুর গ্রাম (ইংরেজদের পরিভাষায় টাউন গোবিন্দহর) উল্লিখিত হলেও, সুতানুটিই ইংরেজ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় হয়েছিল। চিঠিপত্রে তাই সুতানুটি অফিসেরই নাম পাওয়া যায়। 'চুত্তালুটি বা সুতালুটি' এই নামটি কোম্পানির যাবতীয় চিঠিপত্রে ব্যবহার করা হত।

কোম্পানির কাগজপত্রে সুতানুটি হাটের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। নদীর ধারের হাটে, নৌকা করে দূর অঞ্চল থেকে নামা পণ্য আসত। সুতানুটি গ্রামের মূল পণ্য সুতার লুটি বা নানা ধরনের তাঁতের কাপড় ছাড়াও অন্যান্য জিনিষপত্রেরও কেনা বেচা হত। তাঁতব্যবসায়ীরা প্রধান ব্যবসায়ী ছিল ঠিকই, কিন্তু গোয়ালা, ময়রা, সুতো তৈরীর কারিগর, কড়ি বিক্রেতা, চূণ, তামাক, বাসনপত্র, ফলমূল বিক্রেতা, কসাই, চাল ব্যবসায়ী, এই ধরনের নানা ছোট রঙ ব্যাপারীরাও সুতানুটি হাটের নিয়মিত ব্যবসা করত। এদের কাছ থেকেও কর আদায় করা হত। হাট বসত সপ্তাহে দু'দিন বৃহস্পতিবার এবং শনিবার।[৪]

সুতানুটি হাটে নানা অঞ্চলের মানুষজনের ভীড় ছিল। গ্রাম সুতানুটিতেও উত্তর ভারতীয় মুসলমান, আর্মেনিয়ান, ওলন্দাজ নানাধরনের ব্যবসায়ীরা বসতি করেছিল।

আঠারো শতকের প্রথম দিকে নদীর জলধারার হঠাৎ কোন পরিবর্তন হয়। এ খবরও কোম্পানির কাগজপত্র থেকে জানা যায়। গঙ্গানদীর মূল প্রবাহের পূর্বপারে ছিল সুতানুটি, তারপর কলিকাতা এবং কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর আদিতে, শেঠ

বসাকদের বসতি গ্রাম, কিন্তু পরে, ঠাকুর, হালদার, মিত্র, ঘোষ, দেব, এইসব ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবারদেরও বাসস্থান। গোবিন্দপুর গ্রাম একটি নদীর আরেকটি বাঁকের ওপর গড়ে উঠেছিল। ফলে ওখানেও ঘাট, গঞ্জ, কাছাড়ি বাড়ী এবং বাজার গড়ে ওঠে। আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকেই নদীর জলোচ্ছাস, পার ভাঙ্গতে শুরু করে। বাঁকের ধাব ঘেষে জল, ভিতর পযন্ত চলে যায়। গোবিন্দপুর গ্রামের নদীর পার ভাঙছে। গঞ্জের জমি জায়গা নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে, নদীর পার বাঁধানো দরকার, বাঁধ কতদূর যাবে, তাই সব প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি খবরে ভরা থাকত কোম্পানির কাগজপত্র। শেঠ-বসাকদের বড় বড় বাগানবাড়ী ছিল. নদীর তীর ঘেঁষে। আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকে দেখা যাচ্ছে বাগান বাড়ীগুলি পরিত্যক্ত। শেঠ-বসাকরা গোবিন্দপুর ছেড়ে চলে গেল উত্তরে, কলিকাতা. চিৎপুর এবং সুতানুটিতে।[৮] পিরালি ঠাকুররা চলে যান কলিকাতা গ্রামের উত্তরে চিৎপুর, জোড়াসাঁকোতে। ১৭৩৭ সালের প্রবল ঝড় এবং জলোচ্ছাসের পর দেখা গেল, গোবিন্দপুর পরিত্যাক্ষ। নবকৃষ্ণদেবের পিতৃদেব গোবিন্দপুরের আদি বাড়ী গঙ্গায় ভেসে যাওয়ার ফলে সুতানুটিতে নতুন বাড়ী তৈরী করলেন। জমি কিনেছিলেন শেঠ-বসাকদের কাছ থেকে।

গোবিন্দপুর গ্রামের গঙ্গার জলোচ্ছাসে হারিয়ে সাথে সাথে, সুতানুটি গ্রামের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। যা কিনা ছিল, তাঁতী কারিগরদের বাসস্থান, সেই অঞ্চলই এখন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী পরিবারদের এলাকা হয়ে উঠল। সুতানুটির নদীর পার অনেকটা উঁচু হওয়ার ফলে জোয়ারের সময় বা বর্ষা জলের আঘাত ততটা ক্ষতি করতে পারেনি। সুতানুটি, নদীর পারের ছায়ায় গড়ে ওঠা গ্রাম, নদীর জলপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ও লালিত; সুতানুটির প্রাণস্পন্দনও নদীপথেব ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে সুতানুটি গ্রাম, তাঁত-ব্যবসাতে বটেই নানা ধরনের বসতি, বাজার ইত্যাদি নিয়ে জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

সুতানুটির সীমানা ছিল এরকম—উত্তরে বাগবাজাব তার ওপারে একটু সাঁকো পর্যন্ত। ফোর্ট উইলিয়ম রেকর্ডসে এই সাঁকোটিকে বলা হচ্ছে কাউকর্স ব্রিজ (cowcross bridge) উত্তরদিক থেকে দমদম হয়ে বাগবাজারের মধ্য দিয়ে একটি বড় পথ ছিল। এই পথ দিয়েই সিরাজদৌল্লা ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণ করেন। সিরাজদৌল্লার কলকাতা জয় ক্ষণস্থায়ী হলেও, যে পথ দিয়ে তিনি এসেছিলেন—দমদম হয়ে বাগবজার এবং শ্যামবাজার—সুতানুটির উত্তর অঞ্চলের ভেতর দিয়ে ডিহি কলকাতা পৌঁছনর রাস্তাটির স্থায়ী গুরুত্ব তৈরী হয়ে গিয়েছিল।[৯]

সুতানুটির মধ্যস্থলে ছিল সিমলাগ্রাম। অজস্র শিমূল গাছের জন্যই এই নাম। শিমূল গাছ তাঁতীরাই রোপণ করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবু মনে করা যেতেই পারে যে সুতানুটির আদি বাসিন্দা তাঁতীরা তাদের কারিগরির কাঁচামাল পওয়ার সুবিধার জন্য স্থানীয় শিমুল তুলোর চাষ করেছিলেন। সুতানুটির পূর্ব সীমায় ছিল হোগলকুঁড়িয়া। আর দক্ষিণ অংশ তখনকার মানিকতলার দক্ষিণে গড়পার পর্যন্ত। মূল সুতানুটির বিস্তারের মধ্যে হোগল কুঁড়িয়া, শিমলা বা শিমূলিয়া, মির্জাপুর ইত্যাদি ছোট ছোট গ্রামের উল্লেখ পাওয়া কোম্পানির নথিপত্র থেকে। এছাড়া ছিল অনেকগুলি বাজার। উত্তরে বাগবাজার এবং শ্যামবাজার ও সুতানুটির মধ্যিখানে শিমলাবাজার। বাজার, বসতি, হাট সব নিয়ে সুতানুটি ক্রমশই জমজমাট সরগরম একটি শহর এলাকায় পরিণত হচ্ছিল।

১৭৫৭-র রাজনৈতিক পরিবর্তন সুতানুটিরও পরিবর্তন আনে। ১৭৫৮-র কোম্পানির রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে, সুতানুটি এবং সিমলার জনসংখ্যা হঠাৎই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৭৫৭ সালে নবকৃষ্ণদেব নতুন তৈরী ঠাকুর দালানে মহাধুমধামে দুর্গা পূজা করলেন।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় পর্বে সুতানুটি ক্রমশঃ একটি সম্ভ্রান্ত অভিজাত ধনী মানুষদের এলাকায় পরিণত হচ্ছে।

ইংরেজদের পরিকল্পিত নতুন শহরের যে নকশা এইসময় ক্রমশই দ্রুত ফুটে উঠেছিল, তাতে স্পষ্ট একটি বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। পরিত্যক্ত গোবিন্দপুরে, নতুন দুর্গ তৈরী করা ছাড়াও।

শুধুমাত্র ইংরেজদের বসবাসের জন্য গোবিন্দপুরের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল White Town হিসেবে গড়ে উঠল। অন্যদিকে সুতানুটি চিহ্নিত হল Black Town বা Natune Town হিসেবে। কিন্তু Black Town হলে, সুতানুটির জমজমাট শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করার মত। ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, মুৎসুদ্দি, বানিয়াম নতুন ব্যবসায়ীরা ইংরেজদেরই অনুকরণে প্রাসাদের মত বাড়ী তৈরী করতে লাগলেন। নদীর পার ধরে, তাঁদের তৈরী ঘাটগুলি, সংখ্যায় পড়তে লাগল। নদীর সঙ্গে যুক্ত করে পথ তৈরী হল, ভেতরকার বসবাস এলাকা পর্যন্ত।

যেন সুতানুটির নদী, তাদেরই একান্ত নিজস্ব।

নদীর পারের সুতানুটিতে উনিশশতকের তৃতীয় দশকে নদী বেয়ে এসে পৌঁছেছিলেন কবি গির্জা গালিব। সুতানুটির কোন ঘাটে তাঁর নৌকা ভিড়েছিল জানা যায়নি। নৌকা থেকে নদীর পারের সুতানুটি তাঁর দৃষ্টি কেড়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা যে দু'বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন, সেই দু'বছরে তাঁর কলকাতা বাসের ঠিকানা ছিল সুতানুটির শিমলা বাজারে, 'গোলতালাও' বা হেদুয়া পুকুরের নজদিক্কে।[১]

সূত্র-নির্দেশ

১। সি. আর উইলসন, *আর্লিএ্যানালস্ অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল,* ভল্যুম ১, লণ্ডন, ১৮৯৫, পৃঃ ১২৭।

২। স্টিভেনসন—মুর কমিটি রিপোর্ট, *রিভার্স অফ বেঙ্গল,* ভল্যুম-২, *রিপোর্ট অন দি হুগলি রিভার এ্যান্ড ইট্স হেডওয়ার্টাস,* ওয়েস্টবেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস; পৃঃ ৮০-৮১।

৩। তদেব, পৃঃ ৫২, ৫৮, ৫৯।

৪। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, *কলিকাতা সেকালের ও একালের* প্রথম প্রকাশ ১৯১৫, নব সংস্করণ ১৯১১, পৃঃ ৩২৪।

৫। সি. আর উইলস।

৬। উইলসন, *ওল্ড ফোর্ট উইলিয়ম রেকর্ডস,* ভল্যুম-২, পৃঃ ৪০, ৪১, পৃঃ ১৬৩, পৃঃ ৫২, রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বাঙ্গালীর বল, ১৩২৮, পৃঃ ৩৫৮।

৭। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, *কলিকাতার ইতিবৃত্ত,* পৃঃ ৭৬, উইলসন। *ওল্ড ফোর্ট উইলিয়ম রেকর্ডস,* ভল্যুম-২, পৃঃ ১১, ১২, ২০।

৮। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, উল্লিখিত, পৃঃ ৮৩, ৮৪।

৯। ঘালিব ১৭৯৭-১৮৬৯, *লাইফ এ্যান্ড লেটার্স,* অনুবাদ এবং সম্পাদনা র‍্যালফ্ রাসেল এবং খুরশিদ ইসলাম, *পার্শিয়ান লেটার্স অফ ঘালিব,* এস. এ এল. তারমিজি, পৃঃ xiii-xv।

দিল্লী সুলতানী শাসনে যুগ-পরিবেশের প্রভাব (১২০৬-১৫২৬ খ্রিঃ) একটি পর্যালোচানা

তপন কুমার মণ্ডল

দিল্লী সুলতানী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্রের শাসন নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই প্রভাব প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু রাজাদের স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল না। তথাপি কেবলমাত্র ভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ উভয় জাতির শাসন নীতির মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। যে কোন শাসন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ঠ দেশের 'যুগ-পরিবেশ'-এর দ্বারা অবধারিত ভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু দিল্লী সুলতানীর শাসন নীতির ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতীয় যুগ-পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। কারণ দিল্লী সুলতানীর প্রথমদিকের শাসক গোষ্ঠী ছিলেন বহিরাগত আর শাসিত জনগন ছিলেন অধিকাংশ ভারতীয়। সুতরাং বহিরাগত শাসকগণ তাঁদের আধিপত্যকে স্থায়ী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে তাঁদের নিজস্ব পূর্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ শাসন নীতি স্থাপন করবেন—এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই দেখা যায় যে, দিল্লী সুলতানীর আমলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য সম্পন্ন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দিল্লী সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভারতে প্রকৃত অর্থে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না[১]। তুর্কী বিজয়ের পর দিল্লীতে যখন স্থায়ীভাবে সুলতানী শাসনের সূচনা ঘটে তখন থেকেই দেখা যায় যে, দিল্লী সালতানাত ক্রমশঃ ভারতের মত এক বিশাল সাম্রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ[২] বিদেশী শাসকদের সামনে কেন্দ্রীয় শক্তি গঠনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। কারণ দেশীয় বিচ্ছিন্ন রাজ্য[৩] গুলির কোন সর্বভারতীয় চেতনা ছিল না[৪]। নিজ অঞ্চলের স্বার্থকে তারা সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিত[৫] এবং নিজ রাজ্যের স্বার্থকে রক্ষার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলো পরস্পর বিবাদে লিপ্ত থাকত[৬] সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশ প্রেম বলে কিছু ছিল না[৭]। কারণ সাধারণ জনগণ ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। সামাজিক ন্যায় বিচার ছিল না। জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রবল[৮]। নিম্ন- বর্ণের মানুষদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করার কোন অধিকার ছিল না। যদি কেউ পাঠ করে তবে তারা

জিহ্বা কেটে ফেলা হত[৯]। সমাজ ছিল কুসংস্কার পূর্ণ। মন্দিরগুলি ছিল বিপুল ধনরত্নে পূর্ণ অথচ দুর্দিনে মন্দিরগুলি হতে কোন সেবামূলক কাজ করা হত না। দেবদাসী প্রথাকে ধর্মের বিশেষ অঙ্গ বলে ধরা হত[১০]। নৈতিক জীবনের মান ছিল সর্বদা নিম্নমুখী। সাধারণ মানুষ ছিল এসবের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ। এসব দুর্নীতি ও অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সুলতানী শাসনের প্রতি অধিকাংশ মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল[১১]। এছাড়া সুলতানী আমলে ইসলাম ধর্মের উদারতা[১২] বেশীরভাগ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। অপরদিকে বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধ করার মত কোন দেশীয় শক্তি ছিল না[১৩]। এই সকল অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে দিল্লী সুলতানী শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দিল্লী সুলতানী শাসন ব্যবস্থায় ইসলামিক তত্ত্ব[১৪] ও আইনাবলী গৃহীত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে ভারতীয় হিন্দু যুগের প্রযুক্ত আইনাবলী থেকে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। তাই কোন কোন গবেষক দিল্লী সুলতানী শাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে ধর্মাশ্রয়ী শাসন[১৫] ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা সত্য যে, সমস্ত যুগের সমস্ত রকম শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্দ্ধারণে যুগ-পরিবেশ সর্বাধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সুতরাং দিল্লী সুলতানী শাসনের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ধর্মীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সুলতানী শাসনকে বিচার করলে ভুল হবে। কারণ শাসন পরিচালনায় প্রাচীন ও মধ্য যুগে অন্যান্য সহায়ক শক্তির মত ধর্মও একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, যার দৃষ্টান্ত তৎকালীন যুগ পরিবেশে হিন্দু-খ্রিস্টান-মুসলিম ইত্যাদি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া শাসকগণ তাঁর প্রভুত্ব প্রজাদের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য যে কোন একটি ধর্মকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় নেতারা রাজানুগ্রহ লাভের দ্বারা ধর্মমতকে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য শাসককে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তৎকালীনযুগ-পরিবেশ বিজ্ঞান বা যুক্তি নির্ভর ছিল না, ঈশ্বর নির্ভর ছিল। সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্বকে উপেক্ষা করে কোন শাসকের পক্ষে শাসন কার্য নির্বিঘ্নে চালান সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শাসক কোন একটি ধর্মের অধীনস্ত হয়ে পড়লেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এবং ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে নানা সমস্যা নানা সময়ে ঘটেছে। কখনো সুলতানরা ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করায় ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।[১৬] কখনো রাজার সঙ্গে পোপের বিরোধ হয়েছে। আবার কখনো পোপের অনুমোদন ছাড়া নতুন রাজার সিংহাসন প্রাপ্তি বৈধতা

পাচ্ছে না ইত্যাদি। ভারতবর্ষে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাক-সুলতানী যুগে পুরোহিত শ্রেণী রাজার উপর অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করতেন এবং তাদের সুবিধার্থে আইন রচনা করতে বাধ্য করতেন। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছেন তাঁরা যে কোন একটি ধর্মমতকে নিজে গ্রহণ করেছেন এবং গৃহীত ধর্মমতকে নিজ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র ধর্ম, হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই ভাবে ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। এই অবস্থার ব্যতিক্রম আমরা দিল্লী সুলতানী যুগেও দেখতে পাই না। সুতরাং কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেই কোন রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া যুগ প্রেক্ষাপট বিচার না করে সুলতানী শাসনকে ধর্মাশ্রিত শাসন বলে অভিহিত করা আদৌ ইতিহাস সম্মত নয়। একথা সত্য যে, শাসন ব্যবস্থার উপর ধর্মের প্রভাব ছিল এক বিশেষ সময়ের এবং বিশেষ যুগের স্বাভাবিক রীতি যা কেবলমাত্র দিল্লী সুলতানীর ক্ষেত্রে নয়, সারা বিশ্বের নানা দেশের শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম অনেকাংশে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্য সুলতান বা সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল, ধর্মীয় নির্দেশের উপর নয়[১৭]।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে যে রাজা বা সুলতান যে ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন সেই ধর্মমত যাতে সমস্ত প্রজা গ্রহণ করে তার জন্য সচেষ্ট হতেন এবং ধর্ম প্রচারের জন্য সরকারী ভাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। যেমন রোমান সম্রাট শার্লামেন, ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম চার্লস, নেদারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ফিলিপ এবং ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজারা সকলেই ক্যাথলিক ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ এবং অলিভার ক্রমওয়েল প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী ছিলেন। এছাড়া ফ্রান্সের বুঁরবো রাজারা এবং অন্যান্য স্বৈরতান্ত্রিক রাজারা "ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায়" বিশ্বাসী ছিলেন। তারা বলতেন যে আমরা যা করছি, ঈশ্বরের নির্দেশে করছি, আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ"। অর্থাৎ "রাজনৈতিক স্বার্থে এবং স্বৈরাচারিতাকে আড়াল করার জন্য ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন[১৮]। উক্ত শাসকগণের সকলেরই ধারণা ছিল যে, ধর্মীয় ঐক্য ব্যতীত রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই ধারণা যে যুগ, পরিবেশের অনুবর্তী ধারণা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক, দিল্লী সুলতানী শাসন তার যুগ ধর্মকে উপেক্ষা করেনি। গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানে "ধর্মীয় প্রভাবাধীন" শাসন ব্যবস্থা চলছে সেখানে দিল্লী সুলতানীর অধিকাংশ শাসক সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে উক্ত ধারাকে উপেক্ষা করবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি। বরং যুগ-পরিবেশের অনুকূলে দিল্লী সুলতানী শাসকরা নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা ধরে

রাখা এবং তাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ধর্মকে বাহন হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে— বাস্তব বিচারে ইহা কোন রকম আপত্তিকর কিছু হতে পারে না।

ভারতে প্রাচীন আর্যদের কোন লিখিত ধর্মশাস্ত্র ছিল না কিন্তু পুরোহিতদের বক্তব্য ছিল ধর্মীয় নির্দেশ স্বরূপ। পুরোহিতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরামর্শ রাজা মেনে নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। কারণ একমাত্র পুরোহিত ছিলেন ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং অভিষেক প্রথায় পুরোহিত রাজাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতায় উন্নীত করতেন।

আমরা মৌর্যদের শাসনকালে দেখছি যে, সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূল নির্দেশগুলি তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনার নীতির সঙ্গে যুক্ত করেন। বলা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতিগুলি তাঁর সাম্রাজ্য শাসনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ অশোকের অনুশাসনগুলি সবই বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুষাণ সম্রাট কনিষ্কও অশোকের মতই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ভারতের গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী উপজাতি রাজ্যগুলির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করে সেখনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলতেন রাজ্য অধিগ্রহণ করা রাজার কর্তব্য। তিনি পরাজিত রাজার কাছ থেকে উপহার স্বরূপ রাজকন্যা গ্রহণ করতেন। এসবই তৎকালীন যুগে ন্যায় সঙ্গত ব্যাপার ছিল কিন্তু বর্তমান যুগে এসব অচল। গুপ্ত রাজারা ধর্মশাস্ত্র ও চিরাচরিত প্রথাকে উপেক্ষা করে কোন আইন রচনা করতে পারতেন না।

দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের শাসন ধর্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে পরিচালিত হত। রাজার ক্ষমতা শাস্ত্রের নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যাহোক, উপরিউক্ত সকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত প্রায় কোন শাসনকাল যুগের ধারাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং দিল্লী সুলতানী শসনকাল-এর থেকে কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। তাছাড়া বলা যায় যে, কোরান বা শরিয়ত শুধু ধর্মশাস্ত্র ছিল না, ছিল ইসলামিক শাসন ব্যবস্থার এক প্রকার লিখিত সংবিধান, যার ব্যাখ্যাকর্তা ছিলেন উলেমা শ্রেণী। দিল্লীর কোন কোন সুলতান উলেমাদের ব্যাখ্যা মান্য করতেন, আবার অনেকে উপেক্ষাও করতেন[১৯]। যাঁরা দুর্বল সুলতান ছিলেন সামরিক দিক থেকে তাঁরা অনর্থক বিদ্রোহের পথ পরিহার করবার জন্য উলেমাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা মান্য করতেন। কিন্তু যাদের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী ছিল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল সে সব সুলতানরা উলেমাদের শরিয়তী ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করে কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করতেন। শক্তিশালী সুলতানরা বলতেন যে, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক, কোনটা উচিত আর কোনটা উচিত নয় তা আমি জানি না। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এবং

প্রজাদের কল্যাণের জন্য যা করা দরকার আমি তাই করব[২০]। এ থেকে বোঝা যায় যে, শরিয়তের ব্যাখ্যাও নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবার জন্য কোন সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা ছিল না। সুতরাং দিল্লী সুলতানী শাসন ছিল সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক সুলতানের ক্ষমতার উৎস ছিল তার অনুগত সামরিক বাহিনী[২১]—ধর্মশাস্ত্র নয়।

দিল্লী সুলতানী শাসন ব্যবস্থার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের প্রাচীন যুগ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক শাসন ব্যবস্থার কিছু দিক এখানে উল্লেখ করেছি। কারণ বর্তমানে দেখা যায় যে, কিছু ইতিহাস গবেষক ইতিহাসের প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করছেন। সত্যানুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করছেন না। কতকগুলি গুরুত্বহীন মামুলি বিষয়ের উপর চিন্তা ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রেখে পক্ষপাতমূলক বিশ্লেষণ করছেন। যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অসংখ্য ভুলবার্তা পৌঁছে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে দিল্লী সুলতানী শাসনকে "ধর্মাশ্রীয় শাসন ব্যবস্থা" বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে, তথাপি পুনরায় বলব যে, ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হবেন কোন একজন ধর্মগুরু। যেমন রোমের শাসনকর্তা ছিলেন এক সময় "পোপ", এক সময় বাগদাদের শাসনকর্তা ছিলেন "খলিফা", এক সময় প্রাচীনকালে অযোধ্যার রাজা ছিলেন হিন্দুদের ভগবান "রামচন্দ্র" ইত্যাদি। সম্রাট অশোকের শাসনকেও ধর্মাশ্রয়ী শাসন বলা যায়। কারণ কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ নয়, কিংবা ধর্মের নির্দেশ শুধু মান্য করা নয়, অশোক নিজেই বৌদ্ধধর্মকে তাঁর শাসন নীতির শীর্ষে স্থাপন করেছিলেন এবং একজন ধর্মগুরুর মত ভূমিকা পালন করে "ধর্মাশোক" হিসেবে অভিহিত হন। কিন্তু দিল্লী সুলতানী শাসকদের মধ্যে কেউ "ধর্মগুরু" বা "খালিফা" ছিলেন না। সুতরাং ধর্মগুরুদের শাসন এবং ধর্মকে শাসন নীতির শীর্ষে স্থাপন করা আর ধর্মীয় ব্যাখ্যা শুনে জনকল্যাণকামী আইন রচনা করা কখনোই একই ব্যাপার হতে পারে না। দিল্লী সুলতানীর অধিকাংশ শাসক ঠিক এই কাজটি করেছিলেন যথেষ্ঠ দক্ষতার সাথে। সুতরাং দিল্লী সুলতানী শাসনকে ধর্মাশ্রয়ী শাসন না বলে "যুগ-পরিবেশের অনুসারী শাসন" বলে অভিহিত করাই হবে অধিকতর ইতিহাস সম্মত।

সূত্র-নির্দেশ

১। *ঈশ্বরী প্রসাদ, হিস্টরি, অফ্ মেডিয়িভ্যাল ইণ্ডিয়া,* পৃঃ-১

২। *ঐ* পৃঃ-৪০

৩। মহম্মদ হাবিব ও খালিফ আহমদ নিজামী, *এ কমিপ্রিহেনসিভ হিস্টরি অফ্ ইণ্ডিয়া,* ৫ম *খণ্ড, পার্ট ওয়ান,* পৃঃ-১৩২

৪। ঈশ্বরী প্রসাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৮৪
৫। ঐ, পৃঃ-৮৫
৬। ঈশ্বরী প্রসাদ, *এ শর্ট হিস্টার অফ্ মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া,* পৃঃ-১২
৭। মহম্মদ হাবিব ও খালিক আহমদ নিজামী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পার্ট ওয়ান, পলঃ-১৩৩
৮। ঐ, পৃঃ-১৮৫
৯। ঐ, পৃঃ-১৩৪
১০। ওম প্রকাশ "স্টানডার্ড অফ্ মরালিটি ইন ইণ্ডিয়া ইন দিন আর্লি মেডিয়িভ্যাল পিরিয়ড", ৩৫তম সেশন, *প্রসিডেংস অফ্ ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস,* পৃঃ-২৯
১১। ঈশ্বরী প্রসাদ, *এ শর্ট হিস্টরি অফ্ মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া,* পৃঃ-১০
১২। ঐ, পৃঃ-১০
১৩। জে. এল. মেহেতা, *অ্যাডভান্সড স্টাডি ইন দি হিস্টরি অফ্ মেডিয়িভ্যাল ইণ্ডিয়া,* পৃঃ-৩১
১৪। ঐ, পৃঃ-২৭৫
১৫। ইউ, এন, দে, *অ্যাডমিনিষট্রেটিভ সিস্টেম অফ্ দিল্লী সুলতানেট (১২০৬-১৪১৩)* পৃঃ-৩৩
১৬। কে. এম. মুনসি, *দিল্লী সুলতানেট* (৬ষ্ট খণ্ড) পৃঃ-৪৪০।
১৭। রিচার্ড এন, ইএটন, দি রাইজ অফ্ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, ১২০৪-১৭৬০, পৃঃ-২৯
১৮। মহম্মদ হাবিব ও খালিক আহমদ নজামী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পার্ট ওয়ান, পৃঃ ২৮১।
১৯। মজুমদার রায়চৌধুরী অ্যান্ড দত্ত *অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্টারি অফ্ ইণ্ডিয়া,* পৃঃ-২৯৪
২০। ঐ পৃঃ ২৯৮
২১। ঐ, পৃঃ ৩৮৪

ভারামল্লপুরের মন্দির স্থাপত্য ঃ শিল্পের পুরাতত্ত্বে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাঙলার পরিবর্তনশীল সমাজ

শর্মিলা সাহা

আনুমানিক ষোড়ষ শতক থেকে পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে, বিশেষত সমসাময়িক মধ্যে ও দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে (বর্তমান বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়) এক নতুন শৈলীর হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্য রীতির বিকাশ দেখা যায়। ক্রমে সপ্তদশ ও মধ্য অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী পর্বে দক্ষিণবঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলে এই বাঙলা রীতির স্থাপত্য ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকে সমসায়িক একাধিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পশ্চাৎপটে এই শিল্পরীতিতে আঞ্চলিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। শুরুতে বাঙালার এই মন্দির স্থাপত্য রীতির মধ্যে বহু ধরনের বাহ্যিক প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকলেও সাথে সাথে এই ধর্মীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও ইসলামিয় রীতির সংমিশ্রণে চালা, রত্ন, দালান ইত্যাদি উপপ্রজাতির সৃষ্টি হতে থাকে। মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকে এই শিল্পরীতির বাহ্যিক প্রকাশে ভাঙ্গন ও পতন দুই-ই শুরু হয়।

ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিক সামাজিক জটিলতার ফলে মধ্যযুগীয় মন্দির স্থাপত্য বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে অষ্টাদশ শতকীয় বাঙলায় হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে ক্ষেত্রানুসন্ধানের ভিত্তিতে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হবে এবং ঐ অঞ্চলের মন্দির নির্মাণ শিল্পের সম্পর্কের ইতিহাসও পুনর্গঠনের চেষ্ঠা করা হবে। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মূলতঃ তিন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ ঐ অঞ্চলে অবস্থিত মন্দিরগুরি স্থাপত্য-ভাস্কর্য শৈলী, দ্বিতীয়তঃ, মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি সংক্রান্ত তথ্য ও সন তারিখ এবং তৃতীয়তঃ, স্থানীয় কিংবদন্তী ও মৌখিক ইতিহাস।

বর্তমান হুগলী জেলার কেন্দ্রিক অংশে অবস্থিত তারকেশ্বর এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বর্তমানে একটি আঞ্চলিক শৈব তীর্থ। লৌকিক ইতিহাস অনুযায়ী এবং অঞ্চলের মধ্যযুগীয় নাম ভারামল্লপুর কারণ, তারকেশ্বরের শৈব মন্দির ও মঠ নির্মাণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভারামল্ল নামক এক স্থানীয় রাজা। কিংবদন্তী আরও বলে যে, এই ভারামল্ল কনৌজ থেকে আগত এক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। বর্তমানে ভারামল্লপুর

নামটি তারকেশ্বরের ৬ কি.মি. উত্তর-পূর্ব ভারামলপুর নামক গ্রাম ভারামল্লপুরের মধ্যযুগীয় স্মৃতি বহন করছে। এখন প্রশ্ন হল, তারকেশ্বরের শৈব প্রতিষ্ঠানের সাথে ভারামল্লের প্রকৃত সম্পর্ক কি?

এই প্রশ্নগুলির সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম তারকেশ্বর সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় লিখিত নথির দিকে চোখ রাখতে হবে। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন নামক কাব্যগ্রন্থে সম্ভবতঃ প্রথম তারকেশ্বরের নাম পাওয়া যায়।[১] এই কাব্যগ্রন্থ ও তারকেশ্বরের ইতিহাসের সাথে এই গ্রন্থের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনা করেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচায।[২] তাঁর অভিমত উল্লেখনীয়ঃ

ভুরশীটের রাজা নরনারায়ণ রায় কবির প্রপৌত্র বাসুদেব রায়কে মহাত্রান ভূমি দান করিয়াছিলেন (হাওড়া কালেকট্রির ৪৩০৫৮ নং তায়দাদ)। উক্ত বাসুদেব ১১৫৯ সালে জীবিত ছিলেন না। অপর দিকে রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২-১১১৮ সাল। সুতরাং বাসুদেবের প্রপিতামহ কবি রামকৃষ্ণের প্রথম অভ্যুদয়কাল ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে যাইবে না। .....ভারামল্লে জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুদাসই প্রতম বালিগড়ি পরগণার জমিদার ছিলেন। তদনুসারে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রাজা বিষ্ণদাসকে কিছুতেই ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে টানিয়ে আনা যায় না।

দীনেশচন্দ্রের উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণে একাধিক ক্রটি স্পষ্ট। প্রথমতঃ, তিন পুরুষে এক শতাব্দীর হিসাব ইতিহাস কালানুক্রম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, নরনারায়ণের রাজত্বকালের সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না এবং সর্বোপরি, শিবায়ন কাব্যের কাব্যশৈলী অবশ্যই ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তীকালীন।[৩] শিবায়ন কাব্যের তাৎপর্য হল তারকেশ্বর অঞ্চলে মন্দির নির্মাণের ইতিহাসের আগেই তারকেশ্বর নামের পরিচিতির প্রমাণ দান করা। তারকেশ্বর সংক্রান্ত ইতিহাস উম্মোচন অন্য যে কিংবদন্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, ভারামল্লকে তারকেশ্বর মঠ নির্মাণের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বর্ণনা করা হলেও তারকেশ্বর মন্দিরের নির্মাণের সাথে মুকুন্দ ঘোষ নামক এক গোপালক শ্রেণীর ব্যক্তির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বলা হয়, প্রাথমিক পর্বে এই ব্যক্তি তারকেশ্বরের শিবলিঙ্গের আবিস্কর্তা এবং পূজারী হলেও, পরবর্তীকালে তার পূজার্চনায় ক্রটি দেখা দেওয়ার স্বয়ং দেবাদিদেব একজন ক্ষত্রিয় দ্বারা মন্দির নির্মানের নির্দেশ দেন এবং ব্রহ্মাণ পূজারীও নিযুক্ত করা হয়। ভারামল্ল স্থানীয় রাজারূপে কর্তব্যটি সমাধা করেন এবং জনৈক চতুর্ভূজ গাঙ্গুলি নামক ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত করা হয়। এই কিংবদন্তীর অপরিসীম গুরুত্ব যথাসময়ে আলোচিত হবে।

তারকেশ্বরের মূল মন্দিরের প্রতিষ্টালিপি শুভমস্ত স(শ)কাব্দা ১৬৪৩ অর্থাৎ ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়। ভারামল্ল কর্তৃক দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের স্থানীয় আদিপুরুষ

মায়াগিরি ধূম্রপান নামক ব্যক্তিকে শৈব মঠ নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন। এই মঠ নির্মাণের স্বীকৃত সময় ১৭২৯ সাল।[৪] কিন্তু তারকেশ্বরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে (বালিগড়ি, জয়নগর, প্রতিহারপুর, বাহিরগড়, রামনগর, শ্যামপুর, ভারামলপুর ও বিনোগ্রাম) একাধিক প্রতিষ্ঠালিপি সম্বলিত চালা ও রত্ন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলির মধ্যে লিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রাচীনতম মন্দিরটি ১৭৫০-৪১ খ্রিষ্টাব্দে এবং সাম্প্রতিকতম মন্দিরটি ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতার নাম (বীরেশ্বরগুণাকর ও রামকানাঞ্চি(ই) দেবস(শ)র্মা জানা যায়। এই নামগুলির সাথেও তারকেশ্বরের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস প্রত্যক্ষরূপে জড়িত। এখানে উল্লেখ্য, উপরোক্ত গ্রামগুলির মধ্যে বাহিরগড়, ভারামলপুর এবং রামনগরের সাথে স্থানীয় কিংবদন্তী ভারামল্ল ও তার ভ্রাতা বিষ্ণুদাসকে সম্পর্কিত করে।

তারকেশ্বর অঞ্চলের মধ্যযুগীয় ইটের মন্দিরগুলির ধর্মীয় চরিত্র সর্বত্রই বৈষ্ণব অথবা শৈব। স্থাপত্যের দিক থেকে মন্দিরগুলির মধ্যে হিন্দু ও ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। ত্রিখিলানযুক্ত তোরণদ্বার, গম্বুজাকৃতি ছাদ, তোরণের উপরের অংশের খাঁজবিশিষ্ট প্রান্তদেশ, রোসট্ নামক গোলাপাকৃতি টেরাকোটা বৈশিষ্টের উপর্যুপরি ব্যবহার, বিমূর্ত ফুল, ফল, লতাপাতার অলঙ্করণ এবং উল্লম্বরীতিতে মন্দিরগাত্রে প্রোথিত পদ্মের গবাক্ষ অলঙ্করণ মন্দিরগুলির উপর সমসাময়িক ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির প্রত্যক্ষ অলঙ্করণ মন্দিরগুলির উপর সমসাময়িক ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির প্রত্যক্ষ অভিঘাত প্রমাণ করে। ধর্মীয় দৃশ্যের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি সার্বিকভাবে তিন ধরনের ধারণা বা theme-কে প্রকট করে। প্রথমত প্রচুর পোড়ামাটির ফলকে শিব ও শিবের পূজার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর একাধিক সুনির্মিত মূর্তিও চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া রামায়নের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে *সেতুবন্ধন পর্ব* (জয়নগর) ও রাম-রাবণের যুদ্ধের (বালিগড়ি) দৃশ্যগুলি টেরাকোটা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। জয়নগরের একটি মৃৎফলকে খোদিত তাঁতীর তাঁত বোনার দৃশ্যটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, ভাস্কর্য শৈলীর নীরিখে শিব বৈষ্ণব ও মহাকাব্যিক কাহিনীগুলিই এই মন্দিরগুলির হিন্দু ভাস্কর্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

তারকেশ্বরের মন্দির নির্মাণের পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ও সমসাময়িক মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্যগুলির বিশ্লেষণ ও পুনর্বিশ্লেষণ করলে দক্ষিণ বাংলার একটি ক্ষুদ্র জনপদে অষ্টাদশ শতকে সংঘটিত এক আঞ্চলিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথমত ভারামল্লের ঐতিহাসিকতা পুরাতত্ত্বের সাপেক্ষে বিচার্য। একটি গ্রামনাম ছাড়া এই ব্যক্তি সংক্রান্ত কোন ঐতিহাসিক দলিল এই মুহুর্তে নেই। *শিবায়ন* কাব্যের বক্তব্যের ভিত্তিতে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, তারকেশ্বর নামক স্থানের নাম ১৭২১ খ্রিঃ মন্দির ও ১৭২৯ খ্রিঃ মঠ নির্মাণের পূর্বেই মানুষ জানত। গ্রামনামের ভিত্তিতে ভারামল্লের

ঐতিহাসিকতাকে স্বীকৃতি দন করলে অবশ্যই ভারামল্লপুর নামক জনপদের জন্ম ১৭২১ অথবা ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দের পরেই হয়েছিল। সুতারং কিংবদন্তী অথবা ইতিহাসের ভারামল্ল ও তাঁর নামানুসারে জন্ম নেওয়া ভারামল্লপুর অস্তিত্ব লাভ করে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে।

প্রশ্ন আসে, কে এই ভারামল্ল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনেকগুলি সাক্ষ্যকে একতিত্রত করতে হবে। প্রথমেই বালা যায় কিংবদন্তীর মুকুন্দ ঘোষ একজন গোপ বংশীয় ব্যক্তি। পশ্চিমবঙ্গে অপর এক ভৌগোলিক অঞ্চলে ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতকে গোপ বংশীয় কিছু স্থানীয় নিম্নবর্গীয় শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গোপভূম নামক এক প্রভাবশালী স্থানীয় আধাস্বাধীন আঞ্চলিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল।[৫] ভারামল্লপুরের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রামাণাদি না থাকলেও মুকুন্দ ঘোষের *গোপালক* পবিচয় গোপনের উদ্দেশ্যেই যে ভাবামল্লের আগমন হয়েছিল এরূপ ব্যখ্যা অযৌক্তিক নয়। ভারামল্লের ক্ষত্রিয় পরিচয়ের উৎস সন্ধানে বর্তমানে এরূপ কোন সাক্ষ্য নেই যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোন ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করে ভারমল্ল পরবর্তীজীবনে সুদুর কনৌজ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের এই প্রত্যন্ত গ্রামে অভিপ্রয়াণ করেছিলেন। বরং *ভারামল্ল* বা *বিষ্ণুদাস* নামগুলি বাঙলার স্থানীয় নিম্নবর্গীয় জাতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষাগতভাবে ভাবামল্ল শব্দটি *বীরমল্ল* (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা) শব্দের অপভ্রংশ। বিষ্ণুপুর এবং বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য অংশ জুড়ে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে মল্লগোষ্ঠীয় নিম্নবর্গীয় রাজাগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব কবেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সংস্পর্শে সমগ্র মল্লভূমব্যাপী ব্যাপক মন্দির নির্মাণ (মূলত বৈষ্ণব ও শৈব) কার্যও পরিচালিত হয়েছিল মল্লদের দ্বারা।[৬] মল্লগোষ্ঠী প্রাথমিক পর্বের ব্যক্তিত্বদের যুদ্ধবৃত্তির সাথে সরাসরি সংযুক্ত করা হযেছে।[৭] সুতরাং, মল্ল রাজত্বকালের শেষাংশে কোন মল্ল বংশোদ্ভূত প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষে ঐ অঞ্চল থেকে তারকেশ্বরে এসে বসতি স্থাপন করা অসম্ভব নয়, যদিও শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত নয়। ভারমল্লের ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত না হলেও একথা নিশ্চিত যে তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেও কনৌজ ক্ষত্রিয় ছিলেন না। আঞ্চলিক সমাজ বিবর্তনের একটি স্তরে নিছক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার জন্য তাঁকে ক্ষত্রিয় হতে হয়েছিল।

ভারামল্ল পরিচয় কি তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল *ভারামল্ল* কেন ও ভারামল্লকে ক্ষত্রিয় পরিচয় গ্রহণ করতে হল কেন? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মধ্যযুগীয় ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের এক বিশেষ নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বের দিয়ে চোখ ফেরাতে হবে। বস্তুনির্ভর এই তত্ত্বের সাথে ভারামল্লপুর সংক্রান্ত পুরাতাত্ত্বিক ও লিখিত দলিলগুলিকে সম্পৃক্ত করতে পারলে হয়ত একটা সন্তোষজনক মীমাংসার দিকে এগোতে পারব।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে, মধ্যযুগীয় বহু উপজাতীয় ও নিম্নবর্গীয়

গোষ্ঠী বিভিন্ন ভৌগলিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে প্রধানত চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্ম ও শঙ্করাচার্য্য প্রভাবিত শৈব ধর্মই এই জাতিগত তথা সামাজিক বিবর্তনের চালিকা শক্তিরূপে ক্রিয়া করেছে। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস দর্শনের সমাজ বিবর্তনের এই ধর্মীয় পন্থাকেই সংস্কৃতায়ণ নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৮] পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী তারকেশ্বরের মূল মন্দির (১৭২১খ্রিঃ) ও সংলগ্ন অঞ্চলের অপর প্রাচীনতম মন্দিরটির (১৭৪০-৪১ খ্রিঃ) নির্মাণের সময়কালের মাঝে দুই দশকের এক বিরাট ব্যবধান। এই দুই দশক সময়ের মধ্যেই মুকুন্দ ঘোষকে প্রতিস্থাপিত করে ভারামল্লের আর্বিভাব ঘটেছে এবং তাঁর ক্ষত্রিয়করণও ঘটেছে — সংস্কৃতায়ন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে।

একটি প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারামল্লের ক্ষত্রিয়করণের মুখ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল কারা এবং এই ভূমিকা গ্রহণের পিছনে কি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল? ভারামল্লকে শৈব ধর্মের সাথেই যুক্ত করা হল কেন?

তারকেশ্বরের এক প্রভাবশালী স্থানীয় সিংহরায় গোষ্ঠী, যারা নিজেদের রাজপুত বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে, নিজেদের ভারামল্লের সাথে রক্তসম্পর্কে যুক্ত করে এবং তারকেশ্বরের দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠেও এই গোষ্ঠীর প্রভাব বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তারকেশ্বরের মঠের সাথে এই গোষ্ঠীর এক দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় তারকেশ্বরের অনতিদূরস্থ মাখালপুরের জমিদার মনোমোহন সিংহরায়ের জবানবন্দি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন[৯]

My ancestors came with Keshab Hazari ...10-12 clans of the same caste came with Keshab Hazari. Gobardhan Singha, my ancestor married Keshab Hazari's daughter. Our priests, Kanauj Brahmins, came with Keshab Hazari ...

এই জবানবন্দি থেকে স্পষ্ট যে, সিংহরায় গোষ্ঠীর সাথে ভারামল্ল গোষ্ঠীর (কেশব হাজারী ভারামল্লের পিতা—এরূপ কিংবদন্তীই প্রচলিত) আত্মীয়তা বৈবাহিক, রক্ত সম্পর্কিত নয়। সিংহরায় গোষ্ঠীর অভিপ্রয়াণ সংক্রান্ত সমস্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। মূল কথা হল জমিদারীর অর্থনৈতিক সংগঠন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারামল্লের মত সাময়িক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ক্ষত্রিয়রূপে বৈধতা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। একই সাথে শৈব ধর্মের ছত্রছায়ায় এই সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে ভারামল্লকে মন্দির নির্মানের বৈধ অধিকারীরূপে প্রমাণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত মূল তারকেশ্বর মন্দির ছাড়া ভারামল্লপুরের অন্যান্য মন্দিরের সাথে ভারাবল্লের কোন সম্পর্কের কথা স্থানীয় ইতিহাস বলে না। কিন্তু পুর্বোল্লিখিত *বীরেশ্বরগুণাকর* (১৭৪০ খ্রি মন্দিরের নির্মাতা) ও রামকানাই (১৯৪৭ খ্রিঃ মন্দিরের নির্মাতা) দুইজনকেই

সিংহরায় গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরূপেই দাবী করেন মাখালপুরের জমিদারের বর্তমান বংশধর। সুতরাং এই অঞ্চলে মন্দির নির্মাণর ধারাবাহিক প্রথার ধারক প্রকৃতপক্ষে এই সিংহরায় গোষ্ঠী। প্রাথমিক পর্বে মুকুন্দ ঘোষের প্রতিস্থাপন দ্বারা ভারামল্লের আগমন এবং পরে ভারামল্লের ক্ষত্রিয়করণের দ্বারা স্থানীয় জমিদার গোষ্ঠীর ধর্মাশ্রয়ী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইতিহাসই উন্মোচিত হয় ভারামল্লপুরের পুরাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যের দ্বারা। কিন্তু কেন শৈব ধর্ম? আমরা জানি আদি মধ্যযুগ থেকেই শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবের ফলে পূর্বভারতে শৈব ধর্মের প্রসার শুরু হয়। হুগলীর মহানাদ অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য একথা নিঃসন্দেহে প্রমান করে।[১০] ক্রমে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ও আঞ্চলিক ধর্মীয় বিদ্রোহগুলি সমসাময়িক আঞ্চলিক শাসকগোষ্ঠীকে ধর্মের সাথে মিথোজীবিতা স্থাপনে বাধ্য করে নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণে। এমতাবস্তায় বৈষ্ণব-শৈব দ্বিত্বের মধ্য দিয়ে তারকেশ্বর নামক ক্ষুদ্র জনপদ ক্রমে ভারামল্লপুর নামক অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ধর্মীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের এককে পরিণত হয়।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের এক পরবর্তী অধ্যায়ে, আঃ ঊনবিংশ শতক থেকে ভারামল্লপুর ক্রমাগত রাজকীয় ঐতিহ্য হারাতে আরম্ভ করে এবং একই সাথে তারকেশ্বর নামক শৈবতীর্থের পুনরুত্থান হয়। এই পর্বের ইতিহাসের আলোচনা এক পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে, কিন্তু সেই ইতিহাস আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র সীমায় আলোচিত হওয়া অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্ভব।

সূত্র-নির্দেশ

১। বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ: ৩৭১।

২। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৬২, পৃ: ৮০০-৮০১।

৩। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় কৃত *শিবায়ন*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

৪। বিনয় ঘোষ, ঐ, পৃ: ৩৭৯।

৫। পরমানন্দ আচার্য্য, *এ নোট অন দ্য "ভূম" কান্ট্রিজ ইন ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া* (ইন্ডিয়ান কালচার, খণ্ড ১২), ১৯৪৫, নং ২, পৃ: ৩৭-৪৬।

৬। হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *মল্লভূম* (সুরজিৎ সিন্হা সম্পাদিত *ট্রাইবাল্ পোলিটিক্স এণ্ড স্টেট্ সিস্টেম ইন প্রিকলোনিয়াল নর্থ ইস্টার্ণ এণ্ড ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া*), কলিকাতা ১৯৭৮, পৃ: ৭৩-১৪২।

৭। আর. সি দত্ত, *দ্য অ্যাবরিজিনাল এলিমেন্টস্ ইন দ্যা পপুলেশন অব্ বেঙ্গল (ক্যালকাটা রিভিউ,* নং সি এল) ১৮৮২, পৃ: ২৪২।

৮। এম. এন শ্রীনিবাস, *কালেক্টেড এসেজ*, দিল্লী ১৯৯৮ (পুনর্মুঃ), পৃ: ২২১-২৩৫।

৯। চন্দননগর আদালত মহাফেজখানায় রক্ষিত হুগলী ডিস্ট্রিক্ট্ কোর্ট রেকর্ডস্ নং ১৮৫-১৯০ অব্ ফিফ্থ্ আগস্ট, ১৯২৬।

১০। গৌতম সেনগুপ্ত, নিউ এভিডেন্স ইন্ আর্লি বেঙ্গল স্কাল্পচার (দেবলা মিত্র এবং গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত *নলিনীকান্ত শতবার্ষিকী · এন. কে ভট্টশালী সেন্টিনারি ভলিউম্)*, দিল্লী ১৯৮৯, পৃ: ২৩৩-২৩৭।

সারাংশ

তেলীখাই শিলালিপি

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান

সাধারণ ভাবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেসকল উপাদান সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত বলে প্রমাণিত তার মধ্যে অন্যতম হল শিলা লিপির ভাষ্য। শিলালিপি থেকে লিপির কাল এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। শিলালিপি ঘোষণা করে থাকে সমকালীন রাজত্বের কথা, রাজত্বের বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট এবং আঞ্চলিক প্রশাসকদের কথা। শিলালিপি সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যাবলী চমৎকার ভাবে বক্ষে ধারণ করে। শিলালিপি থেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসেরই কথা নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলার ইতিহাসের উপাদান সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি বর্তমান গবেষক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে গত ১৪/০৮/০৩ খ্রিঃ তারিখে। শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছিল ৮৫৬ হিজরীর জিলকদ মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার (১৪৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর)। একটি জামে মসজিদে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিটি বর্তমানে তেলীখাই গ্রামে শাহ তমিজ উদ্দিন (রঃ) এর মাজারে সংরক্ষিত হচ্ছে।

তেলীখাই কিশোরগঞ্জ জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম, বাংলার ভাটি অঞ্চল বলে খ্যাত কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামন থানার কেওয়ারজোর ইউনিয়নে প্রাচীন এই গ্রামটি অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শাহ তমিজ উদ্দিন (রঃ) নামে একজন ইসলাম প্রচারক এই গ্রামটির পত্তন করেন এবং একটি খানকা নির্মাণ করেন। ঐ খানকাকে কেন্দ্র করে অথবা বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্ব কালে তার আঞ্চলিক প্রশাসক উলুঘ রহমান এর প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে সম্ভবত একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমানে মসজিদের কোন অস্তিত্ব না থাকায় মসজিদ সংলগ্ন শাহ তমিজ উদ্দিন (রঃ) এর মাজারে শিলালিপিটি সংরক্ষিত হচ্ছে। সারাজ ভূঞা, পিতা মৃত আমীর হোসেন ভূঞা, মাজারটির খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্বে এই বাড়িটি ফকির বাড়ি নামে পরিচিত ছিল, বর্তমানে ময়দার আলী ভূঞার বাড়ি হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। কিশোরগঞ্জ জেলা সদর শহর থেকে তেলীখাই গ্রামের দূরত্ব আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণ কোণে। মিঠামন থানা সদর থেকে তেলীখাই গ্রামের দূরত্ব প্রায় নয় কিলোমিটার পূর্বদিকে প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলে।

শিলালিপি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে সর্বমোট ১৫ টি শিলালিপি ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিগুলো পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। ডঃ আবদুল করিমের মতে দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে, দুটি বিহারের ভাগলপুরে, একটি বীরভূম জেলার বালাপুরে, ১টি ময়মনসিংহ জেলার ঘাঘরা গ্রামে, ১টি মালদহ জেলার মোগলটুলিতে, ১টি হুগলী জেলার সাতগাঁওয়ে, ২টি ঢাকা শহরে, ১টি গৌড় নগরীর কতোয়ালী দরওয়াজায়, ১টি পাড়ুয়ার ছোট দরগাতে এবং ৩টি বাগেরহাটে। অন্যদিকে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় *দুশো বছরের স্বাধীন সুলতানী আমল গ্রন্থে* বলেছেন, নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বালিয়াঘাট (জঙ্গীপুর) গৌড়, সাতগাঁও, হযরত পাড়ুয়া, ঢাকা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, ঘাঘরা (ময়মনসিংহ), কেওয়ারজোর (ময়মনসিংহ)। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামন থানার অন্তর্গত ঘাঘরা ও কেওয়ারজোর দুটি পাশাপাশি ইউনিয়ন।

ডঃ আব্দুল করিম ময়মনসিংহ জেলার ঘাঘরা গ্রামে (বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত) একটি মাত্র শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেনে। অন্যদিকে সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন কেওয়ারজোর এবং ঘাঘরা গ্রামে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

মৌলবী শামসুদ্দিন আহমেদ তার ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল গ্রন্থে বলেছেন ঘাঘরা শিলালিপিটি পন্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে। ফলে শিলালিপি প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরোও বলেছেন যে, ঘাঘরা গ্রামের প্রকৃত অবস্থান, লিপির তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্যই তার জানা ছিলনা, তিনি আরোও বলেছেন ডঃ আহম্মদ হাসান দানী চোখে দেখা থেকে যে পাঠটি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই পাঠটি তিনি তার গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। যে পাথর খণ্ডে লিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে সেই পাথরটির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওযায় সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মৌলবী শামসুদ্দিন আহমেদ তার *ইন্সক্রিপশন অব বেঙ্গল গ্রন্থে* কতকগুলি শব্দের পরিবর্তন করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে ঘাঘরা ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে শিলালিপির সন্ধান করেছি। কিন্তু সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালের কোন শিলালিপির সন্ধান পায়নি। তবে কেওয়ারজোর ইউনিয়নের তেলীখাই গ্রামে আলোচ্য শিলালিপিটির থেকে ধারণা করা যায় যে, সম্ভবত এই শিলালিপিটির কথাই আব্দুল করিম এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও মৌলবী সামসুদ্দিন আহম্মদ ঘাঘরা শিলালিপি নামে যে শিলালিপিটির পাঠ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেই শিলালিপিটির পাঠের সাথে এই শিলালিপির পাঠের পার্থক্যটি উপরে দেখানো হয়েছে। ফলে ধারণা করা যায়

যে, এই শিলালিপিটির পাঠ, এবং লিপি বৈশিষ্ট্য ইত্যাটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

এছাড়া ও মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদ তাঁর *ইন্সক্রিপসন অব বেঙ্গল* গ্রন্থে ঘাঘরা গ্রামের যে শিলালিপিটির কথা উল্লেখ করেছেন, ঐ শিলালিপিটির বিবরণ উপস্থাপন কালে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, শিলালিপিটির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আলোচ্য শিলালিপিটির কোন অংশই নষ্ট হয়ে যায়নি এবং শিলালিপিটির কোন শব্দ অথবা বাক্য অস্পষ্ট হয়নি। তবে শিলালিপিটির কিছুটা অংশের লেখা জটিল হওয়ায় পাঠ উদ্ধার কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় শিলালিপিটি বর্তমান সময়ে আবিষ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি বলা যেতে পারে।

লিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে মাহমুদ শাহী বংশের সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন ঐ বংশের প্রথম সুলতান। মুদ্রার স্বাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি ১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহকে অনেকে ইলিয়াস শাহী বংশের অধস্তন বলে মনে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকাণ থেকে বিশ্লেষণ করলে তাৎক্ষণিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। কেননা তিনি যে কোন সুলতানের পুত্র ছিলেন অথবা পূর্ববর্তী কোন সুলতানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন তারও কোন প্রমাণ কোন শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়না।

আলোচ্য শিলালিপিতে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহকে 'আসসুলতানুল আজম উল মোয়াজ্জম' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে মহান সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার সালতানাত তিমি অধিকার করেছিলেন এবং তার প্রতিপক্ষকে তিনি যে কোন প্রকারেই হোক পরাজিত করে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। শিলালিপিতে মাহমুদ শাহকে 'খলিফাতুল্লাহ বিলহুজ্জাতে ওয়াল বুরহান' অর্থাৎ দলিল ও সাক্ষ্য মতে তিনি আল্লাহর খলিফা। বিষয়টি ধারণা করা যায় যে, ইতিপূর্বে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ মুদ্রায় ও শিলালিপিতে 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। আর তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহও একই উপাধি গ্রহণ করেন। তবে তিনি দাবি করেন যে, দলিল ও সাক্ষ্যমতে তিনি আল্লাহর খলিফা।

শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট অঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা অধিকারভুক্ত হবার পর হযরত শাহজালাল (রঃ) এর অনুসারীগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ঐ সময় প্রাচীন ভাটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তেলীখাই এবং ভরাগ্রামে যথাক্রমে হযরত তামিজ উদ্দিন শাহ (রঃ) এবং হযরত লতিফ ইয়ামনি (রঃ) আগমন করেন। তাঁরা এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আলোচ্য শিলালিপি থেকে খান মোয়াজ্জম উলুঘ রহমান নামে একজন প্রভাবশালী প্রশাসকের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি সম্ভবত বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলা এবং সিলেট জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে বাংলার সুলতানের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শিলালিপির বিবরণ

৩৬˝ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ২৪˝ ইঞ্চি প্রস্থ একটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ পাথরের উপর লিপি উৎকীর্ণ। তিন সারিতে খোদাই করা লিপিগুলোকে দুটি মধ্যবর্তী ১˝ ইঞ্চি প্রস্থ রেখা দ্বারা সারি তিনটিকে বিভক্ত করা হয়েছে। সারির প্রত্যেকটির প্রস্থ ৬˝ ইঞ্চি করে। শিলালিপিটি বর্তমানে হযরত শাহ তামিজ উদ্দিন (রঃ) -এর মাজারে অভ্যন্তরে একটি কাঠের চৌকিতে রাখা হয়েছে। তবে সব সময় একটি লাল কাপড় দ্বারা শিলালিপিটিকে ঢেকে রাখা হয়। শিলালিপির কোন অংশই নষ্ট হয়ে যায়নি।

শিলালিপির পাঠ

১) আল্লাহর তায়ালা বলেন- নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ আল্লাহর ইবাদতের জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না। এই জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে সময় ও যুগের সেই সুলতানের দ্বারা যিনি জনগণের জন্য নিরাপত্তা বিধানকারী এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) এর রাজত্বের উত্তরাধিকারী।

২) মহা সম্মানিত মহামহীয়ান সর্ব্বোচ্চ মর্যাদাবান ও গরিয়ান, মুকুট ও অঙ্গুরীয়ের অধিকারী দলিল ও সাক্ষ্য মতে আল্লাহর খলিফা মোমেনদের নেতা দীন ও দুনিয়ার সাহায্যকারী।

৩) আবুল মোজাফফর মাহমুদশাহ সুলতান আল্লাহ তার রাজত্ব ও প্রতিপত্তিকে স্থায়ী করুন এবং হুকুমত ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখুন। এই জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা খান মহান উলুঘ রহমান.................নির্মাণ তারিখ ৮৫৬ হিজরীর জিলকদ মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার।

ঐতিহাসিক উপকরণ বিশ্লেষণ

শিলালিপিটি পর্যালোচনা করলে বাংলার সুলতানী আমলের ইতিহাসের নতুন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। শিলালিপিটি থেকে অনুমান করা যায় নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করেছিলেন। ইতিপূর্বে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা সম্ভবত আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার রাজত্বকাল ছিল দীর্ঘ। সুখ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল তার রাজত্বের সর্বত্র। শিলালিপিটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার প্রথম সুলতান যিনি দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণ

সহ আল্লাহর খলিফা এবং আমীরুল মোমেনীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের অনেক সুলতান বাগদাদের খলীফাদের আনুগত্য স্বীকার করেই তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এই প্রথম বাংলার একজন স্বাধীন সুলতান নিজেকে আল্লাহর খলিফা এবং আমীরুল মোমেনীয় হিসেবে শিলালিপিতে ঘোষণা করার বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য শিলালিপি খেকে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের একজন নতুন শাসন কর্তার নাম জানা যায়। এই ক্ষেত্রে শিলালিপির একটি অংশের পাঠ বড়ই জটিল হওয়ায় শুধুমাত্র 'খান মোয়াজ্জম উলুঘ রহমান' এইটুকু জানা যায়। খান মোয়াজ্জম উপাধি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি একজন প্রভাবশালী আঞ্চলিক প্রশাসক ছিলেন। তবে সাধারণ অর্থে 'উলুঘ' উপাধিটি প্রশাসনিক অঞ্চলের সামরিক ক্ষমতার অধিকারী শাসন কর্তাকে বুঝায়।

আলোচ্য শিলালিপিটির প্রাপ্তিস্থান লক্ষ্য করলে বিষয়টি বিস্ময়ের ব্যাপার হয় যে, শিলালিপির উৎকীর্ণের সময়কালে বিশাল হাওরে নিমজ্জিত অঞ্চল মিঠামন থানার এই তেলীখাই গ্রামটিতে মানব বসতির বিষয়টি। তাছাড়াও সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বের বিস্তৃতির বিষয়টিও এই শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায়।

শিলালিপি থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত ঐ সময় সমগ্র সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ খান মোয়াজ্জম উলুঘ রহমানের প্রশাসনিক অঞ্চলের আওতাধীন ছিল। ফলে তার প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার্থে এবং মধ্যবর্তী স্থানে তার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তেলীখাই গ্রামের পার্শে ভরা গ্রামে মালিকের দরগায় ও তার আশেপাশে প্রাচীন দালান কোটা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলে এই বিষয়টি সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

শিলালিপির ভাষা ও লিপি তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ

শিলালিপিটি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একজন সুদক্ষ্য লিখন শিল্পীর হস্তে এই অসাধারণ কর্মটি সম্পাদিত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে প্রস্তরখণ্ডটি বড় আকারের হওয়ায় অনেক তথ্য এই শিলালিপিতে পরিবেশন করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বের সময় বাংলাদেশে আরবি ভাষার ব্যাপক উৎকর্ষ ঘটেছিল। বিশেষ করে আরবি লিখন পদ্ধতির উৎকর্ষের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভাষা কিংবা ব্যাকরণগত কোন ত্রুটি এই শিলালিপিতে পরিলক্ষিত হয় না।

লিপিতে ব্যবহৃত আলিফ ও লাম অক্ষরের লম্ব দণ্ড এবং দণ্ডের নিম্ন অংশে সুবিন্যস্ত অক্ষর সমূহ বিশেষ করে আনুভূমিক বাহুর আনুপাতিক ব্যবহার পরিমাপ করলে এই শিলালিপিকে গোলায়িত লিখন পদ্ধতির নাসখের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মুঘল ও নবাবী আমলে মেদিনীপুরের অর্থনৈতিক জীবন

রাজর্ষি মহাপাত্র

বিভিন্ন পর্যটকদের বিক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে মুঘল আমলে বঙ্গদেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার যথাযথ চিত্র পাওয়া মুশকিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে মেদিনীপুরের জনসাধারণকে মোটামুটি তিনভাগে স্পষ্টতই ভাগ করা যায়। উচ্চবিত্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাকি অন্যান্য সম্প্রদায়।

মুঘল আমলে মেদিনীপুরে খালসা ও জায়গীর এই দুই ধরনের জমিতে জমিদারী প্রচলিত ছিল। তবে মুঘল রাজত্ব কিন্তু মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহালগুলির কৃষি-অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

আবার ভূমি রাজস্ব সংগ্রহে নিদারুণ কঠোরতা দেখা যায় মুর্শিদকুলীর সময়ে। অবশ্য এসময়ে মেদিনীপুরে গ্রামের সংখ্যা ছিল অনেক এবং জমিদারদের কিংবা তালুকদের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। আলিবর্দীর আমলেও জমিদাররা সমৃদ্ধশালী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের কয়েকটি পরগণায় তাঁতীদের কাপড় তৈরী করতে দেখা যায়। অবশ্য জমির মালিক অথবা তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা খুবই মুসকিল। ক্ষীরপাই ও রাধানগরে প্রচুর বস্ত্র উৎপাদন হত। হিজলী ও তমলুকে প্রচুর পরিমাণ লবন উৎপন্ন হত। তমলুক সে যুগে দাসব্যবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল তাও জানা যায় একটি ফার্শী বিবরণে। হিজলী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেসময়ে চন্দ্রকোনা ও রাধানগর তুলা, কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য তৈরীর একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

কাট্‌রা মসজিদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, এইচ ১১৩৭/এডি ১৭২৪-২৫ তৈরী

রাশেদা ওয়ায়েজ

অবস্থান ঃ

কাট্‌রা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের দু মাইল পুর্বদিকে অবিস্থিত। মসজিদটি একটি উচ্চ বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ৫৪ মিটার আয়তনের একটি বর্গাকার প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি ভিতের উঁপরে এটি দন্ডায়মান। প্রতিটি পার্শ অংশ ১৬৬।

স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ

মুর্শিদকুলী খানের লাল ইটের কাট্‌রা মসজিদ দেখলে অবাক হতে হয়। প্রথমেই সম্মুখ অংশে বাগান তারপর কাট্‌রা মসজিদ চত্তরে প্রবেশ করতে হবে। আয়তাকৃতির এক আইলে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির পরিমাপ ৩৯.৬২ মিটার x ৭.৩২ মিটার। মসজিদটি, যেটিতে মুর্শিদকুলী খানের কবরও অন্তর্ভুক্ত তার মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে অথাৎ ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। কাট্‌রা মসজিদটি তৈরী করা হয় নতুন রাজধানীর জামে মসজিদ রূপে। মসজিদটি সবদিক থেকে দ্বিতল কক্ষ — প্রতিটি কক্ষ (সেল) গম্বুজ দ্বারা পরিবেষ্টিত। চারটি বৃহৎ মিনার পাইলন আকৃতির ইজিপশিয়ান নমুনায় তৈরী। বর্তমানে চারটি মিনারের মাত্র, দুটি অক্ষত অবস্থায় দন্ডায়মান। উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বৃহদাকার মিনার দুটি আজও দন্ডায়মান। অষ্টাকোণাকৃতি মিনারগুলো খুবই শক্ত ও ক্রমে ক্রমে শুরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। ঘুরানো সিঁড়ি পথ মিনারের উপর পর্যন্ত প্রলম্বিত। মসজিদের দু-পার্শ্বস্থ মিনারে উঠতে হলে ৬৭টি সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। আগেই বলেছি সিঁড়িগুলো ঘুরানো এবং উপরে উঠবার সুবিধার জন্য মিনারগুলোর গায়ে বড় বড় ছিদ্র রাখা হয়েছে যাতে সিঁড়িতে উঠতে আলো বাতাসের অভাব না হয়।

মসজিদ প্রাঙ্গন আকৃতিতে চাবকোণাকৃতি - পরিমাপ হচ্ছে ১৩০´ X ২৪´। পাঁচগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ যার দুটো ১৮৯৭ সনে ভূমিকম্পের দরুন ধ্বংশ হয়ে যায়। মসজিদটি চারিদিকে থেকে দ্বিতল কক্ষ সারি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার পূর্ব বারান্দায় ক্রমাগত খিলান দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাট্‌রা বলে অভিহিত কক্ষগুলো মাদ্রাসা ব্যবহৃত হত এবং একই সঙ্গে কাট্‌রা বা ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল। আধুনিক পন্ডিতবর্গ এবং স্থানীয় লোকেরা বলেন খিলান দ্বারা আবদ্ধ সেলগুলোতে বাজার বসত। যা হোক একজন উনবিংশ শতাব্দীর লেখক বলেছেন যে কক্ষগুলোতে কোরান যারা পড়তেন অর্থাৎ হাফেজরা এখানে অবস্থান করতেন যারা সার্বক্ষণিক মুর্শিদকুলী খানের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং ভ্রাম্যমান যাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হতো। এটা খুব অবিশ্বাস্য যে চেম্বারগুলোর দরজা খুলতে গেলে সামনা সামনি ভাবে মসজিদের চত্তরের দিকে খুলতে হবে যেগুলো বাজার হিসাবে ব্যবহার করলে উচ্চ আওয়াজ কিংবা চিৎকার শুনা যাবে। এছাড়া বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় যে মসজিদের ভিতরে মাদ্রাসার ভিত দেখে বাংলায় মাদ্রাসার অবস্থান একই মসজিদ প্রাঙ্গণে যেমন উদাহারণস্বরূপ খান মুহাম্মদ মির্জার মসজিদ ঢাকা (১৭০৬), করটালেব খানের মসজিদ যে দুটি মসজিদ ঢাকায় অবস্থিত, যা মুর্শিদকুলী খান নিজে তৈরী করেন এবং মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কাট্‌রা মসজিদে সাতশত কোরান পাঠক ও ফকির, দরবেশ, এতিম ইত্যাদি বসবাস করতেন।

পূর্ব ফ্যাসাদ অত্যন্ত জাকজমক সহকারে প্যানেল সজ্জায় সজ্জীকরণ এবং দরজাগুলো সুন্দরভাবে অলংকৃত। প্রতিটি দরজা উচ্চ 'মালটি কাস্প' আর্চ দ্বারা বেষ্টিত, কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারে উভয় পার্শ্বে রয়েছে সরু টারেট দ্বারা আবৃত, নামাজ কক্ষটির ঠিক ভিতরের অংশে পাঁচটি bay (বে) স্তম্ভ পথ শেষে কিবলা দেওয়ালে তিনটি করে 'মেহরাব' পরিলক্ষিত হয় এবং এভাবে কাট্‌রা মসজিদে সর্বমোট পনেরটি মেহরাব আছে। ভিতরের অংশে একটি মাত্র হল ঘর দেওয়াল থেকে উত্থিত চারটি আড়াআড়ি খিলানে মোট পাঁচটি (bay) তে বিভক্ত। এভাবে ট্রান্সভার্স আর্চের বাংলাদেশে ব্যবহার আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত খুব প্রচলিত মুগল বিল্ডিংগুলোতে এবং এগুলোর রাজস্থান থেকে উৎপত্তির কোন প্রয়োজন নেই। ছাদের উপরের অংশে সম্মুখ ভাগে দেখা যাচ্ছে সমান্তরাল প্যারাপেট এবং মসজিদের ছাদটিতে পাঁচটি গম্বুজ স্থাপিত। সমান্তরাল প্যারাপেট যা প্রমাণ করে সুরক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং গম্বুজগুলোতে আছে উচ্চ কলসযুক্ত ফিনিয়াল যা পদ্মফুল পাপড়ি ডিজাইনের উপর বসানো।

চারটি মিনারেটের উৎপত্তি খুব সম্ভব লাভ করে রাজকীয় মুগল স্থাপত্য থেকে, উদাহরণস্বরূপ কোণের বসানো মিনারেটগুলো বাদশাহী মসজিদ, লাহোর, পাকিস্তান যেটি তৈরী হয় ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। বাদশাহী মসজিদের মিনারের সঙ্গে কাট্‌রা মসজিদের মিনারের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কাট্‌রা মসজিদে প্রবেশ করতে হলে পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করতে হয়, দরজায় প্রবেশ করতে হলে ১৪টি সিঁড়ি অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয়।

অলংকরণ ঃ

মসজিদের বহিরাংশ চারদিকে চার সমকোণ বিশিষ্ট চতুর্ভূজ সারি বদ্ধ প্যানেল দ্বারা সজ্জিত। এ মসজিদের সজ্জাকরণ জাহানিয়া মসজিদের, গৌড়, ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তৈরী সজ্জাকরণের যথেষ্ট মিল আছে। পূর্ব ফ্যাসাদে যে পাঁচটি খিলান দেখা যায়, এ ব্যবস্থায় ট্রাবিয়েটেড কালো কষ্টি পাথর যুক্ত দরজার ফ্রেমে পিলপা গোল সুক্ষ্মাগ্র খোলা পথ যখন দেখা যাচ্ছে বাংলার যতগুলো মসজিদ ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয় সবগুলোতে পয়েন্টেড আর্চ দেখা যায়, ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদেও গোলাকৃতি খিলান দেখা যায়। এটা খুব সম্ভব বাংলার স্থাপত্যের প্রাথমিক ইউরোপীয় প্রভাব। বাহিরের দেওয়ালের চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে চতুর্কোণাকার প্যানেলের নমুনা আবার জাহানিয়া মসজিদ, ১৫৩৫ (গৌড়) স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা একধরনের চতুর্কোণাকার প্যানেলের নমুনা সজ্জীকরণ গুরাই মসজিদ যা ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মসজিদের এক অংশের অলংকরণ দেখতে পাই, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, রাধামাধবের মন্দিরের সম্মুখ অংশের অলংকরণের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে যেটি পরবর্তীতে নির্মিত হয় (১৭৩৭) খ্রিষ্টাব্দে।

তারিখ ঃ

মসজিদটির দুটি পার্শিয়ান শিলালিপি আছে, একটি মধ্য মেহরাবের মাথায়, অপরটি পূর্ব ফাসাদে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের মাথায়। দ্বিতীয় শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে নির্মাণ কাল ১১৩৭ হিজরী (১৭২৪-২৫) খ্রিষ্টাব্দে। মুর্শিদকুলী খান নিজে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর তৈরী সিঁড়ির নীচে পূর্বদিকে পোর্টালের কবরে আশ্রয় নেন যেটি ছাদের শেষ অংশে অবস্থিত। তিনি ধারণা করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সমাহিত করা হলে বহু লোকের পদধুলি পড়লে তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করবে।

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামপুনর্গঠন ভাবনা ও গ্রাম সমীক্ষা ঃ গ্রাম বল্লভপুর"

অমিয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লীপুনর্গঠন ভাবনা অধুনা চর্চিত বিষয় হলেও কবির পল্লীপরীক্ষণ এবং তার প্রয়োগিক দিক বিশেষভাবে আলোচিত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো রবীন্দ্রনাথের গ্রাম সমীক্ষা ভাবনা ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এবং ক্ষেত্রবীক্ষা হিসাবে বেছে নেওয়া গ্রাম বল্লভপুর সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

এক

শহরের এক উচ্চপরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হলেও কর্মের সূত্রে গ্রামের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ১৮৯০ খ্রিঃ থেকে।[১] পারিবারিক জমিদারী এলাকার তত্ত্বাবধানে এসে গ্রামের মানুষের দুঃখ নিবারণে তিনি কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[২] পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গ্রামে (শিলাহিদহ, পতিসর, কালিগ্রাম) তাঁর পল্লীপুনর্গঠন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সঞ্চিত জ্ঞান তাঁকে পরবর্তী কর্ম নির্ধারণের দিশা দিয়েছিল। কবির গ্রাম পুনর্গঠন ভাবনার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় 'স্বদেশী আন্দোলনের যুগে'। ১৯০৪ খ্রিঃ 'স্বদেশ সমাজ' গড়ার আহ্বানের [৩] মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছিল নূতন গ্রামীণ সমাজ গড়ার দর্শন ও কর্মধারা। দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথের গ্রামপুনর্গঠন ভাবনা বাস্তব রূপ পায় বীরভূম জেলার বোলপুর এলাকায়, যেটি শ্রীনিকেতনের কর্মকান্ড নামে পরিচিত। নানা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের সময় কৃষি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলন দেখে আপ্লুত রবীন্দ্রনাথ সহকর্মীদের উৎসাহিত করেছিলেন নূতনভাবে পল্লীপুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে। তাঁর নির্দেশে শ্রীনিকেতনের কর্মীরা (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মিলেই বিশ্বভারতী) গ্রামীণ অর্থনীতি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য এই তিনের উন্নতি[৪] ঘটাতে চেয়েছিলেন একসাথে। কবি কয়েকটি গ্রামের সার্বিক বিকাশ ঘটিয়ে 'মডেলগ্রাম'[৫] হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ভারতবাসীর কাছে।

দুই

সূচনাপর্বে সুরুলকুটি বাড়ীকে কেন্দ্র করে (১৯১৭) বিক্ষিপ্ত ভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু হলেও লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে গ্রামের কাজে যোগদান করার পর (১৯২২) থেকেই প্রকৃত অর্থে এই কর্মে জোয়ার আসে। ধীরে

ধীরে যুরুল কুটিবাড়ীকে (পরে নামকরণ হয় শ্রীনিকেতন) কেন্দ্র করে যে গ্রামপুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয় তার ছিল নির্দিষ্ট ছক। এই ছকটি ধরা পড়ে ১৯২৬ খ্রিঃ থেকেও এল্‌মহার্স্টের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও কালীমোহন ঘোষের নেতৃত্বে পল্লীপুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণের পর।[৮] পল্লীসেবার কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শুরু হয় গ্রাম-সমীক্ষা। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যত কর্মসূচীর নির্ধারিত হতো। শ্রীনিকেতনের নিবিড় গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে প্রথমে যে তিনটি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয় তার মধ্যে বল্লভপুর গ্রাম ছিল অন্যতম।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবী মতাদর্শে বিশ্বাসী কালীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করার পর কবির 'গঠনমূলক জাতীয়তাবাদে' আকৃষ্ট হয়ে শান্তিনিকেতনের কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২২ খ্রিঃ থেকে পল্লী পুনর্গঠনের কাজে তিনি নিজেকে আমৃত্যুকাল অবধি যুক্ত রেখেছিলেন।[৯] রবীন্দ্র কর্মযজ্ঞের তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পূর্ণাঙ্গ গ্রামসমীক্ষা ও সমবায় আন্দোলনকে বাংলার বুকে নূতনমাত্রা দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের কর্মীরা গ্রামের কিছুকিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করে কাজকর্ম শুরু করলেও সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ পল্লীতথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন।[১০] অবশেষে ড. রজনীকান্ত দাস পল্লী পরীক্ষণের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ইউরোপ যাত্রা করলে কালীমোহন ঘোষ বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেন।[১১] হেমন্তকুমার সরকার, ধীরানন্দ রায়, বিপিনবিহারী চন্দ, শশধর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সহযোগিতায় কালীমোহন ঘোষ বল্লভপুর গ্রামের সমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করেন।[১২] এটিই সম্ভবত বাংলা প্রদেশে প্রথম বেসরকারী উদ্যোগে গ্রাম সমীক্ষা।

তিন

পল্লী-পরীক্ষণের ক্ষেত্রে মূলত সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১৩] এককভাবে বা দলবদ্ধ ভাবে গ্রামের মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ছাড়াও গ্রামের প্রতিটি এলাকায় ঘুরেঘুরে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মানব সম্পদের। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে সমীক্ষার কাজে যেসব তথ্যাদি সংগ্রহের দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে মাথায় রেখে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঝাড়াই বাছাইয়ের পর গ্রামসমীক্ষা গবেষণাপত্রটির পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া হয়। অনেক তথ্যাদি সংগ্রহের পর মহলানবীশের মতামতের জন্য কোলকাতায় পাঠানো হয়।[১৪] এই গ্রাম সমীক্ষাগুলির উপর রবীন্দ্রনাথ কতখানি আস্থাশীল ছিলেন তা ধরা পড়েছে। কবির ক্লারেন্স পিকেটকে লেখা পত্রে (১৯৩২)।[১৫] উক্ত পত্রে তিনি লেখেন-'গ্রামের তথ্যাদি সংগ্রহ করে ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমরা যে সমীক্ষাপত্র তৈরী করেছি তার ভিত্তিতে বলা যায়-গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রামোন্নয়নকেন্দ্র কখনই গ্রাম থেকে দূরে কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান রূপে হোক্ গ্রামবাসী তা চায়না। আমারও মত সে রকমই। ....বাইরের কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নয়, গ্রামের উন্নতি নিয়ে ভাববে ও কাজ করবে গ্রামবাসীরা।[১৬]

১৯২২ খ্রিঃ থেকে শ্রীনিকেতন পরিচালিত পল্লীপুনর্গঠন বিভাগ বল্লভপুর গ্রামে নানা উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[১৭] ১৯২৬ খ্রিঃ পল্লীপরীক্ষণ-এর সময় গ্রাম সম্পর্কে তাই শ্রীনিকেতন কর্মীদের ছিল প্রাথমিক ধারণা। কিন্তু গ্রাম সমীক্ষা চালানো হয় নিপুণভাবে এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। সাধারণ তথ্যাদির সঙ্গে তৈরী করা হয় গ্রামের মানব সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা। সেখানে উল্লেখ করা হয় গ্রামের মানুষের পেশাগত বৃত্তি, কোন উৎপাদন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ রয়েছে।[১৮] মাটির শ্রেণী বিভাগ (কৃষিযোগ্য জমির), শস্যবীজের শ্রেণী বিভাগ, সার ব্যবহারের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাম সমীক্ষার দ্বারা গড়ে তোলা হয় তথ্য ভাণ্ডার।[১৯] গ্রামের পরিবার পিছু আয়-ব্যয়ের তালিকা ও সম্পদের পরিমাপ করে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত তা পল্লী পরীক্ষণ গুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[২০]

চার

কালীমোহন ঘোষের নেতৃত্বে গ্রাম সমীক্ষার পর শ্রীনিকেতনের কর্মীরা গ্রামের লোকের সহায়তা নিয়ে বল্লভপুরে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তার বিভিন্ন তালিকা খুঁজে পাই বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদন গুলিতে। ১৯২৫ খ্রিঃ আলোচ্য গ্রামে গড়ে তোলা হয়েছিল কেবল স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি; ১৯২৯ খ্রিঃ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে সেখানে একে একে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, মহিলা সমিতি, নৈশ্য বিদ্যালয়, প্রভাতী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্রতীবালক দল ও গ্রামোন্নয়ন সমিতি গড়ে ওঠে।[২১] ১৯৩১ খ্রিঃ বল্লভপুরকে কেন্দ্র করে আরো চারটি পার্শ্ববর্তী গ্রামকে নিবিড় কর্মসূচীর প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হয়।[২২] রবীন্দ্র ভাবনায় গড়ে ওঠা এই পল্লীপুনর্গঠন কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শ্রীনিকেতনের কর্মীরা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন (ক) গ্রামের কাজে গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রশিক্ষণদান কল্পে 'ব্রতীবালক আন্দোলন' কে (স্কাউটদল গঠন) এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং (খ) শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক উন্নতিই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রাক্-বিপর্যয় কর্মসূচী গ্রহণ করা। আলোচ্য সময়ে ম্যালেরিয়া রাঢ়বঙ্গে প্রায় মহামারী আকার ধারণ করেছিল। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রাক্-বিপর্যয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। নিত্যাসঙ্গী বন্যা ও খরার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হতো এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যত কর্মসূচী হিসাবে গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হয় ধর্মগোলা।[২৩]

প্রায় ৩৫ বছর পর ১৯৬১ খ্রিঃ 'Visra-Bharti Agro-Economic Research Centre' বল্লভপুর গ্রামের উপর সমীক্ষা করে।[২৪] এই সমীক্ষার কাগজপত্র অনুসারে বলা যায়-'১৯২৬ খ্রিঃ বল্লভপুরে প্রতিএকর জমিতে ধান উৎপাদন হতো ১৫ মণ, ১৯৬১ খ্রিঃ সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ মণ; শিক্ষার হার ১৪ % (১৯২৬) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (১৯৬১) হয় ৪৮%।[২৫] ১৯৭৫ খ্রিঃ 'Indian Staistical Institute' (Calcutta)-এর গবেষক দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় কুলদা বিশ্বাস ও শৈলেন সেনগুপ্ত বল্লভপুর

গ্রামের উপর সমীক্ষা করেন।[২৬] এই সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যায় ৫০ বছরের মধ্যে গ্রামের জন্যসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষবাস ছাড়া ক্ষুদ্রব্যবসার দিকে গ্রামবাসীদের ঝোঁক রয়েছে।[২৭] ২০০১ খ্রিঃ জনগণনা অনুসারে গ্রামটিকে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা যায়।[২৮]

রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠনের কাজের এলাকা সীমিত ছিল, কিন্তু এই 'প্রতীকীগ্রাম পুনর্গঠন কর্মসূচী-কে তিনি ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সে যুগে দেশে-বিদেশে শ্রীনিকেতনের কর্মসূচী বিশেষ প্রশংসালাভ করে।[২৯] আজও শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠন বিভাগ ৪৩টি গ্রামে রবীন্দ্রভাবনায় গ্রামের উন্নয়ন যজ্ঞে লিপ্ত। বিদেশী ভ্রমণকারীদের কাছে আদর্শগ্রাম হিসাবে তুলে ধরার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারত সরকার বেছে নিয়েছে বল্লভপুর গ্রামকে (৩টি গ্রামের মধ্যে)[৩০] এটি রবীন্দ্রভাবনার প্রতি বিশেষ মর্যাদা দান। সর্বোপরি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচীতে যেসব ত্রুটি রয়েছে সেটি সম্পূর্ণ পরিহার করা যেতে পারে, যদি গ্রাম সমীক্ষার ভিত্তিকে ভবিষ্যত কর্মসূচী তৈরী করা হয় এবং গ্রামের কাজে গ্রামের মানুষকে যুক্ত করা হয়। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামপুনর্গঠন ভাবনা আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১. manjula Bose (Ed.)-Contenary Volume : L.K.Elmhirst, Calcutta 1994, p.41

২. Amiya ghosh-Tagore's conceptiun of Rural Reconstruction and Village Self-government : An Experiment (unpublished article), pp. 2-3

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্বদেশী সমাজ, কলিকাতা, ১৯২৯ (পু.মু.), পৃ. ৫-৭

৪. Khudiram Das (Ed.)-Rabindranath Tagore : A 125th Birth Anniversary Volume, Calcutta, 1988, pp. 104-112

৫. Visva-Bharati, Bulletin No.-11, Santiniketan, Dec.1928, p.3

৬. Activity Report of the Dept. of Adult, Continuing Education and Extension, Palli Samgathana Vibhaga, Visva-Bharati, 2002-2003, p.13

৭. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়-রবীন্দ্রনাথ ঃ পল্লীপুনর্গঠন, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৫২

৮. Uma Dasgupta-Santiniketan and Sriniketan, Calcutta, 1983, p.14

৯. সত্যদাস চক্রবর্তী-শ্রীনিকেতনের গোড়ারকথা, কলিকাতা, ২০০১ (পু.মু.), পৃ.৬১-৬৩

১১. কালীমোহন ঘোষ (সম্পাঃ)-পল্লী-পরীক্ষণ ঃ বল্লভপুর, শান্তিনিকেতন, ১৯২৬, ভূমিকা-১০

১২. তদেব

১৩. তদেব

১৪. Visva-Bharati News, Vol-III, Jan.1939, No.-7, p.47

১৫. নেপাল মজুমদার-রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স, কলিকাতা, ১৯৯১ পৃ. ৬১-৬৫

১৬. ৩/৮/১৯৩২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লারেন্স পিকেটকে লেখা পত্র, সূত্র-রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স, পৃ. ৬২-৬৩

১৭. Sherry Joseph and Prasanta Kr. ghosh–Sriniketan : From Experiment to Experience (Unpublished Project Report-2002), pp. 8-9

১৮. কালীমোহন ঘোষ (সম্পা.)-পল্লী-পরীক্ষণ ঃ বল্লভপুর, পৃ. ১৮-২১

১৯. তদেব, পৃ. ৫-৬

২০. তদেব, পৃ. ৪৯-৫৩

২১. Visva-Bharati Annual Report, 1929, pp. 28-30

২২. Visva-Bharati Annual Report, 1931, P.P. 26-27

২৩. See, Visva-Bharati Annual Report(s), 1923-1940

২৪. সত্যদাস চক্রবর্তী-শ্রীনিকেতনের গোড়ারকথা, পৃ. ৬১-৬২

২৫. See, Village Servay Report, Visva-Bharati Agro-Economic Research Centre, Santiniketan, 1962, pp. 25-29

২৬. অরুণ চৌধুরী-লালমাটির কথকতা, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১১৭

২৭. Joseph & Ghosh-Sriniketan : From Experiment to Experience, p. 8

২৮. Census Report 2001, Source : www.nic.in/census

২৯. নেপাল মজুমদার-রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারিটিম্বার্স, পৃ. ৬২

৩০. আনন্দবাজার পত্রিকা, দক্ষিণবঙ্গ সংস্করণ, ১৬.২.২০০৪, পৃ. ৯।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও ফরিদপুর সম্মেলন

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর দেড় মাস আগে ১৯২৫ সালের ২ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ দেন। এই ভাষণকে বলা হয় 'his last testament to the nation'। দেশবন্ধুর এই ভাষণ তখন প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল এবং আজও তা বিতর্কের বস্তু হয়ে আছে। এই ভাষণের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি আগে নানা ভাষণে যা বলেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন।

প্রথমত, ফরিদপুরে তিনি স্বাধীনতা ও স্বরাজের আদর্শের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। এক, তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতার চেয়ে স্বরাজ শব্দটি অধিকতর ব্যাপক ও প্রশস্ত। স্বাধীনতার আদর্শ স্বরাজের আর্দশের চেয়ে 'অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে, Independence-এর অর্থ dependence বা অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলত অভাবাত্মক।' দুই আদর্শ পরস্পরবিরোধী নয়। কিন্তু স্বাধীনতার মধ্যে অভাববোধ আছে, তা শৃঙ্খলার অভাব যা স্বরাজের আদর্শের মধ্যে নেই। ইংরেজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার। স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজ লাভ এক বস্তু নহে। ইংরেজের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হলেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হয় না। 'আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয়—ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।'[১] স্বরাজ আদর্শের মর্মকথা ভারতীয়দের বহু বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও রীতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য চেতনার প্রতিষ্ঠা, যা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। দুই, জাতীয় একতা স্থাপনের জন্য জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন অগ্রগতির পথ। ইউরোপের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তার গভীরে একটা 'সামরিক ভাব' রয়েছে। ভারতের জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। তাকে রক্ষা করতে হবে। তিন, 'আমাদের পথে অগ্রসর হইতে কোন বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের বাধা দিতে পারিবে না। ....আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ। Home-Rule এবং Self-Government এর আদর্শের মধ্যে একটা শাসনের ভাব ফুটে উঠে। কেবল নিজেদের দ্বারা এবং নিজেদের জন্যই যদি Self Government হয়........সে ক্ষেত্রে আমি বলিতে পারি যে, স্বরাজের আদর্শে ইহার সমস্তই বিদ্যমান আছে'।[২]

দ্বিতীয়ত, দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'জাতীয় জীবনের বিকাশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমাদের যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়-তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা মুক্তিলাভ করিব। আর যদি সুযোগ না দেয়—সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় জীবনকে পিষিয়া ফেলে, তাহলে সাম্রাজ্যের বাইরে গিয়াই আমাদের স্বরাজলাভ করিতে হইবে।' এইখানে তিনি আমেদাবাদ কংগ্রেসের বক্তব্য থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজের অধীনস্থ থেকে ভারতের জাতীয় বিকাশ সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলেননি। তিনি বরাবরই বলেছেন ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা না রাখার প্রশ্নটি আমদের জাতীয় স্বার্থের দ্বারা চালিত হবে এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির শর্তেই তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হবেন। গান্ধী ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে এইখানে তাঁর সাদৃশ্য ছিল। চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বরাজের অর্থাৎ ডোমিনিয়ান স্টেটাস গ্রহণের প্রস্তাব দেন। প্রভু-দাসের বন্ধনের সূত্রে নয়, স্বাধীন চুক্তিমূলক সম্পর্কের শর্তে সাম্রাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩]

তৃতীয়ত, ঐ ভাষণে দেশবন্ধু বলেছিলেন যে হিংসা ভারতীয় জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়। হিংসামূলক বিদ্রোহের দ্বারা কখনো জাতীয় মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। 'হিংসা ভারতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের অঙ্গ নয় এবং হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমন ভাবে নাই, যেমন ইউরোপে আছে।' এই ঐতিহ্যের প্রশ্ন ছাড়াও এক নিরস্ত্র পরাধীন জাতির পক্ষে আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান এক 'সুনিয়ন্ত্রিত' সরকারকে' কয়েকটি বোমা ও রিভলবারের গুলীতে সমূলে উচ্ছেদ করা যাবে, 'এ এক অবাস্তব ধারণা। সুতরাং এই পদ্ধতি কার্যকরী হবে না। উপরন্তু ভারতীয় গণ হিংস্র হলে ব্রিটিশ সরকার আরো বেশি হিংস্র হয়ে প্রচণ্ড দমন নীতির দ্বারা আমাদের বিপর্যস্ত করবে।[৪] সুতরাং হিংসা পদ্ধতি স্বরাজ-লাভের পরিপন্থী, কারণ প্রথমত, জাতীয় জীবন ও সভ্যতার সঙ্গে মিল না থাকায় তা 'নীতি-বিরোধী' এবং দ্বিতীয়ত, তার কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চিত্তরঞ্জন ভারতে হিংস্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের উত্থানের কারণ সবিশেষ বিশ্লেষণ করে এর জন্য ব্রিটিশ সরকারের চণ্ড নীতিকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'রাজশক্তির অবিমিশ্রকারিতা, হঠকারিতা, অথবা নির্বিচারে সমস্ত দেশের উপর প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ বা অপ-প্রয়োগ, শিক্ষিত ভারতবাসীর মতামতকে অসীম অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা হইতেই রাজদ্রোহের আবহাওয়া জন্মলাভ করিয়াছে।' তিনি বলেন এদেশে Rule of Law নেই, সেখানে আইন ও শৃঙ্খলার নামে আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত করা হয় দমননীতি প্রয়োগের জন্য। দেশবন্ধু বেঙ্গল অর্ডিনান্সের তীব্র নিন্দা করে বলেন বিনা বিচারে ও কেবল পুলিশ বা সি.আই.ডি-র

গোপন সংবাদের উপর নির্ভর করে কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করা শুধু অবিচার ও অত্যাচার নয়, ' ইহা সভ্যতাভিমানী-ন্যায়বিচারাভিমানী সমগ্র ইংরেজ জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক।'[৫] দেশবন্ধু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিচারের দাবী জানান এবং বলেন আদালতের বিচারকে কার্যে পরিণত করা শাসনবিভাগের কাজ, শাসনবিভাগের নিজের বিচার করার অর্থ জনগণের স্বাধীনতাকে নিষ্ঠুরভাবে অপহরণ করা, যে বিষয়ে ইংলণ্ডের ঐতিহাসিকগণই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারে কাছে সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী পেশ করেন। বিপ্লবী যুবকদের উদ্দেশ্যের সততার ও স্বদেশপ্রেমের উন্মুক্ত প্রশংসা করেও তিনি তাদের 'হিংসামূলক রাজদ্রোহিতা'র পথ পরিহার করতে বলেন। তিনি সরকার বা বিপ্লবীগণ, যে তরফেরই হোক না কেন, তাদের হিংস্র কার্যকলাপকে—সরকারের হিংস্র দমন-নীতি ও বিপ্লবীদের হিংস পদ্ধতি, উভয়কেই নিন্দনীয় মনে করেন।[৬]

স্বরাজ প্রাপ্তির উপায় প্রসঙ্গে তিনি বারবার আগে যা বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে, মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার ভারতীয়দের 'কোন ক্ষমতা দেয় নাই'। 'বর্তমান Reform Act-এর আসল কথা হইতেছে এই যে, গবর্নমেন্ট মন্ত্রিদিগকে বিশ্বাস করে না' এবং এইরূপ অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় সহযোগিতা অসম্ভব। যদি সরকার বিশ্বাস করে সত্যকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর অর্পণ করেন এবং কাজ করতে কোন বাধা না দেন তবে সরকারের সহিত একত্রে কাজ করা সম্ভব এবং তা সার্থক করে তোলার জন্য দু'টি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমত, শাসকদের ভারতীয়দের প্রতি মনোভাবের যথার্থ পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত, নিকট ভবিষ্যতে বিনা বাধায় সম্পূর্ণ স্বরাজপ্রাপ্তির সূচনা ও এ বিষয়ে সরকারকে এমন কথা দিতে হবে 'তাহার যেন নড়চড় না হয়'। তিনি আপোস-মীমাংসার জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন—১) সরকার কর্তৃক দমননীতি পরিত্যাগ ও তার প্রমাণ স্বরূপ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, ২) ব্রিটিশ সাম্রাজের কাঠামোর মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য অবিলম্বে সরকার কর্তৃক পাকা কথা দেওয়া, এবং ৩) পূর্ণ স্বরাজলাভের একটি স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।[৭] দেশবন্ধু অপ্রতুল মন্ট-ফোর্ড সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে [illegible]াত্মক প্রতিরোধ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান যতক্ষণ না ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকৃত হচ্ছে। সরকার যদি ভারতের দাবী মেনে নিয়ে হৃদয়ের পরিবর্তন দেখায় তবে তার সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব, নয়তো মুক্তিকামী জাতির শেষ হাতিয়ার হবে গণ আইন অমান্য আন্দোলন, যা সরকারের বিরুদ্ধে 'ব্রহ্মাস্ত্র'। Civil Disobedience-এর জন্য প্রয়োজন-১) দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলারক্ষা, ২) আত্মোৎসর্গের জন্য অসীম সহিষ্ণুতা এবং ৩) ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গত স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থের নিকট বলি দেওয়া।[৮] তিনি মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচিকে পূর্ণভাবে সফল করার আহ্বান জানান যা না হলে আইন অমান্য আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে না। তিনি এই

আপোস-মীমাংসা সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন, কারণ তিনি তখন চারদিকে মিলনের আকাঙ্খা ('signs of reconciliation') দেখেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণ বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী একে বলেছিলেন দাশের সাফল্যের রাজমুকুট।[৯] অন্যদিকে, তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন একে বলেছেন, দাশের রাজনৈতিক মৃত্যু।[১০] সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, তরুণ প্রজন্মের কাছে এই ভাষণ নিস্তেজ মনে হয়েছিল।[১১] এম.এন.রায় একে বলেছেন ভারতীয় রাজনীতির উদ্দীপ্ত বিদ্রোহীর 'গৌরবহীন সমাপ্তি'।[১২] মার্কসবাদী পত্রিকা Masses এই ভাষণকে বলেছিল, 'আর একটি বারদৌলি ও লজ্জাজনক অবরোহন"[১৩] আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, যেমন রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অমলেশ ত্রিপাঠী জন ব্রুমফিল্ড এই ভাষণের সমালোচনা করেছেন। ডঃ ত্রিপাঠী লিটনের মতের সমর্থক। ডঃ মজুমদার মনে করেন দাশ দলের কতকগুলি সুলালিত নীতিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ব্রুমফিল্ডের মতে দাশ, নিজের দুর্বলতা থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। রজতকান্ত রায় অনুরূপ মত পোষণ করেন।[১৪]

এই সব অভিমতের সত্যতা বিচার-সাপেক্ষ। গান্ধীর সন্তোষের প্রবল কারণ ছিল দাস কর্তৃক হিংসার নিন্দা। অন্যদিকে তরুণ সম্প্রদায় তাঁর ডোমিনিয়ান স্টেটাসের তীব্র বিরোধিতা করেছিল, কারণ তারা চেয়েছিল সাম্রাজ্যের বাইরে স্বাধীনতা। তাদের ক্ষোভের আর একটি কারণ ছিল দাশ কর্তৃক হিংস্র বৈপ্লবিক পদ্ধতির নিন্দা। দাশ যা বলেছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিংসা-বিরোধী, একথা সাধারণভাবে সত্য। যদিও সভ্যতার ঊষাকাল থেকে ভারতবর্ষ শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছে এবং বারবার হিংসার পথ গর্হিত বলেছে, তবু এও সত্য প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় ইতিহাসে সামরিকতার পরিচয় রয়েছে, যা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ করেছেন।[১৫] প্রাচীন ভারতের অনেক রাজন্যবর্গ (নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত থেকে পাল, প্রতিহার, রাষ্টকূট) স্বেচ্ছায় যুদ্ধ ও দেশজয়ের নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং সামরিক শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। এই যুদ্ধ ও সামরিকতা 'আরোপিত' বা 'মিথ্যা আবরণ' (যা দেশবন্ধু বলতে চেয়েছেন)[১৬] নয়। এইখানে দাশের ইতিহাস-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

দেশবন্ধুর ফরিদপুর ভাষণের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের ধারণা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত।[১৭] তিনি ঠিকই বলেছিলেন, বর্তমানকালে কোন দেশ বা জাতি অন্যের নিরপেক্ষ হয়ে পৃথকভাবে বাঁচতে পারে না। চিত্তরঞ্জনের লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয়। সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন ভারতকে বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জে সমান অংশীদার রূপে। কিন্তু শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এক মহান রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও সমগ্র মানব জাতির মহামিলনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র মনে করার পিছনে কোন যুক্তি ছিল না। 'সাম্রাজ্য' শব্দটি 'ব্রিটিশ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তখন জাতীয় চেতনায় ঘৃণার সঞ্চার করত ও দাসত্বের চিহ্নরূপে প্রতিপন্ন হত। ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে সমান অংশীদারত্ব যা দেশবন্ধু চেয়েছিলেন তা অনেকের নিকট অলীক মনে হয়েছিল। তাছাড়া তখন বেঙ্গল অর্ডিনান্স ও সরকারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে শাসক কুলের হৃদয়ের পরিবর্তনের প্রত্যাশা এবং মিলনের আকাঙ্খার কোন বাস্তবভিত্তি ছিল না। ভারতের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও মানবজাতির মঙ্গলের জন্য 'ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে'—তাঁর এই অভিমতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা ও অলীক আদর্শবাদের আভাস ছিল, যা অনেকেই সমর্থন করেননি। আবার ভারতের ইংরেজদের প্রতি তাঁর আবেদন—'তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার অধিকারী একটা মহিম্নজাতির বংশধর—আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কি তোমরা সাহায্য করিবে না—?' ছিল যেমন একটি নিষ্ফল অযৌক্তিক প্রত্যাশা, তেমনই 'আমরা তো এ দেশে তোমাদের ন্যায্য অধিকারের স্বত্ব সর্বদাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত'—দাশের এই অভিমত শুধু বিতর্কিত ও বিস্ময়করই নয়, তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। এই কারণে তিনি সঙ্গতভাবে সমালোচিত হয়েছেন। আবার অন্যদিকে তিনি যুবশক্তিকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, এখনও বিশ্রামের সময় আসেনি, 'যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর যুদ্ধ কর।' কিন্তু যুদ্ধশেষে সংযত পদক্ষেপে শান্তির 'মিলনমন্দির প্রবেশ কর।'

কিন্তু এই সাম্রাজ্যের প্রশ্ন ছাড়া চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে স্বরাজ্য দলের কোন নীতিকে বিসর্জন দেননি যে অভিযোগ রমেশ মজুমদার এনেছেন। স্বরাজ্য দলের নীতিগুলি ছিল স্বরাজ অর্জনের জন্য গণ সংগ্রাম, দ্বৈতশাসনের বিরোধিতার জন্য সাংবিধানিক যুদ্ধ, জাতীয় দাবীর অস্বীকৃতিতে সর্বাত্মক প্রতিরোধ, ঐ দাবী স্বীকৃত হলে সম্মানজনক সহযোগিতা, সর্বশেষ অস্ত্র গণআইন অমান্য আন্দোলন, সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান, হিংসা বর্জন, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এ সবের কোনটাই চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে পরিহার করেন নি। এই সম্মেলনে স্বরাজ লাভের সংগ্রামের জন্য ভারতীয় কৃষকশক্তিকে সংগঠিত করার প্রস্তাব ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রথমোক্ত প্রস্তাবের জন্য আন্তর্জাতিক কৃষক সংগঠন ক্রেসটিনটার্ন অভিনন্দন-বার্তা পাঠিয়েছিল।[১৮]

সুতরাং ব্রুমফিল্ড ও লিবারালগণ উল্লসিত হয়েছিলেন যে চিত্তরঞ্জন অসহযোগী থেকে সহযোগীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন[১৯] তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৎকালীন ভারতীয় মনোভাব সম্পর্কে লর্ড লিটন লর্ড বার্কেনহেডকে লিখেছিলেন, 'জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাকে দাসত্বের চিহ্ন এবং অসহযোগকে স্বাধীনতার প্রতীক-চিহ্ন রূপে দেখে'। দেশবন্ধুর কাছে সহযোগিতা ও দাসত্ব সমার্থক ছিল না।[২১] তখনকার অনেকে ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা তাঁকে অনেকটা ভুল বুঝেছেন। ফরিদপুরে তিনি অসহযোগকে পরিত্যাগ করেন নি। সম্মানজনক মীমাংসা ও দাসসুলভ সহযোগিতা বা দুর্বলের আপোস এক বস্তু নয়। দেশবন্ধু চেয়েছিলেন স্বরাজের

ভিত্তিস্থাপনের জন্য একটি সম্মানজনক মীমাংসার সূত্র খুঁজতে। এই সম্মানজনক সহযোগিতার কথা নতুন কিছু নয়। তিনি ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে এবং পরে অন্যান্য মঞ্চ থেকে বারবার বলে এসেছেন যে সহযোগিতা হবে ভারতীয়দের শর্তে বা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জাতীয় দাবীর স্বীকৃতিতে। সুতরাং তাঁর সহযোগিতার প্রস্তাব ছিল শর্তসাপেক্ষ। ফরিদপুরের সঙ্গে বারদৌলির তুলনা অসঙ্গত। বারদৌলিতে গান্ধী যেমন গণসংগ্রামকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, ফরিদপুরে দাশ তা করেন নি, কারণ সেখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সরকার থেকে কোনরূপ সাড়া না পেলে গণ-আইন অমান্য আন্দোলন হবে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং ইতিমধ্যে সরকারী প্রশাসনকে অচল করে দেবার জন্য যে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে তা পূর্ণভাবে বহাল থাকবে।[২২] মার্কসবাদী ঐতিহাসিকও দাশ সম্বন্ধে বলেছেন, মীমাংসা সম্বন্ধে তাঁর অলীক ধারণা ছিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে আরও একটি সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন।[২৩] একটি ইংরাজী সংবাদপত্র লিখেছিল যে ফরিদপুরে দাশের এক হাতে ছিল শান্তির অলিভ পতাকা, অন্য হাতে যুদ্ধের দামামা।[২৪] সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অসহযোগকে দাশ সহযোগিতার স্বার্থে উৎসর্গ করেন নি এবং পূর্ণ প্রতিরোধ অক্ষত রেখে সম্মানজনক সহযোগিতার প্রস্তাবে জাতীয় দাবী অবনমিত হয়নি, যা লিবারালগণ ও তার সতীর্থরা ভুলবশতঃ সন্দেহ করেছিল। এ কথা সত্য যে এই সম্মেলনে যুবকবৃন্দ, বিশেষত বিপ্লবীরা, চিত্তরঞ্জনের ভাষণের কিছু অংশের প্রবল বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁর প্রস্তাবের পরাজয়ের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দাশের বিপুল ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবে এবং গান্ধীর মধ্যস্থতায় ভিতরের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯২৪ সালে ধৃত সকল রাজবন্দীদের মুক্তি, হিংসা দমন ও সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজ। বঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক প্রতিবেদনেও এই স্বীকৃতি ছিল 'এই বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না যে মিঃ দাশের প্রবল ব্যক্তিত্ব তখনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শ্রদ্ধা অর্জন করত।'[২৫] সুতরাং লিটনের সিদ্ধান্ত, যে রাজনৈতিক দিক থেকে দাশ ফরিদপুরে মৃত্যু বরণ করেছেন, ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক।

দেশবন্ধু সেই সময় মোটেই দুর্বল পরিস্থিতিতে ছিলেন না, যে অভিযোগ কেউ কেউ তুলেছেন। তখন বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য দলের প্রতিরোধে দ্বৈত শাসন অচল হয়ে গেছে। গান্ধী ১৯২৪ সালে বেলগম কংগ্রেসে স্বরাজী নেতৃত্বের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন, যাকে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন 'unconditional surrender'।[২৬] বিপ্লবীগণ ও মুসলমানগণ দাশের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে ছিল। সরকারী রিপোর্টও স্বীকার করেছিল—'তাঁর মৃত্যুর সময়ে দাশ তাঁর শক্তির উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন'।[২৭] সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্বলতা থেকে সহ-যোগিতার অভিযোগ ভিত্তিহীন। দেশবন্ধু চেয়েছিলেন যাকে বলা যেতে পারে 'peace with honour'। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনড়তায় তাঁর প্রচেষ্টা এক তরফা রয়ে গিয়েছিল, এ কথা বলা যেতে পারে।

সূত্র-নির্দেশ

১। মণীন্দ্র দত্ত, হারাধন দত্ত সম্পাদিত, *দেশবন্ধু রচনাসমগ্র,* তুলি-কলম, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৫, পৃ : ১৬৯-৭০

২। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৭১-৭২

৩। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৭৩

৪। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৭৫-৭৬, ১৮৩

৫। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮১, ১৮৩

৬। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮৩

৭। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮৪-৮৬

৮। পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮৮ দেশবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ ফরিদপুর ভাষণের জন্য ইংরাজী গ্রন্থ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দিল্লী, ১৯৬০, অ্যাপেনডিক্স চার, পৃ : ২০৮-২৮ দ্রষ্টব্য

৯। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ২য় খণ্ড, ১৯২৫, পৃ : ২০৭

১০। লিটনের পত্র বার্কেনহেডকে, ১৮ জুন ১৯২৫, বার্কেনহেড সংগ্রহ, নেহরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, নিউ দিল্লী ৩য় খণ্ড, পৃ : ৭২

১১। সুভাষ চন্দ্র বোস, *দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল,* কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃ : ১৫৬

১২। এম.এন.রয়, মেন আই মেট, বম্বে, ১৯৬৮, পৃ : ২৫

১৩। মাসেস, ১৯২৫, উদ্ধৃত, মঞ্জুগোপাল মুখার্জী, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

১৪। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *হিসট্রি অফ দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া,* ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ : ২৫৩; অমলেশ ত্রিপাঠী, 'গান্ধীস সেকেণ্ড রাইস টু পাওয়ার,' *দ্য ক্যালকাটা হিসটরিক্যাল জার্নাল,* জুলাই, ১৯৭৬, ১ম খণ্ড, ১নং, পৃ : ২৩; জন ব্রুমফিল্ড, *এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি,* ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬৮, পৃ : ৫২৬-৬৬; রজতকান্ত রায়, *সোস্যাল কনফ্লিক্ট এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল, ১৮৭৫-১৯২৭,* নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ : ৩৪৬

১৫। বিমলকান্তি মজুমদার, *মিলিটারি সিসটেম অফ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া,* কলিকাতা ১৯৫৬;

১৬। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ : ২১২

১৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য-দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ : ২১০-১১ এবং *দেশবন্ধু রচনাসমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃ : ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯; মঞ্জুগোপাল মুখার্জী, সি.আর.দাশ এ্যাণ্ড স্বরাজ পার্টি, অপ্রকাশিত পি এইচ ডি থিসিস, পূর্বোক্ত, পৃ : ৪৫৫-৫৭

১৮। জি.অধিকারী, সম্পাদক, *ডকুমেন্টস অপ দ্য হিসট্রি অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া,* ২য় খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃ : ৪৯১ এবং রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অফ বেঙ্গল, ১৯২৪-২৫, পৃ : X

১৯। *দ্য বেঙ্গলী,* ২ মে ১৯২৫; ব্রুমফিল্ড, পূর্বোক্ত

২০। লিটনের পত্র বার্কেনহেডকে, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৫, বার্কেনহেড সংগ্রহ, ১৮ খণ্ড, পৃ : ১৭৯

২১। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু স্মৃতি,কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ২য় সংস্করণ, পৃ : ২৮৭

২২। দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পৃ : ২২৬-২৭

২৩। উদ্ধৃত, মঞ্জুগোপাল মুখার্জী, পূর্বোক্ত

২৪। দ্য স্টেটস্‌ম্যান এ উল্লিখিত, অমৃতবাজার পত্রিকায় (৪ মে, ১৯২৫) উদ্ধৃত

২৫। রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অফ বেঙ্গল, পূর্বোক্ত

২৬। *দ্য কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ মহাত্মা গান্ধী,* ২৮ খণ্ড, পৃ : ৫১

২৭। গর্ভনমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, হোম পলিটিক্যাল, ফাইল নং ১১২/১৯২৫, ফর্টনাইটলি রিপোর্ট, বেঙ্গল, জুন, সেকেণ্ড হাফ

উনবিংশ শতাব্দীর পণপ্রথা ও তার বিবরণ

তিথি নন্দী

অক্সফোর্ড ইংরাজী অভিধানে Dowry শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ হল যে অর্থ বা সম্পদ স্ত্রী স্বামীর জন্য নিয়ে আসে বা পত্নীর সঙ্গে যে ধন দেওয়া হয়। স্বামী স্ত্রীকে উপহার দেন তাকেও Dowry বলা হয়।

প্রাচীন গলদেশে স্ত্রী বিবাহের পর স্বামীগৃহে অর্থ নিয়ে যেতেন স্বামী সেই অর্থের সঙ্গে স্বোপার্জিত সম্পদ সমপরিমাণে মিশিয়ে একটি যুগ্মধন তৈরী করতেন। প্রথমে নববধূ অর্থ ও অন্যান্য অস্থাবরধন নিয়ে পতি গৃহে যাবেন এটাই ছিল সাধারণ রীতি। তবে পরিমাণ নিয়ে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, যদিও এর সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা জড়িত ছিল।[১]

এ. এস. আলতেকার তাঁর বই "Position of women in Hindu civilization" এ দেখিয়েছেন প্রাগৈতিহাসিক ভারতে নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হত,[২] তাই বিয়ের সময় বরপণকেই কনের বাবাকে কন্যাপণ দিতে হত। এর যুক্তি হিসাবে বলা হত যে বিয়ের পর কনেকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেত। ফলে বিয়ের পর থেকে মেয়ে বাপের বাড়ির জন্য কিছু করতে পারত না, তার সমস্ত কায়িকশ্রমের অধিকারী হত শ্বশুরবাড়ি। তাই তারা বরপণের কথা ভাবতেও পারত না। রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা গল্পেও দেখি বংশী তার ভাইয়ের বিয়ে দেবার জন্য কন্যাপণ জোগাড় করতে দিনরাত পরিশ্রম করছে। অবশ্য আলতেকার[৪] এ বলেছেন ধনী অভিজাত পরিবারগুলিতে জামাইকে বিবাহের সময় কিছু উপহার দিতে হত। অর্থববেদে উল্লেখ আছে রাজকন্যা বিবাহের সময় পণ হিসাবে একশত গাভীকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। দ্রৌপদী, শুভদ্রা, উত্তরা ও বিয়ের সময় পণ হিসাবে ঘোড়া হাতি, মূল্যবান অলঙ্কার প্রভৃতি শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাতকে আমরা উল্লেখ পাই সাকেত শ্রেষ্ঠী ধনজয় তাঁর কন্যা বিশাখার শ্বশুরালয়ে মূল্যবান পণ পাঠাচ্ছেন। এমনকি ঋক্‌বেদেও উল্লেখ পাওয়া যায়, রাজা বিদর্ভ তাঁর বোন ইন্দুমতীর বিবাহে প্রচুর পণ দিচ্ছেন। আলতেকার এই সব ঘটনাকে পণপ্রথার উদাহরণ হিসাবে মানতে ইচ্ছুক নন। তারমতে এগুলি স্বতঃ স্ফূর্ত ভাবে দেওয়া উপহার। তিনি বলছেন স্মৃতিশাস্ত্রে শুধু এইটুকু পাওয়া যায় পিতা তার কন্যাকে নিজের সামর্থ্যমত সালংকরা করে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করবেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য তাঁর 'প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্যে'-এ উল্লেখ করেছেন কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে বেশ কয়েকবার বরপণ দেবার উল্লেখ আছে ঋক্‌বেদে।

বই এর পাতায় উল্লেখিত স্বতঃস্ফূর্ত দান এবং পণ এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা বাস্তবিক ঐ কঠিন। বিশেষত যেখানে গোড়াতেই গলদ। যেখানে বিয়ের ধারণার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে দান করার ধারণা। হিন্দু বিয়েতে কন্যাকে বিয়ের সময় মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বরের হাতে দান করা হয়। অতত্রব কন্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছোট বড় জিনিসও দান করা যেতেই পারে। এখানে থেকেই প্রথমে স্বতস্ফূর্ত দান এবং অবশেষে পণ প্রথার ভয়াবহ পরিণতি। যদিও প্রাচীন সাহিত্যে সরাসরি পণ-প্রথার উল্লেখ নেই আপাতদৃষ্টিতে। আবার সতর্কভাবে দৃষ্টি ফেললে উল্লেখ আছে। সমাজের ব্রাহ্মণ্য সমাজের দয়ার ছদ্মবেশে। যেমন বৌধায়ন ধর্মসূত্রে[৭] আমরা উল্লেখ পাই 'ধর্ষিতা নারীকে ধর্ষণকারী বিয়ে না করলে বিধিমতে বিনাপণে তার বিয়ে হতে পারে' অতত্রব এটা ধরে নেওয়াই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়কি, সাধারণ মেয়ের বিয়েতে পণ দেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তবে পণপ্রথা তখনও তার বাল্যকালে ছিল, পণপ্রথা প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করে উনবিংশ শতাবদী যুগসন্ধিক্ষণে। পণের সামগ্রীর পরিবর্তনও বেশ আকর্ষণীয়। প্রথমে গরু, হাতী, ঘোড়া থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে স্বণলংকার, জমি, অর্থ গৃহ সাজানোর দৈনন্দিন সামগ্রী থেকে পাত্রের বিদেশ যাত্রা পাথেয় এই সবকটি আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দেখে উঠতে পারবো। সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পাত্রীর গুণাবলীর চাহিদাও যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে পণ্যসামগ্রীরও।

ত্রয়োদশ শতাব্দী, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে রাজপুতনায় অভিজাত পরিবারগুলিতে পণপ্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। একজন যোদ্ধা রাজপুত যুবককে নিয়ে কয়েকটি কনের পরিবারের মধ্যে রেষারেষির কারণ পণপ্রথা এক বিরাট অভিশাপ রুপে দেখা দেয়। আলতেকারের মতে ব্রিটিশ রাজত্বে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, সরকারী চাকুরী লাভ, যুবকদের উচ্চ বেতন লাভ বিয়ের বাজারে তাদের দর বাড়িয়ে দেয়। তাদের নিয়ে কনের বাবার রেষারেষিতেই পণপ্রথা সামাজিক অভিশাপের রূপ ধারণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বাংলার সমাজের দিকে তাকালে অবশ্য এর প্রমাণ মেলে না। ব্রিটিশ আসার বহু আগে থেকে পণপ্রথা মহাসমারোহে বাংলাদেশে বিরাজমান ছিল। এ ব্যাপারে প্রথমদিকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা রঙ্গমঞ্চে দামামা বাজাতে আসেন নি। বাংলাদেশে পণপ্রথার অনুঘটকের কাজ করেছিল বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্যপ্রথা। এই কৌলিন্য প্রথা বিয়েকে একটা ব্যবসায় পরিণত করেছিল। এক একজন কুলীন যে কত বিয়ে করতো তার কোন ইয়ত্তা ছিল না। এমনই এক কুলীনের মেয়ে, কুলীনের বৌ নিস্তারীণী দেবী।[৮] জন্ম ১৮৩৩ সালে। বাংলাদেশের সমাজের পালে তখন সংস্কারের হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে। নিস্তারীণীর ঠাকুরদাদার বাবা

বিয়ে করেছিলেন একশ আটটি (হ্যাঁ ১০৮টি), ঠাকুরদাদা ৫৪টি, বাবা অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মাত্র ২টি বিবাহ করেছিলেন। নিস্তারীনীর বিবাহ হয় খানাকুল কৃষ্ণনগরের ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যার পেশা ছিল কোন সরকারী চাকুরী নয়, ঈশ্বরের পেশা ছিল 'কুলীন কন্যের কুল উদ্ধার করা'। নিস্তারীনীকে বিয়ের আগে ইতিমধ্যে তার তিরিশ, চল্লিশটি বিয়ে হয়ে গেছে। তার পেশাও ছিল কুলীন কন্যা বিয়ে করা। আর কণের বাপের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সেই অর্থে নিজের প্রতিপালন করা। এইসব কুলীন বরদের এক শ্বশুরবাড়ি থেকে আরেক শ্বশুরবাড়ী ঘুরতে দিন চলে যেত। যাইহোক অনেক দর কষাকষির পর নিস্তারীনীর বিয়ে হোল। নিস্তারীনীরও আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল। তার স্বামীও অর্থ নিয়ে অন্যত্র গমন করলেন।

বস্তুত তখনকার দিনে কুলীন জামাইরা টাকার জন্যই শ্বশুরবাড়ী আসত। যে শ্বশুরবাড়ী জামাই-এর খরচ বহন করতে পারত না, জামাইও সেই শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গমন করত।

একখানা খাতায় কুলীন বামুনেরা বিয়ের হিসাব লিখে রাখতেন। খাতার একদিকে পাত্রীর নাম, ঠিকানা, থাকত, আরেকদিকে থাকত টাকার কথা, লোক-লৌকিকতা আদায়ের কোন সুযোগ সুবিধা। কত টাকা পণে কোন মেয়েকে বিয়ে করেছে তাও লেখা থাকত। যেখানে পাওনা দক্ষিণা বেশী সেখানেই তারা বেশী যেতেন। চিত্রা দেবী[৯] লিখেছেন শ্বশুরবাড়ীতে পা ধোয়ানি, নমস্কারি ও ভোজন দক্ষিনা না পেলে রাত্রিবাস করতেন না। এই কৌলিন্য প্রথা, পণপ্রথার অভিশাপের জন্যই বোধকরি সেকালে মেয়ে জন্মালে ঘরে কান্নার রোল উঠত। বিয়ের পর ঈশ্বর চ্যাটুজ্যে কে পুনরায় শ্বশুরবাড়ী আনার জন্য দরঠিক হল-ঈশ্বর যতদিন শ্বশুরবাড়ী থাকবেন প্রতিদিন তাকে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। এও ঠিক করা হল পাঁচ টাকা আগাম দিতে হবে। পড়তে পড়তে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে হয় একোন পৃথিবীর কথা পড়ছি। এ কোন শতাব্দীর কোন স্থান। সময় খুব পিছিয়ে নয়, মাত্র ১৭০ বছর পূর্বে, আর স্থান আমারেই তিলোত্তমা কোলকাতা। এখানেই টাকা দিয়ে বর কিনতে হত, আবার বাড়ী ভাড়ার মত আগাম ও দিতে হত। এখানে কুলীন ছেলে সংসার চালাবার জন্য বিয়ে করত। স্বামী, স্ত্রীর কোন দায়িত্ব নিত না, উল্টে স্বামীর দায়িত্বই কন্যার পরিবারকে নিতে হত। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের সবকথা অক্ষরে অক্ষরে মানতেন, অথচ বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণের সময় স্বামীর স্ত্রীকে সারাজীবনের জন্য ভাত-কাপড় সুখ প্রভৃতির প্রতিজ্ঞা করেও পরে এতবড় বিচ্যুতি। এতবড় বিচ্যুতি শাস্ত্র পতিরা কিভাবে মেনে নিতেন কে জানে।

পণ প্রথার আর এক বহিঃপ্রকাশ করণ প্রথা। অর্থাৎ কুলীন পাত্রের কুল ভঙ্গ করা। পাবনা জেলার হরিপুরে গ্রামের দুর্গাদাস চৌধুরীর বড়মেয়ে প্রসন্নময়ী[১০]এর ভুক্তভোগী। প্রসন্নময়ীর জন্ম ১৮৫৭ সালে। প্রিয়ংবদা এরই মেয়ে। এরই ভাই বিখ্যাত আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী। প্রসন্নময়ী ধনীর কন্যা। তার বিয়ে হয় পাবনার গুনাইগাছা

গ্রামের কৃষ্ণ কুমার বাগচীর সঙ্গে, কৃষ্ণ কুমার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র কুলীন, তাই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অ-কুলীন প্রসন্নময়ীকে সে বিয়ে করে। কুলীন পাত্রের এই কুল ভঙ্গ করাকে বলা হোত করণ। বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণ কুমার উন্মাদ হয়ে যায়। বস্তুত এই সব বিবাহের বেশীর ভাগের পরিনামই ভাল হোত না। আরেক দুর্ভাগার নাম তিলোত্তমা। সেণ্ট্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ দাসের কন্যা। মাতা কৃষ্ণভাবিনী দাস, কৃষ্ণভাবিনী সে যুগে স্বামীর সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলেন, (১৮৮২ সালে) বিলেত যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণভাবিনী তার পাঁচবছরের শিশু কন্যাকে রেখে যান, শ্বশুর শ্রীনাথ দাসের কাছে। বিলেতেই শুনতে পেলেন তার মেয়েকে হাত পা বেধে জলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতত্রব, ১০ বছরে তিলত্তমার বিয়ে হয় হরি প্রসাদ ঘোষের সঙ্গে। শ্রীনাথ আর কিছু করতে পারুক না পা পারুক ১০ বছরের নাতনির মধ্যে স-যত্নে রোপন করে দিয়েছলেন পতিব্রতার বীজ। আর পণ হিসাবে দিয়েছিলেন অনেক ধন, গা-সাজানো গহনা কোম্পানীর কাগজ জমীর দলিল। মিস্টি কথায় ভুলিয়ে স্বামী সেসব হাতিয়ে সামান্য অজুহাতে তাকে ত্যাগ করেন। এই সবকিছু তিলত্তমা ছোট ছোট কবিতায় তার কাব্য গ্রন্থ 'আক্ষেপ' লিখেছেন।

"যা হবার হোয়ে গেল, যায় দিন যায়।
পতিমোর লয় ধন উন্মত্তের প্রায়"
ভালবাসি যারে সদা প্রাণচায় তারে।
মিষ্ঠ ভাবে তুষি মোরে সদা ছলেরে।।"[১১]

এই সব টুকরো টুকরো ছবি। এদেরই কোলাজ তো উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ। যার ফলে নতুন যুগের হাওয়া লেগেছে, পাশ্চত্য শিক্ষার দমকা হাওয়া অনেক অর্গল খুলে দিয়েছে, কিন্তু অন্দর মহলে তখনও গাঢ় অন্ধকার। কোথাও টিম টিম করে প্রদীপ জ্বলছে। কাদম্বরী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু, তরুদত্ত জ্ঞানদা, নন্দনী, সরলাদেবীরা প্রতিটা কদম এগোচ্ছেন, প্রবলযুদ্ধে করে। অপরদিকে আপামর বাঙালী নারীসমাজ মুখ থুবরে পড়ে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ, রাজনীতিতে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। আরাকান জলদস্যুদের নারী হরণ, বর্গী আক্রমণ বাংলার সমাজ জীবনে এক বিরাট সংকটের সৃষ্টি করে। প্রচুর নারী অপহৃত এবং ধর্মিত হয়। পরে পরিবারে এলে ঘরে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃত হয়। পরিবারের বন্ধনগুলি ঢিলা হতে শুরু করে। এই সময়ই আশ্চর্যজনক ভাবে কৌলিন্য প্রথার কড়াকড়ি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। কুলীনদের বিরাট পণের চাহিদা মেটাতে না পারায় অনেকেমেয়েকেই পেটের দায়ে আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন গণিকালয়ে। এক গণিকা ত্রৈলোক্য[১২] ১৮৪৮ সালের ৯ আগস্ট আরেক গণিকা রাজকুমারীকে খুন করে। ৩ সেপ্টেম্বরে তাঁর ফাঁসীর হুকুম হয়। ত্রৈলোক্যের মৃত্যুকালীন

জবানবন্দী তেকে পরিস্কার কিভাবে পণপ্রথা আর কৌলিন্য প্রথার অভিশাপ তাকে ঠেলে দিল বেশ্যাবৃত্তির দিকে। (এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে ত্রৈলোক্য। তার আইবুড়ো নাম ঘুচাবার জন্য তার পিতামাতা প্রচুর পণদিয়ে একবৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ দেন। আবার ৪ বছর পর আসেন অর্থ আদায়ের জন্য এবং রাত্রিবাস করে পরের দিন প্রাতে আবার যাত্রা করেন। পরে এর স্থান হয় গণিকালয়ে। পরে পেট চালাবার জন্যে একের পর এক খুন করতেও পিছুপা হয়নি ত্রৈলোক্য। এই সমাজ এক সাধারণ মেয়েকে প্রথমে বানালো গণিকা তারপর খুনী।[১৩] এরকম আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। (১৮৪২ সালে বিদ্যাদর্শন পত্রিকায়" এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যাভিচারের কারণ" শীর্ষক পত্রে পত্রলেখিকা নিজের পরিচয় দিয়েছেন' কলিকাতা নির্বাসিনী বেশ্যা বলে। যখন তার ৩বছর বয়স, তখন তার বিবাহ হয়। প্রথমবার তার স্বামীকে সে দেখে যখন তার বয়স ১৬ বছর স্বামীর ৫০। তাকে দেখে কুমারী মেয়ের প্রথম অনুভুতি— "তাহার কুৎসিত আকৃতি গলিত অঙ্গ এবং পক্ক কেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া ছিলাম। আমি জ্ঞানত তাহাকে বরণ করি নাই, কদাপি জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাত (হয়) নাই, অথচ (তিনি) আমার পতি, আমার সকল সুখের মূলাধার।" যাইহোক পরদিন প্রাতে যথেষ্ঠ পরিমাণে ধন নিয়ে সেই বৃদ্ধ প্রস্থান করে।

অতত্রব স্বামীর দর্শন পাওয়া নির্ভর করত অর্থ সংগ্রহের উপর। যেসব মেয়ে ভাই, দাদা, মামার সংসারে আশ্রিত ছিল তারা বিবাহের পর জীবনে দু-তিনবারের বেশী স্বামীর সুখ দেখতে পায়নি। এরকম মেয়েও দুর্লভ ছিল না, যে বিয়ের পর আর স্বামীর মুখ দর্শন করেনি, এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর তার মৃত্যু সংবাদ পায়নি। নিস্তারীনী দেবীই এরকম ঘটনার কথা লিখেছেন। কালীঘাটে নিস্তারীনী দেবীর এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হয়। কথায় কথায় জানতে পারেন সেই বৃদ্ধা তারই সতীন। সেই বৃদ্ধা স্বামীর মৃত্যুর খবরও জানতেন না। নিস্তারীনী দেবীর[১৪] মুখে খবরশুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন। অথচ বিয়ের পর কিন্তু যে স্বামী কেমন-তা একদিনও দেখে নাই। যেসব মেয়ের পিতামাতা বেঁচে থাকতেন তারা কায়ক্লেশে অর্থ জোগাড় করতেন জামাইকে ঘরে আনার জন্য অর্থের বিনিময়ে যদি সামান্য সময়ের জন্য কন্যার সামান্য সুখও কেনা যায়। কিন্তু এভাবে কি সুখ কেনা যায়? এটা পণপ্রথাই তৈরী করেছিল। একদল অপোগণ্ড, কর্মবিমুখ অলস যুবসম্প্রদায়ের, যারা কোন পেশা গ্রহণ করেনি, বিয়েই এদের জীবন নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বড় সুখের সময় নয়।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়। অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিটি বিবাহে বিদ্যাসাগর বিপুল পরিমানে অর্থ ব্যায় করেছেন কখনো পাত্রপক্ষকে বিপুল পরিমানে পণদিতে, কখনো বা বিবাহের আনুসঙ্গিক খরচে। এমনকি তার সহকর্মী অন্যান্য সমাজ ও সংস্কার করাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। মতিলাল শীল ঘোষণা করেন যে কোন হিন্দু ভদ্রলোক

বিধবা বিবাহ করতে রাজী হবেন তাকে তিনি ২০,০০০ টাকা দেবেন। ১৮৫৬ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয় পত্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্নর সঙ্গে বিধবা কালীমতী দেবীর। বিদ্যাসাগর এই বিয়েতে ১০,০০০ টাকা ব্যায় করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী "Man I have seen"[১৬]-এ লিখেছেন তাঁর সহপাঠী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এক বিধবাকে বিবাহ করতে মনস্থ করলে বিদ্যাসাগর এই বিবাহে প্রচুর যৌতুক দেন। এভাবে ৬০টি বিবাহে তিনি প্রায় ৮২,০০০ টাকা ব্যায় করেন। এ ব্যাপারে তাঁর বন্ধু বান্ধবেরাও তাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন। কেউ এককালীন, কেউ বা মাসে মাসে। অনেকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত অর্থ সাহায্য করেননি। তাই বিদ্যাসাগর প্রচুর দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ প্রত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়।

"বিধবা বিবাহের জন্য এককাণ্ড হয়। অনেকে চাঁদা দেবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য স্বভাবসুলভ শৈথিল্যহেতু কাহাকে পীড়াপীড়ি করেন নাই। অনেকের নিকটে বিস্তর চাঁদাকরা হয়। শেষে প্রায় আদায় হইল না। ইতিমধ্যে প্রায় ৬০ টি বিধবা বিবাহ দিতে ৮৭,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়।[১৭] মৃত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি কয়েক জন্য হিতৈষি সাহায্য করেন এইমাত্র। ইহাতে প্রায় ৪২,০০০ টাকা উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ভাবিয়াছিলেন, অন্য সকলে এইপ্রকার সাহায্য করিবেন। কিন্তু চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া টাকা না দেওয়া অধিকাংশ লোকের যে রোগ আছে, এস্থলেও তাহার কার্য্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগর ৩৫,০০০টাকা ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন।

কিন্তু বিষ্ময় লাগে এইবিপুল ঋণ মাথার উপর বহন করার সত্যিই কোন আবশ্যকতা ছিল কি? এত বড় সমাজ সংস্কারক হয়ে তিনি বা তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা এটা কেন বিস্মৃত হলেন পণ দিয়ে বিবাহ দিলে তার সার্থকতা কোথায়? বেশীরভাগ পাত্রই বিবাহ করতে আসত টাকার লোভে। বিবাহের মূলকথা প্রেম বা বিধবাদের দুঃখ কষ্ট দেখে তা দূর করার জন্য তারা বিবাহে ব্রতী হননি। বস্তুত অনেকপাত্রেরই স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে বর্তমান থাকা অবস্থায় তারা দ্বিতীয়বার বিধবা বিবাহ করে শুধু অর্থের লোভে। অর্থ আদায় হয়ে গেলে স্ত্রীকে ফেলে রেখে তারা আবার নিজের বাড়িতে ফিরে যেত। ফলে এই সব মেয়েদের অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পড়তে হত।[১৮] যা বিধবা বিবাহকে অনেকাংশেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। অবাক লাগে বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তি কি করে পণপ্রথার পৃষ্ঠপোষক হলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধুদের দোষারোপ করেছেন বিবাহে উপযুক্ত অর্থ না দেওয়ার জন্য। তাঁরা কথার খেলাপ করলে নিশ্চয় দোষের, কিন্তু তাঁর থেকেও দোষের নয়, পণ দিয়ে বিধবাদের বিয়ে, অবশেষে যার পরিণতি এদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

বিদ্যাসাগর নিজেও এই পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যর্থতা অনুভব করেছিলেন শেষ দিকে। তাই তিনি পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকার পত্রে সঁই করিয়ে নিতেন।

এই যখন দেশের অবস্থা, তখন দেখা যাক বাংলার সবচেয়ে আলোকপ্রাপ্ত পরিবার ঠাকুরবাড়ির কি অবস্থা? সমকালীন হিন্দু সমাজের মধ্যে এক স্বদ্বীপের মত অবস্থান করত ঠাকুরবাড়ি। পিরালী হওয়ায় হিন্দু ব্রাহ্মণদের সমাজে তারা ছিল অনেকটাই একঘরে। তার উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলে সমকালীন হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ছিল না বললেই চলে। তবে সামাজিক রীতি নীতিগুলি কি খুব স্বতন্ত্র ছিল? পণপ্রথা নিয়েই বা ঠাকুরবাড়ি কি খুব উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল?

পিরালী ব্রাহ্মণ হওয়ায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের জন্য সদবংশের সতচরিত্র, শিক্ষিত ছেলে পাওয়া খুব দুষ্কর ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বিয়ে করলে সমাজচ্যুত হবার ভয় ছিল। অতত্রব ঠাকুরবাড়ির জামাইদের ঘরজামাই করে রাখা হত। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বিয়ে করলে সারাজীবন তাদের গ্রাসাচ্ছদন এবং অন্যান্য সকল বিলাসিতার খরচ ঠাকুরবাড়ির তহবিল থেকে মেটানো হত। দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সৌদামিনী সুকুমারী শরৎকুমারী, বর্ণকুমারী, কাদম্বিনী, কুমুদিনীর, স্বামী যথাক্রমে সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যদুকমল মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যোগেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায় সকলেই ঘরজামাই ছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল।

এই ঘটনাগুলিকে প্রণপ্রথার উদাহরণ হিসাবে কি ধরা যায় না? অবশ্য ঘরজামাই করে রাখার প্রথা পরবর্তী কালে অনেকাংশেই উঠে যায়। যেমন এদের পরবর্তী প্রজন্মেই হেমেন্দ্র নাথের কন্যা প্রতিভার সঙ্গে বিবাহ হয় আশুতোষ চৌধুরীর। যিনি ঘরজামাই ছিলেন না। প্রতিভার বোন প্রজ্ঞার সঙ্গে বিবাহ হয় অসমিয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেশুবরুয়া এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে ঠাকুর পরিবার পণপ্রথার কোন প্রতিবাদ তো করেন নিই উপরন্তু খুব সূক্ষভাবে একে যৌতুক নাম দিয়ে এই প্রথার পৃষ্ঠপোশকতা করেছেন। যেমন হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী 'মহর্ষি পরিবার' থেকে জানতে পারা যায়। মহর্ষি নাতনীদের বিয়েতে তিনহাজার টাকা যৌতুক দিতেন।[১৯]

'হিন্দু বিবাহ' 'অকাল বিবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধেও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহ রোধে আইনপ্রণয়ন করতে না চাইলেও তাঁর সুষ্ঠ সমর্থন ছিল' যৌবন বিবাহের' প্রতি। এমন কি দেনাপাওয়া, হৈমন্তী, অপরিচিতা গল্পেও তো বারবার গর্জে উঠেছে তাঁর কলম। কাউকে উপদেশ দেওয়া যতটা সহজ, ব্যক্তি জীবনে সেই দায়িত্ব পালন ততটাই কঠিন। কবি তাঁর কন্যা মাধুরীলতার বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন যখন মাধুরীর বয়স মাত্র চৌদ্দ। দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার ফুলশয্যা হয় ১১ বছর ৮ মাস বয়সে, মীরার বিয়ে হয় ১৩½ বছরে। এর পিছনে স্বার্থটা পণপ্রথা সম্পর্কিত।[২০] এর কারণ

অনেকে মনে করেন মহর্ষির জীবদ্দশায় ঠাকুর পরিবারে বিয়ের যাবতীয় খরচা মেটানোও হত সরকারী তহবিল থেকে।[২১] পারিবারিক এই ব্যবস্থার জন্য কবি মহর্ষির জীবৎকালেই তিন মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আলোই নিরুপমা হৈমন্তী, কল্যাণীর মানসপিতার নিজের ব্যক্তি জীবনে এই মানসিকতা। প্রশান্ত কুমার পাল লিখেছেন "ব্যক্তি স্বার্থের তাঁর সামাজিক ভূমিকা বিস্মরণের ইতিবৃত্তটি কিঞ্চিৎ আপত্তিকর।"

যাইহোক এই ব্যক্তি স্বার্থ এবং অর্থের বিনিময়ে জামাই ক্রয়ের প্রচেষ্টা কবির ও মেয়ের জীবনে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনতে পারেনি। প্রথমে মাধুরীলতার কথাতেই আসা যাক। সুপাত্র হিসাবে কবি যাকে পছন্দ করলেন তার নাম শরৎকুমার চক্রবর্তী দর্শনে অনার্স সহ প্রথমশ্রেণীতে প্রথম, মেন্টাল এণ্ড মর‍্যাল সায়েন্সে এম.এ.সি. ওকালতি পাশ করে মজঃফরপুরে প্র্যাকটিস করছে। অতত্রব পাত্রের বাজারদর বেশ উচ্চ-ই। প্রথম পাত্রপক্ষ ২০,০০০ টাকা পণ চাইলেন। কবি অর্থে জলে পড়লে শরু হল দরাদরি। যেন কোন পশু বা পণ্য ক্রয় করা হবে। শেষে দর ঠিক হল ১০,০০০ টাকা।[২২] শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এতেই সম্মতিজ্ঞাপণ করলেন। কারণ এমন চমৎকার সুপাত্র তো হাতছাড়া করা যায় না। পাত্রপক্ষ তখন সুকৌশলে পাত্রের, বরযাত্রীর যাওয়া আসা, রাহা খরচ বাবাদ আর ও ১,০০০ টাকা চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন এই ভেবে যে বিয়ের আশীর্বাদ রূপে দেবেন্দ্রনাথ কতগুলি গিনি উপহার দেন, তাঁদের মূল্য ১২,০০০ এর কম হবে না কিন্তু পাত্রপক্ষ বেঁকে বসলেন। বিয়ের-আগে তাদের হাতে নাতে পণ চাই। বিহারীলাল চক্রবতীর শিক্ষিত পরিবার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত শ্বশুরকেও টাকার ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। কবি বন্ধুকে লিখলেন "আমাদের বাড়িতে অনেক বিবাহ হইয়া গেছে-আমার কন্যার বিবাহেই প্রত্যেক কথা লইয়া দরদস্তর হইল। এ ক্ষোভ আমার থাকিবে।[২৩] এত দর নিয়েও তিনি পিছিয়ে আসতে পারেননি। কবি কন্যা কি এতই সস্তা। আর শরত কি এতই দুর্লভ? কন্যার পিতার হীনমন্য মনোভাব আজও যায়নি, তো সেদিন হোক না যে কন্যা মাধুরীলতার মত অসামান্যা সুন্দরী ও গুনবতী, হোন না যে পিতা বিশ্বকবি, তাও না। রবীন্দ্রনাথ একদিকে স্ত্রীর পত্রে ঘৃণালের মুখে ভাষা জোগাচ্ছেন আর অপরদিকে নিজের কন্যাকে যথাসময় মাথানত করে বাঁচতে শেখাচ্ছেন। তারই প্রমাণ মাধুরীলতার চিঠিতে" তুমি আমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছ তা আমি প্রাণপণে পালক করতে চেষ্টা করব। আমার স্বামী যে আমার চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আমি যে তার সমান নই এটা বরাবর মনে রাখব।"[২৪]

যাইহোক আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি-রবীন্দ্রনাথ পণের সমস্যার সমাধান হেতু সরাসরি ভাবী জামাতা শরৎ কুমারকেই চিঠি লিখলেন। এত শিক্ষিত যুবক নিশ্চয় পণ প্রথা সমর্থন করবে না। শিক্ষিত, বিনীত যুবকের মতোই শরৎ পত্র পাঠালেন, যাতে

সাপ মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে। শরৎ জানালেন তিনি পণ প্রথা সমর্থন করেন না। কিন্তু মা, ভাইদের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত রফা হোল। টাকার জন্য জামিন থাকলেন কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য।

মাধুরী লতার বিয়ে হোল ১ আষাঢ়, মাস খানেকের মধ্যে কবি দ্বিতীয় কন্যা রেণুকাকে যুপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত হলেন। ২২ শ্রাবণ বিয়ে হোল রেণুকার। বয়স ১০ বছর ৬ মাস পাত্র সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পণ-ছেলেটিকে বিলেত পাঠাবার ও সেখানে পড়াশুনা চালাবার খরচ কন্যার বাড়ীর। মাসে দশ পাউন্ড। কিন্তু সে পড়াশুনা শেষ না করে দেশে ফিরে আসে। এবং ঘর জামাই হিসাবে ঠাকুর বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়। প্রতিমাসে হাত খরচ ১৫০ প্লাস বিভিন্ন সময় গাড়িভাড়া বাবদ অর্থ ইত্যাদি। ঔষধের দোকান বানাবার ২,০০০ টাকাও কবিকেই দিতে হবে।[২৫] এত কিছু করেও কবি মেয়ের জন্য সুখ কিনতে পারলেন না। ব্যার্থ দাম্পত্যের জ্বালা নিয়ে অকালে হারিয়ে গেলেন রেণুকা।

এতেও শিক্ষা হল না কবির। তাই মীরার যখন নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে সম্বন্ধ করলেন তিনি তখন ভুলে গেলেন আগের ২ মেয়ের জীবন ইতিহাস। মীরার বয়স তখন ১৩ বছর ৬ মাস। পণ নগেন্দ্রনাথের আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভের পাথেয়। পরবর্তীকালেদেশে ফেরার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান বিভাগটি গড়ে তোলার দায়িত্ব পান। তখন পি-এইচ.ডি করতে বিলেত যান। তার খরচও দেন রবীন্দ্রনাথ।

দারিদ্র্যর কুটীর থেকে ধনীর প্রাসাদ, নিরক্ষর থেকে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির পরিবার কেউই প্রথার অভিশাপ থেকে দুরে ছিল না। এই ব্যাধি সমগ্র সমাজকেই ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিয়ে ছিল এর চুরান্ত উদাহরণ স্নেহলতা, অমিয় বালা। বাবাকে ভয়াভয় পণপ্রথার লাঞ্ছনা থেকে বাচাবার জন্য অন্যকোন উপায় না দেখে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন স্নেহলতা।

আর অমিয় বালা![২৮] ১৯০০ সালে তাঁর জন্ম। অমিয়বালা বিংশতাব্দীরই সন্তান। অথচ ভয়াভয় পণপ্রথা একেও বাঁচতে দেয়নি। অমিয়বালার জীবনের সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তীর ।প্রবাসী পিতা হৈমন্তীর মতই সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন এক জমিদার তনয়ের সঙ্গে। ১৫ বছর বয়সে অমিয়বালার বিয়ে হয়। ১৬ বছর বয়সে অমিয়বালা শ্বশুর বাড়ী আসে। ৩ মাস সুখ স্বপ্নের মত কেটে যায়। প্রথম ৩ মাস ভালবাসার কোন কমতি অনুভব করেননি। তারপরই স্বামী বিনাদোষে ত্যাগ করেন। লোকের কাছে বলে বেড়ান তার বিভিন্ন ত্রুটির কথা। কাউকে বলেন অমিয়বালার একটি মেয়েলি রোগ আছে। কাউকে বা বলে অমিয়বালা হারমোনিয়াম বাজাতে পারে না, এর সব কিছুর মুলে ছিল আর ও তিনহাজার টাকার পণের দাবী। অমিয়বালার বাবা তার সর্বস্ব দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তার

কাছে এই নুতন দাবী বিনামেঘে ব্রজপাতের মত। আত্মীয় স্বজনেরা তাও যে ভাবে হোক এই টাকার দাবী পূরণ করতে চেয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেন অমিয়বালা স্বয়ং। ১৮ বছরের সংসারের অনভিজ্ঞতা মেয়ে এভাবে তার সুখ কিনতে চায়নি। পণপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পিছ পা হননি। দাম্পত্যর শুরুই ভালবাসায়, শেষেও ভালবাসা এখানে অর্থের কোন স্থান থাকতে পারেনা, এই সারবস্তু ১৮ বছরেই অমিয়বালার বুঝতে কষ্ট হয়নি। শুধু তাই নয়, আবহমান কাল ধরেই বাংলার নারী জাতি যে অপমান সহ্য করে এসেছে তাদের সবার হয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন অমিয়বালা। বাঙালী ঘরের মেয়ে বলে কি নীলকণ্ঠের মতো সংসারের বিষে আকণ্ঠ পূর্ণ করব আমরাই? অমিয় বালার যেন নিরুপমার মতোই বলেছেন "আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।"

যুগ বলদায়, যুগ বদলাচ্ছে। সময় এগিয়ে চলছে। পণ প্রথা প্রাচীন কাল থেকে তার রূপ বদলাচ্ছে কখনো বা নগ্নরূপে, কখনো বা সুস্থরূপে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে অমিয়বালারাও। যারা তার অন্যায়কে মানতে চাইছে না। যারা প্রতিবাদের নতুন ভাষা খুজেঁ নিচ্ছে। সুখের সজ্ঞাও বদল হচ্ছে। মেয়েরা নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নিচ্ছে। স্ত্রীর পত্র-এর মৃণালের মত এখন এরা বলছে "আমার সমুখে আন নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। সুব্রতা সেন-পণপ্রথা, শাস্ত্রে ও সমাজে। আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৯৮, পৃ : ২৬-২৭

২। আলডেকার এ.এম-পজিশন সব উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন ফ্রম প্রিহিস্টোরিক টাইমস টু প্রেজেন্ট ডে, বেনারস, ১৯৩৮, পৃ : ৬৯-৭২

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী

৪। এ.এস আলডেকার প্রাগুক্ত, পৃ : ৬৯-৭২

৫। পূর্বোল্লিখিত

৬। সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীনভারতের সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৩৯৬, পৃ : ২৯

৭। পূর্বোল্লিখিত, পৃ : ৩৫

৮। —

৯। চিত্রা দেব অন্তঃ পুরের আত্মকথা, কলকাতা ১ম সংস্করণ-১৯৮৪ পৃ : ৯

১০। পূর্বোল্লিখিত, পৃ : ১৩

১১। সীমন্তী সেন (সম্পাদিত)-কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা স্ত্রী, ১৯৯৬ পৃ : ১৭০-১৭৫

১২। সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় আক্রান্ত কণ্ঠস্বর, কলকাতা ২০০৩।

১৩। পূর্বোল্লিখিত

১৪। চিত্রা দেব, প্রাগুক্ত পৃ : ৩৩

১৫। মণি বাগচী বিদ্যাসাগর, সাল? ভূমিকা ১৯৫৭, কলিকাতা পৃ : ২১৪-২১৭

১৬। পূর্বোল্লিখিত

১৭। অশোক সেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ ইলুউমিউ মাইলস্টোন স্থান? কলকাতা, ১৯৭৭ সাল? পৃ : ১৮৪

১৮। বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

১৯। চিত্রা দেব ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, ২য় সংস্করন, ২০০০ পৃ : ৮১

২০। প্রশান্ত কুমার পাল রবীজীবনী খণ্ড? কলকাতা সাল? পৃ : ৮৮, ৩৬৩, ৫ম খণ্ড

২১। চিত্রা দেব ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল কলকাতা, ২০০০

২২। প্রশান্ত কুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃ : ১, খণ্ড পঞ্চম

২৩। চিত্রা দেব ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল-প্রাগুক্ত, পৃ : ১১২

২৪। পূর্বোল্লিখিত

২৫। প্রশন্ত কুমার পাল প্রাগুক্ত পৃ : ৮৮, খণ্ড-পঞ্চম

২৬। পূর্বোল্লিখিত, পৃ : ৩৬৩ খণ্ড-৫ম

২৭। চিত্রা দেব-অন্তঃপুরের আত্মকথা পূর্বোক্ত পৃ : ১২৯

২৮। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী অন্দরে অন্তরে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভদ্রমহিলা, কলিকাতা পৃ : ১৪৫-১৪৬, ২২৫, ২২৬

উনিশ শতকের বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস

রিয়া চক্রবর্তী

বাঙালী তার রসনার রুচিবোধের জন্য সারা বিশ্বে আজও বিখ্যাত। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী তার প্রাত্যহিক আহারের তালিকাকে সমৃদ্ধ করতে নতুন নতুন আহার্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে। বলতে গেলে খাদ্যকে বাঙালী প্রায় শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।[১] আর তারই ফল শ্রুতিতে শুক্তো, ডাল, তরকারী, মাছ, মাংস, মিষ্টির সাথে সাথেই ক্রমশ বাঙালীর খাবার টেবিলে চপ, ফ্রাই, কাটলেট, স্যালাড্, আইস্ক্রিম, পুডিং, কেক, প্যাষ্ট্রি, প্যাটিস্ ও পিৎজার আগমন। কিন্তু আহারের এই পরিবর্তন একদিনে সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষে আগত বিভিন্ন জাতি বর্ণের মানুষের মত তাদের আহার্যও বাঙালী আপন করে নিয়েছে। ফলে অল্পবিস্তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে ওগুলো বাঙালীর রন্ধন শালায় এক স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

কোন একটি দেশ বা সমাজের ক্ষেত্রে তার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-আসাক প্রভৃতি যেমন তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের অন্তর্গত বিষয়, তেমনি তার খাদ্যাভ্যাসও ঐ সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।[২] তবে কোন জাতি-গোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে অর্থনীতিকে ভিত্তি করে। এজন্য এগুলিকে আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বলাই ভাল। খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল উনবিংশ শতকে বাঙালীর খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বাঙালীর তদকালীন আর্থ সামাজিক সংস্কৃতির সম্পর্ক নিরূপন করা। অর্থাৎ তখন বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠার পশ্চাতে আর্থ সামাজিক পটভূমি কীভাবে কতটা কার্যকর ছিল তা দেখা। একথা সর্বজন বিদিত যে, আর্থ সামাজিক সংস্কৃতি তা সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক-তিনটি মূল উপাদনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে দেশজ উপাদান, বহিরাগত উপদান এবং অর্থনৈতিক অবস্থা। খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠার পশ্চাতেও এই উপাদান গুলিই সক্রিয় থাকে।

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের এবং উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সব সময়েই পার্থক্য ছিল। লিখিত ইতিহাসের যুগের থেকে শুরু করে আজও একথা সমান প্রযোজ্য। বাংলার বেশির ভাগ মানুষ, কৃষক এবং তাদের বেশির ভাগই অর্থনৈতিকভাবে দুঃস্থ। বলা হয়ে থাকে "They are born in debt, brought up in debt and die in debt." এই যাদের অবস্থা-যাদের জীবনের সবকিছুই মধ্যসত্ব ভোগীরা আত্মসাৎ করে নেয়-তাদের খাদ্য তালিকায় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় না থাকাই স্বাভাবিক। তবে দরিদ্র

অথচ উচ্চ বর্ণের ক্ষেত্রে খাদ্যের কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন সব ধরনের মাছ ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য নয়, শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, বক, হাঁস, উট, গরু, শূকর ইত্যাদিও অভক্ষ্য ছিল। তবে নিম্নতম সমাজ স্তরে এবং আদিবাসীদের মধ্যে আজকের মতই এগুলি তখনও ভক্ষ্য ছিল।

খাদ্যের বৈচিত্র্যই খাদ্যের বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য আলোচনার জন্য খাদ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-প্রধান ও অপ্রধান খাদ্য।[৩] বাঙালীর চিরাচরিত প্রধান খাদ্য অন্ন এবং নিরামিষ ও আমিষ নানা প্রকারের ব্যঞ্জন। বাঙালী অপ্রধান খাদ্যকে "খাবার" বা "জলযোগ" বলে। এর মধ্যে চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি, হুড়ুম এবং নানান রকমের নোনতা এবং মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এছাড়া উৎসব-পার্বনাদি উপলক্ষ্যে নৈমিত্তিক পর্বে যে খাদ্য পরিবেশিত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে, তাতে প্রধান ও অপ্রধান সবরকমের খাদ্যই অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে।

বাঙালীর আহার্যের ক্রম বিবর্তন আলোচনা সম্পর্কে প্রথমেই প্রাচীন বাঙালীর খাদ্য তালিকা একটু দেখে নেওয়া যাক। সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং বাংলাদেশে ভাত মাছ ও বিভিন্ন তরিতরকারী যে বাঙালীর খাদ্য তালিকার শীর্ষ স্থানাধিকারী হবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কলা পাতার উপর গরম ভাত, তার সামনে গাওয়া ঘি ঢালা, নালতে শাক, মৌরলা মাছ, তার পাতের শেষে এক-বলকা দুধ-এই ছিল প্রাচীন বাঙালীর দুপুরের পরিতৃপ্ত আহার্য তালিকা।[৪] আতিথি পরায়ণ বাঙালীর অতিথি আপ্যায়ণের তালিকায় ছিল নালতে শাক, পাবদা মাছ আর পাকা কুমড়ো দিয়ে রুইয়ের পেটি। প্রাচীন বাংলার আহর্য সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা করা যায় ভবদেব ভট্টের "প্রায়শ্চিও প্রকরণ"[৫] নামক গ্রন্থ থেকে ঃ সে সময় ভাত, মাছ, মাংস, ফলমূল শাক-সবজি এবং দুধ বাঙালীর প্রধান খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন যুগের যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হল সে সময় নগরায়ণের প্রভাবে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য হয়নি। তাই বাঙালীর খাদ্য বলতে পুরো বাংলার খাদ্যই বোঝাত। শহর-গ্রামের খাদ্য তালিকার ইতর বিশেষ ছিল না। তবে ধনী দরিদ্রের খাদ্যে পার্থক্য ছিল।

ইতিহাসে মধ্যযুগ ছিল ভারত ও বাংলায় মুসলিম যুগ। স্বাভাবিকভাবে অন্য সবকিছুর মত বাঙালীর খাদ্য তালিকায় মুসলিম প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। অন্নের বদলে পোলাও, বিভিন্ন রকমের কাবাব, বিরিয়ানি, মাংসের ঢালাও পদপ্রাচুর্য যেমন-মটন চাপ, রেজালা প্রভৃতি। তার সঙ্গে গরম মশলার অঢেল ব্যবহার এই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়।[৬] তাছাড়া বিভিন্ন রকমের সরবতের প্রচলন ও নবাব বাদশাহের হাত ধরে বাঙালীর জীবনে প্রবেশ করে। তবে রক্ষণশীল বাঙালী প্রথমেই এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেনি ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে।[৭] কিন্তু কালক্রমে এগুলি সম্পন্ন বাঙালীর খাদ্য সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠল।[৮] তবে সাধারণ বাঙালীর খাদ্য তালিকা এই অসাধারণ পদ প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ছিল না।

মুসলিম আমলের শেষ থেকে উনিশ শতকে পদার্পণের যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালীর অর্থনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাদশাহী মোসাহেবী আর কোম্পানীর দালালির হাত ধরে তাদের হাতে প্রচুর অর্থের সমাগম হয়। এই অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রভাব তার খাদ্যরুচিকেও অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিবর্তিত করেছিল। সনাতনী বাংলার পঞ্চব্যঞ্জন অপসৃত হয়ে সম্পন্ন বাঙালীর খাদ্য তালিকায় এসে উপস্থিত হয়েছে কেক, প্যাটিস, পুডিং, চকোলেট, সুপ, ইংলিশ ফিস ফ্রাই, রোস্টেড মিট প্রভৃতি।[৯]

উনবিংশ শতাব্দীর আর একটি বড় ঘটনা কলকাতার নগরায়ণ। কলকাতা একাধারে ঔপনিবেশিক শাসন ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। গ্রামীন সম্পদ আহরণ করে কলকাতায় হয়ে উঠল ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল এবং সারা বাংলার তথা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্তা। "শাসন যন্ত্রের যন্ত্রীর প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন" ও হল কলকাতায়।[১০] তারই ফলে দেখা যায় শহরের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব ও বাবু সংস্কৃতির উদ্ভব। স্বাভাবিক ভাবেই শহর কলকাতার খাদ্যরুচি গ্রামীণ পটভূমি থেকে বিস্তর আলাদা হয়ে যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভৌগোলিক কারণেই বাঙালীর প্রধান খাদ্য তালিকায় ভাত-মাছ-তরকারী-মিষ্টির প্রাচুর্য ছিল। উনিশ শতকেও এই ভৌগোলিক কারণেই বাঙালীর প্রধান খাদ্য তালিকা তৈরী হত ঐ সব উপাদান মিশিয়ে। জল-খাবার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন আহার ও নিমন্ত্রণ বাড়ির ভোজ্য তালিকা বিশ্লেষণ করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ঐ সময় বাঙালীর জলখাবারে ছিল লুচি, বেগুনভাজা, কচুরি, সিঙ্গারা, জিলিপি ও সঙ্গে গরম চা। একই সময়ে গ্রামীণ জল খাবারের তালিকা একটু অন্য রকম ছিল। ধামা করে মুড়ি, নারকেল, বাতাসা, কখনও কখনও চপ, বেগুনি, ফুলুরি-এই ছিল মোটের উপর আয়োজন। কিন্তু নগরায়ণ ও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শহরের জল খাবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছিল ওমলেট, ডেভিল, চপ, বাটার টোষ্ট, স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি। গ্রামীন জল খাবারে কিন্তু এদের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

সাধারণ বাঙালী, নিম্নবিত্ত, গরীব, মধ্যবিত্ত এদের খাদ্যাভ্যাসের এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কালে। তবে এই আঘাতে এলিট বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসে তেমন কোন চিড় ধরেনি। জিনিস পত্র বিশেষকরে চালের দাম এমন আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল যে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। গ্রামে গ্রামে মন্বন্তরের বিভীষিকা, কলকাতাও তার বাইরে রইল না। হাজার হাজার মানুষের অনাহারে মৃত্যু ঘটল। যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁদের জন্য চালু হল কন্ট্রোলের দোকান, রেশন ব্যবস্থা। মানুষ তখন নিজের প্রয়োজন মেটাতে খাদ্যরুচি বদল করে ফেলল। অন্নের বদলে হল রুটির প্রচলন। তৎকালীন সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দির ভাত ছেড়ে গম, জোয়ার, বাজরার রুটি খাবার পরামর্শ, দেরীতে হলেও বাঙালী আপন করে নিল। এই ঘটনার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালী আর রুটিকে ছাড়তে পারেনি।[১১] বিশেষ করে রাতের খাবারে

রুটি হয়ে উঠল বঙ্গ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর রুটির তালিকা যে কত সুবৃহৎ হতে পারে তার একটি নমুনা নেওয়া যাক। বেসনের রুটি, ছোলার ডালের রুটি, গোল আলুর রুটি, বোম্বাই রুটি, ফুলকো রুটি, চাপাটি, ময়াদী রুটি, নারকেল রুটি পাকা আমের রুটি, তন্দুর প্রভৃতি।[১২] তবে ভাত একেবারে বাদ ছিল না। তাই নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা কম হয়নি। তার ফলে আমরা পাই নাতি হ্রস্ব তালিকা।

নোনা ভাত, পোয়ের ভাত, ফ্যাকড়া ভাত, পান্তাভাত, সাতলানো ভাত (আমানি) ফেনসা ভাত, মালাই ফেনসা, ক্ষারনি ভাত ইত্যাদি।[১৩]

বাঙালীর দৈনন্দিন প্রধান আহার্য তালিকায় মৎস একটি বিশেষ স্থানাধিকারী। উচ্ছে মৌরলা মাছের তেতো চচ্চড়ি, ডালের সঙ্গে কাঁচকি মাছের ঝুড়ি, কুচকুচে কালো বিশাল কই মাছ-ফুল কপি দিয়ে বাঁধা, কোন দিন হয়ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইলিশ-ভাজা, সরষেতে ভাপা কলাপাতায় মোড়া, কুমড়ো ফালি দিয়ে জিরের ঝোল-সবেতেই ইলিশ, কোনদিনও বা রুই মাছের মুড়ো দিয়ে মুগ ডাল, নারকেল চিংড়ি চিতলের পেটি ধনে পাতা আর ডালের বড়ি দিয়ে বড় বড় পাবদা, আবার কখনও বা মাগুর মাছের আলু আদা পেঁয়াজের ঝোল। এই রকম নানা বিচিত্র মাছের তালিকা[১৪] নগরায়ণের প্রভাবে মাছসহ বাঙালীর খাদ্য পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি। তবে তাতে এসেছে পরিবর্তন। ভাতের সঙ্গে পোলাও, মাছের সঙ্গে মাংসের ঘটা এবং আরও নানা প্রকার ইউরোপীয় খাদ্যের সংমিশ্রণ এই পরিবর্তনের অংশ।

মিষ্টি বাঙালীর খাদ্য তালিকায় এত সুবৃহৎ স্থানাধিকারী যে তার ক্রমবিকাশ সীমাবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। বাঙালীর প্রধান গ্রামীণ মিষ্টি ছিল নারকেলের সন্দেশ, নাড়ু, তক্তি, পায়েস, পীঠে, চন্দ্রপুলি ইত্যাদি বিভিন্ন ময়রার প্রতিভা। এবং দক্ষতার প্রকাশ ঘটেছিল দুগ্ধজাত নানা মিষ্টির মধ্যে। ছানার রসগোল্লা, সন্দেশ (বহু প্রকারের), লেডিকেনি, পান্তুয়া, ক্ষীরপুলি, সীতা ভোগ, মিহিদানা, মোতিচুর, জিলিপি, দই। তাছাড়া রসনার তৃপ্তির জন্য ছিল খাজা, গজা ইত্যাদি। এগুলো কোনটিই বিলুপ্ত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেক পুডিং, চকোলেট, আইসক্রিম ইত্যাদি। এই মিশ্রণ অবশ্যই ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও নগরায়ণের প্রভাবে ঘটছে বলা যেতে পারে।

বাঙালীর পূজা-পার্বন, উৎসব-বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত খাদ্য তালিকা পৃথকভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তবে এক্ষেত্রে এলিট ও সাধারণের জন্য আয়োজনের পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১৫] ঠাকুরবাড়ির শরৎ কুমার চৌধুরাণীর 'শুভবিবাহ" গ্রন্থে এই পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। সাধারণ আমন্ত্রিতরা যেখানে লুচি, কচুরি, পাঁপড়ভাজা, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, চাটনি, ক্ষীর, দই ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত হয়, এলিট সমাজে সেখানে আপ্যায়নের মেনু হল পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়ে ছোলার ডাল, রুই মাছের মুড়ো দিয়ে

মুগের ডাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা, দই মাছ, চাটনি, খাজা, গজা, দরবেশ, মিঠাই আর আম, কামরাঙা ও তালশাঁস। এছাড়া ক্ষীর, রাবড়ি ও ছানার পায়েস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের যে কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না তার রন্ধন প্রণালীর বিবরণ, অল্পমাত্রায় হলেও, তাতে না থাকে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় বাঙালীর রান্না একটি উৎকৃষ্ট মানের কলাবিদ্যায় উন্নীত হয়েছিল। বাঙালী রমণীর উদ্ভাবন প্রতিভা, দক্ষতা, সেবামূলক মানসিকতা এবং রান্নার প্রতি তার ভালবাসার দৌলতেই তা সম্ভব হয়েছিল। কোন কাজ যদি কারো ভাল লাগে তবে তা সে প্রাণ মন ঢেলে করবে। কারণ সেখানে সে তার সত্তাকে খুঁজে পায়- এ কাজ যেন তার "Home coming"–তার একান্ত আপনার জগৎ। বাঙালী রমণী জীবনের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল এই শিল্প চর্চার মধ্যে তাই মনে হয় হাসিমুখেই সে মেনে নিয়েছিল ষোড়শ উপাচারের রান্না রচনার সৃষ্টি কর্ম। অনেকে হয়ত বলবেন—"Subjugation of women"। সে আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। বাস্তব হল, রন্ধন শিল্পে বাঙালী রমণী ছিল অনন্য প্রতিভাময়ী, অন্তত উনিশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। কেবলমাত্র শুষ্ক দায়িত্ব বোধের দ্বারা এতটা উৎকর্ষ কখনওই অর্জিত হত না। রন্ধন শিল্পের এই উৎকর্ষতার ফল স্বরূপ বাঙালীর রসনা হয়ে উঠেছিল যেন কষ্টি পাথর। রান্নার অতি সামান্য "তারের" পার্থক্যও তার রসনায় ধরা পড়ত। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, যে রন্ধন শৈলী ও পদ প্রাচুর্যের কথা উল্লিখিত হল তা জমিদার বা ধনী গৃহের ভোজ্যের কথা নয়, গড় বাঙালীর গড়পড়তা খাদ্যের কথাই বলার বিষয়। উৎপাদনের ভিত্তিতে গড় বাঙালীর স্বাভাবিক দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা ছিল ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি-টক-মিষ্টি-ফল। আজও তাই আছে। যা নেই তা হল পদ বৈচিত্র্য। একই জিনিস দিয়ে, কেবলমাত্র সামান্য হেরফের ঘটিয়ে, যত রকম পদ সৃষ্টি হত সে সময় আজ তা নানা কারণে অপসৃত এবং বিস্মৃত। বাঙালীর পদ সম্বাবের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু-শংকর পর্যন্ত বহু লেখকের লেখনীর স্পর্শে বিধৃত হয়ে ইতিহাসের গৌরব অর্জন করেছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। তা হল বাঙালী হিন্দু বিধবা রমণীর রন্ধনশৈলীর প্রতিভা। মনে পড়ে যায় শ্রীক্ষেত্র ধামের সেই অমর শিল্পীর কথা যিনি নূন্যতম আঁচড় কেটে কাঠের বুকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন জগন্নাথ-বলরাম-শুভ্রদার অপরূপ ত্রিমূর্তি। বাঙালী হিন্দু বিধবার জীবন কঠোর নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। প্রায় সব সুখাদ্য থেকেই তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, গরম মশলার কথা না হয় বাদই দিলাম। এমন কি মুসুর ডালের মত শস্যও ছিল তাঁদের নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকাভুক্ত। এমতাবস্থায় তাঁরা কিন্তু হেরে যাননি। ধর্ম ও সমাজ অনুমোদিত ন্যূনতম যেটুকু উপকরণ বরাদ্দ ছিল তাই ব্যবহার করে স্বীয় প্রতিভা,দক্ষতা ও জ্ঞান সম্বল করে তাকেই তাঁরা

সুখাদ্যে পরিণত করতেন। আর সে-রান্না বিশ্বের যে কোন প্রান্তের বিখ্যাত রান্নার চেয়ে কিছু কম "সুতার" ছিল না। যা কিছু অকিঞ্চিৎকর, বিচি, ভুতি, খোসা যা সকলে ফেলে দেয় তাই দিয়েই তাঁরা তৈরী করতেন রসনা-সুখ সব খাদ্য! এ যেন "Wealth from waste"। বুদ্ধদেব বসুর মতে "এই নিরামিষ রন্ধন শৈলী কঠোর বৈধব্য প্রথারই উপজাতক"।[১৬] এসব রন্ধন শিল্পের জন্যই সম্ভবত বাঙালী "ভোজন শিল্পী" বা "ভোজন রসিক" নামে বিশেষিত হয়েছিল।

দেশজ উৎপাদনের ভিত্তিতে বাঙালীর নিজস্ব যে খাদ্যরুচি একদা গড়ে উঠেছিল বৈদেশিক প্রভাবের ধাক্কায় বারবার তার সংকরায়ণ ঘটেছিল। তাতে বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ বিধান হল পরিবর্তন কখনো থেমে থাকে না। তাই সংস্কৃতি একটি ধারাবাহিক বিষয়। খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। সেই পরিবর্তনের ধারা আজও চলছে। অতীতের পরিবর্তনের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস একবিংশ শতকের বিশ্বায়ণের যুগে এসে ঠেকেছে। ফলে এখন বাঙালীর খাদ্য তালিকা হয়ে উঠেছে যথার্থ অর্থে বিশ্বায়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য বাঙালী আজ একই সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব সেই বিখ্যাত রন্ধন শিল্প ও শিল্পী।[১৭] হয়ত তার একাধিক আর্থসামাজিক কারণ আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা তার সন্ধান করবেন। তবে বাস্তব হল, বাঙালী রমণী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সকলেই, রান্না ঘরে বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকতে পারছে না। আর তার ফলেই চলছে হোটেল শিল্প এবং হোম ডেলিভারি নামক কুটির শিল্পের লাভজনক ব্যবসা।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। বুদ্ধদেব বসু; ভোজন শিল্পী বাঙালী; বিকল্প প্রকাশণী, কলকাতা ২০০৪।

২। নীহার রঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস; দ্বিতীয় খণ্ড; স্বাক্ষরতা প্রকাশন ১৯৮০; পৃ : ৫৬৪

৩। প্রণব রায়; বাঙলার খাবার; কলকাতা ২০০৪

৪। বাঙালীর ইতিহাস; পৃ : ৫৬৫

৫। ঐ ; পৃ : ৫৬৭

৬। বারিদবরণ ঘোষ, শার্মিলা বসু ঠাকুর ও অন্যান্য; মেনু প্ল্যানিং সানন্দ, ৩০.১০.০৩, পৃ ৩৬

৭। Mr. Mohsina Mukadam, 'Enriching taste : Pluralism in Indian Cuisine; Unpublished article in Annual Conference of Institute of Historical Studies at Eudupi, 2003.

৮। তদেব

৯। সানন্দা; ৩০.১০.০৩; পৃ : ৪০

১০। চিত্তব্রত পালিত; বাঙলার চালচিত্রে কলকাতা, কলকাতা, ২০০০, পৃ : ৫৭

১১। শংকর বাঙালীর খাওয়া-দাওয়া একাল ও সেকাল; সুখী গৃহকোণ; বার্ষিক সংখ্যা ২০০১ পৃ : ৪৭

১২। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী আমিষ ও নিরামিষ আহার; কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত, ২০০৪,

১৩। শংকর প্রাগুক্ত

১৪। বুদ্ধদেব বসু, গোলাপ কেন কালো; কলকাতা ১৯৮০

১৫। শরৎ কুমারী চৌধুরাণী, শুভবিবাহ; কলকাতা, পুনর্মুদ্রিত ২০০৩

১৬। বুদ্ধদেব বসু, ভোজনশিল্পী বাঙালী, প্রাগুক্ত

১৭। তদেব।

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা, ছিট্‌মহল ও সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তি

মাধুরী পাল

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৩ এবং (৩) ধারা মতে স্যার সিরিল র‍্যাডাক্লিফের সভাপতিত্বে বাউন্ডারী কমিশন ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত চিহ্নিতকরণ করে।[১] শুধু তাই নয় র‍্যাডক্লিফ বাটোয়ারার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে জন্ম হয় ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) রাষ্ট্রের। যার ফলে ভারতের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ৯৫টি ছিট্‌মহল ঢুকে পড়েছে। যার আয়তন প্রায় ১২,২৮৯,৩৭ একর। অনুরূপ ১৩০ টি ভারতীয় ছিট্‌মহল পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে, যার আয়তন প্রায় ২০,৯৫৭,০৭ একর।[২] কিন্তু র‍্যাডক্লিফ সীমান্তে দাগ টানার সময় তেঁতুলিয়া, পচাগড়, দেবীপঞ্জ এবং পাটগ্রামকে খেয়ালে রাখলেও বোদা থানাটিকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। উল্লেখিত পাঁচটি থানা এলাকাগুলি পূর্ব পাকিস্থান তথা বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন নং ১২ জলপাইগুড়ির। ফলে দাগ ও বিবরণীর মধ্যে অমিল থাকায় সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তি হয়।[৩] ১৯৫৮ সালে 'নেহেরু-নুন চুক্তি'র মাধ্যমে দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অর্ধাংশ পাকিস্তানে হস্তান্তরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ' বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটি'র নেতৃত্বে তীব্র গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়।[৪] অর্থাৎ লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা ভারতকে দ্বিখন্ডিত করছে এবং ভারতের সীমা নির্ধারণ করছে কিন্তু বিভাজনের এক দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার (জলপাইগুড়ি) একটি অত্যন্ত প্রত্যন্ত ও অখ্যাত গ্রাম সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ, গণ আন্দোলনের সামিল হয়েছিল যা ভারতের অন্য কোন সীমান্তে সেই একই সময় লক্ষিত হয়নি।

কেবল মাত্র আন্দোলনই নয়, বেরুবাড়ী হস্তান্তর সংবিধান গত কিনা সেই বিষয়টি আন্দোলন কারীরা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। ফলে বিষয়টি ১৯৫৯ সালের ৮ থেকে ১১ ডিসেম্বর, চারদিন সুপ্রীম কোর্টে শুনানী হয়। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এই হস্তান্তর সম্ভব নয়।[৫] কিন্তু সকল প্রকার জনবিক্ষোভকে উপেক্ষা করে ১৯৬০ সালের মধ্যেই সংবিধানের নবম সংশোধন হয়ে যায়। এই সংশোধন অনুযায়ী বেরুবাড়ী পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি আইনত সিদ্ধ হয়। ঐ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রী ছিলেন আশোক কুমার সেন।[৬]

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যে উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চল আটটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্ঠিত (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভূটান, মায়ানমার, সিংহল বা শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ) এবং ১৯৪৭-এর বিভাজন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভাগকে খন্ডিত করেছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের ছিট্‌মহল অধ্যুষিত দু'টি জেলা জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ছিট্‌মহল ও সীমান্ত সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের সদ্‌উত্তর পাবার জন্য আমার বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপট উক্ত অঞ্চলের সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তি সম্পর্কিত, সারা ভারতে সীমান্ত সমস্যা বিষয়ক নয়। অর্থাৎ আমার গবেষণা পত্রের মুখ্য বিষয় "র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা, ছিট্‌মহল ও সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তি।"

মূলত ভারতের ছিট্‌মহল সমস্যা ও সীমান্ত সমস্যার উৎস 'র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা ১৯৪৭'। ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী যিনি কখনো ভারতে আসেননি। যিনি ভারত সম্পর্কে কিছু জানেন না তিনি ভারতকে দ্বিখন্ডিত করলেন।[৭] অর্থাৎ ভারতের ভৌগলিক বিষয়ে অজ্ঞতা যেমন র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার একটি দুর্বলতম দিক, তেমনি সেই সময়কার ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দও তাঁকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করেননি। অর্থাৎ জাতীয়নেতৃবৃন্দ র‍্যাডক্লিফকে ভারতের ভৌগোলিক দিকটি সম্পর্কে সম্ভবত অবহিত করেননি। ফলত সীমানা নির্ধারনে জটিলতার উৎপত্তি। শুধু ভৌগলিক অবস্থানই নয় ছিট্‌মহল গুলির উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পর্কেও র‍্যাডক্লিফ অবহিত ছিলেন না বলেই অনুমিত হয়। যদি তা নাই হয়, তবে সীমার দাগ ও বিবরণের মধ্যে কোন রূপ অমিল থাকত না সীমা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হত না।

কিন্তু র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা পরবর্তীতে যখন বেগ (Bagge) সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সীমানা নির্ধারনে এলেন তখন তিনিও সমস্যার সম্মুখীন হলেন। যার সমাধান বেগও করতে অসমর্থ হন।[৮] পরবর্তীতে ১৯৭৪, ১৯৮২-র চুক্তির মূলসুর ছিট্‌মহল বিনিময়, তা কার্যকর হয়নি। পরে নরসীমা রাও এবং খালেদা জিয়ার 'আলাপ আলোচনা ১৯৯১' বাংলাদেশের ভারতীয় ছিট্‌মহল গুলির দরিদ্র মানুষ-গুলোর কষ্টমোচন করতে সক্ষম হয়নি।

১৯৯২-এর তিনবিঘা করিডর চুক্তির ফলে স্থির হয়, কুচলিবাড়ীর মানুষ 'তিন বিঘা'র উপর দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে।[৯] চুক্তিতে একথাও বলা হয় যে, The corridor is presently open from sunrise to sunset every alternate hour.[১০] অর্থাৎ সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি একঘন্টা অন্তর অন্তর ভারতের কুচলিবাড়ীর মানুষেরা এবং বাংলাদেশের দহগ্রামে ও আঙ্গারপোতা ছিট্‌মহল গুলির মানুষ তাদের মূলভূখন্ডে যাতায়াত করতে পারবেন। রাত্রের ১২ ঘন্টা করিডর খোলা থাকবে। তবে এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই।[১১]

পরবর্তীতে সর্ব সময়ের জন্য করিডরের গেট খোলা রাখার দাবিতে সরব হয় বাংলাদেশ। তাই এখন দিনের বেলা অর্থাৎ সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত করিডরের গেট টানা খোলা থাকে। এখনও এই ব্যবস্থা চালু থাকায় রাতের বেলা বাদে সারাদিনই বাংলাদেশিরা এই করিডর দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ পান। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরেই ২৪ ঘন্টা করিডর খোলা রাখার দাবিতে বাংলাদেশিরা আন্দোলনে নেমেছে। তিনবিঘা, কুচলিবাড়ী এলাকায় তাই এ নিয়ে ব্যাপক প্রচারেও নেমেছে বাংলাদেশিরা। ওই করিডর দিয়ে ভারতীয়দের যাতায়াতেও তারা আপত্তি তুলেছে। করিডরের সড়কের বদলে ফ্লাইওভার করে তিনবিঘার যাতায়াতের দাবি তুলেছে বাংলাদেশিরা।[১২]

অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত 'ইন্দিরী-মুজিব চুক্তি'র দ্বারা বাংলাদেশ ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার অর্থাৎ "তিন বিঘা" (প্রায় দশ বিঘা) ৯৯৯ বছরের জন্য 'লিজ' পায় দহগ্রামের সাথে পানবাড়ী মৌজার (p.s. Patgram) যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।[১৩] কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মত বিষয় যে ভারতের তরফ থেকে তার ছিট্‌মহল গুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কোন রূপ চেষ্টা হল না। এমন কি কোন জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এ নিয়ে কোন প্রকার গণআন্দোলন করেনি বা করছে না; যা বাংলাদেশিরা করে চলেছে।

অপর দিকে তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘন্টা খোলা থাকলে তিনবিঘা দিয়ে অনুপ্রবেশ বেড়ে যাবে বলে স্থানীয় ভারতীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা। তবে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়, কারণ Intelligence reports অনুযায়ী "There are some 130 such chitmahals where militants are running their training camps. Indian police hardly have access to these enclaves, which are some what detached from the mainland,while Bangladeshi troops stay away from the chitmahals as they legally come under the Indian territory."[১৪]

"A BSF Intelligence report says most of these chitmahals have become hide outs of KLO militants. Bangladeshi terrorist groups like Awal, Sanwara, rotaleb have been operating their training camps in association with the KLO inside some Indian enclaves like Dahala khagrabari and Basuniapara under Devigunj district in Bangladesh"[১৫]

ছিট্‌মহলকে কেন্দ্র করে সমস্যা আরো গভীরে প্রবেশ করছে সমস্যা সমাধানের পথ বা সূত্র নিরূপনে। কারণ সীমান্ত চিহ্নিতকরণ নিয়ে জটিল সমস্যা রয়েছে। দক্ষিণ বেরুবাড়ীর উত্তর সীমানা বরাবর সীমান্ত চিহ্নিতকরণ শেষে ৭৬৯ নং মেইন পিলার করার পর সমস্যার উদ্ভব হয়। এখানে দেখা যায় ৭৬৯ নং পিলারের পর এক বিশাল

এলাকা যেটি ভারতীয় দখলীয়, সেই এলাকাটি বাদ দিয়ে জমি জরিপের কাজ চলেছে।[১৬] অর্থাৎ ৭৭০ নং এবং ৭৭১ নং পিলার দুটির মধ্যবর্তী নাউতরী দেবোত্তর, নবাবগঞ্জ, কাজলদিঘী পরানী গ্রাম এবং বড়শশী গ্রাম বাংলাদেশ তাদের বলে দাবি করলে, ভারতে মানচিত্রভুক্ত উক্ত চারটি বেরুবাড়ী সন্নিহিত গ্রামকে কেন্দ্র করে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।[১৭]

বর্তমানে ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানাকে কেন্দ্র করে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কচ্ছ কিংবা শিলং অঞ্চলে অথবা ত্রিপুরায় সীমান্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতের সীমান্ত সমস্যার শিকড় হল র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা। অধুনা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে জটিলতা ক্রমশই বাড়ছে। বেড়া দেওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে অনেক জায়গায় ১৫০ গজের নিয়ম মানার জন্য ভারতীয়দের প্রচুর চাষ-জমি বেড়ার বাইরে পড়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আপাতত কোনও দরজার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। কিন্তু বি.ডি.আর কোনও কথা শুনতে রাজি না। তারা যে এলাকা নির্দিষ্ট করে দেবে, তাই ভারতীয় সংস্থাকে মানতে হবে বলে গোঁ ধরে রয়েছে। এছাড়া সীমান্তে যেখানে নদী বা খাল রয়েছে সেখানে নদী বা খালের পাশে ভারতীয় জমি শুরু হওয়ার জায়গার থেকে ১৫০ গজ ছেড়ে বেড়া দিতে হবে বলে বাংলাদেশ দাবী করছে।[১৮]

অধুনা নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চয়েতের অধীন সাকাতি গ্রামের ঝাকুয়াপাড়ার একটি জায়গায় আকারগত সমস্যার কারণেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে কাঁটাতারের বেড়া দেওযার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর(সি.পি.ডব্লিউ.ডি) সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের প্রস্তাবিত পথে বেড়া দেওয়া হলে ১৪টি পরিবারের ৮৫ জন বেড়ার ওপারে পড়ে যাচ্ছেন, ফলে তারা গৃহহীন-ভূমিহীন হয়ে পড়বেন। নিজ ভিটে মাটিতেই তারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন।[১৯]

তাছাড়া, তথ্যভিজ্ঞ মহল সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তানের গোয়েন্দা দফতর আই.এস.আই (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) নেপাল এবং বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, এই দুই দেশকে করিডর করে তারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং অনুপ্রবেশ এভাবে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রোধ করা সম্ভব নয়। যেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ অনুপ্রবেশের শতকরা

হারকে উর্দ্ধমুখী করে তুলেছে সেক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব কিনা-তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আবার দুই দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, শারীরিক গঠন যেখানে একই তখন কাঁটাতারের বেড়া সীমান্ত সমস্যা কতটা নিরূপন করতে পারবে? অপর দিকে, ভারত কাঁটাতার দেওয়ায় ভারতের বহু জমি নষ্ট হচ্ছে। ভারত সরকার কেন বাংলাদেশকেও ঐ ভাবে সীমান্ত সংরক্ষণের কথা জানাচ্ছে না তাও পরিষ্কার নয়। কোন আন্তর্জাতিক আইন কি সীমান্ত সমস্যার সমাধানের সূত্র দিতে পারে না? যদিও পৃথিবীর কোন দেশেই বেড়া দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে কিনা বা করা যায় কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

শুধু তাই নয়, সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছিট্‌মহলবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। ভারতীয় ছিট্‌মহলের অধিবাসীদের নেই রেশন কার্ড। ১৯৫১-র থেকে কোন আদম শুমারীর অন্তর্ভুক্ত তাঁরা হননি। বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ-ছিট্‌মহলবাসী লোকসভা, বিধানসভা এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ নাগরিকত্ব নিয়ে ছিট্‌মহলবাসীর রয়েছে সমস্যা। পঠন-পাঠন ব্যবস্থা, সুচিকিৎসা সব কিছু থেকেই তাঁরা বঞ্চিত।[২০] ছিট্‌মহলবাসীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ছিট্‌মহলগুলির অভ্যন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করছে। ছিটমহল গুলি পরিণত হয়েছে অমানবিকতার কেন্দ্রস্থলে।

অথচ সম্প্রতি ভূটান থেকে যখন ভূটানের রাজা নেপালীদের উৎখাত করলেন, তখন বহু স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তা নিয়ে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু ১৯৫১ সাল থেকে যারা আদম শুমারীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যাদের রেশনকার্ড নেই, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত, নুন্যতম আর্থ-সামাজিক সুযোগ যাদের ভাগ্যে জোটেনি তাদের নিয়ে কোন মানবিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল কোন প্রকার গণ আন্দোলন করছে না।

র‍্যাডক্লিফকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেশ বিভাজন করতে হওয়ায়, বিজ্ঞানভিত্তিক দেশবিভাজন তিনি করতে পারেননি। ফলে সীমান্ত সমস্যার উৎপত্তির জন্য র‍্যাডক্লিফকে কতটা দায়ী করা যায় তা ইতিহাসগতভাবে চিন্তার বিষয়। তবে সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে বলা যায় যে, র‍্যাডক্লিফের কলমের আঁচড়ে মানুষের হৃদয় শুধুমাত্র দ্বিখন্ডিত হয়নি, কেবল দেশ দ্বিখন্ডিত হয় নি, তারও সাথে অতিরিক্ত পাওনা সীমান্ত ও ছিট্‌মহল সমস্যা। যা ভারতের স্বাধীনতার ৫৭ বছরের অধিকাংশ সময় ধরেই ছিট্‌মহলবাসীদের ভিটে-মাটির প্রশ্নে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে রেয়েছে। সুতরাং দক্ষিণ বেরুবাড়ী বা তৎসংলগ্ন ভারতীয় ছিট্‌মহলকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার দৃষ্টি তা কেবলমাত্র আঞ্চলিক সমস্যা নয়, তা আজ অত্যন্ত জটিল ও সুদূর প্রসারী জাতীয় সমম্যার রূপ গ্রহণ করেছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। দক্ষিণ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির পুস্তিকা, জলপাইগুড়ি (পৃ : ২)।

২। মধুপর্ণী ঃ বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬ তে পবিত্র কুমার গুপ্তের লেখা প্রবন্ধ "কোচবিহারের ছিট্‌মহল", সম্পাদক-অজিতেশ ভট্টাচার্য, (পৃ : ৪২৪ থেকে ৪২৫)।

৩। সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

৪। তদেব।

৫। আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক নির্মল বসুর লেখা—"বেরুবাড়ী মামলার ইতিবৃত্ত", কলিকাতা, (১৫.০৩.৬০)।

৬। মধুপর্নী ঃ পূর্বোক্ত (পৃ : ৪২৮)

৭। Dissertation Paper–Tittle of the Paper : Sir Cyril Radclife and the Partition of India : with Special reference to Bengal, writter by srabani Ghosh.

৮। সাক্ষাৎকার ঃ অমর রায় প্রধান (৩১.১২.২০০০)।

৯। তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটির পুস্তিকা, দিনহাটা, কোচবিহার।

১০। দি স্টেটস্‌ম্যান—১৯.৬.৯৯, শিলিগুড়ি সংস্করণ।

১১। তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটির পুস্তিকা—পূর্বোক্ত।

১২। বর্তমান ঃ ১৪.০১.২০০৪, শিলিগুড়ি সংস্করণ।

১৩। রুল অব্ জঙ্গল ঃ অমর রায় প্রধান (পৃ : ১২)

১৪। দি স্টেটস্‌ম্যান ঃ ০১.১০.২০০৩, শিলিগুড়ি সংস্করণ।

১৫। দিস্টেটস্‌ম্যান ঃ তদৈব।

১৬। দক্ষিণ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির পুস্তিকা (পৃ : ৫-৬)।

১৭। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ঃ ০২.১১.২০০১, শিলিগুড়ি সংস্করণ।

১৮। আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৯.০১.২০০৫, শিলিগুড়ি সংস্করণ।

১৯। আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ০২.০৪.২০০৪, শিলিগুরি সংস্করণ।

২০। দি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় শিব শঙ্কর চ্যাটার্জীর লেখা—"ট্রাজেডি অব্ দা ছিট্‌মহলস", শিলিগুড়ি সংস্করণ, ২০.৯.২০০৩।

❑ অন্যান্য সহায়ক তথ্য সূত্র —

১। বাহাদুর চক্রবর্ত্তী, রাই মনেমোহন ঃ "ত্র সামরী অব্ দা চেঞ্জেস ইন দা জুরিসডিকসন অব্ ডিষ্ট্রিক্টস্ ইন বেঙ্গল ১৭৫৭-১৯১৬", ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, ক্যালকাটা, ১৯৯৯।

২। জনমত ঃ আবার বেরুবাড়ী, সম্পাদক—ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, জলপাইগুড়ি, ৬ই জুন ১৯৬৬।

৩। ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিরাত ভূমির জলপাইগুড়ি জেলা সংকলনে মনোমোহন রায়ের লেখা "জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত সমস্যা ও কিছু কথা", সম্পাদক ঃ অরবিন্দ কর। (পৃ : ৪২০-৪২২)।

৪। দি অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার, ১৯৬০, (৪৭ খন্ড) সুপ্রিম কোর্ট।

৫। ত্রিস্রোতা ঃ সম্পাদক ঃ সুরেশ চন্দ্র পাল, জলপাইগুড়ি।

৬। দি স্টেটস্‌ম্যান ঃ ১৭.০৬.২০০৩, শিলিগুড়ি সংস্করণ।

৭। সাক্ষাৎকার ঃ সুধাংশু মজুমদার (৩০.১২.২০০০)

এই প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণ, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ। তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন আমার পিতৃদেব শ্রী অনিল কুমার পাল।

❑ সাক্ষাৎকার প্রদাতা ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় ঃ

১। শ্রী সুধাংশু মজুমদার, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা, এখন বয়স-৮৭।

২। শ্রী অমর রায় প্রধান, এক সময়কার ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষস্থানীয় জননেতা এবং লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ।

বিবর্তন ধারায় ডুয়ার্সের অভিবাসী সমাজ (১৮৬৪-১৯৭৯)

বিষ্ণুদয়াল রায়

নিম্ন হিমালয়ের পাদদেশে ভারত ভূটান সীমান্তে পশ্চিমে তিস্তা নদী থেকে পূর্বে ধানসিরি নদী পর্যন্ত গভীর অরণ্যময় ভূ-ভাগ ভুটানে প্রবেশ ও নির্গমনের পথের জন্য দুয়ার নামে পরিচিত। তিস্তা নদীর পূর্ব তীর থেকে সঙ্কোশ নদী পর্যন্ত তিস্তৃত ভূ-খন্ড 'পশ্চিম ডুয়ার্স' বা 'Western Dooars' নামে পরিচিত কোম্পানী আমল থেকেই। 'আসাম ডুয়ার্স' বা 'Eastern Dooars' এর সীমা ছিল সঙ্কোশ থেকে ধানসিরি পযন্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমগ্র ডুয়ার্স ভূটানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ভূটানী সেনাদের ক্রমাগত হানাদারি ও সীমান্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৩ সালে স্যার অ্যাসলে ইডেন কে ভূটানে পাঠায়। কিন্তু ইডেনের ভূটান দৌত চুড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয় বেং ইডেন ভূটানে লাঞ্ছিত হন। ক্ষুব্ধ ইংরেজ সরকার ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে এক ঘোষণার দ্বারা সমগ্র ডুয়ার্স অধিগ্রহণ করলে দ্বিতীয় ভূটান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৬৫ সালে সিঞ্চুলা চুক্তি স্বাক্ষরের মদ্য দিয়ে শেষ হয় রক্তাক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী দ্বিতীয় ভূটান যুদ্ধ।

এই ডুয়ার্স ভূ-খন্ডে বহিরাগতদের যে ভাবে আগমন হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যকোন অঞ্চলে এই ভাবে আগমন তেমন লক্ষ্য করা যায় না/বহিরাগতরা এখানে এসেছেন এবং শেষে স্থানীয় অধিবাসী হয়েছেন। এটাই হল ডুয়ার্স অঞ্চলের জনবসতির মূল চরিত্র এবং এই ধারাটি আবহমান কাল থেকেই এই এলাকায় প্রবহমান। এই অভিবাসী সমাজ কি ভাবে ডুয়ার্স নামক ভূ-খন্ডটির চিত্র বদলে দিয়েছে স্বল্প পরিসরে তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পশ্চিম ডুয়ার্স ভূ-খন্ডটি ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং জনবিরল (Thinly Populated Area) অঞ্চল হিসাবে পরিচিত/১৮৭২ সনের আদম সুমারীতে বেভারলি লেখেন—"In the recently acquird Dooars the population is 67 to the squire mile." ১৮৯১ সালের জনগণনায় ওডোনেল উল্লেখ করেন, ১৮৮১ সালে আলিপুর দুয়ার মহকুমায় প্রতি বর্গ মাইলে লোক ছিল ৫৭ জন এবং ১৮৯১ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৯ জন।

১৮৬৪-৬৫ সালে ১৯৬৯ বর্গমাইল ডুয়ার্স এলাকা ইংরেজদের দখলে আসলে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৯,৬২০ জন। এই তথ্য তুলে ধরেন W.W.Hunter সাহেব তাঁর " A statistical Account of Bengal" গ্রন্থে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এরা কারা? পরিষ্কার ভাবে জানা না হলেও Hunter সাহেব এদের রাজবংশী, ভূটিয়া, মেচ প্রভৃতি সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেন। তবে পরবর্তী সেনস্যাস রিপোর্টে লক্ষ্য করা যায় যে , ডুয়ার্সে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় খুব দ্রুত হারে।

সারণী সহযোগে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল ঃ—

বছর	জল সংখ্যা
১৮৬৪-৬৫	৪৯,৬২০
১৮৭২	১,০০,১১১
১৮৯১	২,৯৬,৯৬৪

সান্ডার্স সাহেব তাঁর "Survey and settlement of western Dooars" প্রতিবেদনে জনবিন্যাসের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে কিন্তু নেপালীদের নাম পাওয়া যায়নি। তিনি উল্লেখ করেন ভূটিয়া ও লিম্বুদের কথা/জানা যায়, ১৮৯১ সনে ডুয়ার্সে ভূটিয়া ছিল ৩৪,১০৬ জন।

ডুয়ার্সে ভূটিয়া থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দীর্ঘদিন এই ভু-খন্ডটি ছিল ভূটিয়াদের দখলে। পূর্বের পরিসংখ্যান থেকে দুটো বিষয় খুব পরিষ্কার-প্রথমত ডুয়ার্সে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় খুব দ্রুত হারে। দ্বিতীয়ত ১৮৯১ সাল পর্যন্ত ডুয়ার্সে কোন নেপালী গোষ্ঠী ছিল না। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, ডুয়ার্সের এই বাড়তি লোক এসেছিল কোথা থেকে? এই ভু-খন্ডে বাড়তি লোক এসেছিল পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্য থেকে।

নীচে সারণী দিয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করা যাক।

জেলা/রাজ্য	জনংসখ্যা
দিনাজপুর	৫০৫
দার্জিলিং	১,৫৮৮
রংপুর	১০,১০১
কুচবিহার	৩২,২২৪
অন্য জেলা ও প্রদেশ	১,১৪,২২৭

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাশ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে লোক এসেছে মাত্র ৪৪, ৪১৮ জন। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্য থেকে এসেছিল ১,১৪,২৭৭ জন। অর্থাৎ প্রায় তিনগুন বেশী। অন্য প্রদেশ মানে বিহার ও মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছিল চা-বাগানের সূত্র ধরে। কিন্তু তারাই বর্তমানে স্থানীয়-অধিবাসী হয়ে বসবাস করছেন এবং রাজবংশী ও অন্য স্থানীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন।

আবার প্রতিবেশী জেলাগুলোর মধ্যে বেশী লোক এসেছে রংপুর ও কোচবিহার থেকে যাঁরা অধিকাংশই ছিল রাজবংশী কৃষক। ১৮৭০ সালে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার এদের আসার কারণ সম্পর্কে বলেন, "In the western Dooars portion of district ......the area Under rich cultivation was very Considerably extended, owing to the influx of new sellters from Cochbehar state and Rangpur District".

আবার, সান্ডার্স সাহেব লিখেছিলেন, "I have Questioned many of these immigrants who came here .... told that rent for land is too high there, that the gotedars are oppressive and sometimes that the productive power of the soil have decreased."

কিন্তু ভিন্ রাজ্য থেকে যে, ১,১৪,২৭৭ জন লোক এসেছিল তাঁরা সবাই চা-বাগানের সূত্র ধরে এখানে আসেনি। চাষাবাদের সূত্র ধরেও বহু লোক এসেছিল ডুয়ার্স ভূ-খন্ডে। তবে এরা ছিল অধিকাংশই সাঁওতাল। ব্রিটিশ সরকার তাদের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ডুয়ার্সের জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যবস্থা করেন। চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ছোটনাগপুর থেকে সাঁওতালদের আনার জন্য ইংরেজ সরকার ভরতুকিও দিয়েছিল। কারণ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ।

এই ভাবেই ঔপনিবেশিক সরকার জনবিরল ও বনজঙ্গল অধ্যুষিত ডুয়ার্সকে আজকের ডুয়ার্সে পরিণত করেছে। তবে সান্ডার্স সাহেব বলেছেন। শুধু সাওতাল নয় এসেছে ওঁরাও সম্প্রদায়। তাই তিনি উল্লেখ করেন, "Many Orions of Rachi district way be found in Maynaguri, Falakata and Alipur Tewsil, where they settled permanently as gotedars.

আবার গারোরাও কিন্তু এখানকার আদি অধিবাসী নয়। তাঁরা এসেছিল ময়মনসিং থেকে। আমাদের প্রচলিত ধারণা যে, চা-বাগানের সূত্রধরেই জলপাইগুড়িতে এসেছিল পূর্ববঙ্গের লোকেরা। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। চা-বাগান স্থাপনের বহু আগেই বাঙালী কাঠ ব্যবসায়ীরা ব্যবসার খাতিরে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের সুখানী গ্রামে আসেন। এছাড়া চাকরির সূত্র ধরেও বহুলোক এসেছিল পূর্বঙ্গ থেকে। ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবির পাশাপাশি বহু উকিল, মোক্তার, মুহুরী বাবুরা আসেন পাবনা, রংপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে। নোয়াখালির রহিম বক্স এলেন সুখানী থেকে পেস্কার হয়ে। উকিল হয়ে পাবনার জয়চন্দ্র সান্যাল। নাজীর হযে এলেন ঢাকার শ্রীনাথ রায়। উকিল হয়ে আসেন ঢাকার গোপাল চন্দ্র ঘোষ, পাবনার কেশব চন্দ্র ঘটক ও যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। এদের মধ্যে দেখা যায় অনেকেই আবার নিজস্ব বৃত্তি বা পেশা ছেড়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় জমি কেনার বন্দোবস্ত করেন। ফলে জমি

হস্তান্তরিত হয় অ-কৃষিজীবি লোকের হাতে। এদিকে বিহারের দানাপুরের অধিবাসী হেদায়েৎ আলি খাঁন, যিনি ছিলেন দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভূটান যুদ্ধে ইংরেজদের কর্নেল/তিনি ইংরেজ সরকারের একজন বিশেষ আস্থাভাজন রাজকর্মচারীও বটে। এই যুদ্ধের সময়ই যুদ্ধে সরবরাহকারী হিসাবে ডুয়ার্সে আসেন পাবনার পার্বতী চরন নিয়োগীর সঙ্গে আরো অনেকে। এই ভাবে দেখা যায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করা পর্যন্ত ডুয়ার্সে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে অভিবাসী সমাজ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন, যা ডুয়ার্সের আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারমাতা দ্বি-খন্ডিত হল-জন্মাল হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৈতৃক ভিটেবাড়ী, জমি জায়গা স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি প্রভৃতির মায়ামমতা ত্যাগ করে অপর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় ধাবিত হল। এর ফলে দেখা গেল একটা বিরাট জন সংখ্যার চাপ এসে পড়ল ডুয়ার্স ভূ-খন্ডে। যদিও দেখা যায় মানুষ সেই উদ্বাস্তুদের প্রতি তাদের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছিল। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের সাহায্যের হাত।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেল ডুয়ার্সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাড়তি চাপ এল জমির উপর। এদিকে ১৯৫৩ সালে জোতদারী ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ল ভূমি নির্ভর সমাজ। তাদের উদ্বৃত্ত জমি হাত ছাড়া হয় এবং মুখ থুবরে পড়েন জোতদারগণ/এদের মধ্যে অনেকেই আবার নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই সব জোতদারগণ জমি ছাড়া অন্যকোন ক্ষেত্র বা ব্যবসা বাণিজ্যে কোন বিনিয়োগ করেননি। সুতরাং জোতদারী ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পর শুরু হয় একধরনের সামাজিক অস্থিরতা। যদিও এই অস্থিরতা কিন্তু কোন অভিবাসী সমাজের সঙ্গে নয়। সমীক্ষা করে জানা যায় যে, জমি হারানোর ফলে জোতদারদের মধ্যে শুরু হয়েছে একধরনের মনোবেদনা।

এছাড়া, ডুয়ার্সে তিব্বতীদের আগমন বিশেষ ভাবে ঘটেছিল চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর। ১৯৬০ সালে তিব্বত থেকে যে লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল তাঁর একটা অংশ আশ্রয় নেয় এই ডুয়ার্স ভূ-খন্ডে। এর পাশাপাশি দেখা যায়, ১৯৬০-৬১ সালে আসমের "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের ফলে একটা বড় অংশের মানুষ আসাম থেকে এসেছিল ডুয়ার্সে। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালীরা ঘরবাড়ী ছেড়ে ডুয়ার্সে বিস্তীর্ন এলাকায় আস্থানা গেরেছিল। সপ্তাহ ব্যাপী 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে ভস্মীভূত হয়েছিল বহু ঘরবাড়ী। এছাড়া, মেঘালয় থেকে বিতাড়িত নেপালী, কিংবা ভূটান থেকে বহিস্কৃত নেপালীরাও বুকে আশা বেঁধেছিল ডুয়ার্সের মাটিতে পদার্পন করে।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কালও একটা বাড়তি জনসংখ্যার চাপ আসে- এই অঞ্চলে/দার্জিলিং থেকেও নেপালীরা চা-বাগানের সূত্রে ধরে এগিয়ে আসে ডুয়ার্সে/জনসংখ্যার চাপ-ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এই অঞ্চলে শুরু হয় ব্যাপক ভূমি সংকট। তাই ডুয়ার্সের হারিয়ে যাওয়া জমির সন্ধানে সংগঠিত হতে থাকে জোতদার শ্রেণীর কিছু মানুষ। ফলে ১৯৬৯ সালে ডুয়ার্সে প্রথম নৃ-গোষ্ঠী ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে যা "উত্তর খন্ড দল" (uttar khanda Dal) নামে পরিচিতি লাভ করে। যদিও অনেকেই এই দলকে জোতদারদের দল বলে মনে করেন/এই দল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন পঞ্চনন মল্লিক, কলীন্দ্রনাথ বর্মন, রবি সরকার, সম্পদ রায়, রুক্মিনী রঞ্জন রায়, সুমা ওরাও, ওয়াজ উদ্দীন আহম্মেদ প্রমুখ। তাঁরা চাইছে তাদের ইতিহাসকে ধূসর অতীত থেকে আলোর বৃত্তে তুলে আনতে।

১৯৭১ সালে বাংলা দেশ থেকে বহু মানুষ পাড়িদিল ডুয়ার্সে। অনুসন্ধানে দেখা গেল জমির তুলনায় লোকের সংখ্যা বেশী। কিন্তু দেশ বিভাগের প্রায় ত্রিশ বছর পর এই চিত্রটা একটু ভিন্ন রকমের। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় উদ্বাস্তুদের প্রতি যে আন্তরিক সহযোগীতা ছিল সত্তরের দশকে তা ভাটা পড়েছিল। তাই নতুন করে লক্ষ্য করা গেল আন্তরিকতার সংকট। বাংলা দেশ থেকে লোক এসে ভারতের উদার গণতন্ত্রের (Liberal Democracy) সুযোগ নিয়ে রেশন কার্ড পাওয়া, বিভিন্ন চাকুরিতে অংশ গ্রহণ করা, নাগরিকত্বের সুযোগ সুবিধা আদায় করা প্রভৃতি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন সরকারী প্রকল্প বা সরকারী অনুদানের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। স্বভাবতই পুরনো অভিবাসী সমাজের মধ্যে একটা মনঃস্তাত্ত্বিক সংকট নতুনভাবে দেখা দেয়। আর এই সংকট ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপর। জনসংখ্যা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধির ফলে কৃষি অর্থনীতির ভারসাম্য বিনষ্ট হতে থাকে। টান পড়তে থাকে ভূমিতে, অর্থনীতিতে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায়, ডুয়ার্সের প্রায় কুড়ি হাজার আমজনতা বিগত পাঁচ বছরে পাড়ি দিয়েছে পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা প্রভৃতি ভিন্ রাজ্যগুলিতে। মনঃস্তাত্ত্বিক বিরোধের চোরা স্রোতের মধ্য দিয়ে ডুয়ার্সের পরিস্থিতি ঘনীভূত হয়ে তৈরী হচ্ছে সংকট ও অস্থিরতা। ১৯৭৯ সালে ডুয়ার্সের আরো একটি নৃগোষ্ঠীগত সংগঠন হল উত্তরবঙ্গ তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সংগঠন (উতজাআস) যা আসামের আসুআন্দোলনের ধাচেই তাদের কাজকর্ম শুরু করেছিল এবং ডুয়ার্সে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোড় সাওয়াল করেছিল।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। D.H.E. Sumders–survey and settlement of the western Dooars. 1889–95.

২। সম্পাদক-অরবিন্দ কর-কিরাত ভূমি-জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ বর্ষ জেলা সংকলন-১৮৬৯-১৯৯৪।

৩। Ranjit Das Gupta–Economy, Society and politics of Bengal-jalpaiguri-1869-1947.

৪। পশ্চিম বঙ্গ-জলপাইগুড়ি সংখ্যা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ—১৪০৮ পঃ বঃ সরকার।

৫। ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ—'ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ'-সীমান্ত সাহিত্য-৪৭ তম বর্ষ-ফেব্রুয়রী-২০০১।

৬। বিমল দাশগুপ্ত-আমার কথা ও ডুয়ার্সের কথা-প্রথম সংস্করন ১-লা বৈশাখ-১৪০১।

৭। উপেন্দ্রনাথ বর্মন-উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি-১৩৯২ সন

৮। J.F.Gruning-Eastern Bengal and Assam District Gazzetteers-Jalpaiguri-1911.

৯। সাক্ষাৎকার ঃ—

(ক) গুনধর বর্মনঃ-ডাউকিমারী-বয়স-৭০

(খ) সুরেন্দ্রনাথ রায়-কালীর হাট বয়স-৬০

(গ) মন্মথ রায় বসুনীয়া-জল্পেশ বয়স-৬৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—এই প্রবন্ধের তথ্য বিশ্লেষনে ও কাঠামো নির্মাণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ, অধ্যাপক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ঃ সমসাময়িক বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান

মোঃশেরেজ্জ মান

১। ভূমিকা

পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানদের অগ্রযাত্রার পেছনে যে সকল মনীষীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ঢাকার খাজা পরিবারের নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। মাত্র ৪৪ বছরের (১৮৭১ খ্রিঃ-১৯১৫ খ্রিঃ) কর্মজীবনের তিনি বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। বাংলার সমাজ এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রের তিনি অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। নওয়াবা আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের মত তিনিও বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরণের পথিকৃত ছিলেন।

২। জন্ম ও বংশ পরিচয়

নওয়াব সলিমুল্লাহ ৭ জুন, ১৮৭১ সালে ঢাকার বিখ্যাত খাজা পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পূর্ব পুরুষ খাজা আব্দুল হাকিম ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। ১৭৫৬ খ্রি. তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার সিলেট শহরে আগমন করেন।[২] খাজা আব্দুল ওহাব ও খাজা আবদুল্লাহ্ নামক তাঁর দুভাইও তাঁর সঙ্গে সিলেটে এসেছিলেন। সে সময় পূর্ব বাংলা ব্যতীত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি বিরাজ করায় এবং মধ্য ও উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ[৩] হয়ে পড়ায় অপেক্ষাকৃত শান্ত ও অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ পূর্ব বাংলায় খাজা আব্দুল হাকিম আগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। সেখানে নীলের ব্যবসা করে তাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। খাজা আব্দুল হাকিম ও খাজা আব্দুল ওহাবের ইন্তেকালের পর খাজা আবদুল্লাহ ঢাকার বেগম বাজার এলাকায় চলে আসেন এবং সেখানে জমি-জমা ক্রয় করে স্থানীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪] নওয়াব সলিমুল্লাহর পিতা এবং পিতামহের নাম যথাক্রমে খাজা আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১) ও খাজা আব্দুল গণী (১৮১৩-১৮৯৬ খ্রিঃ)। খাজা আব্দুল গণী ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নওয়াব' খেতাব লাভ করেন। এই খেতাব ১ জানুয়ারী ১৮৭৭ সালে দিল্লীর দরবারে খাজা পরিবারস্থ নওয়াবদের জ্যেষ্ঠ পুত্রদের ওয়ারিসী অধিকার বলে ঘোষিত হয়। এই সূত্রে খাজা সলিমুল্লাহর পিতা খান বাহাদুর খাজা আহসানুল্লাহও নওয়াব উপাধিতে ভূষিত হন (১৯৭৭)।

৩। শিক্ষা ও কর্মজীবন

ছোট বেলায় পারিবারিক প্রথানুযায়ী নওয়াব সলিমুল্লাহ গৃহ শিক্ষকের নিকট উর্দু, আরবী, ফারসী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।[৫] তিনি জার্মান ভাষাও শিখেছিলেন বলে জানা যায়।[৬] সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর পারিবারিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তৎকালীন সরকার ১৮৯৩ সালে তাঁকে ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেন।[৭] কিন্তু তাঁর পক্ষে বেশি দিন চাকরি করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯৫ সালে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।[৮] চাকরী জীবনে তিনি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যাদি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[৯] সম্ভবত জনহিতকর কাজ করার প্রবল বাসনা তাঁকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ১৯০১ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করলে পারিবারিক দায় দায়িত্ব তাঁর উপর এসে বর্তায়। সেই সময় থেকে নওয়াব পরিবার তথা ঢাকা নগরীর প্রধান হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ঢাকার নাগরিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদিত হন। খাজা আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম পুত্র জীবিত না থাকায় দ্বিতীয় পুত্র খাজা সহিমুল্লাহ 'নওয়াব' খেতাব লাভ করেন (১৯০১ খ্রিঃ)[১০] নওয়াব সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০২ সালে সি.এস .আই এবং ১৯০৩ সালে 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।[১১]

৪। শিক্ষা ক্ষেত্রে নওয়াব সলিমুল্লাহ্র অবদান

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করে নওয়াব সলিমুল্লাহ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি শিক্ষা আন্দোলনকে অনেকটা রাজনীতি বলে মনে করতেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ন্যায় নওয়াব সলিমুল্লাহ রাজনীতির চেয়ে শিক্ষার উপর অধিক গরুত্ব আরোপ করেন।[১২] তাঁর মতে, সফল রাজনীতির জন্য চাই শিক্ষা, শিক্ষিত লোক ব্যতিরেকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। বাংলার মুসলমানরা যতদিন শিক্ষা-দীক্ষায় দুর্বল থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা উন্নত জাতি সমূহের দ্বারা শোষিত হবে।[১৩] বলা বাহুল্য যে, তখন পর্যন্ত মুসলিম সমাজে হিন্দুদের ন্যায় রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেনি; কেবল মাত্র উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানরাই ব্রিটিশ সরকারের নিকট আনুগত্য বজায় রেখে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বাংলার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চেতনা সৃষ্টি ও শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠার উদোগ নেন। তারই ফলস্বরূপ ১৯০৬ সালে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ঢাকার শাহবাগে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম

প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ উক্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[১৪] বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়া পর্যন্ত (১৯১১) এই সমিতির চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর যুক্ত বাংলায় নওয়াব সলিমুল্লাহর জীবদ্দশায় এই সমিতির মাত্র একটি অধিবেশন আহুত হয়। ১৯১৪ সালের ১১ ও ১২ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি ও দর্শন সমবেত হন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন নওয়াব আলী চৌধুরী।[১৫]

শিক্ষা ক্ষেত্রে নওয়াব সলিমুল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল বাংলায় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্বলিত পরিকল্পিত মাদ্রাসা শিক্ষা ('রিফরমড নিউ স্কীম') প্রবর্তন করা। তৎকালীন ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা লক্ষ্য করে নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনেই ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। এই নিরিখেই, বাংলায় মিড্‌ল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৬] মিড্‌ল মাদ্রাসায় উর্দু ও ফার্সী তথা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাও চালু করা হয়। জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে প্রবর্তিত এসব মিড্‌ল মাদ্রাসার প্রতি ধর্মভীরু মুসলিমদের কোন অনীহা ছিলনা বলে তারাও আধুনিক শিক্ষার প্রতি ধাবিত হয়।[১৭]

১৯০৬ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির নওয়াব সলিমুল্লাহ সদস্য ছিলেন। ঐ কমিটির সুপারিশ এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেস্টায় ১৯১৫ সালে সরকার আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্বলিত পরিকল্পিত মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করে।[১৮] নওয়াব সলিমুল্লাহ নারী শিক্ষারও প্রবক্তা ছিলেন।[১৯] সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তাঁর অবদান রয়েছে।[২০] তিনি ১৯০৫ সালে ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য ডাফরিন বোডিং নির্মাণ বাবাদ ১০ হাজার টাকা দান করেন।[২১] তিনি ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দান কালে আলীগড় কলেজ হোস্টেলের ন্যায় ঢাকায় একটি মোহামেডান হল নির্মাণের জন্য ১,৮৬,৯০০/-টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।[২২]

নওয়াব সলিমুল্লাহ বাস্তবমুখী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জাতির আশু প্রযোজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চ শিক্ষার চেয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার উপর জোর দেন।[২৩] তিনি দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য প্রাথমিক অথবা মধ্যবাংলা পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে উন্নত ধরনের কৃষি কাজ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দেন।[২৪] প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করলেও তিনি উচ্চ শিক্ষার বিরোধিতা করেননি। যাদের অর্থ-সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন।[২৫] তিনি ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২৬] নওয়াব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই নওয়াব সলিমুল্লাহ মরহুম পিতা আহসানুল্লাহর প্রতিশ্রুত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা প্রদান

করেন। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন যে, যারা আব্দুল গনি ফ্রী-স্কুলে ভর্তি হতে পারবে তাদের অন্তত ৪ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।[২৭] ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানার ছেলে মেয়েদের জন্য তিনি লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর অবদানের কথা কারও অজানা নয়।[২৮] ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ কার্যকর হলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনগণের মনে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তারা মনে করে বঙ্গ বিভাগ তাদের অগ্রযাত্রার পথে সহায়ক হবে; কিন্তু মাত্র ছয় বছর পরে ১৯১১ খ্রি. হিন্দু সম্প্রদায়ের অত্যাধিক বিরোধিতার মুখে এ বঙ্গ বিভাগ রদ করা হলে মুসলমান সমাজ একে একটি নিদারুণ অন্যায় বলে আখ্যায়িত করে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রাকশ করে। তৎকালীন বাংলার ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষে মাত্রা উপলব্ধি করে তাদের শান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি, ঢাকায় আগমন করলে নওয়াব সলিমুল্লাহ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাসহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা বঙ্গ বিভাগ রদ করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশকিছু হিন্দু ও গুটিকয়েক মুসলমান নেতা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধিতা করলে ১৯১২ সালের ৩-৪ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগে'র সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বিরোধিতাকারীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভাইসরয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাস হয়।[২৯] এবং ১৯২১ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।[৩০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এর প্রথম নির্মিত হলের নামকরণ করা হয় সলীমুল্লাহ মুসলিম হল (আগস্ট,১৯০৯)।[৩১]

স্যার সলিমুল্লাহ শিক্ষাথীদের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০৬ খ্রিঃ ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "আমাদেরকে আলীগড়ের ন্যায় হল প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যেখানে ছাত্ররা নিয়মানুবর্তিতার মাঝে থেকে শিষ্টাচার শিখবে যা প্রতিটি যুবকের চরিত্র গঠনের জন্য অত্যান্ত জরুরী।[৩২]

ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে নওয়াব সলিমুল্লাহ ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। আলীগড় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নকে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি দেয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর মতে, রাজনৈতিক বিষয়াদির ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও শিভার্থীদের সভা-সমিতির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে দেয়া উচিত। এতে করে তাদের ধর্ম সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন হতে সহায়ক হবে।[৩৩]

৫। সমাজসেবক হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহ্র অবদান

তৎকালীন বাংলার অনগ্রসর মুসলিম সমাজে শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়াও নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ জনসেবার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। একজন প্রকৃত জনদরদী ও সমাজসেবক হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহর জোড়া মেলানো ভার। সাধারণ মানুষকে যেন কোর্ট ও উকিল মোক্তারের নিকট গিয়ে ধর্না দিতে না হয় সে জন্য তিনি ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন।[৩৪] বিভিন্ন নথিপত্রে নওয়াব সলিমুল্লাহর দান-দক্ষিণার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ্ল ঃ

১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে টাংগাইলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী আয়োজন করার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ৫০০/-টাকা দান করেন।[৩৫] ১৯০২ সালে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ১,১২,০০০/-টাকা অনুদান দেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০২ সালের মে মাসে তিনি জনৈকা বিধবাকে ২৫/- টাকা দান করেন। ১৯০২ সালেই তিনি ছোট লাট উড বার্ণের স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[৩৬] নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর পিতামহীর নামে মিটফোর্ড হাসপাতালে 'আসমাতুন্নেছা মহিলা ওয়ার্ড' নির্মাণে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[৩৭] তিনি ১ জানুয়ারী ১৯০৩ সালে রাজা ৭ম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ঢাকা শহরের স্কুলসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের এবং কাংগালী ভোজনের নিমিত্তে ৫ হাজার টাকা দান করেন।[৩৮] নওয়াব আব্দুল গণির স্মরণে ১৯০৩ খ্রি. আলীপুর চিড়িয়াখানায় একটি পশুনিবাস নির্মাণের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ২০ হাজার টাকা দান করেন।[৩৯] ১৯০৪ সালে টাঙ্গাইল শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে সেখানকার পৌরসভাকে তিনি ২ হাজার টাকা দান করেন।[৪০] অনাথ ও দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের কর্মমুখী শিক্ষা দান করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে স্যার সলিমুল্লাহ্ ১৯০৯ সালে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪১]

নওয়াব সলিমুল্লাহ্ জনসাধারণের সাহায্যার্থে একটি পৃথক তহবিল গঠন করে রেখেছিলেন। কোন দরিদ্র প্রজা নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়ে সাহায্যের আশায় নওয়াবের দ্বারস্থ হলে নওয়াব তৎক্ষণাৎ তাকে সাহায্য করতেন।[৪২] তিনি কাউকেই খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না, কিছু না কিছু দিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দান-দক্ষিণা ও জনসেবামূলক কর্ম করে গেছেন।

৬। রাজনীতিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ্র অবদান

বাংলা তথা পাক-ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে নওয়াব সলিমুল্লাহর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব ছিল অনেকটা আকস্মিক। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি আবির্ভূত হন তদানীন্তন পূর্ব বাংলার নির্যাতিত মুসলিম সমাজের মুক্তির দিশারীস্বরূপ। তিনি দেখতে পান যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

থাকা সত্ত্বেও বিহার ও উড়িষ্যার সাথে বাংলাকে যুক্ত রেখে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি বাংলাকে আলাদা করার চিন্তা ভাবনা করেন। ঘটনাক্রমে ব্রিটিশ সরকারও এ সময় প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে বিভক্ত করার নীতি গ্রহণ করে। ১৯০৩-০৪ সালে ইংরেজ সরকারের বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনার উপর মতামত দিতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[৪৩] ১৯০৪ সালের ১১ জানুয়ারি তিনি পূর্ব বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এক বৈঠকে আহ্বান করে সরকারের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেন।[৪৪] তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সুবিধার্থে ঢাকায় রাজধানী করে বৃহত্তর প্রদেশ গঠনের এক বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন।[৪৫]

বঙ্গ বিভাগের প্রতি সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে এসে (১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪) ঢাকায় নওয়াব সলিমুল্লাহ্র আতিথ্য গ্রহণ করেন।[৪৬] বঙ্গ বিভাগ নিয়ে লর্ড কার্জন নওয়াব সলিমুল্লাহ্র সাথে বিশদ আলোচনা করেন। এরপর ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ নিয়ে লর্ড কার্জন নওয়াব সলিমুল্লাহ্র সাথে পুনরায় আলোচনা করেন। উক্ত তারিখে বঙ্গ বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলে ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামক একটি নতুন প্রদেশ অস্তিত্ব লাভ করে।[৪৭] বাংলা বিভক্ত করার ব্যাপারে নওযাব সলিমুল্লাহ্র কোনরকম হাত ছিল এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায়না। তবে সিদ্ধান্তটি বিশদভাবে কার্যকরী করার ব্যাপারে হয়ত তাঁর কিছু প্রভাব কার্যকর হয়েছিল।[৪৮] এতে নওযাব সলিমুল্লাহ্র মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি পূর্ব বঙ্গের নেতার মর্যাদা লাভ করেন।[৪৯] নওয়াব সলিমুল্লাহ্ প্রথমে বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন বলে কংগ্রেসপন্থী ইংরেজ সাংবাদিক ও লেখক নেভিন্সন যে অভিযোগ করেন সেটি সঠিক নয়।[৫০] বঙ্গভঙ্গের কারণ সম্পর্কে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও ভিন্নমত রয়েছে; কিন্তু এটি পরিষ্কার যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ বিভাগ ঘোষিত হলে বাংলার হিন্দু পুঁজিপতি মহাজন, উকিল, ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীসহ্ জাতীয় কংগ্রেস এর প্রবল বিরোধিতা করে এবং নওয়াব সলিমুল্লাহ্র নেতৃত্বে পূর্ববাংলার মুসলমান জনগণ একে স্বাগত জানায়। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতার মুখে বঙ্গ বিভাগ টিকিয়ে রাখার পক্ষে জনমত সংগঠিত করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এর মতে "মনে হয়, সলীমুল্লাহ অংকুরেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস ও বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের দিক থেকে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা ক্রমাগত আরো চরম আকার ধারণ করতে পারে। তাই তিনি নতুন প্রদেশের সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিম জাতির সংহতি বৃদ্ধি ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবতে শুরু করেন।[৫১] নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠার দিনেই নওয়াব সাহেবের

উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ঢাকায় নর্থব্রুক হলে পূর্ববঙ্গের নেতৃস্থানীয় মুসলমান ও ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয়।[৫২] এটি ছিল বাঙালী মুসলমানদের প্রথম প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমিতি।[৫৩] এই সমিতি তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক প্লাটফরম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্যার সলিমুল্লাহ তাঁর সহযোগীদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন মফস্বল শহরে সভা করে নতুন প্রদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস এর বিরোধিতায় আন্দোলন গড়ে তোলে[৫৪]

১৯০৬ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ 'অল ইণ্ডিয়া মোহামেডান কনফেডারেসি' নামক একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করেন। তাঁর পরিকল্পনাটি উপমহাদেশের বিভিন্ন নেতা ও সমিতির নিকট প্রেরণ এবং পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।[৫৫] নওয়াব সলিমুল্লাহ সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পূর্ণ নিজ খরচে ঢাকায় 'অল ইণ্ডিযা মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর ২০ তম অধিবেশনের আয়োজন করেন। ১৯০৬ সালের সালের ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নওয়াবের শাহবাগস্থ বাড়ীতে এই অধিবেশন চলে এবং এতে প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধি এবং পাঁচশ-এর বেশী দর্শক যোগ দেয়।[৫৬] উক্ত অধিবেশনের শেষ দিনে নওয়াব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবনায় 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭] ১৯০৭ সালে প্রথম দিকে সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যাবলী প্রচারের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করেন। ১৯০৭ সালের ৪ মার্চ কুমিল্লায় এ ধরনের একটি সভায় তিনি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। তারা নওয়াবের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসাও রটিয়েছিল।[৫৮] সব কিছু উপিক্ষা করেই তিনি মুসলমান সমাজের জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করে গেছেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৮ সালের জুন মাসে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠন করে এর সেক্রেটারী হন।[৫৯] ১৯০৮ সালের ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর অমৃতসরে সৈয়দ আলী ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।[৬০] বঙ্গ বিভাগ জনিত কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি দেখে নওয়াব সলিমুল্লাহ বিচলিত হযে পড়েন। এই নিরিখে তিনি নতুন প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১৯০৯ সালের ২১ মার্চ 'ইম্পেরিয়াল লীগ অব ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম' গঠন করেন।[৬১] ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার কার্জন হলে পূর্ববঙ্গের ছোটলাট হেয়ার-এর বিদায় এবং বেইলী-এর স্বাগত অনুষ্ঠানে স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।[৬২]

নতুন প্রদেশের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ও তাঁর সহযোগীগণ বঙ্গ বিভাগ-বিরোধীদের শত বিরোধিতা উপেক্ষা করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নতুন প্রদেশের বিবিধ উন্নতি বিধানে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত নতুন প্রদেশের বিসাল উন্নতি সাধিত হয়।[৬৩] পূর্ব বাংলার মুসলমানরা যখন বঙ্গ ভঙ্গকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে এনে নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট এবং নিজেদের রাজনৈতিক সত্তাকে সবল করার জন্য সর্বভারতীয় মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিশেষ প্রত্যাশার সাথে ভবিষ্যতের দিকে তাকিাচ্ছিলেন,এমন সময় ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাছে মথানত করেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশরাজ পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গরদ ঘোষণা করেন।[৬৪] এই ঘোষণায় নবাব সলিমুল্লাই খুবই মর্মাহত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে ২০ ডিসেম্বর মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ৮টি দাবি ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট পেশ করেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুযারী লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকট বিভিন্ন দাবি পেশ করেন। সেদিনই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদের জন্য একজন শিক্ষা অফিসার নিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।[৬৫] ১৯১২ সালের ৩-৪ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর অধিবেশনে সবাপতির ভাষণে তিনি পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারীদের যুক্তি খণ্ডন করে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং সরকারি চাকরিতে তাঁদের সংখ্যানুপাতে কোটা ধার্যের দাবি জানান।[৬৬] ১৯১৪ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগের অধিবেশন আহ্বান করেন। এরপরই তিনি কার্যত কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেন।[৬৭]

৭। নওয়াব সলিমুল্লাহ্র শেষ জীবন

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনায় রাজনৈতিক সমর্থন দিতে গিয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ জমিদারীর দিকে বিশেষ নজর দিতে পারেননি। ফলে তাঁর এস্টেটের আয় ক্রমশ কমতে থাকে। এতদসত্ত্বেও ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকল্পে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সমিতির সম্মেলন আয়োজন করার যাবতীয় খরচ, তিনি বহন করে। এতে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। এ জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত এস্টেটের হাতি ঘোড়া[৬৮] এবং স্ত্রীদের অলংকার বিক্রি এমনকি বিপুল অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করতে হয়।[৬৯] স্যার সলিমুল্লাহর নওয়াবী গ্রহণের সময় খাজা পরিবারের বিত্ত ও বৈভবে কিছুটা ভাটা পড়েছিল; কিন্তু উত্তরাধিকারীরূপে তিনি যা পেয়েছিলেন তা যথেষ্টই বলা যায়। নওয়াব আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ব্যাংকের হিসাবে ও তোষাখানাতে জমা অর্থের পরিমান ছিল ১৭ লক্ষাধিক টাকা।[৭০] কিন্তু অকাতরে দান কাজ ও রাজনীতি করতে গিয়ে ৪/৫ বছরের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ

গচ্ছিত ধন-সম্পাদ শেষ করে ঋণ করতে শুরু করেন। ১৯০৭ সালে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ টাকা।[৭১] ধর্মভীরু সলিমুল্লাহ্ মদ-নারীর পেছনে কোন অর্থ অপচয় করেননি। জনকল্যাণ মূলক কাজে অতিরিক্ত পরিমাণে দান দেয়ায় ও রাজনীতিতে অর্থ ব্যয়ের কারণেই তিনি ঋণগ্রস্থ হয়েছিলেন।[৭২] জনকল্যাণমূলক কাজ ও রাজনীতিতে অজস্র অর্থ ব্যয়ের দরুন তিনি ঋণগ্রস্থ হন এবং বঙ্গ বিভাগ রদের পর মানসিক দিক দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েন। ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারী চৌরঙ্গীর বাস ভবনে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকার বেগম বাজার এলাকায় তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

৮। উপসংহার

উপসংহারে বলতে পারি যে, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উন্নয়ন, মিলাদুন্নবী ও ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম জনপ্রিয়করণসহ নৈশ্য বিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, ছাত্রাবাস প্রভৃতি স্থাপন করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে মোটা অঙ্কের অনুদান দেন। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করেন। জনগণ যেন অযথা মামলা-মোকদ্দমা ও হয়রানির শিকার না হয় তার জন্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মোট কথা, একজন প্রকৃত সমাজসেবী হিসেবে যা করণীয় তার সবকিছু তিনি করেছেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর বিচিত্র কর্মময় জীবন পর্যালোচনা করলে তার গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের অবহেলিত, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০৬ সালে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পূর্বে অনেক মুসলিম নেতাই এই ধরেনের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও তাঁরা সফলকাম হতে পারেননি। নওয়াব সলিমুল্লাহ বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করে ভুল করেছিলেন না সঠিক করেছিলেন তার জবাব উপমহাদেশের পরবর্তীকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই জানা যায়। তংার সফল নেতৃত্বের কারণেই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতহয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাঙালি জাতি তাই নওয়াব সলিমুল্লাহর নিকট চিরঋণী।

সূত্র নির্দেশ :—

১. ঢাকা প্রকাশ (সম্পাদকীয় : নবাব বাহাদুর পরলোকে), ১৭ জানুয়ারী, ১৯১৫, পৃ.৩
২। এফ.বি.ব্রাডলি-বার্ড, দি রোমান্স অফ এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল (লণ্ডন : স্মিথ এল্ডার এ্যাণ্ড কো., পৃ. ২৮৩

৩। এইচ.এইচ.ডডওয়েল (এডি.), **দি ক্যামব্রিজ হিস্টরী অফ ইণ্ডিয়া**, ভলিউম-৫ (দিল্লী : সে.চাঁদ এ্যাণ্ড কো.), পৃপৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

৪। মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **নবাব খাজা সলীমুল্লাহ** (রাজশাহী : মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৭০), পৃপৃ. ১-২।

৫। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **বাংলা পিডিয়া** (বাংলাদেশ জাতিয় জ্ঞানকোষ), খণ্ড ৩ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৬।

৬। মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৭। এস.এম. তৈফুর, **গ্লিম্‌সেস অফ ওল্ড ঢাকা** (ঢাকা : এস.এম.পারভেজ, ১৯৫৬), পৃ. ৩২৭।

৮। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৯। দেওয়ান শফিউল আলম, **নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর**, ১৯৬৪, পৃপৃ. ৮-১০।

১০। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **নওয়াব সলীমুল্লাহ** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেসন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ১৪।

১১। তদেব, পৃ. ৫২।

১২। তদেব, পৃ. ১১২।

১৩। প্রসিডিংস অফ দি ফার্স্ট প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম, ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত, মহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৩৯-২৪৪।

১৪। তদেব।

১৫। ঢাকা প্রকাশ, ১২ এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ. ৩।

১৬। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ১২৬-১২৭।

১৭। মোঃ আলমগীর "বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশকৃত অপ্রকাশিত পি এইচ, ডি অভিসন্দর্ভ, অক্টোবর, ১৯৯৯), পৃ. ১৭৯।

১৮। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৭।

১৯। বিস্তারিত দেখুন : প্রসিডিংস অফ দি লেজিসলেটিব কাউন্সিল অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম, ৬ এপ্রিল ১৯০৮, উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃ.১৪৯।

২০। বিস্তারিত দেখুন : মোঃ আলমগীর, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২২১-২২২।

২১। **ঢাকা প্রকাশ**, ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৫, পৃ. ৩।

২২। প্রসিডিংস অফ দি ফার্স্ট প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম, ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৪৩-২৪৪। (মোহামেডান হল নির্মাণের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ৩,৪৯,৩০০ টাকা)

২৩। প্রসিডিংস অফ দি ফার্স্ট প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম, ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৩৯-২৪৪।

২৪। **ঢাকা প্রকাশ**, ১২ এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ ৩ এবং ১৯০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর অমৃত সরে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স এর ২২তম অধিবেশনে নওয়াব সলিমুল্লাহ সভাপতিরূপে যে উর্দু ভাষণ দেন তার ভাবানুবাদ, উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৮৫-৩০২।

২৫। প্রসিডিংস অফ দি ফার্স্ট প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশড়াল কনফারেন্স অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাড আসাম, ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৩৯-২৪৪

২৬। এস.এম তৈফউর, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩২৮।
২৭। **ঢাকা প্রকাশ**, ৬ এপ্রিল ১৯০২, পৃ. ৪।
২৮। প্রেসিডেন্সিয়াল এড্রেস অফ নওয়াব সলিমুল্লাহ্ এ্যাট দি ফিক্কথ সেসন অফ দি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ, ১৯১২, উদ্ধৃত ঃ মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৭-৭৭।
২৯। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, খণ্ড ৪, পৃ. ২১০।
৩০। **দি এডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল আণ্ডার দি আর্ল অফ রোনাল্ডশে**, ১৯১৭-২২, কলিকাতা ঃ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯২২ পৃ. ৮৪।
৩১। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৬৪।
৩২। প্রসিডিংস অফ দি ফার্স্ট প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম, ১৯০৬ থেকে উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৪৩-২৪৪।
৩৩। সভাপতির ভাষণ, অল ইণ্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স, অমৃতসর, ১৯০৮, উদ্ধৃত ঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৯১।
৩৪। এস.এম. তৈফুর, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩২৮ এবং খাজা মো. আজম, **পঞ্চায়েত সিস্টেম অফ** ঢাকা, কলিকাতা, পৃপৃ. ১২ ও ২৯।
৩৫। **ঢাকা প্রকাশ**, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২, পৃ. ৬।
৩৬। **তদেব**, ৮ ডিসেম্বর, ১৯০২, পৃ. ৩।
৩৭। **তদেব**, ৬ ডিসেম্বর, ১৯০২, পৃ. ৩।
৩৮। **তদেব**, ৪ জানুয়ারী, ১৯০৩, পৃ. ৩।
৩৯। **তদেব**, ৭ জুন, ১৯০৩ পৃ. ৩।
৪০। **তদেব**, ২৬ জুন ১৯০৪, পৃ. ৩।
৪১। বিস্তারিত দেখুন ঃ **মাসিক মোহাম্মদী**, ৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৪ (বাংলা)।
৪২। জাগরণ, ঢাকা ঃ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৫ (১৯২৮ খ্রিঃ), পৃপৃ. ১৬৮-১৬৯।
৪৩। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৬।
৪৪। **ঢাকা প্রকাশ**, ১৭ জানুয়ারী, ১৯০৪, পৃ. ৩।
৪৫। **তদেব**।
৪৬। **তদেব**, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪।
৪৭। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৬।
৪৮। মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৭।
৪৯। মফিজুল্লাহ কবির, "নওয়াব সলিমুল্লাহ এ্যাণ্ড মুসলিম পলিটিক্স, ১৮৭১-১৯১৫", **বাংলাদেশ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ**, ভলিউম-২, ১৯৭৭, পৃপৃ. ১৭৭-১৭৮।
৫০। মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ১০-১২।
৫১। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৫৪।
৫২। **মোসলেম ক্রনিক্যাল**, অক্টোবর ২১,১৯০৫, পৃ. ৪৩৯।
৫৩। শীল সেন, **মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল** দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ৩৫
৫৪। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৬।
৫৫। এস.এম.ইকরাম, **মডার্ণ মুসলিম ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি বার্থ অফ পাকিস্তান** (১৮৫৮-১৯৫১), লাহোর ঃ ১৯৬৫, পৃ. ১০৭।

৫৬। রিপোর্ট ঃ অল-ইণ্ডিয়া মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এডুকেশন্যাল কনফারেন্স, ২৭-২৯ ডিসেম্বর, ১৯০৬ (আলীগড় ঃ ইনস্টিটিউট প্রেস, ১৯০৭), উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৬৬।

৫৭। সবাপতির ভাষণ, অন-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬, শাহবাগ, ঢাকা, উদ্ধৃত, মুহাম্মদ, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৬৮।

৫৮। বিস্তারিত দেখুন ঃ মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ৬-১৮; সুফিয়া আহমেদ, "নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ", **জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ**, ভলিুম-২১, নং-৩, ডিসেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১৫৬; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ৬৩-৬৭।

৫৯। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৬৯।

৬০। উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ৩০৩-৩০৪।

৬১। সুফিয়া আহমেদ, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৬৬।

৬২। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৭।

৬৩। বিস্তারিত দেখুন ঃ এম.কে.ইউ.মোল্লা, **দি নিউ প্রভিন্স অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম (১৯০৫-১৯১১)**, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ঃ আই.বি.এস. ১৯৮১।

৬৪। মোহাম্মদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ৩০-৩১।

৬৫। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৭।

৬৬। প্রেসিডেন্সিয়াল এড্রেস অফ নওয়াব সলিমুল্লাহ এ্যাট দি ফিফথ সেসন অফ দি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ, ১৯১২, উদ্ধৃত ঃ মোহাম্মাদ কছিম উদ্দিন মোল্লা, **প্রাগুক্ত**, পৃপৃ. ২৭-৭৭

৬৭। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৬৮। **ঢাকা প্রকাশ**, ৩ মার্চ, ১৯০৭, পৃ. ৩।

৬৯। মোঃ আলমাগীর, **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১১৭।

৭০। **তদেব**, পৃ. ১১৪।

৭১। **তদেব**।

৭২। **তদেব**।

বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন (১৭৬৫-১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ)

শেষাদ্রি প্রসাদ বসু

জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে রায়কতরা ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সঠিক কি নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা উপযুক্ত তথ্যাদির স্বল্পতার জন্য একটু অস্পষ্টতা আছে। ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তর দায়িত্ব থাকা কর্মচারী মিলিগান রায়কতদের অনুসৃত ভূমিরাজস্ব নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে তা ছিল ধোঁয়াটে এবং অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।[১] এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে "রায়কত বংশের শ্রী জগদীন্দ্রদের রায়কত প্রণীত" রায়ককত বংশ ও তাঁহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ", রায়কত জমিদারী নথিপত্র ও ঔপনিবেশিক আমলের কিছু চিঠিপত্রের মাধ্যমে তৎকালীন বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে রায়কতদের অনুসৃত ভূমিরাজস্বের একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান গবেষকের মত আর কেউ ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র ব্যবহার করেননি।

(ক) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঃ—

বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে রায়কতদের অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে রায়কত শব্দের অর্থ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। রায়কত শব্দটি তৎকালীন সময়ে উপাধি হিসেবে ব্যবহার করা হত এবং এই উপাধি কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলের জমিদাররাই ব্যবহার করতে পারতেন। এই উপাধি বংশানুক্রমিক ছিল না। রায়কতদের জমিদারী লাভের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতরা জমিদারী লাভ করেছিলেন কোচবিহারের রাজা এবং ভুটানের শাসক দেবরাজার সঙ্গে সংর্ঘষের ফলশ্রুতি হিসেবে। দেবরাজা এবং কোচবিহারের মধ্যে সংঘর্ষের সময় তৎকালীন রায়কত দর্পদেব দেররাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোচবিহারের রাজাকে সামরিক সাহায্য দানের কারণে দেবরাজা এবং দর্পদেবের পরাজয় ঘটে। দর্পদেবের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে রায়কত পদে আবার বহাল করেন এবং বৈকুণ্ঠপুরকে একটি সাধারণ জমিদারী এস্টেট হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়।[২] প্রথমে বৈকুণ্ঠপুরের দেয় রাজস্ব ধার্য্য হয় দশ হাজার টাকার এবং পরে সেই রাজস্ব ত্রিশ হাজারে পরিণত হয়। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই রাজস্বের পরিমাণ কমে ছাব্বিশ হাজার টাকায় পরিণত হয়। যেহেতু মোট আদায়ের পরিমাণ ছিল বত্রিশ হাজার টাকা সেজন্য বৈকুণ্ঠপুর জমিদারীর অপর নাম ছিল বত্রিশ হাজারী।

(খ) প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঃ—

রায়কতদের জমিদারী জলপাইগুড়ি এবং রংপুর অঞ্চলে নিয়ে সংগঠিত ছিল। জলপাগুড়ি এবং রংপুর অঞ্চলে মিলিয়ে জমির মূল্য ছিল ১,৩৩,১২,০০০ টাকা এবং মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০১৯৭ টাকা।[৩] তাছাড়া রায়কতদের কিছু করমুক্ত দেবোত্তর ও লাখেরাজ জমি ছিল। দক্ষিণ ময়নাগুলি অঞ্চল রায়কতরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে লাভ করেন লীজ হিসেবে।[৪] সেখানে তারা পূর্বপ্রচলিত ভূটানীরাজস্ব ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখেন। কিন্তু শীঘ্রই লীজের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। মিলিগানের আগে শ্রী জগদীন্দ্রদের রায়কত বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে ভূমি এবং রাজস্ব বন্দোবস্তের কাজ ১৮৮৫-৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এই বন্দোবস্তে উর্বরতা অনুযায়ী জমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) আউয়াল (উর্বর), (খ) দৈয়ম (দোহলা), (গ) সেয়ম (সোহারী), (ঘ) বাহারম্ (ডাঙ্গা), (ঙ) ময়াজী (পতিত)।[৫] জমির কোন নির্দিষ্ট খাজনা ছিল না। অনুমানের উপর নির্ভর করে জমির পরিমাপ করা হত।[৬] এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রুনিং মনে করেন সম্ভবত কামরূপ অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা থেকে ধার করা। জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত চিরস্থায়ী অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমদুয়ারে অবস্থিত কৃষকদের অবস্থার মূলগত পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। সমগ্র চিরস্থায়ী অঞ্চলে এবং বিশেষ ভাবে বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে জোতদাররাই বেশির ভাগ জমির অধিকারী ছিল। জোতদাররা বেশীর ভাগই ছিল আবাসিক কৃষক। (Redident Cultivator) জোতদাররা তাদের খানিকটা জমি চাষ করার জন্য দিত চুকানীদারদের এবং চুকানীদাররা আবার দর-চুকানীদারদের তাদের জমির খানিকটা চাষ করার জন্য দিত। জোতদার এবং চুকানীদার—এই উভয় কৃষক সম্প্রদায় আধিয়ারদের নিয়োগ করত চাষবাসের কাজে। একজন জোতদার তাঁর জমির স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারত জমিদারকে সেলামি প্রদানের বিনিময়ে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় দেখা গেছে রায়কতরা জোতদারদের কাছ থেকে স্বত্ব বদলের সময় সেলামি আদায় করেননি। সুতরাং রায়কতদের এই উদার মনোভাব জোতদারদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করে যে জমির মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জোতদাররাই একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। এই সুবিধা ছাড়া বলা চলে জোতদারদের স্বত্ব ছিল একাধারে বংশানুক্রমিক এবং চিরস্থায়ী। চুকানীদাররা জোতদারদের অধীনে ছিল। তারা জোতদারদের খাজনা প্রদান করত এবং সেই খাজনা মাঝে মাঝেই বাড়ানো হত। চুকানীদারদের জমির উপর অধিকার চিরস্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক হলেও তারা জমির মালিকানা হস্তান্তর করতে পারত না। বৈকুণ্ঠপুর জমিদার বাড়ীর খতিয়ান বইতে "কোলরায়ত" বলে এক শ্রেণীর চুকানীদারের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা "দেশকাল প্রথা" অনুসারে জমির মালিকানা লাভ করেছে।[৭] বস্তুত পক্ষে স্থানীয় প্রথা অনুসারে কেবল চুকানীদার নয় জোতদারদের স্বত্ব ও খাজনাও নির্ধারিত হয়েছে। এটা উল্লেখ্য যে খতিয়ান বইতে জোতদার এবং চুকানীদারদের

উপস্থিতি থাকলেও,দর চুকানীদার কিম্বা দর-এ-দর-চুকানীর-দের উপস্থিতি নেহাতই নগণ্য। মিলিগান এই নগণ্য উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে জোতদার এবং চুকানীদাররা কৃষিকর্মের উপর আধিয়ারদের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করত।[৮] যেহেতু আধিয়ারদের কম মজুরীতে কাজ করানো যেত সেজন্য জোতদার এবং চুকানীদাররা দর-চুকানীদার কিম্বা দর-এ-দর চুকানীয়দারদের সাহায্য নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। উল্লেখিত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আধিয়ারদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে করুণ। তাদের কৃষকের মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। তারা জলপাইগুড়ির জমিদারী অঞ্চলে বেগার শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাদের জমির উপর কোন অধিকার ছিল না। যখন খুশি তাদের জমি থেকে বিতাড়ন করা যেতো। আধিয়াররা তাদের মালিক "গিরি"-র (প্রায়শঃই জোতদার হত) অধীনে কাজ করত। "গিরি"ই তাকে লাঙ্গল, গরু, বীজ সরবরাহ করত। মিলিগান উল্লেখ করেছেন যে পাট উৎপাদন করার সময় আধিয়াররা লাভবান হত, কিন্তু তা তাদের আবহমানকালের দারিদ্র কতখানি দূর করতে পারত তাতে সন্দেহ আছে।

(গ) কৃষক সমাজের বিন্যাস ঃ—

কৃষকদের শ্রেণী সম্পর্কে বলা যায় যে বেশীর ভাগই ছিল স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। বেশীর ভাগ জোতের নাম খতিয়ান বইতে পাওয়া গেছে ভাকরা দাস, চামারু দাস, পাথালু সিং ইত্যাদি নামে তাছাড়া জোত বানু নস্য, জোত ফতে মামুদ ইত্যাদি জোতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব জোতের আদি মালিকানা ছিল মুসলমানদের। বহিরাগতদের মধ্যে খাঁ পাঠান উপাধিধারী মুসলমানরা এখানে এসে জোত কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করে; তাছাড়া ওসোয়ান উপাধিধারী মাড়ওয়ারীরাও অনেকগুলি জোতের মালিক ছিল। বিশেষ ভাবে বহিরাগতদের বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলকে স্থায়ী ভাবে বসতির স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় এই অঞ্চলে প্রচলিত অপেক্ষাকৃত কম হারের খাজনার উপস্থিতি। গ্রুনিং মন্তব্য করেছিলেন যে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত চিরস্থায়ী অঞ্চলে কৃষকদের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার কারণ অপেক্ষাকৃত কম হারের খাজনার উপস্থিতি।[৯]

(ঘ) পরবর্তী ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঃ—

মিলিগান ১৯০৬ সালে যখন জলপাইগুড়ি জেলায় সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ করেন তখন বৈকুণ্ঠপুর এস্টেট থেকে অনুরোধ আসে সেখানে সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ করার জন্য। মিলিগান সেই অনুরোধে সাড়া দেন। বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে মিলিগানের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল প্রকৃত রায়ত কে চিহ্নিত করা। আবার, প্রজাস্বত্ব আইনের পাঁচ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিয়ম প্রয়োগ করতে তা জানা জরুরী। মিলিগান অনুভব করেন দেশকালপ্রথা অনুসারে

রায়তকে খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য; বরং কি উদ্দেশ্যে জমির মালিকানা সৃষ্টি হয়েছিল তা জানতে পারলে জমির স্বত্বের চরিত্র স্পষ্ট হবে। মিলিগান ঘোষণা করেন যে, একটা জোতকে রায়তিস্বত্ব বলে ঘোষণা করা হবে যদি মালিক জোতদার সেই জমিতে বা জমির কাছাকাছি বাস করে এবং যদি সেই আবাদ যোগ্য জমির এক তৃতীয়াংশ জোতদারের অধিকারে সরাসরি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হল যে, যদি জোতদারের বাসস্থান তাঁর জোতের বেশ বাইরে থাকে তাহলে আবাদযোগ্য জমির অর্ধাংশ তার অধিকারে রাখতে হবে।[১০] এই নিয়ম প্রয়োগের পর ৪১·৮ শতাংশ জোত এবং ৩০ শতাংশ দর জোত রায়তিস্বত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়।[১১] মিলিগান ৭·৬ শতাংশ চুকানিদার এবং ১ শতাংশ দর-চুকানীদর, দর এ চুকানীদারদের যদিও ভোগ দখলকারী হিসেবে চিহ্নিত করলেন-কিন্তু তাদের রাযতের মর্যাদা দিলেন না।[১২] আধিয়ারদের সম্পর্কে মিলিগানের উদ্বেগ থাকলেও তিনি তাদের অবস্থান এবং স্বত্বের কোন পরিবর্তন ঘটাতে চাননি। যদিও একশ্রেণীর আধিয়ারদের খতিয়ান বই দেওয়া হয়; কিন্তু তাতে যে তাদের বিশেষ কোন সুবিধা হয়েছিল তার কোন প্রমাণ পাওযা যায় না। নিজ দখল জমির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মিলিগান কিছু পরিবর্তন আনেন। নিজ ভোগ স্বত্বাধিকারীদের জমির মূল্য নির্ধারিত হল একটি নির্দিষ্ট নিয়মে, নিয়মটি হচ্ছে যে ঐ ভোগ স্বত্বাধিকারীরা তাদের জমিকে দান করেছে তাদের অধস্তন চাষীকে এ পূর্বধারণা থেকেই নির্ধারিত হল নিজ ভোগস্বত্বাধিকারীর দখলে জমির মূল্য।[১৩]

(ঙ) মিলিগানের বন্দোবস্তের ফলাফল এবং কৃষকসমাজের উপর এই ব্যবস্থার প্রভাব :—

মিলিগানের বন্দোবস্তে এ (১৯০৬-১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ) বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে জমির মূল্যায়ন হয় ৪৪৩৭৫ টাকায় এবং অন্যান্য এস্টেটের জমির মূল্যায়ন হয় ৯,৩৭৫ টাকায়[১৪] তাছাড়া নিষ্কর জমির উপর কর ধার্য করা হয়। দুটি যুক্তির ভিত্তিতে মিলিগানের সেটেলমেন্টে বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী অঞ্চলে খাজনাবৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। যুক্তি দুটি প্রথমত খাদ্যশস্যর মূল্যবৃদ্ধি।

দ্বিতীয়ত : চাষযোগ্য জমির আয়তন বৃদ্ধি সত্বেও প্রজাদের দেয় খাজনার অপরিবর্তনশীলতা। খাজনার পরিমান নতুনভাবে ধার্য করা হয় এবং মোট খাজনার পরিমাণ ৫৩,৭৫০ টাকায় নির্ধারিত করা হয়। ফলত ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বন্দোবস্তের পর্যায় থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মিলিগান সেটেলমেন্টের সময় পর্যন্ত বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের খাজনা প্রায় ৪০০ শতাংশ বর্দ্ধিত হয়। সহজেই অনুমেয় যে খাজনা বৃদ্ধির প্রভাবে চাষীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। জে.এ.মিলিগান-ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস ইন দ্যা জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট ১৯০৬-১৯১৬-বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো কলকাতা ১৯১৯ পৃ ঃ-৫৯

২। শ্রী জগদীন্দ্র দেব রায়কত প্রণীত-রায়কত বংশ ও তাঁহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সম্পাদক শ্রী নির্মল চন্দ্র চৌধুরী) প্রকাশক-উত্তরবঙ্গ ইতিহাস পরিষদ, জলপাইগুড়ি (তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৩ শ্রী পঞ্চমী) পৃ ঃ ৩৩-এ বলেছেন রায়কত দর্পদেবের সময় এবং তাঁর আগে রায়কতরা করদরাজা ছিলেন।

৩। তদেব পৃ ঃ ৪৮-১

৪। ই.ই.লুইস, কমিশনার-নোট অন দ্যা প্রপোজালস ফর ফিক্সিং রেটস অফ.রেন্ট.ইন. ময়নাগুড়ি তহশীল-ডেটেড ফিফথ জুলাই-১৮৯০

৫। উমেশ শর্মা-জলপাইগুড়ির রায়কত বংশের রাজর্ষি (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০০৩, গ্রন্থতীর্থ) পৃঃ১০২।

৬। জে.এফ.গ্রুনিং-ইর্স্টাণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারর্স ঃ জলপাইগুড়ি, এলাহাবাদ ১৯১১ পৃঃ ৮২

৭। খতিয়ান বই-(পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, তালুক-বারপাটিয়া নুতন বস ভলিউম-১ (সাল-২০.১২.১৯১১) পৃঃ ১-৪৮৫

৮। জে.এ.মিলিগান-ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস ইন দ্যা জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট ১৯০৬-১৯১৬ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো কলিকাতা ১৯১৯ পৃ ঃ ৭৪,

৯। জে.এফ.গ্রুনিং-ইস্টার্ণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারর্স ঃ জলপাইগুড়ি, এলাহাবাদ ১৯১১ পৃঃ ৮৩

১০। জে.এ.মিলিগান-ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস্ ইন দ্যা জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট ১৯০৬-১৯১৬ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো কলকাতা ১৯১৯ পৃ ঃ ৯৯

১১। পার্থ চ্যাটার্জ্জী-বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭ দ্যা ল্যাণ্ড কোয়েশ্চেন (পাবলিশড ফর সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সস, কলকাতা) পৃ ঃ ৩৪

১২। তদেব-পৃঃ ৩৪

১৩। জে.এ.মিলিগান-ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস্ ইন দ্যা জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট ১৯০৬-১৯১৬ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো কলকাতা ১৯১৯ পৃঃ ৫০

১৪। তদেব-পৃঃ ৫৮

প্রাক-শিল্পায়ন শিল্পায়ন ঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বীরভূম ও বর্ধমানের তাঁতশিল্প

অতীশ সাহা

(১)

ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশ এবং শিস্পবিপ্লবের সূচনা ও কারণ অনুসন্ধানে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম থেকে "প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়ন" (Proto-industrialization) গবেষণার বিষয়ে হয়ে ওঠে। প্রাক-শিল্পায়ন ধারণাটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন মেন্ডেলস ১৯৭২ সালে "Proto-industrialization; The First Phase of the Industrialization Proces" প্রবন্ধে। " প্রাক-শিল্পয়ান শিল্পায়নের ধারণা শিল্প বিপ্লবের উৎস সম্মন্ধীয় তাত্ত্বিক দ্বন্দ ও আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের উৎস বিষয়ে এক নতুন সংযোজন।

ঐতিহাসিক ক্লার্কসন[১] প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নকে চারটি বিশেষ বৈশিষ্টের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পের বিকাশই পরবর্তীকালে শিল্পবিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমত প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পের সাথে যুক্ত কারিগররা যে বাজারের দিকে তাকিয়ে উৎপাদন করত, তার অবস্থান ছিল কারিগরদের বাসস্থান থেকে বহুদূরে, কখনও বা বিদেশে। ফলে কখনও কখনও পৃথিবীর একপ্রান্তের কারিগরদের অন্যপ্রান্তের কারিগরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হত, যেমনটি ঘটেছিল বাংলার তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত এই কারিগররা বছরের বিভিন্ন সময়ে কৃষি ও হস্তশিল্প উভয় কাজের সঙ্গে ই নিজেদের যুক্ত রাখত। কারণ ক্ষুদ্র ও কৃষি শ্রমিকদের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost) ছিল খুব কম এবং তাদের পরিবার বছরের একটা সময়ে কৃষি কাজের অভাবে বেকার থাকত। তাছাড়া শিল্প হিসাবে কুটির শিল্পগুলির স্থির মূলধনের (fixed capital) চাহিদা ছিল কম, কোন বিশেষ শিল্প স্থানের (industrial premise) দরকার ছিল না এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ছিল সরল ও সহজলভ্য।

তৃতীয়ত প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নের বিকাশ বাণিজ্য শস্যের বাজার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই শিল্পর সঙ্গে যুক্ত কারিগররা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন করতে পারত না। হয়ত তাদের আবাদ জমির পরিমাণ কম ছিল, অথবা তারা কৃষিকাজকে অবহেলা করত। কারণ প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পে মুনাফা ছিল বেশী। তাই তাদের ন্যুনতম প্রয়োজনও অনেক সময় বাজার থেকে কিনতে হত এবং এ জাতীয় অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থাই ছিল প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নের ভিত্তিভূমি।

চতুর্থ বৈষিষ্ট্য তৃতীয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই শিল্পের সঙ্গে গড়ে ওঠা শহরগুলি ছিল বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র, যেখানে একই সঙ্গে কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যের সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক কেনাবেচা হত। যে সকল ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল সরবরাহ করত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বাজারে সেই ব্যবসায়ীরা আসত রপ্তানীর জন্য পণ্য কিনতে এবং বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষক কারিগর ও দালালরা আসত তাদের নিজ নিজ পণ্য বিক্রি করতে। যখন প্রাক-শিল্পায়ন শিল্প ও বাণিজ্যিক কৃষির উন্নতি একই সঙ্গে হতে থাকল তখন এই অঞ্চলগুলিতে কাঁচামালের সঙ্গে খাদ্যও লভ্য হল এবং অঞ্চলগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ নগরীরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

শিল্পদ্রব্য হিসাবে চাহিদা ছিল মূলত নিকৃষ্ট মানের বস্ত্রের, যা নিজেদের মান বজায় রাখতে পারত (Standardised product)। যেহেতু পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ছাড়া শ্রমই ছিল মূল বিষয়, তাই ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে সস্তার শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যই বেশী বিক্রি করত। ঐতিহাসিক ক্রেড্‌টা (Kridte)[২] দেখিয়েছেন কিভাবে বাণিজ্যিক মূলধনী শ্রেণী (merchant capitalist class) শহর ও গ্রামে শ্রমের সহজলভ্যতাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করত।

মূলত বাজার ব্যবস্থার প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নে গতি এনেছিল। কোন কোন বাজারে পণ্যের চাহিদা এতই বেড়ে গিয়েছিল, যা শ্রমের যোগানকেও ছাপিয়ে যায়। ফলে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শিল্প সংগঠন (industrial organization) ও পদ্ধতির (technique) পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে প্রাক্ শিল্পায়ন শিল্পগুলি আধুনিক কারখানা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ সম্ভব হয়নি, সেখানে অবশিল্পায়ন (deindustrialization) পথ করে নিয়েছে।

প্রাক্ শিল্পায়ন শিল্পায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট হল শহরতলি ও শহরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য—শহরতলি এলাকাগুলি মূলত উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল, আর শহরগুলি ছিল ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নের কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত আলস্টার ও ইয়র্কশায়ারে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

এই লেখার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাবে বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় তাঁত শিল্পের দ্রুত সার্বিক পরিবর্তন, আলোচনা করা হয়েছে, যা অনেকাংশেই প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নের ধারণাকে সমর্থন করে, যদিও তা শেষ পর্যাযের শিল্প বিপ্লবে উন্নিত হতে পারেনি।

(২)

এশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অর্থের প্রসার ও অর্থগৃধ্নু মনোভাবের প্রসার, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে বিভিন্ন শহরের বিকাশ, উন্নততর ব্যাঙ্ক ও ঋণদান ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ও ঋণের উপর সংগঠকদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি সম্ভাবত ক্ষুদ্র কৃষকদের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির

সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করেছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই বৃহত্তর পরিবর্তন প্রাক্-শিল্পায়ন শিল্পায়নের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। সমসাময়িক সাহিত্য, বিদেশী পর্যটকদের রচনা এবং ফ্যাক্টরী রেকর্ড থেকে আমরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অর্থনৈতিক জীবনের কিছুটা ধারণা পাই। তখনকার গ্রামগুলি মোটেই স্বনির্ভর স্থায়ী ও বদ্ধ ছিল না। শহরগুলিতেও ব্যবসা ছিল চোখে দেখার মত। রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে[৩] আমরা বর্ধমানের বাজার সম্পর্কে যা বিবরণ পাই তাতে প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে।

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার।।
বনিদি দোকান কত শথ শত ঠাঁই।
মণিমুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই।।
বনাত মখমল পটুট ভুসনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখতে তামাসা।।
মালদই এলাটি চিক্কণ সরবন্দ।
আর আর কত কব আমীর পছন্দ।।
বিলাতি বহুত চিজ খেস কিস্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের।।
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেসাতি নাই রাজার দোহাই।।

ভারতচন্দ্রের[৪] "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে বর্ধমানে নিয়মিত বণিক ও সদাগরের আসাযাওযার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এশিয়া ও ইউরোপের বিদেশী সদাগররা এখানে নিয়মিত আসত তাদের আমদানী করা পণ্য বিক্রি করতে ও স্থানীয় পণ্য রপ্তানীর জন্য কিনতে। মিশনারি জন্ ক্যাব্রেলের রচনায় জানা যায় যে ১৬৩৩ সালে পর্তুগীজ, চীন, মালয়, ম্যানিলার বহু জাহাজ হুগলীতে মেরামতি করা হত। এছাড়াও হিন্দুস্থানী, মুঘল পারসীয় আর্মেনীয়রা আসত এখানকার পণ্য কিনতে।[৫]

পর্তুগিজরা হুগলীতে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় এবং প্রায় একই সময় (১৬৫১) ইংরেজরা এখানে কারখানা স্থাপন করে। এরপরি ফরাসী, আস্টেন্ড, দিনেমার ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানী এসে আস্তানা গড়তে থাকে। বাজার ব্যবস্থার প্রসারের সুযোগ বর্ধমান ও বীরভূমের কারিগররা ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছিল। ইউরোপীয় বাজারেই বাংলার তাঁত বস্ত্রের চাহিদা ছিল বেশী। কিছু বস্ত্র ইউরোপীয়দের হাত ঘুরে জাপান, পারস্য শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতি এশিয়া দেশগুলিতেও রপ্তানী হত।

ভারতে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি বাজারের ভিতকে দৃঢ় করে। রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ছোট মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মালদ্বীপ থেকে প্রচুর কড়ি আমদানি হতে থাকে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে[৬] কবি দেখিয়েছেন কিভাবে ঘুঁটে বেচে হরিহর তার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করত ঃ—

"বনে মাঠে বেড়াইয়া কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে।
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।।"

এই সময় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও হুন্ডির প্রচলনও ছিল সর্বত্র। তেজারতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বাঙালী হিসাবে আঢ্য, ধর, মল্লিক পাইন ও শীল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরও বর্ধমান ও বীরভূমে পাওয়া যেত।

(৩)

ভারতবর্ষে সূতী শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতিতে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, যা শ্রমের বিভাজন ও বিশেষায়ণ, পুঁজির প্রবেশ এবং বাজারের নিয়ন্ত্রণেব উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রথম ধারা হল গ্রামীণ হস্তশিল্প। এক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যই কমবেশী উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকত। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রেতা সরাসরি বাজারে বা হাটে বিক্রি করত অথবা অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করত।

উৎপাদনের দ্বিতীয় ধারায়, পাইকাররা নিয়মিত কারিগরদের দাদন দিত এবং নির্দিষ্ট মানের উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান ছিল সুনিশ্চিত। উৎপাদন হত মূলত, পরিবারের মধ্যে মূলধনের প্রয়োজন ছিল কম, শ্রমের বিশেষায়ণ ছিলনা বললেই চলে, মূলধনের মালিকানা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত এবং শ্রমও ছিল সহজলভ্য।

উৎপাদনের তৃতীয় ধারাটি অপেক্ষাকৃত উন্নততর। এখানে কারিগররা বিশেষ জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বিভিন্ন স্তরের কাজ সম্পন্ন করা হত এবং একাধিক পাইকার ও বণিক শ্রেণী মধ্যসত্ত্বভোগী হিসাবে উৎপাদনে যুক্ত হয়ে পড়ত। স্বল্প হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাক্-শিল্পায়ন মালিকানাও দেখা যেত।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বর্ধমানের কালেক্টর মার্সারের সালে লেখা এক চিঠি (১ জুন ১৭৪৯) থেকে বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিবরণ পাওয়া যায়।[৭]

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল[৮] কাব্যে 'রামা', এক কুলিন ব্রাহ্মণ গৃহবধু তার স্বামী সম্পর্কে বলছেন ঃ-

সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মুখ তুষ্ট নহে রুষ্ট হয়ে যায়।।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে অষ্টাদশ শতকের শেষে তাঁতশিল্প কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষানুক্রমিক পেশা ছিল না সমাজের একটা বড় অংশ এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল। এই দু'ই জেলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় খাদ্যশস্যের দাম ছিল কম। তাই যখন আবাদ ছিল না অথবা অতিরিক্ত আয়ের আশায় অনেকেই এই পেশার সাথে যুক্ত হতে চাইত। পূর্বে উল্লিখিত গুহ ও মিত্র সম্পাদিত বই (পৃঃ ৯০) থেকে জানতে পারা যায় বর্ধমানের এক চৌকিতে চৌদ্দজন তাঁতীয় নাম যারা দত্ত, গরুই, গুই, সিং হালদার প্রভৃতি ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে একই সঙ্গে ধোবা এবং চাষীবোধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ সম্ভবত ইঙ্গিত করে যে বস্ত্র ধোলাই এর কাজে বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়লে ওই কাজে পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত ধোবা শ্রেণীর লোক ছাড়াও বহুসংখ্যায় সাধারণ চাষীরা নিযুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও পাল, দে, লাহা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ কাজে যুক্ত হত[১০]। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের লোকই প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হত। বীরভূমে প্রায় সকল পরিবারই এই ব্যবসার বিভিন্ন স্তরে যুক্ত ছিল। নয়নসুখ, জলমল, সেরবতী জাতীয় উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদন হলেও "গারা" জাতীয় নিকৃষ্ট বস্ত্রেরই চাহিদা ছিল বেশী। 'গারী' নিকৃষ্ট মানের হওয়ায় উৎপাদনে বিশেষায়ণের প্রয়োজন ছিল না। ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে পারত। স্ক্যাভেনিয়াসের প্রতিবেদনে[১১] জানতে পারা যায় বছরে এখান থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বা তারও বেশী সংখ্যক গারা বস্ত্র বীরভূম থেকে রপ্তানী হত এবং বছরে শুধুমাত্র বীরভূম জেলাতেই মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৪ লক্ষ পিস্ গারা। প্রতি পিস্ গারা ছিল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে নির্দিষ্ট। বীরভূমে গারা কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট এই তিন মানের হত।

ইংল্যান্ডে প্রাক্-শিল্পায়ন যেমন স্বাধীন উৎপাদকদের ক্রমশ 'সর্বহারা' শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছিল, বর্ধমান ও বীরভূমে তার তুল্য উদাহরণ মেলা ভার। তবে সমাজে উচ্চ বর্ণের লোকেরা ক্রমশঃ নীচু বর্ণের পেশায় যুক্ত হওয়ায় একথা অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। স্ক্যাভেনিয়াস[১২] তার প্রতিবেদনে বলেছেন বিভিন্ন বর্ণের তাঁতীরা একত্রিত হয়ে নিয়মিত মদ্যপান করত (হতে পারে বীরভূমের অধিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যও এরজন্য কিছুটা দায়ী)। এটি উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের একটি উদাহরণ। আঠারো শতকের ন'য়ের দশককে বাংলার তাঁতশিল্পের সর্বোচ্চ প্রসারের যুগ ধরা যেতে পারে। উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি পেলেও এ সময় তাঁতীদের মজুরী বৃদ্ধি পায়নি। তিন থেকে চার টাকা ছিল একজন তাঁতীর সর্বোচ্চ মাসিক আয়, যদি সে সারা মাস উৎপাদনে যুক্ত থাকতে পারত। এর মধ্যে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা উৎপাদনের সাহায্য করত তাদের আয় এবং বিভিন্ন স্তরে "প্রথানুযায়ী দেয় (customery payment) ধরা আছে। তাই সামগ্রিকভাবে এ সিদ্ধান্ত করা যেতেই পারে যে একদা স্বাধীন তাঁতীরা পাশ্চাত্যের ন্যায় 'সর্বহারা' শ্রেণীতে রূপান্তরিত না হলেও তাদের অবস্থার অবনতি হয়েছিল।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক শর্তহিসাবে উৎপাদনের সব স্তরে মূলধনের নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ও বাজার ব্যবস্থার প্রসার, পণ্যের প্রাচুর্য্য (immense accumulation of capital) এবং প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতিকে ধরা যেতে পারে। আমাদের আলোচনায় একথা বলা যায় যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়। কিন্তু তা কখনই উৎপাদনের সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত হয়নি। মূলত দেশীয় অব্যবসায়িক শ্রেণীই তাদের মূলধন প্রাথমিক ভাবে বিনিযোগ করতে উৎসাহী হয়। আবার অর্থবান লোকেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যতিরেকে বাণিজ্যেই লগ্নী করতে বেশী আগ্রহী ছিল। তাই অর্থ ও বাজার ব্যবস্থার প্রসার ঘটলেও উৎপাদনের সব স্তরে মূলধনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী পরিকাঠামোয় শ্রম সহজলভ্য হওয়ায় প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি হয়নি। তাছাড়া উৎপাদনের উপযোগী জিনিসপত্রের মালিকানা শ্রমিকদের নিজেদের হাতে অথবা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়, প্রযুক্তির উন্নতি হয়নি অথবা পারিবারিক পেশা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে ত্যরা উৎসাহী হয়নি। তাই ব্যবসায়ীরা তাঁতীদের নিয়মমাফিক উৎপাদনে বাধ্য করতে পারত না। কেবলমাত্র যারা মহাজন, ব্যবসায়ী বা সারাফদের কাছ থেকে ঋণ নিত তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্রের যোগান দিতে হত। একমাত্র দারিদ্র ছাড়া অন্য কোন আর্থিক কারণেই তাঁতীকে উৎপাদনে বাধ্য করা যেত না, ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থেই তাঁতীদের ঋণ দিত। তাঁতীরা ঋণ হিসাবে কাঁচামাল গ্রহণ করতেও অস্বীকার করত, কারণ, কাঁচামাল তারা নিজেরাই কমদামে উৎপাদন বা যোগাড় করতে পারত এবং এই বাবদ তাদের কিছু মুনাফাও থাকত। তাই বলা যায় যে ঘরোয়া পরিবেশ থেকে বেড়িয়ে এসে ধনতান্ত্রিক শিল্প বিকাশের বাতাবরণ তৈরি করতে উৎপাদক ও ব্যবসায়ী উভয়শ্রেণীই যৌথভাবে ব্যর্থ হয় এবং প্রাক-শিল্পায়ন শিল্পায়নের শেষ মুক্তি ঘটে অবশিল্পায়নের পথে।

সূত্র-নির্দেশ

১। ক্লার্কসন, প্রোটোইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন : দি ফার্স্ট ফেইজ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন? ম্যাকমিলান, ১৯৮৫ পৃ :

২। ক্রিড্টা মেডিক, স্লাম্ বহ্ম, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিফোর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, কেমব্রিজ্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১ পৃ :

৩। রামপ্রসাদ সেন, রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা। সাল? পৃ :

৪। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা। সাল? পৃ :

৫। এস্ চৌধুরী, ট্রেড অ্যান্ড কমার্সিয়াল অরগ্যানাইজেশন ইন বেঙ্গল ১৬৫০-১৭২০, কলিকাতা, ১৯৭৫ পৃ : ৮

৬। আর গুহ, এবং মিত্র, (সংকলিত), ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট্ রেকর্ডস্ নিউ সিরিজ্, বর্ধমান। লেটার্স ইস্যুড্ ১৭৮৮-১৮০০। অফিস অফ দি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ সেন্সাস অপারেশন্স, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৯৫৬, পৃ : ২০।

৭। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, উপরিল্লিখিত, পৃ : ৫৭

৮। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, উপরিল্লিখিত, পৃ : ১০২।

৯। ঐ পৃ : ৬৮।

১০। ডি.বি.মিত্র, দি কাটন উইভার্‌স অফ বেঙ্গল ১৭৫৭-১৮৩৩, কলিকাতা, ফার্মা কে.এল্.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ : ৮৫।

১১। ও ফিল্ডবেইক্, ক্লথ প্রোডাক্সন্ অ্যান্ড ট্রেড ইন লেট এইটিন্থ্ সেঞ্চুরী বেঙ্গল ঃ এ রিপোর্ট ইন দি ড্যানিস্ ফ্যাক্টরী অ্যাট্ শ্রীরামপুর, বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট্, হিরক জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৬৭, পৃপৃ : ১২৮-১২৯।

১২। ঐ পৃ : ১৩০।

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা

সুতপা দাশগুপ্ত

ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে দেশভাগের গ্লানি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্কুল পাঠক্রমে স্বাধীনতা ও দেশভাগকে বহুদিনের বিদেশী শাসন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু দেশভাগ ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের সূচনা। সীমান্তের উভয় প্রান্তে, পশ্চিমে ও পূর্বে দেশভাগ মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বাধীনতার সাথে সাথে যে অজস্র মানুষ গৃহহীন হয়েছিল তাদের জীবনে দেশভাগের অর্থ গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তবে পাঞ্জাবে ও বাংলায় দেশভাগের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সাংগঠনিক রাজনৈতিক আন্দোলন। তাই দেশবিভাগ সম্পর্কে গবেষণা একদিকে যেমন স্বাধীনতা ও দেশভাগের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় সীমিত রাখা উচিত নয়, অপরদিকে পাঞ্জাব ও বাংলার ক্ষেত্রে পুনর্বাসন সক্রান্ত আলোচনা পৃথক রাখা বাঞ্ছণীয়।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাংগঠনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ও পাঞ্জাবে এই ধরনের সাংগঠনিক সংগ্রামের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল।[১] পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু আগমন মূলত ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সীমিত ছিল। সেখানে দেশ বিভাগের আগেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ফলে ১৯৪৭ সালে এক ব্যাপক আকারে মুসলিম প্রধান অঞ্চলে থেকে হিন্দু ও হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে থেকে মুসলিম বিতাড়নের ধ্বংস লীলা দেখা যায়। কাজেই পাঞ্জাবে আগমনের চিত্রটা ছিল দ্রুত ও হিংসাত্মক এবং পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে লোক বিনিময় সম্পন্ন হয়েছিল। বাংলার ক্ষেত্রে এটি ছিল এক দীর্ঘকালীন সমস্যা। ১৯৪৬-এর নোয়াখালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীদের যে আগমন শুরু হয় তা আজও চলেছে। এর পরে ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ অপারেশন, ১৯৫০ সালের বরিশাল ও খুলনায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন, পঞ্চাশ ও ষাট-এর দশকে আশ্রয়প্রার্থী আগমনের ধারা অপরিবর্তিত রেখেছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার ফজলুল হক এর নেতৃত্বে যে ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তার পতন এবং ১৯৬২ সালের রাজশাহী পাবনা ও ঢাকার সাম্প্রদায়িক হামলার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী আগমনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঞ্জাবে এই দ্রুত ও হিংসাত্মক

ঘটনাবলীর ফলে ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে সমস্যাটি ছিল দীর্ঘকালীন ও প্রয়োজন ছিল সুপরিকল্পিত এক পুনর্বাসন নীতির। শরণার্থী আগমনের ধারা ও প্রকৃতির এই পার্থক্যের ফলে সরকারের ভূমিকা ও উদ্বাস্তুদের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই পাঞ্জাব ও বাংলার ক্ষেত্রে পৃথক ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে সংগঠিত উদ্বাস্তু আন্দোলনের বিকাশ দেখা গিয়েছিল। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবেই উদ্বাস্তু আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল তা নয়। কলোনি কমিটির মাধ্যমে যে সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম হয়েছিল তা একটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী আগমন ও পুনর্বাসনের চারিত্রিক বিশেষত্বের দরুণ civil society বা নাগরিক সমাজের উন্মেষ হয়েছিল। আর এই নাগরিক সমাজের উদ্ভব উদ্বাস্তু সচেতনতা ও সংঘবদ্ধ উদ্বাস্তু আন্দোলন গঠনে সাহায্য করেছিল। উদ্বাস্তু সমস্যার রাজনীতিকরণ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পাটির উদ্ভব সম্ভবপর করেছিল। তবে উদ্বাস্তু সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কেবল সাংগঠনিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা যথেষ্ট ছিলনা৷ সরকারের পুনবার্সন নীতি, শরণার্থীদের আগমনের ও বসবাসের অভিজ্ঞতা ও তাদের অতীত স্মৃতি উদ্বাস্তু চিন্তন ও মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই রচনাটির মাধ্যমে বাংলায় ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে আগত উদ্বাস্তুদের মনোভাব ও সচেতনতা গঠনের স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াটি বোঝবার একটি প্রয়াস করা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক প্রভেদ লক্ষণীয়। স্বাধীনতার পরে যারা এসেছিল তারা সকলেই সরকারের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল না। আগত জনসংখ্যার একাংশ অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ছিল ও তারা সরকারের অনুদানের অপেক্ষায় ছিল না। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর উদ্বাস্তুরা ছিল সরকারী ক্যাম্পে আশ্রয়প্রার্থী। এরাই সম্পূর্ণভাবে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এছাড়াও ছিল কলোনির অধিবাসীরা। পতিত জমি দখল করে কলোনী প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছিল। জবরদখল কলোনীগুলির গঠন ও পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ইতিহাসের বিশেষত্ব। কলোনীবাসীদের অধিকার ও অধিকৃত জমিগুলির আইনী স্বীকৃতির দাবিতেই উদ্বাস্তু আন্দোলন ক্যাম্পে ও বিশেষত কলোনীগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

তবে জবরদখল কলোনীবাসীরা প্রথম থেকেই ঐক্যবদ্ধ ছিল এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। রাজনৈতিক মতাদর্শের অমিল উদ্বাস্তুদের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস ভাবাপন্ন উদ্বাস্তুরা মনে করতেন যে নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কেবল সরকারের সমালোচনা আকাঙ্খিত নয়। অপরদিকে সরকারের পুনর্বাসন নীতির অভাব বেশ কিছু

কলোনীবাসীদের অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাই সরকার সমর্থক ও বিরোধীদের বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের অমিল যে কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তা বিজয়গড় ও আজাদগড় কালোনীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।[২] তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণেই যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়। প্রতিবেশী কলোনীগুলির মধ্যে জমিরি দখল নিয়ে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হত। এই প্রসঙ্গে আজাদগড় ও নয়া বরিশাল কলোনীর একটি জমি সংক্রান্ত বিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তৎকালীন উদ্বাস্তু আন্দোলনের কর্ণধার ও আজাদগড়ের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দুবরণ গাঙ্গুলির স্মৃতিচারণায়-

"বাইশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, সকালে উঠে দেখা গেল নয়া বরিশাল কলোনি আজাদগড় বিদ্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত ঐ জমিতেও প্লট বিলি করে রাতারাতি হোগলার ঘর তুলেছে। আজাদগড়ের অধিবাসীরা স্বাভাবিক ভাবেই এতে রুষ্ট হয়। শ্রী বঙ্কিম চন্দ, ২নং ওয়ার্ড, শ্রী কাঞ্জিলাল ৩নং ওয়ার্ড ও আরো কয়েকজন ব্যাপার কি জানতে অগ্রসর হলে নয়া বরিশালের কতিপয় তরুণ ওদের উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে শুরু হয় এক নক্করজনক মারামারি। আজাদগড়ের লোকবল ছিল অনেক বেশি। সর্বশ্রী প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, সরোজ বসু, নরেন ঘোষের নেতৃত্বে সহজেই নয়া বরিশালের ছেলেদের আজাদগড় পিছু হটিয়ে দেয়।"[৩]

কিন্তু উদ্বাস্তুদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেবল প্রাধান্য দিলে এই সময়ের ইতিহাসকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। পারস্পরিক ব্যক্তি সংঘাত, কলোনী ও জমি নিয়ে আভ্যান্তরীণ গোলযোগ ও রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা একত্রিত হয়ে উঠেছিল বৃহত্তর সংগ্রামের স্বার্থে।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে আগত ছিন্নমূল মানুষেরা বহন করে এনেছিল অতীতের স্মৃতি। এই স্মৃতি এক দিকে ছিল 'পীড়াদায়ক' (frauma) অপরদিকে 'নস্টালজিয়ায়' (nostalgia) পরিপূর্ণ।[৪] দাঙ্গার ভয়াবহতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভিটেমাটি পরিত্যাগ করার মর্মবিদারক স্মৃতি তাদের অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আবার পূর্ববঙ্গে ছেড়ে আসা জীবনের প্রতি আকুলতা ও নস্টালজিয়া ফুটে ওঠে তাদের কথোপকথনে, স্মৃতিকথায় ও তাদের নীরবতায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসের সুহাসিনীর মত অনেকেই অনুমান করতে পারেননি যে পূর্ববঙ্গের সাথে তাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়েছে।[৫] এপার বাংলার বাসা কোনো দিনই তাদের স্থায়ী বাড়িতে রূপান্তরিত হতেপারেনি। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থন এই ছিন্নমূল মানুষকে যেন এক ঘনিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। এই স্মৃতি একদিকে যেমন ছিল ব্যক্তিগত, অপরদিকে একই পরিস্থিতিতে একই অনুভূতি তাদের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করেছিল।

তবে কেবল বিগত দিনের স্মৃতিতে আবদ্ধ থাকেনি উদ্বাস্তুরা, তাদের মধ্যে দেখা গেছে অপরিসীম কর্মোদ্যম। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত হতাশাকে পরাজিত করে তারা এগিয়ে চলেছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলন কেবল মিটিং মিছিল দাবি ঘোষণা বা পুলিসের সাথে সংঘর্ষে সীমিত ছিল না। জবরদখল আন্দোলন একদল সর্বহারা মানুষের সৃজনশীল গঠনমূলক কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠার সংগ্রাম। আর এই স্বনির্ভর আত্ম-পুনর্বাসনের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এক সক্রিয় নাগরিক সমাজের উত্থানের চিত্র আমরা খুজে পাই। কলোনী গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে অপরিসীম কর্মোদ্যম ও একত্রিত প্রচেষ্টা ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতার এই কলোনী প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তটিতে ঃ-

"১৭ জানুয়ারী আমার বাসার দক্ষিণ দিকের পাকিস্তান মাঠে প্লট ভাগ করা শুরু করলাম। আমার সঙ্গে তখন আর কেউ ছিল না। নারকল দড়ি দিয়ে বেলা নয়টা দশটায় শুরু হল প্লট ভাগ করা .... দেখতে দেখতে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বহু পথচারী লোক এসে গেলেন প্লট নেওয়ার জন্যে এবং তারাই আমাকে সাহায্য করলেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবার যার পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও জমি নেই শুধু তারাই যোগ্য বিবেচিত হবেন। ......আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতে স্বতঃস্ফূর্ত এক কর্মযজ্ঞে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নীরব নিস্তব্ধ এলাকাটি ক্রমে রূপান্তরিত হতে লাগল একটি কোলাহলপূর্ণ জনবসতিতে।"

কেবল মাত্র গৃহ নির্মাণই নয়, বিদ্যালয়, বাজার চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি কলোনীতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই ভাবেই এক সক্রিয় নাগরিক সমাজের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে কলোনীতে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমন একটি ক্লাব ছিল চিত্তরঞ্জন কলোনীর জ্যোতি সংঘ।[৭] পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলোনী সুরক্ষার জন্য একটি সংগঠনের মাধ্যমে যুবসমাজকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তাই এই ক্লাবের জন্ম দেয়। তবে কলোনী সুরক্ষার সাথে সাথে কলোনীর সামগ্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার কথাও স্মরণ রাখা হয়ে ছিল। ধীরে ধীরে সেই সময় চিত্তরঞ্জন কলোনী ও পার্শ্বপর্ত্তী এলাকায় প্রবীণ, যুবক, শিশু ও মহিলাদের এক মাত্র সংঘ হয়ে ওঠে জ্যোতি সংঘ। সংগঠনটির বিভিন্ন বিভাগ ছিল যেমন ক্রীড়া বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ, শিশু বিভাগ, মহিলাদের বিভাগ, পাঠাগার বিভাগ, সেবামূলক বিভাগ ইত্যাদি। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাট্যোৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে কলোনীবাসীদের একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক সত্ত্বা গড়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে অনুঘটকের কাজ করেছে কেন্দ্রীয় তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু নীতি। ১৯৪৬ থেকে যে বিপুল জনসোত এসেছিল তার জন্য সরকারের তরফে একেবারেই প্রস্তুতি ছিল না। এছাড়াও প্রথম দিকে সাময়িক সাহায্য প্রদানের কথাই সরকারের তরফে ভাঁবা হয়েছিল। সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কেন্দ্রিয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা ২ মার্চ ১৯৫০-এ কলকাতায় জানিয়েছিলেন যে ১৯৫০-এ আগত

শরনার্থীদের সামরিক আশ্রয় প্রদান করা হবে। তার কারণ সরকারি মহলে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে পূর্ববঙ্গে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে ৫০-এর দশকে আগত শরনার্থীরা ভিটেমাটির আকর্ষণে প্রত্যাবর্তন করবে। এছাড়াও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে সমস্যার আকস্মিক প্রকৃতির ফলে পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রস্তুতি নেওয়া তখনো সম্ভব হয়নি।[৮]

পাঞ্জাবের তুলনায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল এই অভিযোগও বিভিন্ন মহলে সুদৃঢ় আছে।[৯] ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে ঈশান পত্রিকা বাংলা ভাগের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করেছিল তাতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলনের কর্ণধার অনিল সিংহের রচনায় সরকারের প্রতি তাদের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন,

"মাসের পর মাস ভারত সরকার পুর্বপাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের সমস্যাকেই স্বীকৃতি দিতে চায়নি এবং সেইহেতু কোনও দায় দায়িত্বও গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। সামর্থ্যানুযায়ী রাজ্য সরকারকেই কাজ করতে হয়েছিল। এবং এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দুই বছরে মাথা পিছু ২০ টাকার বিশাল অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছিল।"[১০]

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনীহার অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অমুলক নয়। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শরনার্থীদের জন্য ব্যয় হয়েছিল ২৩৬·৮০ কোটি টাকা কিন্তু ওই একইসময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় হয়েছিল মাত্র ১০৯·২৯ কোটি টাকা।[১১]

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও উদ্বাস্তু সমস্যার গুরুত্ব প্রথমে অনুমান করতে পারেনি। ফলে স্বাধীনতার সময় ত্রান মন্ত্রক থাকলেও পুনর্বাসন মন্ত্রক শুরু হয় ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সময়। এছাড়াও শরনার্থীদের সাহায্যার্থে যে সরকারী অনুদান দেওয়া হত তার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত স্বল্প। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে উদ্বাস্তু হোম গুলির বাসিন্দাদের মাসিক ডোলের পরিমাণ ১৯৪৭ সালে বেড়ে দাড়িয়েছিল মাত্র ৩২০ টাকায়।[১২] অপরদিকে গৃহ নির্মাণের জন্য ধার্য্য ঋণ ২০০০ টাকা থেকে ৯০০০ টাকা করা হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। যাদের গৃহ নির্মাণের জমি ছিলনা তাদের জন্য এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৫০০০ টাকা থেকে ১০,০০০টাকায়।[১৩] এইভাবে পূনর্বাসন নীতির পরিকল্পনা ও তৎপরতার অভাব ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছিল।

কংগ্রেস সরকারের অনীহা ও পরিকল্পনার অভাব উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে রাজনৈতিক শূণ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা পূরণ করে কমিউনিস্ট পার্টী। ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তু আন্দোলন গঠনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টীর বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তু সংগঠনগুলিতে (যেমন নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ) গুরুত্বপূর্ণ পদে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার

প্রতিনিধিরা ছিলেন। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে বিশেষত ইউ.সি.আর.সি. প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[১৪] যদিও দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টী কিছুটা উদাসীন ছিল, পরবর্তী কালে পার্টী প্রভাব বৃদ্ধি করতে উদ্বাস্তু আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে যখন কমিউনিস্ট পার্টীকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয় তখন অম্বিকা চক্রবর্তীর মতো বলিষ্ঠ কমিউনিস্টরা উদ্বাস্তু নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[১৫] পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতির অভাব উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে কংগ্রেস বিরোধীতা সৃষ্টি করেছিল তাতে কমিউনিস্ট পার্টি লাভবান হয়। নেতৃত্ব দান ও পরিচালনার মাধ্যমে উদ্বাস্তু আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই গতি সঞ্চার করে। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানে উদ্বাস্তুদের ভূমিকাও নির্বাচনী ফলাফলগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতায় ঘন উদ্বাস্তু বসতির ফলে ১৯৫১-১৯৬৭ এর মধ্যে নির্বাচনগুলিতে যে বামপন্থী দলগুলি গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কলকাতায় অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করেছিল তা উদ্বাস্তুদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাবেরই পরিচয়।

যে সক্রিয় নাগরিক সমাজ কলোনীগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তুরা ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের শিকার। সর্বস্ব ত্য।গ করে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে তখন নানাবিধ সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দায়ভার অর্থনৈতিক সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে যেমন প্রস্তুতির অভাব ছিল, স্থানীয় বাসিন্দারাও এই জনস্রোতের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সমস্যাবহুল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, সঙ্কুচিত সুযোগের মুখে নতুন প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে এই বিভেদ পশ্চিমবঙ্গীয়-পূর্ববঙ্গীয় সচেতনতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের ইতিহাস অসহায়তার কাহিনী নয়, সাফল্যের কাহিনী। এই সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত স্তরে সীমিত ছিল না, কলকাতার শহরতলী সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য যশোধারা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত 'দ্য ট্রমা অ্যাণ্ড দ্য ট্রায়াম্প, জেণ্ডার অ্যাণ্ড পার্টিশন ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া' (কলকাতা, ২০০৩), পৃ: ২-৩ দ্রষ্টব্য।

২। ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, 'কলোনীস্মৃতি' প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৯৭) বিজয়গড় ও আজাদগড় কলোনীর বিবাদের উল্লেখ রয়েছে।

৩। ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী পৃ : ৮৬।

৪। দীপেশ চক্রবর্তী 'রিমেম্বার্ড' ভিলেজেস ঃ রিপ্রেসেন্টেশন অফ হিন্দু-বেঙ্গলি মেময়ার্স ইন দ্য। আফটারমাথ অফ দ্য। পার্টিশন', ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি (ভল-৩১, নং ৩২, ১৯৯৩) পৃ ২১-৪৫

৫। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ,'পূর্বপশ্চিম' (কলকাতা, ১৩৯৫) পৃ ৫৪।

৬। ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী পৃ ৫৪

৭। তমাল কান্তি দে, 'চিত্রঞ্জন কলোনীর ইতিহাস' (কলকাতা ১৯৯৯)

৮। হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু' (কলকাতা ১৯৭০)

৯। এই প্রসঙ্গে অনল সিংহ, 'পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা। (কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৮) ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী 'কলোনিস্মৃতি' প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৯৭), তুষার সিংহ 'মরণজয়ী সংগ্রামে বাস্তহারা।' (কলকাতা ১৯৯৯), কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'শিকড়ের সন্ধানে' (কলকাতা, ২০০২), হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু' (কলকাতা ১৯৭০) দ্রষ্টব্য।

১০। অনিল সিংহ, 'পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা' (কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৮) পৃ ৪২

১১। তাই ইয়ং তান অ্যাণ্ড জ্ঞানেশ কুদাসিয়া, 'দ্যা আফটারমাথ অফ পার্টিশন ইন সাউথ এশিয়া।' (লণ্ডন, ২০০০) পৃ ১৭২-১৭৫

১২। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিশনারকে লেখা পত্রে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে এ কথা জানিয়ে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব ডি.কে.চক্রবর্তী। এ পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'ম্যানুয়াল অফ রেফিউজি অ্যাণ্ড রিহাবিলিটেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভল-১ (কলকাতা ২০০০) পৃ ৪৪

১৩। কে ঝালা, সচিব আর, আর ও আর ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখা পত্র ২৯ মে ১৯৯৫। 'ম্যানুয়াল অফ রেফিউজি অ্যাণ্ড রিহাবিলিটেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভল-১ (কলকাতা, ২০০০) পৃ ৪৫।

১৪। প্রফুল্ল চক্রবর্তী 'দ্যা মার্জিনাল মেন' (কলকাতা, ১৯৯০) গ্রন্থে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১৫। ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী পৃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।

বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (প্রথম পর্যায়-১৮২০-১৯০৯)

প্রগতি বন্দোপাধ্যায়

এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সাধারণত ঔপনিবেশিক পটভূমিকার সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসক এবং ঐতিহাসিকরা অবশ্য ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন রেখা টানতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতে যেসব বিভিন্ন জনগোষ্ঠী (ব্যাকট্রিয়, গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি) আক্রমনকারীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল, ভারতের ইতিহাসে তারা একে একে মিশে যায়। কিন্তু ইসলাম এদেশে আবির্ভাবের পূর্বেই যে স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত হয়েছিল, বহুযুগ এদেশে অতিবাহিত করার পরও মূলত তা বজায় রেখেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো একশ্রেণীর ঐতিহাসিক এদেশে এবং পাকিস্তানে আই.এইচ.কুরেশী-র মতো পণ্ডিতরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, শুরু থেকেই ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান-এই দুই সম্প্রদায় দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবাস করেছে। অতীতে এই ধারণার ভিত্তিতে প্রাচীন যুগকে "হিন্দু" এবং মধ্যযুগকে "মুসলমান" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাচীন ভারতে যে হিন্দু ছাড়াও অন্য ধর্মাবলম্বী শাসকদের দেখা যায় (যেমন বৌদ্ধ বা জৈন) তা এই ধরনের পর্ব বিভাজনে ধরা পড়েনি। জাতিভেদ প্রথা, আঞ্চলিক বিভেদ কিংবা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মতদ্বৈধতাও আলোচকদের মনে স্থান পায়নি। আর্থ সামাজিক বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাত আলোচনার বাইরে না রাখলে বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি নামকরণ সম্ভব নয়।

অধ্যাপক ক্রিস বেইলী (C.A. Bayly) সাম্প্রদায়িক সমস্যার (উনবিংশ শতকে) গতি-প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে "There is little basis then for the assumption made by many writers that Hindu-Muslim conflict did not occur until the creation of local representative bodies and the emergence of 'Modern' Politics in the Post-Mutiny era." উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহাসিক বেইলী আওরঙ্গজেবের মসজিদ নির্মাণের দ্বারা মন্দিরের স্থানান্তরকরণকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করা সম্ভব নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাৎক্ষণিক কোন কারণবশত সংঘর্ষ সংগঠিত হতে পারে।

কিন্তু 'সাম্প্রদায়িকতা' বললে আমরা বুঝি বিশেষ এক প্রকারের মনোভাব যা সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার নামে নিজেকে সংগঠিত করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়।

উনিশ শতকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদান-ও কম ছিল না। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু-জনতা বেনারসে আওরঙ্গজেবের মসজিদ ধ্বংস করেছিল। কথিত আছে, ৫০টি মসজিদ এই দাঙ্গায় ধুলিসাৎ হয়েছিল এবং বহু মুসলমান জনগণের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণের অভাব আছে। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মুসলমানরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে এক শোভাযাত্রার ওপর আক্রমণ করেছিল। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বম্বেতে 'রামনবমী' ও মহরম একই দিনে পড়ায় স্থানীয় দেবতা 'বিঠোবা' পূজা উপলক্ষে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা সৃষ্টি হয় ও মুসলমানরা 'বিঠোবা' র মূর্তি সমূহ ক্ষতিসাধন করেছিল। ফলে ৪৮ জন মুসলমান দাঙ্গাকারী আহত হয় ও ২১ জন কে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিঃ ব্রোচ-এ একজন 'চরিত্রহীন' পার্সির অপমানজনক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা পার্সীদের বাসস্থান আক্রমণ করে। ফলে দাঙ্গাকারীদের ২ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয় ও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৭১-৭২ সালে উত্তরপ্রদেশের বেরিলি ও অন্যান্য স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৮৭৭ সালেও উত্তরপ্রদেশে রেরিলি ও অন্যান্য স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে 'রমজান' মাসে 'গণপতি' উৎসবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা পার্সীদের বাসস্থান আক্রমণ করে, ফলে দাঙ্গাকারীদের ২ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয় ও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৭৭ সালে রমজান মাসে প্রশাসনিক নিয়মের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণ হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে দেবদেবীর মূর্তি বিনষ্ট করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত কলকাতার পার্শ্ববর্তী কলকারখানা সমূহের উভয় সম্প্রদায়ের তিক্ততা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৫ সালে কাঁকিনাড়া জুটমিলে 'মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' আরও বেশী পরিমাণে মুসলমান শ্রমিক নিয়োগের দাবি জানায় ও মসজিদগুলি সংস্কারেরও দাবী জানাতে শুরু করে। উক্ত জুটমিলের শ্রমিকরা মিছিল করে ১ মাইল দূরে অবস্থিত জগদ্দলের অ্যাংলোইন্ডিয়ান জুট মিলের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত একত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে টিটাগড়, গার্ডেনরিচ ও শ্রীরামপুরে সংগঠিত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বখর্-ঈদ্-এর সময়ে গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল। মহম্মদ হোসেন নামে এক ব্যক্তি (যে "Standard Jute Mill" টিটাগড়ে কর্মরত ছিল) একটি বাছুর নিয়ে এসেছিল বলিদানের জন্য। চারজন হিন্দু যুবক এই গো-হত্যা বন্ধের জন্য উক্ত গো-সন্তান-কে চুরি করেছিল। এই দাঙ্গায় টিটাগড় পেপার

মিল ও টিটাগড় জুট মিলের শ্রমিকরা (মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত) একত্রে দাঙ্গায় যোগদান করেছিল। তবে টিটাগড় মসজিদ (যেখানে প্রায় ৩০০ জন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ বখর-ইদ উপলক্ষে সমবেত হয়েছিল) থেকেই দাঙ্গার উৎপত্তি হয়েছিল। এই দাঙ্গায় ৩০০ জন বা তারও বেশী হিন্দু এবং ১৮০ জন মুসলমান দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছিল। তারা "Mar Hindu sala log"শ্লোগান সহ দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছিল। হুগলী জেলায় রিষড়া-য় হেষ্টিংস জুটমিলে গোহত্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে টিটাগড়, বরানগর, কামারহাটি প্রভৃতি জুট মিলের কিছু কিছু শ্রমিকরা নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব বিষয়ে (ঈদ, মহরম, রথযাত্রা) বিষয়ে অতিরিক্ত "assertive" হয়ে উঠেছিল, এইসব কারখানায় তারা ধর্মীয় উৎসবে ছুটি না দিলে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিল। IJMA শ্রমিকদের হুমকির ফলে সন্ত্রস্ত হয়ে সরকারকে পত্র মাধ্যমে জানায় যে সরকার যেন সম্ভাব্য দাঙ্গার জন্য যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সর্বোপরি ১৮৯৭ সালের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যখন কলকাতায় টালায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমি-মসজিদের জন্য জমি হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায় দাবি করে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করলে এক ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ ৩০ শে জুন (১৮৯৭) ও ১লা জুলাই (১৮৯৭) সমগ্র শহরে দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে ১১জন নিহত ও ২০ জন আহত হন। ৩৪ জন পুলিশ নিহত হয় ও ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু যথার্থই বলেছেন যে 'হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানটাতে কতোবড়ো একটা কলুষ আছে, এবার যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত, তবে ইহাকে আমরা স্বীকার করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।'

গোহত্যাকে কেন্দ্র করে ১৮৯০-এর দশকে সমগ্র বাংলায় বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নিদর্শন পাওয়া যায়। বখর-ঈদ উপলক্ষের সংগঠিত গো-হত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণ মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতির আবশ্যিক অঙ্গ হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তা মহাপাপ হিসাবে পরিগণিত হোত। তাই বিভিন্ন হিন্দু নেতা গোসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গোহত্যা নিবারণী সভা' স্থাপন করে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন।

১৮৮৭ সালে মাদ্রাজের বার্ষিক অধিবেশনে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর রায় গো-হত্যা বন্ধের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৯১ সালে নাগপুরের অধিবেশনে গো-রক্ষিণী সভার সদস্যগণ কংগ্রেসের সভা করার ও চাঁদা তোলার অনুমতি লাভ করে। বহু জমিদার ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানী বন্ধ করতে সফল হলেও বহু গ্রামে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ম্যাকলেনের বর্ণনায় আমরা এই বিষয়ের সমর্থন পাই। তার মতে, "The year 1893 was one

of the worst years for Hindu-Muslim relating in the 19th century. More than one hundred people were killed in communal riots related to cow slaughter in such widely separated places as Bombay city, Junagarh State, the North Western Provinces and Oudh, Bihar and Bangaon."

টাঙ্গাইলের সীমানা ছাড়িয়ে গো-হত্যা কেন্দ্রিক দাঙ্গা ঢাকা, কলকাতা, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

উনবিংশ শতক থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধারাবাহিকতা বিংশ শতকের প্রথম দশকেও চলেছিল। যশোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল। ১৯০৩-এর ৭ই এপ্রিল বেঙ্গলী পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে অ্যান্টি সেকুলার সোসাইটির হস্তক্ষেপে যশোরে একটি ভয়াবহ দাঙ্গা এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়েছিল। ময়মনসিংহের 'চারুমিহির' পত্রিকায় নিম্নশ্রেণীভুক্ত চাষীদের (বিশেষত মুসলমান) সমসাময়িক হারে কর দানে অস্বীকারের কথা জানা যায়, এছাড়া' নবাব সাহেবের সুবিচার' নামে পত্রিকা বিলির মাধ্যমে মৌলভী সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক প্রচারে ব্যস্ত ছিল।

স্বদেশী আমলে ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসের শেষে নন্দাইল, ঈশ্বরগঞ্জ-প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। স্থানীয় এক মৌলভী ও ধর্মান্তরিত হিন্দু ব্যক্তির (দীনেশ নিয়োগী)-র নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ (যারা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করত)-কে কর্মত্যাগের প্ররোচনা দেওয়া হয়। এইসব অঞ্চলে হিন্দু তালুকদারদের মধ্যেও এইসময় এক অভূতপূর্ব ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রমিক সেবিকা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীকে হিন্দু মালিকদের সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বয়কট করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯০৭ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বজাতি আন্দোলন 'ও লাল ইস্তাহার' (Red Pamphlet') বিলি ব্যবস্থার মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে সর্বতোভাবে বয়কটের নির্দেশ দান করা হয় যা স্বদেশী যুগে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯০৭ সালের ৪ মার্চ নবাব সলিমউল্লাহ কুমিল্লায় পদার্পন করার সাথে সাথে হিন্দু জনগণের উপর অত্যাচারের ঘটনাও ঘটেছিল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল পুলিশের নিরপেক্ষতা ও নীরবতা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে, 'there was a wide spread panic among the Hindu minority population in East Bengal and a growing estrangment of the relation between the two communities'

আবার ২১ এপ্রিল সুমিত সরকারও এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ১৯০৭-এ ময়মনসিংহের জামালপুরে দুর্গামূর্তিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল (মে ১৯০৭)। মাসের মধ্যভাগে দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সীগঞ্জে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৯০৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর শেরপুর বাজারে সামান্য বিতর্ককে কেন্দ্র করে মুসলমান জনতা পুলিশ ব্যারাক ঘেরাও করে। এইভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা সমগ্র স্বদেশী যুগকে কলুষিত করেছিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক উনবিংশ শতকে-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ বা হীনমন্যতা-কে দায়ী করেছেন। জেমস্ লঙ্ তাঁর 'The Social Condition of the Muhammadans of Bengal and the remedies' শীর্ষক আলোচনায় মুসলমান সম্প্রদায়-এর অসন্তোষের কারণ বিষয়ে উনবিংশ শতকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে দূরত্ব-কে দায়ী করেছেন। ১৮৩৩ এর চার্টার অ্যাক্ট ও ১৮৫৮-র সংশোধিত আইনবিধি অনুসারে প্রশাসানিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের নিয়োগ ব্যবস্থা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বরচিত দূরত্ব বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-এর তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বছর	হিন্দু জনসংখ্যা	জনসংখ্যার হার শতকরা	মুসলমান জনসংখ্যা	জনসংখ্যার শতকরা হার	মোট
১৮৭২	১৭,১১২,৯৮৫	৪৯·২৪	১৬,৬৮০·৬৪৩	৪৮·০	৩৪,৭৫১,৩৩৯
১৮৯১	১৮,০৬৮,৬৫৫	৪৪·৭২	১৯,৫৮২,৩৪৯	৪৮·৪৭	৪০,৩৯৮,২৬৫

অর্থাৎ ১৮৭২-১৮৯১ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ১৫৭ জন। তবে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল, শিক্ষা ও চাকুরীতে সমহারে অংশগ্রহণ ঘটেনি। ১৮৮১ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিসংখ্যান অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৫৩,৪০৩ জন অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে ছাত্রসংখ্যার হার ছিল ২৭·৬ শতাংশ। চাকুরীক্ষেত্রে (১৮৮১) বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মুসলমান জনগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০·৪৮ শতাংশ। সেখানে চাকুরীক্ষেত্রে নিযুক্ত হিন্দু জনগণের সংখ্যার হার ছিল ৬৬·৩০ শতাংশ।

ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা ১৮৫৯ সালের ১৪ মে-এর একটি 'Minute'-এ লর্ড এলফিনস্টোন স্পষ্টতই বলেছেন "Divide it Inpera was the old Roman Motto and it should be ours"

সালের ১৪ জানুয়ারী লর্ড ডাফরিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানদের অনুপস্থিতি বিষয়ে বলেন "This division of religious feeling in to our advantage" এই কারণেই বাংলার রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উত্তর প্রদেশ থেকে মুসলমান অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ হিন্দু জনগণের ধারণা হয়েছিল যে মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তবে মৌলানা আজাদ এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে ইজিপ্ট, ইরাক, তুরস্কে যখন মুসলমানরা ইংরাজ শাসকের বিরোধিতায় লিপ্ত তখন এদেশেও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে তারা যুক্ত নয় কেন? তথা তারা ব্রিটিশ সহযোগী নীতির অনুসারী কেন? ('Camp followers of the British')

ডঃ ওয়াকিল আহমেদ অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিরোধের উৎপত্তির কারণ হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জাত্যভিমান হিন্দুর আর্যাভিমান, মুসলমানের প্রভুশক্তির অপব্যবহার, নব্যহিন্দুর ধনগর্ব, শিক্ষা অহংকার ও সুবিধাভোগ ও সর্বোপরি ইংরাজ শাসকের 'সুয়োরানী-দুয়োরানী-ভাবনা কে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্রস্থল ছিল কেবলমাত্র শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণী, গ্রামাঞ্চল নয়। উনবিংশ শতকের শেষে কয়েক দশকে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পেলেও ১৮৮৭ সালে ইউসুফ হোসেন সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচক মন্ডলী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ঐ একই বছরে (১৮৮৭) রাজনারায়ণ বসু 'বৃদ্ধ-হিন্দুর পাশা'-শীর্ষক রচনায় হিন্দু সমিতি নামক একটি মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন মুসলমানদিগের যেমন National Mohameddan Association নামে ভারতীয় সভা, ভারত-প্রবাসী, ইংরাজদিগের যেমন "Anglo Indian Defence Association" নামক জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়, ফিরিঙ্গীদিগের 'Eurasian and Anglo-Indian Association' নামে জাতীয় সভা আসে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় একটি ভারতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রয়োজিত হয় ঐ জাতি ও ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপিত করিয়াছে সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দু-দিগের আছে, এবং সাধারণত হিন্দুদিগের উন্নতিসাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।

সমসাময়িক কালে সাহিত্যেও সাম্প্রদায়িক সভার বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নজরুল ইসলাম-এর মতে সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী, হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিষ্টান অন্যান্য সমস্ত লোককে নিয়ে এক ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর কথা ভাবতে পারেননি। বিপিন চন্দ্র পাল এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ব্রিটিশসমাজ ও নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' র সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮২১-৫৯) ও রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) কবিতায় মুসলমান বিদ্বেষ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে সৎচাষী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সৎনাম নাটকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প পাওয়া

যায়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধসমূহকে (আনন্দমঠ-ইত্যাদি) ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতকরণের দোষে দুষ্ট বলে অভিযুক্ত করা হলেও অরবিন্দ ঘোষ, বঙ্কিমের সাহিত্যিক অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও ধর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে প্রকৃত অবদানের কথাই স্বীকার করেছেন।

ঐতিহাসিক ম্যাকলেন উনবিংশ শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির সাথে হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতির সাদৃশ্যের বিষয়টিকেই দায়ী করেছেন—যেমন শিবাজী উৎসবকেই কেন্দ্র করে রীতিনীতিগত সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়েছিল, তাঁর মতে 'The unsettling development of the 19th Century triggered religious antagonism between Hindus & Muslims'

ঐতিহাসিক নেভিনসন তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবেই ইংরেজ শাসকের তথা সরকারী নীতির মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতা-কে দাঙ্গার জন্য দায়ী করেছেন। ঐতিহাসিক ও ডোনেল অবশ্য এক্ষেত্রে 'মোল্লাদের প্ররোচনাকে' দায়ী করেছেন। আবার পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার 'strong Agrarian note' এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ধর্মীয় করারোপ ও অত্যাচারকে দায়ী কবেই স্পষ্টভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর "Early political writing"-এ (১৯০৭-এর Bande Mataram পত্রিকায় প্রকাশিত) ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে সরকারী নথিপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে বলেছেন "It is not a political byward in England it self that no rumour or irresponsible statement should be believed until it had been officially denied?[20]

উনবিংশ শতক জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকার বিষয়েও অরবিন্দ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন।

সূত্র-নির্দেশ

১। C.A Bayly-*Rulers,* Townsman, Bazars (Oxford 1992)

২। Ramesh Chandra Mojumder-'*British Paramountacy and the Indian Renaissance*, Vol-II (Bombay-1965)

৩। Dipesh Chakroborty-'*Rethinkung Working-class History*' Bengal-1890-(Oxford India paperback, 1996)

৪। IBID.

৫। ডঃ নজরুল ইসলাম-*বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক* (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৪০১)

৬। Sufia Ahmed- '*Muslim community in Bengal* (*1884-1912*, Dacca, 1974)

৭। John R. Melane-"*Indian nationalism and Early Congress*" (Princeton University Press, 1977)

৮। Ramesh Chandra Majumder-*British Paramountacy and Indian Renaissance*-Vol-III, (Bombay, 1965).

৯। Rev. James Long. -Selected Papers (edited with an Introduction and Explanatory notes by Mahadev Prasad.) (Indian Studies-Past and Present).

১০। Report of 1891 Census of India, Bengal, vol-III, Cal-1893.

১১। Romesh Chandra Majumder-'*Britsh Paramountacy and Indian Renaissance*-vol-III (Bombay, 1965)

১২। IBID.

১৩। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ-*'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা'* ২য় খণ্ড, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩)

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী-*সাহিত্য-সাধক-চরিত মালা*-৪র্থ খণ্ড (বঙ্গীয় সহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন-১৩৫১)

১৫। নজরুল ইসলাম-*বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আষাঢ়, ১৪০১)

১৬। John. R. Mclane-*Indian Nationalism and the Early Congress* (Princeton University Press, 1977)

১৭। H.W.Nevinson-*The New spirit in India* (1908)

১৮। C.J.O' Donell-*The Causes of present discontents in India* (London, T. Fisher Union, 1908)

১৯। Sumit Sarkar-*The Swadeshi Movement in Bengal* (New Delhi, People's Publishing House, 1973)

২০। Aurobindo Ghosh-*Bande Mataram* (1907) Early Political Writings (Sir Aurobindo Ashram, Pandicherry, 1973).

ডুয়ার্সে জোতদারী প্রথার অবসান ঃ একটি সামাজিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা

নিরঞ্জন অধিকারী

বর্তমান উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা ও আসামের পশ্চিমাংশের কিছু এলাকা নিয়ে ডুয়ার্স অঞ্চল বিস্তৃত[১]। জলপাইগুড়ি শহরের পূর্বে তিস্তা নদী হতে পূর্বে সঙ্কোশ নদী পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ৮৬ মাইল আর উত্তর দক্ষিণে ৩৮ মাইল বিস্তৃত এই ডুয়ার্স অঞ্চল[২]। ডুয়ার্স কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'দুয়ার' কথাটি থেকে। সেই সময় গিরিপথকে বলা হত 'দুয়ার'। ভুটান থেকে সমতলে আসার জন্য এই অঞ্চলে এগারোটি 'ডুয়ার্স' বা দুয়ারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই এগারোটি দুয়ারের মাধ্যমে ভারত ও ভুটানের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এর মধ্যে পাঁচটি পথ জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। জলপাইগুড়ি জেলায় পশ্চিম থেকে পূর্বে এই পথগুলি হল যথাক্রমে চামুর্চি, লখিমপুর, বল্লা, বক্সা ও কুমারগ্রাম। বাকী আর ছয়টি পথ বা রাস্তা আমাদের গোয়ালপাড়া জেলায় ডুয়ার্স নামে পরিচিত।

এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রণালী ভূমি ব্যবস্থা, আর্থিক ক্রিয়াকলাপ উৎপাদন ব্যবস্থা, জন-বিন্যাস ও সামাজিক অবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের থেকে একটু ভিন্ন ছিল।

১৭৬৫ খ্রিঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার পর তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় ব্যবসায়ের সূত্রে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ। এই ডুয়ার্স অঞ্চলও ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ব্যতিক্রম ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে ডুয়ার্স অঞ্চলের সুরক্ষা বিষয়ে ইংরেজরা বেশ বিব্রত হয়ে ওঠে। ভুটানের অস্থির রাজনীতি, দুর্বল রাজতন্ত্র, প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের স্বাধীন কার্যকলাপ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করেছিল এবং তার প্রভাব সমতলের আসাম সীমান্ত, রংপুর বৈকুণ্ঠপুর সীমান্তকে উত্তপ্ত করেছিল। শুধু তাই নয় ভুটানী দস্যুরা কখনো কোচবিহারের চখোয়াখেত, শৈলমারি, কখনোও বৈকুণ্ঠপুরের জিরাণগঞ্জ, সাপ্টিবাড়ী বাকালীতে মাঝে মাঝে হানা দিতে থাকে। ভুটানী দস্যুদের দমন করার জন্য ইংরেজরা নানা ধরনের পরিকল্পনা খুঁজতে থাকে। ১৮৬৩ সালে বড়লাট এলগিন এ্যাস্‌লি ইডেনকে ভুটানের দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করেন। নানা কারণে ইডেন দৌত্য ব্যর্থ হয়। ভুটানকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ইংরেজরা

সশস্ত্র অভিযানের আয়োজন করতে থাকে। ১৮৬৪ সালের মাঝামাঝি ইঙ্গ-ভূটান যুদ্ধ বাধে। উভয় পক্ষ তুমুল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ৯ নভেম্বর ১৮৬৫ সালের সিঞ্চুলার সন্ধির দ্বারা। সন্ধির শর্তানুসারে ১৮৬৩ বর্গমাইল দুয়ার সমভূমি ভূটান ইংরেজদের ছেড়ে দিল।[৩]

আলোচনার শুরুতে কয়েকজন জোতদারের নাম ও জমির পরিমাণ কত ছিল উল্লেখ করলে জোতদারী প্রথার অবসানের চিত্রটি পরিষ্কার হবে।

জোতদারের নাম	জমি পরিমাণ (একরে)
১। শ্রী পঞ্চানন মল্লিক	১। ১৫০০-১৬০০
২। ঁরাজেন্দ্র নাথ রায়	২। ৪০০-৫০০
৩। ঁমুসব্বর বসুনীয়া	৩। ৩৪০০-উইল অনুসারে
৪। ঁহাজি নছরুদ্দীন	৪। ৫৫০-৬০০ দলিল অনুসারে
৫। ঁভোচক দাস	৫। ২৫০-৩০০
৬। ঁকালসিং বসুনীয়া	৬। ১১০০-১২০০ খতিয়ান নং-২ অনুসারে
৭। ঁখর্গনাথ সেন	৭। ১৩৫০ বর্তমান একজনের দলিল অনুসারে
৮। ঁমাথুরাম রায়	৮। ৪০০-৪৫০ দলিল অনুসারে
৯। ঁমঙ্গলা কান্ত রায়	৯। ১০০ দলিল অনুসারে
১০। ঁকেকারু প্রধান	১০। ৫০০ খতিয়ান নং ৩/২ থেকে ৩/৫ অনুসারে

উপরের সারণীটি থেকে বোঝা যায় যে, ডুয়ার্স অঞ্চলে মোটামুটি তিনধরনের জোতদারের অস্তিত্ব ছিল-ছোট জোতদার, মাঝারি জোতদার ও বড় জোতদার। আমি উপরোক্ত জোতদারগণের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে যে নথিপত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় এরা কেউই এখানকার বসবাসকারী নয়। এদের পূর্ব পুরুষ কেউ না কেউ বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলা বা অন্যত্র থেকে আগত। এখন প্রশ্ন হল তাহলে এই সব ছোট বড় ও মাঝারি জোতদারদের জমি কিভাবে বৃদ্ধিপেল বা এরা কিভাবে এত জমির মালিক হল? ডুয়ার্স অঞ্চল কোন এক সময়ে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে কোন মানুষের বসবাস ছিল না বললেই চলে। ইংরেজগণ ডুয়ার্স অঞ্চল ভূটানের কাছে থেকে ছিনিয়ে নেবার পর ডুয়ার্স অঞ্চলকে নন-রেগুলেটেড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে অর্থাৎ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে সব আইন ও রেগুলেশন চালু ছিল তা সাধারণভাবে এই ডুয়ার্স অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল না।১৮৬৫ খ্রিঃ ডুয়ার্স অঞ্চল স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ ভারতে যুক্ত হলে, ১৮৬৯ সালে গৃহীত ভূটান ডুয়ার্স অ্যাক্ট[৪] অনুসারে এই অঞ্চলের প্রশাসন চালু হয়। এই অঞ্চল যেহেতু জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল,

সেই জন্য রংপুর বা অন্য অঞ্চল থেকে আগত কিছু কিছু মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেক অনাবাদি জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দক্ষিণ ময়নাগুড়ি পরগণার তালুক চুড়াভাণ্ডারের জোতদার কেকারু প্রধান জঙ্গল ভেঙ্গে অনেক আবাদী জমি বের করেন। মাথুরাম রায়ের পিতা ভগৎ সিং রায়, তিনি ঠিক একইভাবে ঝাড় বড় গিলা তালুকের জঙ্গল ভেঙ্গে প্রচুর জমির মালিক হন। হাজী নছরুদ্দীনের প্রপৌত্র শ্রী আব্দুল ওয়াহেদের সাক্ষাতকার অনুসারে জানা যায় যে, হাজী নছরুদ্দীনের জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের নিলফামারি জেলায়, তিনি বর্তমানের দক্ষিণ বড়গিলায় এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি বের করেন। পরবর্তীকালে তিনি এখানে পাটের ব্যবসায়ে আত্মনিযোগ করেন এবং সেই মুনাফায় অনেক জমি ক্রয় করেন বা নিলামে ডেকে একজন মাঝারি ধরণের জোতদারে পরিণত হয়।

এই অঞ্চলের জোতদারদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পেরেছি যে, সবাই যে জঙ্গল পরিষ্কার করে জোতদারে পরিণত হয়েছে তা নয়। অনেকে আবার কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেও টাকা পয়সা উপার্জন করে সুযোগ বুঝে নিলামে জমি ক্রয় করে প্রচুর জমির মালিক হন। যেন জল্পেশের জোতদার লক্ষ্মীকান্তসেন, তিনি বর্তমানের নদীয়া থেকে জল্পেশে আসেন। তিনি প্রথমে দলিল লেখক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার সুদের ব্যবসাও করেন। উভয়ের মূলধনে তিনি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কয়েকশত একর জমির মালিক হন। অপর আর এক জোতদার মুসব্বর বসুনীয়া (আমগুড়ি) চাকুরী ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা ৩৪০০ একরের বেশি জমির জোতদারে পরিণত হন। অন্যান্য জোতদারগণও ঠিক এই ভাবে জঙ্গলভেঙ্গে নিলামে ডেকে এবং ক্রয় করে ছোট বড় এবং মাঝারি জোতদারে পরিণত হন। জমির সঙ্গে খাজনার সম্পর্কটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক জোতদারের জমি নিলামে বিক্রি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল খাজনা বাকি। খাজনা ঠিকমত সময়ে না দেওয়ার কারণে অনেকেরজমি নিলামে ওঠে। সেই নিলামের জমি ক্রয় করে কিছু পয়সাওয়ালা ব্যক্তি জোতদারে পরিণত হন।

এখন দেখা যেতে পারে জোতদারগণ কি পরিমাণ জমির জন্য কত টাকা খাজনা দিত। নীচের সারণী থেকে ধারণাটি পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে।

জোত/তৌজী নং	অবস্থান	টাকা	জমির খাজনা (একরে)
১০২৮ নং জোত	......তালুক চুড়াভাণ্ডার	....২১৬	.......১৬·৫১
১০২৩ নং জোত	......তালুকা চুড়াভাণ্ডার	......২১৬	........১৭·৫৫
৪৮৯ নং জোত	..........তালুকা বেতগাড়া	.....৪৮৮ দ/২	.....৩০৫·১৬
৪৮৯ নং জোত	..........তালুক ঝাড়বড়গিলা	....৬২৭।। দ/১১	....৪১৭·৮৬

৫৫৬ নং জোত	তালুক চাপগড়	১৬৮ দ ৯৩	১০৫.৫৯
১৫৩২ নং জোত	তালুক কটকতাড়ী	১৭৩ দ	৭০.৪৪
৫০ নং জোত	তালুক উত্তর মাটিয়ালী	১৮৭।।	৬৬.২৮
১৩৪৩ নং জোত	মাধব ডাঙ্গা	১১০।.	৪২.০৬
১ নং তৌজী	প্রসন্নদেব রায় জোত বৈকণ্ঠপুর	৮০ দ ৯	৩২.৬২
১৪৩৬ নং জোত	ঝাড় অলতাগ্রাম	২১৬	৮৫ নং (ভূটান খাস মহল)
৪৮০ নং জোত	বেতগাড়া	১৬১ দ ৯	৬২.৮১

১৯৪০ এর দশকের পূর্বাবধি জোতদারদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ডুয়ার্সের জোতদারগণ জমি ও আধিয়ার বা প্রজার ওপর নির্ভর করেই চলত। জোতদার হয়েও আধিয়ার বা প্রজার ওপর নির্ভর করার কারণ হল, সেই সময় জমির তুলনায় লোক সংখ্যা ছিল খুবই কম। প্রজা বা আধিয়ারের অভাবে অনেক জোতদারের জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধিয়ার বা প্রজাকে কিছু লোভ লালসা দিয়ে জমিতে বসাতে হত। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ডুয়ার্সের জোতদার গণ প্রজা বা আধিয়ারদের নিজের এক জনের মতই দেখত। সেই সময় আধিয়ার এবং জোতদারদের অবস্থা ভালোই ছিল। শুধু তাই নয় সমাজে জোতদার গণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ১৯৪০ এর পরে জোতদারী ব্যবস্থার ওপর আঘাত আসতে শুরু করে। এক দিকে জোতদারগণ বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে এবং অপর দিকে আধিয়ার বা প্রজা সমাজ কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দুর্বিসহ জীবন-যাপন আরম্ভ করে।

আধিয়ার বা প্রজা সমাজ জোতদারদের শোষণ ও অত্যাচারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আধিয়ার সমাজের মধ্যে ছিল দারিদ্র, জোতদারদের বিরুদ্ধে ছিল ক্ষোভ। কিন্তু এই ক্ষোভ প্রকাশের হাতিয়ার তাদের ছিলনা। এই অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাবার জন্য কৃষকরা সংগঠিত হওয়া শুরু করে, এবং প্রতিবাদ হিসাবে "গাণ্ডী" বা তোলা[৫] বন্ধের আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের দাবী ওঠে "সামন্তবাদ" ও "সাম্রাজ্য উচ্ছেদ"।

ইহার পর শুরু হয় সমগ্র উত্তর বঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)[৬]। তে-ভাগা আন্দোলন ডুয়ার্সের কৃষক সমাজের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছিল এবং এখানকার জোতদার সমাজের ভীতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ডুয়ার্স অঞ্চলের

মালবাজার, মেটেলী, পাটগ্রাম নাগরাকাটা, বাতাবাড়ি এমনকি গয়ানাথ বর্মনের[৭] বাড়িতেও তে-ভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ডুয়ার্সে তে-ভাগা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেন তারা হলেন সমর গাঙ্গুলী, পটল ঘোষ, ননীভৌমিক, লোধরা বুড়ো, টুনিয়া, ফুকিমুণ্ডা, জগন্নাথ ওরাও, ফাগু ওরাও, অর্জুন ওরাও, আমগুড়ির বচরাতেলী, গদরু রায় ও করণচাঁদ রায় (চৌকিদার), ময়নাগুড়ির ললিত চৌধুরী।[৮]

তে-ভাগা আন্দোলনের পর জোতদারী প্রথার উপর আইনগত ভাবে আঘাত আসে। ১৯৪৫ সনের "দি বেঙ্গল অ্যাডমিনিসট্রেটিভ এনক্যুইরি কমিটি" তৎকালীন জোতদারী প্রথাকে সেকেলে এবং ভূ-সম্পদ ও জলসম্পদ সদ্ব্যবহারের পক্ষে পরিপন্থী বলে মত দেয়'। "দি এগ্রেরিয়ান রিফর্ম্স কমিটি একই ধরনের মতামত দিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জোতদারী প্রথা অবসানের জন্য "দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেট এক্যুইজিশন অ্যাক্ট ১৯৫৩ পাশ করে।[৯] ১৯৫৫ সনের ভূমি সংস্কার আইন" অনুযায়ী জমির মালিকদের জমির উর্দ্ধসীমা ২৫ একর নির্ধারিত হয়, এর ফলে দেখা যায় বহু জোতদারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯৫৫-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যারা এক সময় জোতদার হিসাবে পরিচিত ছিল বর্তমানে তাদের উত্তরাধিকারীগণ কেউ ক্ষুদ্র কৃষক কেউ বা দীনমজুরী, কারো ছেলে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে জীবিকার সন্ধানে। দু একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটি জলের মত পরিষ্কার হবে। মুসব্বর বসুনীয়ার পৌত্র গিরিন্দ্র নাথ বসুনীয়ার জমির পরিমাণ ১০ থেকে ১২ একর। কালসিং বসুনীয়ার ছেলে কলিন বসুনীয়ার জমির পরিমাণ ১৫ একর। হাজি নছরুদ্দীনের পৌত্র আব্দুল ওয়াহেদের বর্তমান জমির পরিমাণ বাড়ির ভিটা (বাস্তু)। তার বর্তমান অবস্থান দীন মজুর।

ডুয়ার্সে জোতদারী প্রথা অবসানের পর তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার কয়েকটি কারণ নীচে আলোচনা করা হল।

১। "১৯৫৫ সনের ভূমি সংস্কার আইন" অনুযায়ী জোতদারদের জোতদারী প্রথা তাসের ঘরের মত করে ধ্বংস হবে তাহা কোন দিনই তারা ভাবতে পারে নাই। জোতদারী প্রথার ওপর পর্যায় ক্রমে বংশ পরম্পরায় নির্ভরশীলতা তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী।

২। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, জোতদারদের ছেলে মেয়েগণ কখনই লেখাপড়ায় অগ্রসর হতে পারে নাই। লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে জোতদারদের একাংশের ছেলেমেয়েগণ জোতদারী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত। সুতরাং জোতদারদের আর্থিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

৩। অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, যে কোন্ কোন্ জোতদারের ছেলেমেয়ে ১০ থেকে ১৫ জন; কিন্তু তাদের জমির উর্দ্ধসীমা হল পরিবার প্রতি ২৫ একর। ১৯৫৮ সালের পর জোতদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন বলবৎ হয়। সুতরাং পরবর্তী কালে ঐ ২৫ একর জমি বন্টন হলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়।[১০]

৪। ডুয়ার্স এলাকার বেশির ভাগ জমিই হল সেচবিহীন এবং চা-বাগিচা চাষের উপযোগী। সেচপূর্ণ ও সেচবিহীন এলাকার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমানে এক একর জমিতে ধান উৎপাদন হয় প্রায় ৯০ মন কিন্তু ডুয়ার্স অঞ্চলের আবাদী জমিতে উৎপাদন হয় গড়ে ১২ থেকে ১৫ মন। সুতরাং ডুয়ার্স অঞ্চল ও রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের ভূমি বন্টন ব্যবস্থা ডুয়ার্সের জোতদারদের অর্থনৈতিক দূরবস্থার অপর একটি কারণ।[১১]

৫। ডুয়ার্সের অধিকাংশ জোতদারদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ছিল জমি। সেই জমিও আবার বেশির ভাগই ছিল প্রজা বা আধিয়ারের হাতে। জোতদারগণ সর্বসাকুল্যে বড়জোড় ২ থেকে ৩ (তিন) হল জমি নিজে চাষ করত। তারা ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করার চেষ্টা কোন্ দিনই করেনি। সুতরাং জোতদারী প্রথা ধ্বংসের পর তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙার অপর একটি কারণ বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

৬। সরকারী তরফ থেকে জোতদারদের কাছ থেকে যে জমি খাস করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইনগত নির্দেশ থাকলেও সরকারী আমলাদের টালবাহানার দরুণ সময় মত ক্ষতিপূরণের টাকা না পাওয়ায় তৎকালীন জোতদার গণ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিন বছরের মধ্যে ক্ষতি পূরণ নির্ণয় তালিকা প্রণয়নের আইনে প্রাথমিক নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে আইন করিয়া উহাও বিলম্ব করা হয়, কি হারে কোন্ সময়ে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে তাহারও সঠিক হদিস মিলিতেছেনা। উপরন্তু জমিদারী গ্রহণ আইনের ১০(২) ধারা ও ৭ নিয়মের নোটিশ জারী করিয়া ১৩৬২ সনে খাস জমির উপর একর প্রতি ১০ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশ দিতেছে। খাস জমির বাবদ ক্ষতিপূরণ না দিয়া পাল্টা ঐ জমির বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় কোন্ আইন বা যুক্তিবলে সমর্থন যোগ্য তাহা দুবোর্ধ্য।[১২]

৭। প্রাক্তন ভূম্যধিকারীগণ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ বাবদ পর্যাপ্ত টাকা পাইতে হক্‌দার হইলেও ঐ সকল জোতদারগণের কৃষি আয়কর আদি রাজস্ব রূপী টাকার জন্য নোটিশ জারী করিয়া তাহাদের অস্থাবর মালামাল, গরুবাছুরাদি ক্রোক ও নীলামে বিক্রয় করিয়া সরকারী প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতেছেন, কিন্তু সরকার নিজের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেনা পরিশোধের কোনই ব্যবস্থা করিতেছেন না। উভয়পক্ষের দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ হইলেই গরীব জোতদার বাঁচিয়া যায়, অন্যথায় সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য।[১৩]

৮। জোতদারী প্রথা অবসানের পর কৃষিজীবী রায়ত শ্রেণী হইতে লেভী প্রথায় ধান্য আদায়ের নীতি সরকার ঘোষণা করেছে এবং ধান্যের মূল্যের উপর দ্বিধা-বিভক্ত নীতি এবং সাম্প্রদায়িক রেট প্রয়োগ করা হয়েছে তাহাতে অধিক শস্য ফলনের কাজে কৃষিজীবিগণ হতাশ হইয়া পড়িতেছে।[১৪] বড় চাষী অর্থাৎ জোতদারের অধীনস্থ, বর্গাদারের গৃহীত করজা শোধ করিয়া সমস্ত ধান জোতদারের গোলায় দিয়া আসিতে হয়। পুনরায় পাটবপন এবং ধান্য রোপনের সময় জোতদারের গোলা হইতে করজা বাবদ ধান আনিতে হয়। কিন্তু সমস্যা হইল জোতদারের গোলায় এই সমস্ত ধান দেখিতে পাইয়া যদি সরকার সীজ করিয়া লইয়া যান তাহা হইলে বর্গাদারদের অনাহারে মরিতে হইবে, অনাহরে থাকিয়া তাহাদিগকে অধিক ফসল ফলানোর আসা আর করিতে হইবেনা।[১৫] এর ফলে বর্গাদার আধিয়ারা বা জোতদারদের অর্থনীতির উপর দারুণ প্রভাব পড়িয়া যায়।

তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৫-৪৬), ভূমিসংস্কার আইন (১৯৫৫) এবং অপারেশন বর্গা (১৯৭৮) ডুয়ার্সের জোতদারী ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলায় জোতদার ও আধিয়ার বা প্রজার সম্পর্ক ছিল শোষক ও শোষিতের, কিন্তু ডুয়ার্স অঞ্চলে ১৯৫০ এর দশকের শুরু পর্যন্ত জোতদার আধিয়ার সম্পর্ক ছিল সুমধুর।[১৬] জোতদার এবং আধিয়ার একে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা ছিল স্বাভাবিক। তার প্রধান কারণ হল জোতদারদের জমি চাষের জন্য প্রধান সম্বল ছিল আধিয়ার বা প্রজা। কোন জোতদারের আধিয়ার বা প্রজা না থাকলে তার অধিকাংশ জমিই অনাবাদি থেকে যেত। তাই কোন্ কোন্ জোতদার প্রয়োজনে আধিয়ারকে অনেক লোভ লালসা দিয়ে নিজের জমিতে বসাতে দ্বিধা করত না। অপর দিকে যেহেতু সেই সময় জমিই ছিল একমাত্র বেঁচে থাকার সম্বল তাই আধিয়ার বা প্রজাগণ জোতদারদের জমির প্রলোভনে বা অন্যান্য কিছু বাড়তি প্রলোভনের জন্য তাঁদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

তে-ভাগা আন্দোলনে আধিয়ার বা প্রজা কে লাভবান হয়েছে কে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাহার সঠিক মূল্যায়ণে গবেষণার দরকার। কিন্তু জোতদারী ব্যবস্থা অবসানের পর (১৯৫৫) ষাটের দশকে দেখা যায় এই ভূমি হারানো জোতদারগণ ডুয়ার্স এলাকায় তাদের হারানো জমি উদ্ধারের চেষ্টা করে। তার কারণ ও অবশ্য স্পষ্ট। রাজবংশী সমাজ পুরোপুরি একটি ভূমি নির্ভর সমাজ।[১৭] স্বাভাবিক ভাবেই ভূমি দখল আন্দোলন তাঁদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ভূমি এই অঞ্চলে তখনও সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবেই বিবেচিত হত। তাই তাঁরা রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয় এবং 'উত্তর খণ্ড' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। ডুয়ার্স এলাকায় এই দল জোতদারদের পার্টি বলে পরিচিত। এই আন্দোলনকে অনেক ঐতিহাসিক উত্তরবঙ্গের প্রথম

নৃ-গোষ্ঠীভিত্তিক আঞ্চলিক দল বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৬৯ সালের ৫ জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার জল্পেশ মন্দির প্রাঙ্গনে এই দলের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই দল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চানন মল্লিক কলীন্দ্রনাথ বর্মন, সুমা ওঁড়াও, ওরাজ উদ্দীন আহ্‌মেদ, রবি সরকার, সম্পদ রায়, রুক্মিনী রঞ্জন রায় প্রমুখেরা।[১৮] 'উত্তরখণ্ড' আন্দোলন ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে জোতদার আধিয়ার জমির সঙ্গে জড়িত এই দুইটি শ্রেণীর মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জোতদারী অবসান এবং "অপারেশন বর্গার' পর আধিয়ার বা প্রজার সঙ্গে জোতদারের সম্পর্কের অনেকটা তফাৎ হয়ে দাড়ায়। যে সব প্রজা বা আধিয়ার বর্গা আইনে জমি পেয়েছে তারা অধিকাংশই কিন্তু পরবর্তীকালে সেই জমি ধরে রাখতে পারে নাই। তার কারণ হল জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সব উপকরণ যেমন গরু রোপনের জন্য অগ্রিম খাওয়া বাবদ ধান ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা জোতদার গণ দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে এমনকি জোতদার গণও নিজেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সূত্র-নির্দেশ

১। মধুপর্নী : জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা : ১৩৯৪ : সম্পাদনা অজিতেশ ভট্টাচার্য, সংখ্যা সম্পাদক : ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

২। শ্রী উপেন্দ্র নাথ বর্মন *উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি*।

৩। মধুপর্নী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা - ১৩৯৪ : সম্পাদনা অজিতেশ ভট্টাচার্য সংখ্যা, সম্পাদক : ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ।

৪। *ইতিহাস অনুসন্ধান নং-১৭*. সম্পাদনা : গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

৫। *ইতিহাস অনুসন্ধান নং-১৭*-সম্পাদনা : গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

৬। ঐ

৭। দেবেশ রায় *তিস্তা পারের বৃত্তান্ত*।

৮। কুনাল চট্টোপাধ্যায় *তে-ভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*।

৯। *ইতিহাস অনুসন্ধান নং-১৭*-সম্পাদনা : গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

১০। ঐ

১১। ঐ

১২। ত্রিস্রোতা : ৩০.১১.১৯৫৮

১৩। ঐ

১৪। জনমত : ০১.১১.১৯৬৫

১৫। ঐ

১৬। কিরাত ভূমি : জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (১৮৬৯-১৯৯৪) সম্পাদনা : অরবিন্দ কর।

১৭। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ উত্তরখণ্ড আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ)।

১৮। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইতিহাস (১৮৬১-১৯৯৪) (প্রবন্ধ) ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও ডঃ রত্না রায় সান্যাল।

১৯। সাক্ষাৎকার ব্যক্তিগণের পরিচয়

ক) চিত্ত রঞ্জন রায়, রথেরহাট, বয়স-৪৫, তাং- ৯.১০.২০০৩

খ) ললিত রায়, রথের হাট বয়স-৬৫, তাং-৯.১০.২০০৩

গ) শরৎ চন্দ্র রায়, রথের হাট, বয়স-৫৫, তাং-৯.১০.২০০৩

ঘ) রতন অধিকারী বয়স-৬০, ধওলাগুড়ি ১১.১১.২০০৩

ঙ) মহেন্দ্র নাথ রায় বয়স-৫৭, আমগুড়ি ১৫.১১.২০০৩

চ) কলিন্দ্র নাথ বসুনীয়া, বয়স-৮০, আমগুড়ি ২০.১২.২০০৩

ছ) অরুণ চন্দ্র বসুনীয়া বয়স-৪৫, আমগুড়ি, ২০.১২.২০০৩

জ) আব্দুল ওয়াহেদ বয়স-৭৫, আমগুড়ি ২৫.১২.২০০৩

ঝ) মহেন্দ্র নাথ সেন বয়স-৬২, জল্পেশ ৩০.১২.২০০৩

ঞ) মহেশ চন্দ্র সেন বয়স-৫৯, জল্পেশ ৩০.১২.২০০৩

ট) ভোলা নাথ দাস বয়স-৫৭, ময়নাগুড়ি ০১.০১.২০০৪

২০। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করেছেন, আনন্দ গোপাল ঘোষ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতা—উত্তর বাংলার যুব আন্দোলন

দোয়েল দে

"যুব সম্প্রদায় হল গোটা সমাজের সবথেকে সক্রিয় আর সবচেয়ে সজীব শক্তি। শিক্ষা গ্রহণে তারা সবথেকে বেশী আগ্রহী আর তাদের চিন্তাধারা সবচেয়ে কম রক্ষণশীল, সমাজ তান্ত্রিক যুগে এ কথাটা বিশেষ রূপে সত্য।" তাই "তাদেরকে সাধারণ লোক হিসাবে দেখা কিংবা তাদের বৈশিষ্ট গুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।"[১]"............একমাত্র যুবকদের এবং সমস্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও তাদের স্বহস্তের কাজেই কয়েক দশকের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পারে"[২] মাও-সে-তুং এর এই উদ্বৃতিটির সূত্র ধরে একথা বলা যেতেই পারে যে, দেশ ও সমাজ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কাঠামো যুব সমাজের দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। উনবিংশ শতকে বাংলার ইতিহাসে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী কিংবা বিংশ শতকের নকশাল পন্থী যুব আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯৪৭ এর ভারত বিভাজনের প্রভাব সবথেকে বেশী পড়েছিল পাঞ্জাব আর বাংলাদেশের উপর। বিভাজন শুধু এই দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিভাজনের সীমাবদ্ধ রইল না; এই বিভাজন এই দুই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক এবং বিশেষত সাংস্কৃতিক জীবনকে তোলপাড় করে দিয়েছিল। যার প্রভাব এই দুই অঞ্চলে কয়েক দশক পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়।

দেশবিভাগের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, স্রোতের মতন এপার বাংলায় প্রবেশ করে। অনিবার্য ভাবেই যাদের ঠাঁই হল উদ্বাস্তু শিবিরে। এর ফলে শুধু যে জনসংখ্যারই অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটল তাই নয়, অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হল, দারিদ্র আর বেকারত্ব বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর যুবসমাজ দেখল, "তাদের দেশ, সমাজ দীর্ণ, দ্বিধাবিভক্ত। দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের ছাল চামড়া ওঠে গিয়ে এক পচা গলা শবদেহ এই ত্রিকোণ মানচিত্রের মহাশ্মশানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। হতভাগ্য স্বদেশে ভ্রষ্ট, নষ্ট কিছু আগ্রামী মানুষ বেপরোয়া লুটতরাজ চালাচ্ছে।"

............."কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছিল গড়ে তোলা হবে এক সুখী, সমৃদ্ধ দেশ আর জাতি।[৩] কিন্তু স্বপ্ন আয় বাস্তবের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই অবক্ষয়ের চিহ্ন ছিল বর্তমান। উদ্বাস্তু শিবির গুলি ছিল এই অবক্ষয়ী অবস্থার জ্বলন্ত উদহরণ। দিনের পর দিনের অকর্মন্যতা, বেকারত্ব, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা সবথেকে বেশী প্রভাব ফেলল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাংলার যুব সমাজের একটা

বড় অংশ সহজেই সমাজের চোরাস্রোতে বিলীন হয়ে গেল। অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশ ও জয়ন্ত কুমার রায় এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলার তথাকথিত গুণ্ডা বা সমাজ বিরোধীদের একটা বড় অংশই এসেছে মূলত উদ্বাস্তু শিবির থেকে।[৪] আর যারা এই চোরাস্রোতে থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল, তারা সহজেই জড়িয়ে পড়েছিল যে কোন আন্দোলনে। এক্ষেত্রে আন্দোলনের মূল্যবোধের থেকে বয়স জনিত উদ্দামতা আর কিছু করে দেখাবার স্বপ্নই ছিল এর মূলে, আর তাতেই উদ্বাস্তু শিবির গুলি হয়ে উঠেছিল "সংগ্রামের এক একটা দুর্গ"। আর অনিবার্য ভাবেই মধ্যবিত্ত যুব সম্প্রদায়ও জড়িয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনগুলিতে। কারণ বেকারত্বের জ্বালায় তারাও ছিল জর্জরিত। এই ভাবেই ক্রুদ্ধ, উদ্বাস্তু যুব সম্প্রদায়ের সাথে এপার বাংলার মধ্যবিত্ত যুবকরা মিলে তখন একটা বেশ সংগঠিত যুবশক্তি গড়ে তুলেছিল। এই ভাবেই স্বাধীনতা উত্তর গণ আন্দোলন একটা বিশেষ রূপ লাভ করে।

স্বাধীনতার পর এক বছরের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষেরও বেশী হিন্দু উদ্বাস্তু পূর্ব বঙ্গ থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভিটে মাটি হারানো এই মানুষ গুলোর জন্য বা তাদের দাবী নিয়ে তখনও কোনও বড় আন্দোলন সংগঠিত হয় নি। তৎকালীন বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের মূলে ছিল যুব সমাজের নানাবিধ অসন্তোষ। যেমন—১৯৪৯ এর ১৪ই জানুয়ারী একটি উদ্বাস্তু মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চালানোর প্রতিবাদে একটি সভা ডাকলেন বামপন্থীরা[৫]। এই ঘটনার কিছু পরে ১৭ই জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক পথসভার পর হঠাৎই উত্তেজিত জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল করতে চাইলে পুলিশ প্রথমে লাঠি চালায় ও পরে কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছোঁড়ে। প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা ট্রামে বাসে আগুন লাগান[৬] এই সব ঘটনাগুলি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম দিককার সেই বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সব আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের কোন বড় জয় হয় নি। বরং উদ্বাস্তু আন্দোলন সফল হয়েছে পঞ্চাশের দশকে সংগঠিত প্রতিবাদের মাধ্যমে।

পঞ্চাশের দশকে অবস্থান, ঘেরাও, আইন অমান্য ইত্যাদির মাধ্যমে গণ আন্দোলন একটি বিশেষ রূপ লাভ করে যার অন্যতম প্রধান শক্তির উৎস ছিল যুব সমাজ। সেক্ষেত্রে বাস্তুহারা মানুষের নানাবিধ দাবির পাশে নানা নাগরিক দাবিও উঠে এসেছে। আর আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে সামনে এসেছে উদ্বাস্তু নয় এমন পরিবারের যুবকরাও। ফলে পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলার যুব আন্দোলন গণ আন্দোলনের সাথে একাকার হয়ে গণ আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তুলেছে। ১৯৫৩ সালের ট্রামভাড়া বিরোধী আন্দোলন ছিল এরই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই "এক পয়সার লড়াই" যা একমাস ধরে জনজীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, তাতে ছাত্রতথা যুব সমাজের ভূমিকাই

ছিল প্রধান। হীরেন দাসগুপ্ত লিখেছেন, "জুলাই এর প্রথম ধর্মঘটের পর আন্দোলনে 'কেমন যেন একটা শিথিলতা এসে গিয়েছিল।' নেতারা তাই নতুন পথ খুঁজতে থাকেন এবং ছাত্রদের দিয়ে লাগাতার ধর্মঘট করিয়ে আন্দোলনে একটা নতুন জোয়ার আনার চেষ্টা করা হয়"[৭] কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের মুখপাত্র "Student" ঐ দিন গুলিকে "Seventeen days that shook calcutta" বলে অভিহিত করেছন।[৮] এছাড়া আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্দোলনের নেতৃবর্গের অধিকাংশই একসময় সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, যাদের স্মৃতিতে অগ্নিযুগের অতীত তখনও উজ্জ্বল। ফলে তারা আন্দোলনকে একটা মারমুখী চেহারা দিয়ে কলকাতাকে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনের প্রধান দাহিকা শক্তি ছিল তৎকালীন যুবসমাজ—বিশেষত উদ্বাস্তু যুবসমাজ।[৯]

ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঠিক পরের বছরই শুরু হয়েছিল শিক্ষক আন্দোলন। "নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি"র নেতৃত্বে এই আন্দোলনের দাবি ছিল "মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন বাড়াতে হবে এবং মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে ৩৫ টাকা।" এই দাবি নিয়ে শিক্ষকরা সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট আরম্ভ করেন। ঠিক তার পর দিন থেকেই বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ, পথ অবরোধ ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলন "শিক্ষকদের আন্দোলন" হলেও তাদের দাবির সমর্থনে সেই সব কিশোর, তরুণের দলই রাস্তায় নেমেছিল যারা ঠিক তার আগের বছরের ট্রাম পোড়ানোর আন্দোলনের পুরভাগে ছিল। ১৬ ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত গণ মিছিলের সমর্থনে যত মানুষ সমবেত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল কোলকাতায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪র Statesman পত্রিকার শিরোনাম ছিল "Widespread violence in Calcutta"[১০] সেখানে মিছিলের যে ছবি দেখা যায়, তার অগ্রভাগে যদিও ছিলেন মধ্যবয়সী শিক্ষক-শিক্ষিকারা;কিন্তু তার পেছনে এবং আশেপাশে ছিল এক যুব-বাহিনীই। এইভাবে ১৯৫৪র শিক্ষক আন্দোলনও এক গণ আন্দোলনের রূপ পেয়ে যায়।[১১]

উল্লেখ্য যে, ট্রাম-বাস পোড়ানোর যে ট্র্যাডিশন ১৯৫৩ র " এক পয়সার আন্দোলনের" মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, তা এই সময়ও অব্যাহত ছিল। ১৭ই ফেব্রুযারী স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায়, ট্রাম বাস না চলায় কলকাতা কার্যত বন্ধের চেহারা নেয়। ১৬ এবং ১৭ তারিখের পুলিশী আক্রমণে নিহত হয়েছিল যে ৭ জন তারা প্রত্যেকেই ছিল কোন না কোন অর্থে ছাত্র। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা উত্তর যে কোন বিক্ষোভ আন্দোলনই খুব সহজে গণ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল, আর তাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল ছাত্র যুব সম্প্রদায়। "পুলিশের সাথে লড়াই" যেন একটা ট্রেন্ড এ পরিণত হয়েছিল, যা আরও ব্যাপক, আরও প্রমত্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলনে।

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯)। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকেই চলছিল খাদ্য সঙ্কট। একদিকে উৎপাদন, সংগ্রহ আর সরবরাহ ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতা আর অন্যদিকে

চোরাকারবারী দের দৌরাত্ম্য পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতির সৃষ্টি করে। আর এই ঘাটতির সাথে যুক্ত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের চাপ, খাদ্যের দাবীতে ছোট ছোট আন্দোলন স্বাধীনতার পর থেকেই চলছিল, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হল ১৯৫৯ এর ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। আগষ্ট মাস থেকেই (১৯৫৯) আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। খাদ্যের দাবীতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। ২৬ শে আগষ্ট হাওড়া, শ্রীরামপুরের গণ বিক্ষোভের উপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে।[১২] ২৭ তারিখ বিক্ষোভ দমন করা হয় ডায়মন্ডহারবারে।[১৩] এমতাবস্থায় ৩১ শে আগষ্ট রাইটার্স অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা রাজনীতির বা মতাদর্শের সীমা ছাড়িছে তাতে যোগ দিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আর স্বাভাবতই তাদের বহুকালের জমা রাগ আর ঘৃণার প্রকাশ হল নানা ধরনের হিংসাত্মক নাশকতামূলক কাজের ভেতর দিয়ে। আর এই আন্দোলনে জঙ্গী ভূমিকা নিয়েছিল বেকার, বঞ্চিত ছিন্নভিন্ন যুব সমাজ। তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তথাকথিত "রাস্তার ছেলে" আর সমাজ বিরোধীরা।[১৪]

খাদ্যের দাবীতে ১৯৫৯ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৬৬ র গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। তবে এক্ষেত্রে শুধু খাদ্যই নয়, সাথে জ্বালানীতেল ইত্যাদির দাবীও ছিল প্রবল। এই সব দাবী নিয়ে ১৯৬৬ র ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই মফস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী বসিরহাটের স্বরূপ নগরে পুলিশের গুলিতে নুরুল ইসলাম নামে এক কিশোরের মৃত্যু হলে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নিতে আরম্ভ করে।[১৫] এরপর আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। উল্লেখ্য যে সব জায়গাতেই যারা খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে শহিদ হন তারা অধিকাংশই ছিলেন কিশোর, ৯ মার্চ এর বসুমতী পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল—"হে শোকার্ত বঙ্গ জননী, আনন্দ আর ফিরিবে না। পশ্চিমবাংলা হইতে আনন্দ বিদায় লইয়াছে। গণতন্ত্রের কবর খোঁড়া হইয়াছে ....আনন্দ নরুল প্রভৃতি কিশোরেরা সেই গণতন্ত্রের কবরে শায়িত।[১৬] প্রফুল্ল চক্রবর্তী যথার্থই এই আন্দোলনকে "Revolt of the teen agers" বলেছেন।[১৭] তাঁর মতে পঞ্চাশ দশকের আন্দোলনের মতো এবারও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল উদ্বাস্তু কলোনীর ক্রুদ্ধ যুবসমাজ আর তথাকথিত "লুম্পেনরা।" তবে শুধু কলোনির যুবক বা রাস্তার ছেলেই নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের স্কুল বা কলেজে পড়া ছেলেরাও ছিল সমান বেপরোয়া, আর অই ১৯৬৬-র গণ আন্দোলন ছিল "পরিকল্পনাহীন" এবং "নেতৃত্বহীন" কিন্তু "স্বতঃস্ফূর্ত"[১৮]। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ যেমন বোমা ছোঁড়া, অগ্নিসংযোগ কিংবা সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের মতন কাজে কলকাতার ভাল কলেজের ছাত্রদের এই সময় বিশেষ

পাওয়া যায় না। তারা আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল করেছিল, কবিতা লিখেছিল, পথ অবরোধও করেছিল, কিন্তু পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মূলতঃ অংশ নিয়েছিল রাস্তার ছেলেরা বা তথাকথিত "লুম্পেনরা"। এদের কারো কারো হয়ত স্কুল কলেজের খাতায় নাম ছিল, কিন্তু সমাজের চোখে তারা ছিল রকবাজ ছেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি এদের সুকৌশলে বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছিল। নিজেরা পেছনে থেকে পুলিশের সামনে লেলিয়ে দিয়েছিল সব হারানো এই কিশোর বা যুবকদের। আর তারাও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। তাই স্বতঃস্ফূর্ততার পেছনে একটা রাজনৈতিক বাতাবরণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক হরসবমের মতে, যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান যে কোন দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা "Starter" এর কাজ করে।[১৯] আর ১৯৬৬-র গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে এই বিশ্লেষণ অনেকটাই মিলে যায়। কারণ খাদ্যের দাবীতে শুরু হলেও এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে, প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জন জাগরণের রূপ নিয়েছিল। তাই দাবীটা শুধু খাদ্যের ছিল না, ছিল শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনেরও।[২০]

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলার যুব আন্দোলনের একটা নির্দিষ্ট ধরণ আছে। প্রথমত তা কোন না কোন গণ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের দাবী এবং মূল গণ আন্দোলনের দাবী মোটামুটি ভাবে ছিল এক ও অভিন্ন এবং প্রথম পর্যায়ে তা একটি নির্দিষ্ট দাবী হিসাবে থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা পরিচালিত হয় মূলত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। তৃতীয়ত তখনকার আন্দোলন বলতে বোঝাত মূলত মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ব্যারিকেড লড়াই—ইত্যাদি। এই মিছিলের পরোভাগে থাকত সাধারণত মধ্যবিত্ত যুবসমাজ। কিন্তু যখনই মিছিল গতিরুদ্ধ হচ্ছে তখনই তাতে গতি সঞ্চার করতে এগিয়ে আসছে অন্য এক সম্প্রদায়, চলতি ভাষায় "লুম্পেন" বা তথাকথিত সমাজ বিরোধীরা আর গুণ্ডারা। এই বস্তি বা ঝুপড়িবাসী বা রাস্তার ছেলেদের একটা বড় অংশ এসেছিল মূলত উদ্বাস্তু শিবির গুলি থেকে। তাদের ছিন্ন ভিন্ন কৈশোরের ও প্রতারিত যৌবনের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা, হতাশা আর ক্রোধের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রাজনৈতিক স্রোতে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের মধ্য দিয়ে। তাই যে কোন দলের কাছেই তারা ছিল এক দুর্জয় শক্তি,কারণ যে কোন আন্দোলনকে একটা জঙ্গীরূপ দান করতে তারা ছিল অপরিহার্য।

এইভাবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলার বিভিন্ন গণ আন্দোলন ও তাতে যুব সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান পরবর্তী একটি বৃহত্তর আন্দোলনের (নকশাল আন্দোলন) ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছে। এই নকশাল আন্দোলন কয়েক বছরে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ভিত্তি ছিল স্বাধীনতাউত্তর এই গণ আন্দোলনগুলি।

সূত্র-নির্দেশ

১। মস্কোতে চীনা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানবীসদের সাক্ষাৎদান কালে প্রদত্ত ভাষণে (১৭ই নভেম্বর, ১৯৫৭) সভাপতি মাও-সে-তুঙ্‌-র উদ্ধৃতি, নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, ১৯৯৩।

২। তদেব

৩। শৈবাল মিত্র, ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, শীতসংখ্যা, কলকাতা, ১৯৮৭

৪। Suranjan Das and Jayanta Kumar Roy , *The goondas* : *Towards a Reconstruction of calcutta under world,*

৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৯

৬। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৯

৭। হীরেন দাস গুপ্ত ও হরিনারায়ণ অধিকারী, "*রাজনৈতিক পটভূমিতে ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন*", কলকাতা, ১৯৯৩

৮। হীরেন দাসগুপ্ত, প্রাগুক্ত

৯। Prafulla Chakraborty, '*The Marginal Men, Calcutta*, 1990

১০। The Statesman, 17 February, 1954

১১। The Statesman, 17 February, 1954; হীরেন দাসগুপ্ত, প্রাগুক্ত; বারীন রায়, "*ছাত্র অন্দোলনের ধারা*", পি এস ইউ ১৯৬০।

১২। The Statesman, 27 August, 1959

১৩। The Statesman, 28 August, 1959; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ আগস্ট, ১৯৫৯

১৪। প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত,

১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

১৬। দৈনিক বসুমতী, ৯ মার্চ, ১৯৬৬

১৭। প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত,

১৮। তদেব

১৯। E.J. Hobsbawm "*Cities and Inrurraction*" *in* "*Revolutionaries*", 1973

২০। পরিচয়, মাঘ, ১৩৭২

জন্মনিয়ন্ত্রণ বিতর্কে বাংলা সাময়িক পত্রের ভূমিকা

মৌসুমী মান্না

প্রস্তাবনা ঃ-

পড়ুয়া এবং তার্কিক বাঙালীর ভাব প্রকাশের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে সাময়িক পত্রের ভূমিকা বোধকরি সর্বজনগ্রাহ্য। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সমকালীন সমাজ-জীবন-সংপৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময় বাংলা সাময়িক পত্রের প্রবহমান বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতঃই, আধুনিক জন্মশাসন পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার পর তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্কের যে ঝড় ওঠে, তা একটু দেরীতে হলেও ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে এসে পৌছনোর পর বাংলায় এই বিতর্ক সঞ্চালনে সাময়িক পত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জন্মশাসন বিতর্ক প্রসঙ্গে বাংলা সাময়িক পত্রের প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার মূল সুর এই প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধ এমন এক বিষয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান যার উপাদন মূলত তিনটি ঃ জন্মশাসন বিতর্ক; এই বিতর্কে বাংলা সাময়িক পত্রের যোগদান; এবং তার মধ্য দিয়ে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষিত ও মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনন ও চেতনার পরিচয়।

বিতর্কের সূত্রপাত ঃ-

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস শুরু হচ্ছে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'মাসিক দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়।[১] পরবর্তীতে বাংলা সাময়িক পত্র অত্যন্ত দ্রুত এক জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সেকালের সাময়িক পত্রে এক বিশেষ আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল 'বিবিধ প্রসঙ্গ' কলম, যেখানে দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর মন্তব্য সহ প্রকাশিত হত।

জন্মশাসন বিতর্ক সাগর পেরিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌছয় ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। ঐ বছরেই ইংল্যান্ডে মালথুশীয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা হয়, এবং চার্লস নোলটনের 'ফ্রুট্‌স্ অফ্' ফিলসফী' পুনঃপ্রকাশের অপরাধে চার্লস ব্র্যাডল্য এবং অ্যানি বেশান্ত মহারানীর আদালতে আনীত হন।[২] ব্রাডল্য-বেশান্ত ট্রায়াল ইংল্যান্ডে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রেও এই ট্রায়ালের খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজের মুরুগেসা মুদালীয়ার মালথুশীয়ান লীগের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ম্যলথুশীয়ান লীগ ইংল্যান্ডে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। কিন্তু মূলত আর্থিক কারণে ইচ্ছা থাকলেও লীগ ভারতে তাদের কার্যাবলী তেমন বিস্তৃত করতে পারেনি। এরপর মোটামুটি ১৯২৫ খিষ্টাব্দের পর মূলত আমেরিকার বার্থকন্ট্রোল লীগের প্রতিষ্ঠাতা মার্গারেট স্যাঙ্গনারের উৎসাহ ও সহায়তায় ভারতের বিভিন্ন শহরে বার্থকন্ট্রোল

লীগ এবং ক্লিনিক গড়ে ওঠে। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ায় ইংল্যান্ডের বার্থকন্ট্রোল আন্দোলনের সক্রিয় নেত্রী এডিথ হার্ড-মার্টিন ভারতে আসেন। ঐ বছরেরই শেষের দিকে মার্গারেট স্যাঙ্গনার ভারতে এলে এদেশে জন্মশাসন নিয়ে প্রভূত ও বিস্তৃত আলোচনা শুরু হয়।

বাংলা সাময়িক পত্রেও এই সময়ে জন্মশাসন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা, খবর ও প্রবন্ধ ছাপা হয়, মোটামুটি ভাবে ১৯২৫ থেকে ১৯৪৫-এই বছর কুড়ি সময় কালে বাংলায় জন্মশাসন বিতর্ক রীতিমত জমে ওঠে। বর্তমান নিবন্ধেও মূলত এই সময়কালকে ধরা হয়েছে। নৃপেন্দ্রকুমার বসু-র দাবী অনুযায়ী বাংলা সাময়িক পত্রে জন্মশাসন সংক্রান্ত প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের রচয়িতা তিনিই—"১৩৩০ সালের মাঘমাসের 'স্বাস্থ্য-সমাচার' পত্রে 'জন্ম-সংরোধের আবশ্যকতা' শীর্ষক মৎলিখিত একটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হয়। ইতঃপূর্বে কোন বাংলা সাময়িক পত্রে বিশুদ্ধ ও বিশদভাবে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই।"[৩]

নৃপেন্দ্রকুমার বসু-এর পরেও স্বাস্থ্য-সমাচার পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এবিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। স্বাস্থ্য-সমাচার পত্রিকা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় কার্তিক চন্দ্র বসু-র সম্পাদনায়। এইরকম তথাকথিত ' স্পেশালাইজড্' পত্রিকায় জন্মশাসন নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিক। কিন্তু তথাকথিত সাহিত্য পত্র হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন কুলীন সাময়িক পত্রের জন্মশাসন বিতর্কে জড়িয়ে পড়া বিশেষ আগ্রহের উদ্রেক করে। তৎকালীন সমাজে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজন সাময়িক পত্রের এই চাপান-উতোর থেকে সুন্দরভাবে বোঝা যায়। এখন দেখা যাক বাংলা সাময়িক পত্রে জন্মশাসন নিয়ে সমর্থন বা বিরোধিতার মূল সুর কি ছিল, এবং কোন সাময়িক পত্র কি ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল।

জাতিক্ষয় ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ঃ-

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দকে ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ক ইতিহাসের "মহান বিভাজন বছর" বলা হয়ে থাকে কেননা এই বছরের পর থেকেই ভারতে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়তে শুরু করে। ভারতের ব্রিটিশ সেনসাস কমিশনারগণ ১৮৮১ থেকেই ভারতের জনসংখ্যার বাহুল্য এবং ভবিষ্যতে লোকবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে পরিবেশ ও অর্থনীতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসকদের তরফ থেকে ভারতের বিপুল জনসংখ্যাকে এদেশের দারিদ্র দু-র্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা এই প্রচারকে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র রোধ করার ক্ষেত্রে বিদেশী শাসকদের ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা বলে অভিযোগকরেন। প্রবাসী, বিচিত্রা প্রমুখ সাময়িক পত্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোন থেকে জন্মশাসনের বিরোধিতা করে।

প্রবাসী পত্রিকা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিবিধ বিষয়ক সাহিত্য পত্র' হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিচিত্রা প্রকাশিত হয় অনেক পরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়।[৪] রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা কাগজকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নামকরণ ও তিনিই করেন। বিচিত্রা-কে সেই অর্থে উগ্র জাতীয়তাবাদী আখ্যা না দেওয়াই সঙ্গত। জন্মশাসন-এর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে বিচিত্রা-য় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ সংখ্যায় কালীচরণ মিত্রের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়।[৫] এই প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে জনৈক ইংরেজ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বাংলাদেশের দারিদ্রের জন্য জনসংখ্যাকে দায়ী করেন, এবং বাংলায় জন্মশাসন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারের উপদেশ দান করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কালীচরণ মিত্র মন্তব্য করেন যে ফরাসীদেশ, যেখানে জন্মশাসন পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, সেখানে রাষ্ট্র বহু সন্তানবতীকে পেনসন দিচ্ছে এবং অবিবাহিত ও নিঃসন্তানদের উপর শুল্ক বসাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সাহেবরা জন্মশাসনকে সমর্থন করছে। কালীচরণ মিত্র ব্রিটিশ সরকারকে পাল্টা উপদেশ দেন জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে দারিদ্র দূর করার জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, শিল্পোন্নয়ন করতে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে ....ইত্যাদি। তাঁর লেখা থেকে জাতীয়তাবাদীদের ম্যালথাস বিরোধী অবস্থান পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু সকলেই এই একইমত পোষন করতেন না তা বলাই বাহুল্য, এবং তাঁদের সকলকে দেশদ্রোহী ভাবারও কোনও কারণ নেই। ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক ভারতবর্ষ পত্রিকা, সম্পাদক প্রথমে জলধর সেন ও পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষন। কবি ও দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রনাল রায়ের পরিকল্পনার বাস্তবরূপ এই পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধে লেখক সুধাংশুশেখর রায় মন্তব্য করছেন—

"অপরিমিত জনবৃদ্ধির ফলে এদেশে খাদ্য, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই লোকের জীবযাত্রা নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে। সেই কারণেই আজ জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে"।[৬] জনসংখ্যা ও পরিবেশ এবং অর্থনীতির ভারসাম্য নিয়ে সে সময়ে সম্ভবত সবচেয়ে সোচ্চার বাঙালী বুদ্ধিজীবী ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। প্রবাসীতে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়, সেখানে তিনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বর্ণনা করেন।[৭] কিন্তু এই লেখা ছাপালেও প্রবাসী জন্মশাসনের মূলত বিরোধী ছিল এবং এই ক্ষেত্রে প্রবাসীকে শুধু জাতীয়তাবাদী না বলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলাই সঙ্গত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান চার্লস রিচেট। প্রবাসী তাঁকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে রিচেট ভয় পাচ্ছেন কিছুদিন পরেই পৃথিবীতে শ্বেতজাতির সংখ্যা কমে যাবে, কেননা পীতজাতি ও মিশ্রজাতি, শ্বেতজাতির থেকে অধিক হারে বাড়ছে। এই সংবাদ পরিবেশনের পর বিবিধ প্রসঙ্গে সংকলকের মন্তব্য—

"পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে লোকসংখ্যা কম বাড়ার কারণ কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ। হিন্দুদের মধ্যে সন্ন্যাসীদের বাহুল্য, বালবৈধব্য এবং কণ্যাপন বরপণ আগে থেকেই হিন্দু সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা জন্মাইয়া আসিতেছে। তারওপর জন্মনিরোধ প্রথা আর একটা উপসর্গ হইয়া বসিতেছে।[৮]

ব্রিটিশ রাজের কাছে প্রবাসীর আবেদন ছিল, জন্মহার না কমিয়ে মৃত্যুহার কমান। চাষবাসের উন্নতি করুন। কেশ দাস নামক লেখক প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে হিন্দুর পতনের কারণ হিসেবে দায়ী করেন বাঙালীর (হিন্দুর) অলসতা, কৃষির অনুন্নতা ও বৈদেশিক শাসনকে। তাঁর পর্যবেক্ষণ বলছে বাঙালী মুসলমান বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের মাধ্যমে জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, অথচ জন্মনিরোধের ধুয়ো তুলে বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।[৯] প্রবাসী এদেশের দোকানে দোকানে জন্মনিরোধের "ঔষধ ও যন্ত্র" অবাধে বিক্রয় ও খবরের কাগজে এবিষয়ে বিজ্ঞাপন ছাপানোর প্রবল বিরোধিতা করে।[১০]

জন্মশাসন ও নারী-স্বাস্থ্য বনাম কলিতে বহুসন্তান :-

জন্মশাসনের ঔচিত্য নিয়ে যত তর্কই থাকুক,বাঙালী মধ্যবিত্ত উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে থেকেই নারী তথা প্রকৃতির স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বিশেষ সচেতন হয়ে পেড়। এর পিছনে অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ছিল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী মাসিক পত্রিকাও সমালোচনা তৎকালীন কলকাতার স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ ক্রেককে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রষূতি মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৮৬ জন। বামাবোধিনী এর কারণ হিসাবে দারিদ্র, অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ, রুদ্ধ ও অপরিচ্ছন্ন সুতিকাগারের পাশাপাশি বাঙালীর নৈতিক অবক্ষয়কেও দায়ী করে।[১১]

এই লেখাটির সাথে জন্মশাসন বিতর্কের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে এর কিছুদিন পরেই জন্মশাসন প্রবক্তারা জন্ম-নিরোধের আবশ্যকতা বোঝাতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন প্রষূতির স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর। অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ প্রষূতির স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করেননি, কিন্তু মনে করেছিলেন জন্মশাসন করলে বাঙালীর নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে। গর্ভসঞ্চারের ভীতি না থাকলে সমাজে অবাধ ও অবৈধ যৌন সম্ভোগ চলবে। অপরিনামদর্শী কিশোর-কিশোরী, অবিবাহিত নারী পুরুষ ও বিধবা যুবতী জন্মশাসনের জ্ঞান আহরণ করে সমাজকে গোল্লায় পাঠাবে। মাসিক বসুমতী ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করা কেননা সম্পাদক মনে করেছিলেন ভাবের প্রচার যত অধিক হয়, উন্নতির পদ জাতির পক্ষে ততই সুগম হয়। মাসিক বসুমতী অভিযোগ করে পশ্চিমে মারী স্টোপের প্ররোচনায় মেয়েরা ভ্রূণ হত্যা করছে, আর আমাদের দেশের সংস্কারকগণ এদেশের মেয়েদেরও সেই অধিকার দিতে চাইছে।[১২]

সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল সংস্থার পত্রিকা কুমুদিনী দত্ত সম্পাদিত বঙ্গলক্ষী নারীর প্রধান কর্তব্য যে মাতৃত্ব ও সনাতন আদর্শ পালন তা স্মরণ করিয়ে দিতে বিশেষ সচেষ্ট ছিল—

"আমাদের নারী সন্তানের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া bionomial theorem কষিতে মন নিবিষ্ট করিবেন, হেঁ আদর্শ যেন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।"[১৩]

জনসংখ্যা ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি মাত্রা একটি জাতি ও সমাজ ভিত্তিক, অন্যটি পরিবার কেন্দ্রিক, মধ্যবিত্ত পরিবারে বহু সন্তান সবসময়ে বাঞ্ছিত হয়ে ওঠেনা শুধু মায়ের স্বাস্থ্য হানির কারণেই নয়, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার জন্যেও। জন্মশাসন সমর্থকগণ এই দুটি বিষয়ের ওপরেই মূলত জোর দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটির লেখিকা সুধাময়ী দেবী যিনি মনে করেছেন জন্মশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে "প্রথমত স্বাস্থ্য, দ্বিতীয়ত শিক্ষা ও তৃতীয়ত অর্থের দিক দিয়া।" অবশ্য একই সাথে তিনি পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—

"বিবাহিত জীবনে সম্পূর্ণ জন্মরোধ করিয়া রাখিবার অধিকার কাহার ও নাই, একথা ভূলিলে চলিবে না। বিবাহ সামাজিক ব্যাপার, বিবাহের উদ্দেশ্য মূলত সৃষ্টি। সমাজের প্রতি প্রত্যেক দম্পতির কত্তর্ব্য হইতেছে সৎ সন্তান দান।"[১৪]

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জন্মশাসন সমর্থকগণ কোনও সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চাননি, জন্মশাসনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন মাত্র। অন্য লেখাটিতে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য টিপ্পনী কেটে বলছেন বিভীষণ রামের কাছে দিব্য করছে-যদি মিথ্যা বলি যেন কলিতে শত সন্তানের পিতা হই। এই টিপ্পনীর পরে লেখক বহুসন্তান ধারনে মায়ের স্বাস্থ্যহানি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[১৫]

আবার অনেকে এখন মতও পোষন করেছেন যে জন্মশাসন করলেই নারীর স্বাস্থ্য-হানি ঘটে—

"আজ দরিদ্র দেশ জন্মশাসন ও জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্বাভাবিক পাশ্চাত্য বিধান গ্রহণ করিয়া নারীর অবনত স্বাস্থ্যকে আরও অবনত করিতেছে।"[১৬]

ওপরের উদ্ধৃতি কিছুটা রক্ষণশীল পত্রিকা মাসিক বসুমতী থেকে আহরিত। প্রবাসীও নারীর কর্তব্য বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাবই পোষণ করত বলে মনে হয়—

"বহু সন্তানবতী নারীদেহ উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক মহিলারা নাক সিঁটকাইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বহু সুস্থ সুসন্তানের জননী যাঁহারা, তাঁহারা সন্তানের যোগ্য।"[১৭]

বহু সন্তান সুস্থ হবেই, এবং মায়ের স্বাস্থ্য হানিও ঘটবে না, এরকম নিশ্চয়তা যদিও, জন্মশাসন বিরোধীরা দিতে পারেননি। সেই সময়ের পক্ষে সবচেয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা

নিয়েছিল বিজয় নাগ ও পরবর্তীতে লীলাবতী নাগ ও বীনাপানি রায় সম্পাদিত জয়শ্রী পত্রিকা। 'প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির ভাবধারায় পরিচালিত এই পত্রিকায় জন্মশাসন বিষয়ে তৎকালীন মহিলা লেখকদের রচনা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। জয়শ্রী-র লেখিকারা মালথুসীয়ান ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা জাতীয়তাবাদীদের অনুরোধ করেন শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক চক্রান্ত বলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাকে উড়িয়ে না দিয়ে একটু অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করতে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর বক্তব্য ছিল কোন মা-বাবার ততগুলিই সন্তান হওয়া উচিত যতগুলিকে তারা যথাযথ লালন-পালন ও শিক্ষা দিতে পারবে।[১৮] এছাড়া মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা নিয়েও জয়শ্রীর লেখককূল মুখর ছিলেন এবং এই কারনে জন্মশাসনকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

আধুনিক, উদার এবং একই সাথে প্রাচীন 'এছলাম' ভাবধারায় বিশ্বাসী বলে পরিচিত মোহাম্মদ আক্রম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকাও মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্মশাসনের পক্ষে ছিল।[১৯]

পরিশেষে জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশিথ অনিন্দিতা দেবীর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে এই বিষয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলকাতা অধিবেশনে জন্মশাসন নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সভায় উপস্থিত বর্ষিয়সী ও কুমারী মেয়েরা মূলত জন্মশাসনের বিরোধিতা করেন, কিন্তু বহু বিবাহিতা সন্তানবতী যুবতী জন্মশাসনের পদ্ধতি জানতে চান। বিরোধিতার মূল যুক্তি ছিল নৈতিকতার প্রশ্ন। অনেকে বলেন জন্মশাসনই যদি করতে হবে তবে আবার বিধবাদের বিয়ে দেওয়া কেন? সম্মেলনে অনুষ্ঠিত এই বিতর্কের প্রতিবেদন দেওয়ার পর অনিন্দিতা দেবীর রাগত মন্তব্য—

"একদিকে সুস্থ সবল যুবতী নারী বিধবা বলে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে রুগ্ন দুর্বল মা বহু রুগ্ন শিশুর জন্ম দিয়েই চলবে এবং ক্রমশ অকালমৃত্যুর দিকে এগোবে। এ কেমন যুক্তি।[২০]

উপসংহার ঃ-

স্বল্প পরিসরে, বিভিন্ন বাংলা সামরিক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা ও মতামত থেকে উঠে আসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সম্ভবত তৎকালীন বঙ্গসমাজে জন্মশাসন বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা। বিরোধিতার প্রাবল্য থেকে বোঝা যাচ্ছে জন্মশাসন পদ্ধতি সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশই সহজলভ্য ও গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের গন্ডী পেরিয়ে অশিক্ষিত আমজনতার কাছে যে আধুনিক জন্মশাসন পদ্ধতি আবিষ্কারের খবর বা এই নিয়ে বিতর্ক, কোনটাই পৌছঁয়নি তা তো পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের জন্মহারের পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত।

নৈতিক অবক্ষয়ের বিতর্ক পিছনে ফেলে মূলত জন্মহার বোধ করার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র, জন্মশাসনকে সরকারী স্বীকৃতি দেয় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু নারীর স্বাস্থ্য, যা নিয়ে জন্মশাসন বিতর্কের বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষ একমত ছিলেন, তার সুরক্ষার প্রশ্ন পিছনে পড়ে যায়। অবশ্য ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের পর নতুন জনসংখ্যা নীতিতে কায়রো কনভেনশন অনুসারে নারীর প্রজননমূলক স্বাস্থ্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু সেটা অন্য গল্প। নব্য-মালথুসীয়ান আদর্শ এদেশের মাটিতে জন্ম নেয়নি, পশ্চিম থেকে আমদানি হয়েছিল। নব্য-মালথুসীয়ান বা ধ্রুপদী অর্থনীতির আদর্শে দারিদ্রের প্রধান কারণ হিসেবে জনসংখ্যাকে চিহ্নিত করে পশ্চিমে সমাজবাদীদের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের একই ধরণের মনোভাব দেখা যায়। তৎকালীন প্রবল জাতীয়তাবাদী হাওয়ায় নব্য-মালথুসীয়ান আদর্শ খড়-কুটোর মতো উড়ে যেতে পারত, সাময়িক পত্র তথা অন্যান্য মাধ্যমের তীব্র বিরোধিতায়। কিন্তু জন্মশাসনের অন্যদুটি প্রয়োজনীয় দিক-প্রসুতি ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে বহু সন্তানের লালান ব্যয়, এতটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে জন্মশাসন বিতর্কে এই দুটি বিষয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটি বাংলা সাময়িক পত্র এই বিষয়গুলিকে তুলে ধরায় জন্মশাসন বিতর্ক জমে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, মাঘ, ১৩৪২, পৃ: ৪

২। ব্রাডল্য-বেশান্ত ট্রায়ালের সময়-ই অ্যানি বেশান্ত ল অফ্ পপুলেশন ছেপে বার করেন। এই বই ভারতে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়। এরপর বেশান্ত বইটি বাজার থেকে তুলে নেন।

৩। নৃপেন্দ্র কুমার বসু *জন্মশাসন*, ক্যাত্যায়নী বুক স্টল, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫০, (প্রস্তাবনা)

৪। গীতা চট্টোপাধ্যায় *বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী* (তিনখণ্ড)১ম খন্ড; ১ম সংস্করণ ১৯৯০ খ্রিঃ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। প্রবন্ধে উল্লিখিত মাসিক পত্রিকা সমূহের প্রথম প্রকাশকাল (১) ও (৪) তেকে আহরিত।

৫। কালীচরণ মিত্র, ভারত কি ধ্বংসের পথে? *'বিচিত্রা*, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৮, পৃ : ৭৬৮-৭৭২

৬। সুধাংশুশেখর রায়, 'আর্থিক দুনিয়া, *'ভারতবর্ষ'* জৈষ্ঠ্য ১৩৪৭

৭। রাধাকলম মুখোপাধ্যায় ' লোকবৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়', *প্রবাসী*, আশ্বিন, ১৩৪২, পৃ : ৭৬২-৭৬৪

৮। *প্রবাসী* (বিবিধ প্রসঙ্গ), আষাড়, ১৩৪১, পৃ : ৪৪৭

৯। দবস, কেশ, 'বাঙালী হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ', *প্রবাসী* আশ্বিন, ১৩৪২ পৃ : ৭৬২-৭৬৪

১০। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪১

১১। *বামাবোধিনী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা*, (সাময়িক প্রসঙ্গ), আশ্বিন, ১৩২৮, পৃ : ২০৬

১২। *মাসিক বসুমতী*, জৈষ্ঠ, ১৩৪০

১৩। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'নারী প্রগতি' *বঙ্গলক্ষ্মী,* মাঘ, ১৩৩৬ পৃ : ১৭৬
১৪। সুধাময়ী দেবী 'জন্মশাসন', *জয়শ্রী* অগ্রাহায়ন, ১৩৩৯, পৃ : ৬৬৭-৬৭১
১৫। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'সন্তান নিরোধ বাঙালীর কর্তব্য কিনা', *জয়শ্রী* আষাঢ়, ১৩৪২, পৃ : ২৩৩-২৩৫
১৬। *মাসিক বসুমতী,* আষাঢ়, ১৩৪০
১৭। *প্রবাসী* (বিবিধ প্রসঙ্গ), শ্রাবণ, ১৩৪১
১৮। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, 'মা-বাপ ও সন্তান', জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৪২, পৃ : ৪৩-৪৫
১৯। তোরাব আলী, 'জন্মশাসন ও বাঙালী মুসলমান', *মাসিক মোহাম্মদী,* চৈত্র, ১৩৩৪, পৃ : ৩৭২-৩৭৪
২০। অনিন্দিতা দেবী, 'জন্ম-নিয়ন্ত্রন', *জয়শ্রী* বৈশাখ, ১৩৪১, পৃ : ৮৫-৯৩

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ঃ আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও কৃষক শ্রমিক শক্তির ভূমিকা, একটি সংক্ষিপ্তসার

বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়

চট্টগ্রাম অভুত্থান (১৯৩০) ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ছিল। ১৯৩০ সালে শুরু হয়ে এই বিদ্রোহ চলেছিল প্রায় ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। শেষ অধিনায়ক ধরা পড়ার পর এই অভুত্থান পরিচালনাকারী Indian Republican Army-র সক্রিয় কর্মধারা বন্ধ হয। এই অভুত্থানের প্রকৃতিছিল চিরাচরিত অভুত্থানগুলি তেকে পৃথক। চট্টগ্রাম অভুত্থান ঘটেছিল দেশজোড়া ও পৃথিবীজোড়া এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে যখন একদিকে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যুদয় হয়েছে কমিউনিজমের এবং অন্যদিকে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস এবং সমস্ত দেশজুড়ে ইংরেজ বিরোধী আবহাওয়া তখন তুঙ্গে। এ অবস্থায় চট্টগ্রাম অভুত্থানের প্রকৃতি ও পরবর্তী কর্মধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নূতন প্রবাহ নিয়ে আসে যাতে কৃষক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে।

ঔপনেবেশিক শাসনে বিদেশী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে সমাজজীবন, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির উপর তীব্র চাপের সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন ঘটতে থাকে সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যা ক্রমশ পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক উভয় শ্রেণীকেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে উৎসাহ দেয়। চট্টগ্রামে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্বদেশী দুর্জোয় শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়ে যায়। শিল্প ব্যবসায়ী ছাড়া জমিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে একটি ছোট জোতদার শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই সব রকমের মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় এই সব ছোট জমিদাররা জমি থেকে তাঁদের জীবনধারনের উপযুক্ত আয়টুকু পন্তি করতে পারছিলেন না, আবার বড় জমিদারদের মতো অত্যাচারের মাধ্যমে জোর করে অতিরিক্ত অর্থও আদায় করতে পারছিলেন না, ফলে শুরু হয়েছিল আরওবেশি করে জমিলীজ দেওয়া বা নির্ধারিত খাজনার বিনিময়ে জমি হস্তান্তর করা। যাঁদের হস্তান্তর করা হয় তারা ক্রমশ মালিক কৃষকবা ছোট জোতদার[১] হয়ে ওঠেন। জমি থেকে পর্যাপ্ত আয় না হওয়ায় এরা অনেকেই নানা মধ্যবিত্ত পেশা গ্রহণ করতে থাকেন। এদের মধ্যে একাংশ ছিলেন শিক্ষিত। এরা অনেকেই রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করেন। চট্টগ্রামে তখন কংগ্রেস একটি প্রধান রাজনৈতিক দল তাছাড়া অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল দুয়েরই শাখা ছিল। অহিংস গণ আন্দোলন পরিচালনায় চট্টগ্রামে কংগ্রেস অগ্রনী ভূমিকা নিলেও

ধীরে ধীরে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রন পরোক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে চলে যায়। কংগ্রেসি আন্দোলনের পাশাপাশি গোপনে চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী দল যে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করে তা নিছক সন্ত্রাসবাদ ছিল না। ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি ছেড়ে চট্টগ্রামের বিপ্লীবি দল সশস্ত্র জনযুদ্ধেয় পরিকল্পনা করেছিল এবং একাজে কৃষক শ্রেণীর সাহায্য এমনকি সম্ভব হলে বার্মার থায়ওয়াডি বিদ্রোহীদের সাহায্য নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের আগে গ্রামের ঘাঁটি এলাকা তৈরির কাজ চলছিল এবং পরে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল গ্রাম থেকেই। সঙ্গী ছিল কৃষক শ্রেণী। পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বে কৃষক সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ছিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের লক্ষ্যছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

চট্টগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে জমিদারি কিনেছিলেন। এসব জমিদারি আয়তনে বড় ছিল না। অনেক সময় ভাগ হয়ে যাওয়া জমিদারি অর্থাৎ জমিদারির কিছু অংশ তাঁরা কিনতেন, কখনও খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিতেন। এই সব ছোট ছোট জমিদার ছিল ব্রিটিশ বিরোধি, কারণ প্রথমত, জমির খাজনা ও জমিসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সংঘাত চল্‌তো। দ্বিতীয়ত, জমিদারির ব্যয় বেড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের উপর চেপেছিল নূতন সরকারি করের বোঝা। যেমন আয়কর রোড সেস। পাব্লিক ওয়ার্ক সেস। চৌকিদারি ট্যাকস, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি। তাছাড়া সরকার নানাভাবে ওই সময় জমিদারদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল।[২] ফলে ছোট জমিদারদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল শোচনীয়। তাঁদের মধ্যে জোতা উঠেছিল ইংরেজ বিরোধিতার অনুভব। চট্টগ্রামে ছোট জমিদারদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশি, তাঁদের মধ্যে ইংরেজবিরোধীতা ছিল। শুধু জমিদারী নয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রথায় চট্টগ্রামে যে পুঁজি লগ্নি করে ব্যবসা শুরু করেছিল সেই পুঁজির বিপরীতে পুঁজি লগ্নি করে ব্যবসা করতে গিয়েও একশ্রেণীর জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্রিটিশের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে দেশি বুর্জোয়া যদি পুঁজির অবাধ বিকাশ চায় তবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে। বিপরীতে দেশি বুর্জোয়া যদি সীমিত বিকাশে তুষ্ট থাকে তবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে মূলত আপোষের সম্পর্ক।[৩] চট্টগ্রামে শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দেশি পুঁজির অবাধ বিকাশের সমর্থক কম ছিলেন না সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতাও ক্রমবর্ধমান ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তার প্রতিঘাত। কাজেই শিক্ষিত বুর্জোযা শ্রেণী ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশ নেবেন এটা স্বাভাবিক ছিল। চট্টগ্রামে দেশিপুঁজি ও বিদেশী পুঁজির ভেতরে প্রবল সংঘর্ষ দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রবেশের পিছু পিছু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উদ্ভবের পাশাপাশি দেশিয় পুঁজির বিকাশ ও সংঘর্ষ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে, দেশিয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে চট্টগ্রামে বিংশ শতাব্দীর স্বদেশি সংগ্রামের শুরু হয়। এই স্বদেশি সংগ্রাম ক্রমশ জাতীয় বুর্জোয়াদের তত্ত্বাবধানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপ পায় যার চূড়ান্ত পরিণতি চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান। থাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন অন্যান্যদের সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক জনগণ।

শ্রমিক শ্রেণী চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানকে কতটা সমর্থন করে ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু একথা সত্য যে সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে বারবার তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়করা ১৯২১ সালের চাঁদপুরে বা বাগানের কুলিদের দাবি সমর্থন করেন। একই ভাবে বুলক ব্রাদার্স স্টিমার কোম্পানির শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করেন তখন সূর্যসেন ও তাঁর সঙ্গীরা শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থনে পদসভা ও অন্যান্য প্রচার চালিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা চালান। শেষে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্মানজনক শর্তে চুক্তি হয়।[৪] এর একমাস পরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের সময় সূর্য সেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা আবার শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ান।[৫] এই সময় চট্টগ্রামের বিপ্লবী সমিতির অম্বিকা চক্রবর্তী ও কয়েকজন শ্রমিকদের সমর্থন করে কারাবরণ করেন। অনন্ত সিংহ লিখেছেন গোপনে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম করে মালিকপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে তোলা এবং রেলকোম্পানিকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করা চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী দলের উদ্দেশ্য ছিল। এটা ঠিক যে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান কারীরা শ্রমিকদের রাজনৈতিকশক্তি বলে ভাবতে পারেননি, কিন্তু শ্রমিকদের প্রতি তঁরা সহানুভূতিশীল ছিলেন। শ্রমিক শ্রেনীরও চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানকারীদের সম্পর্ক বিতৃষ্ণা ছিল না। অস্ত্রাগার মামলার বন্দিমুক্তির জন্য শত সহস্র মানুষ স্বাক্ষর দেন তার মধ্যে শ্রমিকেরাও ছিলেন। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানকারীরা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন I.R.A ও H.S.R.A-র[৬] সঙ্গে যোগাযোগে। তা ছাড়া রিভোল্ট গ্রুপের সন্তোষ মিত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানকারীরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই দুটি গোপন বিপ্লবী সংগঠনই কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সন্তোষ মিত্র এবং তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত বিপ্লবীরা ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে কয়েক হাজার শ্রমিকের মিছিলকে কংগ্রেসের প্যান্ডেলে মিছিল করে ঢুকিয়ে দেন। তাঁদের শ্লোগান ছিল "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "পুঁজিবাদ নিপাত যাক" প্রভৃতি। পরে জওহরলাল নেহরু ও গণন্দিজির মধ্যস্থতায় তাঁরা কংগ্রেসি নেতাদের বক্তৃতা শোনেন।[৭] সুতরাং শ্রমিক সংগঠন তৈরি করার আদর্শযুক্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানকারীদের যোগাযোগ এবং অভ্যুত্থান কারীদের পূর্ব ও পরবর্তী কার্যকলাপ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাঁদের সহানুভূতি প্রকাশ করে।

শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপ্লবের আগুন জ্বালান। ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে লড়াই। শহরের পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেকেই গ্রামের ছোট ছোট জোতের মালিক ছিলেন। এঁরা ও গ্রামের মালিক কৃষকরা গ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি ছিলেন। গ্রামের এসব ছোট ছোট মালিক কৃষকের অবস্থা সাধারণ কৃষকের থেকে খুব ভাল ছিল না। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারি ব্যবস্থার প্রতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ক্ষোভ

ছিল। বৃহৎ জমিদারদের প্রতি গ্রামের কৃষকদেরও ক্ষোভ ছিল। চট্টগ্রামের কৃষকরা ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ এবং তার পরেও মাষ্টারদা প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। কৃষক শ্রেণীর কাছ থেকে এবং গ্রামীণ মানুষের কাছ থেকে বিপ্লবীরা যতটা সাহায্য পেয়েছিলেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে এটি শুধু শহুরে অভ্যুত্থান ছিল না। গ্রামকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন বিপ্লবীরা আর গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী সংগঠন।

অনন্তসিংহ এবং কল্পনা দত্তের মতে গ্রামে I.R.A-র সঙ্গে যুক্ত সরাসরি সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও অভুত্থানের আগেই গ্রামে ঘাঁটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা গ্রামে আশ্রয় নিলে গ্রামবাসী কৃষকেরা শত অত্যাচার ও প্রলোভনে তাঁদের ধরিয়ে দেন নি।[৮] সরকারি সুত্রে বলা হয়েছিল The villages within half a dozen miles of Dhalighat are the centre of revolutionary organisation in was through the active support of the inhabitants of these villages that Surya Sen and his party were able to make their plan.[৯] আর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে Villages were promind remission from punitive fines in exchange for information but the device failed Promised Completely.[১০] গ্রামীণ মানুষ ও কৃষক শ্রেণীর সমর্থন-এ দরদ না থাকলে গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হত।

৭০০ স্কোয়ার মাইল অঞ্চল, বিপ্লবীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল একথা সরকারি তথ্যই স্বীকার করেছে।[১১] এই ৭০০ বর্গ মাইল অঞ্চলে মুসলিমরা ছিল অত্যান্ত বেশি পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই মুসলিম কৃষকদের সমর্থন ছাড়া চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানকারীর লড়াই চালিয়ে যেতে পারতেন না। লক্ষ্যনীয় এই যে চট্টগ্রাম অভুত্থানের ঠিক এক মাসের মধ্যে (১৮.৪.৩০ এ চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান, কমিশনারের চিঠি ১৮.৫.৩০) সরকার পক্ষ মুসলমান কৃষক জনতার ব্রিটিশ বিরোধিতার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামে তারা যে বিপ্লীদের সাহায্য.করছেন এ ব্যাপারে সরকার নিশ্চিত ছিল।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পরে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের উপর চট্টগ্রামে ব্রিটিশের অত্যাচার চরমে ওঠে । ব্যক্তিসন্ত্রাসের রাস্তা পরিহার করে কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধ চালানোর রাস্তা দেখিয়েছিল চট্টগ্রাম বিপ্লবী দল I.R.A. তৈরি করে (Indian Republican Army).

আন্দোলনের ধারাপথে শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে, কৃষক সমাজের সঙ্গে থেকে দীর্ঘদিন গেরিলাযুদ্ধ চালাতে চালাতে মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী যুবকদের বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র ক্রমশ পাল্টে যায়। তাঁরা অর্থাৎ চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অধিকাংশই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আদর্শ হিসাবে তাঁরা চিন ও রাশিয়ার যুব সমাজের বিপ্লবী আদর্শকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন। পুরনো গুপ্ত বিপ্লবীদল গুলির মতো শুধু জাতীয়তাবাদের এবং সামাজ্যবাদ বিতাড়নের শপথ নেননি। শোষণ ও গুণ্ডামির বিরুদ্ধে, দেশিয় উৎপীড়কদের উচ্ছেদের

শপথও তাঁরা নিয়েছিলেন। বার্মায় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। গরীব উপজাতি কৃষকদের মধ্যে শুরু হয়েছিল তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা। ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর গোপন প্রতিবেদনে সরকার শঙ্কিত হয়ে বলেছিল There was a remarkable manifestatiom of Communist spirit among all classes of terrorists in Bengal.[১২]

উল্লিখিত আলোচনার রূপরেখা থেকে এবং তথ্যসহ প্রমাণ করা যায় যে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের উত্থানের জন্য দায়ী। এই বিদ্রোহে কৃষক শ্রেণীর পরোক্ষ ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে বহু কৃষক সদস্য ছিল, ছিল অতি সাধারণ মানুষ। এটি জনবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর বহুদিনের জমে থাকা পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের হতাশা ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ঘৃণা, বিদেশি পুঁজির সঙ্গে দেশিয় পুঁজির সংঘর্ষ ও দেশিয় পুঁজির পৃষ্ঠপোষক স্বদেশি বুর্জোয়াদের উত্থান, রাশিয়ার অত্যাচারী জারতন্ত্রের পতন, ১৯২৯ সালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মন্দা, আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক প্রভৃতি নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা তখন বাংলার অন্যান্য অংশর মতো চট্টগ্রামের মানুকেও উদ্বেল করে তুলেছিল। যার পরিণতি ছিল চট্টগ্রাম অভুত্থান। তাৎক্ষণিক আবেগ নয় এটি ছিল পরিকল্পিত অভুত্থান যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপেক্ষিত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক সমর্থনে ঘাঁটি এলাকা গড়ে লড়াই শুরু করার নিদর্শন গোপন বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে চট্টগ্রামে I.R.A. প্রথম দেখিয়েছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১। এইমালিক কৃষক সম্পর্কে মাও-সে-তুঙ বলেছেন। মধ্যকৃষকেরা অনেকেই জমির মাত্র অংশবিশেষের মালিক। বাকি অংশটি খাজনার তারা বন্দোবস্ত নেয়। একজন মধ্য কৃষকের আয়ের প্রধান অংশ আসে নিজের শ্রম থেকে। সাধারনতঃ সে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না কিন্তু গরীব কৃষকে নিজের শ্রমশক্তির কিছুটা বিক্রয় করতেই হয়। (মা-সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ : ১৭৭

২। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলায় আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী) কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ : ২৪-২৫

৩। রতন খাসনবিশ ঃ আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ : ৪৪

৪। অনন্ত সিংহ ঃ সূর্যসেনের স্বপ্ন ও সাধনা, কলিকাতা ১৯৬৮

৫। প্রাগুক্ত

৬। I.R.A–Indian Republican Army, H S.R.A.–Hindustan Socialists Repablican Army.

৭। Mallikarjuna Sharma : Role of Revolationaries in Freedom movement of India p. 260, 268, Marxist study Forum. Hyderabad 1993

৮। Tanika Sarkar : Bengal 1928-1934, the politics of protest, p-153 Oup, 1987 Calcutta.

৯। <01, Home plo 27/14/34 of 1934, WBSA Calcutta.

১০। Fortnightly reports on Bengal. 1st half of March 1930. <01, Home pol. 18.3.1933, W.B.S.A. Calcutta.

১১। Home Dept. F.No 13/32 Pol WBSA Calcutta

১২। Collection MSS, EURE 251, 33(10L) confidential report of H. Williamson in intelligence Burau, Home CoL 1933.

সারাংশ

গোবরডাঙা পুরসভার জনসংখ্যা বিষয়ে একটি সমীক্ষা

(পাশাপাশি অন্যান্য পুরসভার সঙ্গে তুলনায়)

দীপককুমার দাঁ

একটা অঞ্চলের জনসম্পদের বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

গোবরডাঙা পৌরসভা এলাকা (স্থাপিত-১৮৭০) প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন একটি জনপদ। যমুনা নদী বেষ্টিত এই জনপদ যাতায়াতের পক্ষে সুগম স্থান। পার্শ্ববর্তী ইছাপুর (১ কিমি), চৌবেড়িয়া (৮ কিমি), বনগ্রাম (১৬ কিমি) নানাভাবে ইতিহাসের আলোকে খ্যাত। গোবরডাঙা অঞ্চল যশোহর রোড থেকে (১১ কিমি) দূরে থাকায়, এর জনপদের বিকাশ হাবড়া, অশোকনগর, চাঁদপাড়া, বনগ্রাম, বারাসতের থেকে স্বতন্ত্র। ১৯৪৭ ঃ দেশভাগ, পরে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জন্ম—প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত গোবরডাঙার জনচিত্রকে ও এর বিবর্তনকে বুঝতে সাহায্য করে।

যে সময় গোবরডাঙা পুরসভার স্থাপনা, তার অল্প আগে পরে বারাসাত, বসিরহাট, টাকি, বাদুড়িয়া, বনগাঁ, উত্তর দমদম পুরসভার জন্ম। এর অনেক পরে জন্ম হয়েছে অশোকনগর-কল্যাণগড় ও হাবড়া পুরসভার। এইসব পুর এলাকার সঙ্গে তুলনা করে গোবরডাঙা পুরসভার জনচিত্রকে (Demography) বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

আর একটা বিষয় হল জনসংখ্যায় হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাগত অবস্থান। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে—মুসলমান জনসংখ্যায় গুরুতর হেরফের হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান জরুরি। অনেক জায়গায় মুসলমান জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে (যেমন, গোবরডাঙা পুরসভা এলাকা)। দারিদ্রের কারণে, শিক্ষায় অনগ্রসরতা ও আধুনিক জীবন ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে না পারার কারণে—এদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০০১ জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ২৩% হলেও গোবরডাঙা পুরসভায় এই অঙ্ক মাত্র ২.১% (২০০১)। অথচ, ১৯২৫ সালের (২০।৭।১৯২৫) গোবরডাঙা পুরসভার একটি জনগণনা তথ্য থেকে জানা যায়,—মোট জনসংখ্যা ৫১১২। হিন্দু—২৯০১ (৫৮.৭০%) মুসলমান—২২১১ (৪১.৩০%)। এই মুসলমানদের একটি অংশ (খুব বেশি নয়) স্বাধীনতার পর (১৯৪৭-

৬০-র মধ্যে) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেও, বর্তমানে মাত্র ৮০০ প্রায় মুসলমান জনসংখ্যায় (মোট জনসংখ্যা-৪১,৬১৮, ২০০১ গণনায়) এসে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণে। এজন্য, স্থানীয় ভাবে এদের জনসংখ্যা কমছে। অভাবের তাড়নায় জমি বিক্রি করে সর্বক্ষণের ভ্যান-রিকশা চালক। প্রায় সর্বহারা। পেশা দিনমজুরী, কাঁচামাল কেনা ফড়িয়া বা নির্মাণ কার্যে আধা শ্রমিক (অদক্ষ)।

সারণি—এক

• গোবরডাঙা পুরসভার জনসংখ্যা চিত্র •

আটটি মৌজা সহ গোবরডাঙা পুর এলাকা—১৩.৩৯৯৬৮ বর্গকিমি বা ৫.২৩৪২৫ বর্গমাইল।

বছর	জনসংখ্যা	জনঘনত্ব (প্রতি ব.কিমি)	১০ বছরে বৃদ্ধি/হ্রাস (+) (–)	বৃদ্ধি/হ্রাস (+) (–) শতকরা হার	প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোক	মন্তব্য
১৮৭১	৬৯৪১	৫১৮	—	—	—	• ১৮৭১ থেকে ১৯১১—জনসংখ্যা কমেছে প্রবল ম্যালেরিয়া রোগের কারণে। অনেকে গোবরডাঙা ছেড়ে শহর কলকাতা বা অন্যত্র চলে যান। • দেশ ভাগের পর ১৯৫১ থেকে জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করে। • ১৯৭১-তেও বেশ কিছু বেড়েছে—বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু চলে আসার কারণে। এই আসা আজও অব্যাহত। • ১৯৮১ থেকে কিছু উচ্চ / মধ্যবিত্ত শহর মুখী। এঁরা বারাসাত মধ্যমগ্রাম, দমদম, বিরাটি, সল্টলেক ইত্যাদি চলে যাচ্ছেন—শহরের সুবিধার কারণে, বিশেষত ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত জীবন ভেবে।
১৮৮১	—	—	—	—	—	
১৮৯১	৬৭৫০	৫০৪	—	—	—	
১৯০১	৫৮৩১	৪৩৫	–৯১৯	–১৩.৬১%	—	
১৯১১	৫০১২	৩৭৪	-- ৮১৯	– ১৪.০৪%	১০০২	
১৯২১	৫২১২	৩৮৯	+ ২০০	+ ৩.৯৯%	৯২৭	
*১৯৩১	—					
১৯৪১	—					
১৯৫১	—					
১৯৬১	১৩,৬৮৪	১০২১				
১৯৭১	২০,১৮৪	১৫০৬	+ ৬৫০০	+ ৪.৭৫%	—	
১৯৮১	২৮,০৩৪	২০৯২	+ ৭৮৫০	+ ৩.৮৮%	—	
১৯৯১	৩৫,৯২৯	২৬৮১	+ ৭৮৯৫	+ ২.৪১%	৯৬৩	
২০০১	৪১,৬১৮	৩১০৫	+ ৫৬৮৯	+ ১.৫৮%	৯৬৯	

* ১৯২৫ জনসংখ্যার একটি তথ্য নিম্নরূপ :—

গেবোডঙে পুরসভা— মোট জনসংখ্যা—৫১১২

হিন্দু—২৯০১ (৫৮.৭০%)

মুসলমান—২২১১ (৪১.৩০%)

* ২০০১ সালে— মুসলমান জনসংখ্যা—৮০০ প্রায়।

● পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডে কোন মুসলমান কাউন্সিলার নেই।

পৌরসভার ১৩৪ বছরের ইতিহাসে কখনও কোনও মুসলমান জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হননি।

নং	পুরসভা	প্রতিষ্ঠা বর্ষ	শ্রেণী বিভাজন	জনসংখ্যা ১৮৭১	মোট জনসংখ্যা			১০ বছরে বৃদ্ধি '৯১-'০১	শতকরা বৃদ্ধি হার
					১৯৮১	১৯৯১	২০০১		
১	বনগাঁ	১৯৫৪	C	—	৩৬,৭৫১	৭৯,৫৭১	১,০২,১১৫	২২,৫৪৪	২.৮৩
২	গোবরাঙা	১৮৭০	D	৬৯৪১	২৮,০৩৪	৩৫,৯৩৯	৪১,৬১৮	৫,৬৭৯	১.৫৮
৩	বাদুড়িয়া	১৮৭০	D	১২৬৮৭	৩৩,৩৯১	৪১,৭৬২	৪৭,৪১৮	৫,৬৫৬	১.৩৫৪
৪	বসিরহাট	১৮৬৯	C	১২১০৪	৮০,৮০৫	১,০১,৪০৯	১,১৩১২০	১১,৭১১	১.১৫৫
৫	টাকি	১৮৬৯	D	৫২৬১	২৫,৬৭১	৩০,৪২১	৩৭,৩০২	৬,৮৮১	২.২৬২
৬	উত্তর দমদম	১৮৬৯	B	—	—	১,৪৯,৯৬৫	২,২০০৩২	৭০,০৬৭	৪.৬৭২
৭	অশোকনগর-কল্যাণগড়	১৮৭০	C	—	৫৫,২৫৬	৯৬,৭৪৭	১,১১,৪৭৫	১৪,৭২৮	১.৫২২
৮	হাবড়া	১৯৬৮	C	—	৭২,৫৯৯	১,০৫ ৮২৩	১,২৭,৬৯৫	২১,৮৭২	২.০৬৭
৯	বারাসাত	১৮৬৯	B	১১,৮২২	৬৭,৩১১	১,৭৪,৪৪৫	২,৩১,৫১৫	৫৭,০৭০	৩.২৭১
১০	মধ্যমগ্রাম	১৯৯৯	C	—	৪৭,৯০৩	১,০৬,৯১৪	১,৫৫,৫০৩	৪৮,৫৮৯	৪.৫৪

[সূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—২-৩০ আগষ্ট; ২০০২]

এই চিত্র থেকে যা ফুটে ওঠে—

১) বাদুড়িয়া, বসিরহাট প্রধানত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই তালিকায় সর্বনিম্ন। বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান জরুরি।

২) মধ্যমগ্রাম, উত্তর দমদম, বারাসাত এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত ক্রমশ শহরে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে—এটাই সহজবোধ্য।

৩) ১৮৭১-০ জনসংখ্যার তুলনায় বর্তমান বৃদ্ধি ঃ বাদুড়িয়া পুরসভা—৩.৭ গুণ, গোবরডাঙা—৬ গুণ, বসিরহাট—১০.৬ গুণ, টাকি—৭.১ গুণ, বারাসাত—১৯.৮ গুণ।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

(ক) কুশদহ বার্তা—-পত্রিকা / বিভিন্ন সংখ্যা, গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট।

(খ) কুশদহ—মাসিক পত্র, দাশ, যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার বিরোধী নেতৃত্বের ভূমিকা

মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মাসুম

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের পর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-'২২) ব্রিটিশ ভারতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের এই মিলিত আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের ভিত্তিকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-'১৮) জয়ী হওয়ার পর মিত্রশক্তি জার্মানির সহযোগী তুরস্ককে খন্ড-বিখন্ড করার আয়োজন করে। ভারতসহ বিশ্বের মুসলিমগণ তুরস্কের সুলতানকে তাদের ধর্মীয় খলিফা হিসেবে মান্য ক.াতেন।[১] যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার তুর্কী সাম্রাজের কোন ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি দিলে ভারতের মুসলমানেরা সরকারের আহ্বানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে 'সেভার্স' চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ককে খন্ডিত করার ব্যবস্থা নিলে[২] ভারতের মুসলমানেরা খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র তুর্কী সাম্রাজের অখন্ডতা রক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকাবের 'রাওলাট এ্যাক্ট' ও তার প্রতিবাদে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড' ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেস তথা হিন্দুগণ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এই পর্যায়ে গান্ধী ও মুসলিম নেতৃত্বের সহায়তায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন একাকার হয়ে যায় এব, 'ভারতের স্বরাজ' আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।[৩] বাংলার হিন্দু মুসলিম যৌথ নেতৃত্বে এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম নেতৃত্বের একাংশ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তাঁদের এই বিরোধিতার পেছনে নানা কারণ জড়িত ছিল এবং ব্যক্তিবিশেষে কারণের প্রকৃতিও ভিন্ন ছিল। হিন্দু সমাজেরও দু'একজন উল্লেখযোগ্য নেতা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বের এই বিরোধিতা খিলাফত - অসহযোগ আন্দোলনের মূল গতিকে থামাতে না পারলেও বাংলার তৎকালিন রাজনীতিতে তা যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে খিলাফত - অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার বিরোধী নেতৃত্বের ভূমিকা ও তার কারণ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে যে সকল নেতৃত্ব খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের

বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে প্রথমে নবাব আলী চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নবাব আলী চৌধুরী বিজিত মুসলিম রাজ্যসমূহের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ১৯১৯ সালে সিরাজগঞ্জে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েযিনের' এক অধিবেশনে যুদ্ধ পরিস্থিতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অনিশ্চিত ভবিষ্যত দেখে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৪] মূলতঃ তুরস্কের খিলাফত ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি তুর্কী খালিফাকে ভারত তথা মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করেননি। ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু তুরস্কের জন্য তিনি করতে রাজী ছিলেন না। কার্যত তিনি নিজ মাতৃভূমি তথা মুসলিম বাংলার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেন। যার জন্য নবাব আলী চৌধুরী খিলাফত আন্দোলনে সাড়া দিতে পারেননি। খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন তিনি 'Views on the present political situation in India' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লিখে 'মন্টেগো - চেমসফোর্ড পরিকল্পিত শাসন সংস্কারকে (১৯১৯) স্বাগত জানান। এই পুস্তিকায় তিনি মুসলমানদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে শাসন সংস্কারটি বাস্তবায়িত হলে দেশবাসী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই শাসিত হবে এবং এর ফলে খাঁটি স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। খিলাফত আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন যে, অমুসলিম কোন নেতা খিলাফত বিষয়ে মুসলমানদের পথ-প্রদর্শন করতে পারেন না। কিভাবে খিলাফত সমস্যার সমাধান করা যায় তাও ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অপব্যবহার করে খিলাফত সমস্যার সমাধান করা যাবে না।[৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উক্ত পুস্তিকাটিকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিরোধী বলে অভিহিত করেন।[৬] তবে আবুল মনসুর আমেদ খিলাফত সমস্যার প্রশ্নে নবাব আলী চৌধুরীর পুস্তিকার প্রশংসা করেন।[৭]

অসহযোগ চলাকালীন হাজার হাজার ভারতীয় মুসলিম স্বদেশ ত্যাগ করে আফগানিস্থানে 'হিজরত' করেন। কারণ আন্দোলনকারীদের মতে ভারত শত্রুকবলিত দেশ। এখানে ধর্মে-কর্মে বাধা প্রদান করা হচ্ছে।[৮] এই 'হিজরতের' যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। নবাব আলী চৌধুরী এই 'হিজরতের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, 'হিজরত', জিহাদদ' কোনটাই সম্ভব নয় এবং এই আন্দোলনের সফলতা সুদূর পরাহত। একমাত্র উপায় হল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।[৯] নবাব আলী চৌধুরীর পরামর্শে অনেকে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের অধীনে সম্প্রসারিত নতুন কাউন্সিলে যোগদান করেন।

সমকালীন বাংলার মুসলমানদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এ. কে. ফজলুল হক খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ১৯১৯ সালের ২২-২৩ নভেম্বর তাঁর সভাপতিত্বেই দিল্লীতে প্রথম সর্বভারতীয় খিলাফত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খিলাফতের দাবি মেনে না নিলে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট এবং অসহযোগ

আন্দোলন পরিচালিত হবে বলেও প্রস্তাব পাশ হয়।[১০] শুধু তাই নয়, এক ঘরোয়া আলোচনায় তিনি আন্দোলনের স্বার্থে আইন পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।[১১] কিন্তু পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের কিছু কর্মসূচীর সাথে একমত হতে না পেরে তিনি আন্দোলন হতে সরে দাঁড়ান। ফজলুল হক অসহযোগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরি বর্জন কর্মসূচীর তীব্র নিন্দা করেন এবং এ ধরনের কর্মসূচী মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন। তুরস্কের খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ব্রিটিশ বিরোধী হওয়া সত্বেও তিনি বাংলা তথা ভারতীয় মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর এই পরিবর্তন তৎকালে বাংলার রাজনীতিতে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। ফজলুল হকের সমালোচনায় The Mussalman পত্রিকায় বলা হয় ঃ

Now Moulvi Fazlul Haq has turned his back and is going to stand for election to the Bengal Legislative Council, inspite of the decision to the contrary, arrived at by the Khilafat Committee. People say that the shadow of a ministership has proved too tempting to him and so like a brave general encouraging and leading an army to battle field, he shows his back and runs away to a safe retreat....leaving his followers to their fate.[১২]

ফজলুল হক সংবাদপত্রে পেরিত এক চিঠিতে তাঁর পরিবর্তিত ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন।[১৩] তিনি ঢাকার নর্থব্রুক হলে এক সভায় (১২ ডিসেম্বর, ১৯২০) গান্ধীর আহ্বানে মুসলিম ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জন না করার পরামর্শ দেন।[১৪] ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানের অপর এক সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'যদি সমস্ত হিন্দু ছেলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে, তাদের যায় আসেনা। কারণ তাদের পরিবারে সবাই শিক্ষিত। তারা বাড়ী বসে মা-বাবার কাছেও লেখাপড়া শিখতে পারবে এবং সময় হলে স্কুল-কলেজে ফিরেও আসবে। কিন্তু মুসলমান ছেলে স্কুল-কলেজ ছাড়লে সর্বনাশ। তাদের পরিবারে সবাই অশিক্ষিত। অতএব, তারা এমনিভাবে গোল্লায় যাবে যে, সময় হলেও তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। মুসলমান শিক্ষাক্ষেত্রে আরো অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে যাবে।[১৫]

ফজলুল হকের ন্যায় অসহযোগ আন্দোলনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বয়কট নীতি অনেকে সমর্থন করেননি। তার মধ্যে মুসলিম নেতা হাকীম হাবিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম। তিনি খিলাফত আন্দোলনের সমর্থক থাকলেও স্কুল-কলেজ বর্জন করাকে মুসলমানদের জন্য অহিতকর মনে করেন। সেজন্য তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেননি। হাবিবুর রাহমান সে সময়ে ঢাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহায়তায় শিক্ষাবর্জন কর্মসূচী রোধ করতে 'মুসলমান শিক্ষা রক্ষা কমিটি' প্রতিষ্ঠা করেন[১৬] এবং অসহযোগের বিরুদ্ধে

'অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় উলামার অভিমত' শীর্ষক উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১৭]

ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ 'ঢাকা খিলাফত কমিটি'র সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ আদায়ের পক্ষপাতী চিলেন। তাই খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন যখন এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং অসহযোগ আন্দোলনে শিক্ষাবর্জন কর্মসূচী গৃহীত হয় তখন তিনি এ আন্দোলন হতে সরে দাঁড়ান। নওযাব হাবিবুল্লাহর উদ্যোগেই ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার নর্থব্রুক হলে শিক্ষবর্জন তথা অসহযোগের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি 'ঢাকা খিলাফত কমিটি থেকেও পদত্যাগ করেন।[১৮]

ঢাকা খাজা পরিবারের সদস্য মুহম্মদ আযম খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের নানা কর্মসূচীর সমালোচনা করেন। খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সদ্ভাব বজায় রাখতে অমৃতসরে ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের এক সভায় গরু কুরবানীর পরিবর্তে অন্য প্রাণী জবেহ করার প্রস্তাব করা হয়।[১৯] খাজা আযম এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়া, তিনি ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল 'ঢাকা জেলা মুসলমান সমিতি'র উদ্বোধন করতে গিয়ে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা না করে এবং শিক্ষাদীক্ষা ও সরকারি চাকরি না ছেড়ে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে খিলাফত আন্দোলন করার পরামর্শ দেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময়ে হিন্দু সমাজ মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল — এই যুক্তিতে তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সাথে একযোগে কোন আন্দোলন না করার নির্দেশ দেন।[২০]

'আঞ্জুমান - এ - ওয়ায়েযীনে বাঙ্গালা'র সভাপতি আবুবকর সিদ্দীকী প্রথমদিকে খিলাফত আন্দোলনের অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ফজলুল হকের ন্যায় তাঁর মতেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি ভাবতে শুরু করেন যে, অসহযোগ আন্দোলন করে ইংরেজদের বিরাগভাজন হওয়া মুসলিম সমাজের জন্য কল্যানকর হবে না এবং স্কুল-কলেজ বর্জন করে শিক্ষাক্ষেত্রে আরো পশ্চাৎগামী হওয়া কিছুতেই সমীচীন হবে না। তাই তিনি অসহযোগ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার মত পোষণ করতে শুরু করেন।[২১]

বর্ধমানের আবুল কাসেম ১৯২০ সালের ফ্রেরুয়ারিতে আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট খিলাফতের দাবি পেশ করতে ইংল্যান্ড গমন করেন। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে তিনি এই আন্দোলনের প্রতি নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং অসহযোগের কাউন্সিল বয়কটকে উপেক্ষা করে বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন।[২২] এছাড়াও, বরিশালের খান বাহাদুর হেমায়েত

উদ্দীন, ইসমাঈল চৌধুরী, হোসেন আলী অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতায় নেতৃত্ব প্রদান করেন।[২৩]

বাংলার হিন্দু সমাজেরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতা খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস নেতা বিপিনচন্দ্র পাল একজন চরমপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালে তিনি দু'বছরের জন্য ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফিরে হিংসার পথ পরিহার করেন।[২৪] ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতিবাদে বলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে অচল করে দেয়া ভারতীয়দের নিজস্ব দুর্বলতার কারণেই সম্ভব হবে না। তিনি এক দশক পূর্বে সংঘটিত বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ভারতবাসীর সাবধান থাকা উচিত। তিনি ব্রিটিশ কতৃপক্ষের সাথে সমঝোতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, প্রয়োজনে ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা যেতে পারে। দাবি অগ্রাহ্য হলে গান্ধীর কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।[২৫] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির একজন পুরোধা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় অগ্রসর হয় তখন তিনি ইংরেজ প্রবর্তিত ভারতের শাসন সংস্কারের সমর্থন করেন এবং মন্ত্রিত্ব (১৯২১) গ্রহণ করেন।[২৬] ১৯২১ সালে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কোলকাতায় যে 'রিফরম্‌স' এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালনা করা।[২৭]

পরিশেষে, খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতায় বাংলার মুসলিম নেতৃত্ব তুলনামূলক অগ্রজ ভূমিকা পালন করেন। অনেকে তুরস্কের খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও তুর্কীর স্বেচ্ছাচারী সুলতানকে বিশ্বের খলিফা মানা কিংবা ব্রিটিশদের বিরাগভাজন হয়ে তাঁর খিলাফত পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে শরীক হননি। নবাব আলী চৌধুরী ছিলেন তার পুরোধা। তাঁর ন্যায় অন্যান্য মুসলিম নেতৃত্ব মনে করেন যে ভারতীয় মুসলমানেরা নিজেরাই পশ্চাৎপদ। নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সক্রিয় না হয়ে extraterritorial একটা বিষয়ের জন্য সংগ্রামের কর্মসূচী ছিল অবাস্তব। এ. কে. ফজলুল হক, আবুবকর সিদ্দীকী, আবুল কাসেমের ন্যায় নেতৃবৃন্দ প্রথমে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরি বর্জনকে সমর্থন করতে না পেরে আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের বিরুদ্ধে মুসলিম নেতৃত্বের ঐকমত্যের পেছনে যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল। সরকারি রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯১৭ হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রদের হার এক চতুর্থাংশ কমে যায় এবং এজন্য

প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনকে দায়ী করা হয়। হিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধীতা করেন তাঁরা অসহযোগের পুরো কর্মসূচিকেই আযৌক্তিক মনে করেন।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম নেতৃত্বের বিরোধিতা এই আন্দোলনের মূল স্রোতকে থামাতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত, এই আন্দোলন সফল হয়নি। প্রথমে ১৯২২ সালে চৌরিচৌরার ঘটনার প্রেক্ষিতে গান্ধী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত এবং ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের জাতীয় পরিষদ খিলাফত প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিলে খিলাফত আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের প্রেক্ষিতে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন বাংলার কিছু নেতৃত্বের বিরোধিতা একেবারে অসংগত ছিল না।

সূত্র-নির্দেশ

১। কারণ মুসলমানদের পবিত্রস্থানসমূহ তথা সিরিয়া, আরব, ফিলিস্তিন, ইরাক প্রভৃতি দেশগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হতে পূর্ববর্তী চারশত বছর তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। 'সম্পাদকীয়', *মালঞ্চ*, কলকাতা, ৬ষ্ঠ পর্ব, ১২শ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯২০, পৃ: ৯৫০।

২। ডেভিড থমসন, *'ইউরোপ সিন্স নেপোলিয়ন'*, লন্ডন, ১৯৬২, পৃ: ৫৭৫-৬০৮।

৩। ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ১৫৬-১৫৮।

৪। নওয়াব আলী চৌধুরী, *সভাপতির অভিভাষণ*, কলিকাতা, ১৩২৬, পৃ: ৭০-৭২।

৫। ওয়াসিমুদ্দীন আহমদ, *অ্যান অ্যাপিল অব দ্যা বেঙ্গল মুসলেম ফেডারেশন টু দ্যা মোহামেডানস্ ভোট্‌স ফর ইলেকশন অব মেম্বারস টু দ্যা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল*, ক্যালকাটা, ১৯২৩, পৃ: ১-৫।

৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (১৯০৫-৪৭), কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ: ২৪৬। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, *আ নেশন ইন মেকিং*, ক্যালকাটা, ১৯২৫, পৃ: ৩৩৮।

৭। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ: ৯১।

৮। ফররোখ আহমদ নিজামপুরী, 'হিজরত', *আল-এছলাম*, শ্রাবণ, ১৩২৭, পৃ: ২১৯-২০।

৯। *দি মুসলমান*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২১, পৃ: ৫।

১০। এস মইনুল হক, *মোহাম্মদ আলী*, করাচি, পাকিস্তান হিস্টরিকেল সোসাইটি, ১৯৭৮, পৃ: ১০৯-১০

১১। *দি মুসলমান*, ২০ আগষ্ট, ১৯২০, পৃ: ৪।

১২। *ঐ*।

১৩। *ঐ*। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২০, পৃ: ৫।

১৪। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২০।

১৫। মুহম্মদ আব্দুল খালেক (সম্পাদিত), *শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ: ২০২।

১৬। মুহম্মদ আব্দুল বাকী, 'ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে উপমহাদেশীয় উলামা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, পৃ: ২৮।
১৭। মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন,* ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ: ২৮।
১৮। *ঢাকা প্রকাশ,* ৯মে, ১৯২০, ১২ ডিসেম্বর, ১৯২০।
১৯। মইন জায়েদি, *এভোলুশান অব মুসলিম পলিটিক্যাল থট অব ইন্ডিয়া,* ভল্যুম - ২, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫, পৃ: ২১৭।
২০। খাজা মুহম্মদ আযম, *প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস অব দ্যা ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম এসোসিয়েশন,* ঢাকা, ১১ এপ্রিল, ১৯২০, পৃ: ৮।
২১। 'সম্পাদকীয়', *ছুন্নত-অল-জামায়াত,* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৫, কলিকাতা, পৃ: ১৮৭।
২২। গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ,* ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩২-৩৩।
২৩। *ঢাকা প্রকাশ,* ৫ জুন, ১৯২১।
২৪। রঞ্জিত সেন, 'বিপিন চন্দ্র পাল এর রাজনৈতিক মতবাদ ঃ একটি দিক' *ইতিহাস অনুসন্ধান* - ১৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ৫৪৯।
২৫। এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্ট্রার* পার্ট - ৩, শিবপুর, ক্যালকাটা, ১৯২১, পৃ: ১১২ (সি)।
২৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান,* কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ: ৫৬৯-৭০।
২৭। এন. এন. মিত্র, *ঐ,* ১৯২২, পৃ: ১৫।

কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭ খ্রিঃ) ও গুণধর মাইতি

শঙ্কর দাস

কার্ল মার্কসের কথায় ''যতদিন শ্রেণী থাকবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে। এই সংগ্রাম কখনও গোপনে, কখনও উন্মুক্ত, কখনও সংগঠিত এবং কখনও অসংগঠিত, কিন্তু সংগ্রাম চলবেই।[১]

বর্গাদার বা অধিয়ারের ওপর শোষণ, পীড়ন, অবিচার, প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ও ধূমায়িত রোষে তিরিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে মনোভাব দেখা দিয়েছিল নির্দিষ্ট দাবিতে তাকে সংহত করে এগিয়ে যাবার সুস্পষ্ট আহ্বান সামনে এসেছিল বলেই তেভাগা আন্দোলন সীমানার গন্ডী ছাড়িয়ে অবিভক্ত বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল।[২]

সুন্দরবন অঞ্চলে শতকরা ৯০ জন কৃষকই ভাগচাষী। ভাগচাষীর জমিতে কোন অধিকার নাই, জমির মালিক জমিদার। জোতদার, মহাজন ভাগচাষীকে চাষ করতে জমি দিতেন, এক বৎসর চাষের পর অন্যবৎসর নাও দিতে পারেন। জমির মালিকের ইচ্ছামত তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত। জমির মালিকের নিয়ন্ত্রিত স্থানে খামার ছিল। ঝাড়াই মাড়াই এর ফসলের অর্ধেক পেত ভাগচাষী আর অর্ধেক মালিক। কিন্তু চাষী তার নিজের নিজের অংশ নেবার আগে তার অংশ থেকে জমির মালিক আদায় করত খামার চাঁচানী, সেলামী, নজরানা, কাকতাড়ানী, কড়ালী, পার্বনী, বারোয়ারী, দারোয়ানী প্রভৃতি বিভিন্ন আদায় (আবওয়ার)। এর উপর আছে অভাবের তাড়নায় চাষের সময় বা আগে গরীব চাষী জোতদার, জমিদার, মহাজনের কাছ থেকে ধান ধার নিত, তাতে সুদদিতে হত শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ। এক বস্তা ধান ধার নিলে দেড় বস্তা সুদসমেত দিতে হলে তাকে বলা হত দেড়াবাড়। আবার বস্তায় দুবস্তা দিতে হলে বলা হত দুনোবাড়। ভাগচাষীরা সব আদায় দিয়ে কর্জ শোধ দিয়ে যে ধান পেত সামান্যই বা কিছুই পেত না বরং ধার বাকী থাকত বা আবার ধান ধার নিয়ে যেতে হবে। এই ছিল বর্গাদারদের অবস্থা।[৩] ২৪ পরগনার দক্ষিণাংশে বর্গাদারদের অবস্থা একেবারে ক্রীতদাসের মত।[৩ক]

অত্যাচার কেবল অর্থনৈতিক ছিল, এমন নয়। শ্রেণী শোষণের এক বিশেষ মাত্রা হল শ্রেণী ও লিঙ্গের সমন্বয়। আধিয়ার শ্রেণীর মেয়েদের মনুষ্যত্বকে নস্যাৎ করে

জোতদার জমিদারগণ তাদের দেখত ভোগের বস্তু রূপে। কারো যদি বিধবা বোন, সধবা স্ত্রী বা যুবতী মেয়ে থাকতো তাদের দাদা, স্বামী এবং বাবাকে রাত ১০টার সময় পৌঁছে দিতে হত নায়েব ম্যানেজারের ভোগের জন্য। ভোরে আবার তাদেরকে বাড়ী ফেরৎ নিয়ে আসতে হত। তৎকালীন যুবকদের মধ্যে দারুন ঘৃণাক্রোধ জন্মায়। প্রকাশ্যে কোন কিছু করার উপায় না থাকায় রাত্রির অন্ধকারে তাদের বিভিন্ন লাটের নায়েব, ম্যানেজারদের গোপনে হত্যা করত। উদাহরণ স্বরূপ বুধাখালীর পাশেরলাটে নদীর পারে মুন্সেফ বাবুদের নায়েব কৃষ্ণ মজুমদার কে হত্যা করা হয়। পুলিশ মৃত ব্যক্তির লাশ খুঁজে পায়নি।[৪]

১৯৪২ সালের ১৭ অক্টোবর প্রচন্ড ঝড়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে গঙ্গার জল ৭/৮ ফুট উঁচু হয়ে একটা বিরাট বাঁধের মতো আকার নিয়ে ঘরবাড়ী পথ ঘাট মাঠ সব একাকার করে ডুবিয়ে নিয়ে গেল উত্তর মুখো হয়ে। ফ্রেজারগঞ্জ মৌশুনী, সাগর, কাকদ্বীপের নদী তীরবর্তী দক্ষিণ পশ্চিমাংশ হয়ে ডায়মন্ডহারবার ফলতা সব ডুবে গেল। মেদিনীপুরের খেজরী, কাঁথী, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা এবং হাওড়া শিবপুর ডুবে যায়।[৫] বন্যার কবলে পড়লেন ২ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় সরাসরি ও আনুসঙ্গিক কারণে ১৪ হাজার ৫ শত মানুষের মৃত্যু ঘটল। গৃহপালিত পশুর জীবন হানি ঘটল ১ লক্ষ ৯০ হাজার। অভাবের তাড়নায় বহু মানুষের জমি হাতছাড়া হল জলের দরে।[৬]

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় চন্দন পিঁড়ির শয়তান তুল্য বসন্ত মন্ডল এক মণ এক সের খেসারি দিয়ে ৫ মণ ধানের দলিল লিখিয়ে নিয়ে ছিল। শেষে চাষীরা নিজেদের হাটে বাজারে বিক্রয় হতে লাগল। অনেক চাষী দুই এক মণ ধানের জন্য এক বছর বা দেড় বছরের জন্য ক্রীতদাস হয়। তেমনি এক মণ ধানের বিনিময়ে অনেক দুর্ভাগা মা রাত্রির পর রাত্রি দেহ দিয়ে পশুদের লালসা মিটিয়ে সন্তানদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।[৭]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় গান ঃ- সোনার বাংলা ....দুয়ারে কান্না, মা একটু ফেন।[৮]

কৃষক সভা আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এল। কোথাও লঙ্গর খানা খোলা হল, কোথাও বিনামূল্যে চাল বিতরণ। অসুস্থদের জন্য ঔষধ। গঠিত হল পিপ্‌লস্ রিলিফ কমিটি। কাকদ্বীপে রিলিফের কাজ করতে করেত কর্মীদের সংগঠিত করলো কৃষকসভা। তার সাথে এলেন গুণধর মাইতি, যতীন মাইতি।[৯]

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় ভাগচাষীদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। পরের বৎসর বুধাখালীর ভাগচাষীগণ বুধাখালীর চকদার বটকৃষ্ণ সাউকে আধা ভাড়া দিতে চায়, কিন্তু দেড়াবাড়ী ও আবওয়াব দেবে না বললে ঝাড়াই মাড়াই বন্ধ থাকে বৈশাখ

মাস পর্যন্ত। গরু উদাম ছিল এবং বর্ষায় ধান ডুবে যাবে বলে রাসবিহারী ঘোষ ২৪ পরগণা জেলার D. M. স্টুয়ার্ট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্টুয়ার্ট সাহেব বলেন গোয়েন্দা রিপোর্ট, ভাগচাষীরা যে যার বাড়ীতে ধান নিয়ে চলে গেছে। রাসবিহারী ঘোষ বলেন, মাঠে একটা যৌথ খামার করা হয়েছে, আপনি স্বচক্ষে দেখতে পারেন। স্টুয়ার্ট সাহেব তদন্তে এসে দেখেন ভাগচাষীগণ ধান তাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়নি। তখন বটকৃষ্ণ চকদারের কর্মচারীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার বক্তব্য কি? এই শর্তেই জমিভাগে দেওয়া হয়েছে। এই শর্ত মানতে হবেই। তখন স্টুয়ার্ট সাহেব বলেন অর্ধেক ভাগ নেবেন কি না বলুন। আমরা মালিকের কর্মচারী মালিকের অনুমতি ছাড়া আমরা অর্ধেক ধান নিতে পারি না। ভাগ চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা কি বলেন, ভাগচাষীরা বলেন যে ভাগ নিয়ে কোন বৎসর ভাগ রশিদ দেয় নাই। এই গন্ডগোলের মূলে ভাগধান প্রাপ্তির রশিদ দিতে হবে। নায়েব বলেন রশিদ আমি দেব না। স্টুয়ার্ট সাহেব কোন মীমাংসা করতে পারলেন না। স্টুয়ার্ট সাহেব চলে যাওয়ার পরে ভাগচাষী নয় এমন কিছু রায়ত কৃষককে সাক্ষী স্বরূপ দাঁড় করিয়ে রেখে আধাভাগ ভাগচাষীগণ যে যার বাড়ীতে নিয়ে যায়। বুধাখালীর চকদারের প্রাপ্ত আধা ভাগ ধান নিয়ে তার খামারে ঠেকবন্দি করে মজুত রাখে। স্টুয়ার্ট সাহেব রাসবিহারী ঘোষকে ডেকে বলেন ভাগচাষীগণ জমিদারের প্রাপ্য অংশ লুট করে নিয়ে গেছে। রাসবিহারী ঘোষ বলে যথাস্থানে মজুত আছে। মহকুমা শাসক সহ স্টুয়ার্ট সাহেব কাকদ্বীপ থানার নিকট মালিক পক্ষ ও ভাগচাষী উভয় পক্ষকে ডেকে পাঠান। চকদার বটকৃষ্ণ সাউ এর কর্মচারী বলেন কিভাগ নেব। কত কি উৎপাদন হয়েছে, আমি ভাগ নিতে পারি না। ফৌজদারী কোর্টে ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে লুট পাটের কেস দিয়েছি। বিচারে যা হয় তা হবে। তখন স্টুয়ার্ট সাহেব মহকুমা শাসককে বলেন পুলিশ রিপোর্ট যে কেস হয়েছে সে সমস্ত কেস তুলে নিতে হবে। দরখাস্তের মূলে সে সব লুটতরাজ কেস হয়েছে আপনি নিজে তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। উভয় প্রকার কেসে পুলিশে যে রিপোর্ট হয়েছে সেই সেই পুলিশের নাম আমার কাছে পাঠাবেন। আমি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিব। ভাগচাষীগণ এই ঘটনাকে তাদের বিরাট জয় বলে মনে করেন এবং "কৃষক সমিতির জয়" লাল ঝান্ডার জয় বলে জয়ধ্বনি দেন।

তার পরের ঘটনা বৈশাখ মাস গতে, পরের বৎসর চাষের জন্য আগের বৎসর ভাগচাষীগণ যে যে জমি চাষ করে ছিলেন সেই সেই জমি দখল করেন। এই দখল করার জবাবে জমিদার ও চকদার পক্ষ ফৌজদারী কোর্টে আবেদন করলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। স্টুয়ার্ট সাহেব রাসবিহারী ঘোষ মারফত জানান যে, আমি মহকুমা শাসক সহ বুধাখালী গ্রামে তদন্ত করতে যাব সমস্ত ভাগচাষীগণ যেন উপস্থিত থাকেন। নির্দিষ্ট তারিখে স্টীমার যোগে মহকুমা শাসক সহ স্টুয়ার্ট সাহেব উপস্থিত হয়ে ভাগচাষীদের

নেতা যতীন মাইতি ও গুণধর মাইতিকে ডেকে পাঠান। প্রত্যুত্তরে উভয় নেতা স্টুয়ার্ট সাহেবের নিকট যেতে অস্বীকার করেন কারণ ইতিমধ্যে বহু কেসের ওয়ারেন্ট তাদের উপর আছে। স্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, এখানে আসলে তারা গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কা অমূলক নয়। আমরা তাদের কাছে যাব। আমরা দুই জন ছাড়া অন্য কোন পুলিশ থাকবে না। কয়েকজন বৃদ্ধ কৃষককে বলেন, আমদের বডি সার্চ করুন, আমাদের কাছে কোন আগ্নেয় অস্ত্র আছে কিনা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধ কৃষকগণ উভয়কে সার্চ করেন। মাঠের মধ্যে আলে বসে আলোচনা হয়। সমবেত ভাগচাষীগণ বলেন, গতবৎসর যে যে জমি চাষ করেছিলাম সেই জমি আমরা নাঙ্গল দিয়েছি। তখন স্টুয়ার্ট সাহেব চকদারের কর্মচারীর উদ্দেশ্যে বলেন আপনাদের বক্তব্য কি? চকদারের কর্মচারী বলেন, এটা চিরাচরিত প্রথা, প্রতিবৎসর বন্দোবস্ত নিতে হবে। তখন স্টুয়ার্ট সাহেব জোরের সহিত বলেন, তা কখনও হতে পারে না। তিনি মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যে বলেন, যত ১৪৪ ধারা আছে সমস্ত কেস প্রত্যাহার করে নিন। মহকুমা শাসক সমস্ত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়ে ছিলেন। এই ঘটনা ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই কাকদ্বীপ থানার বিভিন্ন গ্রামের ভাগচাষীগণ বুধাখালীর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারা কৃষক সমিতি গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। বুধাখালীতে যতীন মাইতি, পাথর প্রতিমায় গুণধর মাইতি এবং নামখানায় জগন্নাথ মাইতি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের কাজ করেন।[১০]

১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা গঠিত হবার পর ১৯৩৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার কৃষকসভা গঠিত হয়। ১৯৪০ সালে কংসারী হালদার, জ্যোতিষ রায়, শৈলেন ঘোষ, মানিক হাজরা এবং হরেন চক্রবর্ত্তী ডায়মন্ড হারবারে একটি কৃষক সমিতির অফিস তৈরী করেন। সেই সময় কাকদ্বীপের কৃষকরা ঐ কৃষক সভার অফিসে আসতেন। এদের মধ্যে গুণধর মাইতি, যতীন মাইতি সহ কয়েক জন তাদের কাকদ্বীপে যাবার কথা বলেন। এখন কাকদ্বীপ ও নামখানা একই থানা। মূলত সামন্ত, নন্দ, দিনদা, শাসমলদের লাটদারী। হাজার বিঘা জমির লাটদার এরা।[১১]

১৯৪২ সাল থেকে কাকদ্বীপের চারিদিকে কৃষক সংগঠন গড়তে গড়তে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত লাগে। এসময় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনের নেতা প্রিয়রঞ্জন সেন আর গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী, সুবিমল চক্রবর্ত্তী যাদবপুর কলেজ থেকে যেতেন।[১২]

১৯৪৩-৪৬ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে কংসারী হালদার, যতীন মাইতি, জগন্নাথ মাইতি ও গুণধর মাইতির নেতৃত্বে শিবরামপুরকে কেন্দ্র করে গোপনে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে, অলিখিত পার্টি অফিস ছিল"প্রতিমা ফার্মেসী' গায়েনের বাজার। মনমথ দাস ও গুণধর মাইতি সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন।[১৩]

১৯৪৪ সালে বুধাখালীতে প্রথম প্রাকাশ্যে মিটিং হয়। সে মিটিংয়ে জ্যোতিষ রায়, যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, কংসারী হালদার এবং রেজজাক খাঁ উপস্থিত ছিলেন। তারা এই মিটিংয়ে জোরদার বক্তব্য রাখেন। চতুর্দিকে রটে গেল সেই বার্তা। বুধাখালী থেকে মথুরাপুর, হরিপুর, লয়ালগঞ্জ, চন্দনপিড়ি, নারায়ণপুর হয়ে আরো অনেক গ্রামে।[১৪]

১৯৪৫ সালে যতীশ রায় এবং গুণধর মাইতি সভা করতে যাচ্ছিলেন মথুরাপুরের লক্ষ্মী জনার্দনপুরে। যাবার পথে দুপুরে জোতদারের লোকরা তাদের ধরে নিয়ে গেল কাছারী বাড়ীতে। তাঁদের শাসানি চলল এলাকায় ঢোকা চলবে না। মুচলেকা দিতে হবে চাষীদের খ্যাপাবে না। কিন্তু শাসানিতে কোন ফল হল না। শেষে লেংটো (উলঙ্গ) করে বসিয়ে রাখা হল। এই খবর পেয়ে কৃষকরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল কাছারী বাড়ী।[১৫]

বুধাখালী, হরিপুর, চন্দনপিড়ি, লায়ালগঞ্জ এবং কাকদ্বীপের অন্যান্য গ্রামে মেয়েদের সংগঠিত করিবাব জন্য কংসারী হালদার, প্রভাষ রায়, গুণধর মাইতি, যতীন মাইতি, মাণিক হাজরা, আব্দুলরসুল এবং অন্যান্য ঘরোয়া মিটিং এবং বৈঠক করে মহিলাদের তেভাগা আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলেন। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাখিবালা সিন্‌হা, অহল্যা দাস, নিত্যময়ী জানা, সরোজিনী দাস, উত্তমী দাস, মাজিদা খাতুম এবং অন্যান্য মহিলা কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১৬]

অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ভূমি ব্যবস্থা, রাজস্ব, বর্গচাষ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। ফ্লাউড কমিশন ২২ মার্চ ১৯৪০ সালে তার রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে ভাগচাষীকে দুই ভাগ আর মালিককে এক ভাগ ফসল দেবার কথা বলা হয়েছিল।[১৭]

১৯৪০ সালের জুন মাসে যশোর জেলায় পাঁজিয়া সম্মেলনে ফসলের২/৩ ভাগ আদায় করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৮]

১৯৪৬ সালের মে মাসে খুলনা জেলার মৌভোগ সম্মেলনে তেভাগা সংগ্রাম শুরু কবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৯]

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লিগের "ডাইরেকট অ্যাকশন ডে" ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় ১৯ আগস্ট পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সে সময় সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সভা এই সংকট জনক মূহুর্তে দাঁড়িয়ে ১৯৪৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তেভাগার লড়াই এর ডাক দিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিতে সমাজ জীবনে সংকট যতই তীব্র হচ্ছিল, বিদেশি শাসক আর

দেশীয় সামন্ত প্রভুরা ততই বিক্ষোভের মোড় সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী গণসংগঠনগুলি সঠিক ভাবেই শ্রেণী দ্বন্দ্বের চেহারাটিকে চিহ্নিত করেছিল এবং শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন গড়ে তোলার সঠিক প্রয়াস চালাচ্ছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল, সঠিক সময়োপযোগী শ্লোগানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা শ্রেণী সংগ্রামই সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে।[২০]

২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক রাসবিহারী ঘোষ ১৯৪৭ সালের ৬ নভেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে বললেন, সরকার ভাগচাষীর নাম রেকর্ড করছে না। অবিলম্বে এই রেকর্ড করাতে হবে।[২১]

আন্দামান জেল থেকে সদ্য মুক্ত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ২৪ পরগণা জেলার সুনীল চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৬ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখের "স্বাধীনতা" কাগজে এক প্রতিবেদন লিখলেন ঃ

গত ৮ নভেম্বর (১৯৪৬ খ্রিঃ) কাকদ্বীপে পৌঁছে বুধাখালী গ্রামে যাই। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির লাল ঝান্ডা উড়ছে, খবর পেয়েছি। সুন্দরবনের সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক সেই লাল ঝান্ডার নিচে দাঁড়িয়ে, সরকার, জমিদার ও মহাজনের চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দাবি তুলেছে জমিদারের খামারে ধান তুলবে না, দশ আনা ধান চাষীর। ছ'আনা জমিদারের ভাগচাষীর স্বত্ত্ব স্বীকার করতে হবে।

"ঘুমন্ত সুন্দরবন আজ জেগে উঠেছে। সেখানকার নিরীহ মানুষ আজ সুন্দরবনের বাঘের মতোই লড়বে।"[২২]

কাকদ্বীপের ডাকবাংলো ময়দানে ১৯৪৬ সালে ১৮ নভেম্বর হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী ৭ হাজার কৃষকের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্লোগান উঠে ঃ দশ আনা চাষীর, ছ'আনা মহাজনের মানতে হবে। 'নিজ খামারে ধান তোল', বিনা খতিপুরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই।'

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবার মহকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক কংসারী হালদার, কৃষক নেতা যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, রাজকৃষ্ণ মন্ডল ও মাণিক হাজরা লাটদার জমিদারদের জুলুম ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। এই সভায় কাকদ্বীপে তেভাগার ডাক দেওয়া হয়।[২৩]

১৯৪৬-৪৭ সালে ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে তখনকার পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গে যে যে তেভাগা সংগ্রাম হয়েছিল তা ছিল যেমন বিরাট তেমনি জঙ্গী। ৬০ লাখ দুস্থ ভাগচাষী হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি মেয়ে-পুরুষ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া

ঐ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছিলেন। বাংলার কৃষকের রক্তে লালে লাল হইয়া পৃথিবী বিখ্যাত এক কৃষক আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল।[২৪]

কাকদ্বীপ অঞ্চলে তেভাগা বিরোধী জোতদারের নাম ঃ শচীন ঘোষ, রসময় হাজরা, সুরেশ পরামানিক, গদাধর দাস, অন্নদা দাস, বীরেন গিরি, অতুল সাঁতরা, ক্ষিরোধ বেরা, অতুলানন্দ শাসমল প্রভৃতি।[২৫]

কাকদ্বীপের ক্ষেত্রে আন্দোলনের শুরু বুধাখালী এলাকা থেকে। ফসল কাটা শুরু হওয়ার আগেই ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে। প্রথম দিকে বুধাখালীর কাছে মন্সেফ বাজারে মিটিং করতে গিয়ে প্রচন্ড বাধা আসে কাছারীর কর্মচারীদের কাছে। সম্মিলিত প্রতিরোধের ফলে সে বাধা দূর হয়।[২৬]

সুন্দরবনের 'সিপ্লট' এলাকার শিবরামপুর মৌজা। এক ভাগচাষী তেভাগার দাবিতে উৎসাহিত হয়ে বহুকালের প্রথা ভেঙ্গে 'নিজ খামারে' ধান তোলে। চকদারের নির্দেশে তাকে বেঁধে কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদ পেয়ে সহস্রাধিক কৃষক স্বেচ্ছাসেবক চকদারের কাছারি ঘিরে রাখল। কৃষক জনতার ক্রোধ ও রোষের সামনে জোতদার নতজানু হলো। কৃষক সমিতির সিদ্ধান্ত তেভাগার দাবি মেনে নেবেন বলে অঙ্গিকার করে ও ভাগচাষীকে তখনই মুক্তি দিয়ে 'চকদার' রেহাই পেল।[২৭]

গোবিন্দরাম পুরের প্রফুল্ল বেরার লাটের ভাগচাষীগণ তেভাগার দাবি তুলে খামারের ধান ঝাড়াই বন্ধ রাখেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারীতে এমন দুই জন ভাগচাষী ভোরে কাছারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের কে লাটদারের নির্দেশে প্রহরী ধরে এনে কাছারিতে প্রচন্ড মারধর করেন। সংবাদ পেয়ে ভাগচাষীগণ শঙ্খধ্বনি করলে আশে পাশের গ্রাম থেকে ভাগচাষী গোবিন্দরামপুরে আসেন। বুধাখালী গ্রামে যতীশ রায় তখন গুণধর মাইতি ও যতীন মাইতির সঙ্গে আন্দোলনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। সংবাদ পেয়ে তাঁরা গোবিন্দরামপুরে এলেন। ভীত সন্ত্রস্ত প্রফুল্ল বেরা প্রাণভিক্ষা চেয়ে যতীশ রায়ের কাছে আত্মসমর্পন করেন এবং তেভাগার দাবিকে মেনে নেন। উত্তেজিত কৃষক জনতা মীমাংসা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাত্রে কার্তিক খাঁড়ার নেতৃত্বে তার খামারের ধান খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কাছারির প্রহরীর গুলিতে কার্তিক খাঁড়া সহ ৯ জন আহত হন। পরে ৮ জন সুস্থ হয়, কিন্তু চিকিৎসার অভাবে জেল হাজতে কার্তিক খাঁড়ার জীবনাবাসন হয়। কার্তিক খাঁড়াই কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহীদ।[২৮]

১৯৪৭ সালে কাকদ্বীপের কৃষক কর্মী গুণধর মাইতি কৃষক সমিতির সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলেন মথুরাপুর এলাকার কোয়েমুড়ি গ্রামে এক সভায়। তেভাগার দাবি আদায় করতে হবে। হাঁটা পথ, খেয়া পার।

চকদার রজনী প্রধানের গুন্ডাবাহিনী পথের মাঝে ওত পেতে থেকে গুণধর মাইতিকে লক্ষ্য করে বন্দুকের তাগ করলো। গুণধর মাইতিকে রক্ষা করতে ঐ গুলিতে শহীদ হন ঐ এলাকার ভাগচাষী যতীশ হালদার।[২৯]

তেভাগার আন্দোলনের ডাক কাকদ্বীপ থানার এক প্রান্ত বুধাখালী থেকে শুরু করে লয়ালগঞ্জ, ফ্রেজারগঞ্জ, অন্যদিকে চন্দনপিঁড়ি, পাথর প্রতিমা, রাক্ষস খালি, বুড়াবুড়ি তট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন বেরার লাট, ফটিকপুর উকিলের লাট প্রভৃতি লাটে বিস্তার লাভ করে। কৃষকদের পাল্টা আক্রমণে বিভিন্ন লাট থেকে জোতদার এবং কর্মচারী কাকদ্বীপ ছেড়ে কলিকাতা এবং মেদিনীপুর চলে যায়।[৩০]

"কাকদ্বীপ (২৪ পরগণা), ১৯৪৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল, সুন্দরবন অঞ্চলের লয়ালগঞ্জ ও হরিপুর হইতে পুলিশ ও জোতদারদের গুন্ডাদের অত্যাচারের রোমহর্ষক কাহিনী পাওয়া যাইতেছে। নেতা ও কর্মীদের খোঁজ না দেওয়ায় পুলিশ ঘর থেকে মহিলাদের টেনে বার করছে এবং প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘন্টার পর ঘন্টা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে দাঁড়করিয়ে রেখে তামাসা দেখেছে। বিবস্ত্র অবস্থাতেই জানকী দাসী ও তারিনী দাসীকে বেত মারা হয়। উভয়েই অজ্ঞান হয়ে যান। ভূষণ মাইতির স্ত্রীর ওপরও একই ভাবে নিপীড়ন চলে। কোথাও কোথাও রাত্রিকালে হানা দিয়ে কৃষক রমীনদের বিবস্ত্র করা হয় এবং নগ্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর টর্চের আলো ফেলিয়া পাষন্ডের দল বিকৃত লালসা চরিতার্থ করে।[৩১]

গুণধর মাইতি বলেন, "জমিদারের লেঠেল ও পুলিশের ভয়ে আমরা বাঘের ও সাপের ভয় অগ্রাহ্য করে পাতার রস এবং কাঁকড়া পুড়ে খেয়ে জঙ্গলে থাকতাম।"[৩২]

যে সমস্ত ভাগচাষী আন্দোলনে যোগ দেয়নি বা জোতদারের খামারে ধান তুলে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এলাকার কৃষকের ক্ষোভ প্রকাশ পায়। এই রকম ভাগচাষী গুণধর বর্মনের বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।[৩৩]

১৯৪৬-৪৭ সালে কাকদ্বীপে যে আন্দোলন হয় সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে একটি গোপন সরকারী নির্দেশ মার্চ মাসের প্রথমে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য এলাকার মত ডায়মন্ড হারবারের এস. ডি. ও-র কাছে আসে। কাকদ্বীপ ডায়মন্ডহারবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রিপোর্টে এস. ডি. ও. স্বীকার করেন যে, ভাগচাষীগণ ব্যাপক ভাবে সমস্ত ফসল নিজেদের ঘরে নিয়ে গেছে, জমির মালিকদের এক তৃতীয়াংশ দিতে চাওয়ায় তারা তা নিতে অস্বীকার করেছেন। এস. ডি. ও. তাঁর রিপোর্টে স্বীকার করেন "ভাগচাষীর ক্ষোভ ন্যায্য। জমির মালিকরা ভাগচাষীর স্বার্থ একেবারেই দেখেন না। আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যাপক হয়েছে এবং সরকার ভাগচাষীদের স্বার্থে দেখতে যাচ্ছে" এই কথা ছড়ানোর পরেই এবং ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে বর্গাদারদের স্বার্থে 'বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক

নিয়ন্ত্রণ বিল' প্রকাশের পরেই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি ভয়াবহ বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশংকা রয়েছে। ১০৭ ধারা ও ১৪৪ ধারা জারী করে পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। (বিভিন্ন কৃষকদের বিরুদ্ধে) নির্দিষ্ট মামলা জারী করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।"[৩৪]

ইতিমধ্যে বাংলার অন্যত্র তেভাগা আন্দোলন শেষ। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে আন্দোলন তুলে নেওয়া হল ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

কাকদ্বীপের আন্দোলনে এমন ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যায় এবং কৃষকের মধ্যে এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যে কাকদ্বীপের নেতাদের পক্ষে আন্দোলন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। আমরা কেউ কেউ চাইলাম আন্দোলনটা চালিয়ে যেতে, কিন্তু পার্টি হেড কোয়ার্টার, কিষাণ সভার নেতারা আন্দোলনটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন না। এই সব অবস্থার মধ্যে কাকদ্বীপের অনেক কৃষক নেতা, কর্মী জেলে গেলেন। রাসবিহারী ঘোষ, কংসারী হালদারও গ্রেপ্তার হলেন। কংসারী হালদারকে এক দিন রেখে ছেড়ে দেওয়া হল।

আন্দোলন তখনকার মতো থেমে গেলেও এই প্রথম কাকদ্বীপ এলাকায় গরিব কৃষক, ভাগচাষীর মধ্যে তীব্র শ্রেণী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল।[৩৫]

গুণধর মাইতি বলেন - ১৯৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারীটা আমার জীবনের "রেড লেটার ডে" কোয়েমুড়ির রজনী প্রধানের ঘর জ্বালানী ও লুটপাট কেসের আসামী করেছিল আমাকে। ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও আমাকে ধরতে পারেনি। পার্টির সাথে ঠিক ঠিক বনছিল না নানা কারণে। তবু সেরেন্ডার করার নির্দেশ এল, প্রতিবাদী আমি অগত্যা ধরা দিলাম। ২ বৎসর জেল হল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী জেল থেকে ছাড়া পেলাম।[৩৬]

গুণধর মাইতি ১৯২০ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তার পারিবারের সঙ্গে কাকদ্বীপ থানার বুধাখালীতে আসেন। কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলনের সময় ভারপ্রাপ্ত কৃষক নেতা রূপে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। বিপদজ্জনক তিন মাইতির তাঁর নিজের কথায় দ্বিতীয় জন। তিনি দ: ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমার সি. পি. আই (এম) এর এম. এল. নির্বাচিত হয়ে ছিলেন।[৩৭]

তিনি কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে বলেন - তেভাগা আন্দোলন সফল তো বটেই। কেননা এলাকার কৃষক সামন্ত্রতান্ত্রিক শোষণের শৃংখল ছিঁড়ে ফেলেছে, জমির উপর কায়েম হয়েছে বর্গাদারদের অধিকার। ফসলের ভাগের চেয়েও মানুষের মত বেঁচে থাকার সম্মান ও মর্যাদা লড়াই করে কিভাবে ছিনিয়ে আনা যায় তা কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন দেখিয়েছে।[৩৮]

সূত্র-নির্দেশ

১। *২৪ পরগণা জেলার তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৭)*, শিবদাস ভট্টাচার্য, স্মারক পত্র ২২তম সম্মেলন - ১৯৯৫, উ: ২৪ পরগণা জেলা, কৃষক সভা, বারাসত, পৃ: ৩৩।

২। *বাংলার 'তেভাগা' - তেভাগার সংগ্রাম*, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ: ১৮।

৩। স্মারক পত্র, ঐ, পৃ: ৩৩।

৩ক। তেভাগার লড়াই, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, পৃ: ৩।

৪। সাক্ষাৎকার-গুণধর মাইতি, বুধাখালী, দ: ২৪ পরগণা, ৩-১১-২০০২।

৫। *লাল বাগানে শিশু তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, শ্রী সন্তোষ কুমার বর্মণ, কাকদ্বীপ, ১৯৯৭, পৃ: ৯।

৬। জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ: ২৫।

৭। *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ: ১৫।

৮। সাক্ষাৎকার - পঞ্চানন দাস, মঠের দীঘি, দ: ২৪ পরগণা, ৩০-৫-০৩।

৯। স্মারক পত্র, ঐ, পৃ: ৩৩।

১০। সাক্ষাৎকার - গুণধর মাইতি, ঐ।

১১। স্মারক পত্র, ঐ, পৃ: ৩৩, *কাকদ্বীপে অগ্নিযুগ*, কংসারী হালদার, *তেভাগার লড়াই*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ: ১৯।

১২। ধৃতি তেভাগা ৫০, কল্যানগড়, উ: ২৪ পরগণা, ১৪০৩, পৃ: ১৭৩।

১৩। শ্রী সন্তোষ কুমার বর্মন, ঐ, পৃ: ২২।

১৪। *অনেক রক্ত ঝরেছে অধিকার পেতে*, গুণধর মাইতি, *তেভাগার লাড়াই*, ঐ, পৃ: ২১।

১৫। *২৪ পরগণার শ্রমিক কৃষক আন্দোলন* ও প্রভাস রায়, *অভিযাত্রিক*, জানুয়ারী-জুন, ১৯৯২, পৃ: ১৪৮।

১৬। *দি তেভাগা মোভমেন্ট ইন কাকদ্বীপ*, রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, কলিকাতা, ২০০১, পৃ: ১১৪।

১৭। স্মারক পত্র, ঐ, পৃ. ৩৩।

১৮। *কৃষক আন্দোলনের অমর অধ্যায়, তেভাগা লড়াই*, বিনয় চৌধুরী, *তেভাগার সংগ্রম - ফিরে দেখা*, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ: ১২০।

১৯। *তেভাগার সংগ্রাম - ফিরে দেখা*, ঐ, পৃ: ১২০।

২০। *তেভাগার লড়াই*, হেমন্ত ঘোষাল, *পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা*, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প: ব: সরকার, কলিকাতা, পৃ: ৫৮।

২১। জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ: ৪২।

২২। *স্বাধীনতা*, ১৬-১১-১৯৪৬।

২৩। *স্বাধীনতা*, ২৩-১১-১৯৪৬।

২৪। মণি সিংহ, "তেভাগা সংগ্রামের স্মৃতিকথা", *তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ*, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ: ৪৫।

২৫। *ধৃতি তেভাগা ৫০*, ঐ, পৃ: ১৬৬।

২৬। *বর্তিকা*, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৮৭, মহাশ্বেতা দেবী, মুর্শিদাবাদ, পৃ: ৩২।

২৭। *স্বাধীনতা,* ২৯-১১-১৯৪৬।

২৮। সাক্ষাৎকার, গুণধর মাইতি, ঐ।

২৯। *পশ্চিমবঙ্গ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা,* প্রকাশক - তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২000, পৃঃ ১৬১।

৩০। *পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা,* ১৪04 বঙ্গাব্দ, ঐ, পৃঃ ৮৭।

৩১। *স্বাধীনতা,* ৮-৪-১৯৪৭।

৩২। সাক্ষাৎকার গুণধর মাইতি, ঐ।

৩৩। *বর্তিকা,* ১৯৮৭, ঐ, পৃঃ ৩৪।

৩৪। ফাইল ৬ এম - ৩৮-৪৭ বি, ডিসেম্বর ৪৮/১৫-১০৭, ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট, এল, আর ব্রাঞ্চ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজ খানা)

৩৫। রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে সাক্ষাৎকার টি নেন মৈত্রেয় ঘটক। *বর্তিকা,* ১৯৮৭, ঐ, পৃঃ ৩৩।

৩৬। সাক্ষাৎকার গুণধর মাইতি, ঐ।

৩৭। *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলনের আর্থ রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা - পুনর্বিচার।* সুস্নাত দাশ, কলিকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৯০।
তেভাগা আন্দোলন ও যতীশ রায়, পলাশ প্রামানিক, বাখরা হাট, দঃ ২৪ পরগণা, ১৯৯৮, পৃঃ ৬০।

৩৮। সাক্ষাৎকার, গুণধর মাইতি, ঐ।

নেত্রকোনার টঙ্ক আন্দোলন এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ ঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

টঙ্ক আন্দোলন ছিল অবিভক্ত বাংলায় কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম। উনিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলায় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয় যা ব্রিটিশ সরকারের ভিত কাপিয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে তেভাগা আন্দোলন, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, সুখারি বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, টঙ্ক আন্দোলন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মূলত এই আন্দোলনগুলির সবগুলিতেই কমিউনিস্ট পার্টির নাম জড়িত ছিল। টঙ্ক ছিল টাকার পরিবর্তে উৎপাদিত ধানের মাধ্যমে খাজনা পরিশোধের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদিত হোক বা নাহোক কৃষকদেরকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হত এবং এই খাজনার পরিমান ছিল টাকায় প্রদেয় খাজনার চাইতে কয়েকগুন বেশী। ফলে কৃষকরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। টঙ্ক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মণি সিংহ।

কমরেড মণি সিংহ ১৯০১ সালের ২৮ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতামহী ছিলেন বর্তমান নেত্রকোণা জেলার সুসং-দুর্গাপুরের জমিদার বংশের মেয়ে। সেই সূত্রেই সুসং-দুর্গাপুরেই তিনি তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেন এবং সুসংয়ে লেখাপড়া শেষে ১৯০৯ সালের দিকে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। কলকাতার তৎকালীন উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ মণি সিংহের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি তৎকালীন বাংলার বিপ্লবীদল অনুশীলনে যোগদেন।[১] ১৯২৫ সালে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন।

কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে আন্দোলনের সূত্রপাত

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে ১৯৩০ সালের ৯ মে রাতে মণি সিংহ কলকাতা হতে গ্রেফতার হন এবং বিভিন্ন জেলখানা ও ক্যাম্প ঘুরে ১৯৩৫ সালে সুসংয়ে নিজ

বাড়িতে নজরবন্দী হন। এই নজরবন্দী অবস্থায় প্রতিদিন বিকেলে তাঁকে একবার করে থানায় হাজিরা দিতে হ'ত।[২]

সুসং জমিদারবাড়ীর আধামাইল দূরে দশাল নামক মুসলমান কৃষকদের একটি গ্রাম ছিল। নজরবন্দী থাকা অবস্থাতেই ঐ গ্রামের কয়েকজন কৃষকের সাথে মণি সিংহের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তাদের মাধ্যমে তিনি অত্র এলাকায় টঙ্ক প্রথার অত্যাচার এবং টঙ্ক সম্পর্কে কৃষকদের মতামত, ঘৃণা প্রভৃতি জানতে পারেন। আলাপ-আলোচনায় কৃষকরা মণি সিংহকে টঙ্কপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অনুরোধ জানান।

ইতিমধ্যে তাঁর নামে একটি মামলা হয় এবং মামলায় তাঁকে তিন বৎসরের সাজা দেওয়া হয়, যা আপিলের মাধ্যমে দেড় বৎসর হয়। ১৯৩৭ সালে সমগ্র বাংলায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিমলীগকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মন্ত্রীসভা গঠনের পর তৎকালীন সরকার যারা বিনা বিচারে বন্দী আছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার সূত্র ধরেই কমরেড মণি সিংহ ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর পরই তিনি তার অসুস্থ মাকে দেখার উদ্দেশ্যে সুসং-দুর্গাপুরে যান। সুসং-দুর্গাপুরে পৌছাবার ২/৩ দিনের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী দশাল গ্রামের ৮/১০ জন মুসলীম কৃষক তাঁর বাড়ীতে যান এবং তাঁকে টঙ্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার অনুরোধ করেন।

সুসং-দুর্গাপুরে টঙ্ক আন্দোলন করা ছিল কমরেড মণি সিংহের পক্ষে খুবই কঠিন, কারণ যাদের বিরুদ্ধে টঙ্ক আন্দোলন করতে হবে তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর আত্মীয়। তাছাড়া তাঁর নিজ পরিবারের কিছু জমিও টঙ্কের অর্ন্তভুক্ত ছিল। ফলে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল তাঁর জন্য খুবই কঠিন। এই সময় তাঁর মনে ভাবনা আসে যে, আগে আমার পারিবারিক স্বার্থ না রাজনৈতিক আদর্শ। তিনি আরো ভাবেন যে, "এই আন্দোলনের কারণে আমার নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের স্বার্থে আঘাত লাগবে, এজন্যই হয়ত আমি এ আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছি। অবশেষে রক্ত ও সম্পত্তির সম্পর্ক অপেক্ষা মণি সিংহের কাছে জীবনাদর্শ ও কর্তব্যবোধই বড় হয়ে উঠে এবং তিনি টঙ্ক আন্দোলন করার জন্য মনস্থির করেন।"

টংকপ্রথা

টঙ্ক মানে ধান কড়ারী খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মত ধান দিতে হবে। টঙ্ক জমির উপর কৃষকের কোন স্বত্ব ছিলনা। তৎকালীন ময়মনসিং জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী ও শ্রবদী এই পাঁচটি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মুলত টঙ্ক ছিল অত্র এলাকার প্রচলিত স্থানীয় নাম। এই প্রথা সেই সময়ে পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল, যেমদ চুক্তিবর্গা, ফুরন, সাঁজাভাগ. খাড়াভাগ, মকরাবাগা,

ইত্যাদি।[৩] সুসং জমিদার এলাকায় যে টঙ্ক প্রথা প্রচলিত ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হ'ত সাত থেকে পনেরো মণ। অথচ সেই সময় জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া এক একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময় ধানের দর ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হত এগার থেকে প্রায় সতেরো টাকা।[৪] এই প্রথা শুধু জমিদারদের মধ্যে ছিল কেবল তাই নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনেরাও টঙ্কপ্রথায় লাভবান হ'ত। সেই সময় জোতস্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশ টাকা থেকে দু'শ টাকা নজরানা দিতে হ'ত। গরীব কৃষক ঐ নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেননা। অন্যদিকে টঙ্কপ্রথায় কোন নজরানা লাগতনা। কাজেই গরীব কৃষকের পক্ষে টঙ্ক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। প্রথমদিকে টঙ্কের হার খুব বেশী ছিলনা, কৃষকরা যখন টঙ্ক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন প্রতি বছর ঐসব জমির হার নিলামে ডাকা হ'ত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশী ধান দিতে রাজী হত তাকেই জমি দেওয়া হত। এইভাবে নিলামে ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সালে তা সোয়া একরে পনের মণ পর্যন্ত উঠে।

টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে কমরেড মণি সিংহ দশাল গ্রামে উপস্থিত হয়ে বয়স্ক কৃষকদের সাথে মিটিং করে টঙ্ক আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তা মুসলিম, উপজাতিসহ সকল গ্রামে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। এসময় ললিত সরকার, জ্যোতিষ রায়, নগেন সরকার, ক্ষিরোদ রায় প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ দুর্গাপুরে গিয়ে মণি সিংহকে আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন।

টঙ্ক আন্দোলনের ফলে কি জমিদার, কি মধ্যবিত্ত সমাজ উভয়েই মণি সিংহের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তারা সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে নানারূপ অপবাদ ও মিথ্যা প্রচার চালাতে শুরু করেন। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মণি সিংহকে দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এ সময় ব্রিটিশ সরকার লক্ষ্য করেন যে যেসব এলাকায় পূর্বে কোন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়নি, অথচ কমিউনিস্টরা এসব এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছে। তাদের মতে অত্র এলাকায় উপজাতিরা ছিল ব্রিটিশভক্ত, কিন্তু হাজংরাও কমিউনিস্টদের সাথে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। কাজেই তারা সজাগ হন এবং ঐ এলাকাকে কমিউনিস্টদের প্রভাবমুক্ত করার জন্য টঙ্ক সম্পর্কে আশু কিছু করার প্রয়োজন বলে মনে করলেন। ফলে তারা আন্দোলনরত পাঁচটি থানায় জরিপ করে একর প্রতি কত উৎপাদন হয় তার হিসাব করে টঙ্ক ধানের হার বেশীরভাগ যায়গায় অর্ধেক করে দেন। এমনকি কোন

কোন স্থানে তা অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসে। তাছাড়া যার বছরে যে টঙ্ক খাজনা আছে তার সমপরিমান পরিশোধ করে দিলে জমির স্বত্ব তার হয়ে যাবে।[৫] এইভাবে ১৯৪০ সালের দিকে টঙ্ক প্রথার কিছুটা সংশোধন করা হয়। সরকার কর্তৃক টঙ্ক প্রথার এই সংশোধনের পর কৃষকরা কিছুটা পরিত্রান পায়। আন্দোলনের নেতারা কৃষকদের কথা বিবেচনা করে এবং এরপরেও আন্দোলন চালিয়ে গেলে সরকারের চরম দমন-নিপীড়ন এবং এর ফলে কৃষকরাও এটা থেকে দূরে যেতে পারে এই আশংকায় তারা সাময়ীকভাবে এটাকে মেনে নেন। আর এভাবেই টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

টঙ্ক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ময়মনসিং জেলার কৃষক আন্দোলনগুলি বেশ সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। পাশাপাশি কমিউনিস্টপার্টি কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলনগুলিকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে পার্টি পুনরায় তে-ভাগা ও টঙ্ক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।[৬] অন্যদিকে সরকারও তা দমনের জন্য ব্যাস্টিনকে ময়মনসিং 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট' করে পাঠান। কৃষক আন্দোলনরত এলাকাগুলিতে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যাস্টিন সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে মোতায়ন করেন। ১৯৪৬ সালে মণি সিংহ ও কমিউনিস্টপার্টির নেতৃবৃন্দ সুসং-দুর্গাপুর হাইস্কুলমাঠে একটি সভার মাধ্যমে পুনরায় টঙ্ক আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দেন। ফলে ১৯৪৬ সালের টঙ্ক মৌসুমে তেমন কোন টঙ্ক ধান আদায় হয়নি। এতে জমিদার ও ব্যাস্টিন বাহিনী দারুনভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং তারা বলপ্রয়োগ ও নির্যাতনের মাধ্যমে টঙ্ক ধান আদায় এবং কৃষকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারী ব্যাষ্টিন বাহিনী একসাথে জিগাতলা, লেঙ্গুরা, চৈতন্যনগর এবং ভরতপুরসহ মোট ১২টি গ্রাম আক্রমণ করে টঙ্ক চাষীদের সমস্ত ধান দখল ও লুঠ করেন।[৭] বিভিন্ন স্থানে কৃষক সমিতির অফিস ভেঙে ফেলা হয়। ৭ থেকে ২৮ জানুয়ারী-১৯৪৭, সময়ে সোমেশ্বরী নদীর পূর্ব অঞ্চলে বিভৎস দমননীতি চালিয়ে পশ্চিমদিকে বাওইপাড়া, সানখোলা, বগাঝড়া, ভেদিকুড়া হইতে নিতাই নদীর তীর বাগপাড়া, কালিকাবাড়ী পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রামের টঙ্ক চাষীদের ব্যাপক মারপিট, নির্যাতন এবং মহিলাদের ধর্ষণসহ টঙ্কচাষীদের কাছ থেকে বলপূর্বক টঙ্কের ধান আদায় অথবা লুন্ঠন করা হয়েছিল।[৮]

১৯৪৭ সালে ৩১ জানুয়ারী 'ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস' এর একদল সৈন্য সোমেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরে বাহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করেন এবং দুইজন হাজং মেয়েকে ধর্ষণ করেন। অতঃপর কুমোদিনী নামক ২০/২১ বছরের একজন বিবাহিত হাজং মেয়েকে

বলপূর্বক ধরে নিয়ে যেতে শুরু করেন। বাহেরাতলী গ্রামের পার্শ্বেই ছিল ছনগড়া গ্রাম, সেখানে জঙ্গিরা দুপুরের আহারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই খবর পৌঁছানমাত্র তারা কুমোদিনিকে রক্ষার জন্য তৎক্ষনাত বাহেরাতলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং পুলিশকে ঘিরে ফেলেন। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে রাশিমণি, সুরেন্দ্রসহ মোট তিনজন জঙ্গি ও দুজন পুলিশ নিহত হন।

বাহেরাতলীর সংঘর্ষের পর ব্যাষ্টিন বাহিনী তার দানবীয় পুলিশী আক্রমণ আরো বাড়িয়ে দেয়। ১ ফেব্রুয়ারী-১৯৪৭ ইং তারিখে পুলিশ লেঙ্গুরা বাজারের ১২টি কৃষকের বাড়ী ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলে। সংঘর্ষে নিহত সুরেন্দ্রের গ্রাম আক্রমণ করে সমস্ত বাড়ী - ঘর ভেঙে ফেলে এবং গ্রামবাসীদের গাছের সাথে বেঁধে ব্যাপক মারধর করে। ৫ ফেব্রুয়ারী পুলিশ সুসং-দুর্গাপুরে মণি সিংহ ও ফণী গোস্বামীর বাড়ী আক্রমণ করে সবকিছু তছনছ করে ফেলে। এমনকি মণি সিংহের বিধবা ভ্রাতৃবধু এবং গোস্বামীর বৃদ্ধা মাকে এক বস্ত্রে ঘর হতে বের করে দেন। ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে বগাঝাড়া গ্রাম আক্রমণ করে পুলিশ ব্রজমণিসহ বহু কৃষক মেয়েকে ধর্ষণ ও দৈহিক অত্যাচার করে।

পুরো ফেব্রুয়ারী মাস কৃষকদের উপর ব্যাস্টিন বাহিনীর এই বীভৎস অত্যাচার চলতে থাকে। ব্যাষ্টিনের এসব অত্যাচারের খবর কলকাতায় পৌঁছলে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা হতে একটি অনুসন্ধান কমিটি পাঠানো হয়। ঐ অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন জ্যোতিবসু, ব্যারিষ্টার স্নেহাংশু আচার্য ও সাংবাদিক প্রভাত দাসগুপ্ত। কিন্তু ব্যাষ্টিন এই কমিটিকে বাহেরাতলী গ্রামে যাওয়ার অনুমতি দেননি।[১]

বাহেরাতলী গ্রামের এই সংঘর্ষের জন্য কোর্টে একটি মামলা হয় পাশাপাশি ব্যাষ্টিন বাহিনীর এরূপ অত্যাচারে কৃষকরা এসময় খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মণি সিংহসহ কমিউনিস্ট নেতাদের অধিকাংশই আত্মগোপনে চলে যান। ফলে টঙ্ক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় এটাকে তেমন আর অগ্রসর করা সম্ভব হয়নি। প্রথম পর্যায়ে যতটুকু সংস্কার করা হয়েছিল তাই রয়ে যায়।

টঙ্ক আন্দোলন (শেষ পর্যায়) এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ

কমিউনিস্টপার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত বি.টি. রণদীভের থিসিস এবং ভবানীসেনের 'তেলেঙ্গানার পথে চল' আহ্বান কংগ্রেসে উপস্থিত সকলের মনেই বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাই কংগ্রেস থেকে ফেরার পর পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টপার্টির প্রাদেশিক কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ফ্রন্টে বিশেষত কৃষকদের মধ্যে টঙ্ক প্রথার বিলোপ ও তেভাগার দাবী নিয়ে পুনরায় সংগ্রামের কথা ভাবতে শুরু করেন। তারই অংশ হিসাবে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার নাগেরপাড়া গ্রামে ময়মনসিং

জেলা কমিটির মিটিং ডাকে পুনরায় টঙ্ক আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১০] ফলে শুরু হয় টঙ্ক আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়।

১৯৪৯সালের ৮ জানুয়ারী জমিদারের লোকেরা কলমাকান্দা থানার চৈতন্যগড়ের নীলচাঁদ হাজং-এর বিশমণ টঙ্ক ধান নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দিয়ে ধান ছিনিয়ে নিয়ে তা পূনরায় নীলচাঁদকে ফেরৎ দেন। চৈতন্যগড়ে সুসং জমিদারের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের একটা নতুন কাছারিবাড়ি বসানো হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারী, ১৯৪৯ তারিখে সেই কাছারিবাড়ি লেঙ্গুয়ার কৃষকরা দখল করে নেন এবং পরেরদিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারী সকালে কাছারি প্রাঙ্গণে এক বিশাল কৃষক সমাবেশ হয়।

২৮ জানুয়ারী, ১৯৪৯ তারিখে লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের সামনের ময়দানে ৫ হাজার কৃষকের এক বিরাট সভা হয়। সভায় বক্তারা বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, টঙ্কপ্রথা রদ, সরকারের রাজস্ব ও কর আদায় এবং খাদ্য সংগ্রহের কাজে স্থানীয় কমিটিগুলির সহযোগিতা গ্রহণ ইত্যাদির দাবী জানান এবং লিখিতভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়।

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ তারিখে লেঙ্গুরা বাজারে টঙ্ক আন্দোলনের ইতিহাসের সব চাইতে বিখ্যাত কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ ঘটে। বেলা ১১টার দিকে ২৫ জন টঙ্ক চাষীর একটি প্রচার বাহিনী হাটের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রচারবাহিনীর সদস্যরা হাটের কাছাকাছি এসে আওয়াজ তুললো জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কর; ধান সিজ বন্ধ কর; জান দিব তবু ধান দিব না; 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। হাটের জনসাধারণও প্রচার দলটির সাথে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। প্রচারবাহিনীর সদস্যরা তাদের প্রচারকাজ শেষ করে যাত্রা শুরু করতেই পুলিশ ক্যাম্প থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষিত হয়। গুলিতে প্রচারবাহিনী দলের নেতা মঙ্গল সরকার ও অগেন্দ্র নিহত হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঙ্গল সরকার ও অগেন্দ্রর মৃত্যুসংবাদ ও লড়াইয়ের খবর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র এক চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জঙ্গি কৃষকরা হাতের কাছে যে যা পেল তা নিয়েই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাটের দিকে আসতে শুরু করে। বেলা তিনটের দিকে সমগ্র পুলিশ ক্যাম্পটি চতুর্দিক থেকে জঙ্গি কৃষকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং মূহুর্তের মধ্যেই তারা ক্যাম্পটির উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সিপাহীরাও আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ফলে ঘটনাস্থলেই মোট ১৯ জন কৃষক নিহত হন।

লেঙ্গুরায় সংগঠিত ৪ ফেব্রুয়ারীর এই সংঘর্ষের সময় মণি সিংহসহ টঙ্ক আন্দোলনের কোন নেতা ঘটনাস্থলে ছিলেন না। মণি সিংহ সাংগঠনিক কাজে এসময় নেত্রকোণায় ছিলেন, খবর শুনেই সকলেই লেঙ্গুরায় চলে আসেন এবং মিটিংয়ে বসেন। মিটিংয়ে

সিদ্ধান্ত হয় যে, সরাসরি পুলিশকে আর আক্রমণ করা হবেনা, এখন থেকে পুরোপুরি গেরিলা কায়দায় লড়াই সংগঠিত করতে হবে।

সামনাসামনি নয় গেরিলা কায়দায় লড়াই সংগঠিত করার লক্ষ্যে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় স্থান ঠিক করা হয় এবং মোট নয়টি গেরিলা ক্যাম্প তৈরি করা হয়। এই সময় কৃষক সংগ্রাম সমগ্র এলাকাতে এমনভাবে সংগঠিত হয়েছিল যে, গ্রামের ছোট ছোট শিশু ও বালকেরাও সিপাহীদের আগমন লক্ষ করে গাছে উঠে বাঁশি বাজিয়ে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দি'ত। কমরেড বিপিনসহ হাজংদের মধ্যে যে সকল কারিগর ছিলেন তাদের প্রচেষ্টায় কিছু দেশী বোমা ও পঞ্চাশটির মত গাদা বন্দুক এবং কতগুলি বড় বড় বন্দুক তৈরি করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সংঘর্ষ ও চোরাগোপ্তা হামলার সময় সিপাহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটি রাইফেল, ষ্টেনগান, পিস্তলও ছিল। এসময় হাজং মেয়েদের রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালনা ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়।

অপরদিকে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই সুসং-দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট ও নলিতাবাড়ি থানার মোট ২৫টি পুলিশ ক্যাম্পে সশস্ত্র সিপাহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই সকল সিপাহীরা দরিদ্র কৃষক ও জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। তার কৃষকদের গৃহ লুণ্ঠন, তাদের উপর সর্বপ্রকার শারীরিক নির্যাতন, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা চারিদিকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের কোন না কোন যায়গায় প্রতিদিনই পুলিশের সাথে কৃষকদের সংঘর্ষ হ'ত। মূলত আন্দোলনরত সমগ্র এলাকা একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। টঙ্ক, লেভি মহাজনী ঋণ সবই বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি সরকারও মরিয়া হয়ে সংগ্রামীদের দমাবার জন্য প্রচন্ড দমননীতি চালিয়ে যেতে শুরু করেন। এসময় খন্ড খন্ড বহু সংঘর্ষ হয়েছিল, কোথাও পুলিশ পালিয়ে বেঁচেছে, অনেক পুলিশ আহত হয়েছে, কিন্তু সংখ্যক মারাও গিয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বিরাট এলাকা জুড়ে এভাবে যখন কৃষক, গেরিলা-পুলিশ, সিপাহী সংঘর্ষ চলছিল, যখন সংঘর্ষে কোথাও পুলিশ মারা পড়ছিল আবার পালিয়ে জীবন রক্ষা করছিল, আবার কখনো কৃষক গেরিলারা কোন কোন যায়গায় হার মানছিল ঠিক সেই সময় কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র "ফর এ লাষ্টিং পীস এন্ড ফর এ পিপলস্ ডেমোক্রেসি" নামক সম্পাদকীয়তে ভারতের কমিউনিস্টপার্টি রণনীতি ও রণকৌশলে ভুল করছে ব'লে জোরের সাথে লেখা হয়। এটা ভারতের কমিউনিস্টপার্টির মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং দেশব্যাপী পার্টির সভ্যরা তখনকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সাধারণ সম্পাদক রণদীভের উপর বিক্ষোভে ফেটে

পড়েন। অন্যদিকে ১৯৫০ সালে সারা বাংলায় শুরু হয় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে মুসলীমলিগ সরকার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও টঙ্ক আন্দোলনের জঙ্গী সংগ্রামে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সুসং এলাকায় এক জনসভা করে বলেন, 'টঙ্ক প্রথা তুলে দিচ্ছি, সবাই জমির স্বত্ব পাবে, জমিদারী প্রথাও আইন করে তুলে দেওয়া হবে কাজেই তোমরা আন্দোলন থামিয়ে দাও।'[১১] নুরুল আমিনের ঘোষণা ও লাষ্টিং পীস পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এবং দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মণি সিংহের আহ্বানে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সুসং-দুর্গাপুরের এক পাহাড় অঞ্চলে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতা-কর্মী এবং কমিউনিস্টপার্টির সভ্যদের নিয়ে একটি গোপন মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টঙ্ক আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং নুরুল আমিনের দেওয়া ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।

আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরপরই আন্দোলনকারীদের উপর সরকার দলীয় সমর্থকদের অত্যাচারের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়। গ্রামে গ্রামে লুণ্ঠন আর বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়। মেয়েদের ধর্ষণ, ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা ক্ষেতের ফসল নষ্ট সবই হয়। ফলে হাজং, ডালু, বালাই, কোচসহ প্রায় দেড় লক্ষাধিক লোক সীমান্তের অপর পার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। টঙ্ক আন্দোলনের ফলে ধান কারারী খাজনা, জমিদারী প্রথা সবই উঠে গিয়েছিল একথা যেমন সত্য তেমনি এই আন্দোলনের ফলে প্রায় সাড়ে চারশত লোক হারিয়েছিল তাদের প্রাণ, অর্ধ শতাধিক মহিলা তাদের সম্ভ্রম হারায় আর প্রায় দেড় লক্ষ লোক তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে চলে যায়।

সূত্র-নির্দেশ

১। মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* (প্রথম খণ্ড) ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ২৭।

২। মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* (প্রথম খণ্ড) ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ৪৫।

৩। শারদ *নক্ষত্র* ১৪০৮, ১৫২-১৫৩, এস. সেপ, ২০০১, পৃ: ১০৫।

৪। *দৈনিক মাতৃভূমি*, পূর্বোক্ত।

৫। বদরউদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ঢাকা-১০০০, পৃ: ১৮৯।

৬। প্রমথ গুপ্ত,. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮।

৭। মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫।

৮। প্রমথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮।

৯। প্রমথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯।

১০। মণি সিংহ, পূর্বেক্তো, পৃ: ৭৮।

১১। মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯২।

মেডিক্যাল ও সেল্স্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রেমাশিস চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পরে পরেই ১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করলেন "দেশীয় পুঁজি ও বিদেশীয় পুঁজি স্বার্থ একইভাবে দেখা হবে"। দেখা গেল লাভের পাল্লাটা বিদেশীদের ক্ষেত্রেই ভারী হলো।

১৯৪৮ সালে যেখানে ১০ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হতো, ১৯৭১ সালে তার উৎপাদন দাঁড়ায় ২৫০ কোটি টাকায়, ১৯৮১ সালে সেটা বেঁচে দাঁড়ায় ১২০০ কোটি টাকায় এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে এই পরিমাণ প্রায় ১৮০০০ কোটি টাকা।[১]

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রী জয়শুকলাল হাতী কমিটি সুপারিশ করে বিদেশী একচেটিয়া কোম্পানীগুলির জাতীয়করণের যা লাগু হয় ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে। এই হাতী কমিটি পর্যালোচনা করে দেখেন ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এবং এমনকি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ দেশে নিযুক্ত সুপরিচিত ১৫টি বহুজাতিক সংস্থা ও ভারতীয় সংস্থা 'অনুমতী পত্রাবলী' মোতাবেক ৩৬৪ রকমের ওষুধ তৈরীর অনুমতি লাভ করে। এর মধ্যে ৪টি হচ্ছে ব্যাপক ব্যবহৃত ওষুধ এবং বাকী ৩৬০টি মিশ্র ওষুধ যথা গ্রাইপ মিকস্চার, দাদের মলম, স্বাস্থ্যবর্ধক উপাদান, অ্যালকোহলযুক্ত টনিক, ক্যালসিয়ামযুক্ত টনিক ইত্যাদি।[২]

অর্থাৎ সংস্থাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা বিক্রয় প্রতিনিধির উৎপত্তি

একটা বিরাট মুনাফা অর্জন এবং ভারতের মতো দেশে প্রতিটি প্রান্তে কোম্পানীর ওষুধগুলিকে পরিচিত করবার জন্য বহুজাতিক কোম্পানীগুলিই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা তদানীন্তন সেল্স্ম্যান নিয়োগের পরিকল্পনা করে।

এর ডাইরেকটর-জেনারেল হ্যাকডন মাহলার ১৯৭৫ সালে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আনেন, "যে সব ওষুধ' উৎপাদক দেশে বিক্রির স্বীকৃতি পায় না এবং নিরপত্তা বা যোগ্যতার অভাবের জন্য বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় - সেইসব ওষুধ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানি করা হয় ও বাজারে ছাড়া হয়।" আবার সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ - এ স্টেট্স্‌ম্যান লিখল, "ওষুধ কোম্পানীগুলো দরিদ্র দেশে ব্যাপকপ্রচারিত নিজ ডাক্তারীকে অবশ্যম্ভাবী বলে যে শুধু মেনে নেয় বলে মনে হয় তাই নয়। তারা এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করে।" স্বাস্থ্য গবেষণা গ্রুপ-এর কর্তা র‍্যালফ ন্যাদার বলেন যে, "ওষুধ শিল্পের ক্রেতারা যেমন বন্দী অন্য কোন শিল্পের ক্রেতারা তেমনটি নয়, ডাক্তারেরা ক্রেতাদের বাজার সরকারের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন এবং অনেক সময় ডাক্তারেরা না জেনেই প্রেসক্রিপসন দেন, তার আংশিক কারণ হচ্ছে মেডিক্যাল স্কুলগুলো পর্যাপ্ত পরিমানে ওষুধপত্তর সংক্রান্ত শিক্ষা দেয় না এবং অন্য কারণ হচ্ছে তারা ওষুধ বিক্রির প্রতিনিধিদের উচ্চচাপের বিক্রয় কৌশলের কাছে নতী স্বীকার করেন।" তিনি আরো বলেন, "সর্বব্যাপী ওষুধ কোম্পানীর সেলস্‌ম্যান সম্ভবত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অস্ত্রাগারের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সে যেন সেই পুরাকালের সাপের তেল বিক্রেতার মতো, যে সোজাসুজি ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার রঙীন কাগজে মোড়া বস্তুর রোগ নিরাময়ের গুণগান ফেরী করে বেড়ায়। সেই সময় সেনেটর টেড কেনেডি লক্ষ্য করেছেন যে, ডাক্তারেরা প্রায়শঃই সেল্‌স্‌ম্যানদের ওষুধ ব্যবহারের জন্য উপঢৌকন হিসাবে প্রদত্ত গাড়ি ও টি ভি সেটের মোহে আটকে পড়েন। আমেরিকাতে প্রতি ১০০০ জন ডাক্তার পিছু একজন সেলস্‌ম্যান রয়েছে। মেক্সিকোতে প্রতি ৩ জন ডাক্তার পিছু একজন সেলস্‌ম্যান রয়েছে।[৩]

যদিও এগুলো বহু পরেকার মন্তব্য, তার আগেই স্বাধীনতার ঠিক পরে ৪০ দশকের শেষের দিকে কোম্পানীর ওষুধের বাজার তৈরীর জন্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা বা সেল্‌স্‌ম্যান নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলো PARKE-DAVIS নামে একটি বহুজাতিক আমেরিকান ওষুধ কোম্পানী। এই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহুসংখ্যায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলি বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ শুরু করে। আকর্ষনীয় বেতনের পাশাপাশি উচ্চহারে কমিশন ও ট্রাভেলিং এ্যালাউয়েন্স নিয়ে একজন বিক্রয় প্রতিনিধির রোজগার খুবই ঈর্ষনীয় ছিল। তখন দেখা যায় যে প্রফেসর, শিক্ষক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে বিক্রয় প্রতিনিধির চাকরি গ্রহণ করতো। কিন্তু এই চাকরীর কোন রকম নিরাপত্তা ছিল না। তখনকার সময়ে একটি টেলিগ্রাম - এই চাকরী চলে যেতো - "Your Service is no longer required"।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সংগঠন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

সেলস্‌ম্যান বা ওষুধ কোম্পানীতে নিযুক্ত মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাজের পরিধি ছিলো বিরাট - কর্মসংস্থানের সুযোগও ছিল প্রচুর। তবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে রাজ্যের মূল শহরগুলোতে একসঙ্গে বসবাস করবার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে অনুভূত হলো।

এই প্রয়োজনীয়তার ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণরত সেলস্‌ম্যানরা প্রথম সংগঠন তৈরী করে যায় নাম ছিল COMMERCIAL TRAVELLERS' AGENCY বা সংক্ষেপে CTA. সংগঠন গৌহাটিতে একটি বাড়ী নেয় সদস্যদের থাকার সুবিধার জন্য- যাকে বিক্রয় প্রতিনিধিদের পরিভাষায় বলে রেষ্ট হাউস। CTA-র পরিধি ছিল গঙ্গার উত্তর দিক থেকে শুরু হয়ে উত্তর - পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য।

অনুরূপভাবে ১৯৫৩ সালে বিহারের রাজেন্দ্রনগরে স্থাপিত হয় BIHAR STATE SALES REPRESENTATIVES' UNION বা সংক্ষেপে BSSRU শীগ্রই রাজ্যের বিভিন্ন শহরে এর শাখা গড়ে ওঠে এবং রেষ্ট হাউস স্থাপিত হয়। এরপরে পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, প্রভৃতি রাজ্যে রেষ্ট হাউস তৈরী হয়। এর বহু রেষ্ট হাউস আবার মূল সর্বভারতীয় সংগঠন FMRAI আত্মপ্রকাশ করবার পরবর্তী কালেও তৈরী হয়েছে। সর্বশেষ রেষ্ট হাউসটি ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে গোয়ার মারগাঁওতে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

এই রেষ্ট হাউসগুলি মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের দৃঢ়বদ্ধ সংগঠন তৈরীর অন্যতম সূতিকাগার বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

আমাদের দেশেত্রিশের দশক থেকেই বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেদের সঙ্গবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন ইউনিয়ানের পতাকাতলে। পরবর্তীকালে চল্লিশের দশক থেকেই বিভিন্ন অফিস কর্মচারীরা সংগঠন তৈরী করে।

মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের সংগঠন তৈরী হতে শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে। — রাজ্যগত ভাবে মূল শহরগুলিতে এক জায়গায় বসবাস করার সুবিধার জন্য - রেষ্ট হাউস ভিত্তিক। এই পেশার চাকচিক্য অতুলনীয়। সারা বছরে বহুবার ফাইভ স্টার হোটেলে আনাগোনা, কোম্পানীর নানা রকম উপঢৌকন, বেতন, কমিশন, ইনসেনটিভ ইত্যাদি দিয়ে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যাতে নিজেকে একাত্মীকরণ না করতে পারে তার সমস্ত দিকেই তীক্ষ্ণ নজর ছিল কোম্পানীগুলির ম্যানেজমেন্টের। সংঘবদ্ধতা না থাকায় চাকরির অঢেল সুযোগ-এর পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতাও ছিল চরম। ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে রিপ্রেজেন্টেটিভরা সরব হতে আরম্ভ করার পরে দ্বন্দ্বের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং সর্বভারতীয় এক সংগঠন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা বারে বারে অনুভূত হতে থাকলো।

সংগঠন তৈরী ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯৬২-১৯৭৬)

বিক্রয় প্রতিনিধিদের চাকুরীর নিরাপত্তা কম হওয়ায় এবং অন্যান্য আক্রমণ শানিত হওয়ার শ্রমিক-মালিক বিরোধের ঘটনাও ঘটতে থাকে।

১৯৫৬ সালে প্রথম তথ্যটি পাওয়া যায়। তদানীন্তন MAY & BAKER নামে এক বহুজাতিক কোম্পানীর জনৈক মুখার্জী, তার প্রতি ম্যানেজমেন্টের অন্যায় আচরনের প্রতিবাদ জানিয়ে মামলা দায়ের করেন এবং পরে এই মামলা সুপ্রীম কোর্টে যায়। সুপ্রীম কোর্ট একতরফাভাবে রায় দেন এবং মুখার্জী হেরে যান। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুয়ায়ী বিক্রয় প্রতিনিধিরা WORKMEN নয় এবং স্বভাবতঃই INDUSTRIAL DISPUTE ACT, 1947- এর কোন সুবিধা তারা পাবেন না।[৫]

১৯৫৬ সালে যৌথ দর কষাকষির অধিকার আদায়ের (COLLECTIVE BARGAINING RIGHT) প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয়। GLAXO EMPLOYEES UNION বিক্রয় প্রতিনিধিদের হয়ে দাবী সনদ (COD) পেশ করে। ম্যানেজমেন্ট বলে বিক্রয় প্রতিনিধিরা যেহেতু WORKMAN নয়, তাদের হয়ে UNION কোন ভাবেই দাবী উত্থাপন করতে পারে না। বিষয়টি ট্রাইবুন্যালে যায়। মেহের ট্রাইবুন্যাল রায় দেয় বিক্রয় প্রতিনিধিরা WORKMAN. তখন ম্যানেজমেন্ট বিক্রয় প্রতিনিধিদের নিয়ে GLAXO FIELD STAFF ASSOCIATION বা GFSA তৈরী করে UNION থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন। বিক্রয় প্রতিনিধি বা ফিল্ডকর্ম্মীদের ঐক্যের পরিপন্থী এই FIELD STAFF ASSOCIATION পরবর্তীকালে ম্যানেজমেন্টের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।[৬]

মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্নবোধক চিহ্নের পাশাপাশি শ্রমিকদের নূন্যতম অধিকারবোধের সচেতনতার ক্রমিক বৃদ্ধি এক সংগঠন তৈরীর অনুকূল আবহাওয়া তৈরীতে উৎসাহ দিচ্ছিল।

১৯৬২ সালে নাগপুরে MAHARASTRA PHARMACEUTICAL FEDERATION -এর উদ্যোগে এক কন্‌ভেন্‌শন আয়োজিত করা হয়। এই উদ্যোগ গ্রহণের পেছনে গ্ল্যাক্সো কোম্পানীর কতিপয় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তথা বিক্রয় প্রতিনিধির অবদান অনস্বীকার্য। এই কন্‌ভেন্‌শনে বিক্রয় প্রতিনিধি তথা ফিল্ড কর্ম্মীদের সর্বভারতীয় ইউনিয়ন গড়ার উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং ভবিষ্যতের এক শক্তিশালী সর্বভারতীয় ইউনিয়ন তৈরীর ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিস্থাপিত হয়।[৭]

১৯৬৩ সালে হায়দরাবাদে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষে ফিল্ড কর্মীদের প্রথম সর্বভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিতহয় - FEDERATION OF MEDICAL AND SALES REPRESENTATIVES' ASSOCIATIONS OF INDIA সংক্ষেপে FMRAI. এই সম্মেলনে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে FMRAI কি হিসাবে রেজিস্ট্রীকৃত হবে? ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে না সোসাইটি অ্যাক্টে অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে। বিতর্কের ফলে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও বিভাজন পরিলক্ষিত হয় এবং তদানীন্তন

বম্বে ইউনিটের সদস্যরা সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বম্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে FMRAI- এর কোন UNIT ছিল না। সম্মেলন থেকে গৃহীত অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী FMRAI রেজিস্ট্রীকৃত হলো T.U. Act অনুযায়ী এবং একইভাবে তার ঠিক পরে পরেই পশ্চিমবঙ্গ বিহার, ও মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ UNIT এর রেজিস্ট্রেশন হয় T.U. Act অনুযায়ী।

১৯৬৫ সালে FMRAI এর Working Committee-এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন জ্ঞানশঙ্কর মজুমদার। মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের আন্দোলনে এই জ্ঞানশঙ্কর মজুমদারের নাম আমরা বারে বারে পাবো এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যে কাজ তিনি সেই সময় শুরু করেছিলেন তা তিনি এখনও নিরলস ভাবে করে চলেছেন। ২০০৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি FMRAI-এর Vice President হিসাবে।

১৯৬৬ সালে FMRAI-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫টি কোম্পানীতে COD দেওয়া হয়। এই কোম্পানীগুলি হলো HOECHST, PARKE-DAVIS, CYNAMIDE, SARABHAI এবং EAST INDIA.

কিন্তু সংগঠনের তখন একদমই শৈশাবস্থা। PARKE DAVIS, CYNAMIDE এবং EAST INDIA তখনকার এই সাংগঠনিক দুর্বলতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল এবং COD -কে কোন গুরুত্বই দিলো না। HOECHST কোম্পানী তাদের বিভিন্ন ডিভিশনে FIELD STAFF ASSOCIATION তৈরী করে দিল এবং SARABHAI তাদের প্রত্যেক ডিভিশন থেকে দুজন করে নিয়ে আলোচনা করে অর্থনৈতিক কিছু সুবিধা কিন্তু কর্মীদের দিয়ে দিলো।[৯]

HOECHST কোম্পানী TRIBUNAL- এ যায় এবং LALA TRIBUNAL রায় দেয় যে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা WORKMAN নয়।

সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এই পশ্চাদপসরণের থেকে উপলব্ধি করে যে সারা ভারত জুড়ে কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের নিয়ে শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করা উচিত। কোম্পানীগুলির সমস্যার চরিত্র যেহেতু আলাদা। কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের নিয়ে আলাদা সংগঠন গড়াই আদর্শ। তবে এই সংগঠনের অস্তিত্ব হবে সংগঠনের মধ্যেই।

১৯৭১ সালে FMRAI একটি পুস্তিকা বার করে - 'THE NEED OF COMPANYWISE GROUPING'. সংগঠনের বক্তব্য ছিল— "A group of representatives within the union called council - an unit within the union."[১০]

যখন FMRAI এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত নিলো কোম্পানীগুলি FIELD STAFF

ASSOCIATION তৈরী করে কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের UNION-এর আওতার বাইরে আনার জন্য উদ্দ্যোগ গ্রহণ করলো। ম্যানেজমেন্টের স্বার্থ চরিচার্থ করবার নির্লজ্জ প্রয়াসে কিছু কোম্পানীর কর্মীরাও জড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। ১৯৭১ সালে JOHN-WYETH, NEO-PHARMA ইত্যাদিতে কর্মরত ফিল্ড কর্মীরা COMPANYWISE COUNCIL তৈরী করে COMPANYWISE WAGE SETTLEMENT- এর দিকে ঝুঁকেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন ইউনিট WEST BENGAL MEDICAL REPRESENTATIVE ASSOCIATION- এ এই নীতির স্বপক্ষে বেশ কিছু সমর্থক জোরালো সওয়াল করতে লাগলো। ভবিষ্যতে এই নীতির ভ্রান্তি সংগঠনের অগ্রগতির পথে অনেক বাধাই সৃষ্টি করেছিলো।

১৯৭২ সালে বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত অষ্টম জেনারেল কাউন্সিল মিটিংএ (তখন সম্মেলনকে এই নামেই অভিহিত করা হতো) প্রথম COMPANYWISE GORUPING যা অদূর ভবিষ্যতেই FMRAI-এর অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠল সেই COUNCIL MOVEMENT LINE নীতিগতভাবে গৃহীত হয়।[১১]

এই মিটিংএ পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সমঝোতা করা হলো। FMRAI-এর অবস্থান ছিলো যে ভবিষ্যতে আর নতুন FIELD STAFF ASSOCIATION হবে না আর গঠিত হয়ে যাওয়া FIELD STAFF ASSOCIATION গুলিকে FMRAI থেকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে না —

১৯৭৩ সালে এই মতভেদের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় পশ্চিমবঙ্গে। মূলত FIELD STAFF ASSOCIATION এর প্রবক্তা ছিল, ম্যানেজমেন্ট। কোম্পানীতে যদি FSA বানিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কিছুটা করা যায় তাহলে যে মূল কাজটা হতে পারে তা হলো FMRAI-কে আটকে রাখা - ম্যানেজমেন্টগুলোর এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গী। FMRAI- এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল One company one union হলে ম্যানেজমেন্টের আক্রমণের মুখে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা বা বিক্রয় প্রতিনিধিরা defenceless হয়ে যাবে। আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে - কারণ এই ইউনিয়নের সদস্যরা এক ছাদের তলায় কাজ করেন না। অতএব সমস্যা হলে FMRAI- এর অন্যান্য সদস্য যারা ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীতে কাজ করে তাদের অংশগ্রহন ও আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটানো বাস্তবোচিত হবে। কিন্তু পাশে পাশে কোম্পানীতেও সেই কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের নিয়ে তৈরী হবে COUNCIL. এই COUNCIL কোম্পানীতে নায্য দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করবে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে - যদি প্রয়োজন হয় সাধারণ সদস্যরা (উক্ত কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য কোম্পানীতে কর্মরত সদস্যরা, FMRAI-এর পরিভাষায় General unity) COUNCIL-কে আন্দোলন অগ্রগতি ঘটানোর জন্য

সাহায্য করবে। এই প্রসঙ্গে FSA স্বপক্ষে জোরদার সওয়ালকারী মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যে বিনা আয়াসেই সংগঠন না তৈরী করেই ম্যানেজমেন্ট আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কিছু 'CONCESSION' দিচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে - এই সুবিধা আমরা নেবো। অর্থাৎ এই মতাবলম্বীদের কোন লড়াই বা শক্ত ভিতের সংগঠন তৈরী - কিছুরই দরকার নেই, উল্টে আছে কিছু পাওয়ার সুযোগ - ঠিক যেন নাকের বদলে নরুন। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটি এক চরম সুবিধাবাদী অবস্থান যা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রমানিত হয়েছে।

তখন পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৬ টি FSA-র জন্ম হয়েছিল এবং এই FSA গুলি একটি Co-ordination Committee তৈরী করে কলকাতায়।

১৯৭৩ সাল প্রথম পুরুলিয়ায় এবং পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত FMRAI-এর মাদুরাই সম্মেলনে FSA-র প্রবক্তারা এবং Co-ordination Committee-র সদস্যরা মিলিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ সমস্টির মতামতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে।

১৯৭৪ সালে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ইউনিট WBMRA ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল। মূল অংশটির নাম হল WEST BENGAL STATE SALES REPRESENTATIVES' UNION বা WBSSRU এবং FSA নীতির সমর্থনকারী সুবিধাবাদীরা সৃষ্টি করলো ALL WEST BENGAL SALES REPRESENTATIVES' UNION বা AWBSRU.

১৯৭৪ সালেই CTA নাম পরিবর্তন করে হয় COMMERCIAL REPRESENTATIVES' UNION সংক্ষেপে CRU - এর পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে CRU, FMRAI - এর affiliation পায়।

১৯৭৫ সালে FMRAI CONFERENCE অনুষ্ঠিত হয় আজমীরে। এতদিন ধরে অনুসৃত নীতি ছিল 'One state - One Union' কিন্তু সেই নীতির পরিবর্তন ঘটলো। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে FMRAI দুটি Union - কেই affiliation দিলো WBSSRU এবং AWBSRU. তখন Rest House গুলোতেও দুই ইউনিয়নের সদস্যরা থাকতো।

১৯৭৬ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত FMRAI দশম সম্মেলনে শ্রী জ্ঞান শংকর মজুমদার তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার মধ্য দিয়ে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বচিত হলেন। FMRAI - কে আজকের স্বাবলম্বী, স্বচ্ছ এবং আত্মত্যাগী শ্রমিক ইউনিয়ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য্য।

সর্বভারতীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ঃ

সর্বভারতীয়ভাবে মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের সংগঠন তৈরী করবার

মূল উদ্দেশ্য কোম্পানীগুলির বিভিন্ন রকম অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার জন্য COLLECTIVE OPOSITION সৃষ্টি করা, আইন সুযোগ সুবিধার পরিমন্ডলে অন্তর্ভুক্ত ও INDUSTRIAL UNION হিসাবে স্বীকৃতিলাভ।

সংগঠনের কর্মসূচী মূলত রূপায়িত করা হয় বিভিন্ন ধারায় আন্দোলনের মাধ্যমে। যদিও এই ধরনের সংগঠন সারা পৃথিবীতে এটিই প্রথম, তাই প্রতিটি ধারার আন্দোলনের ক্ষেত্রেই স্বকীয়তার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধারায় কর্মসূচীগুলিকে রূপায়িত করবার প্রয়োগ করা হয়।

COUNCIL MOVEMENT - A group of Representatives of the Company within the union called council - an unit within the union.

General Unity - সাধারণ সদস্যদের (কোন বিশেষ কোম্পানী ব্যাতিরেকে) ঐক্যের সহযোগীতা।

Protest Movement - একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ম্যানেজমেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানানো যা Protest Movement বা প্রতিবাদ আন্দোলন হিসাবে পরিচিত।

প্রতিবাদ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ হিসাবে স্বীকৃত Deputation .

Demonstration Programme - প্রাথমিকভাবে ম্যানেজমেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও কোন কাজ না হলে Demonstration Programme বা বিক্ষোভ কর্মসূচীর মাধ্যম গ্রহণ করা হয়।

Resistance Movement - পূর্বোলিখিত পর্যায়গুলি ফলপ্রসূ না হলে Resistance movement বা প্রতিরোধ আন্দোলন কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। যে যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই কর্মসূচী নেওয়া হয় মূলত ঐ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ ছাড়া বেশিমাত্রায় সাধারণ সদস্যরা এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

মূলত তিন ভাবে কর্মসূচীগুলিকে সংগঠনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছে -

সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন (Common Democratic Movement) সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সদস্যদের অংশগ্রহণ।

নির্দ্দিষ্ট কোম্পানীর আন্দোলন (Individual Companywise movement) - কোন একটি অনৈতিক ভাবে শ্রমিকস্বার্থ ভঙ্গকারী কোম্পানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সদস্যদের অংশগ্রহণ। শিল্পগত আন্দোলন (Industrial Movement) শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্যার নিরসনে পালন করা কর্মসূচীতে সদস্যদের অংশগ্রহণ।[১২]

সংগঠনের কাঠামো -

সারা ভারতে মূলত ১৯টি রাজ্য সংগঠন রয়েছে, এবং সাবইউনিট রয়েছে মোট

২৯১টি। মূল কেন্দ্রের সঙ্গে কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং - এর মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে কার্যাদি পরিচালনার সুবিধার জন্য। সারা ভারতকে কাজের সুবিধার জন্য চারটে জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন ভাগ নিম্নরূপ

অঞ্চল	রাজ্যভিত্তিক সংগঠন	সদস্য সংখ্যা
জোন ১	প:ব:, ওড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খন্ড উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহ	১৩,৩৭২
জোন ২	উ: প্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব	৯,৮৩৯
জোন ৩	মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া	৭,৫৬৩
জোন ৪	তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরালা	১৩,০০১
মোট সদস্য ঃ		**৪৩৭৭৫**[১৩]

সংগঠনের সর্বোচ্চ ফোরাম - কনফারেন্স, যা অনুষ্ঠিত হয় তিন বছর অন্তর। তারপরে জেনারেল কাউন্সিল সভা - য. অনুষ্ঠিত হয় দু-বার ঐ তিন বছরের মাঝখানে। এরপর যথাক্রমে ওয়াকিং কমিটি, সেক্রেটারিয়েট ও জেনারেল সেক্রেটারীর ক্রমান্বয়ে অবস্থান।

সংগঠনের অগ্রগতি ও প্রাসঙ্গিকতা

সংগঠন তৈরী করবার প্রাথমিক পর্যায়ে FMRAI - এর সদস্যরা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে নিজেদের গণ্য করতে পারতেন না। এর ফলে ধীরে ধীরে কোম্পানীগুলির বিভিন্ন অনৈতিক আক্রমণের সামনে দাড়িয়ে মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিলম্ব হলেও শ্রেণী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ও তীব্রমতাদর্শগত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে চেতনার মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটলো। বর্তমানে সারা ভারতব্যাপী এক শিক্ষিত, আত্মত্যাগী শ্রমিক ইউনিয়ন হিসাবে এই সংগঠন FMRAI আত্মপ্রকাশ করেছে।

নিম্নে ১৯৬২ সাল থেকে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অগ্রগতি ঘটানোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো।

1962 - Convention at Nagpur.

1963 - FMRAI formed - 1st Conference at Hyderabad. Decision to register as a trade union.

1965 - Decision to submit charter of demands to 6 companies.

1967 - All India Chemical & Pharmaceutical Employees Federation (AICAPEF) formed at New Delhi.

1969 - Demand raised for amendment of I. D. Act to include Medical and Sales Representatives.

1970 - First direct protest demonstration. First procession at Burdhaman.

1972 - Resolution on Council.

Termination of J. S. Majumder in Glaxo.

Historic movement against Glaxo, rationalisation demanded, AICAPEF revived at Mumbai.

1974 - Reinstatement of J. S. Majumder in Glaxo.

1975 - AICAPEF rally at Delhi.

1976 - First wage settlement of FMRAI in Biological Evars Ltd.

1977 - Relay hunger strike at Mumbai 27 Point Common Charter of demands at Ahmedabad.

1978 - Conference resolution on strike by FMRAI

1980-84 - National tripartite meeting.

1984 - First strike by FMRAI

SPE Act amendment passed.

AICAPEF Conference held at Kolkata.

1985 - Resolution on Council's cardinal points.

1986 - National seminar on drug industry and Indian people.

1987 - Gyan Vigyan Jatha, AIPSN formed.

1989 - First General Council Meeting at Chandigarh.

1994 - Attempt disruption at Lucknow defeated.

1996 - Globalisation impact, Zonal protest rallies organised at Kolkata, Delhi, Chennai & Mumbai which was participated by 20 thousand members.

1997 - 8 points new demands in globalisation stage at Raipur GCM Massive 95% strike ballot in favour of 3 days strike.

Historic Mumbai rally on 29th December, 1997 which was participated by 18 thousand members.

1998 - Agenda of Action on current tactics in Kollam Conference.

2000 - Historic Delhi Rally on 18th September, 2000.

2000 - Organised Sector group (OSG) and unorganised Sector Group (USG) companies identified and pin pointed approach to create a gigantic force against the attack of

the management were formulated in Jaipur General Council Meeting.

2001 - Weeklong countrywide strike from 8th to 12th January, 2001.

2002 - 3 Burning problems identified in Bangalore General Council Meeting - i) Replacement of Medical Representative by so called ' officers', ii) Contractualisation of jobs through franchises. iii) Sales as a part of service condition. Increase work load & new work system.[14]

বর্তমানে যেখানে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নকে শেষ করে ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে সেইখানে এই ধরনের একটি ইউনিয়ন - যেখানে সদস্যরা বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকরী করেন, ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অন্যায় আক্রমণ তা ওষুধের কালোবাজারী, দামবৃদ্ধি, ছাঁটাই ইত্যাদি যাই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে চলেছেন তা প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। সারা পৃথিবীতে FMRAI - এর মতো ট্রেড ইউনিয়ন নেই। পরে নেপালে (NMSRA) এরকম ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু দেশে মেডিক্যাল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের সংগঠন হয়তো আছে তবে তা সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছে এরকম কোন তথ্য নেই। ভারতবর্ষের মতো দেশে এই ধরনের ইউনিয়ন একটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষিত শ্রমিকদের যে ভাবে একতাবদ্ধ করে তুলেছে তা শুধু প্রশংসার নয় অবাক হয়ে ভাববার মতো। আইনগত বিভিন্ন সাফল্যের পাশাপাশি রাজ্যগত,, অঞ্চলগত, ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানী মিলিয়ে প্রায় ৬০টি কোম্পানীতে বেতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পেশাগতভাবে আন্দোলনের ক্ষেত্রে শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও FMRAI - এর প্রাসঙ্গিকতা আরো বেশী করে প্রতিভাত হবে বলেই আশা করা যায়।

সূত্র-নির্দেশ

১। *পেটেন্ট ও জনস্বাস্থ্য* - গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়

২। Multinational's in Drugs and Pharmaceutical Industry in India - J. S. Majumder (1981).

৩। IBID.

৪। *FMRAI News* - Vol. - III, No. - 6, January (Supplementary) 2004.

৫। *Note on Council Movement placed in 2nd and 3rd Conference of WBMSRU Councils.*

৬। From an Interview with D. P. Dubey General Secretary, FMRAI), and Arun Ghosal (Gen. Secy. WBMSRU), by the author of the present Essay.

৭। From an Interview with D. P. Dubey General Secretary, FMRAI), and Arun Ghosal (Gen. Secy. WBMSRU), by the author of the present Essay.

৮। IBID.

৯। *Note on Council Movement placed in 2nd and 3rd Conference of WBMSRU Councils.*

১০। From an Interview with D. P. Dubey General Secretary, FMRAI), and Arun Ghosal (Gen. Secy. WBMSRU), by the author of the present Essay.

১১। IBID.

১২। IBID.

১৩। *Report of General Secretary, FMRAI*, which was placed in 20th Conference of FMRAI, 9-12 February, 2004.

১৪। FMRAI NEWS - Vol. - III, No. 7, February, 2004.

বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরী ঃ চট্টগ্রাম হতে অগ্রদ্বীপ জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলন বিবর্তন-একটি পর্যালোচনা

মহঃ ইনামুর রহমান

গণআন্দোলন ও গণসংগ্রামের মধ্যদিয়েই গড়ে ওঠে কর্মী ও নেতৃত্ব। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে অজস্র কর্মী ও নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটেছে। বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরীও এরূপ গণসংগ্রামের এক বিরল চরিত্র। ইতিহাসে ঘটনা উপলক্ষ্য যেমন মূল, তেমনি ব্যক্তি উপলক্ষ্যর গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। সুবোধ চৌধুরীর মতো মানুষেরা ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনটি ধারা—গান্ধীবাদী, সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এবং বামপন্থী প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই তাঁর সংগ্রামী জীবনকে স্পর্শ করেছিল। বর্ধমান জেলায় বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোয়নার প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণআন্দোলনের নেতার মতো তিনিও ছিলেন এক বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সুবোধ চৌধুরী ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অগ্রদ্বীপে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গগেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিনি পেশায় ছিলেন আইনজীবী, আবার সরকারী চাকরিও করেছেন।[১] ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনে প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ বিদ্যালয়ে তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শোনা করেন। সে সময়ের প্রধান শিক্ষক চন্ডীদাস মজুমদার মহাশয়ের প্রেরণায় তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা জন্মলাভ করে। কাটোয়ার কংগ্রেস আশ্রমে বিদেশী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব কর্মসূচী কিশোর, সুবোধ চৌধুরীর হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। তিনি তাঁর গায়ের বিদেশী জামাকে ঐ আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে খালি গায়ে হোস্টেলে ফিরে আসেন। ঐ দিনের ওই ছোট্ট ঘটনাটি এক কিশোরের ভবিষ্যৎ জীবনের যেন রূপরেখা রচনা করে দেয়।[২]

কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর অভিভাবকরা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করে তাঁকে জাতীয়তাবাদী প্রভাব বলয়ের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর মামা নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম শহরতলী রেলওয়ে হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজনীতি তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল। ১৯২৬-এ যুগান্তর দলের চট্টগ্রাম শাখার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৮-এ

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং সেই বছরই মাষ্টারদা সূর্যসেনের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ ঘটে। ইতিমধ্যে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে বিজ্ঞানবিভাগে ভর্তি হন এবং বিপ্লবী গনেশ ঘোষ প্রমুখর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য মাষ্টারদার নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ শুরু হয়। তিনিও এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন প্রত্যক্ষভাবে। যখন সরকারী অস্ত্রভান্ডার দখল করা হয় তখন সরকারী সৈন্য বাহিনী প্রত্যাঘাত করতে শুরু করলে বিপ্লবীরা মাষ্টারদার নির্দেশে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ৬ মে কালার পোলের যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে সহযোদ্ধা স্বদেশ রায় রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত নিহত হলে ফনী নন্দীর সঙ্গে তিনিও ধরা দিতে বাধ্য হন।[৩] তাঁদের বিচার শুরু হয়। মাষ্টারদার ফাঁসির আদেশ হয়, গণেশ ঘোষ সহ অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁরও দীর্ঘ মেয়াদী কারাদন্ডের আদেশ জারী হয়। ১৯৩২ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়। ১৯৩২-৩৮ পর্যন্ত আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে তিনি বন্দী জীবন কাটান। বাংলাদেশ সহ সারা ভারতে 'বন্দীমুক্তি' আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে রাজবন্দীদের দেশের মূল ভূখন্ডের জেলে নিয়ে আসে। সুবোধ চৌধুরী ও সেলুলার জেল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাংলার বিভিন্ন কারাগরে বন্দী হিসাবে জীবন কাটাতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের ৩১ আগস্ট ১৪ বছর কারাবাসের পর তিনি ঢাকা জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।[৪]

আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী থাকার সময়ে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা বিবর্তিত হয়। সেলুলার জেলে বন্দী বিখ্যাত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ও শিক্ষক নিরঞ্জন সেনের পরিচালনায় মার্কসবাদী বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা পড়তে শুরু করেন। ঐ জেলে বন্দী অন্যান্য কমিউনিস্ট মতাদর্শীদের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। গণেশ ঘোষ সহ তিনি মার্কসবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হন। ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ বা মুষ্টিমেয় কিছু মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবব প্রাণ বিসর্জন ও সশস্ত্রসংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যে নাড়াতে পারবে না, দেশের শোষিত মানুষ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি সমস্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে এক দৃঢ় ঐক্য বাদ, সাম্রাজ্য বাদ বিরোধী জোট গঠন ও দুর্বার গণ আন্দোলনই যে মুক্তিব একমাত্র সোপান সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হন।[৫]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং মুজাফফর আহম্মদ ও অন্যান্য পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বর্ধমান জেলার

আসানসোলে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়।[৬] পার্টি সদস্য পদ লাভ করার অল্পদিনের মধ্যেই সুবোধ চৌধুরী বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবদের সংবর্ধনা দেবার জন্য সারা বাংলার সঙ্গে বর্ধমান জেলা ও কাটোয়া মহকুমা প্রস্তুতি শুরু করে।[৭] সুবোধ চৌধুরী নিজগ্রাম অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হন। গ্রামের জমিদার মল্লিকরা কৃষকদের তীব্র শোষণ করত। বিভিন্ন ধরনের কর ও 'বাজে আদায়' দরিদ্র কৃষকদের কাছ হতে জোর করে সংগ্রহ করত। ব্রিটিশের পুলিশ—এ ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করত। জমিদাররা কৌশলের সঙ্গে 'উঠবন্দী' শর্তে উচ্ছেদের জন্য ফসল থাকা অবস্থাতেই চাষীদের ক্ষেতের ফসল গোয়ালাদের গরু-মহিষ নামিয়ে খাইয়ে দিত। প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতা ছিল না এবং প্রতিবাদ করলে চাষীদের কাছারী বাড়িতে ধরে নিয়ে অত্যাচার করত।[৮] এ অবস্থায় সংবর্ধনা নেওয়া অপেক্ষা তিনি এই অন্যায় ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকেই বেছেনেন। পার্টির সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি আসানসোল না গিয়ে নিজ গ্রাম ও কাটোয়া মহকুমার কৃষক ও পাটি সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন।[৯]

তে-ভাগা আন্দোলনের ঢেউ তখন উত্তর ও দক্ষিণ-বাংলায় আছড়ে পড়েছে। সুবোধ চৌধুরী অগ্রদ্বীপ এলাকায় তে-ভাগা আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। গাজীপুর 'হবির পাঠ' মাঠে তে-ভাগা আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল সেরূপ কিছু না হলেও এই অঞ্চলের কৃষক সমাজের চেতনা বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১০]

কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গার দুদিকে যে সব গরীব মানুষ বাস করত জমিদাররা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। জেল থেকে ফিরে তিনি এই এলাকায় যখন আসেন তখন ঐ গরীব মানুষরা তাঁকে আবেগপূর্ণভাবে 'রাজা সাহেব' বলে সম্বোধন করে।[১১] ইতিমধ্যেই শান্তিব্রত চ্যাটার্জ্জী, গৌরী ঘটক প্রভৃতি পার্টি কর্মীরা দাশরথি চৌধুরী প্রমুখ পার্টি নেতৃত্বের পরিচালনায় এই এলাকায় কৃষক সংগঠন শুরু করেছিলেন। সুবোধ চৌধুরী জমিদারী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখানে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্কিম মুখার্জ্জী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় চৌধুরী, হরে কৃষ্ণ কোঁয়ার প্রমুখ নেতৃত্ব তাঁকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।[১২]

অগ্রদ্বীপ গ্রামের কৃষকরা তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানায়। তিনি গ্রামের গোয়ালা ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। অগ্রদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক বিরাট কৃষক মিছিল জমিদারের কাছারী বাড়িতে নিয়ে যান। কৃষকদের সমস্যার কথা জমিদারদের বলেন। কোন সদুত্তর না পাওয়ায় কৃষকদের নিয়ে জমিদারীর অন্যায়ের সুনির্দিষ্ট তথ্য ভিত্তিতে আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। অগ্রদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম

থেকে কয়েক হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে বিশ মাইল দূরবর্ত্তী কাটোয়া মহকুমা শাসকের দপ্তরে অগ্রদ্বীপের জমিদার মল্লিকদের অন্যায়ের প্রতিকারের দাবিতে মিছিল করে ডেপুটেশন দেয়। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সুবোধ চৌধুরী। এর ফলে পার্শ্ববর্ত্তী কালিকাপুর, পলাশী, কুলগাছি, আকনডাঙ্গা, চরবিষ্ণুপুর, ইসলামপুর, ঝাউডাঙ্গা, সাহেব নগর প্রভৃতি গ্রামগুলি কমিউনিস্ট পার্টির শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়।[১৩] সুবোধ চৌধুরীর মতাদর্শে ও সাংগঠনিক দক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে অগ্রদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির বেশ কয়েক জন কর্মী কৃষক সংগঠন ও জমিদার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন গোপী বিশ্বাস, মহাদেব দে, সুনীল পাল (১৯৪৯-এ শহীদ) সুশীল চক্রবর্ত্তী[১৪] হরিদাস ঘোষ, দুর্গাপদ চন্দ্র, কালাচাঁদ কারফরমা, মনি কর্মকার, বৃন্দাবন বন্দোপাধ্যায়, ফড়ো বাগদী,[১৫] বাদল নন্দী, পাটল বিশ্বাস, আনন্দ দে, পটল ঘোষ, অধীর ঘোষ, দোলগোবিন্দ ঘোষ, সাহেব ঘোষ, লখিরদ্দিন সেখ, জংলী চৌধুরী[১৬] নিজামুদ্দিন সেখ, আব্দুল হক, নূরমহম্মদ সেখ, গৌরী বিশ্বাস, লোহারাম শীল, কালী পাল,[১৭] বাপী কাপুর, গয়ারাম রায়[১৮] প্রমুখ কর্মীবৃন্দ।

এই জমিদার বিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে কৃষকদের সংগঠিত করা শুরু হয়। জমিদারের সুবিধার্থে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামে পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়। অপরদিকে জমিদারের লাঠিয়ালরা সন্ত্রাস শুরু করে। কৃষক কর্মী মহাদেব বিশ্বাস আক্রান্ত হন। মাথায় আঘাত গুরুতর হওয়ায় কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। ঐ সময়ে কাটোয়ায় এক সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায় আসেন। তিনি হাসপাতালে মহাদেব বিশ্বাসকে দেখতে যান এবং বলেন, 'এতদিন ওরা মেরেছে, এবার আমাদের মারদেবার পালা এসেছে।'[১৯] ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার সি.পি.আই কে বে-আইনী ঘোষণা করে। আত্মগোপন অবস্থায় হরেকৃষ্ণ কোঁয়ার অগ্রদ্বীপে দরিদ্র সর্বহারা মানুষদের - গোয়ালা, হিন্দু ও মুসলিম চাষীদের ঐক্য ও সংহতির কথা উল্লেখ করেন। পুলিশ গৌরীঘটক ও সুনীল চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করে, পরে সুশীল চক্রবর্ত্তী দমদম জেলে মারা যান।[২০]

১৯৪৯ সালে পূজোর সময় অগ্রদ্বীপে সুবোধ চৌধুরী, শান্তব্রত চ্যাটার্জ্জী, সুনীল রায় (রবি রায় ছদ্ম নামে পরিচিত ছিলেন) এক জনসভার আয়োজন করেন। প্রায় দশ হাজার মানুষের এক বিশাল জমায়েতে সুবোধ চৌধুরী ও শান্তব্রত চ্যাটার্জ্জী ভাষণ দেন। সভাচলাকালীন মাঠের উপর একটি হেলিকপ্টার চক্কর দেওয়ায় সভায় উপস্থিত মানুষরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ সমাবেশের উপর আক্রমণ করলে জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশের দুটি রাইফেল কেড়ে নেয়। এবং পুলিশের বেয়নেটের খোঁচায় সুনীল পাল মারা যান। সুবোধ চৌধুরী নদীয়ায় পালিয়ে যান। এর পর জমিদারের প্ররোচনায় পুলি অগ্রদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সাধারণ কৃষক ও গোয়ালা পরিবারে অত্যাচার পুলিশের বৃদ্ধি পায়। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও জরিমানা আদায় করা হতে থাকে।[২১] গোপনে পার্টির মিটিং, কখনো

কখনো তরুণদের নিয়ে গঠিত গানের দল হঠাৎ হঠাৎ কোন গ্রামের ভিতরদিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রচার করে যেত। আহত, বিভিন্ন এলাকা ছাড়া কর্মী, বাইরে থেকে আগত নেতৃত্ব দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ও বিনা কারণে বন্দী কৃষক কর্মীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য এক অভিনব পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করা হত। গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে একটি করে থলে বা মাটির পাত্র দেওয়া থাকত। প্রতিদিন তাতে এক মুঠোচাল রাখা হত। সপ্তাহে একদিন ঐ চাল সংগ্রহ করা হত। এই সব প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দক্ষ্যতা ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হত। পুলিশের চোখে ধূলোদিয়ে। এই সব কাজ সুবোধ চৌধুরী আত্মগোপন অবস্থায় তাঁরপূর্বোল্লেখিত কর্মী এবং শশাঙ্ক চ্যাটার্জ্জী, শান্তব্রত চ্যাটার্জ্জী, ললিত হাজরা আনন্দ মোহন রুদ্র, সুনীল রায়, প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতেন।[২২] অপর দিকে জমিদার মল্লিকরা স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন এবং রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। পরবর্ত্তী কালে এঁদেরই উত্তরসূরী পূর্বস্থলী বিধানসভাকেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন।

অগ্রদ্বীপ গ্রামের এই দূর্বার কৃষক আন্দোলন সমগ্র কাটোয়া ও কালনা মহকুমার কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিস্টপার্টির আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এমনকি কাটোয়া বর্ধমান আমোদপুর রেল লাইনের শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে।[২৩] সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্টির প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পায়। সুবোধ চৌধুরী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালে সি.পি.আই এবং ১৯৬৭ সালে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী হিসাবে কাটোয়া বিধান সভা কেন্দ্রে নির্বাচিত হন।[২৪] গ্রাম গঞ্জে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে জমিদারী বাধা অগ্রাহ্য করে ১৯৪৬ -এ একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেন যা জেলা বোর্ডের অনুমতি লাভ করে।[২৫] এছাড়া পার্টিকর্মীদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় চালু করেন। বিধায়ক হিসাবে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প হিসাবে ঢেঁকি কল, দড়ি তৈরীর কল ইঁদা কুঁয়ার মাধ্যমে জলসেচ, মৎস সমবায়, কৃষক সমবায় স্থাপন করেন।

পশ্চিম বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে জমি আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। চৈতন্যপুরের জমিদারদের ও পুটশুড়ীর জমিদারদের অন্যায় ভাবে দখল করা জমি পুনরুদ্ধার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবজনক।[২৬] এর পূর্ব মুখ্য মন্ত্রী প্রফুল্লসেনের জনবিরোধী খাদ্য নীতির প্রতিবাদে পূর্বস্থলী থেকে বিশ হাজার মানুষের ভূখামিছিল ত্রিশ মাইল পদ যাত্রার মাধ্যমে কালনা মহকুমা শাসকের কাছে গণডেপুটেশনের জন্য তিনি নিয়ে যান।[২৭] এবং তৎসহ কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছেও একই গণডেপুটেশন দেওয়া হয়।

তাঁর এই সব সাহসী পদক্ষেপ শাসক শ্রেণী ও সরকার পছন্দ করেনি। তাই ১৯৬৪ সালে 'ভারত রক্ষা আইনে' তাঁকে গ্রেপ্তার করে কয়েকমাস জেলাখানায় বন্দী করে। ১৯৬৫ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হন।[২৮] পঃ বঙ্গে ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বর্ধমানের 'সাঁই বাড়ির ঘটনায়' এক নম্বর আসামী করা হয়। রাজ্যপাল

ধরমবীর কমিউনিস্টনেতা জ্যোতিবসুকে বার বার বলেন সুবোধ চৌধুরীকে আত্মসমর্পণ করতে, কিন্তু জ্যোতি বসু উত্তরে বলেন 'পুলিশ পারলে ধরুক, আমরা ধরিয়ে দেবনা।'[২৯] এভাবে পুলিশের সাজানো ঘটনার প্রতিবাদ করা হয়।

আত্মগোপন অবস্থায় গঙ্গা পার হবার সময় তিনি হঠাৎ পক্ষ্যাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন অন্য নামে কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে ডাঃ ভাস্কর রায় চৌধুরীর তত্ত্বধানে তাঁকে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানতে পারে। তাই তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বাড়িতে রাখা নিরাপদ মনে না হওয়ায় তৎকালীন পার্টিনেতা ডঃ হরমোহন সিংহ ও কৃষ্ণচন্দ্র দত্তর উদ্যোগে বিহারের রাজধানী পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পঃ বাংলায় ১৯৭০ পরবর্ত্তী এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যই এই স্থানান্তরের প্রয়োজন ছিল কারণ তখন তাঁর বডি ওয়ারেন্ট ঘোষণা করা হয়েছিল। পাটনা শহরেই ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট এই আজীবন বিপ্লবী অকৃতদার ও কমিউনিস্টনেতার জীবনাবসান ঘটে। সুবোধ চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) এর পলিটব্যুরো ১৯৭২ সালের ২৮ আগস্ট এক শোক বার্তায় জানায় 'কমরেড চৌধুরীর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকান্ড এবং তাঁর নিঃস্বার্থ সাধাসিধে জীবনযাত্রা সকল কমিউনিস্টের কাছে চিরদিন এক উৎসাহোদ্দীপক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।[৩০]

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে পতাকা সুবোধ চৌধুরী তুলে ছিলেন তা ধর্ম বা জাতপাতের সীমা অতিক্রম করে অগ্রদ্বীপ ও সন্নিহিত গ্রামগুলিতে শ্রেণী সংগ্রামের বীজবপন করেছিল, স্বাধীনোত্তর কালে জমিদার ও জোতদার শ্রেণী ব্রিটিশ নির্দেশিত পথেই শোষক ও শাসকে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার বৈষম্যপূর্ণ ছবির কোন পরিবর্ত্তন তারা করতে চায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে ছিলেন যে ছবি তাঁরা এঁকেছিলেন দেশ ভাগের যন্ত্রণার মাধ্যমে-অর্জ্জিত সে খন্ডিত স্বাধীনতা সেই স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়। তাই স্বাধীনভারতেও হাজার হাজার সুবোধ চৌধুরীদের জমিদার-জোতদার-বুর্জোয়া বিরোধী সংগ্রাম করতে হয়। মানুষদের বোঝাতে হয়। তাদের সংগঠিত করতে হয়, এই বৈষম্য পূর্ণ ব্যবস্থাকে ভাঙতে, পরিবর্ত্তন করতে। অগ্রদ্বীপ সহ সমগ্র গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চলে সেই সংগ্রাম আজও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। সাক্ষাৎকার ঃ-সুব্রত চৌধুরী, অগ্রদ্বীপ, ২৯.১২.২০০৩,

২। তদেব।

৩। *স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমা (১৮৭৬-১৯৫২)*, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ : ২০৬-৭

৪। তদেব
৫। সাক্ষাৎকার ঃ সুব্রত চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
৬। তদেব
৭। সাক্ষাৎকার ঃ সিদ্ধেশ্বর কারফর্মা, অগ্রদ্বীপ (কালিকাপুর) ২৫.১২.২০০৩
৮। *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ*, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ বর্ধমান ১৯৯১, পৃ : ২৪২।
৯। সাক্ষাৎকার-সুব্রত চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
১০। সাক্ষাৎকার সিদ্ধেশ্বর কারফর্মা, প্রাগুক্ত।
১১। সাক্ষাৎকার-পটল বিশ্বাস, অগ্রদ্বীপ, ১১.০১.২০০৪।
১২। তদেব
১৩। সাক্ষাৎকার-শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া, ১১.১০.১৯৯৮।
১৪। *কাটোয়া মহকুমার কমিউনিস্ট পার্টিগঠনের কিছু কথা*, অনঙ্গ রুদ্র, কাটোয়ার কলম, শারদ সংকলন, কাটোয়া, ২০০৩, পৃ : ৯১-৯২
১৫। সাক্ষাৎকার-সিদ্ধেশ্বর কারফর্মা প্রাগুক্ত।
১৬। সাক্ষাৎকার-সুব্রত চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
১৭। সাক্ষাৎকার-আজিজুর রহমান, কাটোয়া, ২৯.১২.২০০৩
১৮। *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ*, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পৃ :- ২৪২, প্রাগুক্ত।
১৯। তদেব পৃ : ২৪৩
২০। তদেব
২১। সাক্ষাৎকার-পটল বিশ্বাস, প্রাগুক্ত।
২২। *বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ*, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পৃ :- ২৪৩, প্রাগুক্ত,
২৩। তদেব, পৃ : ২৪৪
২৪। সাক্ষাৎকার-সুব্রত চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
২৫। বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, প্রাগুক্ত।
২৬। সাক্ষাৎকার-সিদ্ধেশ্বর কারফর্মা, প্রাগুক্ত।
২৭। সাক্ষাৎকার-ধর্মদাস মুখার্জ্জী, পূর্বস্থলী, ২২.০২.২০০৪
২৮। *দেশহিতৈষী শারদ সংখ্যা*, প্রকাশনা-ভারতের কমিউনিস্টপার্টি (মাঃ) কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ : ৮৮
২৯। সাক্ষাৎকার সুব্রত চৌধুরী, প্রাগুক্ত।
৩০। *দেশহিতৈষী শারদসংখ্যা*, প্রাগুক্ত।

জাতীয় কংগ্রেসে সুভাষ চন্দ্রের অবস্থান ঃ অন্তঃসংগ্রাম ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নানারূপ-১৯২২-৩৯

প্রভাত রায়

ঔপনিবেশিক ভারতে জীতায় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হিসাবে সুভাষ চন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই অবস্থান কখনোই এক মাত্রিকরূপে সরল রৈখিক রাজনৈতিক প্রণালীতে প্রবাহিত হয়নি। নানা বাঁক, দ্বন্দ্ব, ঘাত-সংঘাত সুভাষের কংগ্রেস নেতারূপে অবস্থানকালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পরিলক্ষিত জীবনে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে আমি এই সকল বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব যে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি সর্বদা কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি অনুসারে না চলে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমুজ্জ্বল।

১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির নির্বাচন জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তার প্রভাব পড়েছিল। কারণ এর পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়ে নির্বাচন হয়নি, সর্বসম্মতভাবে মনোনীত হয়েছেন। এই প্রথম সভাপতির পদ নিয়ে নির্বাচন হয়। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে আগের বছর (১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেসে) সুভাষ চন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই এমন কি ঘটেছিল যে তাঁর নির্বাচন নিয়ে বিরোধ দেখা দিল? যাই হোক. সুভাষ চন্দ্র বসু শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়লাভ করলেন (১৫৮০-১৩৭৫ ভোটে), গান্ধী নিজের পরাজয় মনে করে শ্লেষাত্মকভাবে বললেন যে, পরাজয় আমারই বেশি, সীতারামাইয়ার নয়।[১] তিনি এমনকি, সুভাষ চন্দ্রকে দেশের শত্রু নন[২] বলেও মন্তব্য করেন। বস্তুতপক্ষে এই নির্বাচনে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীতারামাইয়ার সঙ্গে হলেও পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা (যা ছিল মূলত প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা) হয়েছিল গান্ধীর সঙ্গে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধুমাত্র সভাপতির পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, তা আদর্শের লড়াই হিসাবেই উভয়ে মনে করতেন। পদাধিকারী হওয়ার চেয়ে লক্ষ্য অর্জনের লড়াই বলে গান্ধীবাদী রাজেন্দ্র প্রসাদ মনে করতেন।[৩] স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্বাচন একটি অন্য মাত্রা যোগ করে। বলাই বাহুল্য, যে, ১৯৩৯ সালের সভাপতির নির্বাচনের পর থেকে গান্ধী-সুভাষ বিরোধের কোন সমাধান হয়নি। সর্বশেষ পর্যায়ে সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হন এবং পৃথক দল গঠন করেন। যদিও প্রথমে বসু কংগ্রেসেব মধ্যে থেকে সমস্ত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে কংগ্রসের মধ্যেই একটি অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে 'ফরোয়ার্ড

ব্লক' নামে ব্লক গঠন করেন।[৪] তবে বহিস্কৃত হায়ে সুভাষ এই ফরোয়ার্ড ব্লককে রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সুভাষ জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে (গান্ধীর দ্বারা পরিচালিত) যোগদান করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে গান্ধীর সকল সিদ্ধান্তেই সুভাষ মেনে নেননি। চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে সুভাষ চরম বিভ্রান্তি বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।[৫] এমনকি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীর যোগদানকেও বসু মেনে নিতে পারেননি।[৬] তবে এই সকল মত পার্থক্য কখনোই ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরবর্তী ঘটনার মত পরিণতি হয়নি, এমনকি, কাছাকাছি পৌঁছায়নি। কারণ সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিভাজন সরকারের হাত শক্ত করবে।[৭] তা সত্ত্বেও কেন কংগ্রেসে এই বিরোধ এবং সর্বশেষ পর্যায় হিসাবে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে তা নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবী রাখে।

গান্ধী-সুভাষ, বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সে প্রশ্নটি জাগে তাহল দুইবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেও (একবার মনোনীত এবং দ্বিতীয়বার ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত), বেশ কয়েকবার বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেও গান্ধীবাদী নীতির প্রতি সুভাষ চন্দ্র কতটুকু আস্থাবান ছিলেন? আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলনের পর গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৯২০ সালের পর থেকে গান্ধীজীর নীতিই জাতীয় কংগ্রেসের নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে সুভাষ ব্রিটেন হতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমেই বোম্বাইতে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আন্দোলনের পরি কল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। গান্ধীর আন্দোলনের পরিকল্পনা তাঁর মনঃপুত হয়নি এবং তিনি হতোদ্যম হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। মূলত শ্রীবসু আন্দোলন সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করেন—যার মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি হতাশ হন। স্বভাবতই বসুর মনে হয়েছিল যে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছাবার ধাপগুলি সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা অস্পষ্ট। ফলস্বরূপ এরপর থেকে তিনি গান্ধীজীর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি।[৮] হতোদ্যম সুভাষ, গান্ধীর নির্দেশে কলকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২০-২৫ সালের মধ্যে দেশবন্ধু গান্ধীর অনেক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। শুধু তাই নয়, যতদিন বেঁচে ছিলেন, গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি। কাজেই বাঙালী হিসাবে সুভাষ সেই ঐতিহ্যের অনুসারী বলেই সুধী প্রধান মনে করেন।[১০] যাই হোক ঘরের কাছেই তিনি পেয়ে গেলেন এমন একজন নেতাকে যিনি মানুষ ও রাজনীতিবিদ হিসাবে পূর্ণ করলে তাঁর সকল আশা। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সুভাষের উপর এত গভীরভাবে পড়েছিল সে বাংলার ও সর্বভারতীয়

রাজনীতিতে তাঁর নির্দেশ বা নির্ধারিত নীতি সুভষ চন্দ্র প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতেন।[১১] সুতরাং বলা যায় যে গান্ধীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বসুর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রাজনৈতিক জীবনের সূচনাকাল থেকেই বর্তমান ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও (বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে) গান্ধী-সুভাষ মতপার্থক্য উভয়ের বিচ্ছেদের কারণ বলা যেতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে গান্ধীবাদী আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল চরকা বয়ন। আসলে গান্ধী আধুনিক যন্ত্র নির্ভর সভ্যতাকে মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। গান্ধীজী মনে করতেন যে যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা মানুষের মধ্যে ভোগ-বিলাস বৃদ্ধি করে মানুষের মধ্যে দুঃখ-কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দেয়।[১২] অন্যভাবে বলা যায় যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত করে দুঃখ-কষ্টকে বাড়িয়ে তোলে সুতরাং একথা বলতে পারি সে শিল্প বিপ্লবকে গান্ধীজী মানব সভ্যতার পক্ষে অমঙ্গলকর রূপেই দেখেছেন। একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে সেই সময়ের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী এবং উল্লেখযোগ্য নেতারা (রাজেন্দ্র প্রসাদ, পট্টভি সীতারামাইয়া, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ) যারা মূলত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং কংগ্রেস কমিটিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গান্ধীর অন্ধ ভক্তরূপে গান্ধীর প্রস্তাবকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি তাঁরা এতটাই অন্ধ ভক্ত ছিলেন যে গান্ধীর এই নীতিকে জাতীয় কংগ্রেসের নীতি এবং দেশের নীতিরূপে মেনে নিতে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা যদি সুভাষ চন্দ্রের চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করি, বিশেষ করে যন্ত্র শিল্প সম্পর্কে, তাহলে দেখতে পাই সে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ যন্ত্র সভ্যতাকে মানব সমাজের পক্ষে আশির্বাদরূপে মনে করতেন। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ প্রদান কালে বসু অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে যন্ত্র-শিল্পকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করতেন যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও দারিদ্র দূরীকরণে কৃষির উন্নতি সাধনই যথেষ্ট নয়, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হলে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে হবে। 'পরিকল্পনা কমিশন' গঠন করে সেই কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। মূল কথা হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র বসু আধুনিক শিল্পকে কুটির শিল্পের প্রতিযোগী না ভেবে বরং সহযোগী হিসাবেই মনে করতেন।[১৩] তাঁর এই বক্তব্যকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উদ্বোধনী ভাষণে (১৯৩৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর)। তিনি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন কিভাবে বৃহৎ শিল্প কুটির শিল্পের সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন যে বেনারসের তাঁতীদের (দৃষ্টান্ত হিসাবে বেনারসকে তিনি গ্রহণ করেন।) যদি বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সরবরাহ করা যায় বা সম্ভব হয় তাহলে তারা অনেক দ্রতু, স্বল্প ব্যয়ে অনেক বেশী বস্ত্র ত্া শাড়ী উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। ফলে তারা বৃহৎ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, বিশেষ করে বিদেশী আমদাণীকৃত পণ্যের সঙ্গে, টিকে থাকতে পারবে বা সমর্থ হবে বলেই তিনি মনে করতেন।[১৪]

গান্ধীর আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হল অহিংসা, যার মূল বক্তব্য হল শত্রু পক্ষের মন জয় করতে হবে অহিংসার দ্বারা। এমনকি তার বিপদের সময় সুযোগ গ্রহণ করে বিপদে ফেলার কোন অভিপ্রায় গান্ধীর ছিল না। এই দিক থেকে সুভাষ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, কৌটিল্যের নীতিতে বিশ্বাসী। এছাড়া বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই নেতা সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করতেন। আমরা সকলেই জানি যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। আর সশস্ত্র সংগ্রাম মানেই হিংসা, যাকে গান্ধী সম্পূর্ণভাবে অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করতেন। কিন্তু সুভাষ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কে রেখে চলতে। রাজীতির ক্ষেত্রে তিনি বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠী যুগান্তর দলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।[১৫] এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে সুভাষের নিয়োগে ইংরেজদের আপত্তির প্রধান বা মূল কারণ ছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।[১৬] তবে কলেজে পড়ার সময় সন্ত্রাসমূলক বৈপ্লবিক কাজকর্মের প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি।[১৭]

সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে অনিবার্যভাবেই কমিউনিজমের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এসেই যায়। ১৯২১-২৪-র পর্বে তিনি কমিউনিজ্মের প্রতি তেমন আকর্ষণবোধ না করলেও[১৮] ফেরারী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার জন্য তিনি সব সময়ই সাহায্য করেছেন।[১৯] প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা মানবেন্দ্র নাথ রায়ের সঙ্গে বসুর অনেক ক্ষেত্রে মত পার্থক্য ঘটলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সভাপতিত্বের কালে এক সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।[২০] এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা জনপ্রিয় করে তুলতে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, সুভাষ তাদের মধ্যে একজন।[২১] তবে সমাজতন্দ্রকে জনপ্রিয় করে তুললেও সুভাষ যে বলশেভিক ছিলেন না তার প্রমাণ তাঁর চিঠি থেকেই পাওয়া যায়—"যদি আমার বলেশেভিক এজেন্ট হওয়ার ইচ্ছে থাকত, তবে আমি সরকার বলা মাত্রই প্রথম জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করতাম।....... কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্খা নেই।"[২২] এমনকি , ভারতে মার্কসবাদ গ্রহণ প্রসঙ্গেও তিনি ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন অর্থাৎ মার্কসবাদকে সরাসরি গ্রহণ না করে ভারতীয় প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।[২৩] তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, " ....আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।"[২৪] এখানেই সুভাষের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর বড় পার্থক্য। নেহেরু তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদ—সমাজতন্দ্র ও ফ্যাসীবাদ—এর মধ্যে সমাজতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[২৫] অন্যদিকে বসু এই দুই মতবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তৃতীয় একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বললেন।[২৬] একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরবর্তীকালে সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে—মূলত ফ্যাসীবাদের উগ্র বা নগ্নরূপ দেখে।[২৭] বস্তুত সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পিত অর্থনীতি যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তেমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন

ফ্যাসীবাদের শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা। তবে একথাও ঠিক যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ততটা স্বচ্ছ ছিল না।[২৮] যাইহোক জীতায় সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি বা পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটেছিল। শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও মতপার্থক্য ঘটেছিল।[২৯] দেশত্যাগের পর তা আরো বৃদ্ধি পায়। তবে এটাও ঠিক যে দেশত্যাগের সময় বসু প্রয়োজনীয় অর্থ কমিউনিস্ট কর্মীর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।[৩০] বস্তুত প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত সুভাষ চন্দ্র বসু সুদীর্ঘ পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সুতরাং গান্ধী-সুভাষ বিরোধে উভয়ের পারিবারিক মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, মেজাজের পার্থক্য, শিক্ষার হেরফের প্রভৃতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন সংগঠন, মত ও পথ নিয়ে পার্থক্য, এমনকি তাদের উপর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।[৩১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বাল্যকালে (স্কুল জীবনে) সুভাষ কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে তেমন সচেতন ছিলেন না।[৩২] এমনকি দেশ ছাড়ার আগে (১৯১৯) পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেননি।[৩৩] বস্তুত দেশ ছাড়ার আগে যেমন কোন রাজনৈতিক মতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, তেমনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে প্রভাবিত হয়ে তিনি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি। মূলত মাতৃভূমিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করাই ছিল মূল প্রেরণা, তা যে কোন পন্থাই হোক না, এখানেই গান্ধীর সঙ্গে ফারাক প্রজন্মগত ব্যবধানকেও অস্বীকার করা যায় না। যদিও নেহেরুর সঙ্গে সমাজতন্ত্র নিয়ে গান্ধীর মতপার্থক্য ঘটে। কিন্তু গান্ধী কৌশলে তাঁকে নিয়ন্ত্রণে আনেন।[৩৪] তবে সুভাষের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ সবই কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে সুভাষ চন্দ্রকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করে তুলে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১। মহাত্মা গান্ধীর বিবৃত-৩১ জানুয়ারী, ১৯৩৯; উদ্ধৃত-*স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*; কলকাতা

২। · উপরিল্লিখত, পৃষ্ঠা-২৫৯

৩। সুধী প্রধান; *সুভাষ চন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি*; কলকাতা; ২০০০; পৃষ্ঠা-৬০

৪। বিপান চন্দ্র ও অন্যান; ভারততের স্বাধীনতা সংগ্রাম; কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৩৮২

৫। বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য; উপরিল্লিখিত; পৃষ্ঠা-১৫৭

৬। অমলেশ ত্রিপাঠী; *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*; কলকাতা; আশ্বিন ১৪০২; পৃষ্ঠা-১৮৯।

৭। সুভাষ চন্দ্র বসু; *দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-৪২*; পৃষ্ঠা-২০৭-৮

৮। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*; কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩০-৩১; দ্বিতীয় খন্ড।

৯। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*; উপরিল্লিখিত; পৃষ্ঠা-৩১।
১০। সুধী প্রধান; পূর্বে উল্লিখিত; পৃষ্ঠা-৩০
১১। শিশির কুমার বসু; 'কিছু নতুন চিন্তা, কিছু নতুন প্রশ্ন', *দেশ; সুভাষ সংখ্যা*, ১৯৯৭; পৃষ্ঠা-৫০
১২। অমলেশ ত্রিপাঠী; *স্বাধীনতার মুখ* গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
১৩। *সিলেক্টেড স্পিচেস্ আফ্ সুভাষ চন্দ্র বোস*; পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭।
১৪। *সিলেক্টেড স্পিচেস্ আফ্ সুভাষ চন্দ্র বোস;* পৃষ্ঠা-৯১।
১৫। অমলেশ ত্রিপাঠী; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৬০।
১৬। শঙ্করী প্রসাদ বসু-সমকালীন ভারতে সুভাষ চন্দ্র; কলকাতা, ১৯৯৮; পৃষ্ঠা-১৬; প্রথম খণ্ড।
১৭। সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৩৯; প্রথম খন্ড।
১৮। গৌতম চট্টোপাধ্যায়; 'সুভাষ চন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন; *পরিচয়*, জুন-জুলাই, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১২৫।
১৯। গৌতম চট্টোপাধ্যায়; উপরিল্লিখিত; পৃষ্ঠা-১২৫।
২০। অমিতাভ চন্দ্র; সুভাষ চন্দ্র ও বামশক্তি ঃ কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট *পরিচয়*; জুন-জুলাই, ১৯৯৬-এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।
২১। বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২১৮।
২২। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৭৮, প্রথম খন্ড।
২৩। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২১৫; তৃতীয় খন্ড।
২৪। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী;* উপরিলিখিত, পৃষ্ঠা-২১৬।
২৫। ১৯৩৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা।
২৬। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-১৮২, দ্বিতীয় খন্ড।
২৭। উপরিল্লিখিত; পৃষ্ঠা-২২৩।
২৮। বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২১৮।
২৯। সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৩৭।
৩০। অতীশ দাশগুপ্ত; ' স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের ডায়েরীতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মূল্যায়ন; *দেশ হিতৈষী;* ১৯৯৫; শারদ সংখ্যা।
৩১। অমলেশ ত্রিপাঠী; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৪০-৪১।
৩২। *সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী*, পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২৪, প্রথম খন্ড।
৩৩। শিশির কুমার বসু; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-৪৯।
৩৪। অমলেশ ত্রিপাঠী; পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২৫৮-৫৯।

ষাটের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বিভাজন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমান্তরাল প্রয়াস ঃ একটি পর্যালোচনা

অমিতাভ চন্দ্র

১৯৬৪ সালে সংঘঠিত হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বড় বিভাজন। এই বিভাজনের পরিণতিতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলেও পার্টি ভাঙ্গনের বীজ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিহিত ছিল পঞ্চাশের দশকেই। তাই ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির পথম বিভাজন নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গটির সূত্রপাত করতে হবে প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই।

পঞ্চাশের দশকে ভারতে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অবস্থিত থাকলেও তা ছিল নেহাতই আনুষ্ঠানিক ঐক্যবদ্ধতা। প্রকৃতপক্ষে পার্টির মধ্যে ছিল তীব্র মতবিরোধ ও তীব্র মতপার্থক্য, শুরু হয়েছিল পার্টির মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম। নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও বিষয়কে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল এই মতপার্থক্য ও মতবিরোধ সমূহ, সেগুলির ওপর ভিত্তি করেই চলছিল আন্তরপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম।[১]

১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ প্রয়াত হলেন জোসেফ স্তালিন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে স্তালিন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন নিকিতা ক্রুশেভ নেতৃত্ব শুরু করলেন নিঃ - স্তালিনীকরণ (De-Stalinization) প্রক্রিয়া। একইসঙ্গে ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত এই বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশেভ নতৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমদানি করলেন এক নতুন তত্ত্ব — যা 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Theories' হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। এই তিন পি-র তত্ত্ব বা 'Three P's Theories' হল — ১) শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ (Peaceful Transition to Socialism), ২) ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful competition with the Capitalised Imperialist States) এবং ৩) ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Peaceful competition with the Capitalised Imperialist States)।

এই নিঃ - স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Theories' আলোড়ন ফেলে ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী অংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন এই নিঃ - স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব'। মাও জে-দং-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই 'তিন পি-র তত্ত্ব' এবং নিঃ - স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রুশেভ নেতৃত্বকে 'সংশোধনবাদী', 'সংস্কারণপন্থী', 'ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পনকারী' ইত্যাদি নিন্দাসূচক আখ্যায় আখ্যায়িত করল। চীনের মাও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হানলেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব। শুরু হয়ে গেল ষাটের দশকের গোড়া থেকেই চীন - সোভিয়েত মতাদর্শগত সংগ্রাম, যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুপরিচিত হয়ে আছে 'Great Theoritical Debate' বা 'মহান্ মতাদর্শগত সংগ্রাম' নামে।

এই চীন সোভিয়েত দ্বন্দ্বের প্রতিফলন পড়ল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব কর্তৃক নিঃ - স্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব' উপস্থাপিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। চীনের মাও নেতৃত্ব এই প্রক্রিয়া এবং এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে তার বিরোধীতায় অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরস্থ এই দ্বন্দ্ব নতুন এক মাত্রা পেল এবং আবও তীব্র হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক অংশ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী, আর অপর অংশটি চীনের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী না হলেও তাঁদের অবস্থান ছিল চীনের অবস্থানের কাছাকাছি। সাধারণভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে এক পক্ষ 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' এবং অপর পক্ষ 'চীনপন্থী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। বাম-দক্ষিণ বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির, 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' অংশ 'দক্ষিণপন্থী' এবং সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত অপর অংশ 'বামপন্থী' বলেই পরিচিত ছিল।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এই 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' অবস্থানদ্বয়কে আরও জোরদার করে মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলে পার্টির ভাঙ্গনকে অনিবার্য করে তুলল।

এই আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলীর সঙ্গেই যুক্ত ছিল জাতীয় প্রশ্নাবলী এবং বিষয়সমূহ। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় প্রশ্নাবলী এবং বিষয়সমূহ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য ও মতবিরোধ এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এবং তাই নিয়ে বিতর্ক।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সে জাতীয় প্রশ্ন ও বিষয়গুলি নিয়ে অন্তর্বিরোধ এবং মতপার্থক্য ছিল, সেগুলি ছিল সাধারণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতের শাসক শ্রেণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতাধীন জওহরলাল নেহরু সরকার ও কংগ্রেস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা দরকার, তার চরিত্র কি হবে এবং তাতে কোন্ কোন্ শক্তি যোগ দেবে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর সমন্বয়ে তৈরী হবে এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, নেতৃত্ব থাকবে কোন্ শ্রেণীর হাতে ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি শিবির তৈরী হয়ে গিয়েছিল। একটি শিবিরের নাম ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ (National Democratic Front or NDF) শিবির এবং অপর শিবিরটির নাম ছিল জনগণ তান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ (People's Democratic Front or PDF) শিবির।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ বনাম জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।[২] ১৯৫৬ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কেরলের পালঘাটে। এই পালঘাট কংগ্রেসেই এই বিতর্ক সামনে চলে এসেছিল। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন ডি এফ গঠনের কথা পার্টির যে সদস্যরা বলতেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল এই জাতীষ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, পাতি বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া এই চার শ্রেণীকে নিয়ে। এই ফ্রন্টের ভিত্তি হবে দৃঢ়বদ্ধ শ্রমিক-কৃষক ঐক্য, এবং এই ফ্রন্ট পরিচালিত হবে চার শ্রেণীরই যৌথ নেতৃত্বে, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে। অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা জোর দিয়েছিলেন যৌথ নেতৃত্বের ওপর। অপরদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা পি ডি এফ গঠনের কথা পার্টির যে সদস্যরা বলতেন, তাঁরাও শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, পাতি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া এই চার শ্রেণীকে নিয়েই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা বলতেন, তাঁরাও জোর দিতেন দৃঢ়বদ্ধ শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের ওপর, যা হবে এই ফ্রন্টের ভিত্তি, কিন্তু তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকবেন একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর একক নেতৃত্বের ভিত্তিতেই গঠন করতে হবে চার শ্রেণীর এই যৌথ জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। যৌথ নেতৃত্বের কোনও তত্ত্ব গ্রহণ করতে এই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা প্রস্তুত ছিলেন না।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল কংগ্রেসের একাংশকে অর্থাৎ কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশকে এই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্যে টেনে আনতে হবে, সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন জনগণের সঙ্গে। তাঁদেরও টেনে আনতে হবে, এই ফ্রন্টের ভেতর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে,

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অংশকে সঙ্গে রাখতে হবে। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি কোনও সহযোগিতার কথা না বললেও এই মতের প্রবক্তরা কংগ্রেস সম্পর্কে, বিশেষত কংগ্রেসের নেহরু নেতৃত্ব সম্পর্কে, সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং কংগ্রেসের মধ্যে ও কংগ্রেসের বাইরে ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জওহরলাল নেহরু ও তাঁর অনুগামী প্রগতিশীলদের প্রয়োজনীয় সমর্থনের কথা বলতেন। অপরদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা শ্রমিক শেণীর একক নেতৃত্বের ওপরই জোর দিতেন, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে এই ফ্রন্টে স্থান দিলেও তাঁদের সঙ্গে নেতৃত্ব ভাগ করে নেওয়ার মত কোনও দুর্বলতা দেখাতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না, এবং সেই কারণেই কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানে তাঁরা দৃঢ় ছিলেন, কংগ্রেসের নেহরু নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদের কোনও অহেতুক মোহ ছিল না, এবং কংগ্রেসের নেহরু নেতৃত্বের প্রতি অপর মতের প্রবক্তাদের মত কোনও দুর্বলতা তাঁরা পোষণ করতেন না।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা সাধারণভাবে 'দক্ষিণপন্থী' হিসাবে এবং জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা সাধারণ ভাবে 'বামপন্থী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে 'রুশপন্থী'রাই সাধারণ ভাবে জাতীয় প্রশ্নে ছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা, আর অপরদিকে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সাধারণভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিতরাই জাতীয় প্রশ্নে ছিলেন জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা। পার্টির মধ্যে যাঁরা 'রুশপন্থী' ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা ছিলেন, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যাঁরা 'দক্ষিণপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, ১৯৬৪ সালে পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর তাঁরা প্রায় সকলেই থেকে গেলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সি-পি-আই তেই। আর অপর দিকে পার্টিব মধ্যে যাঁর সাধারণ ভাবে 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন ও জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তা ছিলেন অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যাঁরা 'বামপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, পার্টি ভাগের পর কয়েকজন ব্যাতীত তাঁদের প্রায় সকলেই যোগ দিলেন নবগঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি পি আই (এম)-এ। অবশ্যই উভয় পক্ষেই কয়েকজন ব্যতিক্রমী ছিলেন। যেমন পার্টির মধ্যে উভয় পক্ষের শক্তিবিন্যাস অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি ও ষাটের দশকের প্রথম দিকে 'বামপন্থী' বলে পরিচিত শিবিরে অবস্থানকারী ও বিবিধ প্রশ্নে 'বামপন্থী' দের ঘনিষ্ট বলে পরিচিত এবং সাধারণ ভাবে 'বামপন্থী' হিসাবেই চিহ্নিত ভূপেশ গুপ্ত ও রণেন সেন পার্টি ভাগের পর সি পি আই (এম)-এ যোগ না দিয়ে থেকে গেলেন সি পি আই-তেই। একই কথা প্রযোজ্য সোহন সিং যোশ সম্পর্কেও।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা তাত্ত্বিক প্রশ্নে যখন অবিভক্ত ভারত কমিউনিস্ট পার্টির

মধ্যে বাম-দক্ষিণ মেরুকরণ প্রক্রিয়া পূর্ণ মাত্রায় শুরু হয়ে গেছে, তখন পার্টি ভাগের ঘোরতর বিরোধী জ্যোতি বসু এবং ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সাধারণ ভাবে 'মধ্যপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করলেও শেষ বিচারে তাঁদের অবস্থান ছিল 'বামপন্থী' শিবিরেই এবং তাঁদের পরিচিতি ছিল 'বামপন্থী' হিসাবেই। পার্টির মধ্যে বাম-দক্ষিণ মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়া থেকেই পার্টি ভাগ হয়ে সি পি আই (এম) সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু ও ভূপেশ গুপ্ত প্রায় একই মতের প্রবক্তা ও একই পথ অনুসরণকারী ছিলেন। পার্টি ভাগের পর জ্যোতি বসু ও নাম্বুদ্রিপাদ যোগ দিলেন নবগঠিত সি পি আই (এম)-এ, কিন্তু ভূপেশ গুপ্ত থেকে গেলেন সি পি আই-তেই।

১৯৬২ সালের ১৩ জানুয়ারি, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ঠিক মাস খানেক আগে, প্রয়াত হলেন কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অজয়কুমার ঘোষ। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই বিভিন্ন প্রশ্নে যে অন্তর্বিরোধ ও মতপার্থক্য দেখা দিতে শুরু করেছিল, তাকে যতটা সম্ভব প্রশমিত রেখে এক 'মধ্যপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে সাংগঠনিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে অজয় ঘোষের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর পার্টি বিভাজন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। আশু পার্টি বিভাজনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' উভয় শিবিরের মধ্যে আপস হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে এক নতুন চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করে 'দক্ষিণপন্থী' শিবিরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা এস এ ডাঙ্গেকে করা হল পার্টির চেয়ারম্যান এবং 'বামপন্থী' শিবরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদকে করা হল পার্টির সাধারণ সম্পাদক। এইভাবে পার্টি বিভাজন আরও দুই বছর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর শুরু হল চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। এই চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে সারা ভারতে সৃষ্টি হল উগ্র চীন বিদ্বেষ। উগ্র দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদ আচ্ছন্ন করে রাখল সারা দেশকে। আর তার সঙ্গেই যোগ হল উগ্র ও উৎকট কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। চীনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের এক করে দেখে উগ্র চীন বিরোধীতা রূপ নিল উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায়। এই ব্যাপারে সবচেয়ে প্রবল ভূমিকা ছিল কংগ্রেসের ভিতরের ও বাইরের যাবতীয় দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির। প্রকৃতপক্ষে এই সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য চীন ও ভারত উভয়ের মধ্যে কার কতটা দায়িত্ব, কে কতটা দোষী, সে সমস্ত বিবেচনাবোধ শিকেয় তুলে রেখে, সমস্ত যুক্তি বিসর্জন দিয়ে, একতরফা ভাবে চীন বিরোধিতার ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার রাস্তা গ্রহণ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বিখণ্ডিত না হলেও পার্টির মধ্যে 'দক্ষিণপন্থী' ও 'বামপন্থী' মেরুকরণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং একে অপরের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির

'দক্ষিণপন্থী' অংশ চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে এবং বিশেষ করে নেহ্রু ও তাঁর অনুগামীদের পূর্ণ সমর্থনের কথা, ঘোষণা করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থী' অংশ চিহ্নিত হলেন 'দেশদ্রোহী' হিসাবে। সর্বত্র আক্রমণের শিকার হলেন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের প্রধান অপরাধ ছিল, তাঁরা দেশব্যাপী উগ্র দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও চীন বিদ্বেষের স্রোতে গা না ভাসিয়ে এবং চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত না করে নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করেছিলেন এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভাবে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন। পরিণতিতে দেশ জুড়ে সব 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরাই আক্রমনের ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক হারে কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছিল। প্রধানত 'বামপন্থী' বা 'চীনপন্থী' বলে পরিচিত কমিউনিস্টরাই গ্রেপ্তার হলেও যেহেতু ব্যাপক হারে ও প্রায় নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেহেতু অনেক 'দক্ষিণপন্থী' বা 'রুশপন্থী' বলে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতাও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, যাঁরা পরবর্তী কালে পার্টি ভাগের পর যোগ দিয়েছিলেন সি পি আই-তে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এক মাসও চলেনি, কিন্তু 'বামপন্থী' ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার হয়ে থাকতে হল এক বছরেরও বেশি। তাঁরা মুক্তি পেলেন ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এই রকমই পরিস্থিতিতে ঘটনাবলীর স্রোতে ও অনিবার্য পরিনতি হিসাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখন্ডিত হল ১৯৬৪ সালে। এই বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হল নতুন এক কমিউনিস্ট দল — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি পি আই (এম)।

১৯৬৪ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে তখনও পর্যন্ত অবিভক্ত সি পি আই-এর জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসল। এই জাতীয় পরিষদের বৈঠকে 'বামপন্থী' কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে 'দক্ষিণপন্থী' কমিউনিস্ট নেতাদের তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিল। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। সেই বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল 'ডাঙ্গে পত্রাবলী' নিয়ে উভয় পক্ষের বিতর্ক। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা দাবি করেছিলেন, জাতীয় পরিষদের সভায় ডাঙ্গের সভাপতিত্ব করা চলবে না, যেহেতু 'ডাঙ্গে পত্রাবলী' নিয়ে বিতর্ক চলছে। শেষ পর্যন্ত কোনও আলোচনাই ফলপ্রসু হল না। ১১ এপ্রিল ১৯৬৪ জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পৃথক বিবৃতি দেন। এই সভাত্যাগী সদস্যদের মধ্যে নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসু ও ভূপেশ গুপ্ত তিন জনই ছিলেন। পার্টির ভাঙ্গন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেলো।

১৯৬৪ সালের ৭-১১ জুলাই জাতীয় পরিষদের সভাত্যাগী ৩২ জন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টের ডাকে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। যোগ দিয়েছিলেন সারা দেশ থেকে ১৪৬ জন প্রতিনিধি, যাঁরা 'বামপন্থী' কমিউনিস্ট বলে

পরিচিত ছিলেন। জ্যোতি বসু ও নাম্বুদ্রিপাদ এই তেজালি কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভূপেশ গুপ্ত এই কনভেনশনে যোগ দেননি। জাতীয় পরিসদের সভা থেকে অন্য ৩১ জনের সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তার পরই 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন সি পি আই-তেই।

এই সময়ই কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াসে পার্টি ভাঙ্গন বিরোধী এবং 'মধ্যপন্থী' কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি সংগঠন। তার নাম ছিল কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার (Communist Unity Centre) বা কমিউনিস্ট ঐক্য কেন্দ্র বা সি ইউ সি। জ্যোতি বসু এই সময় যুক্ত হয়েছিলেন এই সি ইউ সি-র সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন নিরঞ্জন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইসমাইল, মনোরঞ্জন রায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত ঘোষাল প্রমুখরা। জ্যোতি বসু সহ এঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন সি পি আই (এম)-এ। সি ইউ সি-র কয়েকজন সদস্য শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন সি পি আই-তে, আর কেউ কেউ সি পি আই (এম) ও সি পি আই —এই দুই দলের কোনওটিতেই যোগ না দিয়ে নিজেদের 'মধ্যপন্থী' ও ভাঙ্গনবিরোধী অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। তেনালি কনভেনশনের আগেই কলকাতায় 'জ্যোতি বসু প্রমুখের দলিল' নামে একটি রাজনৈতিক দলিল প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের দলিলের থেকে পৃথক্। এই দলিলটি ছিল জ্যোতি বসু এবং সি ইউ সি-র অন্যান্য সদস্যদের তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদের পরিচায়ক।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে এই বিভাজন বা ভাঙ্গনের সমকালে বিভাজন বা ভাঙ্গনের প্রয়াসের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত না হয়ে যাঁরা নিজেদের পৃথক অবস্থান রক্ষা করে দুই শিবিরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ও পার্টিকে অবিভক্ত রাখার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তাঁদের সেই সময়কার অবস্থানের ও প্রয়াসের টুকরো-টুকরো বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের কারও-কারও স্মৃতিচারণে এবং বর্তমান লেখককে দেওয়া তাঁদের সাক্ষাৎকারে। এই রকম কয়েকটি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় ও সাক্ষাৎকারেই প্রাপ্ত এই টুকরো-টুকরো বিবরণ গুলিকেই গ্রথিত করে যাঁরা সেই যুগে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঐক্য রক্ষা করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের অবস্থান, ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপের ছবিটি অঙ্কন করা প্রয়োজন, যা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবেই জরুরী।[৩]

কমিউনিস্ট পার্টি অবিভক্ত থাকাকালীন পার্টির মধ্যে 'বামপন্থী' ও 'দক্ষিণপন্থী' বলে পরিচিত দুই শিবিরের শক্তিবিন্যাশ অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্বে ও ষাটের দশকের প্রথম পর্বে 'বামপন্থী' বলে পরিচিত শিবিরে অবস্থানকারী ও বিবিধ প্রশ্নে 'বামপন্থী'দের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এবং সাধারণ ভাবে 'বামপন্থী' হিসাবেই চিহ্নিত

ভূপেশ গুপ্ত ও রণেন সেন পার্টি ভাগের পর নবগঠিত সি পি আই (এম) এ যোগ দেননি। পার্টির মধ্যে 'বামপন্থী' বলেই পরিচিত থাকা সত্ত্বেও ভূপেশ গুপ্ত ও রণেন সেন পার্টি বিভক্ত হওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন সি পি আই - তেই। সোহন সিং যোশ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি খাড়াখাড়ি ভাবে দুই খন্ডে বিভক্ত হওয়ার সময় ও তার ঠিক পরবর্তী কালে বেশ কয়েকজন পার্টি সদস্য দুই পার্টির কোনওটিতেই যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁদের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পরবর্তী কালেও সি পি আই (এম) বা সি পি আই — উভয় দলের কোনওটিতেই যোগ না দিয়ে তাঁদের নিরপেক্ষ অবস্থানই শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন বা রেখেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের নাম এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে — যেমন, নন্দলাল বসু, গোপাল আচার্য, বীরেন রায়, সুবোধ দাশগুপ্ত, অজিত রায় প্রমুখ। পার্টি ভাগের সময় ও তার অব্যবহিত পরেই রণেন সেনও প্রথমে সি পি আই বা সি পি আই (এম) — উভয় দলের কোনওটিতেই যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী একাশি পার্টির দলিলের ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান স্রোত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই উপলব্ধি করে শেষ পর্যন্ত আবার তিনি সি পি আই-তেই ফিরে এসেছিলেন[৪] এবং নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সি পি আই - এরই সদস্য ছিলেন।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষের দিনগুলিতে 'বামপন্থী' বলে পরিচিত কমিউনিস্টদের, যাঁরা পার্টি বিভক্ত হওয়ার পরিণতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সি পি আই (এম) গঠন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এক অংশ 'নরমপন্থী' ও অপর অংশটি 'চরমপন্থী' বলেই পরিচিত ছিলেন। কলম্বো প্রস্তাবের মূল্যায়ণ সংক্রান্ত মতপার্থক্য ও মতবিরোধ এবং গণসাধারণতন্ত্রী চীন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ভিত্তিতেই 'বামপন্থী' বলে পরিচিত কমিউনিস্টদের মধ্যে এই 'নরমপন্থী' - 'চরমপন্থী' বিভাজন ছিল। সি পি আই (এম) গঠনকারী এই 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের মধ্যে জ্যোতি বসু, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইসমাইল, নিরঞ্জন সেন, মনোরঞ্জন রায়, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 'নরমপন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন এবং অপরদিকে মুজফফর আহ্‌মেদ, মহম্মদ আবদুল্লাহ্‌ রসুল, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙ্গার, গণেশ ঘোষ, রতনলাল ব্রাহ্মণ, বিজয় মোদক, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ 'চরমপন্থী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।[৫] এই 'নরমপন্থী' নেতৃবর্গের প্রধান প্রবক্তা ও নেতা ছিলেন জ্যোতি বসু এবং অপরদিকে এই 'চরমপন্থী' নেতৃবর্গের প্রধান নেতা ও প্রবক্তা ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।[৬]

শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বসু যোগ দিয়েছিলেন তেনালি কনভেনশনে এবং এই কনভেনশনের কার্য পরিচালনার জন্য সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন,

অর্থাৎ তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর 'মধ্যপন্থী' অবস্থান ত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভাবেই যোগ দিলেন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের সঙ্গে। একই অবস্থান গ্রহণ করলেন ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ।

তেনালি কনভেনশনেই স্থির হল, পার্টির সপ্তম কংগ্রেস আহ্বান করে নতুন রাজনৈতিক লাইন 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' - এর স্লোগানের ভিত্তিতে স্থির করা হবে। গ্রহণ করা হবে নতুন পার্টি কর্মসূচী। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতভেদের প্রশ্নে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

তেনালি কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার ত্যাগরাজ হলে ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নবগঠিত দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কবাদী) বা সি পি আই (এম) - এর প্রথম কংগ্রেস। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বতন কংগ্রেসগুলির ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এই কংগ্রেস সি পি আই (এম) - এর বিচারে পরিচিত হয়ে আছে এই দলের সপ্তম কংগ্রেস হিসাবে। সপ্তম কংগ্রেসে পি সুন্দরাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে সি পি আই (এম) - এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো উভয় সংস্থাতেই সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন জ্যোতি বসু ও নাম্মুদ্রিপাদ, তখন থেকেই অদ্যাবধি জ্যোতি বসু সি পি আই (এম) - এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো উভয়েরই সদস্য। সাতের দশকে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সি পি অই (এম) - এর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তারপর থেকে সুদীর্ঘ সময় তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই দলকে পরিচালিত করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ৭ নভেম্বর মনুমেন্ট ময়দানে নবগঠিত সি পি আই (এম) - এর প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নবগঠিত সি পি অই (এম) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে তার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও সংসদীয় পথে তার আস্থার কথাও ঘোষণা করেছিল। ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি — উভয়ের থেকেই সমদূরত্ব বজায় রেখে নিজস্ব অবস্থান গ্রহণের কথা।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে সি পি আই (এম) এবং সি পি আই নামক দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরও এই দুই দলের মধ্যে আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়েছিল, প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল আবার সি পি আই (এম) ও সি পি আই - কে ঐক্যবদ্ধ করে পুরোনো অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে যাওয়ার। এই দুটি কমিউনিস্ট দল ছাড়াও তখনও কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি (সি ইউ সি) নামে একটি কমিটির অস্তিত্ব ছিল। যার সদস্য ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির

'ঐক্যপন্থী' ও 'ভাঙ্গনবিরোধী' সদস্যরা। এই কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি বা সি ইউ সি - র উদ্দেশ্যই ছিল আবার দুই কমিউনিস্ট দলকে ঐক্যবদ্ধ করে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে যাওয়ার, কারণ এই কমিটির সদস্যরা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র ঐক্যবদ্ধ থাকলেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি বা সি ইউ সি ১৯৬৪ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখন্ডিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই একটি দলিল প্রকাশ করেছিল।[৭] এই দলিলে এই কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটির তরফে উভয় কমিউনিস্ট দলেরই কিছু কিছু সমালোচনা করে উভয় দলকেই যাবতীয় বিরোধ সত্ত্বেও পুনর্বার ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিকেই পুনর্বার উজ্জীবিত করে তোলার জন্য আন্তরিক আবেদন জানানো হয়েছিল।[৮]

মোট ৩২ জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটির পক্ষে দলিল প্রকাশ করে ঐক্যের জন্য আন্তরিক আবেদন জানানো হয়েছিল। এই ৩২ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১১ জন ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য, ৪ জন ছিলেন নির্বাচিত জেলা কাউন্সিলের সম্পাদক এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সুপরিচিত নেতা ও বিভিন্ন গণ সংগঠনের নেতৃত্বে অবস্থিত। বীরেন রায় এবং খগেন রায়চৌধুরী ছিলেন এই কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক, মহম্মদ ইসমাইল, মনোরঞ্জন রায়, বীরেন রায়, খগেন রায়চৌধুরী, গোপাল আচার্য্য, হেমন্ত ঘোষাল, শামসুল হুদা, রণবীর দাশগুপ্ত, সুবোধ দাশগুপ্ত, অজিত রায়, গোবিন্ কাঁড়ার, চন্দ্র রায় প্রমুখ বহু সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতাই তখন ছিলেন এই কমিটির সদস্য, যাঁদের নামে আবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৯]

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি-র ১৯৬৪ সালের এই দলিলটি।[১০]

ঐক্যের জন্য আবেদন এবং ঐক্যে প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি ক্রমশঃই তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবলুপ্ত কমিউনিস্ট ইউনিট কমিটির সদস্যদের বেশ কয়েকজন যোগ দেন সি পি আই (এম)-এ, কয়েকজন যোগ দেন সি পি আই - তে, এবং কয়েকজন সি পি আই (এম) বা সি পি আই —উভয় দলের কোনটিতেই যোগ না দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখেন এবং কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর আজীবন গুরুত্ব দিয়ে যান, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বিভাজনের চল্লিশ বছর পরে, পরিবর্তিত এক বিশ্বে দাঁড়িয়ে, পেছন ফিরে তাকিয়ে, যে সমস্ত কারণগুলির ফলে এই বিভাজন

ঘটেছিল, তার অধিকাংশকেই যখন আজকের এই পরিবর্তিত, বিশ্বয়ানের রাহুগ্রাসে আক্রান্ত, মার্কিন সামাজ্র্যবাদের আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসীহুমকি ও প্রয়াসে সর্বদাই ত্রস্ত একদুনিয়ায় অপ্রাসঙ্গিক ও বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হিসাবেই উপলব্ধি হয়, তখন আরও, আরও বেশি করেই অনুভূত হয় ও প্রবল হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট ঐক্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

সূত্র-নির্দেশ

১। যে সমস্ত দলিলগুলির পাঠ থেকে এই অন্তঃপার্টি বিতর্ক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সেই বিভিন্ন দলিলসমূহ সংকলিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থদুটিতে ঃ

Mohit Sen (ed.), *Documents of the history of the communist Party of India,* Volume -VIII (1951-1956), People's Publishing House, New Delhi, October, 1977, PP. i-xii & 1-656; অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,* তৃতীয় খন্ড, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আগস্ট, ২০০৪ পৃপৃ: ১-৭৩৬।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও উক্ত দলিলগুলির কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

Gene D Ovenstreet and Marshall Windmiller, *Commission in India,* the Perennial Press, Bombay, 1960, PP. 309-31; রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪),* বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃপৃ: ১৭৫-৩৪৯স রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির* ইতিবৃত্ত, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃপৃ: ১৩৬-৭৭।

২। বিতর্কটির বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটিতে ঃ

Bipan Chandra, 'A Strategy in Crisis — Teh CPI Debate : 1955-56', in Bipan Chandra (ed.), *The Indian Left : Critical Affraisals,* Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, 1983, PP. 259-400.

এই প্রবন্ধটি ছাড়াও নিম্নলিখিত বইগুলিতে বিতর্কটির উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ Overstreet and Windmiller of Cit., PP. 317-31, রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪),* পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ: ২০৯-৩৪৯, অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,* তৃতীয় খন্ড, পূর্বোল্লেখিত, পৃপৃ: ৭০১-৩৬।

৩। এই প্রসঙ্গেই যে সমস্ত স্মৃতিচারণমূলক লেখা ও সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

বর্তমান প্রবন্ধটির লেখক কতৃক গৃহীত প্রয়াত সি পি আই (এম) নেতা বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ঃ ১২-০৮-১৯৮৯, রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-*

১৯৬৪), পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ: ৩১২-১৩, ৩২১, ৩২৩, ৩৬০; রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত পূর্বোল্লিখিত,* পৃপৃ: ১৬৫-৭২, গোবিন্ কাঁড়ার, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গনের পূর্ব মুহূর্তে দমদম কেন্দ্রীয় কারাগারের সেই দনগুলি', *কালান্তর,* শারদীয়, ১৯৭২।

৪। রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা* (১৯৪৮-১৯৬৪), পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ: ৩১২-১৩, ৩২১, ৩২৩, ৩৬০, রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত,* পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ: ১৬৫-৭২।

৫। লেখক কর্তৃক গৃহীত, বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার, ১২-৮-১৯৮৯।

৬। বিজয় মোদকের সাক্ষাৎকার ঃ ১২-০৮৮-১০৯৮।

৭। Statement of Aims and Objects of the Commusist Unity Committee, Calcutta, 1964, PP. 1-4.

৮। Ibid., PP. 1-3.

৯। Ibid., PP. 3-4.

১০। Ibid., PP. 1-4.

সারাংশ

সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারে ২৪ পরগণার মহিষ বাথান গ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক

সুধন্য কুমার মন্ডল

অধুনা সল্টলেকের ১৪ নং ওয়ার্ডভুক্ত একটি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ গ্রাম হল মহিষবাথান। কিন্তু এখনকার সল্টলেক পূর্বে ছিল বিদ্যাধরী ও শাখানদী দ্বারা গঠিত জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্বাপদ সংকুল দীপ অঞ্চল। ১৯৬২ খ্রিঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সেই বিস্তীর্ন ২০ বর্গমাইল জলাভূমির মাত্র ৩.৭৫ বর্গমাইল শহর সংলগ্ন এলাকা গঙ্গার পলি ও বালি সরাসরি পাইপ যোগে এনে ভরাট করার পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী কাজ শুরু করেন। কিন্তু পূর্বতন এই মহিষবাথান ও তৎসংলগ্ন গ্রাম যথা শিখরপুর, বাগু, চারিগ্রাম, মাটকোল, ঠাকুরদাড়ি, ভাঙ্গড়, দত্তাবাদ, গ্রামের বহু চাষী, জেলে, বাগ্‌দী, ধোপা, কুম্ভকার বৃত্তির পৌন্ড্র বর্গক্ষত্রীয়, রাজবংশী, পুঁড়ো সম্প্রদায়ের বহুমানুষকে নিয়ে মহিষবাথানের জমিদার সন্তান দেশপ্রেমিক জনদরদী লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে শুরু করেছিলেন ১৯২১ খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩১ খ্রিঃ আইন অমান্য আন্দোলন ও লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ১৯৩২ খ্রিঃ চৌকিদারী ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলন ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ আন্দোলন। এই সকল আন্দোলন পরিচালনার জন্য গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ ঘুরতে ঘুরতে তার চোখে পড়েছিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা একঘোরে, পণপ্রথা ও অকাল বৈবধ্যজনিত কঠোর বিধিনিষিধের প্রথা নামক বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক, পেশাচিক কুপ্রথা।

গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মীকান্ত বাবু মোড়ল নির্ভর সমাজের এই সকল রক্ষণশীল কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মোড়ল মাতব্বর নির্ভর গ্রামবাসীদের যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। প্রবল মোড়ল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সমাজের সমান্যতম দোষের দ্বারা একঘোরে করে রাখার প্রথাকে উচ্ছেদ করে সেই পরিবারকে সামাজিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেন। পণপ্রথার বিরুদ্ধেও তিনি গ্রামের মানুষদের এগিয়ে আশার আহ্বান জানান। তার জীবনের বিখ্যাত সংস্কার ছিল বৈধব্যজনিত কারণে বাল্যবিধবাদের পুনরায় বিয়ে দিয়ে তাদের সুস্থ সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা। বহু বিরোধিতা-স্বত্বেও নিজ উদ্যোগে নিজ ব্যায়ে নিজ বাড়ীতে নিজ আত্মীয়া বিধবা বীনা প্রামানিকের সঙ্গে মনোহর মাঝির বিবাহ দিয়ে দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেন। বহু বিধবা বিবাহ পরবর্তী কালে তার উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছিল। শিক্ষার জন্য তার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় (১৩৩২ খ্রিঃ) আজও উজ্জ্বল স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে।

ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা

বুলু মুখোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা এসেছে আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে, এখনো ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করে চলেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর ভূমিকা ও অবদান নিয়ে। তিনি আজ একই সঙ্গে জাতীয় বীর, এক কিংবদন্তীর নায়ক। তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের সময় আজ হয়ত এসেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে নেতাজী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক প্রথম সারির নেতা, এবং তিনিই প্রথম দাবি করেছেন পূর্ণস্বরাজ, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়। সেই দাবি পরের কংগ্রেস অধিবেশনে নেহরুর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নেতাজী উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, চরম আঘাত হানবার সময় আগত। ঐতিহসিক ভাবে নিষ্ক্রমণ করে দেশ থেকে সুভাষচন্দ্র চলে যান জার্মানিতে।

১৯৪২ সালের আগস্টে মহাত্মাগান্ধী যখন ভারতবাসীদের আহ্বান করেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে, তিনি প্রথমেই কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী দেননি। ১৯৪২ সালে ৩১ আগস্ট সুভাষচন্দ্র রেডিও বার্লিন থেকে যে বক্তৃতা দেন জাতীয় উদ্দেশ্যে, সেই বক্তৃতা ঐ আন্দোলনের কর্ম্মসূচী প্রচার করে তবে আগস্ট আন্দোলনের পরিচিত রূপদান করে।

১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র জাপান চলে যান সাবমেরিন করে, এবং সেখানে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করেন। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৩ ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজ যুদ্ধ ঘোষণা করে। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালে উত্তর পূর্ব ভারতে কোহিমায় পৌঁছায় এবং পরাধীন ভারতের বুকে উত্তোলন হয় স্বাধীন ভারতের পতাকা। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে আজাদ হিন্দ ফৌজও আত্মসমর্পণ করে। নেতাজী কিন্তু দমে যাননি, ১৯৪৫ সালে তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতায় তিনি ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি বিদ্রোহের ভবিষ্যদ্বাণী করে ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে তার সদ্ব্যবহার করতে বলেন।

লালকেল্লায় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচার চলাকালীন ভারতবাসীদের সহানুভূতি ছিল তাদের প্রতি, জাতীয় বীর হিসেবে। ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহ করেছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।

এই সৈন্য বিদ্রোহ ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেয় যে দেশশাসনের প্রধান স্তম্ভ, সৈন্যবল, দুর্বল হয়েছে, তাদের দিন ফুরিয়েছে। ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৪২ সালের গণআন্দোলন যা পারেনি, নেতাজী তাঁর আজাদহিন্দ ফৌজের মাধ্যমে তাই করে দেখিয়েছেন।

নদীয়া জেলার তাঁতশিল্পের উদ্ভব ও বিস্তৃতি

শুভাশীষ চক্রবর্তী

নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্বভাবতই মনে হয় যে, নদীয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ বিগ্রহের নিমিত্ত বা রাজনৈতিক সংকীর্ণ ক্ষেত্রের জন্য উদ্ভুত হয় নি, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল বিদ্যা এবং ধর্মে। জ্ঞানচর্চা ও ধর্মালোচনাই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। জ্ঞান নদীয়ার রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা এবং ধর্মই নদীয়ার প্রাণ[১]। 'নবদ্বীপ' থেকে নদীয়া নামের উৎপত্তি। ''নব'' মানে ''নয়''[(১)] অথবা নতুন, আর 'দ্বীপ' হল 'জলবেষ্টিত চর' বা 'প্রদীপ'। নদীয়ার 'ন' ওই ''নব'' অর্থেই। 'দীয়া' মানে দ্বীপ। বৈষ্ণব গ্রন্থাকার নরহরি লিখেছেন—

'নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়
নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।
নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম।'

নবদ্বীপ—ন অ দ্দী অ—নদী অ—নদীয়া। যে নয়টি দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ গড়ে ওঠে সেগুলি হল—অন্তদীপ, সীমন্তদীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মোদদ্রুপ দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ। নদীয়ার অবস্থান ২২° ৫৩´ ও ২৪° ১১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮·° ০৯´ ও ৮৮° ৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। জেলার আয়তন ৩৯২৭ বর্গ কিমি[২]।

বহু সংস্কৃতিবিশিষ্ট পূর্ব ভারতে নদীয়া ছিল প্রশাসনের অন্যতম কেন্দ্র। এছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে এই অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ প্রাচীন কাল থেকেই নদীয়ায় রেশমবস্ত্র উৎপাদিত হত। রাজনৈতিক ইতিহাসে বখ্‌তিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের গাথা সর্বজনবিদিত। বাংলার অর্থনীতিতে মধ্যযুগেও নদীয়া জেলার অবস্থান লক্ষ্যণীয়। প্রকৃত কৃষক সম্প্রদায়ের বসবাসের ফলেই জেলায় বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প গড়ে উঠেছিল। তাই অষ্টাদশ শতকে বাংলার সম্পদ ও সমৃদ্ধি শুধু কৃষিনির্ভর নয়, বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্প ও শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, লবণ, চিনি, কাগজ, লোহা, নীল, কোরা. কাঁসা, পেতল, কাঠ, হাতির দাঁতের কাজ প্রভৃতি[৩]। আঠারো শতকে বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে

বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রধান স্থানাধিকারী। উৎপাদনের পরিমাণ বিশাল হওয়া সত্ত্বেও মূলত এটি একটি কুটির শিল্প। বাংলার অর্থনীতিতে বস্ত্রশিল্পের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে — বিপুল পরিমাণ যে বস্ত্র উৎপাদন হত, তা জনগণের চাহিদা মিটিয়েও উদ্বৃত্ত হত। বিদেশে বাংলার বস্ত্রের চাহিদা এদেশে বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতির কারণ। বঙ্গদেশের 'মসলিন' বস্ত্র বাগদাদ, রোম, চীন, গ্রীস, ইতালী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হত। এভাবে এশিয়া ও ইউরোপে বাংলার বস্ত্রশিল্পের যে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তার পেছনে ছিল বঙ্গ দেশের কৃষক তন্তুবায়দেরই চিরস্মরণীয় অবদান[৪]। বস্ত্রশিল্পে ঢাকার মসলিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত।

বঙ্গ সংস্কৃতির মনন ও চর্চার অন্যতম অভিকেন্দ্র নদীয়ায় অবস্থিত শান্তিপুর জেলা, ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুপম উজ্জ্বল তাঁত শিল্পকর্মের জন্য ইতিহাসখ্যাত। অর্থশাস্ত্রে বাংলার বস্ত্রবয়ন শিল্পে পারদর্শিতার কথা উল্লেখ থাকলেও শান্তিপুরের মত জনপদের অস্তিত্ব ছিল কিনা — তার কোন পাথুরে প্রমাণ নেই[৫]। তবে এটুকু বলা যায়, চৈতন্য দেবের বহু আগেই শান্তিপুরে বয়ন শুরু হয়েছিল। তখনও শান্তিপুরের কাপড় 'শান্তিপুরী' হয়ে ওঠেনি। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'শান্তিপুর পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন — ''ঢাকার ধামরাই হইতে লক্ষ্মণ সেনের সময় প্রধানত তাঁহারই আগ্রহে বয়নক্ষম ও সূক্ষ্মতন্তু শিল্প নিপুণ কয়েক ঘর তন্তুবায় এবং তাহার সঙ্গে কয়েক ঘর হিন্দু দরজি বা ওস্তাগর শান্তিপুরে আসে, তৎপূর্বে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ মোটা সূতার বস্ত্র বয়ন করিত। উক্ত ওস্তাগরদিগের কার্য ছিল বস্ত্র রিপু করা, কাঁটা দিয়া ধৌত বস্ত্র সূত্র সমীকরণকরা ও কালি দ্বারা পাড় রঞ্জিত করা। ক্রমে ঢাকা অঞ্চল হইতে বহু তন্তুবায় শান্তিপুরে আসে। তন্মধ্যে কেহ কেহ ধর্মলাভের জন্যেও আসিত। এইসব তন্তুবায়গণ ভক্ত, কীর্তনীয়া ও গায়ক ছিল।''

শান্তিপুরবাসী যত তন্তুবায়গণ।
আইলা প্রভুর গৃহে করিতে কীর্তন[৬]।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই গল্প সাহিত্যে তাঁতীকে 'বোকা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ তুলা থেকে সুতো তৈরী করে, সেই সুতো থেকে কাপড় বুনে তন্তুবায় যে সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, তাতে বুদ্ধির কোথাও অভাব আছে বলে মনে হয় না। শান্তিপুরের একটি তন্তুবায় বংশ প্রকৃতই 'বোকা' নামে অভিহিত হয়। এই বংশের আদি পুরুষ শিবরায় শ্রীচৈতন্যের সময়ে ধামরাই (ঢাকা) থেকে সস্ত্রীক নবদ্বীপ আসলে মহাপ্রভু তাঁকে শান্তিপুরে গমন করিতে আদেশ করেন। তিনি অদ্বৈতাচার্যের নিকট গমন করেন। শান্তিপুরের শাক্ত ব্রাহ্মণরা সে সময় অদ্বৈতাচার্যের উপর জাত ক্রোধ থাকায় শিবরাম 'বোকা' আখ্যা লাভ করেন[৭]।

নদীয়ারাজ রুদ্রদেবের সময়েই নদীয়ায় তাঁত শিল্পের ধীরে ধীরে চরম বিকাশ, সমৃদ্ধি

ও উৎকর্ষ ঘটে[৮]। সূচনা পর্বে হস্তচালিত শিল্প হিসাবে এর জয়যাত্রা। বর্তমান শতাব্দীতেও তাই হস্তচালিত তাঁতশিল্প তন্তুবায়দের পারিবারিক পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এবং কারুশিল্প গৌরবময়।

মুঘল আমলেই প্রথম নদীয়ার বিশেষত শান্তিপুরের উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম তাঁত বস্ত্র বহির্বঙ্গে ও বহির্ভারিতে বাজার সৃষ্টি করে। মুঘল রাষ্ট্র বস্ত্র বয়ন শিল্পে উৎসাহ দিলেও সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিত কিনা, তার সঠিক প্রমাণ নেই[৯]। তবে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত কৃষকের রাজস্বের পরিমাণ ছিল কম।

বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতি পোষক নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে (১৭২৮-৮২) শান্তিপুরে তাঁত বস্ত্রের বিরাট আড়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সময়ে রাণাঘাটের মল্লিক বংশীয় কতিপয় উদ্যমশালী যুবক ঢাকা, শান্তিপুর থেকে সূক্ষ্ম মসলিন সংগ্রহ করে ইউরোপে রপ্তানী করতে থাকেন[১০]। শান্তিপুরের মিহি ধুতি ও নক্‌সা পাড় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে জগতবিখ্যাত হয় এবং বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে দেশ-বিদেশে রপ্তানী হতে থাকে। এভাবে অষ্টাদশ শতকে বাংলার অর্থনীতিতে নদীয়া তাঁত শিল্পে বিশেষ জায়গা করে নেয়। তবে কাঁচামাল, পণ্য পরিবহণ এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সমর্থনের দিক থেকে অবশ্য ঢাকা নদীয়ার তুলনায় এগিয়ে যায়[১১]। তবুও শান্তিপুরের তন্তুবায়দের মলমল উৎপাদনও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতায় তন্তুবায়রা এই বিস্ময়কর বস্ত্রশিল্পকর্ম নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতায় তারা উৎপাদন করতেন।

অন্যদিকে বাংলায় ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অনুপ্রবেশ করেছিল এখানকার বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির প্রতি আকর্ষিত হয়েই। দেশীয় বাণিজ্য বিদেশীদের লভ্যে পরিণত হয়। এ বিষয়ে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হয়েছিল — "বাণিজ্যের নাম লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরণী আরোহণে বিদেশীবাসিনী হইতেছেন। এ দেশের লোক নিতান্তই দীন বেশে দাসত্বের শরণ হইয়াছে। .... এই দশ বছরের মধ্যে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে"[১২]। বাণিজ্যিক আধিপত্যকে সক্রিয় রাখতে পলাশী, বক্‌সারের যুদ্ধ এবং দেওয়ানী লাভ ইত্যাদির দ্বারা ইংরেজরা বাংলায় তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে। রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলার জনজীবনে নেমে আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। উল্লেখ্য যে, ইংরেজ-সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর আঘাতে বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ঢাকা ও নদীয়ার নিপুণতম কাটুনি ও তন্তুবায় এবং তুলাচাষীদের অধিকাংশ অনাহারে মৃত্যু বরণ করে, না হয় প্রাণ রক্ষার জন্যে জীবিকা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগ দেয়[১৩]।

ইংরেজরা নবলব্ধ রাজ্যের রাজস্ব ও তদ্‌সংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং এই উদ্দেশ্যে বরং বঙ্গদেশকে নানাভাগে বিভক্ত করে জমিদারদের সাথে নতুন মেয়াদী বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। এই সময়ে সুযোগ পেয়ে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে নতুন প্রথানুযায়ী বন্দোবস্ত করেন। রাজা শিবচন্দ্রের সময় (১৭৮২-৮৮) ইংরেজ কোম্পানীর তদানীন্তন কর্মচারী জন শোর নদীয়া রাজের হাত থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কেড়ে নেন। শিবচন্দ্র হেস্টিংসের কাছে রাজস্ব আদায়ের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের আবেদন করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নদীয়ারাজের কর্মচারী কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের প্রমাণ ঐ বছরের ২৩শে জুন তারিখে মিঃ ম্যাকডাইয়েল সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম নদীয়াতে 'জেলা কালেক্‌টর' পদ চালু করে[১৪]।

কর্ণওয়ালিশ বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকাজের উন্নতি বিধানের জন্য যে 'দশশালা' বন্দোবস্ত চালু করেন, তার ৩০ বছর পূর্ব পর্যন্ত নদীয়া জেলার রাজস্বের অধিকার ছিল মহারাজের। কিন্তু জেলার তালুকদারদের সাথে পৃথক বন্দোবস্ত করে ইংরেজরা নদীয়ারাজের ক্ষমতা খর্ব করে[১৫]। বহু পূর্ব থেকেই নদীয়া বস্ত্র উৎপাদনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। নদীয়ায় রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের পিছনেও ছিল জেলার বস্ত্র শিল্পের উপর অধিকার লাভ। অর্থাৎ তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বস্ত্র শিল্পভিত্তিক নদীয়ার অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন।

এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে, ইংরেজ কোম্পানী বাংলা তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, এ দেশ থেকে পাট, তুলা জাতীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজেদের দেশের কারখানায় পাঠিয়ে, সেখানকার উৎপাদিত দ্রব্যাদি পুনরায় এদেশে এনে বিক্রি করা হয়। এ বিষয়ে ''সংবাদ প্রভাকর'' পত্রিকায় লেখা হয় — 'ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেস্টার আমারদিগের তুলা ও পাট লইয়া মনোহর নয়নরঞ্জন বস্ত্র দেন, অতএব তারা বঙ্গের অবসন্ন তাঁতীদের অন্ন মারিবার অভিপ্রায়ে কতগুলি কোরাবস্ত্রের মাশুল উঠাইয়া লইয়াছেন। বিলাতী তাঁতীরা এদেশে ডিউটি ফ্রি পাঠাইতেছে...'[১৬]।

আলোচ্য সময়ে নদীয়ায় বিলাতী কাপড়ের আমদানী না হলেও এই বিষয়টি ইংলন্ডীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কিভাবে ভারতের মত সূক্ষ্ম-বস্ত্র কেন্দ্র প্রস্তুত করা যায়, যে বিষয়েও আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়ে যায়। রাজস্ব সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম ও প্রশাসনিক দিকগুলি তদারক করতে একজন কমারসিয়াল রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হলেও নদীয়ার শান্তিপুরে তাঁতবস্ত্রের উপরে দৃষ্টি দেওয়া হতে থাকে[১৭]।

পলাশী পরবর্তীকালে বাংলার তন্তুজ পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

তাঁতীর আয়ও বৃদ্ধি পায়। এ যুগে একজন কুশলী তাঁতী মাসে তিন টাকা, একজন মাঝারি ধরনের তাঁতী পাঁচ টাকা এবং একজন দক্ষ তাঁতী সাড়ে সাত টাকা পর্যন্ত রোজগার করত[১৮]। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তও নদীয়ার বিশেষত শান্তিপুরের তন্তুবায়রা স্বাধীনভাবে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারলেও তারপর থেকেই তাদের উপর উৎপীড়ন শুরু হয়[১৯]। এই উৎপীড়নের পেছনে ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক দাপটের চাপ। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে একদল ব্যবসায়ী কারিগরকে দাদন বা অগ্রীম দিয়ে তাদের উৎপন্ন বস্ত্র হস্তগত করত এবং তা শহরাঞ্চলে নিয়ে বিক্রয় করত। এই 'দাদনি' ব্যবসায়ীগণের হস্তে তন্তুবায়দিগকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হত বলে নবাবের আদেশে এই দাদন প্রথা রদ করা হয়েছিল। নবাব এই দেশীয় 'দাদনি' ব্যবসায়ের অবসান ঘটাতে পারলেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দাদন প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি[২০]।

ইংরেজ বণিকরা নতুনভাবে দাদন প্রথার প্রবর্তন করে দেশীয় বণিকদের স্থান গ্রহণ করেছিল। ইংরেজ বণিকদের দ্বারা সৃষ্ট বেনিয়ান ও গোমস্তদের এভাবে আর্বিভাব ঘাট। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বস্ত্র কারিগরদের উপর গোমস্তাদের উৎপীড়ন ভয়ঙ্কর আকারে শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানীর জয়লাভের পর থেকে এই বণিক গোষ্ঠী ও তাদের নিযুক্ত গোমস্তাদের উৎপীড়ন চরম আকার নেয়। তারা কারিগরদেরকে দাদন দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্ত্রের জন্য চুক্তি করত এবং বস্ত্র প্রস্তুত হলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে তাদের সমুদয় বস্ত্র জোর পূর্বক কিনে নিত[২১]। অগ্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মচারীরা বস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে তাঁতীদের বাজার দর থেকে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ কম দিত, রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করতে দেয়নি নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্যের স্বার্থে[২২]। এভাবে শুরু হল গোটা বঙ্গদেশের (ক্রমশ সমগ্র ভারতের) অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিদেশী ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের একচ্ছত্র প্রভূত্ব। আর বঙ্গ দেশের কৃষক তন্তুবায়গণের সৃষ্ট বস্ত্রশিল্প হল সেই একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের প্রথম ও সর্বপ্রথম শিকার। প্রত্যক্ষদর্শী উইলিয়াম বোল্টস্ ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা থেকে বঙ্গ দেশের বস্ত্র কারিগরগণের উপর সংঘটিত বর্বর উৎপীড়নের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়[২৩]। তাঁতীদের কাছ থেকে গোমস্তা, পাইকার, দালাল কর্তৃক আদায়ীকৃত কমিশনের অংশও কোম্পানীর কর্মচারীরা পেতেন। গুণগত দিক থেকে ভাল তাঁত কাপড়ের কম করে দিয়েও তাদেরকে ঠকানো হত। শান্তিপুরের তাঁতীরা এর প্রতিবাদ করায় তাদের নেতাদের বন্দী করে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়[২৪]।

এভাবে নদীয়ার শান্তিপুর ও তার পার্শ্ববর্তী তাঁত উৎপাদন প্রবন এলাকাগুলিতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে শান্তিপুরের বাইগাছিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় কোম্পানীর বাণিজ্যিক কুঠি এবং কোম্পানী এখানকার তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ে পুরোপুরি নিয়োজিত হয়। বছরে ১,২০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের শান্তিপুরী তাঁতবস্ত্র বিদেশে বিক্রিত হত। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংগঠিত নদীয়ার জনগণনা অনুযায়ী শান্তিপুরে তখন বস্ত্র বয়নকারীর সংখ্যা ছিল ১৩,৬৮০ জন ও পাট বয়নকারীর সংখ্যা ২৭৩ জন[২৫]। আর তাঁত বস্ত্রের বিশেষত্বের জন্য নদীয়া থেকে বস্ত্র ব্যাপকভাবে কলকাতায় রপ্তানীকৃত হত। এভাবে নদীয়ার আঞ্চলিক অর্থনীতিতে ইংরেজ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'বিনিয়োগের' ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁত বস্ত্রও বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল। অন্যান্য স্থানের মত নদীয়ার শান্তিপুরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইংরেজকৃত এই বিনিয়োগ দাদন বণিক ও গোমস্তাদের মাধ্যমে হয়েছিল। বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৬৮,৫০০ টাকা[২৬]। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোম্পানী পুরোপুরি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেও তা সম্ভব হয় নি মূলত দাদন বণিক এবং পরে তাদের পরিবর্তে গোমস্তাদের অত্যাচারের কারণে। আর এরই সূত্র ধরেই তাঁতীরা একাধিক প্রতিবাদ, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যা বাণিজ্যিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে কোম্পানীর চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। বলপূর্বক কম দাম দিয়ে নদীয়ার তাঁতবস্ত্র কোম্পানী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সংগ্রহ করত বলে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ও উল্লেখ করেছিল যে (১১ই নভেম্বর, ১৭৬৮) নদীয়ার তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এখন উৎসাহহীন[২৭]।

কোম্পানীর আমলে ইংরেজ ও এদেশীয় কর্মচারীদের সাথে শান্তিপুরের তন্তুবায়দের সম্পর্ক ছিল পুরোপুরি ধনবাদী শোষণ ও নির্মম, অত্যাচারমূলক। কোম্পানীর বিদ্রোহী কর্মচারী প্রত্যক্ষদর্শী উইলিয়াম বোল্টস-এর তথ্য অনুযায়ী কোম্পানীর কর্মচারীরা ডান হাতের আঙুল কেটে, বেত্রাঘাত করে, কারাগারে আটক রেখে জোর করে তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের মুচলেকা আদায় করত[২৮]। বাজার নির্দিষ্ট দর থেকে কম দামে মাল সরবরাহ করার জন্যে এবং কোম্পানী ভিন্ন তাঁতবস্ত্র না উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি পত্রে টিপ সই দিয়ে নিত। এভাবে নদীয়ার তন্তুবায় সমাজ কোম্পানীর ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কোম্পানীর শোষণের এই যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তাঁতীরা জানিয়ে দিতে শুরু করেছিল যে, তারা কোম্পানীর জন্যে আর উৎপাদন করবে না। শিঙা বাজিয়ে তারা প্রতিদিন একজায়গায় সমবেত হয়ে নিজেদের সমস্যা ও অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করত। এর মধ্যে দিয়ে তাদের অভূতপূর্ব ঐক্য ও সৌহার্দ্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[২৮ক] শান্তিপুরের তাঁত

শিল্পের অবনতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। অনুসন্ধানের পর কমিটি অবশ্য সুপারিশ করেছিল — তাঁতীদের দাদন গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, তাদের নগদ মূল্য দিতে হবে, এ দেশীয় ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র সম্ভারের জন্য কোম্পানীর সঙ্গে সরাসরি জামিনসহ চুক্তি করতে পারবে প্রভৃতি[২৯]। তবে কোম্পানীর সুপারিশগুলির আংশিক অনুসরণ করে ভেঙে পড়া অচলায়তনে কোনো রকমে জোড়াতালি পড়ে। তবুও ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিদেশের বাজারে শান্তিপুরের তাঁত বস্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরের নিকটস্থ স্থানসমূহে অবস্থিত ইংরেজদের কয়েকটি নীলের কুঠির বিবরণ পাওয়া যায়। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ মতিবাবু জনৈক অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং প্রজাবর্গকে অন্যান্য নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন[৩০]। অন্যদিকে শান্তিপুরের ইংরেজ কুঠিতে একাধিক ইংরেজ কর্মচারী সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক দেশীয় কর্মী ছিল। এই দেশীয় কর্মীরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে শান্তিপুরের অর্থনীতিতে নতুন বিত্তবান শ্রেণীর আগমন ঘটে। এই কুঠির মাধ্যমে কোম্পানী প্রচুর বিনিয়োগও করেছিল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যের বস্ত্র আমদানি হওয়ায়, শান্তিপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের গুরুতর ক্ষতি হয়। দেশীয় সুতোর ব্যবহারও প্রায় একপ্রকার বন্ধই হয়ে যায়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে "সমাচার দর্পণে" শান্তিপুরের এক 'দুঃখিনী সুতা কাটনী'-র এ বিষয়ে আক্ষেপের কথা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মর্মবস্তু হল — "স্বামীর মৃত্যুর পর দুঃখিনী আস্নাও চরকায় সুতো কেটে পরিবারকে বাঁচান — এমনকি তিন কন্যার বিবাহও দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ সুতোর দাম পড়ে যায়। বিলাতী সুতোর আমদানী এর কারণ এবং তার দাম ৩/৪ টাকা সের। দুঃখিনী আক্ষেপ করে বলেছে — 'বিলাতে আমাদের থেকেও কাঙালিনী আছে....।" কিন্তু দুঃখিনী কল্পনাও করতে পারে নি যে, বিলাতের সুতো চরকায় কাটা নয়, বাষ্পচালিত কলে প্রস্তুত[৩১]। শান্তিপুরের বাণিজ্যকুঠির মাধ্যমে এই বিলাতী সুতো শান্তিপুরেও আমদানী হতে থাকে। তবে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আইনানুগভাবে ভারতে কোম্পানীর ব্যবসা রদ হলে বাণিজ্য কুঠিও শান্তিপুরে বন্ধ হয়ে যায়।

উনিশ শতকে বাংলার অর্থনীতির অংশ হিসাবে জেলাতেও সাধারণভাবে দুরকম পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপাদিত হত — কুটির ব্যবস্থা (domestic system of production) এবং ফ্যাক্টরী ব্যবস্থা (factory system of production)[৩২]। কোম্পানীর বিদেশী বণিক ও দেশীয় বণিকরা নিজেদের কারখানায় শ্রমিক নিযুক্ত রেখে উৎপাদন করত। বণিকদের কাছ থেকে আগাম নিয়ে তাঁতীরা নিজেদের বাড়িতে পরিবারের সকলকে

নিয়ে উৎপাদন করত। বঙ্গদেশে উৎপাদিত বস্ত্রশিল্পের তুলা এ রাজ্যে উৎপাদিত হত না। বেশীর ভাগ তুলা আসত সুরাট, উত্তর ভারতের দোয়াব অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য ও বেরার থেকে[৩৩]।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ার পাশাপাশি ইউরোপে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের কারণেও পাশ্চাত্যের বাজারে বাংলার বস্ত্রশিল্পের চাহিদাও কমে আসে। অবশিল্পায়ন বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, কিভাবে ইংলন্ডের বস্ত্র ভারতীয় বাজার দখল করেছিল। ১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ড থেকে বাংলায় ৯৯,৮০০ টাকার কাপড় আমদানী করা হয়। ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই আমদানীর পরিমাণ বেড়ে হয় — ৬৬,৭৭,২৭৯ টাকা। ১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে ৩৪,২৯,০৪৩ টাকা মূল্যের সুতী বস্ত্র রপ্তানী করা হয়েছিল। ১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে তার পরিমাণ কমে দাঁড়ায় মাত্র ১,৬৪,৪০৮ টাকায়[৩৪]। এই পরিমাণ কমার অর্থ ইউরোপের বাজার থেকে বাংলার সুতী বস্ত্রের ক্রমিক প্রস্থান। ইংলন্ডের বাজারে যাতে ভারতীয় সূতীবস্ত্র প্রবেশাধিকার না পায়, তার জন্য চড়া হারে আমদানী শুল্ক চাপানো হয়েছিল। এভাবে ব্রিটেনজাত বস্ত্রাদি বাজার ছেয়ে ফেলায় এ দেশীয় বস্ত্র উৎপাদকরা জীবিকাচ্যুত হতে বসে। বয়ন শিল্পের পতনে কোম্পানীর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কাটোয়া, মেদিনীপুরের মত শান্তিপুরের ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত কর্মীরাও জীবিকাচ্যুত হয়। তাই ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবজনিত কারণে ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপাদিত বস্ত্র ও সুতো শান্তিপুরের তাঁত বস্ত্র শিল্পের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথায়—'শান্তিপুরের তন্তুসকল ম্যাঞ্চেস্টারের দলের আগুনে নির্বাণ লাভ'। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংলন্ড জাত সুতো শান্তিপুরে আমদানী হতে থাকায় দেশীয় সুতোর ব্যবহার বন্ধ হয়। এর অনিবার্য পরিণতি হল চরকায় সুতো কাটায় ব্যস্ত মহিলাদের জীবিকাচ্যুতি। এভাবে গোটা উনিশ শতক ধরে জেলা অর্থনীতির মেরুদন্ড বয়ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে—জেলা অর্থনীতির অবক্ষয় শুরু হয়। বহু লোকই বস্ত্র উৎপাদন ত্যাগ করে বাণিজ্য ও কৃষি উৎপাদনের সাথে ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হয়। ম্যালেরিয়া ও ভয়াবহ বন্যার কারণেও ১৮৮০-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ — সময়পর্বে শান্তিপুরের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। বহু তাঁতীই স্থান ত্যাগ করে কলকাতা ও অন্যত্র চলে যায়[৩৫]।

বিংশ শতকের প্রথম দুদশক ছিল বাংলাদেশের শিল্প জগতে স্বদেশী যুগ। এই সময়ে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন ও পুনরুজ্জীবনে যে বহুমুখী প্রচেষ্টা শুরু হয়, তার মধ্যে নদীয়া জেলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদেশী নির্ভরতার পরিবর্তে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য দেখা দেয় নতুন উদ্যম। আর রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে আগ্রহ ও উদ্দীপনার অভাবও ছিল না। তবে উনিশ শতকের শেষ দশকে স্বদেশী যুগের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অবশ্য

অস্পষ্টভাবে আড়ষ্ট হতে শুরু করে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ই. ডব্লিউ. কলিন (E.W.Collin) বাংলার শিল্পকর্মের উপর যে সমীক্ষা করেছিলেন—তার বিবরণ অনুযায়ী ম্যাঞ্চেস্টার থেকে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র আমদানী করার জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী বয়ন শিল্প (যার মধ্যে শান্তিপুরও অন্তর্ভুক্ত) ধ্বংস হয়ে যায়[৩৫ক]। উল্লেখ্য যে, স্বদেশীর সময়ে শান্তিপুরের প্রায় ১,২০০ টি তাঁত চলত এবং তাতে ৫০ থেকে ৬০ কাউন্ট সুতো ব্যবহৃত হত। এখানে গড়ে প্রতি বছর ৮৬,৪০০ টি বস্ত্র উৎপন্ন হত এবং তার গড় মূল্য হল ৬০৪,৮০০ টাকা মত[৩৬]। তবে এই মূল্যের অর্ধেক অবশ্য তাঁতীরা পারিশ্রমিক হিসাবে পেত। আবার বিলাতী সুতোতে শান্তিপুরে কোথাও কোথাও শাড়ী ধুতি তৈরী হত। তবে সেগুলি কংগ্রেস বর্জনের ডাক দিয়েছিল। স্বদেশী যুগে আবার এ দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় "বাংলার তাঁতী, জোলা সম্প্রদায় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে। এই উৎপাদিত বয়ন পণ্যাদির সাহায্যে অবশ্য স্থানীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও রপ্তানীকৃত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে বয়ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রেসিডেন্সি বিভাগে উৎকৃষ্ট শান্তিপুরী ধুতি ও শাড়ীর চাহিদা সৃষ্ট হয়[৩৭]।

বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে কুটির শিল্প উৎপাদনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই সূত্র ধরে নদীয়া জেলায় বস্ত্র বয়নের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁতে বোনা কাপড়ের চাহিদাও বেড়ে যায়। শান্তিপুর ও তার পার্শ্ববর্তী ফুলিয়াতে বয়ন শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময়ে শান্তিপুরের তাঁত বস্ত্রের মূল উপাদান ছিল সূক্ষ্ম সুতো। এই সূক্ষ্মসুতো 'বিদেশ থেকে আমদানী করা'—এই ধুয়ো তুলে এক সময় বয়কটেরও আহ্বান জানানো হয়। তবে শান্তিপুরের তাঁতীরা সভা সমিতি করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বুনিয়াদী শিক্ষা পাঠক্রমে চরকার ব্যবহার যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। তাই নদীয়াতেও চরকার ব্যবহার শুরু হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সময়ে তন্তুবায় সমাজও ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের জীবনের উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে সামিল হয়েছিল। ইংরেজদের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ভারত বিভাজন এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তারা একদিকে আশাহত হলেও 'স্বাধীনতা' প্রাপ্তির জোয়ারে নতুন আশা উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষপর্বে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে যুগান্তকারী কোনও পরিবর্তন আসেনি। ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে তা আশা করাও যায় না। বস্ত্র বয়ন শিল্পের অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয়দের দখলে। পরিচালন ও মালিকানা ইউরোপীয়দের হাতে থাকায় মুনাফাও তারা একচেটিয়া ভোগ করত। অথচ এই মুনাফা থেকে নতুন কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত ব্রিটিশ সরকার

এদেশের জতীয়তাবাদীদের খুশি করার জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন' (১৯১৬-১৮), ফিসক্যাল কমিশন (১৯২১-২২) ও ট্যারিফ বোর্ড (১৯২৩-৩১) স্থাপন করে এদেশের শিল্পে উৎসাহ দানের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন[৩৮]। বস্ত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দেওয়া হলেও 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স'—এর চাপে যে সুবিধার অনেকটাই নসাৎ হয়ে যায়।

সূত্র-নির্দেশ

১। কুমুদনাথ মল্লিক (মোহিত রায় সম্পাদিত), *নদীয়া কাহিনী*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ কলকাতা, পৃ-১

২। সঞ্জিত দত্ত ও গৌতম ধনী, *কৃষ্ণনগর সহায়িকা ও একনজরে নদীয়া*, জানুয়ারী, ১৯৯৯, কৃষ্ণনগর, পৃ-৫

৩। সুবোধ মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস* (অষ্টাদশ শতাব্দী), ১৯৮৫, কলকাতা পৃ-৬৮

৪। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* ১৯৬৬, পৃ-৬৭

৫। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ-পৃ-৩৬১

৬। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *শান্তিপুর পরিচয়*, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, শান্তিপুর, পৃ-২১৩

৭। ঐ, পৃ-২১২-১৩

৮। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৬১-৬২

৯। Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal*, 1977-8 Calcutta, P-5.

১০। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ-১৯৭

১১। Debendra Bijoy Mitra, Ibid, P-155.

১২। বিনয় ঘোষ, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ১-৫ খন্ড, কলিকাতা, ১৯৬৮-১৯৮০. প্রথম খন্ড, পৃ-৮১-৮২

১৩। সুপ্রকাশ রায়, ঐ, পৃ-৭১

১৪। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৫-৩৬

১৫। ঐ, পৃ-৩৯

১৬। বিনয় ঘোষ, ঐ, পৃ-৪২

১৭। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৯

১৮। N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol-I, 1967, Calcutta, P-184.

১৯। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৬২

২০। সুপ্রকাশ রায়, ঐ, পৃ-৬৯

২১। ঐ, পৃ-৭২

২২। সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ-৭২

২৩। সুপ্রকাশ রায়, ঐ, পৃ-৬৯

২৪। সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ-৭২-৭৩
২৫। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৬২
২৬। Debendra Bijoy Mitra, *Ibid*, P-132.
২৭। *Ibid*, P-132-33.
২৮। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ-১৯৯
২৮ক। নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা,* জুলাই ১৯৮৬ (পঞ্চম প্রকাশ), কলিকাতা, পৃঃ৩৬
২৯। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৬৩
৩০। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ-২০৩
৩১। মোহিত রায়, নদীয়া উনিশ শতক, এক আষাঢ়, ১৩৯৫, কলিকাতা, পৃ-৯২-৯৪
৩২। H. R. Ghosal, *The Economic Transition in the Bengal Presidency,* 1966, Calcutta, P-1-5.
৩৩। সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ঐ, উনবিংশ শতাব্দী, পৃ:-৭০
৩৪। সমরকুমার মল্লিক, *আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর,* ১৯৯২ কলিকাতা, পৃ-৩৬৪
৩৫। কুমুদনাথ মল্লিক, ঐ, পৃ-৩৬৩-৬৪
৩৫ক। সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ঐ, বিংশ শতাব্দী, ১১৭-১৮
৩৬। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ:-২০৬
৩৭। সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ-১৯৯১, কলিকাতা, ১১৭-১৮
৩৮। ঐ — ১৯৯১, কলিকাতা, পৃ-১৩৫

উপনিবেশিক উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে পাটের ভূমিকা ঃ একটি সমীক্ষা

সুজিত ঘোষ

কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে ভারতের অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপনিবেশিক যুগ থেকে পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে বিবেচিত ছিল এবং প্রাক্ দেশ বিভাগের পর্বে প্রধানত উত্তর ও পূর্ব বাংলা এবং আংশিকভাবে বিহার ও আসামের অর্থনীতিতে পাট ছিল একটি মুখ্য কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য। জর্জ ব্লাইন বলেছেন অখণ্ডবঙ্গের প্রধান non-foodgrain crop-এর অর্দ্ধেকটাই হচ্ছে পাট।[১] উপনিবেশিক যুগ থেকেই উত্তরবঙ্গে পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে বিবেচিত ছিল এবং এখনও কাঁচাপাট উৎপাদনে একটা বড় অংশই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। উপনিবেশিক শাসনকালে বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে পাট আবাদ ও বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখানে উত্তরবঙ্গের পাট আবাদ ও বাণিজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো এবং আলোচনার পরিসীমাটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলি যা সর্বাধিক উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় কখনো কখনো প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গও এসে পড়তে পারে।

উত্তরবঙ্গের Agro-climate অবস্থার জন্য এখানকার এক একটি অঞ্চলে এক একটি বিশেষ কৃষি পণ্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যেমন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের তামাক, জলপাইগুড়িব তামাক ও চা, দার্জিলিং -এর চা ও কমলালেবু, দিনাজপুরের ধান এবং মালদহের আম অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে কৃষিপণ্য হিসাবে পাট উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই পরিচিত ছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে জলপাইগুড়ি, দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে বেশি পাট আবাদ হত, এছাড়া অখণ্ডবঙ্গের দিনাজপুর ও রংপুরে ব্যাপক পাটের আবাদ হত।[২] তবে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক পাট উৎপাদিত হলেও প্রথম থেকেই তা কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে প্রসার লাভ করে নি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গে পাট গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে পরিচিত হওয়ার পূর্বে কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে তামাকের

একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। হান্টার সাহেব ও গ্রুনিং সাহেবের বিবরণে তামাক আবাদ ও বাণিজ্যে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] এ ছাড়া মার্শে ও চোভেট কোচবিহারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন (১৭৭৮) সেখানে রপ্তানী পণ্য হিসাবে ধান, চাল ও তামাকের কথা উল্লেখ থাকলেও পাটের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বৃহত্তর উত্তরবঙ্গে উনিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে পাট আবাদের ব্যাপক আভাস মেলে।[৪] সুতরাং এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত পাট উত্তরবঙ্গে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে পরিচিত ছিল না এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকেই উত্তরবঙ্গে পাট কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ইউরোপে প্রিমিয়ার যুদ্ধ, বার্লিন সন্ধি এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গে এই সময় পাট রপ্তানী ও উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কাঁচাপাট রপ্তানী উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল।[৫] পাটের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াতে অর্থকরী ফসল হিসাবে উত্তরবঙ্গে পাটের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল এবং পাটের ব্যবসাও বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছিল।

সাধারণভাবে রেলপরিবহনের সূত্র ধরেই কৃষিপণ্য বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটেছিল বলে অর্থনীতিবিদদের অভিমত। এ অঞ্চলেও রেলপরিবহনের সূত্র ধরে পাট বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হওয়ার (১৮৫৩খ্রিঃ) পরবর্তী দুই দশকের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে রেলপরিবহন ব্যবস্থা চালু হয় দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের হলদিবাড়িতে (১৮৭৬খ্রিঃ)।[৬] রেলপরিবহনের. মাধ্যমে হলদিবাড়ি থেকে কলকাতায় ব্যাপক পাট চালান হতে থাকে। ১৯১৫ খ্রিঃ পদ্মার উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ উন্মুক্ত হলে কলকাতার সাথে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হয়।[৭] পাট রপ্তানীও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭৮ সালে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে North Bengal State Railways মিটার গেজ রেলপথ নির্মাণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে North Bengal States Railways শিলিগুড়ি - কিশানগঞ্জ পথ উন্মুক্ত হলে এই পথের মাধ্যমে শিলিগুড়ি-মাটিগাড়া-নক্সালবাড়ি-গলগলিয়া-আলুয়াবাড়ি-কিশানগঞ্জ রেলপথ মারফৎ ব্যাপক পাট পরিবাহিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে মাটিগাড়া, গলগলিয়া ও আলুয়াবাড়ি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পাট গুদাম কেন্দ্র।[৮] ১৯২৬ সালে কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রেলপথ মিটার গেজ সরিয়ে ব্রডগেজ লাইন বসান হলে উত্তরবঙ্গে পাট বাণিজ্যে জোয়ার আসে। অবিভক্ত দিনাজপুরে ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে রেলপরিষেবার আওতায় এসেছিল। বিহার

Section-এর অন্তর্গত পূর্ব থেকে পশ্চিমে পার্বতীপুর, ছিরির বান্দার, কাওগাঁও, দিনাজপুর, বিরোল, রাধিকাপুর, কালিয়াগঞ্জ বঙ্গালবাড়ি হয়ে রায়গঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পার্বতীপুর থেকে রেলের Eastern Bengal শাখার মাধ্যমে দিনাজপুরের পাট কলকাতায় চালান যেত। সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে উপনিবেশিক শাসনকালে বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে রেলপরিবহনের সূত্র ধরে পাট কৃষি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এবার উত্তরবঙ্গের বিশেষ পাট উৎপাদন অঞ্চল ও পাটের ব্যবসা প্রসঙ্গে আসা যাক। উপনিবেশিক উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি, দেশীয়রাজ্য কোচবিহার এবং অবিভক্ত দিনাজপুরে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে অবিভক্ত দিনাজপুরে পাটের ব্যবসা বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য হিসাবে পাটের গুরুত্বও বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়কালে অখন্ড দিনাজপুরে গড়ে ৯২ হাজার একক জমিতে পাট চাষ হত। দিনাজপুরের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পাট উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে রায়গঞ্জ থানা ছিল একটি অন্যতম পাট উৎপাদক অঞ্চল।[৯] বর্তমান উত্তরদিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ শহরের রাসবিহারী মার্কেটের নিকট ইউরোপীয় কোম্পানী রেলি ব্রাদার্সের একটি Jute Press Factory ও গুদাম ছিল, এখানে কাঁচা পাটের সাড়ে তিন মনের পাটের বেল তৈরী হত। দিনাজপুরের (Revenue Surveyar Major Sherwill) এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দিনাজপুরের পাট ব্যাপকহারে রপ্তানী শুরু হয়।[১০] সমগ্র দিনাজপুর থেকে পাট পার্বতীপুর হয়ে রেলযোগে কলকাতা বন্দরের মারফৎ বিদেশে রপ্তানী হত।[১১] পাটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং পাট চাষ লাভজনক হওয়াতে অর্থকরী ফসল হিসাবে উপনিরেশিক শাসনকালে জলপাইগুড়িতেও পাটের দ্রুত আবাদ বৃদ্ধি ঘটেছিল, ফলে সাধারণ চাষীর প্রধান খাদ্যশষ্য ধান উৎপাদনের চেয়ে পাটের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল। ১৯০১-০২ সাল থেকে ১৯০৭-০৮ সালে পশ্চিম ডুয়ার্সে ধানের জমি প্রায় ৭ হাজার একর কমে গিয়েছিল।[১২] বিংশ শতকের তিরিশের দশকেও জলপাইগুড়িতে ৪২ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হত।[১৩] জলপাইগুড়ি শহরে গড়ে উঠেছিল একাধিক ইউরোপীয় ও দেশীয় ফার্ম যারা জলপাইগুড়ির পাট ব্যবসার মুখ্য নিয়ন্ত্রক ছিল। এখনও জলপাইগুড়ি শহরে বহু ইউরোপীয় ও দেশীয় জুট ফার্মের চিহ্ন বর্তমান।[১৪] তবে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ছিল বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটি বিশিষ্ট পাট উৎপাদক অঞ্চল, কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনারের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকের সত্তর এর দশক থেকে এ অঞ্চলে পাটের ব্যবসা পূর্ববর্তী বৎসর গুলোর থেকে দ্বিগুণ হয়েছিল, সে সময় কোচবিহার রাজ্যের হলদিবাড়ি ছিল মুখ্যত পাট ব্যবসা কেন্দ্র,[১৫] উত্তরবঙ্গের পাট বাণিজ্যে গ্রুনিং সাহেবের বিবরণেও হলদিবাড়ির গুরুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি

বলেছেন কোচবিহার জেলায় তিস্তার পশ্চিমাংশ থেকে ব্যাপক পাট Eastern Bengal রেলপথের মাধ্যমে পরিবাহিত হত এবং হলদিবাড়ি ছিল একটি মুখ্য পাট বাণিজ্য কেন্দ্র।[১৬] হলদিবাড়ির দীর্ঘ স্বর্ণাভ আঁশের পাট স্বদেশে ও বিদেশের বাজারে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোষের গাড়ি ও গোরুর গাড়ি করে পাট হলদিবাড়িতে আসত এবং এখানে গুদামজাত হয়ে রেলের মাধ্যমে কলকাতা বন্দর হয়ে স্কটল্যান্ডে চালান যেত। বিংশ শতকের তিরিশের দশকে হলদিবাড়ি থেকে প্রতিদিন ৬০টি Jute Wagon নিয়ে Jute special কলকাতায় যেত।[১৭]

হুগলী নদীর তীরে পাটকলগুলি গড়ে উঠলে এবং ইউরোপে সরাসরি পাটের বেইল চালান শুরু হলে হলদিবাড়িতে পাটের ক্রেতাদের তৎপরতা শুরু হয়। ফলে হলদিবাড়িতে পাটের এক ঝাঁক বিনিয়োগকারীকে টেনে আনে। রেল পরিবহন পাট ব্যবসাকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে এসেছিল। ১৮৭৬-এ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রথম হলদিবাড়িতে উপস্থিত হন।[১৮] হলদিবাড়িতে প্রথম যে ইউরোপীয় জুট ফার্মটি খুলেছিল তা হল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জুট মিল এন্ড কোং, বিদেশীদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এসে হলদিবাড়িতে পাটের কারবার খুলতে থাকে। তবে এ কথা উল্লেখ্য যে কোচবিহার রাজ্যে ভিন্ন প্রদেশীয় মানুষের অভিবাসন পাট ব্যবসা প্রসারিত হওয়ার বহু পূর্বেই ঘটেছিল। হান্টার সাহেব জানিয়েছেন সে কোচবিহারের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যই বহিরাগত মুলত মাড়োয়ারী, যোধপুরী, এবং বিকানিরের ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হত।[১৯] হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর রচনায় উত্তরবঙ্গে ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ীদের আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০] সুতরাং, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে পাট আবাদ স্থানীয় অধিবাসীরা করলেও এ অঞ্চলের পাট বাণিজ্যটা ইউরোপীয় ও ভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা ছিল।

এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত উপনিবেশিক উত্তরবঙ্গে পাট আবাদ ও বাণিজ্যে যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সময়কালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে বহু ইউরোপীয় জুটফার্ম গড়ে উঠেছিল এবং কিছু কিছু ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ীদের জুটফার্মও গড়ে উঠেছিল। ১৯১৬-র মধ্যে হলদিবাড়িতে ৮টি ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ১৪টি মাড়োয়ারী ও বাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পাট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা যায়।[২১] ১৯২০ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে হলদিবাড়িতে ৭টি ইউরোপীয়, ৪টি বাঙালী এবং ৫টি বহিরাগত ভিন্নপ্রদেশীয় মালিকানাধীন জুটফার্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত The Cooch Behar "Desk Gazettear"-এ মেখলিগঞ্জ মহকুমায় মোট ২৮টি জুটফার্মের উল্লেখ পাওয়া যায় যার

মধ্যে ৩টি ইউরোপীয়, ১টি বাঙালী এবং ২৪টি ছিল ভিন্নপ্রদেশীয় ভারতীয় মালিকানাধীন। এ সময় জলপাইগুড়িতে ৪টি ইউরোপীয় মালিকানাধীন ও ২টি ভিন্নপ্রদেশীয় দেশীয় মালিকানাধীন জুটফার্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীর তীরে বর্ধমান রোডে একটি ইউরোপীয় জুটফার্মের এবং আরও চারটি ইউরোপীয় জুটফার্মের শাখা অফিস ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩] অবিভক্ত দিনাজপুরের রায়গঞ্জে একটি ইউরোপীয় জুটফার্ম গড়ে উঠেছিল।[২৪] ইউরোপীয় জুট কোম্পানীগুলোর মধ্যে রেলি ব্রাদার্স স্বাধীনতার পরেও কিছুকাল উত্তরবঙ্গে ব্যবসা করেছিল। ১৯৫০ সালে এরা চলে যায়।

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে উপনিবেশিক উত্তরবঙ্গে পাট আবাদ ও বাণিজ্যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সিংহভাগ পাট উৎপাদক অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে কোন পাট শিল্প গড়ে ওঠে নি। অথচ হুগলী পাট উৎপাদক অঞ্চল না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে গড়ে উঠেছিল একাধিক পাটশিল্প। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ব্যাপক পাট উৎপাদিত হলেও কেন এখানে পাটশিল্প গড়ে ওঠে নি তা নিবিড় অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতে ৬৯টি পাটকল গড়ে উঠেছিল তৎমধ্যে ৬২টি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পাট শিল্পজাত ইউরোপ ও সামুদ্রিক দেশগুলিতে চালান যেত সমুদ্রপথে।[২৫] সেক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের সংযুক্ত হুগলী নদীর সন্নিহিত অঞ্চলগুলি সরাসরি জলপথ পরিবহনে যথেষ্ট সুবিধাজনক ছিল। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে এ রকম কোন সুবিধা উপনিবেশিক সরকারের কাছে ছিল না। তবে উত্তরবঙ্গে কেন পাটকল স্থাপিত হয় নি সে সম্পর্কে কোন উপযুক্ত তথ্য এখনও আমার আমার গোচরে আসেনি, এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে উত্তরবঙ্গের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে কোন Functional Caste বা বৃত্তিমূলক শ্রেণী বলে কিছু পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল মুখ্যত কৃষিজীবী। হাণ্টার সাহেবের বিবরণে জানা যায় যে এ অঞ্চলে প্রতি পঞ্চাশজনে উনপঞ্চাশ জনই কৃষিজীবী এবং এখানকার স্থানীয় লোকেদের শহরমুখী হওয়া ও শিল্প ব্যবসায় কোন ঝোঁক ছিল না।[২৬] এ অঞ্চলের আত্মকেন্দ্রিক রাজবংশী সম্প্রদায় কৃষিকার্যকেই প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং বহির্জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করত। ফলে এ অঞ্চলে স্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিস্তার ঘটেনি এবং এখনও পর্যন্ত স্থানীয় বণিক গোষ্ঠীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুতরাং স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর অনুপস্থিতিতে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ইউরোপীয় ও বহিরাগত বাঙালী এবং ভিন্ন প্রদেশীয় অবাঙালী ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এইভাবে উত্তরবঙ্গের বুকে উপনিবেশিক ব্যবসায়ী ও বৃহত্তর মাড়োয়ার, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেদের বিস্তার ঘটতে থাকে যারা এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের মুখ্য

নিয়ন্ত্রণকে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ক্ষুদ্রচাষীরা উৎপাদিত পাট সরাসরি মহাজনের কাছে বিক্রি করত এবং মহাজন বা আড়তদারেরা তার পাইকারী ব্যবসা করত। সুতরাং পাট ব্যবসায় স্থানীয় অধিবাসীদের অনুপস্থিতিতে ইউরোপীয় ও ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ীদের উপর চাষীকে নির্ভর করতে হত। পাটের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করত এই সকল ব্যবসায়ী শ্রেণী। ক্ষুদ্রচাষীর পক্ষে পাটের উপযুক্ত মূল্য বৃদ্ধি করা কিম্বা পাট সমিতি গঠন করা ছিল দূরূহ ব্যাপার এবং তা অবশ্যই আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং ১৯৩০ সালে মহামন্দায় চা এবং পাট উভয়েরই বাজার মন্দা হলেও চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি সমিতি (Tea Market expansion Board) গঠন করে সমস্ত পৃথিবীতে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে পাট চাষীর স্বার্থ সম্পর্কিত এরূপ কোন পাটকর সমিতি গড়ে ওঠে নি। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত পাটের বাজার মন্দা ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে পাটের রপ্তানী ১৯২৫-২৬ সালের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ কমে গিয়েছিল।[২৭] পাটের মূল্য হ্রাসে পাটের দাম বৃদ্ধির জন্য চাষীরা আন্দোলন করে। ফলে সরকার থেকে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। অথচ পাট ছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য যা অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে পাট এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে পাটের মূল্য হ্রাসে কেবলমাত্র চাষীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, শিল্পজীবি, উকিল, মোক্তার অর্থাৎ সমাজের সকলেই নিদারুণ ক্ষতিবোধ করছে।[২৮] পাট চাষীদের সংঘবদ্ধ করে পাটের নিম্নমূল্য স্থির করতে উত্তরবঙ্গের সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র সান্যাল পাটকর সমিতি গঠনের মাধ্যমে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার্থে কার্যকরী পদ্ধতি ও ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছিলেন।[২৯] এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাট নিয়ে ভাবনা এই প্রথম, কেননা জাতীয় কংগ্রেসের কোন নেতা এরূপ কার্যকরী ব্যবস্থার কথা পূর্বে উত্থাপন করেন নি। এইভাবে একজন আঞ্চলিক বুদ্ধিজীবী এই প্রথম পাটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যিকপণ্য এবং পাট চাষীর স্বার্থ নিয়ে জাতীয় স্তরে তুলে ধরেছিলেন।

সূত্র-নির্দেশ

১। *ব্লাইন জর্জ — এগ্রিকালচারাল ট্রেন্ডস ইন ইণ্ডিয়া* (১৮৯১-১৯৪৭) ফিলাডেলফিয়া, ইউনিভারসিটি এবং পেনসিভাসিয়া প্রেস ১৯৬৬, পৃঃ ১১২।

২। ত্রিস্রোতা — জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তাং ১২/৭/১৯৩১।

৩। ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার — *এ স্টাটেস্টিকাল একাউন্ট অব্ বেঙ্গল*, টারবান এণ্ড কোং; লন্ডন খন্ড ১০, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭, পৃঃ ২৯৮।

জে-এফ-গ্রুনিং — *ইষ্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার,* জলপাইগুড়ি - এলাহাবাদ ১৯১১ পৃঃ ৫৯ এবং ১১১।

৪। হেম চন্দের কের — *রিপোর্ট অন দ্য কাল্টিভেশন অব্ এন্ড ট্রেড ইন জুট ইন বেঙ্গল,* ক্যালকাটা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস ১৮৭৭, পৃঃ১৯।

৫। ধর্মকুমার সম্পাদিত — *দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া,* খন্ড দ্বিতীয়, পৃঃ ৮৫২।

৬। মিতালী — বিশেষ হলদিবাড়ি সংখ্যা ২০০১, পি. ভি - এন লাইব্রেরী হলদিবাড়ি।

৭। জয়ন্ত সেন সংকলিত প্রবন্ধ — *উত্তরবঙ্গ সংবাদ,* তাং ২৯-১০-২০০১।

৮। এ. জে. দাস — *গেজেটিয়ার অব দি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক,* আলিপুর, ১৯৪৫, পৃঃ ১৯১।

৯। এফ.এ.স্ট্রং — *ইষ্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার,* দিনাজপুর, এলাহাবাদ - ১৯৯২ পৃঃ ৫৮।

১০। এফ.এ.স্ট্রং, ঐ পৃঃ ৫৮।

১১। মিতালী, ঐ।

১২। গ্রুনিং, ঐ পৃঃ ৫৯।

১৩। ত্রিস্রোতা — ঐ তাং ১২/৭/১৯৩১।

১৪। কিরাতভূমি শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৭, সেকালের জলপাইগুড়ি শহর এবং সামাজিক জীবনের কিছু কথা — কামাখ্যা প্রসাদ চক্রবর্তী

১৫। চোমং লামা, *চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ,* পরিবেশক চক্রবর্তী এণ্ড কোং, কলকাতা-১২, পৃঃ১০১।

১৬। গ্রুনিং, ঐ পৃঃ ১১১।

১৭। মিতালী, ঐ/সাক্ষাৎকার মনোরঞ্জন গুহ রায়, বয়স ৮৬ হলদিবাড়ি তাং ২৯-১০-২০০১।

১৮। সাক্ষাৎকার মনোরঞ্জন গুহ রায়, ঐ

১৯। ডব্লিউ, ডব্লিউ হাণ্টার, ঐ পৃঃ ৩৭৭।

২০। হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — *ইনটারনাল মাইগ্রেশন ইন ইণ্ডিয়া* (এ কেস স্টাডি অব্ বেঙ্গল) কে. পি. বাগচী এণ্ড কোং, কলকাতা ১৯৮৭, পৃঃ ৩৩৮।

২১। মিতালী, ঐ

২২। কামাখ্যা প্রসাদ চক্রবর্তী, ঐ

২৩। বিজয়চন্দ্র ঘটক, শিলিগুড়ি শহরের ইতিবৃত্ত, মুদ্রক সত্যগুপ্ত জাগৃতি প্রেস, জলপাইগুড়ি বাং ১৩৮৯, পৃঃ ৩৭

২৪। এফ-এ-স্ট্রং — ঐ পৃঃ ৫৮।

২৫। এস-হাজরা - *জুট ইন্ডাস্ট্রিস প্রবলেম্স এন্ড প্রসপেক্টস,* বিদ্যা কাহিনী, নিউদিল্লী - ১১০২৯, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ ১।

২৬। ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার, ঐ, পৃঃ ২৬১।

২৭। ধর্মকুমার সম্পাদিত — ঐ পৃঃ ৮৫২।

২৮। ত্রিস্রোতা — ঐ তাং ১/৩/১৯৩১।

২৯। চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারকগ্রন্থ — *জলপাইগুড়ি শহরের একশ বছর; পাটের দাম ও গণসংযোগ,* পৃঃ ২৬৯-৭০।

চব্বিশ পরগনা ঃ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রবেশ দ্বার

পুষ্পরঞ্জন সরকার

ভাবতে অবাক লাগে 'সাত সমুদ্রের রানি' ব্রিটেন কীভাবে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। আরও অবাক হতে হয় যে সুদূর ইউরোপের এক ক্ষুদ্র দেশ কীভাবে বিশাল ভারতের ওপব প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃত হলেও মূলত ভাবতকে শোষণ ও নিষ্পেষণ করেই ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠে।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা-মুর্শিদাবাদ ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন পলাশিতে সিরাজের পরাজয়। বাংলার নতুন নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র চব্বিশ পরগনার স্বত্বাধিকার লাভ করে। বাংলার বা ভারতের চব্বিশ পরগনায় ব্রিটিশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের উপনিবেশ বিস্তৃত হল সমগ্র চব্বিশ পরগনায়। সাগর পেরিয়ে দলে দলে ইংরেজবা চব্বিশ পরগনায় আসতে থাকে। ইংরেজদের ভারত বিজয়ের শুরু চব্বিশ পরগনা থেকে।

অবশ্য ইংরেজদের ভারত সাম্রাজ্য বিস্তারে হুগলি নদীর ভূমিকা কম নয়। এই নদী কলকাতাসহ চব্বিশ পবগনার পশ্চিম সীমানা নির্দেশ করে। এই নদীকে দখলে এনে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্যবাদে উন্নীত হয়েছিল। হুগলি নদীর পূর্ব তীরের চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব লাভ করেছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। প্রকৃত অর্থে ইংরেজ বণিকদেব চব্বিশ পরগনাই ছিল ভারতে প্রথম দখল।

ভারতে ইওরোপীয়দের আগমনে জলপথের বা সমুদ্রের গুরুত্ব অসীম। চব্বিশ পরগনা বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পশ্চিমবাংলার একটি জেলা। ভূগোলকে ২১°৩১´ ও ২২°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২´ ও ৮৯°৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে চব্বিশ পরগনার অবস্থান। 'আইন-ই-আকবরী'[১] গ্রন্থের রাজস্ব ধার্যের খতিয়ানে চব্বিশ পরগনার উল্লেখ আছে। আকবরের রাজস্ববিদ টোডরমলের চব্বিশ পরগনা অজানা ছিল না। মুঘল আমলে এক সময় চব্বিশ পরগনা সপ্তগ্রাম সরকারের শাসনাধীন ছিল। মধ্যযুগের কবি বিপ্রদাস পিল্লাই[২]-এর 'মনসা বিজয়'[৩] ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে হুগলি নদীর তীর সংলগ্ন চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ আছে। মিরজাফর ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রবার্ট ক্লাইভকে হুগলি তীরে ও বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন যে চব্বিশটি পরগনা সমর্পণ করেছিলেন (২০শে ডিসেম্বর, ১৭৫৭), সেগুলি নিয়েই ব্রিটিশ শাসনকালে চব্বিশ পরগনা জেলার নামকরণ হয়। এই চব্বিশটি পরগনা ছিল ঃ (১) মাগুরা (২) খালপুর (টালিগঞ্জ অঞ্চল), (৩) মদন মল্ল (ক্যানিং), (৪) এক্তিয়ারপুর (৫) বুরজুট্টি (৬) খুর (অংশ), (৭) কুরিজুড়ি, (৮) দক্ষিণসাগর, (৯) কলিকাতা (অংশ) , (১০) পাইকান (অংশ), (১১) মদনপুর (অংশ), (১২) আমিরাবাদ (অংশ), (১৩) আজিমাবাদ, (১৪) মুড়াগাছা, (১৫) পেচাকলি, (১৬) পাম্পুর (অংশ), (১৭) মামেদ আমেদপুর, (১৮) মেলাং মহল, (১৯) হাতিঘর (কুলপি, মথুরাপুর), (২০) মেদিয়া বা ময়দা, (২১) আকবরপুর (অংশ), (২২) বালিয়া (অংশ), (২৩) বাসুন্দি ও (২৪) শাহনগর (অংশ)।[৪]

কলকাতা সহ এই জেলা ভারতভূমির পাদদেশে নদীবাহিত পলির একটি বদ্বীপ। এই জেলার ভূগঠনে রয়েছে অস্থিরতার ইতিহাস। এই অঞ্চলের নদীগুলির ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে চব্বিশটি পরগনা গড়ে উঠেছিল। নদী খালে বিভাজিত পলিজ দ্বীপের জঙ্গলময় নবাবি আমলের চব্বিশ পরগনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম জমিদারি গড়ে উঠেছিল। এই জেলার গা ঘেষে হুগলি নদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। খাল, বিল, নদী-নালায় পরিপূর্ণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণে বিখ্যাত সুন্দরবন। জল-জঙ্গলে পরিপূর্ণ চব্বিশ পরগনার সমুদ্রতট।

ইওরোপীয়রা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাদের অস্ত্র সজ্জিত তরীগুলিকে নিয়ে সমুদ্রপারের চব্বিশটি পরগনার অসংখ্য নদী মোহনা, জোয়ারের জল ওঠা খাল, খাড়ি ও দ্বীপসমূহের ভিতর প্রথম প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অপ্রতিরোধ্য বিচরণ করেছে, এখানকার মানুষকে ধরে জাহাজে ভর্তি করেছে। দেশ-বিদেশে দাস বাজারে ব্যবসা চালিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত ব্যাপক দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে 'মগের মুল্লুক'-এ পরিণত করেছিল। এক সময় আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের একচ্ছত্র দখলদার ছিল পর্তুগিজগণ। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে এরা চব্বিশ পরগনায় ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। দিল্লীর সুলতান তখন সিকন্দার লোদি (১৪৮৯-১৫১৭)।[৫] যদিও তখন ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটে এলেন (১৪৯৮)। পর্তুগিজ আরবসাগর তীরবর্তী কালিকট ছাড়াও কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই, সুরাত প্রভৃতি স্থানে ঘাঁটি বানিয়ে বসে। মুঘল শাসনকালেই চব্বিশ পরগনার জমিদারি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে এসেছিল। ভারতে ইওরোপীয় বণিকদের আগমন ও তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার হওয়ার অনেক পর ইংরেজরা ভারতে আসেন। সম্ভবত ইংরেজ বণিক শ্রেণী ব্যবসায়িক বৃত্তিতে ইওরোপের অন্যান্য জাতিগুলি থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ নৌবাহিনীর হাতে স্পেনীয় আর্মাডার পরাজয়ের ফলে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে আসার সমুদ্রপথের উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের দরবারে স্যার টমাস রো সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করেছিলেন। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জন মিলডেন হল নামে জনৈক দুঃসাহসী ইংরেজ বণিক স্থলপথে ভারতে আসেন।[৭] ইতিমধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইওরোপীয় বণিকদের বেশকিছু বাণিজ্য কুটির তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল সুরাত।[৮]

১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে হকিন্স জাহাঙ্গিরের দরবারে আসেন। হকিন্স সুরাতে ইংরেজ কুঠি নির্মাণের অনুমতি পান। মুঘলদের নৌশক্তির দুর্বলতায় কালক্রমে ইংরেজরা মুঘল শক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করত। অন্যদিকে ইংরেজ ও পর্তুগিজ বণিকেরা প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় পারস্পরিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে নৌযুদ্ধ চলে প্রায় দশ বছর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অন্য একটি কারণে ইংরেজরা পর্তুগিজদের কাছ থেকে 'বোম্বাই' লাভ করে। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুরাত ছিল ইংরেজ কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সুরাত, ব্রোচ, আহমেদাবাদ, আগ্রা ও মাসুলিপত্তমে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা সুরাতে একটি দুর্গনির্মাণের চেষ্টা করে। স্থানীয় মুঘল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে।[৯] তারা সুরাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধানদের বন্দি করে। কোম্পানির একদল কর্মচারী মুঘল জাহাজে দস্যুতাবৃত্তি শুরু করে।

কালক্রমে ইংরেজরা দক্ষিণভারতের করমন্ডল উপকূলে বাণিজ্য কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করে। সুরাত থেকে মাদ্রাজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ভারতে ইংরেজদের প্রধান তিনটি ঘাঁটি ছিল বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ। ১৭৪৪ সালের মধ্যে বোম্বাই ও কলকাতার জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫,০০০ ও এক লক্ষ। আলিবর্দি স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, সরকার তাদের আইন সঙ্গত ব্যবসার কাজে কোনো বাধা দেবেন না; কিন্তু ব্যবসা করতে এসে দুর্গ নির্মাণ বা সামরিক প্রস্তুতি সরকার কোনো কারণেই বরদাস্ত করবে না। কর্ণাটকের প্রথম (১৭৪৪-৪৮), দ্বিতীয় (১৭৪৯-৫৪) ও তৃতীয় (১৭৫৭-৬৩) যুদ্ধ ছিল ইংরেজ ও ফরাসিদের পারস্পরিক যুদ্ধের প্রতিফলন।

বাংলার সঙ্গে ইংরেজদের নিয়মিত যোগাযোগ শুরু হয় ১৬৩০-এর দশকে। ইওরোপের অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়ের মতো তারা বাণিজ্য করার জন্য বাংলায় কুঠি

তৈরি করার অনুমতি প্রার্থনা করে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুবিধা আদায়ের জন্য তারা তৎপর হয়ে ওঠে, ১৬৫৯ ও ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা প্রথম বাংলায় কুঠি নির্মাণ করে। ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। তাদের বাৎসরিক শুল্কের পরিমাণ ছিল ৩০০০ টাকা।[১০] ১৬৮৬ সালে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে বিরোধ বাধে। ইংরেজরা পরাজিত হয়। বাংলার সমস্ত কুঠি ও বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে তারা বিতাড়িত হয়। শেষে ১৬৯২ সালে তারা ৩০০০ টাকা বিনিময়ে সমস্ত শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ১৬৯৮ সালে তারা কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব অর্জন করে। এই সময়ে (অষ্টাদশ শতকে) ইংরেজরা যথেষ্ট সুযোগ সুবিধার অধিকারী হলেও তারা তা পর্যাপ্ত মনে করত না। ১৭১৩ সালে সুরম্যানের নেতৃত্বে একদল বণিক মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছে তদ্বির করে। ইংরেজ বণিকরা অনুকূল পরিস্থিতিতে ১৭১৭ সালের ফরমান লাভ করে।[১১] এই ফরমান বলে মাত্র ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। দ্বিতীয়ত, কলকাতায় তাদের বিশেষ অবস্থা মেনে নেওয়া হয় এবং কলকাতার সন্নিকটে ৩৮টি[১২] গ্রাম বাৎসরিক ৮,১২০ টাকা ৮ আনার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ফারুকশিয়ারের ফরমানকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যের 'ম্যাগনা কার্টা' বলা যায়। ফারুকশিয়ারের ফরমানে ইংরেজরা যে বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে তা বাংলার নবাবদের মনঃপুত ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁ পরিষ্কার জানিয়ে দেন, বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার কেবল মাত্র সেইসব দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে, যেগুলি সরাসরি ভারত থেকে সমুদ্রপথে আমদানি বা রপ্তানি করা হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সুযোগ পাওয়া যাবে না। মুর্শিদকুলি খাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও ফরমান লাভের পর ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। ৪০ বছর পরে ফরমানকে অজুহাত করেই ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ইংরেজ বণিকেরা কিন্তু নানাভাবে দস্তকের অপব্যবহার শুরু করেছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরেজদের বিরোধ বাধত। অবশ্য অর্থ আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজদের প্রতি অত্যাচারী নীতি গ্রহণ করত। ইংরেজরা ফরমান লাভ করলেও ওলন্দাজদের সমস্ত জিনিসের ওপর $2\frac{1}{2}$% হারে শুল্ক দিতে হত। তবে তারা জাহান্দার শাহের কাছ থেকে 'ফরমান' লাভ করে। যাই হোক ১৭১৭ সালে ইংরেজদের ফরমান লাভের পর দিনেমার ভারতে বিশেষত বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে।

ফরাসিরা ১৬৯২-৯৩ সালে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু ফরাসি কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তারা বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি। তারা অবশ্য ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ করেছিল। এই ফরমানের শর্ত অনুসারে তারা $2\frac{1}{2}$% হারে শুল্ক দিতে স্বীকৃত হয়।

দিনেমার বণিকেরা সপ্তদশশতকের শেষ দিকে বাংলায় ব্যবসা করতে আসে। তারা এখানে বাণিজ্যে বিশেষ প্রসার ঘটাতে পারেনি। স্থানীয় কিছু কর্মচারীর সঙ্গে তাদের বিরোধ বাঁধায় তারা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়।

অসটেন্ড নামে এক জার্মান কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করতে এসেছিল। ইংরেজরা তাদের নানাভাবে বিরোধিতা শুরু করে।

ইংরেজ ও অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকদের ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশের কিন্তু আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

সুজাউদ্দিন ইংরেজ বণিকদের যথাসাধ্য আয়ত্বে রাখেন। সরফরাজ খাঁ ছিলেন অকর্মণ্য। ইংরেজ ব্যবসা যথারীতি বাড়তে থাকে। এদিকে আলিবর্দি খাঁ সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শেষে গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দি সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। অদৃষ্টের পরিহাস যে সিরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধের মূল্য দিতে হয়েছিল পলাশিতে।

এভাবে দেখা যায় ইওরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজদের প্রাধান্যকে ইংরেজ বণিকেরা খর্ব করে। অন্যদিকে ফরাসি বণিকদের উচ্চাশাকে ইংরেজ বণিকেরা অবদমিত করেছিল।[১৩]

অন্যদিকে সুরাতে ইংরেজ বণিকেরা শুধুমাত্র বাণিজ্যের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছিল। সেখানে তারা বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে তারা অনেকটা জড়িয়ে পড়ে। কর্ণাটকের যুদ্ধে তারা ফরাসিদের পরাজিত করে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ থেকে তারা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল এ কথা বলা যায় না। বোম্বাই ছিল তাদের আদর্শ বন্দর, বাণিজ্যিক উপকরণ। তবে এখানে তারা ছিলেন অনেকটাই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে। কাহ্নোজি আংরে ও তাঁর উত্তরসূরিরা বোম্বাইতে ইংরেজদের নিরাপত্তা বার বার বিঘ্নিত করেছিলেন।[১৪]

কিন্তু পূর্ব ভারতে বাণিজ্য করতে এলে তাদের উচ্চাশা বহুদূর বিস্তৃত হয়। জব চার্নক হুগলি থেকে বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিন্তু কলকাতাকে তিনি ইংরেজ বণিকদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও উপনিবেশে পরিণত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। দস্তকের অপব্যবহার করেই তারা বাংলার দুর্বল নবাবের সঙ্গে বিরোধ বাধায়। তারা পর্তুগিজদের সরিয়ে হুগলি মোহনা পর্যন্ত নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। সমগ্র চব্বিশ পরগনার ওপর তাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে।

ইতিমধ্যে তারা বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ ছিল তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমার বণিকদের গুরুত্ব ইতিমধ্যে কমে এসেছিল। নতুন নবাবের কাছ থেকে পাওয়া চব্বিশ পরগনাকে তারা সাম্রাজ্যিক কাঠামোর প্রধান সোপান বলে চিহ্নিত করে।

প্রশ্ন থাকতে পারে যে ইংরেজরা প্রথমে সুরাতে কুটি স্থাপন করেছিল এবং পরে মাদ্রাজকে কেন্দ্র করেই তারা প্রথমে ভারতের দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। এই সূত্রে চব্বিশ পরগনা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্থাপনের প্রবেশদ্বার হতে পারে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পলাশির যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ বা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর থেকে ইংরেজদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের দুঃসাহসিক বাসনা শুরু হয়েছিল। সেই অর্থে চব্বিশ পরগনাকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গঠনের প্রবেশদ্বার বলে উল্লেখ করা যথার্থই যুক্তিসঙ্গত।

সূত্র-নির্দেশ

১। মনোরঞ্জন রায়, *পরায়ত্ত পরগনা কথা ঃ চব্বিশ পরগনা জেলার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ডায়মন্ড হারবার, ১৯৯০, পৃঃ ২৭৬।

২। ঐ, পৃঃ ৯৯।

৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেট ইয়ার ঃ ২৪ পরগনাস, বরুণ দে (সম্পাদিত), গভর্ণমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৭৪ পৃঃ ৭২।

৪। মনোরঞ্জন রায়, ঐ, পৃঃ ৭।

৫। ঐ, পৃঃ ১১১।

৬। ঐ পৃঃ ১১।

৭। সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারতের ইতিহাস* (১৭০৭-১৮৫৭) কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ১২৪।

৮। জন ক্লার্ক মার্শম্যান, *দ্য হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লি, ১৯৯০ পৃঃ ১৪০।

৯। সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃঃ ১২৪।

১০। আর. সি. মজুমদার (সম্পাদিত), *দ্য হিস্ট্রি এন্ড কালচার অব দ্য ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল*, ভলিউম এইট.; কে. কে দত্ত, *দ্য মারাঠা সুপ্রিমেসি: বেঙ্গল সুবা*, ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৯১ পৃঃ ১০৫।

১১। এন. কে. সিনহা, *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (১৭৫৭-১৯০৫), ইউনিভারসিটি অব ক্যালকাটা, ১৯৯৬ য, পৃঃ ৯।

১২। আর. সি. মজুমদার (সম্পাদিত), *দ্য হিস্ট্রি এন্ড কালচার অব দ্য ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল*, ভলিউম এইট. কে. কে. দত্ত, *দ্য মারাঠা সুপ্রিমেসি; বেঙ্গল সুবা*, ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৯১ পৃঃ ১০৩।

১৩। পি. এল. চোপড়া, বি. এন. পুরি, এম. এন. দাস, এ. সি. প্রধান, *এ নিউ এ্যাডভান্সড্ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লি, ১৯৯৬, পৃঃ ১০৫।

১৪। আর. সি. মজুমদার (সম্পাদিত), *ঐ*, ভলিউম এইট *দ্য মারাঠা সুপ্রিমেসি*, পৃঃ ৩১৫।

টোটোদের বর্তমান ইতিহাস

শ্যামলী সরকার

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমাভুক্ত মাদারীহাট থানার ভূটান সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম টোটোপাড়া। মাদারীহাট থানা থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরত্বে ইন্দো-ভূটান সীমান্তের ভূটান হিমালয়ের পাদদেশে এই গ্রামের অবস্থান। ভারতের ক্ষুদ্র ও প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী টোটো সম্প্রদায় এই গ্রামে বাস করে। গ্রামটির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০ ফিট থেকে ১৫০০ ফিট। এর দেশান্তর অক্ষাংশ ৮৯°২০´ পূর্ব / ২৬°৫০´ উত্তর। এই গ্রামের উত্তর পশ্চিমাংশ যেন পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। টোটোপাড়ার উত্তরে আকাশচুম্বী ভূটান-হিমালয়, দক্ষিণে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের একাংশ ও হাউড়ী নদী। পূর্বে খরস্রোতা আমা-ছু বা তোর্ষা নদী। আর পশ্চিমে তিগ্রিংয়ের গভীর বনভূমি ও পুদুয়া পাহাড়।

১৮৬৪-৬৫ সালে ইঙ্গ-ভূটান যুদ্ধে ভূটানের পরাজয়ের পর বর্তমান ডুয়ার্স এলাকাসহ টোটোপাড়া ব্রিটিশ ভারতের অঙ্গীভূত হয়। সমুদয় ডুয়ার্স অঞ্চল ১৮৬৫ সালের ইঙ্গ -ভূটান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভূটান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভারত-ভূটান যুদ্ধে ভূটানের পরাজয়ের পর ডি.এইচ.সান্ডার সাহেব (১৮৮৯ খ্রিঃ — ১৮৯৫ খ্রিঃ) এই অঞ্চলে জমি জরিপের কাজ করতে আসেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বর্তমান টোটোপাড়ার টোটোদের কথা উল্লেখ করেন। সান্ডারের পরবর্তীকালে বিভিন্ন জরিপ প্রতিবেদন, আদমসুমারী প্রতিবেদন এবং সরকারী নথিপত্রে টোটোপাড়ার এই বিরল জনজাতি গোষ্ঠী টোটোদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুর্গম পাহাড় আর অসংখ্য পাহাড়ী নদী ও জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রামটির ভৌগলিক পরিবেশ গ্রামটিকে বহুকাল দেশের মূল জনবসতি থেকে পৃথক করে রেখেছিল। এইধরনের ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা অনেক সময় মানুষের সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়। টোটোদের অবস্থানও ছিল সেইরকম। ভারতের অন্যতম প্রিমিটিভ ট্রাইব টোটো জনজাতি গোষ্ঠী নিস্তরঙ্গ জীবন-যাপন করছে, এখন আর একথা বলা যায় না। তাদের জীবনে এসেছে নানারকম পরিবর্তন। জনসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র, শিক্ষা এবং আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এই উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্নভাবে উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তথাকথিত

আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে এদের জীবনে। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলত তাদের জীবনযাত্রায় এসেছে পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের ফলে তারা যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধিত হয়েছে, তেমনই আবার দেখা দিয়েছে নানা সমস্যাও।

বর্তমানে টোটো জনজাতির জীবিকা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাদের এই পরিবর্তনের ইতিহাস খুবই দুঃখজনক। পূর্বে টোটোদের অর্থনীতি ছিল কয়েকপ্রকার নগদি বাগানজাত ফসল ও অন্যান্য কয়েকপ্রকার বনজ সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া ছিল প্রচুর পরিমাণে কমলালেবুর বাগান চাষ। সেইসঙ্গে টোটোরা ক্ষেত্রান্তরী ঝুম চাষ পদ্ধতির সাহায্যে সামান্য খাদ্য উৎপাদন করতো। কিন্তু গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে তাদের বাজার অর্থনীতির মূল উপাদান কমলালেবুর উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফসল ও বনজ সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল থাকায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের কাছে টোটোদের কোন বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতাও গড়ে ওঠেনি। অভাবের তাড়নায় এই প্রথম তারা সামাজিক বিধি ভেঙে জীবিকার সন্ধানে টোটোপাড়ার বাইরে যেতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে টোটোদের উন্নয়নের কাছে এগিয়ে আসে দেশী-বিদেশী নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও মিশন। ১৯৫১ সালে টোটোপাড়ায় স্থাপিত হয় 'ট্রাইবান ওয়েলফেয়ার সেন্টার'। ১৯৭৫ সালের পর প্রধানত সরকারী কৃষিবিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের ফলে টোটোরা ধান চাষের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়। কিন্তু উন্নত সাব, বীজ ও সেচের ব্যবহারে এখনও তারা সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তা সত্ত্বেও এখন তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। যদিও ইতিমধ্যে বেশ কিছু টোটো যুবক-যুবতী লেখাপড়া শিখেছে। স্বল্পশিক্ষিত কিছু টোটো সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে। কিছুসংখ্যক টোটো স্থায়ীভাবে ছোটখাট ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। কয়েকজন টোটো যুবক এখন চাকুরী সূত্রে টোটোপাড়ার বাইরে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে টোটোরা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। এমনকি ভারতের মধ্যেও এরা সংখ্যালঘু। ২০০১ সালের কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট অনুযায়ী টোটোপাড়ার মোট জনসংখ্যা হল ৩২২৫ জন। এদের মধ্যে টোটো সম্প্রদায়ভুক্ত হল ১১৫৭ জন। বাদবাকি বেশীরভাগ মানুষই টোটোপাড়ার বহিরাগত। মোট জনসংখ্যার ৫৮.৭২^0 হল অ-টোটো মানুষই টোটোপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৫১ সালের পর টোটোদের স্বাভাবিক সারল্য এবং জেলাপ্রশাসনের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে টোটোপাড়ায় বহিরাগতদের ভিড় বাড়তে থাকে। বহিরাগতরা প্রবেশের ফলে বর্তমানে টোটোপাড়ায় জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার

প্রভাব পড়েছে টোটো জনগোষ্ঠীর উপরে। দুর্গম নদী-পাহাড়, হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত বনভূমি টোটোপাড়াকে বহুদিন পর্যন্ত বহিরাগতদের কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছিল। তাছাড়া বহিরাগতরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে তারজন্য সুস্পষ্টভাবে সুপারিশ করা ছিল। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত টোটোপাড়া মৌজা শুধুমাত্র টোটোদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা ছিল। কৃষিই যেহেতু টোটোদের প্রধান জীবিকা তাই তারা সম্পূর্ণভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। বহিরাগতরা এসে এই এলাকার জমির উপর ভাগ বসায়। ফলে টোটোদের পরিবারপিছু বা মাথাপিছু জমির পরিমাণ অনেক কমে যায়।

১৯৬৯ সাল থেকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল হওয়ায় ঐ বছর বিভিন্ন টোটো পরিবারের চাষের অধীন যতটা জমি ছিল তা বাদে সমস্ত জমি রাজ্য সরকারের খাস জমি হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে খাস জমি হলে যে কেউ এসে সেই জমিতে বসবাস শুরু করতে পারে। ২ একরেরও কম জমি রয়েছে এমন টোটো পরিবারের সংখ্যা অনেক। অথচ কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে টোটোপাড়ার মতো জায়গায় ৫ একরের কম জমি অর্থনৈতিক দিক থেকে চাষের পক্ষে লাভজনক নয়। তাছাড়া টোটো জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী টোটো এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক জনসংখ্যার বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

টোটো	১১৫৭
নেপালী	১৮৯৪
বিহারী	৯০
বাঙালী	৪০
মুসলিম	২৫
গারো	১৫
মেচ	০৪
মোট	৩২২৫

২০০৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, টোটোপাড়া ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী টোটোপাড়ার মোট আয়তন ১৯৯৩.৪৯ একর। তারমধ্যে টোটোদের নামে মোট চাষের জমি রেকর্ডভুক্ত আছে ৯০০ বিঘা। অধিকাংশ চাষের জমি সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের দখলে। এই সময় ২৯২ টি অ-টোটো পরিবারের উল্লেখ্য পাওয়া যায়। তারমধ্যে ২৭০টি নেপালী পরিবার। আর এই নেপালীদের দু-একটি পরিবার ছাড়া সকলেই কৃষির সাথে যুক্ত। ০৪.০৯.২০০৩ তাং-এর টোটোপাড়া ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট টোটোদের সংখ্যা হল ১২২৫ জন। ৬৪০ জন পুরুষ এবং ৫৮৫ জন মহিলা।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই উপজাতি সম্প্রদায় এমনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলির তুলনায় টোটো সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার অনেক কম। ১৯৬৫ সালে টোটোপাড়ায় টোটো কল্যাণ বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে এখানে পড়ানো শুরু হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে প্রথম জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল বোর্ড একটি প্রাইমারী স্কুলের অনুমোদন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এদের উন্নতির জন্য যে সংস্থাটির নাম গভীরভাবে জড়িয়ে আছে তা হল সুইডিশ মিশনারী সংস্থা। এখন বেশ কয়েকবছর আগে থেকে এই সংস্থাটির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া অন্যান্য নানা সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন টোটোদের শিক্ষায় উন্নয়নের কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

টোটোদের মধ্যে মুক্তারাম টোটো প্রথম হাইস্কুল যান। ১৯৭৯ সালে সিঙ্গিমারী হাইস্কুল থেকে প্রথম মাধ্যমিক পাশ করেন চিত্তরঞ্জন টোটো। বর্তমানে বেশকয়েকজন টোটো পুরুষ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে সরকারী বিভিন্ন সংস্থায় নানারকমের চাকুরী করছে। টোটো মহিলারা পড়াশুনায় এখনও প্রায় সম্পূর্ণভাবে পিছিয়ে আছে। মহিলাদের মধ্যে ২০০৩ সালে সূচনা টোটো নামে এক মহিলা প্রথম মাধ্যমিক পাশ করেন। তিনি রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। কিছু কিছু টোটো ছেলেমেয়ে এখন টোটোপাড়ার বাইরে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। টোটো সম্প্রদায় পড়াশুনায় এতটা পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ দারিদ্র। অভাবের তাড়নায় ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই বাবা-মা'র সঙ্গে মাঠে কাজ করতে যায়। পড়াশুনার পেছনে যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ তারা দিতে পারে না। তাছাড়া অর্থকষ্ট একটি বড় কারণ। দিন আনা দিন খাওয়া অনেক টোটো পরিবারেরই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য ন্যূনতম খরচ করার ক্ষমতাই নেই। এছাড়া তাদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে ভাষা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টোটোপাড়ায় বর্তমানে নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় হাট-বাজার, দোকান-পাট সর্বত্র যোগাযোগের ভাষা হিসাবে নেপালী ভাষা প্রচলিত। টোটো ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে টোটো ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু তাদের পড়াশুনা করতে হয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে। ফলে তারা যদি বাড়ীতে পড়তে গিয়ে কখনও কোন অসুবিধায় পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তা দেখিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে পায় না। টোটোপাড়ার স্কুলগুলির বেশীরভাগ শিক্ষক বাইরে থেকে আসে। আবার প্রাইভেট পড়ার মতো আর্থিক সঙ্গতিও তাদের নেই। বৃহত্তর সমাজের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার ক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে এরা তার এতটুকুও পায় না। তাই তাদের মেধা বিচার করার সুযোগের অভাব রয়ে যায়।

টোটোদের প্রাত্যহিক জীবনে এখন এসেছে অনেক পরিবর্তন। জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি গেছে পাল্টে। তাদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, দৈনন্দিন রীতিনীতি

সর্বত্র পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। টোটোপাড়ায় নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার উপর নেপালী সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় প্রভূত পরিমাণে। টোটো পুরুষরা প্যান্ট, শার্ট এবং মহিলারা এখন শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ পড়ে।

বহির্জগতের সাথে টোটোপাড়ার যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতির কোলে শান্ত জীবনযাপন করছে, টোটোপাড়ার টোটোদের সম্পর্কে এখন আর একথা বলা যায় না। বহির্বিশ্বের কোলাহল পৌঁছে গেছে টোটোপাড়ায়। প্রতিদিন টোটোপাড়ার বাইরে থেকে লোকজন যাওয়া-আসা করে। এদের অনেকেই টোটোপাড়ায় অবস্থিত বিভিন্ন স্কুল ও নানা অফিসে কর্মরত। ফলে ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতির ক্ষেত্রে অ-টোটো সম্প্রদায়ের সঙ্গে চলছে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান। ১৯৯৯ সালে টোটোপাড়ায় টেলিফোন ব্যবস্থা এসে গেছে। এখন এখানে বাস-টার্মিনাস তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে কো-অপারেটিভ ব্যাংক, বিভিন্ন দোকান-পাট, ব্যবসায়ীদের বাড়িঘর ইত্যাদি। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রতিদিন টোটোপাড়ায় বাস যাওয়া-আসা করে। এমনকি টোটোপাড়া বাজারে এখন ভি.সি.ডি বা অন্যান্য আধুনিক বিনোদন সামগ্রীও দুর্লভ নয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ছোঁয়া লেগেছে টোটোসমাজে। আধুনিকতার প্রয়োজনও রয়েছে। টোটোরা এখনও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হারায়নি। তারা মনে প্রাণে তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুফল পৌঁছে যাবে টোটো উপজাতির জীবনে। কিন্তু তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রেখে। এই প্রত্যাশায় থাকব আমরা।

সূত্র-নির্দেশ

১) চারুচন্দ্র সান্যাল, *দি টোটোস ঃ এ সাব-হিমালয়ান ট্রাইব অব নর্থবেঙ্গল,* ১৯৭৩, নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি।

২) *'মধুপর্ণী',* বিশেষ জলপাইগুড়ি সংখ্যা, ১৯৮৭, বালুরঘাট।

৩) *'লোকশ্রুতি',* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৬।

৪) *বুলেটিন অব দি কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০২-ভলিউম ২১, স্পেশাল ইস্যু।

৫) সাক্ষাৎকার, ০৪.০৯.২০০৬।

৬) টোটোপাড়া ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার।

৭) বিমলেন্দু মজুমদার, *এ সোসিওলজিক্যাল স্টাডি অব দি টোটো ফোক-টেলস্,* এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা - ১৯৯১।

৮) দেবেন্দ্রনাথ চালী, *টোটো ঃ পশ্চিমবঙ্গে একটি সংখ্যালঘু পার্বত্য আদিবাসী গোষ্ঠী,* কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গ - ১৯৮৭।

সারাংশ

'শিলিগুড়িতে ১৯৭০ সালের ১০দিন ব্যাপী রেলওয়ে ধর্মঘট এবং এর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট'

কাজল কুমার রায়

ভারতবর্ষের প্রতিটি জাতীয় সংবাদপত্রে যে খবর প্রাধান্য পেয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায় তা হলো জুলাই ৫, ১৯৭০ সালে শিলিগুড়ির OC সমর সেন শিলিগুড়ির SDO কক্ষে ঘেরাও চলাকালীন ছুরিকাহত হন। গত ২রা জুলাই বাণীমন্দির স্কুলে নক্সালপন্থী ছাত্ররা রেলওয়ে বাণীমন্দির স্কুলে হামলা চালিয়েছিল। তাদের অভিভাবকরা সংখ্যায় ২০০ এর উপরে ছিল এবং তাদের মুক্তির দাবীতে ঘেরাও করেছিল। ঘটনাস্থল থেকে হাতে নাতে একজন ও পরবর্তী পর্বে সেদিনরাত্রেই আরো ১০ জনকে এই অপবাধে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পরের দিন অর্থাৎ ৬ তারিখ হতেই রেলকর্মচারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে রেল চাকা বন্ধ ও রেল অবরোধ শুরু হয়। ১০ দিন ধরে ধর্মঘট চলার পর রেলমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দের অনুরোধে বিনা শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে এই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়।

এই আন্দোলন ছিল নক্সাল আন্দোলন প্রভাবিত একটা সফল ধর্মঘট। এখানে রেল শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। এতে কোন অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া ছিল না। ছিল মর্যাদা রক্ষার লড়াই। এই লড়াইকে নক্সালপন্থীরা কৃষক আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। ফলে এই আন্দোলনে দুটি মতাদর্শগত লড়াই দেখতে পাই। পরবর্তীপর্বে আন্দোলনের রাশ নক্সালপন্থীদের হাত হতে UCR এর হাতে চলে আসে। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলনে নক্সালপন্থীদের ব্যর্থতা লক্ষ্য কবা যায়।

দ্বিতীয়ত ছাত্রদের আন্দোলন এখানে ছাত্ররা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তারা নির্মম আঘাত হানে। তবে এই আঘাত কিন্তু প্রথম নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস সূচনা পর্ব হতে নক্সালবাড়ী ছাত্র আন্দোলন দেখাবার চেষ্টা করেছি। ছাত্র আন্দোলন কেন পরাস্ত হলো এবং ভেঙ্গে গেল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রতি নক্সালপন্থীদের আঘাত এই আঘাতের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা আমাদের সকলের জানা আছে। কিন্তু তারা যে ভুল করেছিল তা হলো ব্যক্তি শ্রেণী বিন্যাসে, শ্রেণী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা এবং বিবর্তন গুলি বুঝতে। এই বোঝাতেই বিরাট ফাঁকে রয়ে গেছে, এর ফলে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

শিলিগুড়ির নক্সালপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত রেলধর্মঘট একটা রূপক। এই রূপক বিশ্লেষণ এবং তাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে আমাকে নক্সাল আন্দোলনের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টানতে হয়েছে তবে এটা আরো বিস্তৃত করলে ভালো হতো। তবুও সংক্ষিপ্ত আকারে এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

"আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ (১৯৪৭-১৯৭৯) ঃ একটি সমীক্ষা"

মাধব চন্দ্র অধিকারী

জাতীয় জীবনে যে সমস্ত সমস্যা বর্তমানে প্রকট হয়েছে তাদের মধ্যে জাতি-রাজনীতি (Caste-Politics), ধর্মীয় মৌলবাদ শ্রেণী দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিকতাবাদ — এমনতর বহুবিধ সংকট যাদের তীব্রতা ও চরিত্র নির্ভর করে এদের প্রেক্ষাপট ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, স্বাধীনতার উত্তরকালে (১৯৪৭-১৯৭৯) রাজবংশী সমাজের মধ্যে যে জাতি পরিচয়ের সংকট প্রকট হয়েছে তারই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, তাম্রশাসন, বিদেশী পর্যটনের ভ্রমণবৃত্তান্ত ঐতিহাসিকদের বিবরণী হতে রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে সমস্ত এলাকায় বেশী পরিমানে বাস করছেন তা হলো — কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর (উঃ ও দঃ), মালদহ দার্জিলিং এর সমতল এলাকা, আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁও, ধুবড়ী জেলা, বিহারের পূর্ণিয়া ও কাটিয়ার জেলা বাংলাদেশের রংপুর, পূর্ব দিনাজপুর ময়মনসিং জেলার কিছু অংশ' লোয়ার ভূটান, মেঘালয়, নেপালের ভদ্রপুর, ঝাপা, মোর জেলা এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ। এদের পরিচয় সম্পর্কে বিদেশী ও দেশীয় লেখকগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। নৃতত্ত্ববিদগণ রাজবংশীদের ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী বললেও রাজবংশী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মতে রাজবংশীরা ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করেছেন। এই নৃতাত্ত্বিক বিরোধের মধ্যেই রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতি থেকে 'কামতাপুরি' হিসাবে পরিচয়ের দাবি উঠেছে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের এই আত্ম-পরিচয় সংকটের উৎস ও উত্তরণ কোথায় ইহাই এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রাজবংশীদের সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ক্ষাত্রয় সমিতি (১৯১০) গঠন করে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া কান্ড পরিচালনা করেন। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী

স্বীকৃত হয়। শুধু তাই নয়, সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও উন্নত বিধানের জন্য রাজবংশী সম্প্রদায়কে অনুন্নত শ্রেণীর তালিকা (Scheduled Caste : those who are educationally and economically backward) ভুক্ত করা (১৯৩৩ খ্রিঃ) হয়। সরকারী সংরক্ষণ প্রথার আওতায় এনে রাজবংশী সমাজকে শিক্ষায় ও সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন পঞ্চানন বর্মা মহাশয়।

স্বাধীনতার উত্তরকালে রাজবংশী সমাজের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দিক কিছুটা ভাটা পড়ে। দেশবিভাগের ফলে ক্ষত্রিয় সমিতির প্রধান দফতর রংপুরে চলে যায় এবং ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যকলাপে প্রভাব পড়ে। যদিও বিছিন্নভাবে ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যকলাপ চলতে থাকে তথাপি রাজবংশী সমাজে বর্ণ হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে সামাজিক জাত্যাভিমানের (Sanskritization) প্রবণতা দেখা দেয়। যথা — পোশাক, জীবনশৈলী, বিবাহরীতি, ধর্মীয় আচরণ, মূর্তিপূজা, পূজায় চিরাচরিত রাজবংশী পুরোহিত ''অধিকারী'র পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আহবান ইত্যাদি'। তবে রাজবংশীদের এরূপ জাত্যাভিমানের প্রবনতা বর্ণ হিন্দু সমাজ কখনই সমর্থন বা গ্রহণ করেন নি। এখান থেকেই বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক অধিকারের ন্যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজবংশী শ্রেণী বঞ্চিত হতে থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে রাজবংশীদের কাছেই বেশী জোতদায়ী ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চিত্রটা আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। উদ্বাস্তু সমস্যার ফলে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন বর্ণহিন্দু জনগণের কাছে রাজবংশী শ্রেণী ক্রমান্বয়ে হার মানতে থাকে। ফলস্বরূপ রাজবংশী শ্রেণী জমি হারাতে থাকে এবং অর্থনৈতিক অধিকার হারাতে থাকে যা ১৯৫৩খ্রীঃ জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন, '৬৭' এর ভূমিসংস্কার আইন ও '৭৭' এর ''অপারেশন বর্গা'' চরম পরিণতি ডেকে আনে। এর প্রভাব পরে সাধারণ রাজবংশী শ্রেণীর উপর। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজবংশী সমাজের চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এই সমস্যাকে অগ্নিগর্ভে নিয়ে এসেছে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের একাংশ কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি দাবি করে — পৃথক কামতাপুর রাজ্যগঠনের আওয়াজ তুলে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে রাজবংশী সমাজের একাংশ ১৯৬৯ খ্রীঃ *উত্তরখন্ড দল*, ১৯৭৯ খ্রিঃ *উতজাআস দল* এবং ১৯৮৭ খ্রিঃ *কামতাপুর পিপলস পার্টি* (K.P.P.) গঠন করে পৃথক ভাষা স্বীকৃতি ও পৃথক রাজ্যগঠনের প্রবণতা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে উতজাআস দল যদিও পৃথক রাজ্যগঠনের দাবী না করে স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেছেন। আলোচনার অন্তিম লগ্নে একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে — রাজবংশী সমাজ ১৮৯১-১৯২৩ খ্রিঃ-র মধ্যে বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সমাজের ক্ষত্রিত্বের দাবী স্বীকৃত

করতে পেরেছে, সেই সমাজ আজ আত্মপরিচয় সংকটের মুখে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্নজাগে 'কামতাপুরী' পরিচয় বোধ হয় ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দিবে?

একটি বিলুপ্তপ্রায় পথ

শ্রী শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য

হুগলী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ঔপনিবেশিক জনপদগুলি গড়ে ওঠার পূর্বে এগুলির চরিত্র কেমন ছিল আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ধারায় তা উপেক্ষিত। বিক্ষিপ্তভাবে বিরল কিছু মনোযোগী প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে যখন সাধারণভাবে এতদঞ্চলের প্রাক্-ঔপনিবেশিক জীবনধারার প্রতি আলোক ফেলার ঔৎসুক্য গবেষকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, তার মধ্যে কষ্টকল্পনা ও অতিরঞ্জনই প্রাধান্য পেয়েছে। হুগলী নদীর পশ্চিম প্রান্তের একটি প্রাচীন পথ কিভাবে এধরনের কল্পিত ইতিহাসচর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, তা এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

অধ্যাপক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভদ্রেশ্বর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত'[১] গ্রন্থে একটি সুপ্রাচীন পথের উল্লেখ করেছেন যা চন্দননগরের প্রান্ত সীমা ঘেঁষে চলে গিয়েছিল। এটি দ্বারিক জাঙ্গাল। আলোচ্য দ্বারিকজাঙ্গাল-ই 'চৈতন্যপথ' বা 'Pilgrim's Track' ছিল কিনা তা ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে গঙ্গার পশ্চিম কুলের পথ ধরে ছত্রভোগ যান সে সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

সেই তথ্য হতে বোঝা যায় দ্বিতীয়বার পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে ভক্তবৎসল চৈতন্যদেব বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ঘাটের ধ্রুবানন্দের আশ্রম হতে ভক্ত কমলাকর পিপলাই এর মাহেশ হয়ে কোতরং রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে আসেন। পরে ভদ্রকালী শালিখা হয়ে আদিগঙ্গার তীর ধরে ছত্রভোগে আসেন।

চৈতন্যের সঙ্গে রামচন্দ্র খানের যে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন সেই সাক্ষাত দ্বিতীয়বার নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘটেনি। কাটোয়ায় সন্ন্যাস নিয়ে শান্তিপুর থেকে যখন প্রথম তিনি নীলাচলে যান। তখন ছত্রভোগে এই সাক্ষাত হয়েছিল। যেটি উত্তরপাড়ার কোতরং অঞ্চল নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্তগর্ত 'আটিসারা' (বর্তমান আটঘরা) পেরিয়ে জয়নগর - মজিলপুর থেকে প্রায় ৭৪ কিমি দক্ষিণের এই স্থান থেকেই তিনি গঙ্গা পেরিয়ে নীলাচলের পথে যান। রামচন্দ্র খানের পূজিতা দেবী ভদ্রকালীর মনসা নয় খাড়ি মন্ডলের ত্রিপুরাসুন্দরী।

অবশ্য চৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্য অনুসারে-ই বলা যেতে পারে যে চৈতন্য প্রথমবার প্রসিদ্ধ পথ ধরে নীলাচলে পৌছাননি। কারণ এ সময় হোসেন শাহের সঙ্গে ওড়িশার

রাজা প্রতাপরুদ্রের লড়াই চলছে। চৈতন্য ভাগবতের মনোগ্রাহী বর্ণনা অনুযায়ী এই পথ তখন গুপ্তচরে পূর্ণ। রাজশক্তির উপস্থিতি জানাচ্ছে পথে প্রোথিত ত্রিশূল। রামচন্দ্র খানের ব্যবস্থাপনায় অম্বুলিঙ্গ ঘাট থেকে নৌকাযোগে গঙ্গা অতিক্রম করে বর্তমান মেদিনীপুরে কুলপীর কাছাকাছি কোনো স্থানে তিনি তদানীন্তন ওড়িশা প্রদেশে প্রবেশ করেছিলেন। এ পথের সঙ্গে শ্রী-বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নিত দ্বারিক জাঙ্গালের কোনো সংস্রব নেই। আর কষ্টকল্পনা দ্বারা চৈতন্যের সঙ্গে এই সংস্রব আবিষ্কৃত হলে-ও চৈতন্যজীবনীগুলির সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা চলে দ্বারিক জাঙ্গাল তাহলে প্রসিদ্ধ পথ ছিল না।

ফা-হিয়েন যখন ভারতবর্ষে আসেন (৩৯৯ খ্রিঃ - ৪১৪খ্রিঃ) তখন গাঙ্গেয় সমভূমির রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র পাটলীপুত্র থেকে মথুরায় সরে এসেছে। দোয়াব অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ মথুরার এই ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিল। মথুরার তুলনায় পাটলীপুত্র নিষ্প্রভ। মথুরা থেকে কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি চম্পার (বর্তমান ভাগলপুর) রাজধানীতে আসেন। চম্পা থেকে তিনি তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হন। চম্পা থেকে তাম্রলিপ্তিতে আসার পথটি বিতর্কিত।

- যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের অনুবাদেও পাওয়া যায়। গঙ্গার গতি লক্ষ্য করিয়া এবং পূর্বদিকে অষ্টাদশ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া ফা-হিয়েন গঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরে চম্পা নামক সুবৃহৎ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বদিকে প্রায় আরও পঞ্চাশ যোজন পথ অগ্রসর হইয়া তিনি তাম্রলিপ্তি নামক বন্দর যে দেশের রাজধানী তথায় উপনীত হন। (প্রাচীন ভারত, চৈনিক পর্যটক, প্রথম খন্ড - যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার)

ফা-হিয়েন স্থলপথে আদৌ এসেছিলেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সিস্টার নিবেদিতার দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য হল তিনি জলপথেই এসেছিলেন।

দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীন পথ হিসাবে "দ্বারিকজাঙ্গাল" — এর উল্লেখ আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। কালিদাস দত্ত[১] এবং পরবর্তীকালে গবেষক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়[২] দক্ষিণবঙ্গের খাড়িমন্ডলে এ ধরনের পথের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় ঘাটাল মহকুমায় দ্বারিক জাঙ্গালের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন মৃগাঙ্কনাথ রায় । প্রণব রায়[৩] তাঁর একাধিক রচনায় ঘাটাল অঞ্চলে এমন একটি পথের উল্লেখ করেছেন। আবার এ পথকে ঘিরে কল্পনার যথেচ্ছাচারও ঘটেছে কম নয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে চন্দননগরে দশভূজা সাহিত্য মন্দিরে পঠিত একটি প্রবন্ধ" (যেখানে হরিহর শেঠের মত ইতিহাস গবেষক গুণীজন উপস্থিত) তার সাক্ষ্য বহন করে। দশভুজা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রাচীন মজুমদার পরিবারের

জমিদারী প্রাপ্তি ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনায় এই পথ ধরে মানসিংহের বিজয়াভিযানের কাহিনী — জানানো হয়।

সপ্তগ্রাম থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত এই সুবিস্তৃত রাজপথটির কোন চিহ্নই ফান-ডেন ব্রোকের মানচিত্রে দেখা যায় না, যদিও উক্ত অভিযানের সত্তর বছরের মধ্যেই এই মানচিত্র অঙ্কিত হয়। সত্তর বছরে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ বিলুপ্তির কোনো কারণ পাওয়া ও কঠিন; কারণ জাহাঙ্গীরের সময় দক্ষিণবঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়। আর যে পথ জনপদের বাইরেও রয়ে গেছে, সেই পথের উন্নতি সাধনের জন্যও জাহাঙ্গীর সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন।

এছাড়া টোডরমলের'' আইন-ই-আকবরীর বর্ণনা অনুযায়ী সপ্তগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকার হিসাবে চিহ্নিত ছিল। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী এই পথ আর্শাদ তোয়ালী ও বালিয়াড় ও সংলগ্ন বালিয়া পরগণার মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছিল। এমন দুই গুরুত্বপূর্ণ পরগণার মধ্য দিয়ে (আর্শা ও সপ্তগ্রাম এই দুই মহলের একত্র আয় ছিল দু লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশো নব্বই দাম ও বালিয়া পরগণার রাজস্বে আয় ছিল চুরানব্বই হাজার সাতশো পঁচিশ দাম) প্রসারিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথটির এত অল্প সময়ে অবলুপ্তির কোনো কারণই ছিল না, যদি না সে সময় উক্ত পথ আদৌ গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে থাকে।

কুতলু খাঁ-এর সঙ্গে মানসিংহ-এর সংগ্রাম ও তার ফলাফলের বিবরণটি অনৈতিকহাসিক। মানসিংহ কুতলু খাঁ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন ভাগলপুর, বর্ধমান, জাহানাবাদ হয়ে। এই সংগ্রামে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের পরাজয় ঘটে। কুতলু খাঁ-এর আকস্মিক মৃত্যু মুঘলদের পক্ষে ভারসাম্য পরিবর্তনে সহায়তা করে।

এখানে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র এবং ইতিহাস সম্মত তথ্যর সঙ্গে সম্পর্কহীন ঘটনা ও একটি কল্পিত সমরপথ এক চমৎকার কল্পকাহিনীর কাঠামো রচনা করেছে। মানসিংহের সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারীর যে মিথ মুঘল যুগের বিভিন্ন জমিদার পরিবারের উত্থানের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে (কৃষ্ণনগরে ভবানন্দ মজুমদারের জমিদারী লাভ, সুতানুটীতে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের জমিদারী লাভ) তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পথের মিথ। ঐতিহাসিক সত্য এভাবেই কল্পনার কানাগলিতে পথ হারায়।

কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাস

মানস প্রতিম দাস

যুগে যুগে একজন মানুষ আর একজনকে বা বহুজনকে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য যতরকম প্রযুক্তিগত কৌশল বা উপায় গ্রহণ করেছে, তার সবগুলোকেই সূচিত করতে পারে এই তথ্যপ্রযুক্তি শব্দটা। কিন্তু এটা অনেকেই জানেন, মূলতঃ বিংশ শতাব্দীতে কম্পিউটার বা কম্পিউটার চালিত ব্যবস্থা নির্ভর তথ্য আদান-প্রদান বা বিশ্লেষণ-কে বোঝাতেই 'তথ্যপ্রযুক্তি' শব্দটা ব্যবহৃত হয়। বলে নেওয়া ভাল, বহুক্ষেত্রে বাংলায় কম্পিউটার-কে 'যন্ত্রগণক' বলা হলেও এখানে তা ব্যবহৃত হচ্ছে না যেহেতু যন্ত্রগণক শব্দটা 'ক্যালকুলেটর'-কেও বোঝাতে পারে যা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে সক্ষম কিন্তু কম্পিউটারের তুলনায় প্রযুক্তিগতভাবে অনেক নীচু স্তরের। এখানে অতএব 'কম্পিউটার' শব্দটাই ব্যবহৃত হবে আর কম্পিউটার-কেন্দ্রিক তথ্যব্যবস্থাকেই তথ্যপ্রযুক্তি বলা হবে।

এবারে কলকাতার প্রসঙ্গ। কেন কলকাতা? কারণ, পূর্ব ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি-র প্রথম স্বাদ পায় এই শহর। এই শহর থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি-র বহু বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছেন যারা পরবর্তীকালে দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ বা ব্যাঙ্গালোর তথ্যপ্রযুক্তি-র উন্নয়ন ও প্রয়োগে কলকাতার তুলনায় এগিয়ে যায় নানা কারণে। ফলে এই ক্ষেত্রে কলকাতা শহর পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত হতে থাকে। তার এই অ-গৌরব পুরনো গৌরব-কে আড়াল করে দেয়। কলকাতাবাসী বা কলকাতামুখী মানুষ বিস্মৃত হয় সেই গৌরবের কাহিনী। আরও একটি কারণে কলকাতা শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে কর্মচ্যুত মানুষের তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের প্রথম প্রবল জোয়ার লক্ষ্য করা যায় এই শহরেরই। সে আন্দোলন-কে বহু বিশেষজ্ঞ উন্নয়নের অন্তরায় বলে চিহ্নিত করলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য-কে অস্বীকার করা যায় না।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব

পরাধীন ভারতবর্ষে পরাধীনতার যাবতীয় অসুবিধে নিয়েও বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োগে কলকাতা যে অগ্রণী ছিল, তা নিয়ে নতুন করে জানানোর কিছু নেই। প্রফুল্ল

চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি বিজ্ঞানী সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করেছিলেন তাঁদের সাধনায়। এঁদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রকে বিকশিত করেছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ। তিরিশের দশকে তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে (ISI) প্রথম মেকানিক্যাল ডেস্ক ক্যালকুলেটর ব্যবহৃত হয়।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এদেশে প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জাম আমদানির উপর বিধিনিষেধ জারি হয়। কিন্তু ততদিনে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ক্যালকুলেটর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই নিজেদের প্রয়োজন তাঁরা নিজেরাই তৈরি করলেন একই ধরনের একটি (prototype) ডেস্ক ক্যালকুলেটর।[২] এখানেই থেমে না থেকে তাঁরা এই ক্যালকুলেটরের ঢালাও উৎপাদন শুরু করে দিলেন তাঁদের ওয়ার্কশপে। লক্ষ্য নিশ্চয়ই ছিল বাণিজ্য। একইভাবে ইনস্টিটিউট অন্য যে কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আগে পাঞ্চ কার্ড মেশিন ব্যবহার শুরু করেছিল। এছাড়াও তারা তাদের নিজস্ব মডেলের ইলেকট্রনিক সর্টার মেশিনও তৈরি করেছিল। মোট কুড়িটি মেশিন তৈরি হয়েছিল যার মধ্যে দশটি দেওয়া হয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে, তাদের ব্যবহারের জন্য।[৩] এই যে বিরাট পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার (ISI) -তে শুরু হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিল তাদের কাজের ধারা। বলা প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহের তাগিদ এবং সেই তথ্যকে অর্থবহ তালিকায় সংবদ্ধ করা ISI-র মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই লক্ষ্যপূরণে সফল হতে তারা বেশি বেশি করে যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাধীনতা লাভের আগে কলকাতার অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের নমুনা দেখাতে পারেনি।

স্বাধীনতার পরে

ISI একইভাবে তাদের অগ্রগতি বজায় রাখল। ১৯৫০ সালে সেখানে ইলেকট্রনিক্স বিভাগ স্থাপিত হয়।[৪] ১৯৫৩-তে এই বিভাগে অধ্যাপক সমর কুমার মিত্রের তত্ত্বাবধানে একটা ছোট অ্যানালগ কম্পিউটার তৈরি করা হয়।[৫] সে সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু কলকাতায় এলে অধ্যাপক মহলানবীশ ও অধ্যাপক মিত্র তাঁকে এই কম্পিউটার দেখান। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় স্থান পায় এই ছবি।[৬] বলা দরকার যে, এই কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কর্মকান্ডের সময় ফেলে দেওয়া উপাদান থেকে। এই কম্পিউটার দশটা অজানা রাশি আছে এমন সাধারণ সমীকরণ (linear equation) সমাধান করতে পারত।[৭]

এর পরবর্তীকালে ISI উদ্যোগ নিল বিদেশ থেকে ডিজিট্যাল কম্পিউটার আনার।[৮] ব্রিটেনের ব্রিটিশ ট্যাবুলেটিং মেশিন্‌স বা বি.টি.এম. এর কাছ থেকে Hollerith Electronic

Digital Computer 2M, সংক্ষেপে HEC-2M কম্পিউটার কেনার কথা স্থির করে প্রতিষ্ঠান।[৯] কোম্পানী-টি এই কম্পিউটার বিক্রি করতে রাজি হলেও ভারতে সেটা বসাতে বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে রাজি হল না। ISI তখন নিজেদের দু'জন ইঞ্জিনীয়ারকে ১৯৫৪-র ডিসেম্বরে ব্রিটেনে পাঠাল সেই কম্পিউটার সম্পর্কে ট্রেনিং নিতে। এঁরা হলেন অমরেশ রায় ও মোহি মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৫-র জানুয়ারি থেকে জুন, এই ছ'মাস ধরে তৈরি হল সেই কম্পিউটার। আজ আমরা যারা কয়েক ঘন্টায় পার্সোনাল কম্পিউটার যন্ত্রাংশ জুড়ে তৈরি করা দেখে অভ্যস্ত, তারা ঐ সময়ে কম্পিউটার তৈরিতে ছ'মাস লাগার ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারব না। দুই ইঞ্জিনীয়ার জুনেই ফিরে এলেন এবং জুলাইতে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ এসে পৌঁছল ভারতে। সবকিছু জুড়ে নিয়ে কাজ শুরু হল ১৯৫৫-র অগাস্টে। এই নতুন মেশিন চালানো সহজ ছিল না। তাছাড়া কোম্পানি যন্ত্রের ম্যানুয়াল বলতে ছাপা অক্ষরে যা দিয়েছিল তা ছিল নেহাৎই অপ্রতুল। ট্রেনিং পাওয়া দুই ইঞ্জিনীয়ার তখন নিজেরাই ম্যানুয়াল তৈরি করতে লেগে গেলেন এবং তা তৈরিও হল। সেটা ব্যবহার করে ISI -এর প্রায় জনা বারো কর্মী HEC-2M মেশিন ব্যবহার করা শিখল। এই মেশিনে নিজেদের কাজ ছাড়াও বাইরের কাজও করে দিত ISI। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের বিজ্ঞানীরাও তাদের কাজ করাতে আসতেন ISI-তে।[১০]

১৯৫৯-এর শেষ নাগাদ সোভিয়েত রাশিয়া থেকে URAL-1 নামে আর একটা কম্পিউটার আসে ISI-তে।[১১] এটা সম্ভবতঃ সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বন্ধুত্বের উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন অধ্যাপক মহলানবীশ। সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক মহলানবীশের ছাত্র, অধ্যাপক দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার। এই কম্পিউটারের ক্ষমতা ছিল HEC-2M-এর তুলনায় অনেক বেশি। ফলে, তুলনামূলকভাবে বড় মাপের কাজ URAL-1 দিয়েই হত। ISI-তে এই সময় থেকে কম্পিউটার যথাযথ ব্যবহার করাবার জন্য দক্ষ যন্ত্রবিদ তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৬১-তে দু'বছরের একটা ট্রেনিং কোর্স চালু হয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দশ। প্রত্যেকেই ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স -এর অনার্স গ্র্যাজুয়েট। কোন কারণে প্রথমবারের পর আর শিক্ষার্থী নেওয়া হয়নি, কোর্স-ও চলেনি। তবে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী-রা প্রত্যেকেই আজ তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।[১২]

এরপর ISI-এর কাজের ধারায় যুক্ত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তবে তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে 'Radio Physics and Electronics' অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ব্যাপারে

কলকাতা ছিল ভারতে প্রথম। অবশ্য, তৎকালীন চালু পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নতুন পাঠ্যক্রমের নাম দেওয়া হয় 'Wireless'[১৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেডিও তরঙ্গের ব্যাপক প্রয়োগ এবং ইলেকট্রনিক্সের উন্নতি যে দিগন্তের সূচনা করল তাকে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্তরের পাঠ্যক্রমের একটা ছোট অংশে বর্ণনা করা সম্ভব হল না। এক্ষেত্রে আশু বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৪৬এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্রের প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রস্তাব তখনই কার্যকরী হল না। অর্থের আয়োজন এবং আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোগত খুঁটিনাটি ঠিক করে নিয়ে তৈরি হল একটা নতুন বিভাগ। নাম দেওয়া হল — Institute of Radio Physics and Electronics. সালটা ছিল ১৯৪৯।[১৪] ১৯৫৫ সালে এই বিভাগেই পরিকল্পনা করা হল এক ইলেকট্রনিক অ্যানালগ কম্পিউটার তৈরি করার। উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে দেশে লভ্য যন্ত্রাংশ। ১৯৫৬ সালে অর্থাৎ পরের বছর এই পরিকল্পনা রূপায়িত হল।[১৫] সেই সময় থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই কম্পিউটার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগ তথা অন্য প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন মিটিয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ ইনস্টিটিউট-এ এল IBM-1130 মডেলের কম্পিউটার। ১৯৭১-এ তৈরি হল University Computer Centre.[১৬] IBM কম্পিউটার শুধুমাত্র সে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজন ব্যবহার করতেন তাই নয়, বাইরের প্রতিষ্ঠান যেমন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জোকা-র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি থেকে লোকজন এসে কাজ করতেন এখানে। এদের জন্য ভাড়া ধার্য ছিল ঘন্টায় একশো পঁচিশ টাকা। পূজোর চার-পাঁচদিন ছাড়া সারা বছর খোলা থাকত কম্পিউটার সেন্টার পাঁচ ছয় বছরে সেন্টার কম্পিউটারের ভাড়া থেকে আয় করেছিল বাইশ লাখ টাকা।[১৭] ১৯৮০ সালে তৈরি হল Computer Science বিভাগ। University Computer Centre সেখানে মিশে গেল। ১৯৮০তে বি. টেক. এবং এম. টেক. একই সঙ্গে শুরু হল। ১৯৮৩ তে ভারতবর্ষের প্রথম কম্পিউটার সায়েন্স-এ বি.টেক. ব্যাচ পাশ করে বেরিয়ে এল[১৮] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Radio Physics and Electronics -এ বা Computer Science বিভাগ-এ কম্পিউটার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যার নাম উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হলেন অধ্যাপক অরুণ কুমার চৌধুরী। অনন্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। এদিকে, Computer Centre -এর IBM কম্পিউটার বহু মানুষের প্রয়োজন মেটালেও একসময় তার প্রয়োজন ফুরোল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে Regional Computer Centre (RCC) -এ উন্নততর কম্পিউটার বসে যাওয়ায় ব্যবহারকারীরা চলে যেতে শুরু করে সেখানে। তবে RCC-র কথা পরে।

যৌথ উদ্যোগ ঃ অভিনব প্রকল্প

১৯৬১-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (JU)-এর সঙ্গে যৌথভাবে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI) একটি ট্র্যানজিস্টর ভিত্তিক ডিজিট্যাল কম্পিউটার তৈরির প্রকল্প নেয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে প্রকল্পের নাম হয় ISIJU-1.[১৯] এই প্রকল্পের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে প্রফেসর ফন নিউম্যান -এর সহকারী প্রফেসর এন. সি. মেট্রোপলিস আমেরিকা থেকে চার সপ্তাহের জন্য কলকাতায় আসেন। যেহেতু ইঞ্জিনীয়ারিং এর ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তখন প্রতিষ্ঠিত, তাই যাদবপুরেই ISIJU-1-এর কাজ চলে। ১৯৬৬ নাগাদ এটির কাজ শেষ হয়। কয়েকটা কথা এখানে ISIJU-1 সম্পর্কে বলা দরকার।[২০] দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে কম্পিউটার তৈরি করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প নিঃসন্দেহে ছিল অগ্রগণ্য। এখানে যেসব ছাত্র বা শিক্ষক কাজ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে নাম করেছিলেন। কিন্তু অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী, যেহেতু এদেশে বেসরকারী কোম্পানী-র মত পরিশ্রম ও মনযোগ দিয়ে প্রকল্পের কাজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করা হয় না, তাই ISIJU-1 কখনই খুব উন্নতমানের কম্পিউটার গড়ে তুলতে পারেনি। এই প্রকল্পের কনিষ্ঠতম সদস্য মোহিত রায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, এই কম্পিউটারের জন্য প্রোগ্রাম লেখা ছিল এক ঝক্কির ব্যাপার। প্রায়শই মেশিন খারাপ হয়ে যেত। অনেক সময় প্রোগ্রাম কাজও করত না। মেশিনের কলকব্জা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা মানতেই চাইতেন না যে যান্ত্রিক কোন ত্রুটি মেশিনে রয়েছে। তখন একেবারে নির্দিষ্ট করতে হত, ত্রুটিটা কোথায়, এসব সত্ত্বেও ISIJU-1 ভারতের কম্পিউটার নির্মাণের ইতিহাসে ছিল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর মধ্যে যে জিনিসটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যা আর কোনও কম্পিউটারে ছিল না, তা হল সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট অ্যারিথমেটিক। ১৯৬৬ সালে প্রকল্পটা কিন্তু একটু তাড়াহুড়ো করেই শেষ করা হয়েছিল।[২১] তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলা-র উপস্থিতিতে মেশিনের উদ্বোধন হয়। তিনি প্রকল্পের স্থানে প্রবেশ করলে মেশিন থেকে তাঁর ছবি ছাপিয়ে বের করা হয়। কিন্তু যেমন মোহিত রায় বলেছেন, ISIJU-1 প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দক্ষ ছিল না। এদিকে এই প্রকল্পের শেষে রিভিউ কমিটি রায় দিল যে, কম্পিউটার তৈরি করা ISI-এর কাজের মধ্যে পড়ে না।[২২] ফলে কেড়ে নেওয়া হল কিছু মেধাবী বিজ্ঞানীর কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার প্রযুক্তি চর্চার অধিকার। ISI-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর জয়ন্ত কুমার ঘোষ কিংবা অধ্যাপক দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার-এর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁরা রিভিউ কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আক্ষেপ লুকিয়ে রাখেননি।

ISIJU-র পরে

ISIJU-1 প্রকল্পের কম্পিউটার উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই মাঝে মাঝে বিগড়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে বিদেশ থেকে যারা উন্নত এবং ব্যবহারের পক্ষে সহজ কম্পিউটারের ভাষা শিখে এসেছেন (যেমন - FORTRAN), তাঁরা আর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ (মেশিন সরাসরি বুঝতে পারে কিন্তু লেখার পক্ষে অত্যন্ত জটিল ভাষা) নিয়ে কাজ করতে চাইছিলেন না। এখন, FORTRAN দিয়ে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম লিখতে গেলে ঐ ভাষা মেশিনকে বোঝাতে পারে এমন একটা দোভাষী বা প্রযুক্তির পরিভাষার কম্পাইলার তৈরি করা দরকার। কিন্তু যে মেশিন আধঘন্টা অন্তর খারাপ হয়ে যায় তাতে আর কী তৈরি করা যায়! তাই একসময় ঐ মেশিন পরিত্যক্ত হল। এবার যাদবপুরে শুরু হল নতুন অসুবিধে। একটা বিভাগ রয়েছে অথচ কম্পিউটার নেই, কী করবেন শিক্ষক-গবেষকরা? অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতে হত তাঁদের। অনেক দিন তাঁরা কাকভোরে বেরিয়ে ট্রেন ধরে ছাত্রদের নিয়ে যেতেন খড়্গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (IIT), ফিরতেন রাতে।[২৩] কলকাতাতেও কম্পিউটার ব্যবহারের একটা ব্যবস্থা হল অধ্যাপক বিশ্বজিৎ নাগের দৌত্যে।

অধ্যাপক নাগের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি ধর্মতলার কাছে ইউনিয়ন কার্বাইড এর অফিসে IBM—১৪০১ কম্পিউটারে কাজ করার একটা ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সময় পাওয়া যাবে কোম্পানির সুবিধে অনুযায়ী। তারা সময় দিল রাত দশটায়। ছাত্র, এমনকি ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকরা কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল করতে যেতেন রাত্রি দশটাতেই। কাজ চলত রাত দেড়টা পর্যন্ত। কিন্তু সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সেই সময়টাতে কলকাতার পরিস্থিতি খুব সুখকর ছিল না। তাই বিশেষ করে ছাত্রীদের নিয়ে অত রাতে ফিরতে শিক্ষকরা ভয় পেতেন। কোন কোন সময় বড় কাজ থাকলে মাদ্রাজে IIT-তে গিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেখানকার IBM-৩৭০ কম্পিউটারে কাজ করে দিন পনেরো পরে ফিরে আসতেন। এমত অবস্থায় প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্রের।[২৪] এই প্রয়োজনীয়তা থেকে ১৯৭৬-এ তৈরি হল Regional Computer Centre বা R.C.C.[২৫] এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কম্পিউটারের প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু একই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কম্পিউটারে কাজ করতে শুরু করে, এই প্রতিষ্ঠানে। রাজ্য সরকারের কিছু বিভাগও এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ঠিক এখানেই কিন্তু RCC সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে। শুধুমাত্র ব্যবহারকারী সংস্থার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েই সে সময় RCC সন্তুষ্ট ছিল।

প্রজেক্ট ইত্যাদি করে এই সংস্থা স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেনি।[২৬] অবশ্য সাম্প্রতিককালে এ অভিযোগ থেকে তারা অনেকটাই মুক্ত। ২০০১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর থেকে RCC-র কর্তৃত্ব হস্তান্তর হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি অধিগ্রহণ করেছে ভারত সরকারের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন DOEACC সোসাইটি।[২৭]

সামাজিক প্রতিক্রিয়া

এর পরবর্তী সময়ে কলকাতার গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তির কাজ এগিয়েছে তার বর্ণনার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই স্বল্প পরিসরে, সামাজিক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা। বিশ্বের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে দেরিতে। ফলত সত্তরের দশকের গোড়ায় এসে দেখা গেল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিয়াত্তর হাজারের বেশি কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, জাপানে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজারের মত কম্পিউটার সেখানে ভারতে সক্রিয় কম্পিউটারের মোট সংখ্যা দেড়শোও ছাড়ায়নি।[২৮] ১৯৭১-এর অগাস্ট মাসে ভারতে কাজ করছিল মাত্র একশো চল্লিশটি কম্পিউটার। এর মধ্যে চোদ্দটি কম্পিউটার ছিল কলকাতায়।[২৯] এইসব কম্পিউটারের একটা বড় অংশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। সরকারী দপ্তর ও শিল্প প্রতিষ্ঠানেও কিছু কম্পিউটার কাজ করছিল। এই সব কম্পিউটারের কাজের ফলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তরে কিছু সুবিধে বা কাজের অগ্রগতি হলেও ব্যাপক অর্থে সমাজের নাগরিকরা তার দ্বারা প্রভাবিত হননি। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রথম ঢেউ এল ১৯৬৩ সালে। ওই বছর ভারতের জীবন বীমা নিগমের পরিচালন কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেয় অফিসের কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের।[৩০] এই সিদ্ধান্তে নড়ে চড়ে বসল অল ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন। শুরু হল সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন।[৩১] তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল কলকাতাতেও। এদিকে বীমা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও কম্পিউটার বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার ফলে চাকরি যেতে থাকল কর্মচারীদের। তেল কোম্পানীগুলো এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসো স্ট্যান্ডার্ড, ক্যালটেক্স ইন্ডিয়া প্রভৃতি কোম্পানির কলকাতায় স্থিত দপ্তর থেকে হিসাবরক্ষণের কাজ বম্বে-তে অবস্থিত কম্পিউটারে স্থানান্তরিত হওয়ায় বেকার হলেন বহু কর্মী। এদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে সংগঠিত হল। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে একটা যৌথ কমিটি গড়া হল।[৩২] এখানে বাইশটি শিল্প ইউনিয়ন ছাড়াও অংশ নিল বি. পি. টি. ইউ.সি., ইউ টি. ইউ. সি., পি অ্যান্ড টি ফেডারেশন। এই যৌথ কমিটি ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনের আয়োজন করে। এখান থেকে গৃহীত হয় আন্দোলনের

কর্মসূচী।[৩৩] অবশ্য, এর আগে, ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর কম্পিউটার বসানো বা অটোমেশনের বিরুদ্ধে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে নতুন দিল্লীতে। সেখানে কম্পিউটার আসার ফলে কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারকে অটোমেশনের পথ থেকে সরে আসার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলোকে আন্দোলন সংগঠিত করতে বলা হয়েছে।[৩৪] ১৯৬৬-র পুজোর ছুটির সময় কলকাতায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। পুজোর ছুটির সুযোগ নিয়ে ক্যালটেক্স কোম্পানির কলকাতা অফিস পুরোপুরি স্থানান্তরিত হল বম্বে-তে। সেখানে তখন বসে গেছে কম্পিউটার। অফিসের ফাঁকা মেঝেতে বসে আন্দোলন শুরু করলেন ক্যালটেক্স-এর কলকাতা অফিসের কর্মীরা। এই ধর্না চলেছিল চৌত্রিশ দিন ধরে।[৩৫] এদিকে, পঁচিশে নভেম্বর জীবন বীমা নিগমের কর্মচারীরা অটোমেশনের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় স্ট্রাইকের আয়োজন করে।[৩৬]

কলকাতার বুকে এরপরেও চলল জোরকদমে আন্দোলন। এর মধ্যে বোধহয় ILACO বিল্ডিং-এ কম্পিউটার বসানোর বিরুদ্ধে জীবন বীমা নিগমের কর্মচারীদের আন্দোলন সব থেকে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিনের এই অবরোধ আন্দোলন সাফল্যমন্ডিত হয় যখন ১৯৬৯ এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা যুক্তফ্রন্ট সরকার ILACO বিল্ডিং-এ কম্পিউটার বসানোর বিরুদ্ধে তাদের রায় দেয়।[৩৭]

ব্যাঙ্ক শিল্পেও এহেন আন্দোলনের ঘনঘটা চলেছিল। মূলত সবকটি ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন কম্পিউটার বসানোর ফলে যেন কর্মচ্যুতি না ঘটে তার দাবী তুলেছিল। অবশ্য অন্যান্য ইউনিয়নের সঙ্গে এখানে All India Bank Employees Association এর একটা পার্থক্য ছিল। এই অ্যাসোসিয়েশন কর্মচ্যুতির কথা তুললেও সাধারণভাবে কম্পিউটার নির্ভর প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল।[৩৮] যাই হোক, ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে Mechanisation বা যান্ত্রিকীকরণ-কে ঘিরে প্রথম সর্বভারতীয় চুক্তি হয়। এর পর এহেন অনেক চুক্তি হয় যেখানে ইউনিয়নগুলো যান্ত্রিকীকরণ-কে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে বা পাল্লা দিয়ে কর্মীদের জন্য সুবিধে আদায় করে নিয়েছে পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কগুলোতে কম্পিউটার বসানোর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয় মূলত Bank Employees Federation of India, পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে।[৩৯] ১৯৮৫তে হংকং ব্যাঙ্ক, ১৯৮৭-তে Clearing House-এর আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এই বিরোধিতার মনোভাব শেষ হয় নব্বই -এর দশকের শুরুতে। ১৯৯৩ -এর অক্টোবরে এই সংগঠন জাতীয় স্তরে চুক্তি করে কম্পিউটার বসানোর পক্ষে সায় দেয়।

সরকারী উদ্যোগ

কলকাতায় তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগও লক্ষ্য করা গেল এই নব্বই-এর দশকের শেষ থেকে। এখানে সরকারী বলতে রাজ্য সরকার বোঝানো হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য এক টাস্ক ফোর্স গঠন করে সরকার। সেই ফোর্সের সুপারিশ-কে সামনে রেখে ২০০০ সালের পয়লা জানুয়ারি ঘোষিত হয় State Information Technology (IT) Policy[৪০] নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে যায় রাজ্য সরকার যখন ২০০২ সালের ২০শে অগাস্ট ঘোষিত হয় পরিষেবা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি। এর নাম দেওয়া হয় West Bengal's New Policy on IT-Enabled Services।[৪১] এই সব নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা তার রাজধানী কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। কলকাতা ও তার আশেপাশে বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যেমন তথ্যপ্রযুক্তির পাঠ্যক্রমে ছাত্রছাত্রী-রা পড়াশোনা করতে থাকে প্রভূত সংখ্যায় তেমনি কলকাতার পূর্ব সীমানায় সল্ট লেক-এ গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন পরিকাঠামো। এখানে অফিস খোলে দেশ-বিদেশের নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। ২০০৩ সালের নভেম্বর BW-Nasscom Infocom 2003-এর মত এক বড় তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়।[৪২] এই সম্মেলনের ব্যাপকতা বুঝিয়ে দেয়, তথ্যপ্রযুক্তি-র ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করতে চলেছে কলকাতা। সারা বিশ্ব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছে কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাবনার দিকে। উদয় হচ্ছে নতুন সূর্যে-র, কলকাতাকে গৌরবে মণ্ডিত করতে।

সূত্র-নির্দেশ

১। Dutta Majumder, D. 1996, Thoughts on Emergence of IT Activities in India. **Computer Education in India – Past, Present and Future** (The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers) P. 3-4.

২। ঐ

৩। ঐ

৪। ঐ

৫। Brief History of the Institute, 1998-99. Sixty Seventh Annual Report : 1998-99 (Indian Statistical Institute).

৬। অধ্যাপক দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ২০/২/২০০০

৭। Dutta Majumder, D. 1996, পূর্বে উল্লিখিত

৮। ঐ
৯। ঐ
১০। অধ্যাপক দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ২০/২/২০০০
১১। Dutta Majumder. D. 1996. পূর্বে উল্লিখিত
১২। ঐ
১৩। Sen, S N. 1974. Foreword Institute of Radio Physics and Electronics. Silver Jubilee 1949-1974.
১৪। Bhar, J. N., 1974. Looking Back. Institute of Radio Physics and Electronics, Silver Jubliee, 1949-1974, P-12.
১৫। ঐ P.19
১৬। ঐ
১৭। অধ্যাপক শুভাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, -এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১৭/২/০৪
১৮। ঐ
১৯। Dutta Majumder. D. 1996, পূর্বে উল্লিখিত P.5
২০। ঐ
২১। অধ্যাপক মোহিত রায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১২/৮/২০০০
২২। অধ্যাপক দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পূর্বে উল্লিখিত
২৩। অধ্যাপক মোহিত রায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পূর্বে উল্লিখিত
২৪। ঐ
২৫। Organization Profile. 2000, Regional Computer Centre. Calcutta.
২৬। অধ্যাপক মোহিত রায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পূর্বে উল্লিখিত
২৭। ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ০৮/২/০৪
২৮। Report of the Committee on Automation, 1972. Government of India. Ministry of Labour and Rehabilitation P 154.
২৯। ঐ P 23-24
৩০। ঐ P. 2
৩১। Bose, Chandra Sekhar. 1978 A short history of the all India Insurance Employees' Association P. 99-104.
৩২। Bose. Shanti Shekhar, 1999. Souvenir, Union Bank of India. Ezra Street Branch. Kolkata.
৩৩। ঐ
৩৪। Bose. Chandra Sekhar. 1978 পূর্বে উল্লিখিত

৩৫। ঐ

৩৬। ঐ

৩৭। ঐ

৩৮। রাজেন নাগর, General Secretary. Bengal Provincial Bank Employees' Association. এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার. কলকাতা, ১৮/২/০৪

৩৯। প্রদীপ বিশ্বাস, General Secretary. Bank Employees Federation of India. West Bengal-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১০/১১/২০০০

৪০। Information Technology Policy. West Bengal. 2000. Published by Government of West Bengal.

৪১। New Policy on IT-Enabled Services. August 2002. Published by Government of West Bengal.

৪২। Singh, Shelly, December 2003. East in a new orbit, Businessworld

'ত্রিদিবা'র অমিত — ইতিহাসব্রতী না কি ইতিহাস বেত্তা

দেবাযানী বসু (সেন)

বিশ্বখাতার হিসাব পাতায় সময়ের আঁচড় টেনে চলেছে ইতিহাস। সেই আঁকিবুকি, সরলরেখাগুলি কখনও কখনও ত্রিমাত্রিক অবয়ব পেয়ে যায় সাহিত্যিকের লেখনীতে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের পদধ্বনিকে রণিত করেছিলেন তাঁর উপন্যাসে। অতীত ইতিহাস শুধু নয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলয়ও বাংলা উপন্যাসকে উপাদান সরবরাহ করেছে। আজকের আলোচনায় আমাদের সঙ্গী গোপাল হালদার রচিত ত্রয়ী উপন্যাস - 'একদা', 'অন্যদিন' - 'আর-একদিন' - যা একত্রে 'ত্রিদিবা' নামে পরিচিত। লেখক প্রদত্ত 'ত্রিদিবা' নাম — নায়ক অমিতের তিনটি দিনের ভাবনা — বিষয়ের পরিধিতে যার রাজনৈতিক বাস্তবতা আছে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত অমিত ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত কালপ্রবাহে সে সকল ঘটনা ও মানুষদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের বিশ্লেষণের মধ্যে অমিত তার ইতিহাস সন্ধানী অনুভবের তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা এবং যুক্তি মালার বিস্তার করে যায়। আত্ম পর্যালোচনার পাশাপাশি অমিত করতে চায় মানব ইতিহাসের অন্বেষণ। কাহিনী তিনটির সময়, স্থান, ঘটনাপুঞ্জ সবই বাস্তব। চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও লেখককে তাদের ওপর অলীক ভাবনার প্রয়োগ করতে হয়নি, কারণ লেখক গোপাল হালদার ওই কালপ্রবাহে (১৯৩০-১৯৪৮) ভারতীয় রাজনীতির স্পন্দমান বক্ষের শিরা-ধমনীর কম্পন গ্রহণ করেছেন। নায়ক অমিতের চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত হবার পূর্বে আমরা তার রচয়িতার জীবন ও কর্ম আলোচনা করব।

'অথ একদা-র সূচনা' শীর্ষক রচনায় গোপাল হালদার জানাচ্ছেন ১৯৩২ বা '৩৩ সালের বর্ষকাল নাগাদ বক্সা বন্দিনিবাসে বক্ষপীড়ায় (হার্ট) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হবার পর থেকে এমন কারাবাস মাঝে মধ্যে তাঁর রুটিন হয়ে উঠেছিল। শয্যাশায়ী গোপালবাবু দেখতেন নিস্তব্ধ হিমালয় তার কোলে বর্ষণস্ফীত ঝর্ণার অবিরাম গর্জন, আর ডাক্তার ও বন্ধুদের শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখতেন নিজের শারীরিক অবনতির চিহ্ন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ জীবনে যা দেখেছেন বা দেখতে চেয়েছেন যার জন্য এত ছটফটানি, সেটা যদি লিখে রাখা সম্ভব হত -- "তা এত বিরাট, এত

বিচিত্র, এত অসম্ভব অনুভূতিতে আর ঘটনায় মাখা তার সহস্রাংশের এক অংশও বলা সম্ভব হত না -- যদি বলতে পারতাম। কিন্তু কিছু একটু তার আভাসও কি রেখে যাওয়া যায় না"? -- এই ভাবনা তাঁকে সংকোচ ও আলস্যের হাত ছাড়িয়ে লেখায় উদ্বুদ্ধ করে। সেই লেখা হবে 'একটা দিনের স্কেচ'। বিচিত্র, অশেষ, অপরিমেয় বিস্ময় ও বেদনাকে মাত্র ২০/২৫ পৃষ্ঠায় ধরতে চেয়েছিলেন দৈহিক অসুবিধার কারণে। মনে করেছিলেন শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে এর চেয়ে বেশি করে উঠতে পারবেন না।

লেখবার প্রেরণা এল -- আরো বেশি করে মনে হ'ল যা লিখবেন তা একদিনের কথা। এই একদিন বহন করবে সত্যের গভীর রহস্য -- যে সত্য নির্মিত হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ঘিরে। অন্তরে ও বাইরে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তাকে লিখিত আকারে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। উদ্বেলিত মহাজীবনের আহবানের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের তাড়না ও প্রেরণা বাহিত হয়েছিল, তাকে লিখিত আকার দেবার আর্তি গোপালবাবুর মধ্যে কাজ করছিল। কিন্তু সেটা একদিনের কথা হবে, তাই - 'একদা'।

সংবিৎ প্রবাহ (Stream of Consciousness) বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস রচনার নতুন সরণী গড়ে তুলল বিংশ শতকের বিশের দশকে। এই ধারার সারথী জেমস্ জয়েস, তাঁর 'ইউলিসিস' উপন্যাসে নায়কের ভাবনায় কাহিনী এগিয়ে চলে। গোপাল হালদার জানাচ্ছেন 'ইউলিসিসের নাম তিনি শুনেছিলেন সজনীকান্ত দাসের কাছে, কিন্তু 'একদা' রচনার পূর্বে সেটি পড়েননি। সমধর্মী উপন্যাস ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'আবর্ত' - সেটিও তিনি পড়েন 'একদা' রচনার (১৯৩৩) পরে। আমাদের রচনাটি 'একদা'-র নির্মাণশৈলী বা আঙ্গিকের বিচারে যাবে না, গুরুত্ব পাবে তার বিষয়বস্তু -- যাতে রয়েছে অমিতের আত্মানুসন্ধান তথা আত্মসনাক্তকরণ।

'একদা' - 'অন্যদিন' - 'আর-একদিন' তিনটি উপন্যাসে তারিখের উল্লেখ আছে। 'একদা' শুধু হল শীতের সকালে ২৮শে অগ্রহায়ণ, তেরশো সাইত্রিশ (ইং ১৯৩০), ছয় বছরের কারাবাস থেকে মুক্তির দিনটি অমিতের 'অন্যদিন', আর ১৯৪৮ সালে স্বাধীন নাগরিক অমিত পুনঃ কারারুদ্ধ হচ্ছে 'আর-একদিন' -এ। তিনটি কাহিনীতে ব্যবহৃত কালখন্ড বাইরের বিচারে পৃথিবীর এক একটি আহ্নিক আবর্তন মাত্র। 'একদা'-য় দিনটা শীতের, অন্যদিন-এ শরৎ' আর-একদিনে বসন্ত। শীত - শরৎ - বসন্তের তিনটি দিন যে ইঙ্গিতে আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছে অমিতের জীবনেরই তিনটি পর্যায় -- পুরাতনের অবসান, যাত্রার উদ্যোগ, যাত্রারম্ভ। অমিতের চোখের সামনে ইতিহাসের যে পতন - অভ্যুদয়ের পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, যার সক্রিয় শরিক অমিত নিজেও - তারই প্রবহমান পটচিত্র 'ত্রিদিবা'।

ইংরেজ পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সুনীল। তার একটু নিরাপদ আস্তানা এবং খাদ্যসংস্থানের জন্য ইন্দ্রাণীর উপহার দেওয়া দামী ঘড়িটি অমিত অক্লেশে বিক্রি করে তেত্রিশ টাকায়। ব্যক্তির প্রেম-বন্ধনের উর্দ্ধে দেশের দাবী। সুনীলের বিপ্লবীয়ানা বর্ণনার সূত্রে আসে তার সম্পন্ন আত্মসুখ সর্বস্ব দাদা - বৌদিদের কথা। ছোট বৌদি ললিতা ব্যতিক্রম। তার কাছে সুনীলের স্বদেশীব্রত আনুকূল্য পায়। স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হয়েও ললিতা সাধ্যমতো সাহায্য করতে চায় সুনীলের দলের কাজে। ললিতা যখন একান্ত অপারগ তখন সুনীল অমিতের মুখাপেক্ষী। সুনীলের অজ্ঞাতবাসে পৌঁছবার পথে বন্ধু শৈলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংকীর্ণ ভোগবাদী মানসিকতার উৎকট ছবি অমিতের সামনে তুলে ধরে।

য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সহপাঠী শৈলেন আজ উকিল। শ্বশুর বাড়ীর পদমর্যাদায় নিজেকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত করে গৌরবান্বিত। আত্মোন্নতি তার পরম কাম্য, দেশের স্বাধীনতা বাসনার কোনো মূল্য নেই শৈলেনের কাছে। অমিতের সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধু সুহৃদ, তার দেশপ্রেমিক স্ত্রী সুধীরা, বড় চাকুরে স্বামীর দেশকর্মী স্ত্রী ইন্দ্রাণী এসকলের মধ্যে বোনা হয়ে যায় অমিতের জীবনদর্শন। অমিতের পরিবার - সেখানে আছেন তার পুস্তকপ্রেমী, পুত্রের কর্ম সম্বন্ধে উৎসুক পিতা শশাঙ্কনাথ, উদ্বিগ্না মা, স্নেহশীল অগ্রজের সঙ্গ-পিপাসু ভাই-বোন মনু, অনু — এদের মধ্য দিয়ে অমিত যেন ক্ষুদ্র এক ভারতভূমির সন্ধান পায়। অমিত খবরের কাগজের সাব-এডিটর এবং নিবিষ্ট পাঠক। তার পুস্তক তালিকায় থাকে অর্থনীতিবিদ, কেইনসের থিয়োরি, টয়েনবির 'সার্ভে অব ইন্টারন্যাশনাল আফেয়ার্স' ইংবাজী উপন্যাস, কাব্য, সর্বোপরি তার প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ও শেকস্পীয়ার। সে ও তার সংগ্রামী সহযোগীরা কি 'হ্যামলেট্স অব দ্য এজ' — এ প্রশ্ন অমিতকে বিদ্ধ করে। বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধানে অমিতের মনের অন্তঃপুরে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্খার মতো এক সুগভীর পবিত্র নিষ্ঠা জেগে ওঠে। শেকস্পীয়ার খুলে সে এখনও জীবনের সত্য জিজ্ঞাসার উত্তর পায়। অমিতের মনে প্রশ্ন ওঠে "সত্যই তুমি জীবনের পরিচয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছ -- সতাই তুমি আত্মভ্রষ্ট -- তুমি আত্মদ্রোহী"।

গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানে সায় দিতে অমিতের মন দোদুল্যমান। তার সাহিত্যিক বন্ধু অপূর্ব বলে এসব বিদ্বান মানুষের ভাবার কথা নয় "আমাদের আসন হল ধ্যানের আসন, বক্তৃতার মঞ্চ নয়"। অমিত নিজের পরিচয়পত্র সন্ধান করে -- সেখানে তার মনীষার ঋণ শোধ হবে। কিন্তু অমিততো মানব-ইতিহাসের পৌর্বাপথের মধ্য দিয়ে সমাজবিকাশের গতিছন্দকে বুঝতে চায়। সে নিজের কাছে প্রশ্ন রাখে "তুমি না মানব মহাকাব্যের বিপুল কাহিনীর প্রেক্ষাপটে এই যুগের অবসানপ্রায় অধ্যায়টিকে পড়িয়া

লইয়াছ? বুঝিয়াছ, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কেন নবজন্মের সুতীব্র বেদনা, মানুষের চক্ষে কেন এত আশা, এত অস্থির, ব্যাকুলতা? তুমি না সমস্ত জানিয়াই সমাগত বিপ্লবের স্বাগত সম্ভাষণ গাহিবার স্পর্ধাকে নিজের পরিচয় বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছ?" এই এতবড় সমগ্রবোধের পিছনে সমাজবিজ্ঞানের ও ইতিহাসের এমন ব্যাপক দৃষ্টি সত্ত্বেও অমিত বিচলিত নিজের পরিচয় নিয়ে। বহির্বিশ্বের বিপুল ঢেউ-এর দোলায় দোদুল্যমান অমিত নিজেকে খুঁড়তে থাকে তার একান্ত আপনটুকু খুঁজে পাবার আশায়। এই আত্ম-খনন কার্যে তার মধ্যে চকিত প্রশ্ন জাগে 'তোমার পথই কি তুমি চিনিয়াছ?'

অমিত তার স্রষ্টার মতোই শিল্পরসিক। সুনীলের সমস্যা সমাধান করার পাশাপাশি সে আবিষ্ট হয়ে পড়ে নন্দলাল বসু — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্পে। এই চিত্রগুলি তাকে 'ইনটেন্স লিভিং'-এ নিবিষ্ট করে। অমিত কষ্ট পায় এই ভেবে যে ভারতীয়তার মূল নাই, তাই মূল্য নাই। বিলাতী বুর্জোয়া সভ্যতা বাঙালী সভ্যতাকে শিকড় প্রসারিত করতে দিল না। পৃথিবীকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার বুদ্ধি ও সাহস অমিত সঞ্চয় করতে চায়। জীবন চায় বিকাশ -- এই বিকাশ দিন-রাত্রির সংখ্যায় নয়, বিকাশ আপনার পবিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায়, অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। কর্মের আহবান অমিতের মনকে গৃহবিমুখ করে তোলে। কিন্তু সে জানে রাত বারোটাতেও উৎসুক জননী, উৎকর্ণ পিতা তার জন্য জেগে আছেন। ভগ্নীতুল্য সুরোর অমিতকে পি. আর. এস (প্রেমচাঁদ - রায়চাঁদ বৃত্তি) উপাধিকারী দেখার আকুলতা, ইন্দ্রাণীর প্রেমপূর্ণ সঙ্গ এমন কি বই-এর আলমারীর সার সার বইও অমিতকে আত্মোন্নয়নের স্বপ্নে লীন করে না। গৃহের সামনে 'সবুটধ্বনি' এসে থামে — শুরু হয় অমিতের বন্দীদশা।

ছয় বছর বন্দীদশায় গুরুতর রোগভোগ করার পর, মুক্তির দিনটি হল " অন্যদিন"। ইতিমধ্যে মা পরলোকগতা, পিতা অথর্ব। পৃথিবী জোড়া রাজনৈতিক ঝটিকা থেকে অমিত নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। ছয় বছরের কারারুদ্ধ জীবনে তার এক নবযাত্রা শুরু হয়েছে কমিউনিজমে'র পথে। গৃহের স্নেহাধিকার কাটিয়ে উঠে গুণমুগ্ধ সবিতার নির্ভরশীলতাকে ছিন্ন করে অমিত শ্রম-বিপ্লবের সাধনা করতে চায়। একি আত্মার আত্মবিনাশ এ প্রশ্ন অমিতের মনে ঘূর্ণিত হয়। ইতিহাস বড় নেতা, বড় কবি, বড়বড় মনীষীদের কথা লিখে রাখে। বিপ্লবীরা পরিগণিত হয় ভ্রান্ত বিপথগামীরূপে। অমিতের এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, নিরন্তর প্রশ্ন, অনির্বাণ পিপাসা - এই রক্তাক্ত চরণের পথ অন্বেষণ — ইতিহাসের কতটুকু সত্য তবে সত্য? অমিত মনে করে ইতিহাস শুধু কাগজের পিঠে কলমের আঁচড় নয়, কর্ম দিয়ে প্রয়াস দিয়ে ইতিহাস লেখা হয়। যে ঐতিহাসিক গণদেবতাকে জানেনি সে কেমন করে বাক্য-বঞ্চিত মানুষের বুক-জ্বালা

ক্ষোভ ও বুক ভরা ভালবাসার কাহিনী লিখবে। কেমন করে জানবে পথ হারানো ও পথ নির্মাণের কাহিনী। তাই যেন অমিত মানুষের পরিচয় দেবার দায়িত্ব তুলে নিতে চায়। এইভাবে শুরু হয় তার কমিউনিজমের পাঠ।

তবু ইতিহাসের এই ঝটিকা খনন ছাপিয়ে ব্যক্তি হৃদয়ের ক্ষুদ্র আশার বাঁশি মাঝে মাঝে অমিত শোনে ইন্দ্রাণীর হাসিতে কথায়। কিন্তু ইন্দ্রাণী তো তাকে গৃহ গর্তে নিক্ষিপ্ত করতে চায় না। বরং তার উপলব্ধি ভালবাসা শুধু গৃহের নিভৃতিতে একান্ত উপভোগের মধ্যে একালে আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, পথে পথে আজ জীবন রচনা করবার দিন এল পথচারী শতাব্দীর মানুষের। স্বপ্নমদির সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণীর সান্নিধ্যে অমিত আরো বেশি অনুভব করে - 'আমি ইতিহাসের পথিক'। আরো অসামান্য তার প্রতীতি 'আমি শুধু পথিক, আমি মানুষ —'।

'আর একদিন' স্বাধীন ভারতে গোয়েন্দা পুলিশের কুক্ষিগত হচ্ছে অমিত। কংগ্রেস সরকার স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্টদের জেলে পাঠাতে চাইছেন। ত্রিদিবা-রা তৃতীয় ও শেষখন্ডটি কমিউনিস্ট-কর্ম-আন্দোলনের কথায় পূর্ণ। 'একদা' থেকে 'আর একদিন' - এর বৃত্ত পূর্ণ হয় যখন পাঠক দেখে সুরো-র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তার মেয়ে মঞ্জু বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীরূপে বন্দিনী। সুরোর 'অমিদাদা'-র পথ গ্রহণ করেছে মঞ্জু। এতেই যেন তার মৃত আত্মার শান্তি। দেশলক্ষ্মী কটন মিলে মজদুর আন্দোলনের অনেক লড়াকু নারী পুরুষের কথা, অমিতের ভাবনার মধ্যে পাঠক পেয়ে যায়। এরই মধ্যে ভিন্নমাত্রা পায় ফিজিক্সের ফাস্টক্লাস ফিলজফি পড়া ভাবোন্মাদ তপনের উন্মত্ত জীবন সাধনার অচঞ্চল প্রেম প্রদীপ গৌরী। তপনের তরুণী পত্নী গৌরীর কথা শুনে অমিত ভাবে "ইতিহাসের ট্রাজেডি তুমি নারী, বাঙালী মধ্যবিত্তের বাঙালী বিদ্রোহীর মাতা, ভগ্নী, জায়া।"

অমিত স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বাত্মাকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বোঝে জনতার পথ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে জনযুদ্ধের পথে। আজকে ইতিহাসের বক্রতির্যক পথে করতালি পাচ্ছে না অমিতরা কিন্তু এটাই এই মুহূর্তের বৈপ্লবিক বিধিলিপি। সংগ্রামী জীবনের শত সংশয়ী পল-অনুপল পার হয়ে অমিত ভাবে যে, আজ সে আত্মস্থ অর্থাৎ একাত্ম, আর তাই বিশ্বাত্ম। তখন তার মধ্যে দিয়ে আমরা কেবল কমিউনিজম ইতিহাসের টুকরো একটি পর্বকেই মাত্র দেখি না, তার মধ্যে আমাদের এই চলতি সময়ও জেগে ওঠে যেন। যে বাক্যটি বারে বারে উচ্চারণ করে অমিত, তার কিছুটা স্বাদ আমরা খুঁজতে থাকি। আমাদের বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে; 'only in intense living do we touch infinity'.

পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় অমিতের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন 'কোথায় তোমার পরিচয়।'

অমিত সে পরিচয় লেখা বা কথায় রাখতে পারেনি, প্রেমমন্ডিত গৃহ্ রচনায়, ধ্যানসুন্দর, প্রীতি সুন্দর, গোষ্ঠী রচনায় একান্তে বসে আত্মরচনায় সে সফল হয়নি। জ্ঞানে চিন্তায় ভাবনায় কাব্যে কলায় শিল্পে কোনো অক্ষয় কীর্তির স্বাক্ষর অমিত রাখেনি। পৃথিবীর সাফল্যের মাপকাঠিতে অমিত ন্যূন হলেও মানুষের মহদভিযানের মধ্যে মিলে গিয়ে সে সার্থক। শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবির পথ, কর্মজীবির পথ এক হয়ে জেলের গাড়ীতে মেলে যখন, তখন অমিত এক মহাস্রোতে অবগাহন করে জীবনরস আস্বাদন করে। 'ছোট আমি' চূর্ণ করে জেগে ওঠে 'বড় আমি'-র দাবি - কত সত্তার খন্ডতাকে মিলিয়ে দেয় সত্তার সম্পূর্ণতার দীপান্বিতায়। এই মহোৎসবে সত্তায় সত্তায় সম্পূর্ণতা জেগে উঠে বলবে 'তুমি আছ, আমি আছি' — আমরা আছি পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া মানব মুক্তির পরিপূর্ণতার অর্ঘ্য - সকল মানুষের বিকাশের পরিপূর্ণতায় মহামানবের আত্মপ্রকাশ ....।" তাই ইতিহাসের ভাবী দিনের জন্য মহাদাশ্বাস শোনে অমিত 'অয়মহংভো'।

লেখক গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'রূপনারাণের কূলে'-তে নিজের বিপ্লবীজীবন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "শুধু আমাকে নিয়েই আমি নই"। দেশ ও কাল নিয়েই আমি। ১৯১৬ থেকে বিপ্লবী দলে ঢুকেছি, বিবেকানন্দ তাকে বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ শোধন করেছেন"।

'ত্রিদিবা'-র তিনটি কাহিনীতে নায়ক অমিতের যে 'কোয়েস্ট অব রিয়ালিটি' তা লেখকেরও বটে। তিনটি দিনের ছকে তিনি ভারতবর্ষের বিংশ শতকীয় রাজনৈতিক সামাজিক উন্মেষের কথা তুলে ধরেছেন। শতাব্দীর জীবন পথে আগত বিপরীতধর্মী চিন্তা-চেতনা মুখোমুখি হয় এই তিন আখ্যান ভাগে। যার তীব্র আঁচ পাওয়া যায় 'আর একদিন'-এ। কংগ্রেসের গ্রামোদ্যোগ বুনিয়াদি শিক্ষার ফাঁকি ধরা পড়ে খাদি কর্মী সবিতার চোখে। তবু সবিতা বিশ্বাস করত অহিংসায়, সত্যাগ্রহে-কেননা এটাই ভারতবর্ষের চিরকালের কথা। জনতার মহাপথ সে গ্রহণ করল ভারতের মানসিক আধ্যাত্মিক বন্ধনকে মান্য করে। 'আর-একদিন' -এর অমিত উপলব্ধি করছে দেশবিভাগে বাস্তুহারা নরনারীর ক্লেশ। সে লক্ষ্য করে দেশ ছেড়ে পলাতক, পথে পথে অন্নহীন, বস্ত্রহীন অসহায় মেরুদন্ডভাঙা পূর্ববাংলার নরনারীদের খন্ডিত জীবন।

আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রাণী নিজের বাঁধা জীবন ও বাঁধা সংসার বিপন্ন করে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের কর্মী। এই আগুনে সে উত্তপ্ত হতে বলে অমিতকে। অমিত ততদিনে কমিউনিজমের বহ্নিশিখায় জ্বলছে। ইন্দ্রাণীর ভাল লাগে না অমিতের মত পরিবর্তন। তার বক্তব্য "আজ যখন তোমার দেশের জনতা বিপ্লবের মুখে তখন তুমি রহিবে কোন্ 'মস্কোর' চিন্তায় মগ্ন"? অমিত বোঝাতে চায়, 'এ দেশের জনতার ও পথ,

..... উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে জনযুদ্ধের পথে। ইন্দ্রাণীর, কাছে অমিত তিরস্কৃত হয় 'স্ট্যালিনিস্ট', 'মস্কোর ক্রীতদাস' বলে। ইতিহাসের দাবি মেনেই অমিত নিজেকে কমিউনিস্ট বলতে চায়। অমিত মনে করে এযুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম — সৃষ্টির কর্মযোগশাস্ত্র। এই গণসংগ্রামের বিপুল সৃষ্টি শক্তি থেকে ইন্দ্রাণীর যে বিছিন্নতা এসেছে তার জন্য অমিত নিজেকেই দায়ী করে। অমিত ইতিহাসকে সঙ্গী করতে গিয়ে এই প্রবাহে মগ্ন হয় — ''বিপ্লবের পরে আবার বোধন, আবার নতুন কালের নতুন বিরোধ, নতুন সমন্বয়। দিনের পর দিন - যুগের পর যুগ।''

জ্ঞানে কর্মে প্রেমে অমিত মানব তীর্থের পথটি বিনির্মাণ করতে চায়। গৃহজীবন উদাসীন কমরেডদের দেখে অমিত বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাদের মা-স্ত্রী-সন্তানের জন্য। 'একদা'-র অমিত মায়ের সতর্ক দৃষ্টি উপেক্ষা করতে না পেরে ভেবেছিল 'মা বড় জঞ্জাল'। ব্যক্তি আকাঙ্খা ও সমষ্টির আহ্বানের দুই মেরু ভিন্নধর্মী মানতে চায় না অমিতের মন। কমিউনিজমের পথ ব্যক্তিকে প্রিয় সম্পর্ক চ্যুত করবে একথা সে বিশ্বাস করে না। সে মনে করে কমিউনিজমের অর্থ মানবতার পূর্ণতা। 'ভালবাসা'-কে না মানলে মানবতা অর্থহীন। বিপ্লবের মুহূর্তের সম্ভাবনাকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজন চিরদিনের মানুষ - মমতায় দুর্বল, স্নেহে জীবন্ত, জীবন বৈচিত্র্যে পরমাশ্চর্য এই সত্য। মানব ইতিহাসের বাণী সকল মানুষ সকল মানুষের সঙ্গে মিলবে। এক একটি সাধারণ দিন অমিতকে উত্তীর্ণ করে 'বড় আমি'-র তপস্যায়। সে এই তপঃসিদ্ধিতে সঙ্গী করে পাঠককে। এখানেই তার চেতনার বিশিষ্টতা।

সূত্র-নির্দেশ

গোপাল হালদার রচনাসমগ্র ১ — এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সং

'পরিচয়' — গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, ১৯৮০

'রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ত্রিদিবা' — এক্ষণ, ১৫শ বর্ষ, তৃতীয় - চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৮২

একদা, অন্যদিন, আর একদিন' — জার্ণাল - শঙ্খ ঘোষ

গোপাল হালদার রচনা সমগ্রের ভূমিকা — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপনারাণের কূলে (২য় খন্ড) গোপাল হালদার

সেকুলারাইজেশন — এর নিজস্বতা

তারকেশ্বর পান্ডে

সেকুলারিজম' এই শব্দের বঙ্গানুবাদ হিসাবে ধর্ম নিরপেক্ষতা' শব্দের ব্যবহার পদ্ধতিগত ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ বেঠিক। তাই বক্তব্যের সপক্ষে পৃথক ভাবে যুক্তি প্রদর্শন না করে আলোচনার বিন্যাস বা গতির মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হবে।

এছাড়াও আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানে সেকুলারাইজেশন শব্দটি একটি ভিন্নতর গুণগত চরিত্র নিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা একটি বিশেষ চরিত্রের প্রবহমান জীবন বিন্যাসকে ইঙ্গিত করে, এক্ষেত্রে সেই সমাজে বাধ্যতামূলক ভাবে 'সেকুলারিজম' তথা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শটি নাও থাকতে পারে। অথবা প্রয়োজন নাও হতে পারে। আলোচনার বিন্যাসে এই ব্যাপারটিও পরিস্ফুট হবে।

রেঁনেসা ও আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারের পরিণতি হিসেবে প্রাথমিক ভাবে পশ্চিম ইউরোপে সেকুলারিজম এর জন্ম। বাস্তবে রাষ্ট্র - চার্চে দীর্ঘ ক্ষমতাদ্বন্দের পরিণতি হিসাবে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে এর রাজনৈতিক সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

কিন্তু ভারতীয় জীবন যাত্রার প্রণালী ও সভ্যতায় 'সেকুলারাইজেশন' চিরন্তন মনস্তাত্ত্বিক সংস্কৃতি হিসেবেই অবস্থিত। বস্তুত এখানে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির হাত ধরেই 'সেকুলারিজম' নামক রাজনৈতিক আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু আবার সেই সেকুলারিজম নামক সামাজিক জীবন যাত্রার প্রণালী হিসেবে নয়। আলোচনার সুবিধার্থে যদি সেকুলারিজম শব্দটি ব্যবহারও হয় সেক্ষেত্রে বহু ধর্ম ও বহু জীবনযাত্রার প্রণালীযুক্ত একটি রাষ্ট্রে - র অর্থ পশ্চিমী চিন্তা চেতনার সমানুপাতিক অর্থে বোঝার চেষ্টা করাটাই পদ্ধতিগত ভাবে ভুল।

ভারতীয় সেকুলারইজেশনের নিজস্ব চরিত্রকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে এই পর্বেই উপস্থিত করার প্রচেষ্টা করা হল ঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতীয় ও পশ্চিমী ধারার পার্থক্য সমূহ

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পারস্পরিক সংঘাত কিভাবে আমাদের সেকুলারইজেশন পদ্ধতিকে বিপর্যস্ত করার বর্ণনা।

বেদ - পশুচারণ ও কৃষি অর্থনীতির বিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্বে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে পার্থিব মুক্তির সপক্ষে অপার্থিব শক্তির কাছে আবেদনের দলিল। এই অর্থে প্রথম থেকেই ভারতীয় জীবনযাত্রা অপার্থিবতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ পার্থিব সেকুলার স্বার্থের বাইরে নয়।

এমন কি প্রাচীন ভারতে ধর্মের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ধর্মশাস্ত্র সমূহের যুক্তি প্রাথমিকভাবে অপার্থিব শক্তি কেন্দ্রিকতা নয়; বর্ণ (বস্তুত 'জাত') ভিত্তিক কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক ভূমিকা নির্ণয় ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষণ করাটাই (যা বস্তুত সেকুলার উদ্দেশ্য) — এই প্রেক্ষাপটে ধর্ম। তাই ধর্ম ও সেকুলার অনেকটাই পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য শব্দ।

এই অর্থে সার্বভৌম কর্তৃত্ব (অর্থাৎ রাজা) ধর্মের অধীন। বিদেশী ও দেশীয় উপজাতিগুলিও ক্রমান্বয়ে এই সেকুলার ধর্মীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। বলা যায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে জাত ভিত্তিক ধর্মপালনের (যা বস্তুত সেকুলার ধর্ম পালন) ফলে ক্রমান্বয়ে আগত সামাজিক চলমানতার অভাব জনিত গতিহীনতার বিরুদ্ধে এক ধরনের নতুনতর দার্শনিক কার্যক্রম যা ধর্ম সংক্রান্ত হিন্দু বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করে না। ধর্ম সংক্রান্ত অশোকের বক্তব্য এর অন্যতম উদাহরণ।[১]

এখানে দুটি বিষয় বলতে চাওয়া হচ্ছে (১) প্রাচীন ভারতে ব্যক্তির কাছে ধর্ম হচ্ছে ''বিশ্বাস'' কোন গোষ্ঠী কর্তৃক সমাজ বা রাষ্ট্রের নিকট থেকে তাৎক্ষণিক স্বার্থ আদায় করে নেওয়ার জন্য আদর্শ (IDEOLOGY) নয়। ব্যক্তির কাছে সেকুলার জীবন এই ধর্মীয় বিশ্বাস বিযুক্ত নয়।

অতএব প্রাচীন ভারতের বৃহত্তর সমাজে পার্থিব - অপার্থিব এই দুটি বিভাগের সেই অর্থে কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

ভারতীয় সমাজে সেকুলারইজেশন প্রক্রিয়ার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে মধ্য যুগের ভক্তি আন্দোলন যা প্রথমে তামিলনাড়ুতে ও পরবর্তী পর্বে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং দমন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আকাঙ্খা এর দ্বারা ধ্বনিত হয়েছে। সুফি ও পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা অংসখ্য লোকধর্ম - এর চূড়ান্ততম উদাহরণ — চৈতন্য থেকে লালন সবাই এই সেকুলার ধারারই প্রতিনিধি।

জিয়াউদ্দিন বারনি এবং আবুল ফজলের ঐতিহাসিক লেখার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যাবে কিভাবে সেকুলারাইজেশনে প্রক্রিয়ার মধ্যে মধ্যযুগীয় রাজনীতির ক্রম আস্তিকরণ ঘটেছিল।

বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজকে ঔপনিবেশিক অথবা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় রাজনৈতিক ভৌগলিক এলাকার মধ্যে সংবদ্ধ থেকে বুঝতে চাওয়াটিও পদ্ধতিগতভাবে ভুলের পরিচায়ক। ভারতীয় সেকুলারাইজেশনের প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করতে গেলে তার একটি সাংস্কৃতিক ভৌগলিক পরিমন্ডল সম্বন্ধে বোধ তৈরী হওয়া প্রয়োজন যা আফগানিস্থান সহ মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আফগানিস্তান থেকে তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট (১) বামিয়ান বুদ্ধ (২) অশোকের শিলালিপি (৩) পাণিনি - আফগানিস্থান যার মাতৃভূমি। এই আলোচনার ভিত্তিতে মধ্যযুগীয় ভারতের সেক্যুলার চরিত্রে নিম্নলিখিত অবস্থানগুলি চোখে পড়ে। (১) হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সামাজিক ব্যবস্থাপনায় স্থিত দমন প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছে। (২) এই আন্দোলনের গণভিত্তি ছিল, অর্থাৎ নিছক রাষ্ট্রীয় সমর্থনের উপর ভিত্তি ছিল না। (৩) নিছক আধ্যাত্মিকতার উর্ধে বাস্তব পৃথিবীর যুক্তি সিদ্ধ জীবন জিজ্ঞাসার গুরুত্ব প্রদানই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। (৪) সর্বাধিক উল্লেখনীয় ঐতিহাসিক বিষয় হল সামাজিক রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ। অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতার ঘাত প্রতিঘাতের পরিণতি হিসাবে এশিয় সমাজ ব্যবস্থা হাজার হাজার বছর ধরে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সৃজনশীলতার ভিত্তি হচ্ছে ক্রমানুগতভাবে আগত বৌদ্ধিক আন্দোলন বা উত্থানসমূহ। এই সমাজব্যবস্থাগুলির প্রাথমিক গঠনপর্বে উক্ত মানবতাবাদি উদ্দেশ্য সমুহ সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল।[২]

এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় সেকুলারাইজেশনের ধারণা সুদীর্ঘ সামাজিক প্রক্রিয়ারই পরিণতি। যা পশ্চিমী সেকুলার চিন্তার বিবর্তনের সংগে তুলনীয় নয়। সে চিন্তা ব্যক্তির সেকুলার সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দিক হিস্যাবে দেখতে বেশি ভালবাসে।

উভয়ের তুলনামুলক অবস্থানটি আরোও একটু পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন।

মূলগত পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ঃ-

(১) পশ্চিম মূলত একটি একক ধর্মসমন্বিত সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে চার্চ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসাবে সেকুলারিজমের ধারণার উদ্ভব।

বিপরীত দিক থেকে ভারতীয় সেকুলার চিন্তা বহুবিধ ধর্মে বহু সময় ব্যাপী পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠেছে, এর লক্ষ্য ছিল কোন না কোন চরিত্রে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি রক্ষা করা, যে ঐতিহ্য এখনও প্রবহমান।

(২) পশ্চিমী সেকুলারিজমের পশ্চাৎগত আদল হিসাবে জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতাবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ ও শিল্পবিপ্লব কাজ করেছে।

ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন অনুপস্থিত।

(৩) পশ্চিমের সেকুলার চিন্তা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মকে বিযুক্ত করে। এটি সম্ভব হয় সমাজ সম্পর্কে ও সমাজ কাঠামোকে ক্রমান্বয়ে যুক্তিসিদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে।

ভারতীয় সেকুলার চিন্তা ধর্মকে ক্রমান্বয়ে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা করেছে। এটি করতে গিয়ে ব্যক্তির সেকুলার নৈতিকতার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পৃথকীকৃত অস্তিত্ব ভারতীয় ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া প্রায় দুষ্কর।

(৪) পশ্চিমের সমাজ জীবনে যুক্তিবোধের ক্রম উন্মোচনের মাধ্যমে সেকুলারবোধের ব্যাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সামাজিক চেতনা মূলত সামাজিকীকরণের পরিণতি, আধুনিক যুক্তিবোধের পরিণতি নয়।

ভারতবর্ষে তথাকথিত রেনেসাঁ ও আধুনিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে ঔপনিবেশিকতার হাত ধবে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘোষিত পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচী যা স্বাধীনতার পরে জহরলালের নেতৃত্বে অখন্ড প্রশ্নহীন রাষ্ট্রীক কর্তৃত্বের জন্ম দেয়। ভারতের সেকুলারিজম এই কর্তৃত্বেরই অন্যতম দিক - এই সেকুলারিজম ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রবহমান ঐতিহ্যর সঙ্গে তথা জনগণের সামাজিকরণ প্রক্রিয়ার ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১) পশ্চিমের অনুকরণে আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোন ধর্ম নেই।

২) কিন্তু পশ্চিমী ব্যবস্থার বিপরীত ক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্র প্রয়োজনে যে কোন ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং তা হবে সংবিধান সম্মত।

৩) এই সুত্রেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রচ্ছন্ন অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে উগ্র হিন্দুত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।[৩]

সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশিষ নন্দী দেখিয়েছেন যে, স্বাধীনোত্তর ভারতীয় এলিটরা গণতান্ত্রিক কাঠামো চায়,

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চায় না। একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে গণতান্ত্রিক কাঠামো তথা সংবিধান সর্বস্বতার সঙ্গে "সেকুলারিজিম" যুক্ত। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগে "সেকুলারাইজেশন" যুক্ত। এই অর্থে T. N. Madan নিজেকে সেকুলার ধারণারই বিরোধী বলেছেন।[৪]

বলা যায়, নেহরুর যুক্তি বোধ ও বৈজ্ঞানিক মনন প্রক্রিয়া দ্বারা সেকুলার সংক্রান্ত ধারণার রাজনৈতিক সার্বিক সার্বভৌম প্রয়োগ স্বাধীনোত্তর পর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভৌগলিক এলাকার মধ্যে পারস্পরিক বিতর্ক ও আলোচনার অবকাশ দূর করে দিল। যার ভিত্তিতে হয়তো আমরা একটি জাতীয় ঐক্যমতে আসতে পারতাম। অবশ্য উত্তর আধুনিকতাবাদীরা ও সাবঅলটার্ন ইতিহাসবাদীরা জাতীয় ঐক্যমতের এই ধারণাকে পদ্ধতি হিসাবে অপছন্দ করেন।

মধ্যবিত্ত "সেকুলার-মন" সমৃদ্ধ এলিটের কাছে যা "অপরিহার্য একাধিপত্য"। ভারতের ধর্মীয় মনন সমৃদ্ধ সাধারণ মানুষের (বিশেষত ধর্মীয় নিপীড়ণের যারা শিকার) কাছে তাই হচ্ছে ক্রমান্বয়ে পরাধীন হয়ে পড়ার প্রধান পদ্ধতিগত কার্যক্রম, হিন্দুত্ববাদীদের "পজিটিভ সেকুলারিজম" অথবা নেহরুর "যুক্তিসিদ্ধ সেকুলারিজম" এই দুটিরই ত্রুটি আছে।

আমার মনে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি অনেক বেশি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চলছে। যার প্রতিফলন হিসেবে এই নীতিকে কেন্দ্র করে অনেক বেশি বিতর্ক ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের এই বহু ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিত্তিক সমাজে এর ধারণা ও নীতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রান্ত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার মতো কোন নতুন পথ বা দর্শন বর্তমানে আমাদের সামনে উপস্থিত নেই।

আজকের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যাটি ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শের সংগে যুক্ত নয় বরং কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করা যাবে (Process of Secularization) তার সংগে যুক্ত। চার্লস টেলার আধুনিক সমাজে Seculariziom এর তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন ঃ-

i) Common Ground Approch :

It emphasised the ground for co-existence above the conflicting cofessional interest.

ii) Independent Political Ethic :

It looks within the Prevailing human condition to deduce certain

exceptionless Acceptable Norms, such as Peaceful and Equitable co-existence.

iii) Overlapping consensus :

It is propunded by Rawls. It accepts prevailing Diversity and seeks to Build consensus on Ethics through open Debate and Discussion without any Reservation what-so-ever.[৫]

টেলারের বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে 'Overlapping consensus" মডেলটি আমাদেব দেশে আজকের সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। তবে এই তথ্যের মধ্যে আবার দুধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ভাসিত হতে দেখা যাচ্ছে। যার একটি হল। "Secularization Through Politicalization". আর অন্যটি হল "Secularization Through Socialization"। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলনের প্রশ্নে রাজনীতি কখনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমী ভাবধারাকে নকল করে ধর্মের সংগে রাজনীতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এই অদ্ভুত ভাব ধারাটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার চরম সংকটের অন্যতম কারণ।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন বারংবার আমাদের সামনে উঠে আসছে, সেটি হল, বর্তমানে ভারতবর্ষে যেভাবে সেকুলার শব্দটিকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। সেটিকে আমরা গ্রহণ করব না অতীত থেকে যে ভাবে ভারতবর্ষের জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অনুশীলন করে চলেছেন সেভাবে।[৬] এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে গিয়ে আমাদের দু'ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি হল - সেকুলারাইজেশন প্রক্রিয়াটিকে আমরা "Big Little Tradition" এর বিতর্কের মধ্যেই কি চিহ্নিত করব? না এই প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে হলে ভারতীয় চিন্তাধারা ও অনুশীলনের প্রেক্ষাপটে নতুন কোন বিকল্প শব্দ বা ধারণা ব্যবহার করব?

সূত্র-নির্দেশ

১) ওমভেট গেইল, "হিন্দুইজিম এন্ড পলিটিক্স", ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম ২৫ সংখ্যা ৪, ৭ই এপ্রিল ১৯৯০. পৃষ্ঠা ৭২৩-২৯।

২) পি. সি. যোশী, ১৯৮৭ "সেকুলারিজিম এন্ড রিলিজিয়াসিটি অফ দা অপ্রেসড্ ঃ সাম রিফ্লেকশন" "ম্যান এন্ড ডেভলপমেন্ট" ভল্যুম ৯ সংখ্যা ৪, ১৯৮৭. পৃষ্ঠা ২০১-২৩৫।

৩) রুডুল্ফ সি. হেরিডিয়া ও এডওয়ার্ড ম্যাথিয়াস "সেকুলারিজম এন্ড লিবারেশন -

প্রসপেক্‌টিভস্‌ এন্ড স্ট্র্যাটেজি ফর ইন্ডিয়া টুডে'' ইন্ডিয়ান সোশ্যাল ইনস্টিটিউট, নতুন দিল্লী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪২।

৪) টি. এন. মদন, ''সেকুলারিজম ইন ইট্‌স প্লেস, ১৯৮৭. জার্নাল অফ এশিয়ান স্ট্যাডিস, ৪৬, পৃষ্ঠা ৭৪৭-৪৯।

৫) চার্লস টেলার, ''দি সেকুল্যার ইমপ্যারেটিভস'' রাজিব ভার্গভ সম্পাদিত ''সেকুলারিজম এন্ড ইটস ক্রিটিকস'' অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৩৮-৫৩।

৬) রাজিব ভার্গভ, ''সেকুলারিজম এন্ড ইটস ক্রিটিকস'' অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা ৪৮৬-৫৪২।

'মডার্ন রিভিউ'-এর আলোচনায় রাশিয়ার বিপ্লব

তাপসী ঘোষ

গোড়ার কথা

রাশিয়ার বিপ্লব — একটা আলাদা ওজন আছে কথাটার। যে প্রসঙ্গেই বলা হোক না কেন, অন্য সব বিষয়কে গৌণ কবে এটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এখনকার আলোচনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

সারা পৃথিবীতে রাশিয়ার বিপ্লব এত বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে যে প্রাসঙ্গিকতার ব্যাখ্যা দেওয়াই অবান্তর। হতে পারে দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাৎ ছিল। কিন্তু কোনো বিপ্লবকে তো আর এভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় না। কখনও রাজনৈতিক আঙ্গিকে, কখনও সামাজিক আঙ্গিকে, কখনও সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে আবার কখনও বা অর্থনৈতিক আঙ্গিকে। প্রতিটি দেশ, প্রতিটি মানুষ রাশিয়ার বিপ্লবকে নিজেদের মত করে ভেবেছে। শেষের নবআরম্ভকে সবাই প্রায় স্বীকৃতি দিয়েছিলো। মতবিরোধ যা ছিল সবই ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ভারতবর্ষও এর থেকে আলাদা নয়। শাসনের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো রাশিয়ার বিপ্লব। ঔপনিবেশিকতার তফাৎটা তাই তেমন করে চোখে পড়েনি।

ভারতের মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো অধিকার বক্ষার লড়াই দেখে। চাপিয়ে দেওয়া রীতিনীতির ভারে তারা তখন জর্জরিত। উপরন্তু বিপ্লবী নেতৃদলের মনোমালিন্য তাদেব নতুন পথ খুঁজতে বাধ্য করেছিলো। এসময়ে রাশিয়ার বিপ্লবে সাধারণ মানুষের স্বতোঃস্ফূর্ত যোগদান স্বাভাবিকভাবেই তাদের নতুন পথ দেখালো।

অবশ্য সময়টাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলো মানুষের জানার ইচ্ছা। আর এই আগুনে হাওয়া দেওয়ার কাজটা করেছিলো সংবাদমাধ্যম — সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র। তারাই মানুষের জানার ইচ্ছাকে ক্রমাগত উস্কে দিয়েছে খবরের অনবরত যোগান দিয়ে। সংবাদমাধ্যম তখনই কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিব, সাংস্কৃতিক তথা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার জায়গা

পাকা করে নিয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তখন অন্যতম বিতর্কিত আলোচনার বিষয়। মানুষের যেকোনো অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে অতি আবশ্যক বিষয় হিসাবে। যেকোনো দেশের গণতন্ত্রমুখী লড়াই এর অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র।

তৎকালীন ভারত ও মর্ডান রিভিউ

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষও সংবাদমাধ্যমের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। একদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শের পৃথকীকরণ কিংবা অন্য মতে উত্তরণ। অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের সাধারণীকরণ। পুরোনো 'এলিটিষ্ট ভাবধারা' থেকে সরে 'গ্রাসরুট জার্নালিজম' -এর উদ্ভব হয় সেই সময়েই। ফলে, আরও বেশী সংখ্যক মানুষ জানতে পারলো দেশের খবর, বিদেশের খবর। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলা যায় সেই সব মানুষ জানতে পারলো যাদের ছাড়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না। এদের উদ্দীপ্ত করার জন্য এখন সংবাদমাধ্যমে এদেরই কথা লেখা হাতে লাগলো আরও বেশী করে।

এমনই যুগ সন্ধিক্ষণে এলো 'মর্ডান রিভিউ'। সম্পাদক রামানন্দ চ্যাটার্জীর মাসিক ইংরাজী সাময়িকপত্র। বঙ্গভঙ্গের চাপ কাঁধে নিয়ে তার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পেল ১৯০৭ এর জানুয়ারীতে। প্রকাশের একবছরের মধ্যে সুরাট অধিবেশনে বিভাজন হল কংগ্রেসের। নরমপন্থী ও চরমপন্থী মতানৈক্যের শেষ দেখলো ভারতের মানুষ। ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পূর্ণ স্বরাজ, দানে পাওয়া উপহার না ছিনিয়ে নেওয়া অধিকার — এ সব প্রশ্নেই ভাগ হয়ে গেলো ভারতের প্রধান প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আর এ ব্যাপারে অন্যতম অনুঘটকের কাজ করলো বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত। ভারতীয় রাজনীতির তখন এক টালমাটাল অবস্থা। বিরুদ্ধ বিদেশী শক্তি ভাবছে দেশীয় প্রতিআক্রমণের শেষ বোধহয় হয়েই গেলো। আর দেশের মানুষ, নতুন বিকল্পকে খুঁজছে।

'মডার্ন রিভিউ' এর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ছিল, যেকোনো একটি রাজনৈতিক মত ও পথকে আদর্শ করে এগিয়ে চলা। কারণ তখনকার প্রায় সব সংবাদপত্রই কোনো না কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা নেতার মতই প্রচার করতো। কিন্তু সে পথে না গিয়ে মডার্ন রিভিউ নিল মধ্যপন্থা, ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে। মানুষকে ঠিক আর ভুলের বিচার করতে শেখালো যুক্তি দিয়ে। আবেগ দিয়ে নয়। এখানে হয়ত এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মডার্ন রিভিউয়ের ক্ষেত্রেও পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সম্পাদকের মতামত। তখন বলা হত 'নোটস্'। একে আজকের সম্পাদকীয় বলে ভাবা যেতেই পারে। কিন্তু এতটাই সুষম ছিল সে মতামত যে কখনও কোনো ব্যক্তিবিশেষের ধারণা বলে মনে হয়নি। অন্তত বিদগ্ধজনেরা তো তাই বলেন।

'মডার্ন রিভিউ' শুধু রাজনৈতিক মতামত দিত না। কারণ একটা সমাজ শুধু রাজনৈতিক তথ্যে সম্পূর্ণ হয় না। তার ইতিহাস, শিল্প, কলা, অর্থনীতি, সংস্কার, সবই জায়গা করে নিয়েছিলো 'মডার্ন রিভিউ' -এর পাতায়। তাই পুরোদস্তুর রাজনৈতিক পত্রিকা না হয়েও সে ভবিষ্যৎ ভারতের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলো।

এমন একটি পত্রিকার কাছে দ্বিধাহীন সুষম মতামত আশা করাটাই তখন স্বাভাবিক। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বাইরের পৃথিবীও সমানভাবে ধরা দিয়েছিলো এ পত্রিকার বিষয়বস্তুতে। কারণ, সম্পাদক জানতেন বাইরের দেশের যে মুক্তিকামী প্রচেষ্টা, তার খবর না পেলে এদেশের মানুষ উজ্জীবিত হবে কেমন করে? তাই খবরের শিরোনামে বারবার এসেছে আয়ারল্যান্ড বা ফিজির কথা। আবার সেইসঙ্গে ভারতের মধ্যে সাময়িকীর প্রচার সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি ভারতের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোকে বিশ্বের দরবারে তুলে এনেছিলেন। মডার্ন রিভিউ তাই শুধু তৎকালীন ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত ইংরাজী পত্রিকা নয়। ভারতের বাইরেও এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্যার যদুনাথ সরকারের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণীয় "The influence of the Modern Review in Vienna & New York was no less than in Madras & Lahore."।[১] তাই 'মডার্ন রিভিউকে' ভারতীয় খোলসে আন্তর্জাতিক পত্রিকা বলা যায় অনায়াসেই। এটিই সাংবাদিকতায় প্রথম ভারতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতীক। এরকম কোনো পত্রিকায় রাশিয়ার বিপ্লবের কি 'কভারেজ' থাকবে তা সহজেই অনুমেয়।

'মডার্ন রিভিউ' ও রাশিয়ার বিপ্লব ঃ

১৯০৭ থেকে সময়টা একটু এগিয়ে নিয়ে যদি ১৯১৭ তে যাই দেখবো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধে লিপ্ত সরকার কেড়ে নিচ্ছে মানুষের ন্যূনতম অধিকার। দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব হিসাবে ঔপনিবেশিক শিকল ছেঁড়ার অদম্য আকাঙ্খা জেগেছে মানুষের মনে। এমনই পরিস্থিতিতে শুরু হল রাশিয়ার রাজনৈতিক বিপ্লব। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের ৮ তারিখে। অবশ্য যদি কোনো বিপ্লব ঐদিন, ঐসময়ে শুরু হয়েছে বলা যায় তবেই একথা প্রযোজ্য। কারণ রাশিয়ার বিপ্লবের সাম্প্রতিক কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হলেও মূল কারণ নিহিত ছিল গত অর্দ্ধশতাব্দীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভে। এখন প্রশ্ন হল 'মডার্ন রিভিউ' এ বিপ্লবকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছে। ১৯১৭-র মার্চ মাসে রাজনৈতিক বিপ্লব এবং নভেম্বরের সামাজিক বিপ্লবকে সূচক ধরে যদি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের একটি সারণী ১৯১৭ এপ্রিল থেকে ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী সময়সীমার মধ্যে প্রস্তুত করা যায়

তাহলে তা হবে নিম্নরূপ —

১।	দ্য রেভল্যুশন ইন রাশিয়া	—	এপ্রিল, ১৯৯৭	—	নোটস্
২।	উই রিজয়েস	—	”	—	”
৩।	দ্য এফেক্টস্ অফ দ্য রেভল্যুশন	—	”	—	”
৪।	দ্য চেঞ্জলেস ইস্ট্	—	”	—	”
৫।	ইন্ডিয়া ডাজ্ নট চেঞ্জ	—	”	—	”
৬।	দ্য পিপল্ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন	—	”	—	”
৭।	দ্য রুলারস্ অফ্ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন	—	”	—	”
৮।	ব্রিটিশ নোট টু রাশিয়া অন অ্যালায়েড ওয়ার এইমস্	—	জুলাই, ১৯১৭	—	”
৯।	প্রেসিডেন্ট উইলসন'স্ মেসেজ টু দ্য রাশিয়ান পিপল্	—	”	—	”
১০।	রাশিয়ান মিশন টু আমেরিকা	—	”	—	নোটস
১১।	দ্য সিক্রেট পোলিশ ইন - প্রি রেভল্যুশন রাশিয়া	—	”	—	নোটস্
১২।	দ্য রাশিয়ান সিচুয়েশন	—	আগস্ট, ১৯১৭	—	নোটস্
১৩।	দ্য ডে - স্প্রিং ইন রাশিয়া	—	সেপ্টেম্বর, ১৯১৭	—	ফরেন পিরিওডিকালস্
১৪।	চ্যাটস্ উইথ কাউন্ট টলস্টয় ইন আমেরিকা	—	জানুয়ারী, ১৯১৮	—	প্রবন্ধ
১৫)	রাশিয়াজ ইন্টারেস্ট ইন ওয়ার	—	জানুয়ারী ১৯১৮	—	ফরেন পিরিওডিকালস্

মোট ১২টি নোটস্, ২টি 'ফরেন পিরিওডিকালস্' বিভাগে অন্য সাময়িকীর লেখা সম্বন্ধে আলোচনা আর একটি আলাপচারী প্রবন্ধ।

পর্যালোচনা

শিল্পের প্রাচুর্য আর পশ্চিমী মুক্ত চিন্তা রাশিয়াকে যে একটু একটু করে বদলে দিচ্ছিল সে খবর তার শাসকরা পায়নি। আসলে তারা ঠিক পশ্চিমী মুক্ত চিন্তা ঢুকতে দিতেও রাজি ছিল না। অথচ পরিবর্তন ঠেকানোর হাতিয়ারও তাদের ছিল না। 'মডার্ন রিভিউ' এমত সমর্থন করেছিলো যে এই মুক্ত চিন্তা আর শিল্পের উন্নতিই দীর্ঘ অর্ধদশক ধরে রাশিয়াকে নতুন করে তৈরী করেছে। তাই রাশিয়ার বিপ্লব কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া কেরামতি নয়। ১৯১৭, এপ্রিল সংখ্যায় 'দ্য রেভল্যুশন ইন রাশিয়া' নোটে লেখা হয়েছে। "The Revolution in Russia has been very sudden .... But however sudden the revolution, it was not unexpected. And whether expected or not, the soil has been prepared for it by the blood of the martyrs to the cause of popular freedom and the sufferings of the other innumerable victims of the bureaucracy."[২] এমনকি ১৮৬১-৬২ সাল থেকেই যে বিপ্লবকামীরা নিজেদের স্বার্থে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী এক রাশিয়ান উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার বন্ধুকে এক চিঠিতে লিখছেন "তুমি যদি এখন ফিরে আসো (রাশিয়ায়) তাহলে বিপ্লবী দলের উন্নতিতে চমকে যাবে।" প্রসঙ্গত বন্ধুটি কিছুদিনের জন্য রাশিয়ার বাইরে ছিলেন। এই বিপ্লবী দল তখনই উচ্চশিক্ষিতদের দিয়ে প্রচার চালাতো। দীর্ঘ ৫০ বছর পর যখন তাই মানুষের আকাঙ্খার স্ফূরণ হল মহাবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তখন তাকে কি আর অকস্মাৎ বলা যায়? 'মডার্ন রিভিউ' -এর মত ছিল এমনই। আর এ বিপ্লব যে শুধু শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে কর্মরত বিপ্লবীদেরই অভ্যুত্থান তা মনে করেনি এ পত্রিকা তথা তার সম্পাদক। তার মতে জনগণের মূল্যবোধ ও বিবেচনাবোধ জাগানোর জন্য আরও অনেকভাবে আন্দোলন হয়েছিলো। আরও অনেকেই এমন ছিলেন যারা শুরুতে নিহিলিস্ট ভাবনাকে আশ্রয় করেননি। বরং রাষ্ট্রিক কাঠামো তাদের নিহিলিষ্ট হতে বাধ্য করেছে।

তাই 'মডার্ন রিভিউ' রাশিয়ার রাজনৈতিক বিপ্লবকে প্রথমে সবচেয়ে কম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বলেই চিহ্নিত করেছিলো। সংগ্রামীরা যে সবাই হত্যাকারী বা বোমা নিক্ষেপকারী বলে পরিচিত ছিল সে মতেরও তারা বিরুদ্ধাচারণ করেছে। এমনও বলা হয়েছে, যারা হত্যা করেছেন তারাও আসলে শান্তিকামী গরিবের বন্ধু। রাশিয়ার প্রশাসন তাদের বাধ্য করেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে চলতে।[৩] এমনকি জার বা জারিনা সম্পর্কেও ভালো মন্তব্য করেছিলো মডার্ন রিভিউ। পত্রিকার মতে ব্যক্তি হিসাবে এরা ভালো হলেও প্রশাসনিক অব্যবস্থাই এদের জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[৪]

এককথায় 'মডার্ন রিভিউ' রাশিয়ার যাবতীয় অসুবিধার কারণ হিসাবে প্রশাসনকেই

দোষী সাব্যস্ত করেছে। রাশিয়ার বিপ্লবী নেতাদের উদ্যমকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে খুবই স্বার্থহীন এবং আত্মত্যাগের প্রতীক হিসাবে। এপ্রিল, ১৯১৭-র অপর একটি নোট "The effects of the revolution" - এ এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান রাশিয়া যে, সমস্ত আঞ্চলিক শক্তিকেই পৃথক স্বীকৃতি দেবে এমন আশাও প্রকাশ করা হয়েছে। ঔপনিবেশের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে স্বাধীনতার আনন্দ দেবে অন্য দেশগুলিকে। অর্থাৎ সর্বসম্মতভাবে রাশিয়ার বিপ্লবীদের নায়কের আসনে বসিয়ে দিতে চেষ্টার কসুর করেনি এ পত্রিকা। কিন্তু সেও ঐ প্রথম দু'/তিনটি নোটে।

একই সংখ্যায়, ভারতের প্রসঙ্গ উঠতেই অন্য নোটে লেখা হয় "আমরা নিশ্চয় রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্তগুলিকে এড়িয়ে যাব।[৫]

হ্যাঁ, ভুল হতেই পারে। আর মডার্ন রিভিউ এর পাঠকরা পত্রিকার কাছে সমালোচনার দাবি করতেই পারে। সেক্ষেত্রে সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে ভারতের প্রসঙ্গ টানা — সম্পাদকের দূরদৃষ্টিরই নিদর্শন। কিন্তু যে কাজের জন্য একবার কিছু লোক নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে সেই একই কাজে দ্বিতীয়বার ভুলের ক্ষতিপূরণ কেন দিতে হবে?

'The Revolution in Russia' লেখায় একবার বলা হয়েছে প্রশাসনের অযোগ্যতাই বিপ্লবীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বেছে নিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এই মতই অন্যরকম হয়ে যায় "The people of India and the Russian Revolution" লেখায়। এখানে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন "The Russian revolutionaries have succeeded in spite of, not because of the crimes and bloodshed and the assassinations rightly or wrongly associated with the revolutionary movement. We must sum all criminal methods. We must avoid the mistakes of the Russian leaders. We must work keeping the British connection intact."[৬] তার মানে পরোক্ষে কি একথাই বলা হচ্ছে যে বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন? যদিও তা প্রশাসনের দোষেই তবুও দায়ভার তাদেরই বহন করতে হবে। সম্ভবত সম্পাদক গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। হিংসার বদলে অহিংসাকে প্রাধান্য দিতেই তিনি ইচ্ছুক বেশী। তাই 'রাশিয়ার বিপ্লবী নেতাদের অনুসরণ করা উচিৎ' একথা বলার পরও সন্ত্রাসের প্রশ্নে বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

ভারতের প্রসঙ্গেই যখন একথা বলা তখন একটু অন্যভাবেও বোধহয় ভাবা যেতেই পারে। ভারতীয় রাজনীতির বিভক্তিকরণ তখন আর নতুন ঘটনা নয়। নরমপন্থীরা তাদের মতো করে দাবিদাওয়া আদায়ে সচেষ্ট। চরমপন্থী কার্যকলাপও ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে। বোমা নিক্ষেপ, হত্যা, ডাকাতি তখন রাজনৈতিক অপরাধের তালিকায়

জায়গা করে নিয়েছে। পরিসংখ্যান বলে,[৭]

বছর	বোমা নিক্ষেপ	হত্যা	ডাকাতি	অন্যান্য ঘটনা
১৯০৭	—	১	৩	৩ ট্রেন ধ্বংস
১৯০৮	৬	৯	৮	—
১৯০৯	১	২	১০	১ অস্ত্রশস্ত্র লুট
১৯১০	—	১	৭	১

ধরা যেতেই পারে যে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এসব কাজও নিশ্চয় সমর্থন করেননি। হ্যাঁ, তা বলে অবশ্যই এ দাবি করবো না যে তিনি কট্টর নরমপন্থী ছিলেন। আসলে চিন্তাধারার যে স্তরে তিনি বিচরণ করতেন সেখানে তার সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখনীও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বারবার ঝল্‌সে উঠেছে। 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অবশ্য সারা বিশ্বেই সাহিত্যিকরা আন্দোলনকে সমর্থন করলেও হিংসাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও টলস্টয়ের ভূমিকা এমনই। ডস্তয়েভস্কিও 'The Possessed' উপন্যাসে সন্ত্রাসকারী নেচায়েভকে নিন্দা করেছিলেন। আসলে এরা ছিলেন সমাজ পরিবর্তনের মনোভাবাপন্ন সাহিত্যিক। কিন্তু যেকোনো মূল্যে সমাজ পরিবর্তনকারী নেতা বলে আলাদা করে এদের চিহ্নিত করা যাবে না। এরা সমাজ পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনকে দেখিয়েছেন। তাই মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে এদের তফাৎ দেখা যায়। নারোদনিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এ দু'জন কিন্তু নিন্দা করেননি। এমনকি মেনশেভিকদের বিরূপতা স্বত্ত্বেও লেনিন সন্ত্রাসবাদকে ত্যাগ করতে রাজি হননি। এর থেকেও একধাপ এগিয়ে বলা যায় স্বয়ং স্ট্যালিন তো একজন সন্ত্রাসবাদী নেতাই ছিলেন। 'কোবা' ছদ্মনামে তার সক্রিয় কার্যকলাপও উল্লেখযোগ্য।

আমাদের আলোচ্য পত্রিকার সম্পাদক সেই সাহিত্যিকদেরই পদানুসরণ করেছেন। তাই ভারতীয় চরমপন্থা বর্জনই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এমনকি চরমপন্থী বিভাজনের দীর্ঘ দশ বছর পরেও তিনি তাই বলতে পারেন "but the souls of Indians are proof against any such agitation."[৮]

'মডার্ন রিভিউ' তে এপ্রিল সংখ্যার পর রাশিয়া নিয়ে কোনো খবর জুলাই মাসের আগে পাওয়া যায় না। না কোনো প্রবন্ধ, না কোনো সম্পাদকীয় মতামত। এমনকি জুলাইতে যা পাওয়া যায় সবটাই রাশিয়া সম্বন্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকার মতামত অথবা রাশিয়ার পুলিশ বা আর্মি সম্বন্ধীয় লেখা। সেপ্টেম্বরে 'বিদেশী পত্রিকা' (foreign

Periodicals) বিভাগে 'Contemporary Review'-এর একটি লেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রধান কারণ হিসাবে বলা হয়েছে 'দুমা'র কিছু নেতাদের কথা। তাদের নির্বুদ্ধিতাই সম্ভবত রাশিয়ার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো।

রাশিয়ার বিপ্লবের মূল হোতা লেনিন বিপ্লবে যোগ দেন এপ্রিল মাসে। সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না পত্রিকায়। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে জনগণ ঠিক মেনে নিচ্ছে না, সেখানে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছে তার কোনো বিবরণই পাওয়া যায় না। অথচ আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব বা ফিজির শ্রমিক আন্দোলন কিন্তু নিয়মিত জায়গা করে নিয়েছিলো। শুধুমাত্র বামপন্থী ভাবাদর্শ আছে বলেই কোনো বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে, তা যেমন ঠিক নয় তেমনই সেই আদর্শকে সামনে রেখে যারা ভালো কাজ করছে তাদের অন্ধকারে রাখাও ঠিক নয়। যে 'মডার্ন রিভিউ' বিসমার্ক বা মুসোলিনির কথা বলতে বাধা পায়নি, তার পাতায় কিন্তু লেনিন, প্লেখানভ, মাত্রোভ বা ট্রটস্কির কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। অন্তত সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে! আবার মার্কস সম্বন্ধে প্রথম কোনো ভারতীয় পত্রিকা যদি পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রকাশিত করে তবে তার নামও 'মডার্ন রিভিউ'। ১৯১২-র মার্চ মাসে হরদয়ালের লেখা প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'কার্ল মার্কস ঃ এ মডার্ন ঋষি'।[৯] কি অদ্ভুত বৈপরীত্য।

নভেম্বরের সামাজিক বিপ্লবেরও কোনো খবর 'মডার্ন রিভিউ' দেয়নি। অথচ ১৯১৮, জানুয়ারী সংখ্যায় কাউন্ট টলস্টয়ের সঙ্গে এক দীর্ঘ আলাপচারিতার বিবরণ মেলে। নভেম্বরের বিপ্লব সমাজ পরিবর্তনের চিরকালীন এক অনুসরণমূলক উদাহরণ। আর 'মডার্ন রিভিউ' এর সম্পাদকও ছিলেন পরিবর্তনশীল সমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তবুও কোনো প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মতামত ১৯১৮-র মাঝামাঝি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সামান্য যা উল্লেখ তাও 'বিদেশী পত্রিকা' বিভাগে অন্য সাময়িকীর আলোচনার উদ্ধৃতি।

ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায় যখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার indomitable passion for freedom[১০] -এর কথা বলেন তখন কোন্ স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন তিনি? রাশিয়ার মানুষের যে সামাজিক স্বীকৃতি লাভের মুক্তি, চিন্তার দৈন্যতা থেকে মুক্তি — এ কি স্বাধীনতা নয়? খোদ সম্পাদক তো এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। তাই তো তার পত্রিকাকে রাজনৈতিক পত্রিকা না বলে সমাজ রাজনীতি বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা বলা হয়।

খুব সাধারণভাবে দেখলে বলা যায় হয়ত লেনিন 'সন্ত্রাসবাদ' কে প্রশয় দিতেন বলেই সম্পাদক তাকে কৌলীন্য দেননি। খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও সম্পাদকের প্রো মডারেট

অ্যাটিচিউড' কিন্তু ধরা যাচ্ছে। অন্তত সম্পাদক তথা সমালোচক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এ ভুল বা অবহেলা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। যে ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে আনতে পারত নতুন আঙ্গিক তাকে কেন যে আড়ালে রাখলেন তা সত্যিই অবাক করে দেয়। তিনি তো সরাসরি অভিযোগ আনতে পারতেন। যেমন রাশিয়ার ব্যাপারে ব্রিটেনের মতামতকে তিনি যথেষ্ট কাটাছেঁড়া করেছেন। হাউস অফ কমন্‌সের বলা লয়েড ওর্জের উক্তি 'a free people were the best defenders of their own honour"[১১] কে উদ্ধৃত করে ভাবতের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা ভিন্ন কেন তা প্রশ্ন তুলেছেন? 'free people' বলতে কি বোঝায় বা ভারতের মানুষ কেন 'হোমরুল পাবে না সে কথাও বলা হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপতি উইলসন যখন রাশিয়ার চিঠি দিয়ে নিজেদের ভাব ব্যক্ত করেছেন তারও খসড়া ছাপানো হয়েছিল। উইলসন বলেছিলেন "No people must be forced under a sovereignty under which it does not wish to live"।[১২] এর উত্তরে সম্পাদকের জিজ্ঞাসা ছিল "Has America any message for India?[১৩]

যিনি এভাবে তুলনামূলক বিবরণ দিতে পারেন তিনি তো অনায়াসেই রাশিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে আমাদের মুক্তিকামী সংগ্রামীদের তুলনায় যেতে পারতেন। অবশ্য ১৯২৫, জুন সংখ্যায় "বলশেভিকস্ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টস্" শিরোনামে লেখা একটি নোটস্ পাওয়া। কিন্তু এখানেও তুলনা বলতে কিছুই পাওয়া যায় না। বরং এক রাশিয়ান অধ্যাপকের লেখায় বলশেভিক ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া হয়েছে। একথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে ১৯১৭-১৮ সালে রাশিয়া নিয়ে একটিও প্রবন্ধ পত্রিকা অফিসে কেউ পাঠায়নি। 'মডার্ন রিভিউ' তে লেখা মানে তখনকার দিনে বিদগ্ধ সমাজে আসন পাওয়া। কোনো বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবির কি মনে হয়নি রাশিয়া নিয়ে কিছু কথা বলার আছে। ১৯১৭, এপ্রিল সংখ্যা থেকে ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পর্যন্ত রাশিয়া নিয়ে যে মাত্র ১২টি সম্পাদকীয় মন্তব্য, বিদেশী পত্রিকার থেকে উদ্ধৃতির আলোচনা দু'টি আর কাউন্ট টলস্টয়কে নিয়ে একটি মাত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা আগেই দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যানই বলছে রাশিয়া নিয়ে পত্রিকা কতটুকু ভাবিত ছিল। তাছাড়াও 'মডার্ন রিভিউ' -এর যে ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য, ঘটনা পরম্পরা বজায় রাখা — তার সঙ্গেও এ বিপ্লব সঙ্গতিহীন। রাশিয়ার সামাজিক পরিবর্তন এ পত্রিকার ব্রাত্য বিষয়।

তাই রাশিয়ার বিপ্লব নিয়ে আলোচনায় কয়েকটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার—

১) মূলত যে সম্পাদকীয় মতামতের জন্যই মানুষ আগ্রহ নিয়ে 'মডার্ন রিভিউ'

পড়ত তা যথেষ্ট সুষম হলেও ব্যক্তিনির্ভরতার সীমা ছাড়াতে পারেনি। অন্তত রাশিয়ার বিপ্লবের ক্ষেত্রে। ২) সম্পাদকের নিজস্ব আদর্শ বিষয় নির্বাচনকে সামান্য হলেও প্রভাবিত করেছে।

৩) সম্পাদক মতামত দিয়েছেন বিপ্লবের সহিংস দিকগুলি বর্জনের। কিন্তু বিকল্পের সন্ধান দেননি।

৪) ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে আপাত লঘু করে দেখেছেন।

৫) নিজের একপেশে মনোভাব কি সম্পাদক এর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলন? তাই বৈপরীত্যের তাড়নায় ভুগেছেন বারবার? আসলে বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যম সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। বিশেষত সেইসময় যখন ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রবণতা শুরু হয়নি। লেখনী থাকত সৎ, নির্ভীক সাংবাদিকদের হাতে। যখন বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপে সত্যিটাকে কষ্ট করে সত্যি বলতে হত না। এমন সময়ে সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজী পত্রিকার এমন আচরণ মনে সংশয় জাগায়। হয়ত ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসকে একটু নতুন করে দেখার সময় এসেছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। রামানন্দ চ্যাটার্জী, সিলেক্টেড রাইটিংস অ্যান্ড ট্রিবিউটস/বেনসনস্/পৃঃ ৪
২। দ্য মডার্ন রিভিউ/ ১৯১৭ এপ্রিল/ দ্য রেভল্যুশন ইন ইন্ডিয়া/ পৃঃ ৪৭৯
৩। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/ দ্য রেভল্যুশন ইন ইন্ডিয়া/ পৃঃ ৪৮০
৪। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/ দ্য রেভল্যুশন ইন ইন্ডিয়া/ পৃঃ ৪৮০
৫। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/ দ্য পিপল্ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন/ ।পৃঃ ৪৮৪
৬। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/ দ্য পিপল্ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন/ পৃঃ ৪৮৪
৭। হিস্ট্রী অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ২য় খন্ড (১৯৬৩)/ পৃঃ ৪৯
৮। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/ ইন্ডিয়া ডাজ নট চেঞ্জ/পৃঃ ৪৮২
৯। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১২, মার্চ/ কার্ল মার্কস ঃ এ মডার্ন ঋষি/পৃঃপৃঃ ২৭৩-২৮৬
১০। রামানন্দ চ্যাটার্জী, সিলেক্টেড রাইটিংস অ্যান্ড ট্রিবিউটস/বেনসনস্/পৃঃ ১৪
১১। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/ দ্য রুলারস্ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন/পৃঃ ৪৮৫
১২। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, এপ্রিল/প্রেসিডেন্ট উইলসনস্ মেসেজ টু দ্য রাশিয়ান পিপল্/পৃঃ ৯৪
১৩। দ্য মডার্ন রিভিউ / ১৯১৭, জুলাই/প্রেসিডেন্ট উইলসনস্ মেসেজ টু দ্য রাশিয়ান পিপল্/পৃঃ ৯৪

রাজনীতির আঙিনায় বিবেকানন্দ : ভূমিকা ও অবদান

অঙ্কুর রায়

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। হিন্দু ধর্মকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সবই আমরা জানি। কিন্তু বিবেকানন্দ কি কখনও রাজনীতির আঙিনায় এসেছেন? তারাও আগের প্রশ্ন তিনি তো ছিলেন ধর্ম জগতের লোক, তিনি কি রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন? দুটো প্রশ্নেরই উত্তর — হ্যাঁ। আমরা রাজনীতি বলতে কি বুঝি? একটা দেশ চালানোর নীতি, শাসনব্যবস্থা, আইন, জনগণের সেই শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি-তো। এগুলো সম্পর্কে বিবেকানন্দ যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিবেকানন্দ পরিব্রাজন কালে সারা ভারত ঘুরেছেন। দেখেছেন মানুষের জীবনযাপন, দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রীতিনীতি। আর এর সঙ্গে তিনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও পুঁথি যেমন গভীরভাবে পাঠ করেছেন তেমনি ইউরোপের দার্শনিকদের মতবাদের উপরও ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। তাই প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন যুগের শাসন প্রণালী, সমসাময়িক বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল।

বিবেকানন্দ প্রথমত এবং শেষত ধর্মজগতের লোক ছিলেন একথা সত্যি এবং একথাও সত্যি তাঁর ধর্মের অবস্থান সাধারণ মানুষ ও সমাজের বিপ্রতীপে নয়। তিনি ধর্মের আর্থ-সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করে বললেন সমাজের দুর্দশার সঙ্গে একাত্ম হওয়াই ধর্ম। মানুষের দুঃখ দূর করার চেষ্টাই পূজা। তাই তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি লিখেছেন — "ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে — এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়িঁর বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন — এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে"। তিনি দেখলেন অভিজাত শ্রেণী ধর্মকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। ধর্মীয় আচারের আড়ম্বরে ধর্ম যাচ্ছে চাপা পড়ে। তাই তিনি 'পৌরহিত্যরূপ অনাচারের' 'মূলোচ্ছেদ' করার ডাক দিলেন।

নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এবং ইতিহাসের নিষ্ঠ পাঠক হিসাবে শ্রেণীর আর্বিভাব, সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব, আর শোষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য -এ সমাজের বিবর্তন নিয়ে হাল্কা চালে লিখতে লিখতে তাই তিনি তিক্ত মন্তব্য করেছেন — 'যে চাষ করলে সে পেল ঘোড়ার ডিম''। ইতিহাসের গতি পর্যালোচনা করে তিনি দেখালেন — ''মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয় — পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)।'' ''প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে — এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে — এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না''।

ইউরোপ আমেরিকায় দীর্ঘ ভ্রমণ, অভিজাত সমাজে অগাধ মেলামেশা এবং সংবাদপত্র তন্ন তন্ন পাঠ করে পার্লামেন্টিয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ তাঁর কাছে খুলে গিয়েছিল। তিনি গণতন্ত্রের ভালো দিকগুলি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিন্তু জানতেন ভারত কোটি কোটি অশিক্ষিত পশুপ্রায় মানুষ নিয়ে এখনই তা গ্রহণে প্রস্তুত নয়। ভবিষ্যত ভারতের স্বপ্ন তিনি বহুবার বর্ণনা করেছেন বটে কিন্তু ভারতের শাসনব্যবস্থা নিয়ে কোন স্পষ্ট চিত্র তাঁর কাছ থেকে আমরা পাই নি। অবশ্য আমাদের একথা মনে রাখতে হবে তাঁর কাজ, তাঁর শিক্ষা, তাঁর বাণী ভিত্তি স্তরের। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার, আত্মবিশ্বাসের বিস্তার — তবেই তৈরী হবে মানুষ। তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা বেছে নেবে।

আমরা বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার কিছু পরিচয় পেলাম — যা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনাবলীর বিভিন্ন পাতায়। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাবলী, তাঁর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চিন্তার বিশ্লেষণ না করে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সামগ্রিক রূপ দেওয়া যাবে না। আর এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। আমরা এখানে ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তাঁর বিভিন্ন চিন্তা ও উদ্যম যা রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক রাজনীতিতে যার সুদূর প্রসারী ফল ছিল তা এবং তাঁর অবদান নিয়েই আলোচনা করব।

দেখা যাক বিবেকানন্দ রাজনীতির আঙিনায় কখন প্রথম প্রত্যক্ষ পদার্পণ করেন। সঠিক সময়টা বলা না গেলেও বলতে পারি ১৮৮৮ খ্রিঃ বা তার পরে। এই সালটিকে বেছে নেওয়ার কারণ এই বছরই বিবেকানন্দ ভারত পরিব্রাজনে বেরোন। এই পরিব্রাজক জীবনেই তিনি একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ, তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, তাদের অবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন তেমনি একইসঙ্গে তিনি অনেক দেশীয় রাজা ও উচ্চ রাজকর্মচারীকে তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ করেন। প্রথম ঘটনাটা যেমন

তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হবার সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতীয়টি তেমনি তাঁর কিছু রাজনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত।

ঠিক এই সময়টায় ভারতীয় রাজনীতি একটা নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে। রাজনীতির মূল স্রোত আবর্তিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের সংগঠন কংগ্রেসের দয়া ভিক্ষা করে। পাশাপাশি বাংলায় জাতীয়তাবোধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আনন্দমঠ (১৮৮১-৮২) প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু মেলার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে বাসুদেব ফাড়কে চারিদিক সচকিত করে তুলেছেন।

এই সময়ে রাজনীতির অর্থ ছিল একদিকে ব্রিটিশের কাছ থেকে কিছু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা আদায় করা, অন্যদিকে দেশসেবা ও স্বাধীনতা। দেশ সেবার ভাব আসে দেশের মানুষের সাথে একাত্মতা হতে আর স্বাধীনতার ভিত্তি হল আত্মবিশ্বাস। এ দুটোই উনিশ শতকের শেষ লগ্নে ভারত প্রথম পায় বিবেকানন্দের থেকে। আমরা ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দের ভাষণ দেওয়াকেই বিবেকানন্দের প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় তাঁর বিজয়ের সংবাদ যখন ভারতে এসে পৌঁছাল তখন দেশে একটা তীব্র উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। একথা আমরা সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি। তাঁর ইউরোপ-আমেরিকায় বক্তৃতাবলী, পাশ্চাত্য-র উপর প্রভাব বিস্তারের সংবাদ ভারতের শিক্ষিত সমাজকে আত্মসচেতন করেছিল। তারা বুঝল ভারত বিজিত হতে পারে কিন্তু অন্য কারও থেকে ছোট নয়। স্বামীজীর চোখ দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর ভারত নিজেকে আবার দেখল। একারণেই ১৮৯৭ সালে যখন স্বামীজী ভারতে ফিরলেন তখন কলম্বো হতে কলকাতায় আক্ষরিকভাবেই সহস্র সহস্র মানুষের ঢল নামলো তাঁকে দেখতে, তাঁকে জানতে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে।

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়কে ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। কারণ এই প্রথম গণস্তরে ভারত সচকিত হল, উদ্দীপিত হল, আত্মসচেতন হল এবং আত্মবিশ্বাস পেল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসের এটাই গোমুখ। বিবেকানন্দ নিজেও তাঁর পাশ্চাত্য বিজয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক সচেতন ছিলেন। তিনি ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেন — "আমাকে যাইতে হইয়াছিল, কারণ এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম চিহ্ন"।

অবশ্য বিবেকানন্দ অনেক আগেই রাজনীতির মঞ্চে আসেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Swami Vivekananda : Patriot prophet গ্রন্থে লিখেছেন — "........ সিস্টার ক্রিস্টিন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য

ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট করার পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল। সেজন্য আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। এইজন্য আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাকসিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম'। ....'' তিনি যে এমন চেষ্টা করেছিলেন তাঁর প্রমাণ পাচ্ছি তাঁর নিজের কথায়। আমেরিকা যাবার আগেই ১৮৯২ সালে তিনি তাঁর শিষ্য হরিপদ মিত্রকে যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর এই প্রচেষ্টার ছায়া পাওয়া যায় — "হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়ে সৎকার্য করাতে পারলে যে ফল হবে, একজন শ্রীমান রাজাকে সেইদিকে আনতে পারলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হবে ভাব দেখি! গরিব প্রজার ইচ্ছা হলেও সৎকার্য করবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গল বিধানের ক্ষমতা পূর্ব থেকেই রয়েছে, কেবল তা করবার ইচ্ছা নেই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তার ভিতর একবার জাগিয়ে দিতে পারি তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে তার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরে যাবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হবে।"

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানাচ্ছেন যে ভগিনী নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেমঁ তাঁকে লিখেছেন ঃ "মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'এগুলি একেবারে আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা। স্বামীজী অনেক কিছুই করেছিলেন। চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে! আমি সেগুলি কিনেছি। অস্ত্রসহ একটি নৌকা ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি"। অর্থাৎ স্বামীজীর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের গূঢ় যোগাযোগ ছিল। তিনি শুধু তাঁদের কাজের সমর্থক ছিলেন তাই নয়, ইউরোপ আমেরিকার উঁচু মহলে তাঁর প্রভাব খাটিয়ে বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহ করে দিতেন এমনকি কিনেও দিতেন।

স্বামীজী ১৯০১ সালে ঢাকায় আসেন। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ এসময় স্বামীজীর সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠভাবে এবং একান্তে' সাক্ষাত করেন। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ হেমচন্দ্রের সাক্ষাতকার নিয়ে একটি গ্রন্থ লেখেন — স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে। এই গ্রন্থে হেমচন্দ্রের নিজের লেখা একটি প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত করেন যা হেমচন্দ্র তাঁরই অনুরোধের ভিত্তিতে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতকারের ওপর লেখেন। এই প্রবন্ধে হেমচন্দ্র নতুন কিছু তথ্য দেন যা তিনি আগে ভূপেন্দ্র নাথকে দেননি। এই গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম খন্ড নামে প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্র বলছেন — "আমাদের সকলের কাছেই সেই সাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত

হয়েছিলাম। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন ঢাকায় 'মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম যা পরে আরও বৃহৎ আকারে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সে রূপান্তরিত হয় ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে। সুতরাং 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা পরবর্তীকালের বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' -এর প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ হয়েছিল তখনই যখন স্বামীজীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারের সৌভাগ্য আমরা পেয়েছিলাম।''

হেমচন্দ্র জানাচ্ছেন স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন — ''আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা — পলিটিক্যাল ফ্রিডম। তাই সর্বপ্রথম ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বুলি কপচিয়ে নয়, বিল পাস করে নয়, গায়ের জোরে। সংঘবদ্ধ সংগঠিত আক্রমণের দ্বারা। (চাই) অরগ্যানাইজড্ কালেকটিভ অ্যাকশন আনডার ওয়ান লিডারশিপ। তারা (ইংরেজরা) দস্যু, তারা তস্কর, তারা পরস্বাপহারী, তারা ইনট্রুডারস এক্সপ্লয়টারস, তারা ব্লাডমাকারস — আমাদের বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছে। ঐ রাক্ষসদের তোদের বিনাশ করতে হবে। What right the Britishes have to rule our country? They shall have to go back to England. It is our birth place. To drive these intruders and plunderes away from our country. therefore is your only religion now. এই তোদের এখন একমাত্র ধর্ম — the only programme to be executed now.'

হেমচন্দ্রের এই সাক্ষ্য থেকে একথা অনুমান করা কি ভুল হবে যে বিবেকানন্দ হেমচন্দ্রের মত অনেক বিপ্লবীরই মন্ত্রগুরু। অবশ্য অনুমান করার বিশেষ আবশ্যকতা নেই। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর প্যাট্রিয়ট প্রোফেটে লিখেছেন — '' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বামীজীর এই বিপ্লব প্রচেষ্টার সংবাদ বিপ্লবের আদিপর্বের নেতাদের কাছে অবিদিত ছিল না। স্বামীজী স্বয়ং একথা বেলুড়ে পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন। .... স্বামীজীর সঙ্গে এই কথাবার্তার সংবাদ দেউস্কর ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার প্রধান বিপ্লবীদের কাছে প্রকাশ করেন। স্বামীজীর বিপ্লব-প্রয়াসের এই বার্তা তাঁদের মনোবলকে আরও সুদৃঢ় করেছিল''।

একদিকে তিনি দেশীয় রাজাদের নিয়ে শক্তিজোট গঠন কর‍্যার চেষ্টা করছেন, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করছেন, অন্যদিকে হেমচন্দ্র প্রমুখকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন। এই দ্বিতীয়টির গুরুত্ব দূরপ্রসারী। কারণ যুবক বিপ্লবীরা এর আগে গীতা পড়েছেন, আনন্দমঠ পড়েছেন — কিন্তু সবই কবি-কথা। এর পিছনে জীবন্ত চরিত্র ছিল না। এই প্রথম তাঁরা দেখলেন এক জ্বলন্ত চরিত্রকে। যিনি স্বয়ং নির্ভীক। ইংল্যান্ড-আমেরিকায় বসেই বিপজ্জনক কথাবার্তা বলতে যাঁর ভয় নেই। এক জ্বলন্ত বীরের নিজের মুখ থেকে উচ্চারিত বাণী তাঁদের সহস্রগুণ উদ্দীপ্ত করলো। তারা জানলো অন্য কোনো দেবতার

পূজা নয় — "আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরিয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন"। তারা জানলো — "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত"। স্বামীজীর বাণী বিপ্লবীদের কানে কানে হেঁটে তাদের জাগিয়ে তুললো।

এরই পাশাপাশি রাখতে হবে বিভিন্ন বক্তৃতা এবং পত্র ও প্রবন্ধাদিতে ইতস্তত তাঁর আগুণে পংক্তিগুলোকে। তরুণ দেশসেবকদের কাছে যেগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও উৎসাহবর্ধক। যেমন — "এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?" বা "মাকে রুধির দিয়ে পূজা করব। ..... রুধির নইলে কি মার তৃপ্তি হয়? মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয়; তবে তিনি প্রসন্না হন।" বা "তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস.... পিছনে চেয়ো না — অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদুক, পিছনে চেয়ো না। সামনে এগিয়ে যাও। ভারত মাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান।" এই শেষ উক্তিটিতো বিপ্লবের বন্ধুর পথে একাকি চলার ডাক দিচ্ছে, যে পথের শুরুতে প্রিয়জন কাঁদবে অন্তিমে নিশ্চিত মৃত্যু বা " গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে।" এমন আরও সহস্র।

এবার দেখা যাক বিবেকানন্দ-র বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা জেনে, তাঁর স্বমুখে তাঁর বাণী শুনে সমসাময়িক যুবসমাজের উপর, বিপ্লবীদের উপর কি প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা তাঁকে কোন চোখে দেখেছিলেন। বিপ্লবী অনন্ত সিংহ তাঁর সূর্যসেনের স্বপ্ন ও সাধনায় লিখছেন যে মাষ্টারদা স্বামীজীর কর্মযোগ ও গীতা পাঠ করতে বলতেন। আরো জানাচ্ছেন যে সেসময় বিপ্লবীদের ঘরে মা কালী ও বিবেকানন্দের ছবি ও একটি গীতা রাখা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্য যে মৃত্যুর আগে বা সামান্য পরেই তিনি দেবতার সঙ্গে একাসনে স্থান পাচ্ছেন। কি পরিমাণ শ্রদ্ধা তাঁর উপর থাকলে এক লৌকিক ব্যক্তিত্ব অলৌকিকত্বে উত্তীর্ণ হতে পারেন!

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক গণেশ ঘোষ তাঁর বিপ্লবী সূর্য সেন গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে 'বিবেকানন্দের শ্বাস প্রশ্বাসেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল ভারতের স্তিমিত জাতীয়তাবাদ।' এঁর মন্তব্যের গুরুত্ব হল ইঁনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেননি বরং কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। অর্থাৎ এর মন্তব্যে ভক্তির ভাবুকতা থাকবে না।

বিবেকানন্দের প্রভাব বিপ্লবী বাংলার মনে কি গভীর প্রোথিত তার একটি অনবদ্য চিত্র পাই। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর যোদ্ধা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসির পূর্বে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে প্রীতিলতাকে লিখছেন — "মনে হচ্ছে একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজীর মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম। আমার ওটা খুব ভালো

লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি?' ভেবে দেখা প্রয়োজন কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে তৎকালীন সময়ে এক মহিলা তাঁর ভক্তিস্পদের ছবি পোশাকে বহন করেন।"

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে আমাদের অনুরূপ শ্রদ্ধার একটি কাহিনী জানিয়েছেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসির আসামি কানাইলাল জেল সুপারকে বিবেকানন্দ বোঝাচ্ছেন — 'এই আমাদের মন্ত্র, আমাদের বাইবেল, আর তোমাদের মৃত্যুর পরোয়ানা। মরতে আমরা ভয় পাই না, সাহেব। ..... যাঁর লেখা আমি পড়ছি সেই বিবেকানন্দ আমাদের তা শিখিয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর সন্তান।' লক্ষ্যের যে কানাইলাল তাঁদের বিপ্লবী জীবনের পথদ্রষ্টা হিসাবে বিবেকানন্দকেই নির্দেশ করছেন। আর যিনি এই ঘটনাটির সাক্ষী ছিলেন তিনি মানিকতলা বোমা মামলার আসামি, অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবব্রত বসু। ইঁনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হন।

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বিবেকানন্দের প্রভাব শুধু বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। তাঁর পরিব্রাজন কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের একটা অংশ তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন। বিশেষত বিপ্লবের অন্য দুই কেন্দ্র মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিবেকানন্দের আসন যথেষ্ট উচুঁ ছিল। বালগঙ্গাধর তিলক, বিবেকানন্দ যখন বিবেকানন্দ হননি তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাগমনের পরও তাঁর সঙ্গে তিলকের সাক্ষাৎ হয়। ১৯০১ সালে তিলক বেলুড়ে আসেন। তিলকের সহযাত্রী বিনায়ক বিষ্ণু রাণাডের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় বিবেকানন্দ চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। আর একথা বিদিত যে তিলকের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই একথা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে অন্তত পরোক্ষভাবে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাব পড়েছিল।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিবেকানন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল বাংলাদেশে। অরবিন্দ হতে সুভাষচন্দ্র সকলেরই প্রেরণা ছিলেন বিবেকানন্দ। তার মানে এই নয় যে তৎকালীন রাজনীতিক এবং বিপ্লবীরা কেবলমাত্র বিবেকানন্দ থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বিবেকানন্দের জীবন, তাঁর বাণী, তাঁর স্বপ্ন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ এক স্মৃতিকথায় লিখেছেন — 'স্বামী বিবেকানন্দ যত বড় মহাপুরুষই হউন না কেন — বাংলার বিপ্লবীরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন বন্ধুরূপে, পথদ্রষ্টা অগ্রজরূপে। ..... তাই বিবেকানন্দ বিপ্লবীর রক্তের আত্মীয়, পথের বন্ধু, আদর্শ-সাধনার গুরু, সর্বসময়ে তাঁহাদের নিকটতম জন -- দূরের মানুষ নহেন।

সমকালীন রাজনীতি, বিশেষত বিপ্লবের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাব আমরা দেখলাম। আমরা জানি কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি চাইতেন আত্মবিশ্বাসী সংগ্রামের পথে আসুক স্বাধীনতা। কিন্তু তৎকালীন বিপ্লববাদের যে সংকীর্ণতা বিবেকানন্দ তাঁর ওপরে উঠতে পারেননি। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতে আসার ডাক দেননি। হেমচন্দ্র ঘোষ অবশ্য সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি যখন ঢাকায় বিবেকানন্দের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর মুসলমান বন্ধুরাও ছিল এবং তাঁরাও পরে বিপ্লববাদে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সমকালীন গীতা-আনন্দমঠ দেশমাতার পূজা চিহ্নিত বিপ্লবের পথ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজকে আকর্ষণ করেনি। বিবেকানন্দ নিজে ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন না, ছিলেন সকল ধর্মপথের সত্যতায় বিশ্বাসী। কিন্তু ভারতীয় জাতি বলতে তিনি হিন্দু জাতি বুঝিয়েছেন — তাঁর জাতি ধর্ম ভিত্তিক জাতি। এই ভৌগলিক ক্ষেত্রের মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কি এই জাতির বাইরে থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তরও পাই না তাঁর থেকে, যদিও তিনি বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামি দেহের কথা বলেন কিন্তু সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেননি। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ইত্যাদি সবই হিন্দুধর্ম কেন্দ্রিক --- অন্তত আপাতভাবে। বিবেকানন্দ বিপ্লববাদের অন্যতম ভগীরথ, বিপ্লবীদের প্রেরণাদাতা তাঁদের পূজ্য সবই ঠিক, কিন্তু বিবেকানন্দ বিপ্লবের কোন পথ নির্দেশ করেননি। শুধু বলেছেন সংগ্রামের কথা। তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-এ তিনি যে পার্লামেন্টিয় গণতন্ত্রের পক্ষে নন একথা বোঝা যায়। তিনি সোশালিজম-কে পছন্দ করতেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা কি হবে, তাঁর সোশালিজমের রূপটাই বা কেমন, স্বাধীন ভারতেব ধর্মীয় চরিত্র কি হবে একথার সুস্পষ্ট উত্তর তিনি দেননি।

বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে এই সকল সমালোচনার বিরুদ্ধে কেবল একটা কথাই বলা যায় — বিবেকানন্দের ভূমিকা ছিল অগ্রদূতের। তিনি ভারতকে জাগাতে, সচেতন করতে এসেছিলেন। তাঁর মিশন ছিল মানুষ তৈরী। তাঁর হিন্দু ধর্ম গোঁড়া নয় উদার। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার। ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াক, সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আনুক, নিজের প্রয়োজনীয় শাসনব্যবস্থা নিজেই তৈরী করুক — এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু সূত্র আর উৎসাহ। বিবেকানন্দই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা এবং রাজপুতানা হতে বাংলা দেশটাকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি যে সেই চেষ্টা করেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। আর সময়ের বিচারে সেই প্রচেষ্টা ছিল রাজনৈতিক।

সূত্র-নির্দেশ

১। বাণী ও রচনা — স্বামী বিবেকানন্দ।

২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ — শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৩। নিবেদিতা লোকমাতা — শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৪। Swami Vivekananda : Patriot Prophet – Bhupendra Nath Dutta.

৫। স্মৃতির আলোয় স্বামীজি — সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

৬। স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম — স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

৭। সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা — অনন্তসিংহ।

৮। বিপ্লবী সূর্য সেন — গণেশ ঘোষ।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস ও চর্চা

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবতবর্ষে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস এক আধ বছরের নয়। প্রায় দুশো বছর আগে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'দিগদর্শন' পত্রিকায় প্রথম বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা বুক সোসাইটির উদ্যোগে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ১৮১২ সালে। তবে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা প্রকাশ করাই বিজ্ঞান জ্ঞাপনের একমাত্র পদ্ধতি নয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপন শুরু হয়েছে 'দিগদর্শনের'ও আগে থেকে। বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস শুরু হয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন মানুষ 'বাংলাভাষা ও বিজ্ঞান' একই সঙ্গে দুটোই উপলব্ধি করতে শিখেছে। তবে সেই প্রাচীন বাংলা বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস আলোচনা করার সুযোগ এই নিবন্ধে নেই। এই নিবন্ধে আলোচনা করা হবে মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপন কে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ অবধি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার আগে জ্ঞাপন সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার। জ্ঞাপনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Communication। লাতিন শব্দ Communis থেকে এটি এসেছে। Webster অভিধানে জ্ঞাপন বা Communication এর অর্থ হল (১) একটি সাধারণ প্রতীকের মাধ্যমে দুই ব্যক্তির মধ্যে বাক্য বা সংকেত বিনিময় পদ্ধতি, (২) তথ্য সম্প্রচারে উপযোগী প্রযুক্তি কৌশল। আমাদের আলোচনা মূলত প্রথম অর্থটিকে নিয়ে।

জ্ঞাপন বা Communication এর অভিধানগত সংজ্ঞা খুবই সংকীর্ণ। তবে, সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় জ্ঞাপনের অর্থ ব্যাপক, বার্ণাড বেরেলসন ও লিওনার্ড বারকোভিচ জ্ঞাপনের সংজ্ঞায় বলেছেন ঃ 'জ্ঞাপন - প্রতীকের সাহায্যে তথ্য, ধ্যানধারণা, ভাবাবেগ, নৈপুণ্য প্রভৃতি প্রেরণ পদ্ধতি'। মেরিল ও র‍্যালফ লাউয়েনস্টাইনের ভাষায় জ্ঞাপন হল

— 'দ্বিমুখী পথ, কথাবার্তা ছুটে চলে উভয় পথ ধরে', ডার্জ গারনারের মতে জ্ঞাপন হল এক 'সামাজিক মিথোস্ক্রিয়া', ফাউলেস্ ও আলেকজান্ডারের মতে জ্ঞাপন হল 'প্রতীকী আচরণ'। কলিন চেরীর ভাষায় 'জ্ঞাপন হল উদ্দীপনা প্রেরণ ও তার সাহায্যে প্রত্যুত্তর সৃষ্টি'। জি. এ. মিলার প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীর মতে 'জ্ঞাপন বিদ্যা শুধু মাত্র গ্রাহক প্রেরককে কি বার্তা পাঠাল সেই দিকেই আলোকপাত করবে। তবে প্রেরকের সচেতন ইচ্ছা থাকা চাই যে তিনি গ্রাহকের মনকে নাড়া দেবেন।' ভার্গিস কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন 'জ্ঞাপন শুধু বার্তা প্রেরণ-ই নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু। জ্ঞাপনের অর্থ উপলব্ধি, বোঝাপড়া ও প্রণোদন। তথ্যটাই নিছক প্রচার নয়, প্রচার অপেক্ষাও উপরে'।[১]

এতক্ষণ আলোচিত হল, জ্ঞাপন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতবাদ। এবার আসা যাক 'বিজ্ঞান কি', সেই প্রসঙ্গে। সংসদ বাংলা অভিধান মতে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান, ঈশ্বরানুভব অপরোক্ষ জ্ঞান, তত্ত্ব জ্ঞান, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধজ্ঞান[২]। বিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন বিশেষজ্ঞদের মতে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের ফলে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানই হল বিজ্ঞান।

ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রী সুকুমার সেন একটি বই এর ভূমিকায় লিখেছিলেন 'বিজ্ঞান শব্দটি আধুনিক অর্থে ঠিক কবে থেকে চালু হল তা জানবার কৌতুহল আমার আছে'[৩]। গবেষক শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারেননি। আসলে ইংরেজী 'সায়েন্স ও আর্টস' (হিউম্যানিটিস্) জ্ঞান বিজ্ঞানের এই কাট ছাঁট পার্থক্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সর্বজন স্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সেইজন্য বাংলায় বিজ্ঞান শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাপক অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত চলে এসেছিল। এমনকি কবিতার বই-এর নামেও 'বিজ্ঞান' অচল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিশিষ্য রসিক চন্দ্র রায় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে 'বিজ্ঞান সাধুরঞ্জন' বার করেছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান পাঠ্য লেখার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে এদেশে 'বিদ্যা' কথাটি ব্যবহার করতেন। এই রীতির রেশ এখনও রয়ে গেছে 'পদার্থ বিদ্যা', 'জীব বিদ্যা', 'উদ্ভিদবিদ্যা', 'রসায়ন বিদ্যা' ইত্যাদিতে। পরে 'বিজ্ঞান' কথাটি এল ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে 'বিদ্যা'-র মতোই জ্ঞান বিজ্ঞান এই ব্যাপক অর্থে। সাময়িক পত্র 'বিজ্ঞান সেবধী' নামেই তার সাক্ষ্য। কিছুকাল পর্যন্ত 'বিদ্যা' ও 'বিজ্ঞান' দুই-ই চলছিল। তবে বিজ্ঞানের ব্যবহার বাড়তির মুখে। শেষে বিজ্ঞানের পক্ষে চরম রায় পাওয়া গেল ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞান রহস্য' বের করলেন, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে 'অংকপুস্তকং' প্রথম প্রকাশিত হয়। নিতান্ত ক্ষীণকায় একটি পাঠ্য পুস্তিকা, এটিই বাংলার প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক ছাপা বই; আর বই হল পৃথিবীর প্রথম গণমাধ্যম[৪]।

বিজ্ঞান জ্ঞাপন এর মাধ্যম যে শুধু গণমাধ্যম তা নয়। বিজ্ঞান জ্ঞাপন ঘটতে পারে বিভিন্নভাবে। বিজ্ঞান বিষয়ে নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ আমরা কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জানতে পারি। আবাব দুজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য আদান প্রদান করতে পারেন। কমিউনিকেশনের ভাষায় একে বলা যেতে পারে ইন্টার পার্সোনাল সায়েন্স কমিউনিকেশন। আবার গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো স্বভাব বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন; একে বলা যেতে পারে ইন্ট্রাপার্সোনাল সায়েন্স কমিউনিকেশান। স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর বক্তৃতা, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে যে বিজ্ঞান জ্ঞাপন ঘটে তাকে গ্রুপ সায়েন্স কমিউনিকেশন বা দলগত বিজ্ঞান জ্ঞাপন বলা যেতে পারে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি গণমাধ্যমের সাহায্যে বিজ্ঞান জ্ঞাপন ঘটলে তা হয় মাস কমিউনিকেশন। গণমাধ্যম ছাড়া প্রাচীন লোক মাধ্যমের সাহায্যে যেমন বিজ্ঞান জ্ঞাপন ঘটতে পারে, তেমনি ইন্টারনেটের মতো অত্যাধুনিক মাধ্যমও আজ বিজ্ঞান জ্ঞাপনে যথেষ্ট রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আলোচনার সুবিধার্থে বিজ্ঞান জ্ঞাপনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যথা ঃ-

- প্রথাগত পদ্ধতিতে বিজ্ঞান জ্ঞাপন
- চিরাচরিত ও প্রথাগত পদ্ধতি ব্যতিরেকে বিজ্ঞান জ্ঞাপন
- গণমাধ্যম নির্ভর বিজ্ঞান জ্ঞাপন

বিশিষ্ট জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ মিয়ান ম্যাক্‌ব্রাইড জ্ঞাপনের আট ধরনের কার্যাবলী নির্দিষ্ট করেছিলেন। এইগুলি হল তথ্য আদানপ্রদান, সামাজীকরণ, প্রেষণা, বিতর্ক, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রচার, বিনোদন ও সংহতি[৭]। এই সব কটি কাজই বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চিরাচরিত ও প্রথাগত পদ্ধতিতে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথমেই চলে আসে বিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ (এম.সি.ই.আর.টি) ৮০-র দশকের প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষান্তে 'ন্যূনতম শিক্ষণ' সম্পর্কে একটি ধারণা প্রকাশ করেন[৮]। এদের মতে, কতগুলো ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ এবং তা মুখস্থ করাটাই 'শিক্ষা' নয়। প্রকৃত শিক্ষায় পরিবেশে লব্ধ অভিজ্ঞতা বাস্তবে পরিণত হয়ে ওঠে এবং চিন্তাভাবনা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। বিদ্যালয়ের শিক্ষণ কালে শ্রেণি কক্ষের প্রাসঙ্গিক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা সমর্থিত ও সমৃদ্ধ হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীদের মনে যে প্রশ্ন জাগে অভিজ্ঞতা

আলোচনার মাধ্যমে তার উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য এই শিক্ষণ তাকে চিন্তা-অভিমুখী করে তুলবে এবং এজন্য প্রাথমিক শিক্ষান্তে শিশুরা ন্যূনতম ভাবে কিছু সামর্থ্য অর্জন করবে, এটাই প্রত্যাশিত।

রাজ্যপর্ষদের এই চিন্তাধারা যে একমাত্র তাদেরই গবেষণা প্রসূত তা নয়। বিভিন্ন সময়ে শিশু শিক্ষায় একাধিক মনীষী একথা আমাদের শুনিয়েছেন। শিশুরা যে কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চায়, প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য-র বক্তব্য থেকে তা আমরা সুন্দবভাবে বুঝতে পারি। তাঁর কথায়, "ধরুন শিশু বাবা-মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে, হয়ত বাগানে গেছে, একটা পাখি দেখল, ফল দেখল, দেখে সে জানতে চাইল, 'এটা এরকম কেন? এটা ওরকম হয় কেন? দুটো বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তফাৎ দেখার যে প্রবৃত্তি তা শিশুদের মধ্যে আপনা থেকেই আসে"।[৭] স্বাভাবিক দেখার মধ্যে যে পরিবর্তন আসে শিশুরা তা লক্ষ্য করে। জীবজগতের মধ্যে যে সব বৈসাদৃশ্য ও বিশেষত্ব চোখে পড়ে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে শিশু তার কৌতুহল নিবৃত্ত করতে চায়।

প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধান প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে। শিল্প ও বিজ্ঞান উন্নত দেশ সমূহে প্রাথমিক স্তর থেকেই এই ধরনের অনুসন্ধান প্রবণ বিজ্ঞান শিক্ষার ধারা বজায় রয়েছে ভারতবর্ষে যা অনুপস্থিত। বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. এস হলডেন এর মতে, ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সম্ভবত এর একটি অন্যতম কারণ। অধ্যাপক হলডেন লিখেছেন, "আমি মনে করি, বিজ্ঞানের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু জ্ঞান নয়, বরং পদ্ধতি, ... আমার চোখে বিজ্ঞান একটি দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্যের সম্ভার নয়। .... মনে হয়, (বিজ্ঞান) এর পরিভাষা হওয়া উচিত 'প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ'। কেননা, আমি যে বুঝি প্রকৃতি বলতে মননের সেইসব দিককেই বোঝানো হয় যা কিনা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হতে পারে"।[৮] অথচ আমাদের দেশে, কেবল সাধারণের মধ্যেই নয়, শিক্ষাজগতেও বিজ্ঞান অর্থে 'বিশেষ জ্ঞান' বোঝান হয়ে থাকে। এভাবে বিজ্ঞান ক্রমশ তার তাৎপর্য হারায় এবং জ্ঞানের বোঝা মাথায় জমাতে গিয়ে একসময়ে শিক্ষার্থীদের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বিকাশ এর গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা কোনওভাবেই ছাত্রছাত্রীদের অনুকূলে যায়নি। বিজ্ঞানকে তারা গ্রহণ করেছে ভালোবেসে নয়, নম্বরের হাতিয়ারের মাধ্যম হিসাবে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা একটি পুঁথিগত মুখস্থ বিজ্ঞান বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালায় ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাব

উত্থাপিত হয়। পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন উত্থাপন, প্রকল্প নির্মাণ, অনুসন্ধান পরিকল্পনা, হাতে কলমে কাজ, পরিমাপ, সম্পর্ক ও ছক অনুধাবন, প্রমাণ সাপেক্ষ অনুমান, অনুসন্ধান পরিশীলন এবং তথ্য ও ভাব প্রকাশ এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে বিজ্ঞান শিক্ষা পরিপূর্ণ হবে বলে তারা জানায়। বিজ্ঞান শিক্ষা যদি প্রাথমিক স্তর থেকে সঠিক ভাবে হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীকালে বিজ্ঞান জ্ঞাপনে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত গ্রাহক এবং প্রেরক উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে।

চিরাচরিত ও প্রথাগত পদ্ধতিতে বিজ্ঞান জ্ঞাপন এর পাশাপাশি, বিজ্ঞানকে অন্যভাবে শেখানোর উদ্যোগ নানা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য চিরাচরিত ও প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে এসে যে ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হল তাতে বিজ্ঞান জ্ঞাপন আরো শক্তিশালী হয়েছিল। ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে স্কটিশচার্চ স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক রাধিকা বাগচির উৎসাহে ছাত্ররা হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হয়। বিজ্ঞানের এই ব্যবহারিক চর্চার নাম ছিল 'ল্যাবরেটরি'। এই 'ল্যাবরেটরি'-র সূত্র ধরে ১৯৬২ সালে স্কটিশ চার্চ স্কুলে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন' সংস্থা। ১৯৬৭ তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের উদ্যোগে আকাশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা ঃ 'অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমার্স অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলা হয়। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (বিড়লা মিউজিয়াম) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে বিড়লা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পর তার সঙ্গে বেসরকারি সায়েন্স ক্লাবের যে যোগাযোগ এই সময় থেকে শুরু হয় তা পরে আরও বৃদ্ধি পায় নানান কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান র্যাডিকাল হিউম্যানিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন ষাটের দশকের মাঝামাঝি বিজ্ঞান প্রসারের দিকে মনোযোগী হয়। আর এইচ. এ-র সংবিধানে এর মৌলিক নীতি হিসাবে বলা হয়েছিল, মানবতাবাদ যে কোন অতিলৌকিকতার বিরোধিতা করে। মানুষই তার ভবিষ্যৎ গড়ে নেয়।[৮] এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান জ্ঞাপন, এরপর থেকে একেরপর এক বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে এবং বিজ্ঞান জ্ঞাপনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৬৮), যাদবপুর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (১৯৭১), গোবরডাঙা রেনেশাঁস ইনষ্টিটিউট (১৯৭৩), অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থা (১৯৭৪), চন্দননগর সায়েন্স ক্লাব (১৯৭১), পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা (১৯৭৫), দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (১৯৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা কম নয়। মুদ্রণ মাধ্যম হিসাবে বই, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম হিসাবে রেডিও-টিভির ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। স্বাধীন ভারতে যে বিজ্ঞান পত্রিকার নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তা হল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে প্রকাশিত'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (১৯৪৮)। ষাট সত্তরের দশকের আগে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬১ তে অবশ্য পাভলভ ইনস্টিটিউট বের করে 'মানব মন'। এরপরে প্রকাশিত হয়েছে স্বাস্থ্য দীপিকা (১৯৬৩), প্রিজম (১৯৭৯), 'লোকবিজ্ঞান (১৯৭৪) প্রভৃতি।

১৯৭৯ সালে বিজ্ঞান ক্লাব গুলো তাদের সম্মেলনে চারপাশের সমাজে 'বিজ্ঞান চেতনাব বাতাবরণের অভাব'-এর যে সমস্যা চিহ্নিত করেছিল তা দূর করতে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হল একটি নতুন ধরনের পত্রিকা। সত্তর দশকের 'বীক্ষণ' এবং 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্ম্মীর' ধারায় কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করল 'মানুষ'। শুধু বিজ্ঞানের তথ্য ছাপানো নয়, এর লক্ষ্য ছিল মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা। পত্রিকা পঞ্জিকরণের জন্য এর নাম বদলে হয 'উৎস মানুষ'।[১০] ১৯৮০-র দশকে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন - 'বিজ্ঞান' (১৯৮০), 'বিজ্ঞান প্রদীপ' (১৯৮০), 'বিজ্ঞান মেলা' (১৯৮১), 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান' (১৯৮৮১), 'অন্বেষক' (১৯৮১), 'পরিবেশ ও প্রকৃতি' (১৯৮২), 'অন্বেষা' (১৯৮৩), 'অণুবীক্ষণ' (১৯৮৩), 'চেতনা' (১৯৮৬), 'বিজ্ঞান মানস' (১৯৮৭), 'জ্ঞান বিচিত্রা' (১৯৭৬), 'প্রকৃতি' (১৯৯৫), 'খাদ্য ও পরিবেশ' (১৯৮১), 'সবুজবার্তা' (১৯৯৬), 'কম্পাস' (১৯৬৪), 'কম্পিউটার-তথ্য প্রযুক্তি' (১৯৯৬), 'গণিত অন্বেষা' (১৯৯৮) প্রভৃতি।[১১]

বাংলা সংবাদ পত্রগুলোর মধ্যে তিনটি সংবাদপত্রে বিশেষ বিজ্ঞানের পাতা প্রকাশিত হয়। কালান্তর পত্রিকায় প্রতি সোমবার 'প্রকৃতি ও মানুষ' নামে বর্তমান পত্রিকায় প্রতি মঙ্গলবার 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' নামে এবং গণশক্তি পত্রিকায় 'বিজ্ঞানের খবর' নামে প্রতি সোমবার বিশেষ বিজ্ঞানের পাতা প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রতি বৃহস্পতিবার 'অণুবীক্ষণ' নামে আধপাতার একটি বিশেষ বিজ্ঞান সংকলন থাকে। আর অন্য সংবাদপত্র গুলোতে বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ পাতা না থাকলে ও কমবেশি বিজ্ঞান জ্ঞাপনে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে।

বিজ্ঞান জ্ঞাপনে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই রেডিওর কথা বলতে হয়। বাংলাভাষায় রেডিওর ভূমিকা মানেই, আকাশবাণী কলকাতার কথা। আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের জন্ম ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি। সেই সময়

সায়েন্স অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হলেন ডঃ অমিত চক্রবর্তী। দুজন সহায়ক হিসাবে এলেন ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা ঘোষাল। ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিনে বিজ্ঞান বিভাগ কতগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করে।[১১]

কলকাতা বেতার প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে নিয়মিত বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করল। বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার অনুষ্ঠান 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' প্রচারিত হত মাসের একটি বৃহস্পতিবার। অন্যান্য বৃহস্পতিবার 'অন্বেষা' নামে একটি 'বেতার ম্যাগাজিন' অনুষ্ঠান হতো, যেখানে সায়েন্স ফিকশন, কথিকা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি নানা বিষয় থাকত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অন্বেষা অনুষ্ঠানটি বর্তমানে প্রতি শনিবার কলকাতা-'ক'-এ রাত ৮টা থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়। শ্রোতাদের হাজারো তথ্যের উত্তর নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের আসর, আর বিজ্ঞান-পাঠক, ফিচার, ডকুমেন্টারি ইত্যাদি নিয়ে 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' প্রচারিত হত। আশির দশকের মাঝামাঝি ভারত সরকার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রচার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের উদ্যোগে বেতারে কয়েকটি বিজ্ঞান ধারাবাহিক প্রচারিত হয়। যেমন, বিজ্ঞানের নিয়ম কানুন (১৫টি পর্ব, ১৯৮৯) সাল। প্রায় দেড়লক্ষ ছেলেমেয়েকে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরঞ্জাম পাঠায় বিজ্ঞান বিভাগ। এক্ষেত্রে আকাশবাণী বিজ্ঞান জ্ঞাপনে শুধু গণজ্ঞাপনের সাহায্য নিল না, ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশানের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিল। এরপর আরও ধারাবাহিক প্রচারিত হয়েছে। যেমন নিসর্গ সম্পদ, বিবর্তনের পথে মানুষ, সন্ধিক্ষণ প্রভৃতি আকাশবাণীর এফ. এম. বিভাগ ও ১৯৯৪ সাল থেকে বিজ্ঞান রসিকের দরবারে নামে একটি বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান করে থাকে প্রতিমাসের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শুক্রবার রাত ১০টা থেকে ১২টায়।[১২]

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম হিসাবে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আকাশবাণীর যতটা ভূমিকা রয়েছে দূরদর্শন বা অন্যান্য টিভি চ্যানেল এর ভূমিকা সেইভাবে নেই বললেই চলে। ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট কলকাতা দূরদর্শনের জন্ম। এরপর থেকে বাংলা ভাষায় তারা 'বিজ্ঞান প্রসঙ্গে', 'স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসা', বিজ্ঞান কুইজ, কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান করেছে।

স্বাস্থ্যের অনুষ্ঠান এখনও মাঝে মধ্যে হয়। হ্যালো ডাক্তার বাবু নামে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের তুলনায় বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান নগন্য। আর অন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল গুলোতে স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু অনুষ্ঠান বা ক্যুইজ জাতীয় অনুষ্ঠান হয় — সেও হাতে গোনা কয়েকটি। বিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় জ্যোতিষ, ধর্ম, 'ভুত-প্রেত নিয়ে সিরিয়াল' প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে।

২০০৪ সালকে বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন ভারত সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান জ্ঞাপনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ডাইনি প্রথা, জ্যোতিষ

চর্চা, ঝাড়-ফুঁক-তুকতাক এর মতো বিষয়ও গুরুত্ব পাচ্ছে। পাঠ্যস্তরে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্যোতিষচর্চা যা বিজ্ঞান জ্ঞাপনের চিন্তা চেতনায় আঘাত এনেছে। স্বাধীন ভারতে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের যে ঐতিহ্য জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো দিক্‌পাল বিজ্ঞানীরা স্থাপন করেছিলেন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এই প্রজন্মের উপর বর্তায়। যে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী তাঁরা প্রত্যেকেই চাইবেন সমস্ত অন্ধকার শক্তিকে পরাস্ত করে বিজ্ঞান জ্ঞাপন এগিয়ে চলুক।

সূত্র-নির্দেশ

১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গণজ্ঞাপন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, পৃঃ ২-৩।

২। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, আগষ্ট, ১৯৯৮, পৃঃ ৫০০।

৩। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, মে, ১৯৮১ পৃঃ তেরো চৌদ্দ।

৪। অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ধারাবাহিকতা ও একুশ শতকের ভাবনা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফী' বিভাগের অ-প্রকাশিত অধ্যয়ন পত্র, ২০০৩ পৃঃ ১২।

৫। ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম, লিপিকা, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ সাত - দশ।

৬। ধ্রুবজ্যোতি দে, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে কি বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়? জ্ঞান বিজ্ঞান ভাবনা, হালি সহর বিজ্ঞান পরিষদ, উঃ ২৪ পরগণা, ১৯৯১, পৃঃ ২১।

৭। শ্রী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার, 'বিজ্ঞান অমনিবাস' ঃ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, (১৯৮৭)।

৮। সমাজ, বিজ্ঞান ও হলডেন — হলডেন জন্মশত বার্ষিকী কমিটি (১৯৯২)।

৯। আই. আর. এইচ. এ ডিক্ল্যারেশন অব্ অবজেক্ট, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪, পৃঃ ১-৪।

১০। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলন ঃ অতীত, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, প্রতীতি, হুগলি, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃঃ ২২৮।

১১। অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান প্রচার ও পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞানমেলা, ফেব্রুয়ারি মার্চ, ২০০৩, পৃঃ ২৮।

১২। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, বিজ্ঞান সম্প্রচার ও আকাশবাণী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, প্রাক্-শারদ সংখ্যা, ২০০২, পৃঃ ৯৮

১৩। মানস প্রতীম দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ২৫/৭/০৪।

১৪। অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞানের ডিগ্রি থাকলেই বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া যায় না, সংবাদ প্রতিদিন, ১৩ জানুয়ারি, ২০০৪।

ডিরোজিওর ঠাকুরদা : মাইকেল ডিরোজিও

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক জীবনীকার লিখেছেন, *'ঠাকুরপরিবারের উত্তরাধিকারে এমন কিছু কি ছিল হঠাৎ যা বিকশিত হয়ে উঠতে পারল অলৌকিক প্রতিভার শ্বেত শতদলের মতো? .... মহর্ষিপ্রভাবের মোহিনী মায়ার আবরণ অপসারণ করে আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঠাকুর পরিবারের পূর্বসূরীদের কেউ কি এমন ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে অন্তত অংশতও সম্ভবপর করে থাকবেন? এই অনুসন্ধিৎসু অবস্থায় আমি যেন আচমকা ধাক্কা খেলাম দ্বারকানাথের গায়ে লেগে।'*[১] হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক প্রতিভার মূলেও জন্মার্জিত উত্তরাধিকার কিছু ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। সেক্ষেত্রে ডিরোজিও পরিবারের কারো গায়ে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নেই। কেননা তাদের কারো কোনো চেহারার আদলই নেই, না বাপের, না ঠাকুরদার। ত্রিশ বছর ধরে তথ্যসংগ্রহ করে যিনি ডিরোজিয়োর জীবনী লিখেছেন তিনি জানিয়েছেন, 'তাঁর বিষয়ে (ডিরোজিওর ঠাকুরদা বিষয়ে) লিখিতভাবে দু'টি খবর পাওয়া গেছে'। তাঁর ঠাকুরদা মাইকেল ডিরোজিও ছিলেন 'a Portuguese Merchant' ও 'a native protestant.'[২]

সুতরাং আগে দরকার তাঁর ঠাকুরদার অন্তত একটা তথাগত কায়া নির্মাণ। তারপর অনুসন্ধিৎসু কেউ আচমকা ধাক্কা খাবেন কি খাবেন না সে পরে দেখা যাবে। মাইকেল ডিরোজিও সম্পর্কিত এই নিবন্ধের মেড় বাঁধতে গিয়ে কাঠ-খড় যা জোগাড় করেছি তা প্রধানত ঐ সময়ের চার্চ রেকর্ড, শ্রীরামপুর মিশনারীরেকর্ড ও সেই সময়ের জমিজমা ক্রয়বিক্রয়ের রেকর্ড থেকে। মরে যাওয়া সময়ের শুকনো কাঠ-খড় দিয়ে জ্যান্ত মানুষ গড়া যে যায় না সে আমি জানি কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই।

মাইকেল ডিরোজিও জন্মেছিলেন ১৭৪২ সালে। সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের আগে (১৭৫৬)। জন্ম সনের যথার্থতা যাচাই করার চেষ্টা করেও পারিনি। কেননা কলকাতা আক্রমণের সময় অনেক কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। ১৮০৯ সাল তাঁর মৃত্যুর বছর। সে সময় তাঁর বয়স ৬৭ বছর হয়েছিল। 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণালের'[৩] এই বক্তব্য ঠিক হলে 'He was born in 1742'[৪] মেনে নিতে অসুবিধা নেই।

মাইকেল যে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ছিলেন তাতেও সন্দেহ করার কারণ নেই কেননা ১৭৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮ সালের ডিরেক্টরি ও অ্যালমানাকে 'পর্তুগীজ মার্চেন্ট ও

এজেন্টের' তালিকায় তাঁর নাম ছাপা হতো।[৫] কলকাতায় বা বাংলায় তখন ১২জন স্বীকৃত পর্তুগীজ বণিক ছিলেন তার মধ্যে কোনো কোনো বছর তাঁর নাম চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। চার্চ রেকর্ডেও তাঁকে 'পর্তুগীজ' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী ডিরোজিও গবেষকরা ডিরোজিওবংশের ইতিহাস শুরু করেছেন মাইকেল ডিরোজিও থেকে। অর্থাৎ তিনপুরুষ ধরে কলকাতায় ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এখন আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি অন্তত চার পুরুষ ধরে তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা। মাইকেল ডিরোজিওর বাবার নাম আন্দ্রে, মায়ের নাম রীতা।[৬] চার্চরেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে বিভিন্ন দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে এঁরা প্রায়ই হাজির হতেন এবং অনেকেরই 'গড ফাদার' ও 'গড মাদার' হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা।[৭] রীতা ডিরোজিও মারা যান ১৭৯২ সালের ১১ এপ্রিল। স্বামী আগেই প্রয়াত। চার্চ রেকর্ডে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'a native christian' হিসাবে।[৮] তার অর্থ যদি 'এদেশীয়' ধরা হয় তবে ডিরোজিও পরিবারের পরিচয়ে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। হেনরি ডিরোজিওর ভারতীয়ত্ব রক্তগত সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাইকেল ডিরোজিওর পারিবারিক সদস্যের সীমা এতদিন এক স্ত্রী ও চার পুত্র কন্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৯] কিন্তু চার্চ রেকর্ডের অনুপুঙ্খ তল্লাশে এখন জানা যাচ্ছে তাঁর দুই স্ত্রী। দুই পক্ষের পুত্র-কন্যার সংখ্যা এগারোর কম নয়। প্রথম স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। কিন্তু তার তিন কন্যার নাম জানা গেছে। অ্যানাফেসিয়া হেনরিয়েত্তা, ডরোথী ও রোজিনা। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ব্রিজোট (ব্রিজিডা) নামী এক মহিলাকে বিয়ে করে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ব্রিজোট ছিলেন উইলিয়াম এলিয়টের বিধবা পত্নী। মাইকেল ছিলেন উইলিয়াম এলিয়টেব সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। উইলিয়াম এলিয়টের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র কন্যা ডায়না ও চার্লস সহ ব্রিজোটকে তিনি বিয়ে করে ঘরে তোলেন। ১৭৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রোমান ক্যাথলিকচার্চে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।[১০] মাইকেলের সঙ্গে বিবাহের পর ব্রিজিডা আট সন্তানের জননী হন। তিনপুত্র ও পাঁচ কন্যা। এঁরা হলেন জেমস, ফ্রান্সিস, এমেলিয়া, চারলোটা. চারলোটা মারিয়া, জোশেফ, এলিযানোরা, ব্রিজোট। তাহলে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ মিলিয়ে মাইকেলের পুত্রকন্যার সংখ্যা এগারো। উপরন্তু ব্রিজেটের প্রথম পক্ষের দুই পুত্রকন্যা ধরলে মাইকেল কমপক্ষে তেরোটি সন্তানসন্ততির অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এতগুলি ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেখানো. মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করা কম কথা নয়। মাইকেল তাঁর প্রথম পক্ষের তিন কন্যারই বিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যানাথেসিয়ার বিয়ে দেন জর্জ হাডসানের সঙ্গে (১৭৮৬.

১ জুলাই)।[১১] হাডসন চাকরি করতেন 'বোর্ড অব রেভিনিউ'তে। ডরোথী ও রোজিনার বিয়ে দেন একই দিনে জেরাল্ড লা ফলটেইন ও হেনরি মাস্টম্যানের সঙ্গে (১৭৮৮, ৭ এপ্রিল)।[১২] ডরোথীর প্রথম স্বামীর অকাল মৃত্যু হলে আবার তার বিয়ে দেন টমাস স্মিথের সঙ্গে (১৭৯০, ৬ এপ্রিল)।[১৩] ব্রিজেটের প্রথম পক্ষের কন্যা ডায়নার বিয়েও সম্পন্ন হয় মাইকেলের তত্ত্বাবধানে। ডায়নার বিয়ে হয় এডওয়ার্ড মুলিনসের সঙ্গে (১৭৭৯, ১৫ নভেম্বর)।[১৪] দ্বিতীয় পক্ষের চার কন্যার মধ্যে একমাত্র এমিলিয়ার বিয়ে তিনি দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এমিলিয়ার বিয়ে হয় শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মালদহ-দিনাজপুরবাসী এক পর্তুগীজ বণিক ও মিশনারীর সঙ্গে। এটা ছিল ভালোবাসা ঘটিত বিবাহ। প্রথমদিকে মাইকেলের একটু আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম ওয়ার্ডের জোরালো সুপারিশে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। ওয়ার্ড লিখেছিলেন ইগনাসিয়াস ফার্নান্ডেজ তাঁর জানা সেরা পাঁচজন মানুষের একজন। ওয়ার্ডের চিঠির উত্তরে মাইকেল যে চিঠি লিখেছিলেন সে চিঠিটি শ্রীরামপুর মিশনসূত্রে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে স্নেহকাতর এক পিতার হৃদয়। 'If my poor girl may be so disposed of, her absence from calcutta & my sight, I know not how far it may touch the spring of my life for I love her must dearly may all my little ones to that degree that I cannot think of parting from them..... My eyes Dr. sir has full of tears...'[১৫] এমিলিয়া ও ফার্নান্ডিজের বিয়ে সম্পন্ন হয় ১৮০৮ সালের ১১ জুলাই। বিবাহের নথিতে সাক্ষ্য হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন স্বয়ং ওয়ার্ড ও মাইকেল ডিরোজিও। সেন্ট জনস চার্চের প্যারিস রেজিস্টারে আজও তাদের স্বাক্ষর জ্বল জ্বল করছে।[১৬] মেয়েদের মধ্যে চারলোটা মারা যায় শৈশবাবস্থায়। (১৮৮৪, ১৭ ডিসেম্বর)।[১৭] মাইকেলের অন্য দুই কন্যার বিয়ে হয় একই পাত্রের সঙ্গে। পাত্র আর্থার জনসন। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনারীদের কাছে দীক্ষিত, ভাগলপুরে নীলকুঠির মালিক। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন মাইকেলের মধ্যমপুত্র ফ্রান্সিসের শ্যালক অর্থাৎ ডিরোজিওর নিজের মামা। প্রথমে মারিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়।[১৮] তারপর মারিয়ার মৃত্যু হলে তিনি মাইকেলের কনিষ্ঠা কন্যা ব্রিজেটকে বিয়ে করেন। এদের বিয়ে অবশ্য সম্পন্ন হয়েছিল মাইকেলের মৃত্যুর পর। ডিরোজিওর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণপর্ব জড়িয়ে আছে ভাগলপুরকে কেন্দ্র করে। মামা এবং পিসেমশাই এই আর্থার জনসনের কাছেই ডিরোজিও ছিলেন কিছুদিন।

মাইকেল নিজে বণিক ছিলেন কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরির রাস্তা ধরিয়ে দেন। প্রথম পুত্র জেমস চাকরি করতেন 'বোর্ড অব রেভিনিউ'তে।[১৯] দ্বিতীয় পুত্র ফ্রান্সিস যোগ দিয়েছিলেন এক ইংরেজ সদাগরী হাউসে। বিখ্যাত 'জেমস স্কট অ্যান্ড

কোম্পানীর' বরিষ্ঠ হিসাবরক্ষক ছিলেন তিনি। এই ফ্রান্সিসেরই পুত্র ডিরোজিও। ছোটো ছেলে হেনরি জোশেফকে মাইকেল উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত পাঠিয়েছিলেন।[২০] ফিরে এসে তিনি হয়েছিলেন সবকারি নৌবাহিনীর চতুর্থ অফিসার। দেশে দেশে ভেসে বেড়াতেন। মাইকেল তাকে খুব স্নেহ করতেন। এমিলিয়ার বিয়ের সিদ্ধান্ত তিনি আটকে রেখেছিলেন তার দেশে ফেরা পর্যন্ত। মাইকেল ডিরোজিও ছিলেন এক বৃহৎ পরিবারের দাযিত্বশীল প্রধান অভিভাবক। বৃহৎ বটবৃক্ষের মতো তিনি ছায়া বিস্তার করেছিলেন ডিরোজিওপরিবারেব উপর প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে।

মাইকেল মারা যান ১৮০৯ সালে। একই সালে হেনরি ডিরোজিওর জন্ম। পরিবারের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বিদায় নিলেন, এলেন পরিবারের শ্রেষ্ঠসন্তান। একজন জীবনীকার লিখেছেন, 'মাইকেল তাঁর পৌত্র কবি হেনরির জন্মবছরেই মারা যান তবে তিনি পৌত্রের মুখে দেখে গিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না'।[২১] এখন আর এ দুঃখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীরামপুর মিশনারী উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে মাইকেল মারা গেছেন ১৮০৯ সালের ২২ আগষ্ট। হেনরির জন্মের ৪ মাস ৪ দিন পর। কবে মারা গেছেন শুধু সেই তারিখটাই জানা যায়নি। 'পিরিওডিক্যাল অ্যাকাউন্টস' এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের 'মান্থলি সার্কুলার লেটার' থেকে মাইকেলের মৃত্যুর অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওযা গেছে। ২২ আগষ্ট তিনি বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে বৈকালিক আহার সারছিলেন। এমনসময় হঠাৎ বুকে যন্ত্রণা। কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে তিনি উঠে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নিজের ঘরের কাছে যাবার আগেই টলে পড়েন। ভৃত্যেরা কোনরকমে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। একটু স্বস্তি বোধ। তারপর আবার যন্ত্রণা শুরু। 'He complained of the extremity of his pain, but was immediately seized with another fit, in which he expired.'[২২] মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে সব শেষ। খানাপিনার আনন্দময় আসর থেকে মাইকেল অকস্মাৎ প্রস্থিত মহাশিল্পীর মতো বিদায় নিলেন। মাইকেলেব কতদিনের কত আসা-যাওয়ার কথা সেন্ট জনস চার্চেব প্যারিস রেজিস্টারে লেখা আছে। লেখা নেই শুধু শেষ বিদায়ের কথা। কেন? তা আজও আবিষ্কার করতে পারিনি। অথচ তার মৃত্যু ছুঁয়ে গিয়েছিল ওয়ার্ডের মিশনারী জার্ণালের পাতা।[২৩] তাব মৃত্যু চুম্বকের মতো টেনে এনেছিল শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ ও রূপকার স্বয়ং উইলিয়াম কেরীকেও। ডঃ বাইল্যান্ডকে এক চিঠিতে কেরী লিখেছেন সে কথা - 'I went through the whole service, after having attended the funeral of a valuable member, Mr. Derozio, who died almost suddenly'[২৪]

মাইকেল ডিরোজিও সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলেন, এটুকু আমাদেব জানা ছিল; কিন্তু তাঁর বৈষযিক পরিচয়ের অন্য একটা দিকও ছিল। প্রবাসী বণিকেব মতো তিনি কলকাতায়

ভাড়াটে জীবন কাটাননি। 'Bengal past & Present' পত্রিকায় 'History of houses and streets' শিরোনামে পুরানো কলকাতার জমিজমা কেনা বেচার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে এক সময়।[২৫] সে সব তল্লাস করে জানা গেছে মাইকেল ডিরোজিও কলকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ক্রুকড লেন, এন্টালি, বৈঠকখানা, গোলাবাড়ি, প্রভৃতি অঞ্চলে বাগান, পুকুর, জমি সমেত একতলা দোতলা মিলিয়ে অন্তত খান পাঁচেক বাড়ি ছিল তাঁর। যেমন কসাইটোলাব কাছে ক্রুকড লেনে পিয়ারীদাই গলিতে তিনটি প্লটে ন' বিঘে জমি সমেত দুটি একতলা ও একটি দোতলা বাড়ি ছিল তাঁর। এন্টালিতে ছিল সাত বিঘের মতো জমি। বৈঠকখানাতে সাত বিঘে পনেরো কাঠা জমি সমেত একটি একতলা বাড়ি ও আলাদা একটি প্লটে পাঁচ বিঘে জমি সহ একটি বাংলোবাড়ি ছিল। এছাড়া সুতানুটি ও গোলাবাড়িতে বাগান ও জমির পরিমান ছিল তিন বিঘে। *'ইন্ডিয়া গেজেটে'* প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় ভাগলপুরে তাঁর স্ত্রী ব্রিজেটের বিষয় সম্পত্তি ছিল।[২৬] শেষ জীবনে ব্রিজেট সেখানেই থাকতেন। মাইকেলের মৃত্যুর পর প্রথম দিকে ব্রিজেট তাঁর অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের নিয়ে মালদহদিনাজপুরে থাকতেন বলে একটি চিঠি থেকে জানা যায়। মেয়েজামাইয়ের বাড়ির পাশে তাঁদের নিজেদের বাড়ি ছিল। বাজ পড়ে এক রাত্রে তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরে যায়। সেই ঝড়বৃষ্টির বাতে ব্রিজেট ছেলেমেয়েদের কাঁধে ভর করে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে উঠেছিলেন তাঁর জামাতা ফার্ণান্ডেজের বাড়িতে। ১৮১০ সালের ৪ জুলাই মারিয়ার লেখা চিঠিতে আছে সেই দুঃখ রাতের বিবরণ 'We instantly agreed to leave the house, and go through the wet and rain to Mr. Fernandez's house : Our dear mother supported between joseph and me, and Ella and Bridget hand in hand, ran out of the house'।[২৭] যাক্ সে সব কথা।

এক বন্ধকী দলিল থেকে জানা গেছে একটি চমকপ্রদ তথ্য। ১৭৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাইকেল ডিরোজিও তাঁর জমিজমা ও বাড়ি চার্লস ওয়েস্টনের কাছে (যাঁর নামে ওয়েস্টন লেন) বন্ধক রেখে ৭৫, ৮৭০ টাকা ধার নিয়েছিলেন।[২৮] কেন মাইকেলকে এতটাকা ধার করতে হয়েছিল তা আমরা জানি না। হতে পারে, কোনো ভয়ঙ্কর বাণিজ্যিক ভরাডুবি থেকে বাঁচতে তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছিল; আবার এও হতে পারে, নতুন কোনো ব্যাপারে প্রবেশ করার জন্য তাঁর হঠাৎ পুঁজির দরকার হয়েছিল। যাই হোক না কেন, ১৭৯৮ সালে যাবৎ স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে যিনি পৌনে এক লক্ষ টাকা ধার করতে পারেন তাঁর আর্থিক অবস্থার ভিত্তিগত গভীরতা সহজেই অনুমেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহসের স্পর্ধাটুকুও। মাইকেল ডিরোজিওই বুঝি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারতেন—

আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি
ভগ্নঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ছিন্ন করব নীলাকাশ
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।[২৯]

নাস্তিকতার অভিযোগে হিন্দু কলেজ থেকে যাঁর চাকরি গিয়েছিল তাঁর ঠাকুরদা কিন্তু ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাঁর গোটা পবিবারটার মধ্যেই প্রবাহিত হতো বিশ্বাসের ঝরঝরে নির্মল বাতাস। আন্দ্রে ও রীতার আমল থেকেই আমরা দেখতে পাই গীর্জার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও মাইকেল ছিলেন নতুনের অভিযাত্রী। পর্তুগীজরা জাতিগতভাবে ক্যাথলিক। মাইকেলের আমলেই ডিরোজওপরিবার ক্যাথলিক ধর্ম ছেড়ে প্রোটেস্টান্ট মতে দীক্ষা নেয়। কোন সময়? তার হদিশও পাওয়া গেছে। সেন্ট জনস চার্চে রক্ষিত 'List of converts from the Roman to the English church' থেকে জানা যাচ্ছে ১৭৭৬ সালের ৬ অক্টোবর 'Michael Derozio and his three children' প্রোটেস্টান্ট মতে দীক্ষা নেন।[৩০] ক্রমে তাঁর স্ত্রী, পিতামাতা, প্রথম পক্ষের তিন কন্যা এবং ডায়না এলিয়ট (Daughter in law to Michael Derozio) প্রোটেস্টান্ট মত অবলম্বন করেন। পর্তুগীজ চার্চের পথ ছেড়ে তাঁরা ধরেন ইংলিশ চার্চের রাস্তা। সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল যে নৌকায় চেপে আধুনিকতার অতলান্তিক সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে ইংরেজরা সেই নৌকাতে চাপাই ভালো। শুধু ধর্ম নয়, ভাষা বৈবাহিক সম্পর্ক চালচলন সবদিক থেকেই মাইকেল ইংরাজিয়ানার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। পর্তুগীজদের প্রতি তার নির্দেশক চার্চের অধ্যাদেশ ছিল, যে দেশে যাচ্ছ সেই দেশকে তোমার নিজের করে নাও, তুমি সেই দেশের মানুষ হয়ে যাও। জাতিগত সেই আত্মীয়তার সংস্কৃতি মাইকেলরা মনেপ্রাণে মেনেছিলেন। এখন ইংরেজদের কাছ থেকে তিনি নিতে চাইলেন আধুনিকতার পাঠ। ইংরেজরা চাইতেন এদেশ থেকে যতটা পারা যায় গুছিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরতে। মাইকেল কিন্তু এদেশেই পেতেছিলেন তাঁর চিরকালের ঘর। তাই ডি. এল রিচার্ডসন যখন ইংরাজি কবিতা লেখেন, তখন তার সততই মনে পড়ে ইংলন্ডের কথা, ছেড়ে আসা স্ত্রী পুত্রের কথা।[৩১] আর মাইকেল ডিরোজিওর নাতি যখন কবিতা লেখেন ভারতজননী ছাড়া আর কারো কথা তার মনে পড়ে না। জায়গা জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে নিয়ে মাইকেল ডিরোজিও অনেক আগেই ভারত ভূমিতে তাঁর অস্তিত্বের শিকড় বাকড় চালিয়ে বটবৃক্ষ হয়ে বসেছেন। তথ্যাদি নতুনকে স্বাগত জানানোর মূল মন্ত্রটি তিনি কখনো হারিয়ে ফেলেননি। সেটা টের পাওয়া গেল আবার। যখন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল মাইকেল বুঝতে পারলেন মানবতাবাদী

আধুনিকতা পা ফেলছে উইলিয়াম কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যানদের সঙ্গে। শিক্ষা বিস্তারে, মুদ্রণ শিল্পে, মানব সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানে তাঁরা দুঃসাহসিক প্রয়াস শুরু করেছেন। মাইকেল ডিরোজিও পারিবারিকভাবে দাঁড়ালেন মিশনারীদের পাশে। তাদের সঙ্গে স্থাপিত হল নিবিড় সখ্যতা। কলকাতার শাসকবর্গ চাইতেন না ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মিশনারীরা কোনো ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুলুক। তাই প্রথম দিকে কলকাতায় প্রচারাভিযান চালানোর জন্য তাঁদের অসম্ভব সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁদের প্রথম দিকের বহু জনবিরলসভায় মাইকেল ডিরোজিওকে দেখা যেত তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একাএকা বসে থাকতে।[৩২] *'Sometimes Mr. Derozio and his family were almost the only hearers'* কেরীদের স্থাপিত স্কুলে বাচ্ছাদের পিয়ানো শেখাতে যেত মাইকেলের দুই কন্যা। ওয়ার্ড লিখেছেন তাঁর জার্নালে সেকথা। *'Miss Maria Derozio come up with me on the one-horse chair. She & her sister have begun to teach our children to play on the piano forte'*[৩৩] ১৮০৭ সালের ২ মে সস্ত্রীক মাইকেল তাঁর দুই কন্যা এমিলিয়া মারিয়া সহ শ্রীরামপুরে গিয়ে ব্যাপটিস্ট মিশনারী মতে দ্বিতীয়বার দীক্ষা গ্রহণ করলেন।[৩৪] আগে প্রোটস্টান্ট মতে দীক্ষিত হয়ে বরণ করেছিলেন ধর্মের আধুনিকতাকে; এখন উইলিয়াম কেরী পরিচালিত মিশনারী মতে দীক্ষিত হয়ে বরণ করলেন স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজমকে। শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে যে নতুন সংস্কৃতি বাংলার মাটিতে ফুটে উঠছিল মাইকেল তার সঙ্গে সামিল করলেন গোটা পরিবারকে। কলকাতার বুকে তাদের তিনি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হৃদয় দিয়ে কাজ করেছেন। ১৮০৭ সালের ২ আগষ্ট ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের দ্বারা কলকাতায় প্রথম দীক্ষাদানের ঘটনাটি ঘটে। জন এক্সেল নামে গোলন্দাজ বাহিনীর এক সৈনিককে দীক্ষা দেন স্বয়ং ওয়ার্ড। কলকাতার শাসককুল অপছন্দ করত বলে খানিকটা লুকিয়ে চুরিয়ে দীক্ষা দানের অনুষ্ঠানটি করতে হয়েছিল। পুরো অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল মাইকেল ডিরোজিওর বাড়িতে তারই হল ঘরে।[৩৫] মিশনারীরা কলকাতায় একটা স্থায়ী ব্যাপটিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেন। সেই উদ্দেশ্যে যে কমিটি তৈরি হয়, মাইকেল তার সদস্য হন এবং প্রথমদিকে ৪,৮০০ টাকা চাঁদার সম্মতি পাওয়া যায়। তার মধ্যে মিশন ১,০০০ টাকা, মাইকেল ডিরোজিও দেন ১,০০০ টাকা।[৩৬] লালবাজারের কেরী ব্যাপটিস্ট চার্চ নামে যে গীর্জাটি রয়েছে ১৮০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চার্চটির জন্যই মাইকেল চাঁদা দিয়েছিলেন। সেজন্য সেই চার্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে মাইকেল ডিরোজিওর কথা সসম্মানে লেখা হয়েছে।[৩৭] মজার ব্যাপার হচ্ছে, গ্রন্থকার ই. এস. ওয়েঙ্গার তাতে মাইকেল ডিরোজিওর কোনো ছবি জোগাড় করতে না পেরে তার নাস্তিক নাতিরই একটা ছবি ছেপে দিয়েছেন। মাইকেল ডিরোজিওর পরিচয় দেওয়া

হয়েছে এইভাবে — তিনি ছিলেন 'Grand father of Mr. H.L.V. Derozio, the Anglo Indian poet and reformer, by whom he is over shadowed.'[৩৮]

মাইকেল মৃত্যুর কিছুদিন আগে চার্চে সকলের সামনে পাঠ করার জন্য একটি স্বীকারোক্তিমূলক (confession) লেখা ওয়ার্ডের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।[৩৯] তার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঈশ্বরের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পিতপ্রাণ এক বিশ্বাসী মানুষের ছবি। জীবনে তাঁকে অনেক বাধা বিপত্তি, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ও অসুস্থতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় তিনি সেসব বাধা অতিক্রম করতে পেরেছেন। 'I am amazed at the infinite goodmen of God, that I have not, ere now been cut off'.[৪০] অল্প বয়স থেকে তিনি যেন আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। I entertain this hope, on reflecting how the lord has led me, as it were by the hand, from my youth'।[৪১]

'ভেবেছিলেম জীবন স্বামী
তোমায় বুঝি হারাই আমি
আমায় তুমি হারাতে না বুঝেছি এই রাতে।'[৪২]

এমন মানুষকে উইলিয়াম কেরী 'valuable member' বলবেন খুবই স্বাভাবিক। মিশনারীদের নথিপত্রে পাওয়া গেছে 'Some Account of Mr. Derozio'[৪৩] শিরোনামে তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন মূলক একটি লেখা। তাতে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন সৎ ও স্বাধীনচেতা মানুষ। 'Mr. Derozio had an independant mind and was honest to his convictious. The influence of friends made no impression on him, where his judgement was informed, and his conscience convinced'।[৪৪] তিনি বিচারপূর্বক জ্ঞানত যা ঠিক বলে মনে করতেন কারো সাধ্য ছিল না তা থেকে তাঁকে টলায়। তিনিও ছিলেন সত্যসন্ধানী, ধ্রুব পথের যাত্রী, সত্য ও ধ্রুবকে তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে। বিশ্বাসী মানুষ যা করেন। 'He had, for many years, a deep reverence for true religion and great desire to be found right for eternity'।[৪৫] ওয়ার্ড খুব কাছ থেকে জেনেছিলেন তাঁর এই সত্যানুরাগের কথা। মাইকেলের এই 'deep regard for real religion' দেখে ওয়ার্ড বিস্ময়াপ্লুত হয়েছিলেন। মাইকেলের দীক্ষা বদলের কাহিনী আসলে সত্যান্বেষণেরই কাহিনী। সদাগরের জাহাজ এক ঘাট থেকে আরেকঘাটে নোঙর করে লাভের কড়ি খুঁজে নিতে। মাইকেলও মনে মনে অন্বেষণ করে চলেছিলেন সত্যের পাড়ানি। মজেযাওয়া গাঙের পথ ছেড়ে তাই বারেবারেই তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে চলন্ত স্রোতের ধারা। ধর্ম যেখানে আচরণের খোলসে পর্যবসিত সেখান থেকে তিনি নোঙর তুলে নিয়েছেন, অন্তস্থ অনুভূতির গভীর তলদেশ থেকে ধর্ম

যেখানে আলোর ঝরনাধারার মতো ছড়িয়ে পড়ে মানবকল্যাণের ভুবনে মাইকেল তারই সন্ধানে বেছে নিয়েছিলেন একলা চলার পথ।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলোরে।[৪৬]

চলতে চলতে তিনি সপরিবারে এসে পৌঁছেছিলেন একটি ঝরনাতলায়। সেই ঝরণাতলার নামই শ্রীরামপুর মিশন।

দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষদের জন্য কেঁদে ওঠা প্রাণও ছিল মাইকেলের মধ্যে। বাণিজ্য ও সম্পদের অতিকৃত আয়োজনের তলায় তলায় বইত সেই করুণার ফল্গু ধরা। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে 'As far as his ability extended, he was a benevolent man. He contributed to the support of a number of poor persons, and, though the other expenses of his family went through the other hands, he distributed his alms secretly with his own.'।[৪৭] এক হাতে তিনি সামলাতেন বৈষয়িক দায় দায়িত্বের বোঝা, অন্য হাতে নিঃশব্দে বিলোতেন সাহায্য। বাঁহাত দিয়ে দান করলে ডান হাত জানতে পারত না। মাইকেলের এই নিভৃত মানব হিতৈষী সত্তাটিকে আমাদের চিনে রাখা খুবই জরুরী।

মাইকেল ডিরোজিওর বিদ্যেবুদ্ধি ও লেখাপড়ার দৌড় কতদূর ছিল তা আমাদের অজানা। তবে তাঁর লেখালেখির অভ্যাস ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর স্বয়ং ওয়ার্ড তাঁর লেখা 'a number of papers' এ চোখ বুলিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন many proofs of his deep regard for real religion.'।[৪৮] মাইকেল তাঁর পড়া বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও পছন্দসই অংশ টুকে রাখতেন, শুধু তাই নয় তাতে জুড়ে দিতেন 'remarker of his own'। মাইকেলের অন্তত দুটি লেখা আমাদের হাতে এসেছে। একটির মধ্যে উন্মীলিত হয়েছে স্নেহকাতর পিতার হৃদয়, অন্যটির মধ্যে নিবেদিতপ্রাণ ভক্তের শেষপ্রণতি। প্রথম চিঠির আবহে আছে একটি মানসসংকটের ছবি। অপছন্দ ও উপরোধের টানাপোড়েনের সঙ্গে মিশে আছে অকথিত অভিজ্ঞতার তিক্তস্মৃতি ও কন্যা বিচ্ছেদের সম্ভাব্য বেদনা। সামান্য একটা চিঠির দৈর্ঘ্যে এই সংকটের ছবিটিকে তিনি যেভাবে সৌজন্য সম্মত ভাষার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছেন তার সাহিত্যিক আবেদন আমাদের আকৃষ্ট না করে পারে না।

মাইকেল সম্পর্কে দু'টি বিক্ষিপ্ত সংবাদ এপ্রসঙ্গে মনে করে নেব। এক, হেস্টিংস ও সংবাদপত্রজীবী জেমস অগাস্টাস হিকির ঐতিহাসিক মামলায় তিনি জুরী বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। বিচারপতি জন হাউডের নোটবুক থেকে অসম্পূর্ণ যে বিবরণ জানা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৭৮১ সালের ২৮ এপ্রিল এবং ২৬ জুন উপস্থিত মোট ১২ জন জুরীর মধ্যে

মাইকেল ডিরোজিও রয়েছেন।[৪৯] শুধু হেস্টিংসের ব্যাপার নয় তার সঙ্গে জড়ানো ছিল ওল্ড মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেন্ড কীর্ণেন্দারের অভিযোগও। নিয়মানুসারে হিকি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন ১১-৫৩মি: এ শুরু হল বিচার কার্য। ৪-৪০ মিনিটে জুরী বোর্ড একান্ত আলোচনায় গেলেন। ৪-৫০ মিনিটে ফিরে এসে জানালেন তাদের সিদ্ধান্ত।

Verdict : 'Not guilty on the first count. Guilty on the second'।[৫০]

Not guilty ও Guilty-র মধ্যে দোদুল্যমান সেই একান্ত আলোচনায় মাইকেল ডিরোজিও কোন্ পক্ষ নিয়েছিলেন, কি বলেছিলেন তার কোন রেকর্ড নেই। থাকলে আমাদের সুবিধা হত। তবে এই সংবাদ আর কিছু না দিক অন্তত মাইকেল ডিরোজিওর সামাজিক স্বীকৃতিটুকু জানিয়ে দেয়। বিচারব্যবস্থা তাঁকে জুরী বোর্ডের মেম্বর করে তার বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচারশীল ব্যক্তিত্বের একটা প্রশাসনিক স্বীকৃতি আমাদের উপহার দিয়েছে।

দ্বিতীয় আর একটি সংবাদ আমরা পাই তাঁকে লেখা ওয়ার্ডের চিঠি থেকে। ওয়ার্ড তাঁকে শ্রীরামপুর মুদ্রণযন্ত্রে সদ্যোমুদ্রিত বাংলা ধর্মপুস্তক উপহার পাঠিয়ে লিখেছেন, 'I send you a copy of the Bengalee edition of job, the psalms, proberbs. Ecclesiastes, Solomon's song & Esther যদি বেঁচে থাকি পরের খন্ডটি প্রকাশিত হলেই আপনাকে পাঠাবো'।[৫১] এর মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে ডিরোজিওর ঠাকুরদা বাংলা জানতেন। তাঁর দুই মেয়ে এমিলিয়া এবং মারিয়ার চিঠি থেকে জানা যায় তারাও বাংলা জানতেন।[৫২] অর্থাৎ ঠাকুরদার আমল থেকে ডিরোজিও পরিবারে বাংলা ভাষার চল ছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১। কৃষ্ণ কৃপালনী, *দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্তৃত পথিকৃৎ*, অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৯৮৪, ভূমিকা।

২। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *অশান্তকাল ঃ জিজ্ঞাসু যুবক*. পুঁথিপত্র, মার্চ ১৯৮৮, পৃঃ ১৬

৩। *"Calcutta Monthly Journal"*, Aug 1809

৪। E. S. Wenger. *The story of the Lall Bazar Baptist Church*, Calcutta. 1908. pp 41-42.

৫। *"The Bengal Kalendar & Register"* (1794, 1795). *"The calcutta Almanac and Bengal Directory"* (1796. 1797). List of Portuguese Merchant and Agent.

৬। *"Bengal Past & Present"*, Vol - IV. p. 493.

৭। *A2 paris Register of St John's Church*. Calcutta. From A.D 1758 to 1789. pp 15. 16. 64. 65: Unpublished Minor Research project (UGC) of S.S.M. 2003

৮। *Paris Register of St. John's Church*, Calcutta, From A D. 1759 to A D. 1800. BURIAL. p 188 "Mrs. Ritta Derozio. widow a native christian."

৯। সু. মৈত্র, তদেব, পৃঃ ১৬।

১০। *"Bengal Past and Present,"* Vol. IV, p.493 "Michael Derozio was married at the R C. Church on september 22, 1774 to his (*william Elliots*), S.S.M. widow Mrs. Bridget (or Brizida) Elliot (*nca Dias*) mentioned above.

১১। *St. J C Register* 1758-1789, *Marriage*, p. 8.

১২। *St. J. C Register* 1759-1800, *Marriage*, p. 38.

১৩। *St. J. C. Register* Ibid, p. 11.

১৪। *St. J. C Register*, 1758-1789, Marriage, P. 7

১৫। *W. Ward's, Missonary Journal*, Vol IV, Serampore Carey library & Research Centre. pp. 653-656: *Song of the stor my petrel*, Ed A.M. A D. A.K & S S M.. Derozio Commemoration Committee. 2001. pp 468-469

১৬। *St J. C Register, Marriage*, 1808-1817, C-10, p 19.

১৭। *St. J C Register, BURIALS*, 1759-1800, P. 157.

১৮। *St J C Register, Marriage* at out station. 1808-1816, p. 11.

১৯। E. W. Madge, *Henry Derozic . The Eurasian Poet and Reformer*, 1905, Edited by S, Roy Choudhury, 1967, p. 22

২০। *W.W.M. Journal*, Vol III, p. 488.

২১। সুবীর রায়চৌধুরী, হেনরি ডিরোজিও তাঁর জীবন ও সময়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩, পৃঃ ৬।

২২। *Periodicals Account of the Baptist Missionary Society Serampore*. Vol. IV, pp 41-46, Monthly Circular letters BMS, Serampore. Vol. 1, Aug 1809, p 66: *Song of the stormy Petrel*, Ibid. p 471-474

২৩। *W.W M Journal*, Vol IV, p. 701

২৪। P.A.BMS, Vol IV, P. 37.

২৫। *"BPP"*, Vol. XIV, pp. 168, 175, 188

২৬। *"Indian Gazette"*, May 21, 1832, Vol. II, No. 461, p. 1.

২৭। M.C.L BMS. 1810, pp. 80-82; *Unpublished M R.P* (UGC) of SSM, pp. 88-89.

২৮। "B.P.P", Vol. XIV, p. 188.

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, কল্পনা, 'হতভাগ্যের গান', পৃঃ ৩১১।

৩০। *St. J C. Register*, 1758-1789. CONVERT, p. 3.

৩১। T. B. Laurence, *English Poetry in India*, Calcutta, 1869, pt. I, See David Lester Richardson, 'Lines by an British Indian exile to his distant children.
"My sad heart sicken in this solitude
Home is no longer home."....

৩২। Some as 22. See Foot Note.

৩৩। *W.M J* Vol III, p 560; *Song of the Stormy Petrel,* p. 466.

৩৪। *W.M.J* Vol III, pp. 545-546; *The Story of the Lall Bazar Baptist Church,* Appendix-I, p. xi, S.S.P., p. 465.

৩৫। *W M M.* Vol III, p. 563-564, S.S.P. pp 466-467.

৩৬। *W M M* Vol II, p. 405-406, S.S.P., pp 464

৩৭। Same as 8

৩৮। *Ibid*

৩৯। Same as 22, pp. 473-474

৪০। *Ibid*

৪১। *Ibid*

৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূজা, ৮৪ সংখ্যক গীত, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৮৬ : ১৯০১, পৃ : ৩৯।

৪৩। Same as 22.

৪৪। *Ibid*

৪৫। *Ibid*

৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান,* স্বদেশ, ৩ সংখ্যক গীত, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৮৬ : ১৯০১, পৃ ২৪৪।

৪৭। Same as 22.

৪৮। *Ibid*

৪৯। "BPP", Vol III, Serial No. 7, (January-March 1909) p. 52 & p. 55, 'From the Note books of justice John Hyde'; *Calcutta Heritage Histroy-I, Hicky and his Gazette,* P. T. Nair, 2001, S & T Book Stall No. 11, College St., Calcutta, pp. 96-98, 104-108.

৫০। *Ibid*

৫১। Same as 15, 'S.P.P., p. 467-468.

৫২। Letter from Maria Derozio to ward, *PABMS,* Vol IV, pp. 118-120, *Unpublished M.R P* of S.S.M, pp. 87-88;
Letter form Amelin Derozio to her sister Miss Derozio, *MCLBMS,* Vol I, pp. 171-172, *Unpublished MRP* to SSM. p. 90.

'রামমোহনের পূর্বে বঙ্গদেশে বেদান্তচর্চা একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা'

কাকলি দাস

বাংলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক গৌরবময়যুগ। এই শতকে বাংলায় এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর সৃষ্টিশীল প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল। উনিশ শতকে বঙ্গদেশের এই সার্বিক জাগরণকেই 'নবজাগরণ' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই নবজাগরণের একটা দিক ছিল অগ্রগতির অভিমুখে পদচারণা, আর একটা দিক ছিল ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্তাকে নতুন করে আবিষ্কারের সাধনা। উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা যুক্তিবাদের আলোকে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই সাধনায় তাঁরা উনিশ শতকের প্রথম থেকে ভারতীয় দর্শন বিশেষত বেদান্তের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে বেদান্তচর্চার অগ্রপথিক হলেন রামমোহন রায়। রামমোহনের মধ্যে ছিল এক সন্ধানী আত্মা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐতিহ্যেও নিজ মনকে সংস্কৃত ও ঐশ্বর্যবান করে তুলেছিলেন তিনি। প্রাচ্যবিদ্যায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁর মনন, দেশীয় ঐতিহ্যে সুপ্রোথিত ছিল তাঁর চিত্ত। হিন্দী-উর্দু-আরবি-ফারসীতে ব্যুৎপন্ন রামমোহনের যেরূপ ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে ছিল অবাধ বিচারণ, তেমনই হিন্দু শাস্ত্রের বেদান্ত-উপনিষদ, পুরাণ-তন্ত্র সকল বিষয়ের সম্যক অনুশীলন করে তিনি এগুলির প্রতিপাদ্য অধ্যাত্মসত্যকে অন্তরের গভীরে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন স্বদেশীয় ঐতিহ্যের আধার শাস্ত্ররাজি মন্থন করে যে চিরায়ত তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তাকে নতুন যুগের প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। বেদ-বেদান্ত পুরাণ-তন্ত্রের মূল তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে তার বিশুদ্ধ রূপটি সমকালীন সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বেদান্তদর্শনের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলায় উপনিষদ ও বেদান্তগ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং অনেকগুলি বেদান্ততত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহন বাংলাভাষায় বেদান্তের আলোচনার প্রবর্তন করেছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বেদান্তের প্রসারের উদ্দেশ্যে। রামমোহন-প্রবর্তিত বেদান্তচর্চার ধারায় এরপর জোয়ার এনেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ,

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণ। রামমোহন যে বেদান্তচর্চার শুরু করেছিলেন, তা বঙ্গসংস্কৃতিতে অভিনব কোন উদ্ভাবন নয়; তা ছিল প্রকৃতপক্ষে লুপ্তপ্রায় প্রাচীনধারারই নূতনভাবে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে পুনঃপ্রবর্তন। বস্তুত রামমোহনের পূর্বে প্রায় তিনশতক ধরে বঙ্গদেশে বেদান্তচর্চা প্রচলিত ছিল। ভারতের সনাতন বেদান্তদর্শনের আলোচনায় সেই যুগে বাঙালী মনীষা স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মূলভাব প্রচার করলেন। তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিবাদের মূলে ছিল বেদান্তের দ্বৈততত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য বৈদান্তিক মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন! তিনি মাধ্বভাষ্যকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ভাষ্য বলে স্বীকার করেছিলেন — তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের কোন সাম্প্রদায়িক ভাষ্য ছিল না। মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদমূলক বেদান্তভাষ্যের বিষ্ণু (হরি) সর্বোত্তম বস্তু, জগৎ সত্য, জীব বিষ্ণুর নিত্যসেবক, বিষ্ণুর পাদপদ্মলাভ এবং জীবের স্বরূপাভিব্যক্তিই মুক্তি — এই সকল তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রভাবও চৈতন্যদর্শনে লক্ষণীয়। চৈতন্যদেব তাঁর দর্শনবিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। তাঁর সাক্ষাৎশিষ্য রূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর রচিত দর্শন গ্রন্থেই চৈতন্যমতের উপাদান ও ব্যাখ্যা মেলে। এই তিনজন আচার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূলতত্ত্বরূপে যে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' ব্যাখ্যা করেন, তাতে নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বল্লভাচার্যের মতও কিয়দংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনকে প্রভাবিত করেছিল।

রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী ব্যাসদেব রচিত ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্য বা বেদান্তের কোনও প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেননি বটে, তবে তাঁদের রচনায় বেদান্তের বহুবার উল্লেখ আছে। জীব গোস্বামী 'তত্ত্বসন্দর্ভ'তে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করেছেন সাতবার, 'পরমাত্মসন্দর্ভ'তে তেরোবার, 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'তে চারবার, 'ভক্তিসন্দর্ভ'তে একবার এবং 'প্রীতিসন্দর্ভ'তে ছ'বার।[১] জীবগোস্বামী তাঁর 'তত্ত্বসন্দর্ভ'তে দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় ব্যাসদেবের 'ব্রহ্মসূত্র' এবং শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' বা 'শারীরিক ভাষ্যের সূত্রকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

'পরমাত্মসন্দর্ভে' জীবগোস্বামী 'ব্রহ্মসূত্র' এবং গায়ত্রী মন্ত্রের মূল তত্ত্বটিরই সাররূপে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত জীবগোস্বামী তাঁর 'ষট্সন্দর্ভ' গ্রন্থে ভারতীয় বৈদান্তিক দর্শনের পটভূমিকায় গৌড়ীয় ভক্তিমার্গের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি ন্যায়দর্শনেরও সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বঙ্গদেশে বেদান্তচর্চায় সাবলীলতার সঞ্চার করেন। তিনি কাশীতে গুরু রামতীর্থের কাছে অদ্বৈতবেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী আচার্য শঙ্করের মতের অনুবর্ত্তী ছিলেন। মধুসূদনের সমগ্র জীবনই বেদান্তের চিন্তায় ও বেদান্তমত প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর নিরলস সাধনার প্রভাবে বঙ্গদেশে অদ্বৈতবাদের প্রচলন ও প্রসার প্রবল হয়। অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে মধুসূদন সরস্বতীর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলি হল — 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'সিদ্ধান্তবিন্দু', 'সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্যা', 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ', 'বেদান্তকল্পলতিকা'। অদ্বৈতদর্শন বিষয়ক গ্রন্থসাম্রাজ্যে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থখানি শ্রেষ্ঠ। বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী বেদান্তচার্য বেঙ্কটনাথ তাঁর 'শতদূষণী' গ্রন্থে শ্রীহর্ষমিশ্রের মত খন্ডন করেন। আবার দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজতীর্থ 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থে আনন্দবোধাচার্য ও চিৎসুখাচার্যের মত খন্ডন করেন। এর পরই মধুসূদন তাঁর অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থ রচনা করেন।

'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী দ্বৈতবাদী 'ন্যায়ামৃতকার' ব্যাসরাজ তীর্থের দ্বৈতমত খন্ডন করে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করেন। সমালোচনার আঘাতে দ্বৈতবাদ যে নূতন ভাব ধারণ করেছিল, এই গ্রন্থপাঠে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যগণের রচনায় শ্রুতিই প্রমাণ হিসাবে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রেও গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী মধুসূদন অনুমান প্রমাণ বলে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করেছেন। পূর্ববর্তী প্রধান প্রধান বৈদান্তিক আচার্যগণের অনুসরণে মধুসূদন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তদর্শনকে প্রতিপাদন করলেও তাঁর গ্রন্থে মৌলিকতা বিদ্যমান। মধুসূদন সরস্বতীর 'সিদ্ধান্তবিন্দু' গ্রন্থখানি শঙ্করাচার্যের 'দশশ্লোকী'-র ব্যাখ্যা। শঙ্করাচার্য তাঁর 'দশশ্লোকী' গ্রন্থে বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করেছেন। মধুসূদন তাঁর 'সিদ্ধান্তবিন্দু'তে বিচার-বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে বিস্তারিত ভাবে সেই সিদ্ধান্তসকল প্রতিপাদিত করেছেন এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্যবিষয়ের আলোচনা করেছেন। 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ' শীর্ষক বেদান্তবিষয়ক প্রবন্ধটিতে মধুসূদন দ্বৈতবাদ খন্ডন করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর 'বেদান্তকল্পলতিকা'ও একখানি বৈদান্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ। 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থের পূর্বে এটি রচিত হয়। সর্বজ্ঞাত্মমুনি অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করার জন্য 'সংক্ষেপশারীরক' গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদন সরস্বতী এই 'সংক্ষেপশারীরক' গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। তাঁর টীকার নাম 'সারসংগ্রহ'।

মধুসূদন সরস্বতীর একজন বাঙালী শিষ্য বলভদ্র 'সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে মধুসূদনের গ্রন্থের নানাবিধ ভাষ্য রচিত হয়।

অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের আবির্ভাব

বাংলার বেদান্তচর্চার ধারাকে কিছুটা সঞ্জীবিত করেছিল। আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিম্বার্ক-মতাবলম্বী ছিলেন, অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদই ছিল তাঁর মত। আচার্য বিশ্বনাথ ভাগবতের যে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বমূলক টীকা প্রণয়ন করেন সেটিই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা।

বলদেব বিদ্যাভূষণও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ভাষ্যকার ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথের শিষ্য ছিলেন। বলদেব রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের তত্ত্ব দৃষ্টিতে 'ব্রহ্মসূত্রে'র 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করেন। তিনি গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন — 'গীতাভূষণ'। এছাড়া বলদেব ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য, ঐতরেয় তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক — এই দশখানি উপনিষদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অনুযায়ী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তবে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা বলদেব বিদ্যাভূষণ মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতেরই ভাষ্যকার ছিলেন। এই শতকেই রাধাদামোদর 'বেদান্তস্যমন্তক' নামে একখানি প্রকরণগন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেদান্ততত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুত সপ্তদশ শতকে মধুসূদন সরস্বতীর প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ বেদান্তচর্চা বেগবতী হয়েছিল। কিন্তু তারপর, মূলতঃ চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের সঙ্গে অন্বিত হয়ে বেদান্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। অষ্টাদশ শতকে বিশ্বনাথ, বলদেব প্রমুখের দু'একটি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা ছাড়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে বঙ্গদেশে বেদান্তের পঠন-পাঠন ও চর্চা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গদেশে পন্ডিত সমাজে ন্যায় ও স্মৃতি এই দুটি শাস্ত্র মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। তুলনায় বেদান্ত অধ্যয়ন-অধ্যাপনে বঙ্গসমাজে কি পন্ডিতমহল, কি ছাত্রকুল সকলেরই স্বল্পাগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। টোল-চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য — এক হাজার সংস্কৃত বিদ্যার্থীর মধ্যে পাঁচ কিংবা ছয়, কখনও আরও কম।[২] বঙ্গদেশে যখন বেদান্তচর্চার এই দৈন্য তখন কাশী ও অন্ধ্রপ্রদেশে বেদান্তের প্রকৃত চর্চা বিশেষ বেগবতী ছিল। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট ও হনুমন্ত ঘাটে দুটি বেদান্তচর্চা কেন্দ্র ছিল। বঙ্গদেশে বেদান্তচর্চার এই ক্ষীয়মাণ অবস্থার তথ্যসমৃদ্ধ চিত্র অঙ্কন করেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর অমূল্য দু'খানি গ্রন্থে।[৩]

বেদান্ত-অনুশীলনের এই জড়দশায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা সদানন্দযোগীর 'বেদান্তসার' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী সহজভাবে ও অতিসংক্ষেপে অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষায় 'বেদান্তসার' গ্রন্থটি রচনা করেন।[৪] ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত 'বেদান্তসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। বাংলায়

লেখা পুঁথিটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন — "শ্রীযুক্ত অদ্বয়ানন্দ পরমহংস সন্ন্যাসীর শিষ্য কেহো বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের অর্থসকল গৌড়দেশীয় ভাষাতে শ্রীলশ্রী অমুকনামা বড় সাহেবের অধিকার সময়ে আঠারশত তিন সনে রচিত হইল।"[৫] শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরী উইলিয়াম কেরী ও যোশুয়া মার্শম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮১১ খ্রিঃ হিন্দুশাস্ত্র ধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত একখানি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খুব সম্ভব তাঁরই প্রয়োজনে শ্রীরামপুর মিশনের কোন পণ্ডিত মূল বৈদান্তসারের ভাবানুবাদ করেন।[৬]

বাংলা অনুবাদটিকে মূল সংস্কৃত পুঁথিটির আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং অনুসরণে লিখিত ভাবানুবাদ বলা যায়। বাংলা অনুবাদগ্রন্থটির ভূমিকা অংশটুকুতে অনুবাদকের নিজস্ব অভিমত প্রকাশিত। অদ্বৈতমতবাদের পরিপোষক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনুবাদকের বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল বলেই বেদান্তসারের মত অদ্বৈতবেদান্তের একটি প্রকরণ গ্রন্থের জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি উদাহরণের সাহায্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য করে অনুবাদ করেছেন। বঙ্গানুবাদের এই ভূমিকা অংশে দুটি মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হয়েছে। সদানন্দের 'বেদান্তসার' গ্রন্থের প্রধান উৎস যে শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্য, অনুবাদক ভূমিকায় সেকথা সমর্থন করেছেন। আর, ঈশ্বরলাভের জন্য কর্মকান্ডের পথ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের পথই সহজ এই সুস্পষ্ট মত প্রকাশিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, নবজাগরণের সেই অতি প্রত্যূষে রামমোহনের বৈদান্তিকরূপে আত্মপ্রকাশের প্রায় এক যুগ পূর্বে কোন একজন অজ্ঞাতনামা অনুবাদক 'গৌড়দেশীয়' ভাষাতে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত 'বেদান্তসার' গ্রন্থের যে স্বাধীন অনুবাদ করেছিলেন, তাকে আলোড়নকারী ঘটনা রূপে চিহ্নিত করতে হয়। দুঃখের বিষয় অনুবাদকের নাম আজও অজানা। মনে হয়, ওয়ার্ড সাহেবও এবিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন। যাই হোক্, এই 'বেদান্তসার - অনুবাদ' গ্রন্থটিই বঙ্গদেশে বাংলাভাষায় বেদান্তচর্চার প্রথম পদক্ষেপ।

এবার রামমোহনের পূর্বে বেদান্তের প্রসারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সম্ভবত ১৭৯৩ অথবা ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যদেশে বৈদিক সাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরা। ১৭৯৯ খ্রিঃ সেটি মুদ্রিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে হেনরী টমাস কোলব্রুক ঐতরেয় উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং ১৮০৫ খ্রিঃ এটিকে তাঁর বেদসম্পর্কিত বিখ্যাত রচনা 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-এর মধ্যে নিবদ্ধ

করেন। ১৮০৬ খ্রিঃ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম কেরী মূল ঈশোপনিষদ ও তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদগুলির কোনটিতেই উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়নি। বস্তুত তত্ত্বব্যাখ্যা অনুবাদকদের উদ্দেশ্য ছিল না। অন্য উদ্দেশ্যে উপনিষদের নিছক ব্যবহার করেছেন তাঁরা। উইলিয়াম ওয়ার্ড ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর রচিত 'বেদান্তসার' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন — 'ট্রানশ্লেসন অব্ দ্য কনটেন্টস্ অব্ দ্য বেদান্তসার'। ১৮১১ খ্রিঃ এই অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন তাঁর 'অ্যাকাউন্ট অব্ দ্য রাইটিংস্ অব্ রিলিজিয়ন্ এন্ড ম্যানারস্ অব দ্য হিন্দুস্ ইনক্লুডিং ট্রানশ্লেসনস্ ফ্রম দেয়ার ওয়ার্কস'[৭] নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডে। বস্তুত এটিই বেদান্তসার গ্রন্থের প্রথম সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ। ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে সদানন্দ যোগীর 'বেদান্তসার' এর মূল সংস্কৃত পুঁথিটি এবং তার বাংলা অনুবাদও ওয়ার্ডের গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। ওয়ার্ড সাহেবের ইংরাজী অনুবাদটি অবশ্য মূলের যথাযথ অনুবাদ হয়নি। কারণ, মনে হয়, ওয়ার্ড বেদান্তসারের কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্বের গূঢ়ার্থ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। আর আসল ব্যাপার হল, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতার জন্য ওয়ার্ড 'বেদান্তসার' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটিকেই ইংরাজী তর্জমা করেছিলেন। বেদান্তসারের বাংলা অনুবাদক তাঁর রচনার ভূমিকায় যে স্বাধীন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, মূলের অতিরিক্ত যে সকল উপমা-উদাহরণ প্রভৃতি যোগ করেছেন, ওয়ার্ড সেগুলি প্রায় পুরোটাই অনুবাদ করেছেন।

দেখা গেল, রামমোহনের অব্যবহিত পূর্বে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেদান্ত সংস্কৃত ভাষার আবরণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সংস্কারের প্রাবল্যে পন্ডিতবর্গ উপনিষদ তথা বেদান্তকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করেননি। রামমোহন প্রথম এই প্রচলিত প্রথার ব্যত্যয় ঘটালেন। তিনি প্রজ্ঞার আলোকে একদিকে উপনিষদ-ব্রহ্মসূত্র-গীতা এইসব সনাতন ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য সন্ধান করলেন এবং একই সঙ্গে আবাহন জানালেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান দীপ্ত নতুন যুগকে।

সূত্র-নির্দেশ

১। ডঃ এস. কে. দে, 'আর্লি হিস্টরি অব্ বৈষ্ণব ফেথ্ এন্ড মুভমেন্ট, ১৯৪২, পৃঃ৩১৬।

২। উইলিয়াম ওয়ার্ড, 'অ্যাকাউন্ট অব দ্য রাইটিংস, রিলিজিয়ান এন্ড ম্যানারস্ অব্ দ্য হিন্দুস্', ভল্যুম-১, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, শ্রীরামপুর, ১৮১১, পৃঃ ১৯৯।

৩। ঐ

৪। সম্পা — শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসার', প্রথম প্রকাশ শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮৪, পৃঃ ৬।

৫। ঐ

৬। শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসার', সম্পা - শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ - শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮৪, পৃঃ ৩।

৭। উইলিয়াম ওয়ার্ড, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, শ্রীরামপুর, ১৮১১।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১। ডঃ দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস'।

৩। এইচ. টি. কোলব্রুক, মিস্‌লেনিয়াস্‌ এসেজ্‌, ভল্যুম-১ লন্ডন, ১৮৩৭।

নজরুল রচনায় ইতিহাস চেতনা

মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া

মানব সভ্যতার বা মানব ইতিহাসের নিয়ামক তারই ধারণকৃত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের প্রবহমান ধারা। সেই ধারায় তাকে টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে শয়তান, দৈত্য-দানব এবং স্বগোত্রীয় শোষক নিপীড়কের বিরুদ্ধে। সংগ্রামের এই ধারাই ইতিহাসের দীপ্তিমান গৌরব। আর সেই গৌরবের উপর ভর করে একটি জাতির জীবনাদর্শ বা জীবন দর্শন গড়ে ওঠে। কাজী নজরুল ইসলাম সাধারণত বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত। তাঁর রচনায় বিদ্রোহের সুর ও বাণী থাকলেও সে বিদ্রোহ ছিল অন্যায় অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, বাদক, গায়ক, গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী ছাড়াও তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাও রপ্ত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামই রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনামূলক রচনার প্রধান স্রষ্টা।[১] অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগে তাঁর প্রকৃত সাহিত্য জীবনের শুরু। সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হন এবং রাজনৈতিক জাগরণী কবিতা লিখে তা জোরদার করেন। একদিকে তিনি যেমন জামাল উদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামিক চিন্তাধারা ও কামাল আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন অপরদিকে তিনি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হন।[২] সাম্যের কবি, আর্ত মানবতার কবি, বিপ্লবের কবি, সর্বোপরি বাংলার স্বাধীনতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনায় তার স্বপ্নের সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেই সমাজের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সঞ্জীবনী হিসেবে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমাদের আজকের আলোচনার বিশেষ লক্ষ্য নজরুল রচনায় ইতিহাস চেতনার রূপায়ণ বর্ণনা করা, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা এবং তার মূল্য বিচার করা।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এমন এক সময়ে যখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ব্রিটিশ-বেনিয়া ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের

যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সত্যিকার অর্থে তখন ব্রিটিশ সূর্য মধ্য গগন থেকে অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়েছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আলোক আভা ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমন সময় ব্রিটিশ বাংলার এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে নজরুলের জন্ম হয়। দারিদ্রের কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু পারিবারিক ও জাতীয় ঐতিহ্য, দেশ-বিদেশে পর্যটন ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ তাঁকে অত্যন্ত সচেতন করে তোলে। পরাধীনতার গ্লানিই তাঁকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয়। তাই স্বাধীনতার বাণী নিয়েই তিনি সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সমাজ সচেতন ও ইতিহাস বোধ সম্পন্ন। আর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তার মাত্রাজ্ঞান ছিল পুরোপুরি। তিনি বাংলার এমন এক সমাজ থেকে এসেছিলেন যারা একশো বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিধ্বস্ত, পরাজিত ও হতাশা গ্রস্ত হয়ে বসেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তা অর্জন একটি জাতির ইতিহাসের অতীব অপরিহার্য অংশ। আর সে অভিধায় স্বাধীনতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ইতিহাস চেতনায় এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।

নজরুল তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ব্যঙ্গ রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুধু মুসলিম জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যই রূপায়ণ করেননি বরং শ্যামা সংগীতের হিন্দু ঐতিহ্যের ব্যবহারে হিন্দু সমাজকেও যারপর নাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।[৩] অর্থাৎ এক অসাম্প্রদায়িক নজরুল হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাহিত্যে যেমন রয়েছে অতীত সাহিত্যের ভূমিকা, তেমনি রয়েছে অতীত ইতিহাস ও ধর্মের ভূমিকা। বলতে গেলে এগুলোই ছিল নজরুল সাহিত্যের প্রাণশক্তি। সাহিত্যিকগণ ইতিহাসকে নানাভাবে ব্যবহার করেন। উপমার প্রয়োজনে, জাতীয় মানসকে উদ্দীপ্ত করার মানসে, নিজের চিন্তাদর্শের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এবং উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার জন্যে। শুধু উপমাই ইতিহাস চৈতন্য নয় বরং সমকালের রূপকে চিহ্নিত করার জন্যে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এ কাজটি অত্যন্ত স্বার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। নজরুলের অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থই মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য রূপায়ণে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'শাতইল আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণি', 'মোহররম' ইত্যাদি এ চেতনার কবিতা। এগুলোর ভাবানুষংগ মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস ও তার অতীত ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে ইতিপূর্বে আর কোন কবির লেখনীতে প্রকাশ পায়নি। উদাহরণস্বরূপ তাঁর শাতইল আরব কবিতায় শুরুটা দেখা যায়।

শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পুত যুগে যুগে তোমায় তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক সেনানী
য়ূমানী মিশরী আরবী কেনানী;
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈনদের চাঁঙ্গা-শির!
নাঙ্গা-শির শম্‌সের হাতে আঁসু-আঁখে হেতা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর
শাতিল আরব। শাতিল আরব। পূত যুগে যুগে তোমার তীর।[৪]

সমকালীন সমাজে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে দুর্দশা অবলোকন করেছেন সে দুর্দশা একেবারেই নতুন নয়, অতীতেও ছিল। তিনি উল্লেখ করছেন অতীতের মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ বিপ্লব তাদেরকে সে দুদর্শা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বর্তমানেও শাসক শোষকের অক্টোপাস থেকে সেভাবে সংগ্রাম-বিপ্লবের দ্বারা মুক্তি পেতে হবে।[৫] তার বিখ্যাত চল্ চল চল রণ সংগীতটির শেষ তিনটি স্তবক নিম্নরূপ ঃ

কবে সে খোয়ালী বাদশাহী
সেই যে অতীত আজও চাহি
যাস্ মুসাফির গান গাহি
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাকরে তখ্‌ত তাউস
জাগরে জাগ্ বেহুঁস।
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক রুশ।

জাগিল তারা সকল
জেগে ওঠ হীণবল।
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল।

ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করেছি যে একটি দেশ ও জাতি ক্ষীণ-দূর্বল অবস্থা থেকে একদিন সবল শক্তিমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, কখনো ভাল অবস্থা থেকে দুরাবস্থায় নিপতিত হয়েছে, আবার অসহায় অবস্থা থেকে পরাক্রমশালী অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অধঃপতিত ও পশ্চাৎপদ সমাজকে তারই দৃষ্টান্ত দেখাতে নজরুল রোম, গ্রীস, রাশিয়া

ও পারস্যের কথা উল্লেখ করলেন এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ধ্বংসস্তুপ থেকে তারা যদি উঠে আসতে পারে তাহলে আমরা উঠে আসতে পারবো না কেন? সুতরাং বাদশাহী বা রাজত্ব হারানোর দুঃখে অশ্রু বিসর্জন না করে আবার ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠো। পতনের পর উত্থান এটাই ইতিহাসের গতিধারা। কাজেই আমাদেরও উত্থান ও বিকাশ ঘটবে। হতাশার কোন কারণ নেই। তাজমহলের উদাহরণ অতীতের সমুজ্জ্বল কীর্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচায়ক। অতীতের কীর্তিশক্তিতে সন্‌জীবিত হয়ে যে নতুন জীবন ও প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর কবিতা ও গানে তা প্রাণময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[৬]

নজরুলের ইতিহাস-প্রীতি অতীতের প্রতি সামান্য অন্ধ মোহের সংগে তুলনীয় নয়। তিনি অতীতকে স্মরণ করছেন বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার রূপে। তাঁর কবি দৃষ্টিতে ইতিহাস চির জীবন্ত। মহররম ও কোরবাণি কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর উদগত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে সমকালীন মানুষের তৃষ্ণাতপ্ত জীবনের উপর। কামালের কীর্তি ও তাঁর অনুসারীদের আত্মদানের মহিমা ঘোষণা করতে গিয়ে স্বদেশের শহীদদের জন্যই তাঁর বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

"মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের?
আব্ জম্‌জম্ আনলে এঁরা, আপনি পিয়ে, কলসী বিষের
কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছে
দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে
বেশ করেছে।"

নজরুল কাব্যের ভেতর দিয়েই বাংলা কবিতা ও গান রাজনীতি আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে জীবন ও জগতের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মূলে কাজ করেছে রাজনীতি। তিনি নবযুগ পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়তে লিখেছেন ঃ "নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ন মানব। তাঁর হাতে স্বাধীনতার বাঁশী। সে বাঁশীর সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু পরমাণু ক্ষিপ্ত হয়ে সাড়া দিয়েছে। আজ রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতি ধরিয়াছে-

"পোহাল পোহাল বিভারবী
পূর্ব তোরণে শুনি বাশরী।"

এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে এবং সেই সংগে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্তান; জর্জরিত, নিপীড়িত ও শৃংখলিত ভারতবর্ষ।[৭]

সমাজ সচেতন স্বাধীনতা পাগল নজরুল ইসলাম বুঝেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যে ভাবে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা পরাধীনতার শেকল কেটে বেরিয়ে এসেছে এবং আসছে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের পক্ষেও মুক্তি লাভ করা একান্ত সম্ভব। তাঁর এই উপলব্ধি এই চেতনা দিয়েই তিনি লেখনীর উজ্জ্বল মশাল জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"কান্ডারী তব সম্মুখে ঐ পশাশীর প্রান্তর
বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খন্‌জর।"

নজরুল যথার্থভাবেই ভেবেছিলেন এবং বুঝেছিলেন সকল দুঃশাসক ও শোষকের জুলুম-নিপীড়ন থেকে উদ্ধার পাবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হচ্ছে যুদ্ধ ক্ষেত্র। এই শিক্ষা তিনি ইতিহাস থেকেই লাভ করেছিলেন। ফেরাউনের হাত থেকে মুছা নবী, জাহেলিয়া যুগের কোরেশদের হাত থেকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) যুদ্ধ করেই নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করেছিলেন। ইতিহাসই তাঁকে শিখিয়েছিল অন্যায়-অত্যাচার রোধ করতে। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে রাবণের বিরুদ্ধে রামকে, কংসের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকে, কৌরবের বিরুদ্ধে পান্ডবকে, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেন (রাঃ) কে লড়াই করতে হয়েছিল। এই লড়াই-যুদ্ধের মাধ্যমেই মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী দুষ্টচক্রের হাত থেকে রোমীয়-পারসীয়দের মুক্তিঘটেছিল। স্বৈরাচারী জারের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছিল নির্যাতিত রুশদের, গ্রীসের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছিল নিগৃহীত তুরস্কের। তাই তিনি আমাদের এই উপমহাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধই প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন বিশ্বে আজাদি লাভের জন্য মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী, দেশ জাতি বা সম্প্রদায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মানব সভ্যতার আবহমান এ রীতি আজও বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও এভাবে যুদ্ধ করেই মানুষকে টিকে থাকতে হবে। তাই নজরুল যুদ্ধকে মানব জীবন-দর্শন বলে গণ্য করেছিলেন।[৮]

আর সেজন্য ব্রিটিশ বিরোধী সহস্র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির লক্ষ্যে আধুনিক সামরিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত নজরুল ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখাতেও এরকম ইংগিত পাওয়া যায়। তাঁর 'ব্যাথার দান' উপন্যাসে দারা ও সায়ফুল মুলক রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর বেলুচিস্তান থেকে মধ্য এশিয়ায় গিয়ে 'লালফৌজে' যোগদান করেন এবং প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। নজরুল ইসলামের আরো কয়েকটি গল্পের নায়ক যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। যেমন-'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', 'রিক্তের বেদন' এবং 'ঘুমের ঘোরে' ইত্যাদি। 'বাধন হারার' নুরুল হুদা বিদ্রোহী সৈনিক-নজরুলেরই প্রতিরূপ বলে মনে হয়। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার

নির্দেশে নজরুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং সেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন।

তিনি তার মরুভাস্কর কাব্যগ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্বীয় জীবন ইতিহাস সুচারুরূপে বিবৃত করেছেন। ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষা এবং ইতিহাস সচেতনতাই তাঁকে এই তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়েছিল। তিনি তাঁর কাব্যসহ সকল সাহিত্য শাখায় এই মহান শিক্ষাকে মজবুতভাবে মিশিয়ে দেবার প্রাণপন চেষ্টা সাধনা করেন। পরিশেষে একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। তাহলো এই যে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের মাঝে এসেছিলেন এবং যে মহান ও গুরু দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাতে তাঁকে আমাদের 'স্বাধীনতার কবি' না বলে খুব সংকীর্ণ অর্থে 'বিদ্রোহী কবি' বললে আসল সত্যেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে, ঠিক যেমনিভাবে আসল সত্যের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় ১৮৫৭ সালের মহান 'স্বাধীনতা সংগ্রামকে' সংকীর্ণ অর্থে 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে।

সূত্র-নির্দেশ

১। ইসলামী বিশ্বকোষ ১৩ শ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ ঃ ৬১৫।

২। মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃ ঃ ৩৪।

৪। নজরুল ইসলামঃ কালজ কালোত্তর, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ ঃ ১৭।

৫। শ্রেষ্ঠ নজরুল আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ নজরুল।

৬। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগ-স্রষ্টা নজরুল, ১৯৯৬, ঢাকা, ১৯৬৮।

৭। নজরুল রচনাবলী ৩য় খন্ড আব্দুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১৯৯৩।

৮। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য কে, পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

সারাংশ

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা

চিত্তব্রত পালিত

সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের চাপে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গোষ্ঠীস্বাতন্ত্রের প্রাবল্যে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জাতীয়ভাবের বিরোধিতা এবং জাতীয় গৌরবের পুরোধা মনীষীদের অবমূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। সেই সূত্রে জগদীশচন্দ্রও বাদ পড়েননি। এই প্রসঙ্গে আশিস নন্দীর Alternative Sciences, সুব্রত দাশগুপ্তের Jagadish Chandra Bose and অধুনা জন লুরডুস্বামীর অপ্রকাশিত অক্সফোর্ড প্রদত্ত বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদের উপর গবেষণাপত্রে জগদীশচন্দ্রের অবমূল্যায়ন চোখে পড়ে। এঁদের মূল বক্তব্য এই যে জগদীশচন্দ্র তদানীন্তন ব্রিটিশ বিজ্ঞানচর্চার অনুসারী একজন প্রান্তিক বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার স্বকীয়তা এবং সম্পূর্ণতা কম। গণিতে কাঁচা এবং পদার্থ বিজ্ঞানে পারঙ্গম হতে না পেরে তিনি উদ্ভিদবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন, এবং সেখানেও উদ্ভিদের চেতনাপ্রবাহ নিরূপণের অতিরিক্ত কিছু করে দেখাতে পারেননি। অথচ জগদীশচন্দ্রের সমকালীন জীবনীকার প্যাট্রিক গেডেস তাঁকে ভারতীয় বিজ্ঞানের পথিকৃৎ প্রথম সারির বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে প্রবল ঔপনিবেশিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এই আপাতবিরোধী মতামতের সত্যাসত্য বিচার করতে গেলে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চার পূর্ববর্তী ইতিহাসের দিকে ফিরতে হয়। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ স্থান ছিল না। মেকলের ১৮৩৫ সালের শিক্ষা প্রস্তাবে সরকারি টাকা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে মূলতঃ মানবিক বিদ্যার উপর ব্যয় করা হবে বলে রায় দেন। বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান শেখানোর অবশ্য তাঁর সম্মতি ছিল না। এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়। সরকার দপ্তরগুলি চালু রাখার প্রয়োজনে ইংরেজিতে শিক্ষিত কেরানীকুল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী তৈরির কোন সদিচ্ছা তাঁদের ছিল না। তাহলে ভারতীয়রা শিল্পবিপ্লব ঘটাতে পারে এবং ভারতের কাঁচামাল এবং বাজারের উপর নির্ভরশীল ব্রিটিশ শিল্পের হানি ঘটাতে পারে।

জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এই পরিস্থিতিতে প্রবল এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর জাতীয় বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্র বা Indian Association for the Cultivation of Science 1876 সালে গড়ে তোলেন। একালের মত সেকালেও তাঁকে

ভারতীয় নেতাদের মুখেই শুনতে হয় যে ভারতীয়দের প্রয়োজন রুজিরোজগারের জন্য কিছু কারিগরি শিক্ষা। উন্নত বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা নেই। কারণ কোনভাবেই নিউটন বা হার্শেলের মত বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে পারবে না। এর উত্তরে IACS - এর ভাগ্যনির্ধারক বিতর্কসভায় মহেন্দ্রলাল ছাড়া যিনি সেই সম্ভাবনার উপর জোর দেন, তিনি ফাদার ইউজিন লাফঁ (Eugene Lafout)। ইনি ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। মহেন্দ্রলালের বন্ধু এবং পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্রের জীবনে প্রভাবশালী শিক্ষক। জগদীশচন্দ্র তখন কলেজে উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়তে আসেন, তখন লাফঁর প্রেরণায় তিনি মত বদলে পদার্থবিজ্ঞানে নাম লেখান। আমরা দেখাব কিভাবে জগদীশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে নিজস্ব প্রতিভায় এবং প্রযত্নে গবেষণার স্বীকৃতিতে এসব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছাকাছি চলে আসেন এবং গুরুর ইচ্ছাপূরণ করেন।

জগদীশচন্দ্র পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হবার পর কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে ট্রাইপস্ বা পুনরায় স্নাতক হন। এর পরে তিনি Indian Educational Service - এর পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। IES হলে সাহেবরা সরাসরি প্রফেসর পদে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে কম বেতনে ওই পদে বৃত হন। তিনি এক বছর ওই বেতন না নিয়ে কাজ করেন, এই প্রতিবাদের ফলে পরে তাঁকে পুরো সম্মান ও বেতন দেওয়া হয়। এই দাবি আদায় হলেও গবেষণায় সুযোগ দেওয়া হয়নি। দিনের বেলা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকতায় অবদ্ধ থাকতে হত। রাত্রে তবু অসীম অধ্যবসায়ে তিনি গবেষণায় রত থাকতেন। এজন্য তিনি অধ্যাপক পেডলায়ের গবেষণাগারের একটি কোণায় কাজ চালাতেন। যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না। স্থানীয় ছুতোরদের ধরে তিনি নিজের যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিচারণেই জানা যায় যে তিনি একজন সফল শিক্ষক ছিলেন। সেদিকে অবহেলা না করেও রাত্রে গবেষণায় ডুবে থাকতেন।

এখান থেকেই তিনি তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কার ইথারের তরঙ্গ, বিদ্যুৎ ও চুম্বকজনিত ছোট তরঙ্গের সাহায্যে বেতারবার্তা প্রেরকযন্ত্র এবং গ্রাহকযন্ত্র (Wireless Communication by Electromagnetic Short waves) ইত্যাদি মৌলিক গবেষণা করেন। এ ব্যাপারে নিবেদিতা লিখেছেন-তিনিই প্রথম উদ্ভাবক। ১৮৯৫তেই তিনি এর উপর গবেষণাপত্র লেখেন। তখনও মার্কনির গবেষণা সম্পূর্ণ হয়নি। ১৮৯৫ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র বহু গবেষণাপত্র রচনা করে লন্ডনের রয়াল সোসাইটিতে পাঠান। হার্টজের (Hertz) পরবর্তী পদার্থবিদ্যার গবেষণায় তিনি বিপ্লব আনেন। ১৮৯৬ সালে বিনা উপস্থিতিতেই গবেষণা পত্রের ভিত্তিতে ডি. এস. সি. হন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এও এক অভূতপূর্ব সম্মান। তিনি বিলেতে যাবার ছুটি এবং পথ খরচ চাইলে সরকার বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৯৬ থেকে ১৯০১ এর মধ্যে

তিনি দুবার লণ্ডন যান। তাঁর দেশীয় যন্ত্রপাতি প্রয়োগ কৌশল দেখাবার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল। এ ব্যাপারে মার্কনির সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল। তিনি প্রয়োগ কৌশল দেখাবার ব্যাপারে সঠিক যন্ত্রপাতির সাহায্য পান এবং সার্থক প্রদর্শনও করেন। তিনি তাত্ত্বিক ছিলেন না। ছিলেন আবিষ্কারক। ব্যবহারিক দিকের দিশারী। তিনি মাঝারি তরঙ্গে বেতারবার্তা প্রেরণের ব্যাপারে পথিকৃৎ। কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যাখায় জগদীশচন্দ্র ছিলেন অগ্রণী। তবে দেশে থাকতে প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং পরে টাউন হলে তিনি যে প্রদর্শন করেন, তারিখ ধরলে সে ব্যাপারেও তিনি পথিকৃৎ বলা যায়। তাই নিবেদিতা লিখেছেন, মার্কনি তাঁর আবিষ্কার পেটেন্ট করেন এবং তার জন্য নোবেল পুরষ্কার পান। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সে ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না। এতদিনে অবশ্য তাঁকে বেতার যোগাযোগের পথিকৃৎ হিসেবে মরণোত্তর নোবেল প্রাইজ দেবার রব উঠেছে। জগদীশচন্দ্র ছিলেন প্রচারবিমুখ। নিবেদিতা লিখেছেন, জগদীশচন্দ্র ১৮৯৫-১৯০১ - এর অন্তবর্তী সময়ে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র লিখেছেন। সারা বিশ্বে তার স্বীকৃতিও মিলেছিল। যেমন, (Invisibel light polarisation stress and strain of matter Binocular Alternation of viscın) ইত্যাদি। এপর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে যা লেখা হোল, গেডেসের জীবনীতেও তার স্বীকৃতি আছে। সুতরাং তিনি গণিতে কাঁচা থাকায় পদার্থবিদ্যায় আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে না পেরে ওই শাস্ত্র ছেড়ে উদ্ভিদ বিস্তার বিদ্যার দিকে ঝোঁকেন বলে আধুনিক ভুয়োদর্শী লেখকেরা যে মত পোষণ করছেন তা ধোপে টেঁকে না।

এবার তাঁর উদ্ভিদ বিদ্যায় আকর্ষণের বিষয়ে আসা যাক। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতি প্রেমিক ছিলে বলে গেডেস লিখেছেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ওই শাস্ত্রই পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার লাফঁর প্রভাবে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৯১৬) প্রাক্কালে তিনি গাছপালার শারীরতত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেন। যে তড়িৎ-চুম্বক প্রবাহ নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন তারই প্রয়োগ তিনি উদ্ভিদের উপর করে দেখতে চান যে তাদের প্রতিক্রিয়া কী? চেতনা কী? অস্তিত্বের রহস্য কী? এ গবেষণায় তিনি কেন এলেন সঠিক জানা যায় না। তবে মনে হয় কৃষিপ্রধান দেশে এই গবেষণা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। গাছের প্রাণ ও জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে ফলনের উপরও আলোকপাত করা যায়। Plant Genetics, Seed Hybridisation ইত্যাদি নিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যে গবেষণা চলেছে তিনি তাঁর উদ্‌গাতা। তিনি উদ্ভিদের স্পন্দন নিয়ে গবেষণা করেন। তার পরিমাপক যন্ত্র Crescograph তিনি স্থানীয় কারিগরদেব দিয়েই বানিয়ে নেন। গাছের প্রাণ আছে এই উপলব্ধিকে তিনি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখান। উদ্ভিদ

সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের ব্যাপারে এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর জন্যেও তিনি নোবেল প্রাইজ পেতে পারতেন। কিন্তু ওদিকে তাঁর নজর ছিল না। তাঁর আবিষ্কারের মর্ম বোঝার মতো মানুষ এদেশে বা বিদেশে ছিল না। শেষ জীবনে তিনি ক্লোরোফিল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টায় ছিলেন বলে অবলা বসুর ডায়েরিতে জানা যায়। বিকল্প এই উৎস সন্ধান একেবারে উত্তরাধুনিক চিন্তা, ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

জনপ্রিয় বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী লেখক। তাঁর লেখা 'অব্যক্ত' যেই পড়েছেন মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে তিনি মহাদেবের জটা থেকে নদীর উৎপত্তি বর্ণনা করে তার সর্বহিতকারী রূপটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নদীর স্বাস্থ্যহানি ও তার জল নিয়ে যে স্বার্থান্ধ হানাহানি দেখা দিয়েছে, এই প্রবন্ধে তার নিরসনের ইঙ্গিত আছে। আর গাছের প্রাণ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ আছে যা মর্মস্পর্শ করে এবং প্রকৃতি সংরক্ষণে আমাদের তৎপর করে । এছাড়া Hyacmth Committee-র প্রধান হিসেবে ১৯২১-২৮ এর মধ্যে একাধিক প্রতিবেদন লেখেন। কচুরীপানার বৃদ্ধি বন্ধ এবং তা থেকে সার প্রস্তুত করা যায় কিনা তা নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা তিনি লিখেছেন।

পরিশেষে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কথা না লিখলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পনায় এবং নিবেদিতার প্রযত্নে ১৯১৬ তে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দির নামটি সার্থক। কারণ ভারতীয় শিল্পের আধারে মন্দিরের মতই এর অঙ্গসৌষ্ঠব। নিবেদিতার এব্যাপারে অবদান অনেকখানি। অর্থসংগ্রহ, পাঠক্রম এবং স্থাপত্য, সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন জগদীশচন্দ্রের সহচরী। আবার বসু বিজ্ঞান মন্দির জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার মন্দিরও বটে। মহেন্দ্রলালের IACS - এর পর এতবড় প্রচেষ্টা আর হয়নি। এখানে শুধু উদ্ভিদ বিজ্ঞানের চর্চা হত না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা ধারায় পাঠক্রম ও গবেষণা এখানে চালু ছিল। উপযুক্ত গবেষণাগার ছিল। জগদীশচন্দ্র কর্মজীবনে যা পাননি, জাতীয় জীবনে তাই দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আজ বসু বিজ্ঞান মন্দির এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এর দায়িত্ব নিয়েছেন।

দেশসেবার যে মন্ত্রে মহেন্দ্রলাল বা জগদীশচন্দ্র বা সতীশচন্দ্র দীক্ষিত ছিলেন, সেই প্রজন্ম এখন নেই। এঁরা জাতীয়তাবাদ এবং বিজ্ঞানকে মিলিয়েছিলেন। বিজ্ঞানসাধনা এঁদের কাছে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সমতুল্য। এই ধারার পুনঃপ্রবর্তন আজ প্রয়োজন। জগদীশচন্দ্রের মত ভগীরত যেন খর্বকায়দের খর্ব করার চেষ্টায় স্থানচ্যুত না হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসকারদের সে ব্যাপারে অবহিত করার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিক ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে ইংরেজ-নির্মিত 'দুর্বল-অক্ষম বাঙালি-র'[১] কটাক্ষের প্রতিবাদে এক উদ্দীপিত শারীর সংস্কৃতি আন্দোলনের[২] প্রসার ঘটেছিল। আর সেই সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 'ভারতীয় ফুটবলের জনক'[৩] রূপে পরিচিত নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর অদম্য খেলোয়াড়ী উদ্যম ও অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে বাঙালি সমাজে আধুনিক ক্রীড়াসংস্কৃতির উদ্বোধন ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। নগেন্দ্রপ্রসাদের কাছে খেলা ছিল বৃহত্তর লক্ষ্যপূরণের সাংস্কৃতিক পন্থা : আর সেটা হল বাঙালির শারীরিক শক্তির পুনরুজ্জীবন, তার আহত পৌরুষের পুনঃপ্রকাশ এবং ভারতের ক্রমাবনত জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধার। বাঙালির শারীরিক তথা ক্রীড়া দক্ষতার উন্নতিতে নগেন্দ্রপ্রসাদের নিরন্তর প্রয়াসকে স্বভাবতই উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করাটা মোটেও অযৌক্তিক হবে না। যদিও বালক বয়সে তাঁর ফুটবল খেলা প্রবর্তনের বহুচর্চিত কাহিনী এবং মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সমস্তরকম ক্রীড়াসংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে তাঁর কিছুটা আকস্মিক ভাবে সরে যাওয়া[৪] ঐতিহাসিককে যথেষ্ট বিতর্কের সূত্র দেয়, কিন্তু আধুনিক বাংলা সমাজে একটা সচল ক্রীড়া সত্তা গঠনে ও এক নবজাগৃত ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসারে তাঁর অবিসংবাদী অবদান সমকালিন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে দুর্লভ। আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র কিন্তু এ যাবত ঐতিহাসিক রচনায় গবেষণায় উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন। বর্তমান নিবন্ধে সমকালীন বাংলায় ক্রীড়া সংস্কৃতির নবজাগরণে নগেন্দ্রপ্রসাদের অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্রয়াস করব।

নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কলকাতার বিখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের সন্তান।[৫] ১৮৭০ এর দশকের দ্বিতীয় ভাগে নগেন্দ্রপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করতেন। বাংলায় তথা ভারতে তখন ফুটবল খেলার চর্চা শুধু গোরা সাহেবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালিরা সাহেবদের এই সব ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের যুক্ত করতে আগ্রহ দেখাত না। এহেন প্রেক্ষাপটে ১৮৭৭ সালে গ্রীষ্মের এক সকালে বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ তার মায়ের সাথে গঙ্গাস্নানে যাবার পথে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার সংলগ্ন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব-এর মাঠে কয়েকজন গোরা সৈন্যকে ফুটবল নিয়ে খেলতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং একবার তার পায়ের কাছে বলটি এসে পড়লে ঠিকমতো কিক্ করে তা ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

বালক নগেন্দ্র-র এই 'কিক্-অফ্' এর জোরেই বাঙালির ফুটবলে হাতেখড়ি হয়।[৮] কেন না এর আগে ভারতের কোনও প্রদেশেই কোনও ভারতীয় ফুটবল খেলেছেন বলে তথ্য প্রমাণ নেই। এই ঘটনার পরদিনই নগেন্দ্রপ্রসাদ তার হেয়ার স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদা তুলে ফুটবল ভেবে একটি রাগবি বল কিনে এসে স্কুলের মাঠে খেলতে শুরু করে। স্কুলছাত্রদের উৎসাহ দেখে পার্শ্ববর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জি.এ.স্ট্যাক্ নিজে ফুটবল কিনে এনে তাদের খেলা শেখানোর উদ্যোগ নেন। স্ট্যাক্রে কোচিং-এ অল্পদিনের মধ্যেই বালকের দল ফুটবলে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

ছোটবেলা থেকেই নেতৃত্ব দিতে অভ্যস্ত নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন দলের নেতা। অল্পদিনের মধ্যেই 'বয়েজ ক্লাব', ' প্রেসিডেন্সি ক্লাব' ও 'ওয়েলিংটন ক্লাব'-এর জনকরূপে নগেন্দ্র-র নাম কলকাতা সহ আশপাশের মফস্বল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এর মধ্যে 'বয়েজ ক্লাব'-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং মারকুইজ অফ রিপন'। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের পর নগেন্দ্রপ্রসাদ অদ্বিতীয় খেলোয়াড় ও সংগঠকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। কলেজের অগ্রজ ছাত্ররা তাঁর নেতৃত্বে খেলতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই নগেন্দ্রকে সম্মান জানাতে তাকে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করতেন। ক্রমে নগেন্দ্রর চেষ্টায় কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী জেলায় জোর কদমে ক্লাবসংগঠন শুরু হয়। ১৮৭৭ সালেই বয়েজ ক্লাব গঠনকালে চোরাবাগানের মল্লিক বংশের সন্তান নগেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গে নগেন্দ্রর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই জন্যেই নগেন্দ্রপ্রসাদ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাগানে ' ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব' স্থাপনের সুযোগ পান। সে উপলক্ষ্যে মল্লিকদের মার্বেল প্যালেসে বিরাট জাঁকজমকের ব্যবস্থা করা হয় এবং বহু লোকের সমাগম ঘটে। বাংলায় ফুটবল যে ক্রমশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিল, এসব ছিল তারই ইঙ্গিত।

শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়, শহর কলকাতার বাইরে ফুটবলের প্রসারের জন্যে নগেন্দ্র হাওড়ার প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র কুন্ডুর পুত্র বামাচরণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। এঁদেরই যৌথ উদ্যোগে হাওড়াতে প্রথম ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয়। এর সুফল হিসেবেই কলকাতার আশেপাশের মফস্বল শহর গুলোতে 'হাওড়া স্পোর্টিং', 'ন্যাশনাল', 'খিদিরপুর', 'চিনসুরা স্পোর্টিং' প্রভৃতি ক্লাব গড়ে ওঠে। তাঁর এই সাংগঠনিক দক্ষতার জন্যেই বহু ভারতবরেণ্য সহযোগী, যার মধ্যে ছিলেন স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার বিনোদ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার ভূপেন্দ্রলাল মিত্র নগেন্দ্রকে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করতেন। এঁরা সকলেই নগেন্দ্রপ্রসাদের শরীরচর্চা কেন্দ্র ও খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বাঙালিকে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ করার চেষ্টায় সবরকমের সাহায্য করে গেছেন।

নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি গড়ের মাঠে ক্লাবের তাঁবু খাটিয়েছিলেন। এর আগে শুধুমাত্র সাহেবদের ক্লাবগুলো গড়ের মাঠে তাঁবু খাটানোর সুযোগ পেয়ে এসেছিল। এখন যেখানে 'টাউন ক্লাব' অবস্থিত, সেটাই ছিল নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েলিংটন ক্লাব'-এর মাঠ। একে একে ওয়েলিংটন ক্লাবে তিনি ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, রাগবি ও হকি খেলার ব্যবস্থা করেন। নগেন্দ্রপ্রসাদই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরেজদের সঙ্গে ক্রিকেট-খেলে 'ওভারহেড বোলিং' করেন। নগেন্দ্রর চেষ্টায় ১৮৮৫ সালে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা হয়। এই খেলায় অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসা একটি একাদশের সঙ্গে 'প্রেসিডেন্সি ক্লাব—দ্বাদশ' এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।[৭] খেলায় নগেন্দ্রই বাংলার দলটিকে নেতৃত্ব দেন। অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়া খেলাটি দেখতে ইডেন উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন দাদাভাই নৌরজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৮৮৬ সালে বোম্বাই এর পার্সিদের ইংল্যান্ড সফরের আগে অনুষ্ঠেয় এই খেলাটি বোধ হয় ভারতীয়দের সঙ্গে যে কোনও বিদেশী দলের সর্বপ্রথম ক্রিকেট ম্যাচ। কলকাতায় এই ঐতিহাসিক ক্রিকেট খেলা হওয়ার পর এবং তাতে বাঙালি খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যে বিস্মিত হয়ে এইচ এম এস বোদেসিয়া যুদ্ধজাহাজের রিয়ার অ্যাডমিরাল ফ্রি ম্যান্টলে নগেন্দ্র ও তাঁর দলকে তাঁর যুদ্ধজাহাজের ডেকে একটি প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। বিশ্বখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেটার লর্ডহক ও স্যার হেনরি হ্যারিসন পর্যন্ত এই সময় নগেন্দ্রপ্রসাদের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন বলে জানা যায়। এর কিছুকাল পরে লর্ড হকের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের একটি ক্রিকের দল কলকাতায় এসে নগেন্দ্রপ্রসাদের দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ক্যাপ্টেন লরেন্স, রাওলিমসন্ প্রমুখ বিখ্যাত ক্রিকেটাররাও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে ক্রিকেটে নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের সমকক্ষ ছিলেন। এই সময়েই স্যার হেনরি হ্যারিসন প্রদত্ত কাপ গ্রহণ করে নগেন্দ্রপ্রসাদ শুরু করেন 'হ্যারিসন শিল্ড' ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, যা কিনা ভারতের তথাকথিত প্রাচীনতম স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বোম্বাই-এর হ্যারিস শিল্ডেরও ছ'বছর আগে শুরু হয়েছিল।

নগেন্দ্রপ্রসাদের তৈরী ওয়েলিংটন ক্লাব রাগবি খেলাতেও মনোনিবেশ করেছিল। সে সময় সাহেবদের মধ্যেও অনেকে রাগবি খেলতে সাহস পেতেন না। কিন্তু নগেন্দ্র বাছা বাছা শক্তিশালী বাঙালিদের নিয়ে রাগবি দল তৈরী করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৌবাজারের মতিলাল বংশের একটি সন্তান রাগবি খেলার সময় মারা যান। এই ঘটনার পর বয়োঃজ্যেষ্ঠদের অনুরোধে নগেন্দ্রপ্রসাদ ওয়েলিংটন ক্লাব থেকে রাগবি খেলা উঠিয়ে দেন।[৮] অবশ্য হকি ও টেনিস পুরো দমেই চলতে থাকে। কিশোর নগেন্দ্র-র সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে বিশেষভাবে তার গুণমুগ্ধ ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মি. হ্যারি লি। কতকটা এঁর উৎসাহেই ১৮৮২ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদ কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্যে কলকাতায় একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন।[৯] সে বছরের শীতে কলকাতায় এই বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানেব আয়োজন করে নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর

দক্ষতার পরিচয় দেন। এছাড়াও, তিনি ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতায় কুশলী করে তুলতে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের নিয়ে রাইফেল ক্লাবের পত্তন করেন। পিস্তল চালনায় ও ঘোড়-সওয়ারিতে দক্ষ নগেন্দ্রপ্রসাদ পরবর্তীকালে তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত 'নারায়ণী সাধন চক্র'।

নগেন্দ্রপ্রসাদের-ক্রীড়া সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে খেলোয়াড় সদস্য নির্বাচন করা। ভারতে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে জাতপাত-ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সবল প্রতিবাদ করেন। নিজ আদর্শ ও মতবাদের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য রক্ষা করতে গিয়ে নিজের হাতে তৈরি ওয়েলিংটন ক্লাবকে তিনি ভেঙ্গে দেন।

আসলে জাতি-ধর্ম-সম্মান নিয়ে গোঁড়ামির সে যুগে দেশ বোধ হয় তখনও এরকম ঐক্যমূলক মতবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ওয়েলিংটন ক্লাবে নগেন্দ্রপ্রসাদ তখন প্রায় পাঁচ-শ' সদস্য গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে ধনী-মধ্যবিত্ত, পার্সি-খ্রিষ্টান. এমনকি মুসলমানও ছিলেন।[১০] কিন্তু যখন পল্লীর এক কামারের ছেলে মণি দাসকে ঐ ক্লাবে নেওয়া হয়, মধ্যবিত্ত ও অভিজাত বংশের সন্তানগণ তাতে ঘোরতর আপত্তি জানান। কিন্তু যাবতীয় আপত্তি অগ্রাহ্য করে নগেন্দ্র স্পষ্ট-ভাষায় বুঝিয়ে দেন যে কোনও মূল্যে বংশ-পরিচয় ও জাতপাতের উর্দ্ধে 'খেলোয়াড়-জাত' সংগঠিত করতে তিনি বদ্ধ পরিকর।[১১] শেষপর্যন্ত এ নিয়ে ক্লাবের অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোলে নগেন্দ্রপ্রসাদ ওয়েলিংটন ক্লাব ভেস্তে-দেন। আদর্শের জন্যে নগেন্দ্রপ্রসাদের এই আপসহীন মানসিকতা সে কালের বাংলাদেশে এক দুর্লভ কীর্তি।

১৮৮৭ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁরই তৈরি বয়েজ ক্লাব, ফ্রেন্ডস্ ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব আর ভেস্তে যাওয়া ওয়েলিংটন ক্লাবকে একত্র করে শ্বশুরবাড়ী শোভাবাজারের রাজবাটীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'শোভাবাজার ক্লাব'।[১২] কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর এই ক্লাবের সভাপতি এবং নগেন্দ্রপ্রসাদ ও কুমার জিষ্ণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন। শোভাবাজার ক্লাবের পত্তন নগেন্দ্রপ্রসাদের এক অনন্য কীর্তি। ভারতের প্রথম মুক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা 'ট্রেডস্ কাপ' এর প্রথম বছর (১৮৮৯) শোভাবাজার অংশ নেয়। কলকাতার বাঙালি সমাজ তখন নগেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁর শোভাবাজারের খেলা দেখার জন্যে উন্মুখ। বাংলার তদানীন্তন লাটসাহেব পর্যন্ত ভারতীয় দলের খেলা দেখার জন্যে ময়দানে উপস্থিত হন এবং তাঁর ল্যান্ডো গাড়ি থেকে খেলা দেখেন। সে যুগের কলকাতার শ্রেষ্ট ইংরেজি পত্রিকা 'দি ইংলিশম্যান' গুরুত্ব দিয়েই এই ঘটনার উল্লেখ করে।[১৩] বিলেতের টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নগেন্দ্রপ্রসাদকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। এই ঘটনার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১৮৯২ সালে শোভাবাজার দুর্দান্ত মিলিটারি দল ইষ্ট সারে-কে পরাজিত করে। এটাই ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ক্রীড়ায় প্রথম মর্যাদাপূর্ণ জয়।[১৪] ১৯১১-য় মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের প্রায়

দু'দশক আগেই এই জয় খেলার মাঠে ভারতের পতাকা তুলে ধরেছিল। পরাধীন ভারতের ভেতো বাঙালির এই বিজয়-গৌরবে ভারতবাসী মাত্রই উদ্বুদ্ধ হন। পাতিয়ালা, কোচবিহার প্রমুখ দেশীয় রাজারা নগেন্দ্রপ্রসাদকে সম্মান জানাতে তাঁদের রাজ্যে আমন্ত্রণ করেন। বিদেশ থেকেও নগেন্দ্রপ্রসাদ অসংখ্য অভিনন্দন বার্তা পেয়েছিলেন। বাঙালি সমাজেও ফুটবল যেন এর ফলে এক সম্মানের আসন পেতে শুরু করে।

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রপ্রসাদ অনুভব করেন,- একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ছাড়া খেলাটির সঠিক পরিচালনা হতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করতেই তিনি ১৮৯২ সালে 'ডালহৌসি', 'ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব', 'ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স' প্রভৃতি ক্লাবের সাহেবদের একটি সভায় আমন্ত্রণ জানান। এই সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে পরের বছর থেকেই সর্বভারতীয় শিল্ড প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর, তা পরিচালনার জন্যে গঠন করা হয় 'ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন' বা আই এফ এ।[১৫] এই সংগঠনের কর্মসমিতিতে নগেন্দ্রপ্রসাদই একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। আই এফ এ শিল্ড তৈরির কাজে আর্থিক সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন নগেন্দ্রপ্রসাদের গুণগ্রাহী কোচবিহার ও পাতিয়ালার মহারাজারা। লন্ডনের এলকিন্‌টন অ্যান্ড কোম্পানি এই শিল্ড তৈরি করেছিল। ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বছরের শিল্ড খেলায় শোভাবাজার ক্লাবই ছিল একমাত্র ভারতীয় দল, যারা প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।[১৬]

নগেন্দ্রপ্রসাদ নাম-যশের তোয়াক্কা করতেন না। খতিয়ে দেখতেন না ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান। সারাজীবন খেলাধুলোর প্রসার ঘটাতে তিনি অকাতরে অর্থ বিলিয়ে গেছেন। কাজের জন্যেই কাজ ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। তিনি চেয়েছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে খেলোয়াড় জাত তৈরি করতে। সেই জন্যেই এত অল্প বয়স থেকেই তিনি এক নব্য জাতীয়তাবাদী মেজাজে উচ্চ ও নীচ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ইহুদি, পার্সি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন। খেলার মাঠকে হাতিয়ার করে সুদুর প্রসারী এক যাত্রাপথ ভারতবাসীর সামনে মেলে ধরেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় কর্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার ও শরীরচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। নগেন্দ্রপ্রসাদই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি, যিনি ছাত্র সমাজকে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত মাধ্যমের দ্বারা এক অভিনব সাম্যবাদে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। উদার চরিত্র ও দৃঢ় সংকল্পের জন্যে তৎকালীন বাঙালি সমাজের কাছে তিনি পালাবদলের পথিকৃত হয়ে ওঠেন। সত্যি কথা বলতে, নগেন্দ্রপ্রসাদই বাংলায় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ ঘটান। জাতীয় সম্মান সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত বালক বয়স থেকেই অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। দেহমনে দুর্বল হলে কিছুতেই জাতীয় সম্মান রক্ষা করা যায় না, এই কথাটি তিনি সারাজীবন ধরে সবাইকে শিখিয়ে গেছেন। দেশবাসীর শারীরিক শক্তির বিকাশই ছিল নগেন্দ্রর জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র।[১৭]

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আধুনিক খেলাধুলোয় বাঙালি উদ্যোগের ও অংশগ্রহণের পুরোধা ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। তাঁর উন্নত ও আধুনিক ক্রীড়ামানসিকতা (sportsmanship), ক্রীড়াক্ষেত্রে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য প্রচার কিংবা সামাজিক সাম্যের হাতিয়ার হিসেবে খেলাকে ব্যবহার বাঙালি সমাজে এক অভিনব ক্রীড়াসত্তা গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। যদিও নগেন্দ্রপ্রসাদের যাবতীয় ক্রীড়াদ্যোগ ও খেলোয়াড়ী মানসিকতার মূল্যায়ন করতে হবে সমকালীন উপনিবেশিক সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষিতেই। যেহেতু নগেন্দ্রপ্রসাদের ক্রীড়াভাবনা উপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির বাতাবরণেই সৃষ্ট, স্বভাবতই এর সীমাবদ্ধতাও মোটামুটি স্পষ্টরূপেই ধরা যায়। ১৮৮০-৯০ এর দশকে ফুটবল খেলা ছিল একটি সাংস্কৃতিক মাধ্যম বা উপায় যার দ্বারা বাঙালির শারীরিক দক্ষতার ও পৌরুষের পুনঃপ্রকাশ ঘটেছিল এবং ইংরেজের সঙ্গে সামাজিক আদান প্রদানের এক সমক্ষেত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। নগেন্দ্রপ্রসাদের ধারণায় কিন্তু খেলাটি তখনও জাতীয়তাবাদী অর্থে সাংস্কৃতিক অস্ত্র বা প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি। যদিও শরীরী ক্রীড়ায় প্রভু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই ও পরাভূত করার মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্তরে সবল প্রতিরোধের একটি ক্ষেত্র যে নগেন্দ্রপ্রসাদ কিছুটা অনবহিত ভাবেই প্রস্তুত করে দিয়ে যান, এ কথা অনস্বীকার্য। তবে ইংরেজদের সঙ্গে নগেন্দ্রপ্রসাদের আপাত সুসম্পর্ক ও ইংরেজ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাঁর পেশাভুক্তি থেকেমনে হয় তিনি খেলাকে প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক করে দেখতে তখনও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। এদিক থেকে বিচার করলে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী চিন্তা- চেতনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার একধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মোটামুটিভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক খেলাধুলোর অনুকরণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই নগেন্দ্রপ্রসাদের প্রয়াসকে স্থাপন করাটা যুক্তিযুক্ত হবে।

বর্তমান নিবন্ধের আলোচনা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। নবজাগৃত বাংলাদেশের সামাজিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের বৃহত্তর পেক্ষাপটে খেলাধুলোকে স্থাপন করা আধুনিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসের পরিধি ও আলোচনা ক্ষেত্র নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। উপনিবেশিক ভারতে জনসংস্কৃতি (Popular Culture) -র প্রকৃত সমাজ-ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিচার করতে হলে অবসর ও বিনোদনের বাইরে খেলার গুরুত্বকে বুঝতে হবে। বিশশতকে ও নতুন শতকে ভারতীয় জনজীবনে খেলার ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বকে যদি স্বীকার করে নিই, তাহলে মানতেই হবে আধুনিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসের গবেষণা উপনিবেশিক খেলাধুলোর সাংস্কৃতিক বিস্তারের যথাযথ আলোচনা ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সূত্র-নির্দেশ

১. উনিশ শতকব্যাপী ইংরেজ লেখনিতে শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্যে বাঙালির প্রতি তীব্র শ্লেষ ও কটাক্ষ সাধারণ ব্যাপার ছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে ইংরেজদের এইসব কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্যের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দেখুন জন রসেল্লি-র প্রবন্ধ, *"দ্য সেল্‌ফ ইমেজ অফ ইফিটনেস : ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিজম্ ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল"*, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ৮৬ (ফেব্রুয়ারি ১৯৮০)।

২. এই শারীর সংস্কৃতি আন্দোলনের সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায় যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত *'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থে (কলকাতা : ১৯৪৫)।

৩. নগেন্দ্রপ্রসাদের দুই জীবনীকারসহ অধিকাংশ বাঙালি ক্রীড়ালেখকই ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রবর্তনে ও জনপ্রিয়করণে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ নগেন্দ্রপ্রসাদকে এই অভিধায় ভূষিত করেছেন।

৪. ১৯০২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে এটর্নিপদে যোগ দিয়ে নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রায় হটাৎই খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন করে নেন।

৫. নগেন্দ্রপ্রসাদের পিতা রায়বাহাদুর সূর্যিকুমার সর্বাধিকারী ছিলেন বিরাট সাঁতারু এবং নৌকা চালনায় বিশেষ দক্ষ। নগেন্দ্রর বড়োভাই দেবপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম যুগের একজন নামী ক্রিকেটার ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ইউনিভার্সিটি অকেসনালস্ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও হন। আর এক ভাই সুরেশপ্রসাদ স্কুলজীবন থেকেই ছিলেন নামকরা জিমন্যাস্ট। ছোটভাই বিনয়প্রসাদ সবধরনের খেলাধুলোতেই এবং বিশেষত টেনিসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। নগেন্দ্রপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার পি.এল.দাত্ত্ যথার্থই লিখেছেন ঃ 'Thus the Sarvadhikari family has been an out and out sporting family which Nagendra Prasad by his outstanding ability has made a brilliant monument of its kind'.

৬. বালক বয়সে নগেন্দ্রপ্রসাদের কিক-অফ্ এর বহুচর্চিত চিত্তাকর্ষক কাহিনীর জন্যে দেখুন পি.এল.দাত্ত্, *'মেময়্যাব অফ ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী* (কলকাতা, ১৯৪৪) সৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ, *'ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী* (কলকাতা, ১৯৬৩)।

৭. এসকারী, 'হিতবাদী স্পোর্টিং স্যুভেনির' (কলকাতা, ১৯৩৫); পি.এল.দাত্ত্, *'মেময়্যার'*, পৃ. ১৩; সৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ, *'ক্রীড়াসম্রাট;* পৃ. ১২৪-২৬।

৮. পি.এল.দাত্ত্ *'মেময়্যার'*, পৃ. ১৬।

৯. ঐ, পৃ. ১৪-১৫।

১০. ঐ, পৃ. ১৮-১৯।

১১. ঐ, পি.এল.দাত্ত্, ঐ পরিস্থিতিতে নগেন্দ্রপ্রসাদের স্পষ্ট বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর জীবনী গ্রন্থে : 'I know sooner or later the matter will be asked to be put to

vote. It will be a mean move on the part of those who call themselves sportsman. I can not allow myself to be party of it'.

১২. কিভাবে শোভাবাজার ক্লাবের পত্তন হয়, তার বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, ঐ, পৃ. ১৭-১৮ এবং সৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ, *'ক্রীড়াসম্রাট,* পৃ. ১১৮-২১।

১৩. দ্য ইংলিশম্যান, ১২.০৭.১৮৮৯।

১৪. ইংল্যান্ডে ও সংবাদপত্রে ইংরেজ রেজিমেন্ট-দলের বিপক্ষে একটি ভারতীয় দলের জয়কে প্রশংসা ও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরও তথ্যের জন্যে দেখুন জে.এন.বসু, *"মাই রেমিনিসেন্সেস্",* পঙ্কজ কুমার গুপ্ত সম্পাদিত আই এফ এ গোল্ডেন জুবিলি সুভেনির (কলকাতা, ১৯৪৩)।

১৫. আই এফ এ.র প্রতিষ্টার ইতিহাসের জন্য দেখুন আই এফ এ শিল্ড সুভেনির (কলকাতা, ১৯৪৫), পৃ. ১০-১১; দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ১.১২.১৯৩৭।

১৬. শোভাবাজার অবশ্য প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় একেবারেই ভাল ফল করতে পারেনি। প্রথম রাউন্ডের খেলাতেই তারা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ দলের কাছে তিন গোলে হেরে যায়।

১৭. এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রপ্রসাদের জীবনীকার পি.এল.দাত্-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ 'That (physical regeneration of Indians) was the nationalism which Nagendra Prasad preached and Practiced in all his life'.। *'মেময়্যার',* পৃ . ১।

একজন ভদ্রলোক হয়ে ওঠা ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনার খসড়া

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন সৃজনশীল সাহিত্যিক, আর তার নিজের জগৎ ও জীবনকে উপস্থিত করার জন্য আমাদের হাতে আছে পাঁচটি আত্মজীবনী। তাঁর মতে আত্মজীবনী রচনার বা নিজের সুখ, পুণ্য বা কীর্তির কথা বলার অধিকার থাকে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিদের। আর বলে যারা একান্তই নগণ্য সাধারণ তারা। এই সংস্করণটিতে আমার কালের কথা, কৈশোর স্মৃতি ও আমার সাহিত্য জীবন ১ম খণ্ড গ্রন্থিত হয়েছে।[১] তিনি বলেছিলেন, " অনন্য সাধারণ আমি নই; অতি বিনয় করে নিজেকে নগণ্য সাধারণও মনে করিনা। তাই চিৎকার করে কেঁদে, বা কলরব .... উল্লাস করে দুঃখ সুখের কথা বলতে পারব না। .....(পৃ .৪)।[২] তবে হ্যাঁ বলতে পারি কিছু .... পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা .... যেটুকু ন্যায্য অধিকারেই থাকে .... সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশী নয়। [৩] অর্থাৎ প্রথমাবধি সাধ্য মতো নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে ঘটনাবলী ব্যক্ত করার একটা প্রত্যয় রয়েছে। আর পরবর্তী কালেও এই সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই এই পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ কালানুক্রম বিচারে দ্বিতীয় গ্রন্থটির শুরুতেই লিখছেন।" নিজের জীবন কালের কথায় নিজের জীবনকে গৌণ করে কালকে বড় করে ..... লেখার সংকল্প যখন করেছিলাম তখন এ কাজ যে কত কঠিন তা ভেবে দেখিনি " (পৃ . ২৮৭)।[৪] আরো একটা সম্ভাবনা এর মধ্যে সন্নিহিত আছে তা হল প্রথমাবধি আত্মজীবনী সমূহ রচনার সুস্পষ্ট ছক তাঁর ছিল না। সে জাতীয় কিছু থাকলে বাল্যের কথা অর্থাৎ ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যবর্তী ঘটনা ১৯৫১ সালে বিবৃত করে ১৯৫৩ সালে ১৯১৭/১৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী ঘটনাবলীকে বিদ্ধৃত করতে আমার সাহিত্য (১ম খণ্ড)।[৫] জীবন লেখেন। সম্ভবত বাল্য ও যৌবন কালের বর্ণনার মধ্যে ফাঁক থেকে গেছে ভেবে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় "কৈশোর স্মৃতি" যা ১৯০৬ থেকে ১৯১৭/১৮ সালের মধ্যবর্তী কালকে ব্যক্ত করেছে। সাহিত্য সাধনার দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪০ থেকে স্বাধীনতাপূর্ব যুগকে ধরতে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। আর ১৯৭১ সালে মৃত্যুর বহুপরে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয় 'আমার কথা'।[৬] স্বাধীনতাত্তোর পর্ব থেকে ১৯৬৭/৬৮ সালের মধ্যবর্তী সময়কে বিবৃত করতে শনিবারের চিঠিতে ধারাবাহিক ভাবে

মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গত আরো দু'টি বিষয়ের প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। প্রথম সাহিত্য সমালোচনায় একটি সুপরিচিত তত্ত্ব হচ্ছে রচনা বিশেষত উপন্যাস অল্প-বৃহৎ যে কোন অংশেই আত্মজৈবনিক। অর্থাৎ রচনাকার স্বনামে, বেনামে আভাসে ইঙ্গিতে তার মধ্যে উপস্থিত থেকে থাকেন। দ্বিতীয় বক্তব্যটি খানিকটা প্রথমটি থেকে উদ্ভূত ঃ— তারাশঙ্করের রচনার মধ্যে তার নিজের চেনা দেখা বাস্তব ভূরি-পরিমানে মেলে। বাঙালি ভদ্রলোকদের নিয়ে আমাদের এই পর্যালোচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ তাঁকে নিয়ে এই জাতীয় আলোচনা চোখে পড়েনি এবং তাঁর জীবন ও জীবনকে ঘিরে গড়ে তোলা আত্মজীবনীগুলির মধ্যেএমন কিছু মাত্রা আছে যা এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

একজন সামাজিক সত্তাধারীর যতগুলি ভূমিকা থাকা সম্ভব তার অনেকগুলির কিছু কিছু অংশ আমাদের আগ্রহের বিষয়, অনুসন্ধানের লক্ষ্য—তাকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হব? নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক?—(১) হিন্দু উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে তাঁর মধ্যে জগৎ ও জীবনের কোন কোন বৈশিষ্ট্য বিকশিতহয়েছিল বা হয়নি? (২) তাঁর হয়ে ওঠার ইতিহাসে কোন কোন প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল? (৩) ভদ্রলোক সমাজের একজন হিসাবে নিম্নবর্গের মানুষদের সঙ্গে আদান প্রদানের মধ্যে আমরা কোন কোন লক্ষণীয় মাত্রা দেখতে পাই, (৪) গ্রামীণ পরিবেশে যাত্রা শুরু করে নগর জীবন যাপন তাঁর মধ্যে কি কি প্রতিক্রিয়া ও আদি বদলের সূত্রপাত করে? (৫) আধুনিকতা বলতে যা বোঝায় তিনি কতটা সে লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন? (৬) পরম্পরা ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যে তাঁর ঝোঁক বা প্রবণতা কোন দিকে ছিল? (৭) তাঁর স্ব-বিরোধিতা ও আপাত স্ববিরোধিতার স্বরূপ কি ছিল? এছাড়া আরো কিছু জিজ্ঞাসা জমে ওঠে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মানুষের আত্মজীবনী অনুসন্ধান করতে গিয়ে?—(৮) একটি যৌথ পরিবারের প্রধান হিসাবে অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদানের মধ্যে ভদ্রলোক সুলভ কোনো বৈশিষ্ট /লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়? (৯) সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টিশীলতা, কি অনুভববেদ্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল? আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হবে প্রশ্নগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করা কারণ আমাদের আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সেটাই প্রয়োজন।

দুই

অধ্যাপক পবিত্র সরকার অন্য নির্দিষ্ট ও আত্ম নির্দিষ্ট এই দুই ধরনের ঠেলার ফলাফল বলে দেখাতে চান কোন মানুষের হয়ে ওঠাকে। (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য কথাসাহিত্য, জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা ৪৯ বর্ষ। শ্রাবণ, ১৪০৫, পৃ. ১৫-১৭)।[৭] খুব ছোট বেলা থেকে একাধিক অপমান, অভিমান, আঘাত দুঃখ ও হতাশার মধ্যেদিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। ঈর্ষণীয় সাফল্যে উপনীত হয়েও তিনি এগুলিকে ভুলতে পারেননি। তাই

অধ্যাপক সরকার ঐ ধারাবাহিক, অভিজ্ঞতাকে তাঁর জীবনের একটি বড় প্রবর্তনা শক্তি বলে চিহ্নিত করতে চান, যে অভিজ্ঞতা তাঁকে উত্তীর্ণ হবার প্রবল জিদ ক্রমশ সামনে ও উপরের দিকে ঠেলে ওটার শক্তি যুগিয়ে ছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন। "এমনি করেই একটি ধারাবাহিক অধঃপতনে যাচ্ছে বা গিয়েছি বা যার এই দুর্নাম রটনাই আমাকে বোধহয় সুনামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যত অপবাদ রটেছে ততই আমি চেষ্টা করেছি সুখ্যাতি অর্জন করতে"। (পৃ. ১৪১)।

কৈশোর স্মৃতি-তে তাঁর আত্ম নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির মধ্যে পাই পাঁচটি দিকে আকর্ষণের তথ্য ঃ—(ক) বিবেকানন্দর মতো সন্ন্যাসী (খ) ক্ষুদিরামের মতো শহীদ (গ) শিব ভাদুড়ীর মতো ফুটবল খেলোয়াড়(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক (ঙ) রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা বা নাট্যকার হওয়া। এগুলি পরবর্তীকালে ভেবে না সাজানোরই সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তিনি লিখেছেন। "কৈশোরে এই পাঁচখানি আসনের হাতছানিই আমাকে উতলা করেছিল। ....আজও সেসব স্মৃতি মনে জাগলে ক্ষণিকের জন্যও উদাস হয়েপড়ে আমার সমস্ত সত্তা (স্মৃতিকথা ১৬১)।[৮]" "অধ্যাত্ম সাধনা তাঁকে বারম্বার হাতছানি দিয়েছে। ইস্কুল ছাড়ার আগে থেকেই সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ জেগেছিল। প্রেরণা এসেছিল পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে থেকে। তার মায়ের ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। ....বাবারও ছিল। ....বড়মামার মধ্যে মানিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। প্রথম রাখী বন্ধনের দিন (অক্টো ঃ ১৯০৫) তাঁর মা হাতে রাখী বেঁধে "মন্ত্র পড়েছিলেন বাংলার মাটি বাংলার জল।" (স্মৃতি কথা পৃঃ ৫৫, ৮৬)। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্বাশ্রমে ইংরেজ পল্টনের সেপাই হিসাবে মনিপুর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সুবিশাল বন্দুকধারী রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও তারাশঙ্করের পিতৃ সুহৃদ রামজী গোঁসাই এর দক্ষ কথকথা, যাতে তারাশঙ্করের "চোখে আসত জল" (পৃ: ৫৪)। আরছিল বিধবা পিসিমার মুখে সাঁওতাল বিদ্রোহের চাক্ষুষ স্মৃতি রোমন্থন। (পৃ : ১৭৭)। কিছু বীর রসাত্মক খেলাধুলা (পৃ : ১৩২) দেশভাক্তমূলক কবিতা পাঠ ও রচনা দরিদ্র ও কলেরা রুগীর সেবা, অগ্নি নির্বাপণ (পৃ : ১২৮, ১৮৭) (তৎসহ দেখুন তারাশঙ্করের বাল্য সুহৃদ ও ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী "চলচ্ছবি" [৯] ? (পৃ ১৮, ২০) ইত্যাদি কার্যাবলী যখন তারাশঙ্করের কৈশোর চিত্তকে গড়েপিঠে তৈরী করছে তখনই সমাপতনের মতো আরো কিছু ঘটনা ঘটে যায়। ইতিমধ্যে ১৯১৬ সালের জানুয়ারীর শেষদিকে (সরিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর ও সমকালীন সাহিত্য সমাজ, কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫, পৃ : ২৩৪) তাঁর বিবাহ হয় স্বগ্রামবাসী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও উদীয়মান ধনী কয়লা ব্যবসায়ী যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রি উমাশষীর সঙ্গে। ঐবছর মার্চমাসে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফেরার দিন দু'চার পর যুদ্ধে যাবেন বলে "বাঙালী পল্টনে" নাম লেখাতে যান। কিন্তু বাড়িও শশুড়বাড়ীর মহিলাদের প্রবল চাপে সে ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এদিকে রজার কোম্পানীর পিস্তল

লুটের তদন্ত সূত্রে রামপুরহাটের জনৈক দুকড়িবালা দাসী গ্রেপ্তার হলে—উত্তেজনা ও মনের আবেগে তারাশঙ্কর যান রামপুরহাটের কাছে তাঁর বাড়ী দর্শনে। ফেরার পথে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত নলিনী বাগচীর সঙ্গে পরিচয় হয়। (পৃ : ১৮৯-১৯০, ২৩৬)। কলকাতায় এসে সেন্ট জেভিয়ার কলেজে মাস খানেক ক্লাস করেন, এখানে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগ সূত্র স্থাপিত হয়। (পৃ : ২৬৬-২৭০)। তবে গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায়(?) সেই ক্ষীণ যোগসূত্র দৃঢ় হবার আগেই ১৯১৭ সালে পুজোর পর গ্রামে অন্তরীণ হন (পৃ : ২৭৭-২৮৪)।[১০] যুদ্ধ শেষে আটক আইনের অবসান ঘটলে তারাশঙ্কর আবার কলকাতায় এসে সাউথ সাবার্বাণ কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এবারেও লেখাপড়া চালাতে পারেননি। ছাত্র জীবনের অবসান ঘটে ১৯১৮ সালে। জাতীয় কংগ্রেস বিশেষত গান্ধীজী পরিচালিত রাজনৈতিক সাধনায় বিবর্তিত হয় বিপ্লবী হবার স্বপ্নে।

তাঁর জীবনের আত্মনির্দিষ্ট অপর তিনটি লক্ষ্যের পরিণতি সন্ধানের আগে আমরা সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করব তারাশঙ্কর হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর অভিভাবকদের গড়ে তোলার কোন কোন লক্ষ্য ক্রিয়াশীল ছিল? তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়রী লিখতেন। বাবার ডায়রী সম্বন্ধে তারা শঙ্কর-লিখেছেন, "তাঁর ডায়রীখানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমার নাম লেখা আছে। আমাকে সম্বোধন করে কিছু না কিছু লিখে গেছেন।" (পৃ : ১৪) ঐ ডায়রীতে ছেলের উদ্দেশ্যে বাবা লিখছেন, "দেখ বাবা তারাশঙ্কর-জীবনে এ কথা যেন কোনো দিন ভুলিয়ো না। অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈত্রিক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্টা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈত্রিক সম্মান বংশ প্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। ....ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকিল হইবে। .... এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।" (পৃ : ১২) তারাশঙ্কর লিখছেন,"......সর্বদা কাছে রেখে এই ধরনের কথা বলে যেতেন। অধিকাংশ বুঝতাম না, কিন্তু সে কথা তিনি ভাবতেন না। .... চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকে আমি ঐ ডায়রী পড়ে আসছি। (পৃ : ১৪)। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার দায় বাবার পরে মায়েরই হয় প্রথামতে। কিন্তু লাভপুরের মতো জমিদারী দ্বন্দ্ব জর্জর গ্রামে পুরুষ অভিভাবকহীন ভাবে সামান্য ভূ-সম্পত্তির ওপরে ভরসা করে টিকে থাকার যুদ্ধে ঐ "সংসারকে বহু জটিলতা থেকে রক্ষা করেছে" (পৃ : ১৭৬) তাঁর পিসিমার অভিভাবকত্ব। তারাশঙ্করের সামনে যে লক্ষ্য তিনি ধরে দিতেন তা হল, "কাছারিতে বসবি, রূপোর ফুরসীতে তামাক খাবি, সামনে বাক্স থাকবে, লোকজন গমগম করবে বৈঠকখানা, তখন আমার চোখ জুড়োবে। ....অত্যন্ত শক্ত, অনমনীয়, বিশ্ব সংসারের উপর ক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু ....পিসিমা (যাঁর) "সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন"। (পৃ : ১৭৯,১৫,১৬)। তারাশঙ্কর আত্মজীবনী তে আশ্চর্যভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেই সর্বংসহা মার জল্পনাকে স্পষ্ট করেননি। অথচ এই ব্যাপারটি অন্য বহু

বিষয়ের চেয়ে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাবিহীন ভাবে প্রকাশিত। ধাত্রীদেবতা (যা খুব নিবীড় ভাবে আত্মজৈবনীক) উপন্যাসে তারাশঙ্কর রূপী শিবনাথের মার মুখ দিয়ে বলান হয়েছে। "মা বলিলেন, ... আমার যে ভাই, অনেক সাধ শিবনাথের ওপর, আমি যে বড় বিখ্যাত লোকের মা হতে চাই। ....(রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ : ৭৭)। ....শিবনাথের মাতামহ থাকেন বেহারে, (পৃ : ৪৮০) সেখানে সরকারী চাকরি করেন, তাহার ছেলেরা সবাই কৃতবিদ্য। শিবনাথের মা ছেলেকে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং ঐ বংশের ধারা জমিদার সুলভ দর্প, জেদ, উচ্ছৃঙ্খলা, কঠোরতা ও বিলাসপরায়ণতা হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বহুবার সেখানে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" (পৃ : ৮১)। রচনা বলীর প্রথম খণ্ডে জীবনী লিখতে বসে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎ কুমার জানাচ্ছেন, "তাঁর মা প্রায়ই ছেলেকে বড় বড় মানুষের গল্প শুনিয়ে বলতেন হ্যাঁ হতে যদি হয় এমনি মানুষের মা হতে হয়। ...[১১] আশ্চর্যের বিষয় তিনি কোনদিন পুত্রের কাছে কোন ধনবান কি বিত্তে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষের কাহিনী উচ্চারণ করেননি। ....যত পণ্ডিত, মনীষী কবি সন্ন্যাসী ও সাধকের গল্প করতেন। বড়লোক কাকে বলে তার একটা ধারণা ....তারাশঙ্করের একান্ত বাল্যকালে ....মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন"

তিন

কৈশোর স্মৃতি গ্রন্থের একেবারে শেষপাতায় আপন গতিতে যে প্রশ্ন তাঁর কাছে উঠে এসেছিল তা হচ্ছে। " কি করব? কোন পথে যাত্রা করব শুরু? "(স্মৃতিকথা পৃ : ২৮৪) কখনো শুনেছেন জালিয়ানওয়ালাবাগের ধ্বনি। ...... শুনেছেন অহিংসার পথে গান্ধিজীর আহ্বান। তবে ১৯২০-২১ এর অসহযোগ আন্দোলনে সম্ভবত তাঁর উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না।

নিজের বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে হীনমন্যতার দরুণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আশা প্রলম্বিত হয়নি। যদিও নাট্যকার হবার বাসনা ধূমায়িত ছিল বহুদিন অব্দি। এই বাসনায় ইন্ধন এসেছিল লাভপুরের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে" নিজের নাটকের সফল মঞ্চ প্রযোজনার সূত্রে। (পৃ : ৩০৯)। মামা শ্বশুর ও প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় মারফৎ অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কলকাতার আর্ট থিয়েটারে ১৯২৭ সাল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ;পৃ : ১৯০-১৯১) নাগাদ ভাগ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে পেলেন নিদারুণ প্রত্যাখ্যান। (পৃ : ৩৫৪/৫৫) "ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে" ......ভেঙে গেল নাট্যকার হবার স্বপ্ন। ....এই ঘটনাটি জীবন সাহিত্য সাধনায় একটি ধারা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেল। ...."এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখবনা স্থির করলাম। "(পৃ : ৩০০-৩০১)।[১৩] "কংগ্রেসের কাজ রয়েছে, সমাজ সেবা সমিতির সেবাধর্ম রয়েছে বাড়ীতে অভাব অভিযোগের মধ্যে ক্ষেতের ধান-চাল রয়েছে, এদিকে ও দিকে ঘুরে বেড়ানো রয়েছে—শক্ত?" (পৃ : ৩০১)।

তৈরী হল ধোঁকার টাটি-মাসিক পত্রিকা 'পূর্ণিমা' ১৯২৭-২৮ সালে কবিতা, নাটক সমালোচনা-সম্পাদকীয় পরবর্তীকালে ছোট-গল্প, ব-কলমে পত্রিকা পরিচালনা এবং স্বনামে কি ছদ্মনামে লিখে তার জঠর পূর্তি করেছেন। (পৃ : ৩০১-৩০২)। "কিন্তু একটা কি যেন খচখচ করত ..... মন ভরত না। যে সব লেখা 'পূর্ণিমার' কর্তৃপক্ষের ভালো লাগত সে সব আমার ভালো লাগত না। ......'স্রোতের ফুটো' বলে গল্পটি ...আমার বিচারে ভালই হয়েছে কিন্তু 'পূর্ণিমার বিচারে ভালো হয়নি। (পৃ : ৩০২) "কারণতো খুব সোজা—নতুন ধারার সাহিত্যের প্রতি পাঠকের অনুরাগ তৈরী করতে হয়" (রুক্ষমাটির কবিয়াল, পৃ : ৫১)। ঐ সময়ের মেলার উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা সম্বল করে লিখে ফেললেন গল্প 'রসকলি'। পাঠালেন প্রবাসীতে "সাত কি আট মাস .....বিবেচনাধীন থাকার পর খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল যে তখনো সেটি দেখা হয়ে ওঠেনি। ফেরৎ " লেখাটা হাতে করে মধ্য কলিকাতা থেকে দক্ষিণ কলিকাতা পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি" ফিরলেন। চোখে বার কয়েক সেদিন জল এসেছিল। .....ভাবলাম সাহিত্য সাধনার বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরে যাব এবং শান্ত গৃহস্থের মতো জীবনটা ধান চালের হিসাব করে কাটিয়ে দেব। আর বেঁচে থাক কংগ্রেস, ওরই মধ্যে দিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেব জীবন।"

চার

জলাঞ্জলি দেবার সংকল্পটি কাজে পরিণত করার জন্য কর্মজীবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। কাজ দেশ সেবার কাজ। কংগ্রেসের আদর্শে খানিকটা গঠন মূলক কাজ। চরকা কাটেন বটে তবে তাতে সমস্ত দিনটা কাটেনা। লাভপুরের বিশৃঙ্খল ইউনিয়ন বোর্ডের অবস্থা ফেরাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিলেন। "সকালে বাইসিক্ল নিয়ে বের হই-গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথ ঘাট নালা খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেরামত করাই। আঁকাবাকা নালাকে সোজা করে কাটাই; ওখানকার আবাল বৃদ্ধ বনিতার সঙ্গে পরিচয় করি। তাদের মনের খবর বিচিত্র পরিচয় নিজের মনে বহন করে ফিরে আসি। ...... দেখতে দেখতে কাজটা বড় ভাল লাগল। ভুললাম যেন মনের বেদনা। ভাবলাম এই পথেই চালিয়ে দেব জীবন। প্রশংসা তো পেলামই—মনও কর্মের তৃপ্তিতে ভরে উঠল। "(পৃ : ৩০৭)" এছাড়া এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি গ্রামে গ্রামান্তরে মেলায় ঘুরেছি অনেক। এদের অতিথি হয়েছি, পরিচর্যায় পরিতৃপ্ত হয়েছি। ...."(পৃ : ৩০৮)। গ্রাম্য ভদ্র জনের সমাজে, চাষীর গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় এমনই ভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড় সুবিধা ছিল আমার রূপ আমার ছিল না। যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে........পুড়ে গিয়েছিল ....আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে সমান হয়ে মেশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার-ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন-ওদেরই একজনের মতো।" (পৃ : ৩০৯) "আর একটা সুযোগ আমার হয়েছিল ....আগুন, ঝড় এবং কলেরা—এই তিনটাই আমাদের

অঞ্চলে সব চেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্তত আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশচল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছমাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদকরে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপ পুর্ণের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলোর অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। (পৃ : ৩০৯, ৩১০) । এই জোরেই এই জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি। নিজের কথা বলার মতো করেই বলেছি। ....এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে প্রবাসে থাকি প্রতিষ্ঠা খানিকটা পেয়েছি। তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। এ পাওয়া যে কী পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়। ভালোবাসার জন।" (পৃ : ৩১১)।[১৪]

কার্যগতিকে শারীরিক আঘাতের দরুণ কদিন ঘরবন্দি থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। "যেমন বসে থাকা অমনি আবার মনের মধ্যে লেখার বাসনা জেগে উঠল।" (পৃ : ৩১৩)। পোষ্টাপিস থেকে হঠাৎই পেয়ে গেলেন কলকাতায় 'কল্লোল'—এর ঠিকানা। প্রবাসীর বিবেচনাধীন রসকলি গল্পটি পাঠালেন। শুধু মনোনীত হলো তাই নয়, আরো লেখার ফরমাস এল। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনে ও ১৩৩৫-এর বৈশাখে (অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ ও এপ্রিল-মে-তে) যথাক্রমে 'রসকলি', 'হারানো সুর' কল্লোলে প্রকাশিত হল এবং কালিকলমে হল এদুটির 'বিরল' প্রশংসা। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি বলেছেন। "....... এই সাহিত্যিক সাফল্যের মূল্য সেদিন অনেক এবং আমার জীবনে অমূল্য"। কারণ হিসেবে বলেছেন 'কল্লোল'—'কালীকলম'—এমনিভাবে গুণগ্রাহীতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্য পথে, রাজনীতির পথে। সে বন্ধন সে আকর্ষণ আমার কাছে তখনও কম দৃঢ়। কম প্রবল নয়। এই কারণেই এর পথে—মাত্র মাস ছয়েক পরেই যখন "তিরিশ সালের আন্দোলনের বাজনা বেজে উঠল তখন—কলম ছেড়ে তাতেই পড়লাম ঝাঁপিয়ে। মোহকাটল জেলখানায়"। (পৃ : ৩১৪)[১৫]

পাঁচ

১৯৩০ সালে লাভপুর থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে সম্ভবত আগস্ট মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন। বিচারে ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। কারাবাসের অসুবিধাগুলিই শুধু নয়; তিনি মন্তব্য করেছেন," জেলখানার রাজনীতি সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি,চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে। ..... কোন মতেই মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে

অগ্রসর হতে মন রাজী হল না। আত্মাই যদি কলুষিত হয় তবে স্বাধীনতার মধ্যে কি পাব আমি? ....(পৃ : ২৯৫) সব থেকে পীড়িত হলাম আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সে কি ষড়যন্ত্র! মোক্ষম অস্ত্র প্রতিপক্ষকে স্পাই প্রতিপন্ন করা। একের দল ভাঙিয়ে বিশ্বস্ত অনুসারকদের নিজের দলভুক্ত করে নিজের দলকে পুষ্ট করে তোলাটাই তখন মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও সম্মুখে মন্ত্রিত্বের গদি ছিলন না। .... অ্যাসেমব্লির চেয়ার তখনও অনেক দূরে"। সব থেকে মজাটা ঘটল যখন তিনি ও তাঁর ছোটভাই পার্ব্বতী শঙ্কর দু দলের সমর্থক হয়ে ওঠায় দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জেলের মধ্যেই (সরিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত, পৃ : ২৩৯)। অবশ্য সেখানেই আবার চোখের জলে দুজনের মিলন হয়ে গিয়েছিল।

"১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে জেল থেকে মুক্তি লাভের আগের রাত্রে চিরাচরিত ভাবে বক্তৃতা হল। বক্তারা বল্লেন, পুনরাগমনায়চ অর্থাৎ আবার শ্রীঘ্র ফিরে এস।" সেই সভাতেই তারাশঙ্কর ঘোষণা করেন নিজের সঙ্কল্পের কথা—অর্থাৎ এরপর থেকে সাহিত্য সাধনাই হবে তাঁর জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য। বলাই বাহুল্য ঐ সঙ্কল্প সাধারণভাবে রাজনৈতিক সহকর্মীদের দ্বারা ধিকৃত হল। (পৃ : ২৯৫,২৯৬)

এই সঙ্কল্প মনে রেখে-বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোটো ভাইকে লাভপুরের সম্পত্তির ভার অর্পণ করে বোলপুরে একটি ছাপাখানা করেন। মনে মনে আকাঙ্খা ছিল একখানা কাগজও বার করবেন। সাপ্তাহিক কাগজ-নিলাম ইস্তাহার সর্বস্ব নয়। কারণ ঐ জাতীয় কাগজ আরো দু-একটি ছিল-যেমন সিউড়ি থেকে প্রকাশিত 'বীরভূম বার্ত্তা'। মনোবাসনা ছিল তাঁর,, কাগজটি "রীতিমতো দেশ প্রেম প্রচার-পত্রিকা হবে। বাড়ীর মেয়েদের অলঙ্কার বিক্রী করে উপাসনার সম্পাদক সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় যন্ত্রপাতি কিনে বোলপুর আদালতের পাশেই ছাপাখানার কাজ শুরু হল। চেক্ রসিদ আদালতের ফর্ম, ক্যাসমেমো, বিয়ের প্রীতি উপহার ইত্যাদি ছেপে কাজ চলছিল-পাশেপাশে চলছিল সাহিত্যচর্চাও। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে পরিচালিত 'ব্রতচারী' সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গ কবিতা ছাপা উপলক্ষ্য করে। জনৈক স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী সত্ত্বাধিকারীদের অনুপস্থিতিতে বিয়ের প্রীতি উপহার বলে কর্মচারীদের সন্দেহের উদ্রেক না করেই এটি ছাপিয়ে নিয়ে যান। ব্যাপারটি জেলা শাসকের অপছন্দের কারণ হয়। অথচ আইনভঙ্গ না করায় থানায় তলব, তিরস্কার ও ২০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ভবিষ্যৎ সদাচরণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ সুচলেকা আদেশ হয়। (ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী 'যে কবিতা লিখে জেলে যেতে হয়ে ছিল, অরুণ চৌধুরী, তারাশঙ্কর : যেমন দেখেছি ও বুঝেছি;কলকাতা, ক্রান্তিক, ১৯৯৯, পৃ : ৫৪-তেউদ্ধৃত)। কি করবেন তা নিয়ে যখন দ্বিধাগ্রস্ত সেই সময়েই বোলপুর স্টেশনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁরই উপদেশে "স্থির হয়ে গেল পথ।"[১৬] বন্ড বা জামিন কিছুই না দিয়ে প্রেস গুটিয়ে আবার স্বগ্রামে ফিরে এলেন।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর অতিপ্রিয় এক কন্যার মৃত্যু তার "সমগ্র জীবনে ...একটা পরিবর্তন এনে দিলে। (পৃ : ৩৩৯)। ....জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না এলে বোধহয় তা হত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না পড়তাম তবে বেদনা রসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না। (পৃ : ৩৩৭)

শুধু এই মৃত্যুটিই নয়, স্বগ্রামে একটি বিবাদে জড়িয়ে পড়েও "(পৃ : ৩৪৪) তার "সমাজ জীবন আঘাতে আঘাতে ....জর্জর করে তুলেছিল।" আর সবশেষে এল পুলিশের সুনজর(!) বীরভূমের তৎকালীন পুলিশ প্রধান সামসুজ্জোহার বিষনজরে পড়লেন। আকার ইঙ্গিতে জেলা ছাড়ার নির্দেশ, অন্যথায় রাজদ্রোহ মূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা কারা বাসের সম্ভাবনা। ১৯৩৩ সালে "বিছানা বাক্স বেঁধে রওনা হলেন। এসে উঠলেন দক্ষিণ কলকাতার একটি টিনে ছাওয়া কুটুরিতে। পাকা হয়ে শুরু করলেন সাহিত্যিক জীবন। শেষ হয়ে গেল লাভপুরের জীবন। (পৃ : ৩৭৮)

সূত্র-নির্দেশ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় *স্মৃতি কথা,* নিউবেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৮৭। *'আমার কালের* কথা', পৃ : ৪
২. ঐ, পৃ : ৪
৩. ঐ, পৃ : ৪
৪. ঐ, পৃ : ২৮৭
৫. তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায, *'আমার সাহিত্য'*-১৯৫৩
৬. 'আমার কথা' ১৯৯৫ (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)
৭. পবিত্র সরকার, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য, কথাসাহিত্য, *জন্মশত বার্ষিকী সংখ্যা* ৪৯বর্ষ, ১৪০৫, পৃ : ৫-৭৭।
৮. 'স্মৃতি কথা', পৃ : ১৬১
৯. ঐ, পৃ : ৫৫,৮৬,১৩২ ও লক্ষীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 'আত্মজীবনী'
১০. ঐ, পৃ : ১৮৯-২৮৪
১১. রচনাবলী, ১ম খণ্ড
১২. স্মৃতিকথা-পৃ : ১৮৪
১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
১৪. স্মৃতিকথা, পৃ : ৩০৯-১১
১৫. ঐ, পৃ : ৩১৪
১৬. অরুণ চৌধুরী ও তারাশঙ্কর : *যেমন দেখেছি ও বুঝেছি,* ক্রান্তিক কলকাতা ১৯৯৯, পৃ : ৫৪০

পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ফুটবলের ইতিহাস

শুভ্রাংশু রায়

ফুটবল। এক সময় ফুটবলই ছিল বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। না, নিছক শুধু খেলা নয়। সমগ্র বাঙালি জাতির সমাজ ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন। উপনিবেশিক আমলে ১৯১১ সালে শিল্ড ফাইনালে গোরাদের হারিয়ে মোহনবাগানের জয় ফুটবল খেলাকে এক অভিনব সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত করে[১]। এরপর থেকেই উপনিবেশিক আমলে ফুটবলে হয়ে উঠে বাঙালি যুবকদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার। মোহনবাগানের এই জয় যে শুধু বাঙালিপুরুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয় মহিলারাও এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুপ্রেরণার ব্যাপকতা ছিলো আরো বৃহত্তর-উপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তির পাশাপাশি পুরুষ শাসনের হাত থেকে মুক্তি। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত ' মেয়েমহল' বইটিতে জনৈকা মহিলা বলেছেন যে ১৯১১-র বিজয়ে মোহনবাগান ক্লাবের খুব নাম হয়েছিল। তাই ভারতীয় মহিলাদের ও উচিত ফুটবল খেলায় পারদর্শিতা দেখানো। আর তা দেখাতে পারলেই তাঁরা পুরুষ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারবে[২]।

অবিভক্ত বাংলায় মহিলা ফুটবল প্রচলন করার প্রথম প্রচেষ্টা চালান ব্রজরঞ্জন রায়। ব্রজরঞ্জন রায় যিনি বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার জনক হিসাবে পরিচিত ২০ দশকের শেষের দিকে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে মেয়েদের ফুটবল চালু করার উদ্যোগ নেন এবং মূলত তাঁর উদ্যোগেই ১৯২৮ সালে স্থাপিত হয় ন্যাশনাল ইউথ অ্যাসোশিয়েসন। এরই এক সদস্যা পূর্ণ ঘোষ চিরাচরিত ভারতীয় নারীর পোযাক শাড়ী পরে ফুটবল খেলার প্রচেষ্টা করলে তা প্রচন্ড বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং পূর্ণ ঘোষ সমকালীন সমাজে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বিষয়ে পরিণত হন। যদিও সমকালীন বাংলা পত্র পত্রিকা গুলির মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য আনন্দবাজার পত্রিকা পূর্ণ ঘোষের এই প্রচেষ্টার খবর ও ছবি একাধিকবার ছাপিয়ে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রজরঞ্জন রায়ের মহিলা ফুটবলের প্রসারের প্রচেষ্টা আরো গতি পায় ১৯২৯ সালে ওমেনস্ স্পোর্টস অ্যাসোশিয়েসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে[৩]। এই সময় থেকেই বাংলায় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৪ সালে কলকাতায় প্রথম মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রজরঞ্জন রায় প্রমুখ। তৎকালীন সময়ে ফুটবল বাঙালি সমাজে একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল একান্তভাবেই পুরুষের নিজস্ব। ফুটবল নামক 'বীরত্ব' প্রদর্শনের খেলায় অবলা রমণীকুল অংশ গ্রহণ করবে সেটা ছিল প্রায় কল্পনাতীত। স্বভাবতই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও

প্রতিযোগিতাটি টানা ৪ বছর (১৯৩৪-৩৮ খ্রিঃ) চলেছিল এবং কলকাতার বেশ কয়েকটি নামী কলেজ যেমন-বেথুন কলেজ, আশুতোষ কলেজ ও ভিক্টোরিয়া কলেজ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং শত বিতর্কের মধ্যেও একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল। এই প্রতিযোগিতার তৃতীয় বছরে বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া মহিলা ফুটবলার বাঙালি রমণীর চিরাচরিত পোষাক শাড়ী-পরিত্যাগ করে শর্টস পরে ফুটবল খেলতে নামেন। নিঃসন্দেহে উপনিবেশিক বাংলায় এটি ছিল মেয়েদের একটি বড় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ[৪] যদিও শেষ পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিযোগিতাটি ১৯৩৮ সালেই বন্ধ হয়ে যায়।[৫]

প্রায় একদশক পর ভারত উপনিবেশিকশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেলেও স্বাধীনতার জন্মলগ্নের অভিজ্ঞতা বাঙালিদের পক্ষে খুব একটা সুখকর ছিলো না। দেশ বিভাগের পর লক্ষ লক্ষ পরিবারের শরণার্থী হিসেবে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ এবং বহু মুসলিম পরিবারের পাশ্চিমবাংলা ত্যাগ-সব মিলিয়ে পশ্চিমবাংলায় আর্থ-সমাজিক পরিস্থিতিতে এক ভয়ানক ধরনের অস্থিরতা তৈরী করে এবং পঞ্চশের দশকে কিছুটা হলেও বাংলার ক্রীড়াজগতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই নেতিবাচক প্রভাব প্রকট হয়েছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই দেশ বিভাগই বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। জীবন জীবিকার জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী পরিবারের মেয়েরা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসে। পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালি মেয়েদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার যে প্রচেষ্টা এই সময় বাঙালি সমাজ প্রত্যক্ষ করেছিল তা এক কথায় ছিল অভূতপূর্ব। ক্রীড়াজগতও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাই ষাটের দশকে বাংলায় বিভিন্ন খেলাধুলায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কলকাতার ফুটবল তখন অন্য উত্তেজনা। দেশ বিভাগের ফলে প্রায় নিঃস্ব পূর্ববঙ্গের মানুষগুলি তাদের জীবনের লড়াইয়ের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে ফুটবলকে বেছে নেয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ তাদের জীবন যুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। 'বাঙালদের' ইস্টবেঙ্গল ক্লাব হয়ে উঠে 'ঘটি' দের ক্লাব মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব। বস্তুত সমসাময়িক সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সাংস্কৃতিক ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিফলন ছিলো 'ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্ব'— মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লড়াই[৬]। এই সামাজিক দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক ঘাত প্রতিঘাত এবং সর্বোপরি আর্থিক ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার মরীয়া প্রচেষ্টা ক্রীড়া ক্ষেত্রে মেয়েদের আগের তুলনায় অনেক বেশী টেনে এনেছিল। সত্তরের দশকে যখন পশ্চিমবাংলায় মেয়েদের ফুটবল শুরু করার প্রচেষ্টা শুরু হয় তখন ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তরের দশকের শুরুতে পশ্চিম বাংলায় মহিলা ফুটবল চালু করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ বিষয়ে প্রথমেই যে দু'জনের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন এস.আর .জাইদি, লক্ষ্ণৌনিবাসী জনৈক স্কুল শিক্ষক এবং আরতি ব্যানার্জী। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া ওমেনস্ ফুটবল ফেডারেশন এবং ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে যুগান্তরে একটি ছোট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয় যে বাংলার মেয়েদের ফুটবল চালু হতে চলেছে। এ বিষয়ে আগ্রহী মেয়েদের কালিঘাট মাঠে ট্রায়ালে যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়। এই বিজ্ঞাপনটির প্রতিক্রিয়া ছিল দুই রকম। একদল মানুষ এই বিজ্ঞাপনটি দেখে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন মেয়েরা আবার ফুটবল খেলবে! আর আরেকদল মানুষ মেয়েদের ফুটবল খেলাকেই বন্ধ করতে উদ্যোগী হন। এদের মধ্যে একদল প্রগতিশীল ডাক্তারও ছিলেন যারা আধুনিক ক্রীড়া বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে মেয়েদের ফুটবল খেলা অত্যন্ত বিপদজনক। কেননা এই খেলায় অংশগ্রহণ করলে মেয়েদের ভবিষ্যতে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রক্ষণশীল, পিতৃতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তৎকালীন সময়ে এমনকি আজও মেয়েদের বিয়ে ও সংসার জীবন এক আবশ্যিক অঙ্গ। তাই ডাক্তারদের এই বিধান কার্যত মহিলা ফুটবল প্রচলনের স্বপ্নকে শেষ করে দিতে পারে আরতি ব্যানার্জীরা জানতেন। তাই রীতিমত সেমিনার করে ডাক্তারদের মেয়েদের ফুটবল খেলার স্বপক্ষে মত নেওয়া, প্রশাসনিক স্তরে সেই মতকে পৌঁছে দেওয়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জনমানসে যেন মেয়েদের ফুটবল সম্পর্কে ভুল ধারণা না জন্মায় তার প্রচেষ্টা চালানো। মেয়েদের ফুটবল সেদিন আর নিছক খেলা ছিল না, নারী মুক্তি আন্দোলনের এক অনন্য ধারা হয়ে উঠেছিল[৭]।

১৯৭৫ সালে প্রথম দিনে ট্রায়ালে প্রায় দু'শো মেয়ে যোগ দিয়েছিলেন যাদের মধ্যে থেকে প্রশিক্ষক সুশীল ভট্টাচার্য বেছে নেন জনা কুড়ি মেয়েকে। এই মেয়েরা কেউই সেভাবে কোনদিন ফুটবল না খেললেও প্রত্যেকেই যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন ধরনের খেলায়। তাই শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, শুক্লা দত্ত, মিনতি রায়, জুডি-ডি-সিলভা-দের ফুটবল খেলা রপ্ত করতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। এই মেয়েদের বাছাই করে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়ার শুরুর দিন থেকে কলকাতা তথা ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কিন্তু বিদ্রূপ, অবজ্ঞা এবং উপেক্ষায় ভরা এই পথে চলা মোটেই মসৃণ ছিলো না। কিন্তু কিছু মেয়ের এক রোখা মনোভাব, কিছু সহৃদয় মানুষের সহযোগিতা এবং আরতি ব্যানার্জীদের অমানুষিক পরিশ্রম সত্তরের দশকে এদেশের মেয়েদের ফুটবলকে এশিয়ানস্তরে রীতিমত সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দেয়। আর এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য করতে হয় আরতি ব্যানার্জীর অবদানের কথা। মেয়েদের ফুটবল খেলার সপক্ষে ক্রীড়া বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের মতামত তৈরী, প্রশাসনিক স্তরে মেয়েদের ফুটবলের প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছে দেওয়া। নতু কোলেকে বলে খেলোয়াড়দের টিফিনের

ব্যবস্থা করা, মহিলা ফুটবল সংস্থার ফাণ্ড গঠনের জন্য শিলিগুড়ি থেকে মেদিনীপুর, সুন্দরবন থেকে হাওড়ায় মহিলা প্রদর্শনী ম্যাচ আয়োজন করা, মহিলাদলের বিদেশ সফরের জন্য অর্থ সংস্থান করা এবং প্রয়োজনীয় সরকারী ছাড়পত্র আদায় করা, বিদেশ সফরে দলের প্রয়োজনে রাঁধুনীর ভূমিকা পালন করা-এসব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আরতি ব্যানার্জী আক্ষরিক অর্থেই ভারতীয় বা বাংলার মহিলা ফুটবলের মা হয়ে উঠেছিলেন[৮]। এই সময় বাংলায় প্রকাশিত একাধিক ক্রীড়া পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের ফুটবল সহ অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণের সপক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বাংলা তথা ভারতে মহিলা ফুটবলের প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

১৯৭৫ সালেই লক্ষ্ণৌতে বসে মহিলা ফুটবলের জাতীয় আসর। বাংলা তাতে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং শুধু তাই নয় শুরুর বছর থেকেই বাংলার মেয়েরা সাব জুনিয়ার, জুনিয়র ও সিনিয়র তিন বিভাগেই সাফল্য পেতে থাকে নিয়মিত ভাবে। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সিঙ্গাপুরে প্রথম বিদেশ সফরে অধিকাংশই ছিলেন বাংলার খেলোয়াড় এবং কুন্তলা, জুডি, শান্তি, শুক্লা দত্তদের সাফল্য দেখে ময়দানে চলে আসে চৈতালী চ্যাটার্জী, অনিতা সরকার, রমাদাসের মত আরো এক ঝাঁক নতুন মুখ। আন্তর্জাতিক অঙ্গিনায় ভারতীয় মহিলা দলের অন্যতম সেরা কৃতিত্ব ১৯৮২ তে তাইওয়ান বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করা। বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারত শুনলেই যে সব ফুটবল বিশেযজ্ঞ এবং ফুটবল প্রেমী চোখ কচলাতে থাকেন, তাদের অনেকের কাছেই বিষয়টি অজানা যে ভারতও বিশ্বকাপ ফুটবলে মূলপর্বে অংশগ্রহণ করেছে। সৌরভ গাঙ্গুলী ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের বাঙালি অধিনায়ক। কুন্তলা ঘোষ দস্তিদারও বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতীয় দলের বাঙালি অধিনায়িকা। প্রথমজন আজ আমজনতার কাছে সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত নাম। আর দ্বিতীয়জনের নাম আমজনতার কতজন জানে তা হাতে গুনে বলা যায়। ভারতীয় পুরুষ দল ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেললে এতোটা অবহেলার শিকার হতেন? মনে হয় না। মহিলাদের ফুটবল খেলা সম্পর্কে বোধ হয় একবিংশ শতকেও ধারণা খুব একটা পালটায়নি। তাই বিশ্বকাপ দলে চমকপ্রদ পারফরমেন্সের পরেও বাংলার মহিলা ফুটবল এমন অবহেলায় পড়ে রয়েছে। বিশ্বকাপ দলে ৯ জন ফুটবলার ছিলেন বাঙালি-কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, শান্তি মল্লিক, মিনতি রায়, জুড়ি-ডি সিলভা, রমা দাস, ইন্দ্রাণী সাহা, চৈতালী চ্যাটার্জী, শুক্লা নাগ ও শুক্লা দত্ত। বিশ্বকাপে ভারত জার্মানীর সঙ্গে ০-০ গোলে ড্র করেছিল। ড্র করেছিল হাইতির সঙ্গে ২-২ গোলে এবং হল্যান্ডের কাছে ০-৫ গোলে হেরে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বকাপ ছাড়াও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে ১৯৭৯ ও ১৯৮৫ তে রানার্স হওয়ার সম্মান অর্জন করেছে। বেশ কয়েকজন বাঙালি মহিলা যেমন নীলি সেন, শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ একাধিকবার এশিয়ান অলস্টার দলে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। এরকম সাফল্যের নজির পুরুষ ফুটবল দলের একেবারেই নেই।

সত্তর এবং আশির দশকে বাংলা তথা ভারতের মহিলা ফুটবল কিছুটা হলেও এগোচ্ছিলো। জাতীয় স্তরে বাংলার মেয়েদের সাফল্য ছিলো রীতিমত ঈর্ষণীয়। যদিও ক্রমশ অন্যান্য রাজ্য বিশেষত মনিপুরের সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছিল। নব্বুইয়ের দশকের শুরুতে উইমেন্‌স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে এ.আই.এফ এফের অধীনে মহিলা ফুটবল আনা হলো এই যুক্তি দেখিয়ে যে বর্তমানে ফিফা একই সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা ফুটবল পরিচালনা করছে। এতে কিছু পুরুষ ক্রীড়া কর্তাব্যক্তিদের ফিফায় যাবার পথ প্রশস্ত হয়েছে সত্য কিন্তু মহিলা ফুটবল ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। প্রবলভাবে ভারতের মহিলা ফুটবলে উঠে আসে মনিপুর রাজ্যটি গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে জাতীয় মহিলা ফুটবলের জাতীয় প্রতিযোগিতায় মনিপুর চ্যাম্পিয়ান। আর বাংলার মহিলা ফুটবল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৯৩ সালে প্রদ্যুৎ দত্তের আমলে প্রবল ঢাক ঢোল পিটিয়ে মেয়েদের লীগ চালু করা হলেও কার্যত তা প্রচারহীন ও আকর্ষণহীন প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলার ফুটবলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল-যা সম্পূর্ণতা পেলে ভারতীয় ফুটবলে একটি অনন্য নজির ঘটে যেত। জার্মান নিবাসী প্রবাসী ভারতীয় ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আবসার সাত্তারের উদ্যোগে বাংলা তথা ভারতের দুই মহিলা ফুটবলার আলপনা শীল ও সুজাতা কর জার্মানীর 'মহিলা বুন্দেশ লিগার' প্রথম ডিভিসনের ক্লাব কার্লস হাইর দলে ট্রায়াল দিয়ে সুযোগ পান। কিন্তু দীর্ঘ আড়াই মাস অপেক্ষা করেও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ভারত থেকে না আসায় কার্লস হাইস সুজাতাদের সমম্মানে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়[৯]। নিঃসন্দেহে সুজাতা আলপনারা জার্মানীর প্রথম ডিভিসন ক্লাবে খেলার সুযোগ পেতো তাহলে তা ভারত তথা বাংলার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় হতো এবং তাদের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো বহু মেয়ে ফুটবলে পা দিতো।

তিরিশ বছর পেরোনো মহিলা ফুটবল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রাথমিক পর্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট সাফল্য পেলেও কোন ফুটবলারই চাকরি পাননি। কোন পুরুষ ফুটবলার যেখানে একবার রাজ্যস্তরে খেলেই চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন সেখানে মহিলা ফুটবলারদের চাকরির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় স্তরে কোন উদ্যোগ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ইনকাম ট্যাক্স। ইনকাম ট্যাক্সই একমাত্র অফিস ক্লাব যেখানে সম্প্রতি চারজন মহিলা, ফুটবলার হিসেবে চাকরি পেয়েছেন। একথা সত্য যে বেশ কয়েকজন মহিলা ফুটবলার রেলে চাকরি করেন। কিন্তু তা ফুটবলার হিসেবে নয়। কুন্তলার রেলে চাকরি জাতীয়স্তরে বাস্কেটবল খেলার জন্য আর শান্তি মল্লিকের চাকরি হকি খেলার সুবাদে। আসলে ১৯৮৩ সালে শান্তি মল্লিকের ফুটবলে অর্জুন পুরস্কার পাওয়া ছাড়া রাষ্ট্র, মহিলা ফুটবলকে সেভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। তাছাড়া সর্ব ভারতীয় স্তরে এক জাতীয় ট্রফি ছাড়া কোন গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকায় কোন কর্পোরেট সংস্থা বা রেল, ব্যাঙ্কের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি মেয়ে ফুটবল দল গড়ছে না[১০]। প্রতিযোগিতার

সংখ্যাও ভীষণভাবে কমে যাওয়ায় মেয়েরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। বাংলায় মহিলা এবং কোএড কোন স্কুল বা কলেজেই বার্ষিক ক্রীড়ায় মেয়েদের কোন টিম ইভেন্ট থাকে না। ফলে যথেষ্ট অনুশীলন, যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগও বাংলার উঠতি বয়সের মহিলা ফুটবলাররা পাচ্ছেনা। ফলে মেয়েদের মধ্যে ফুটবল খেলার ব্যাপারে আগ্রহীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। বাংলার মহিলা ফুটবলারের অবনতির ক্ষেত্রেও গণ মাধ্যমের কিছুটা হলেও ভূমিকা রয়েছে। মহিলা ফুটবল সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের অনাগ্রহ মহিলা ফুটবলারদের সমস্যা আরো বেশী করে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইচুং ভুটিয়ার ইংল্যান্ডের তৃতীয় সারির নিচের দিকের ক্লাব বারি এফ.সি.-তে যোগদান সংক্রান্ত খবরের জন্য সংবাদ মাধ্যম কাঁড়ি কাঁড়ি নিউজপ্রিন্ট খরচ করেছেন। কিন্তু দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সুজাতাদের জার্মানীর প্রথম বিভাগের ক্লাবে সুযোগ পাবার খবর সংবাদ মাধ্যমগুলি ছাপায়নি। কলকাতার দুই বড় ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে ২০০০-২০০১ সালে মেয়েদের দল গঠন করে মহিলা ফুটবল মহলে কিছুটা আশার আলো দেখালেও বছর দু'তিনের মধ্যে সে উৎসাহে ভাঁড়া পড়ে যায়। ২০০২-২০০৩ সালে ইস্টবেঙ্গল আশিয়ান কাপের পুরুষ দলের আধুনিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে বাড়তি খরচ 'মহিলাদল' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর গত মরসুমে মোহনবাগান ক্লাব কর্তারা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের দরুণ মহিলা ফুটবলারদের বলির পাঁঠা বানাতে ক্লাবের মহিলা ফুটবল দল তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শত অনুরোধ করে ক্লাবকর্তাদের হাতে পায়ে ধরে, অনশন এমনকি ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েও রত্না নন্দী ও শুক্লা দত্তরা টিম গঠন করাতে পারেননি।

আসলে সব সমস্যার মূলে রয়েছে আমাদের সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা। মেয়েরা সাঁতার,অ্যাথেলেটিক বা বড় জোর শুটিং, টেবিল টেনিস, লং টেনিস খেলতে পারে। কিন্তু ভারতে প্রচলিত এত জনপ্রিয় খেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরষালি খেলা, পুরষের একান্ত নিজস্ব খেলা ফুটবলের অঙিনায় মেয়েদের প্রবেশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কখনই মেনে দিতে পারেনি[১১]। সেদিন সত্তরের দশকেও নয় এবং আজও নয় বর্তমানে সমস্যা আরো জটিল হয়েছে এদেশের বিশ্বায়নের মোড়কে আমদানী করা চরম ভোগবাদী সংস্কৃতি যেখানে নারী শুধু পণ্য। সে শিক্ষিত মার্জিত কিন্তু ভীষণভাবে রমণীয়। তাঁকে হতে হবে আধুনিক সাজ পোষাকে সজ্জিত অতীব সুন্দরী মোহিনী। শক্ত পেশীবহুল মহিলা ফুটবলাররা যেখানে বড়ই বেমানান। তাই বাঙালি সমাজ আজও এই অদ্ভুত পুরুষালি মহিলা ফুটবলারদের বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। মেয়ে ফুটবল খেললে বিয়ে হবে তো? এই চিন্তা আজ কুরে কুরে অভিভাবকদের খায়। অভিভাবকদের এই দুশ্চিন্তা অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের ফুটবল খেলায় বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা ফুটবলার না থাকায় প্রায়শই মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে অনুশীলন করতে হয়। ভবিষ্যতে নানা সমস্যার কথা

চিন্তা করে এজন্য অনেক ক্ষেত্রে বাড়ী থেকে মেয়েদের ফুটবল খেলতে বাধা দেওয়া হয়। তাই বর্তমানে বাংলা তথা ভারতের মহিলা ফুটবলারদের সমস্যা গুরবিন্দর চাড্ডার 'বেন্ট ইট লাইফ বেকহ্যাম'-র ফুটবলার নায়িকা যশবিন্দরের তুলনায় শতগুণে বেশি। আর বাঙালি যশবিন্দরদের সমস্যা প্রচুর। সামাজিক রক্ষণশীলতা, রাষ্ট্রীয় অবহেলা, পর্যাপ্ত অনুশীলন এবং সুযোগের অভাব ইত্যাদি নানা কিছু। তাই যশবিন্দরের তুলনায় সুজাতা আলপনাদের জীবনযুদ্ধ অনেক অনেক বেশী কঠিন। তারপরে রয়েছে ক্রিকেটের আগ্রাসন। ভারতে ক্রিকেট ও ক্রিকেটীয় বাণিজ্য যেভাবে দিনকে দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে তাতে অন্যান্য খেলাগুলির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। মিডিয়ার প্রচার, অসংখ্য স্পনসরের উপস্থিতি ও সরকারী দাক্ষিণ্যে পুষ্ট ক্রিকেট আজ দেশে প্রচলিত সমস্ত খেলাগুলিকেই গিলে ফেলছে। এক সময়ের বাঙালির হৃদয়ের খেলা ফুটবল আজ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ও আর্থিক ঔজ্জ্বল্যের কাছে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে। পুরুষ ফুটবলের যদি এই দশা হয় তাহলে জনপ্রিয়তার নিরিখে বাংলার মহিলা ফুটবল কোন খাদে নিমজ্জিত তা সকলের কাছেই সহজে অনুমেয়।

একরাশ হতাশা আছে, বঞ্চনা আর উপেক্ষা রয়েছে। সেই শুরুর দিনগুলিতেও ছিল। আজও আছে। তবু লড়াইও আছে। সেদিনও ছিল, আজও আছে। জাইদি বা আরতি ব্যানার্জীরা হয়তো নেই কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরী কুন্তলা, মিনতি, শান্তি, চৈতালী, জুডি, অনামিকারা রয়েছেন। কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার জার্মানী থেকে ফিফার কোচিংয়ের 'সি' লাইসেন্স নিয়ে এসে প্রশিক্ষণে মন দিয়েছেন। বাংলা এবং ভারতের মহিলা দলের প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন একাধিকবার। শুধুমাত্র মহিলা দল নয় কলকাতার তৃতীয় ডিভিসনের একটি পুরুষ ফুটবল দলকেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। চৈতালী চ্যাটার্জী, জুডি.ডি সিলভা, শুক্লা নাগ, অনিতা সরকার, অনামিকা সেনরা রেফারিং-এ মন দিয়েছেন। এর মধ্যে অনামিকা সেন, বাংলার প্রথম ফিফা ব্যাজধারী রেফারি, গত বছর সুপার ডিভিসনে মোহনবাগানের একটি খেলায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সহকারী রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন। অনিতা সরকার গড়ে তুলেছেন ময়দানে নিজস্ব কোচিং ক্যাম্প। রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা, সামাজিক বঞ্চনা ও লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে কিছু মেয়ের এই নাছোড় লড়াই হয়তো একদিন বাংলার মহিলা ফুটবলকে খাদের কিনারা থেকে সত্তরের দশকের সোনালী অতীতকে ফিরিয়ে আনবে।

সূত্র-নির্দেশ

১. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'দাস বিদ্রোহ' (রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ আগষ্ট ২০০২)

২. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলা ঃ সামাজিক ইতিহাসের দর্পণে* (পশ্চিমবঙ্গ-ফিরে দেখা, সম্পাদনা রাহুল রায় জানুয়ারী ২০০৩)

৩. বোরিয়া মজুমদার ঃ *Forwards and Backwards : Women's soccer in Twentieth Century India* (Soccer, Women, Sexual Liberation, Edited by J.A. Mangan and Fan Hong, Frank Cass/Routtedge, 2003)

৪. বোরিয়া মজুমদার ঃ পূর্বোল্লিখিত

৫. এ প্রসঙ্গে বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ বোরিয়া মজুমদার *'আগে তো মেয়ে'* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ আগষ্ট ২০০২)

৬. রূপক সাহা ঃ ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল (কলকাতা, ২০০০)

৭. পার্থ দত্ত ঃ *'শুধুই বঞ্চনার কাহিনী'* (উপহার, সংবাদ প্রতিদিন, ৫ জুন ১৯৯৯)

৮. কুন্তলা ঘোষদস্তিদার ঃ *'আমার মা ছিলেন'* (কিক অফ, জুন ২০০৩)

৯. দিব্যেন্দু চৌধুরী ঃ *'আমাদের হবে না!'* (কিক অফ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪)

১০. পার্থ দত্ত ঃ পূর্বোল্লিখিত

১১. শান্তনু চক্রবর্তী ঃ *'নারীত্ব বনাম ফুটবল'* (যৌথ খামার, সম্পাদনা সুকল্প চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩)

রবীন্দ্রনাথ ও আকাশবাণী কলকাতা

সুশান্ত কুমার ভৌমিক

কোন ছোট ছেলে মেয়েকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কলকাতা বেতারের নামকরণ 'আকাশবাণী' কে রেখেছিলেন? তৎক্ষণাৎ তারা উত্তর দেবে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। অথবা অন্য ভাবে বললে এটি আংশিক সত্য। আসলে আকাশবাণী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ছিল যে আমরা প্রায়শই এধরনের ভুল করে ফেলি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে দক্ষিণ ভারতে কোন একটি বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল 'আকাশবাণী'[১]। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা বেতারের সম্পর্ক যতই মধুর হ'ক না কেন গোড়ার দিকে কিন্তু এই সম্পর্ক আদপেই মধুর ছিল না। তখন রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা ছিল না। রেডিওতে সব কিছু লাইফ ব্রডকাস্টিং হত। কলকাতা বেতারে এসে কোন কিছু বলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল তীব্র অনীহা। ১৯৩৬ এর মার্চে দিল্লীতে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর অর্থ সংগ্রহ করতে। ওখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে ঐ সময় তিনি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এই প্রথম এদেশে বেতার যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর[২]।

তৎকালীন কলকাতা বেতারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার ও নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেতারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে অভিযোগের সুরে জানান যে, তথাকথিত কয়েকজন 'রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ' বেতারে তাঁর গানের ওপর দিয়ে স্টিমরোলার চালাচ্ছেন[৩]। একই উদ্দেশ্য নিয়ে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রকে রবীন্দ্র নাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্র নাথ তাঁকে বলেছিলেন 'দেখ, তোমাদের এই রেডিও যন্ত্রটি ভবিষ্যতে অনেক উৎপাত বাধাবে বুঝতে পারছি'। ওর মধ্যে আর আমাকে টানাটানি কেন? আমার শরীর অপটু। তাছাড়া বাইরে যাচ্ছি, অনেক লেখার কাজ রয়েছে তাই এখন তো সময় হবে না। না বাপু। এবয়সে আর কোথাও যাওয়া টাওয়া আমার পোষাবে না। তাছাড়া আর একটা কথা কি জান, ঐ যন্ত্রের সামনে বসে কবিতা পড়তেও আমার ভাল লাগে না। কি রকম বাধ বাধ ঠেকে। মানুষকে না দেখে তার উদ্দেশ্যে লেখা যায়। কিন্তু তাকে চোখে না দেখে ভাল করে শোনানো যায় কী করে তাতো বুঝতে পারছি না[৪]। রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কাছে তার গান সঠিক ভাবে গাওয়ার প্রসঙ্গে কয়েকটি অনুযোগও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমার গানের একটা নিজস্ব সুর আছে। সেটাকে যদি কোনো শিল্পী তার খুশীমত অদল-বদল করে তা হলে মনে হয় সকলে মিলে আমার

ওপর উৎপীড়ণ করছে। ওদিকটা একটু লক্ষ্য রেখো তোমরা।”

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানোর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ছিল। ১৯৩৮ এর গ্রীষ্মকালে তৎকালীন ষ্টেশন ডিরেক্টর অশোক কুমার সেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন যে অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্টুডিওর মধ্যে হারমোনিয়ামের দৌরাত্ম্য চলতে থাকলে তার আঘাতে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে হত্যা করতে দিতে মোটেই রাজী নন[৬]। অশোক কুমার সেন বিষয়টি তৎক্ষণাৎ তৎকালীন কন্ট্রোলার অব ব্রডকাস্টিং লায়োনেল ফিলড্রেনকে জানান ফিলডেন সাহেব ভারত বর্ষের সমস্ত বেতার কেন্দ্রে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে হারমোনিয়ামের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও উপলব্ধি করেন যে সঠিক ভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের দায়িত্ব বিশ্বভারতীরই নেওয়া উচিত। বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করে অশোক কুমার সেনকে একটি চিঠি লেখেন। এই সময় থেকেই কলকাতা বেতারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উল্লেখিত চিঠিটি এইরূপ—

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal'
January 19,1940.

Ref : D.O.GC/1414 dated 17.1.40.

Dear Asoke,

I have always been very much against the prevalent use of the harmonium for purposes of accompaniment in our music and it is banished completely from our asrama. You will be doing a great service to the cause of Indian music if you can get it abandoned from the studios of the All India Radio.

Your Sincerely,
Rabindranath Tagore.

Sj. Asoke k. Sen
All India Radio
1, Garstin place,
Calcutta.

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কলকাতা বেতার থেকে তার বিশেষ বাণী প্রচারেও কবিকে রাজী করিয়েছিলেন অশোক কুমার সেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ এ তাঁর জন্মদিনে কালিম্পং থেকে 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটি ঐ দিনই কবি রচনা করেন। পরের দিন ২৬ বৈশাখ দৌহিত্রী নন্দিতা দেবীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "কাল এখানে লোক ছিল অল্প, জমেছিল বেশী। রেডিওতে আমার আবৃত্তি শুনেছিলি তো[৭]"?

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং চিত্রগ্রাহক পরিমল গোস্বামী ১৯৩৭-এ কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে "জন্মদিন" কবিতাটি শুনেছিলেন। পরম উল্লসিত হয়ে সে দিনের সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে ঃ

"রবীন্দ্র কণ্ঠে কাব্যের আবৃত্তি প্রথম শুনেছিলাম ১৯১৭ সালে এবং তাঁর কাব্যর শেষ আবৃত্তি শুনলাম রেডিওতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে। আবৃত্তি করে ছিলেন কালিম্পং থেকে।

আমার এক বন্ধু শুধু এই আবৃত্তি শুনবেন বলেই রেডিও কিনলেন; পরে বলেছিলেন কেনা সার্থক হয়েছে।

'জন্মদিন' অবিস্মরণীয় আবৃত্তি এবং তার প্রতিটি কথার উচ্চারণে অর্থে, ইঙ্গিতে এবং ধ্বনিতে শুধু নয়, কবিতাটির অন্তরে এমন এক গভীর বেদনার প্রকাশ ছিল, যার জন্য এ আবৃত্তি অবিস্মরণীয়।

"সমস্ত মিলে কি অদ্ভুত অনুভূতি এখনও মনে পড়লে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবন ধন্য মনে হয়েছিল সে দিন। মুখে ভাষা ছিল না। চোখে জল এসেছিল আনন্দে। শোনার সময় মাঝে সত্যিই ভয় হচ্ছিল কবির হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে না যায়, এমন ঝড় উঠেছিল সেদিন তাঁর কণ্ঠে"।

১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষ্যে ঠিক হলো যে, 'বেতার জগতের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটি লেখা পাবার জন্য বেতার জগতের তৎকালীন সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার অসুস্থতার কারণে লেখা দেওয়ার অক্ষমতার কথা জানান। তা ছাড়া তিনি এও বলেন যে তিনি যদি শুধু তাদের একটি লেখা দেন, তাহলে দরজার বাইরে লেখা পাবার জন্য যে জনতা ভীড় করে আছে, তাদের তিনি ঠেকাবেন কী করে? নলিনীকান্ত সরকার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। কয়েকদিন পর বেতার কেন্দ্রে একটি চিঠি আসে, যে চিঠির মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের নামহীন একটি কবিতা, যার প্রথম দুটি লাইন এই রূপ ঃ

'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনে
উঠিল আকাশবাণী।
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি।'[৮]

কলকাতা বেতারের নামকরণ 'আকাশবাণী' করা হয় এই কবিতার 'আকাশবাণী' শব্দটি নিয়ে এবং এটি করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর।

১৯৩৯ সালের মে মাস। কবি তখন পুরীতে। এই সময় বেতারে কবির কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটি কবিতা রেকর্ড করা হয়েছিল।[৯]

একবার শোনা গেল জোড়াসাঁকোতে স্টেজ বেঁধে 'তপতী' নাটক অভিনীত হবে। এই নাটকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করবেন। কলকাতা বেতার থেকে তৎক্ষণাৎ এই নাটক সরাসরি রিলে করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন রাজার ভূমিকায়। সেদিন মানুষ শুনেছিল রবীন্দ্রনাথের অভিনয়।[১০]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও রেডিও শুনতে ভালবাসতেন। বিজন বসুর সংবাদ পাঠ তার খুব প্রিয় ছিল। তিনি 'শেষের কবিতা' রেডিওতে অভিনয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি রেডিওতে এই অভিনয় শোনেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি দিয়ে তিনি তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১১]

১৯৪১ এর ৭ আগস্ট বাংলায় ২২ শ্রাবণ। সকাল থেকে ১৫ মিনিট অন্তর কবির শারীরিক অবস্থা জানানোর জন্য বিশেষ বুলেটিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ দিন মধ্যাহ্নে বেতারের মাধ্যমে মানুষ জেনেছিল কবি প্রয়াত হয়েছেন। একজন মানুষ সেদিন বেতার কেন্দ্রে অত্যন্ত মর্মাহত অবস্থায় লিখেছিলেন এক বিখ্যাত কবিতা। বেতার শিল্পী বরোদা গুপ্তের কথায় তিনি যখন কবিতাটি লিখেছিলেন তখন তার দুনয়নে ছিল শ্রাবণের ধারা। কবিতার নাম 'রবিহারা'—কবি কাজী নজরুল ইসলাম। শ্মশান ঘাটে কবির শেষকৃত্যের ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। রেডিওতে যারা সেই ধারাভাষ্য শুনেছিলেন তাদের মধ্যে প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র অন্যতম। তাঁর কথায় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র এমন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন, তা শুনে স্বচক্ষে তিনি যেন সেই শেষকৃত্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র যা বলেছিলেন তা তাঁর নিজের কথায় 'দাঁড়িয়ে আছি গঙ্গার প্রান্তে পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গৈরিক স্রোতে গঙ্গা বয়ে চলেছে সামনে দিয়ে। তারই উপকূলে চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত করা হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দেবার জন্যে। বাঙালীরা আকুল আগ্রহে ছুটে এসেছে শেষ দর্শনের আশায় বিশ্বকবিকে শেষবারের মত দেখে নিতে। সমগ্র বিশ্ব আজ জানল যে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে বিশ্ব সভায় হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সেখানকার সাহিত্যের সিংহাসনে রাজার মত বসিয়েছিলেন। আজ সেই কার্য সম্পাদন করে তিনি বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে [১২]।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা বেতারের সম্পর্ক খুব একটা ভাল না হলেও পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক ক্রমশই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়। সেই কারণে আমরা 'আকাশবাণী' নামটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে না বলে ভুল করে বলে ফেলি 'আকাশবাণী' নামটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। আসলে আমাদের এই ভুল করার প্রবণতা উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তাই প্রমাণ করে। তাই নয় কী?

সূত্র-নির্দেশ

১. আকাশবাণীর কর্মী অমিয় চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎকার, কলকাতা, তারিখ-২৫/০১/২০০৪
২. কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, পর্ব-৮ম, কলকাতা-কে', সময়-সকাল ৮ টা, ১৪/১০/২০০১
৩. তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, *'কলকাতা বেতার ও রবীন্দ্রনাথ'*, কোরক, কলকাতা, ২০০২, পৃ :-২৬
৪. তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ :-২৮
৫. তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ : ২৯
৬. কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, প্রাগুক্ত, তারিখ-১৪/১০/২০০১
৭. কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, পর্ব-৯ম, কলকাতা-'ক',
সময়—সকাল ৮টা, ২১/১০/২০০১
৮. তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ : ৩২
৯. কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, প্রাগুক্ত, তারিখ-২১/১০/২০০১
১০. কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, প্রাগুক্ত, তারিখ-২১/১০/২০০১
১১. তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৩
১২. কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, পর্ব—১০ম, কলকাতা-'ক',
সময়—সকাল ৮টা, তারিখ—২৮/১০/২০০১

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা

আরতি কাহালি গোস্বামী

একদা কোচবিহার ছিল প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ। পঞ্চদশ শতকে হুসেনশাহ প্রতিবেশী কামতারাজ্য আক্রমণ করে। কামতা রাজা নীলাম্বর-এর পতন ঘটলে সে স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতিদের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে কোচরা ষোড়শ-শতকে (১৪৯৬ খ্রি) বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। রাজ্যটির নামকরণ হয় কোচবিহার। নামকরণের বিতর্কের অবসান ঘটে পরবর্তীকালে (রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের) ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের রাজবিজ্ঞপ্তিতে। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক কালজানি মানসাই গদাধর ও সংকোশ নদী বিধৌত কোচবিহার রাজ্যটি মানচিত্রে আসে।

একদা-যে রাজ্যটি পশ্চিম ত্রিহুত থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্যটি একদিকে মুসলিম ও ভূটানী আক্রমণ, অপরদিকে অভ্যন্তরীণ অন্তর্কলহের সুবাদে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তারপর ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ আগস্ট কোচবিহার মার্জার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবাংলার একটি জেলা হিসাবে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

মহারাজ বিশ্বসিংহ থেকে[১] হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদূরের রাজত্বকাল পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য। সাহিত্য, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা ইত্যাদি ছিল পাঠ্য বিষয়, সংস্কৃত চর্চা রাজ্যে থাকলেও রাজকীয় কার্যাদি বাংলা ভাষায় লিখিত হত। মহারাজ নরনারায়ণের লিখিত অসম রাজকে পত্র ও তার উত্তর পত্র সেই সময়ের প্রাচীনতম বাংলা ভাষার সাক্ষ্য বহন করে। উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজকার্য বিষয়ক দলিল দস্তাবেজ তার প্রমাণ বহন করে। ষোড়শ শতকের শক্তিশালী কোচবিহার রাজবংশের সাথে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যোগাযোগের ভাষা ছিল বাংলা। কামরূপ, কাছাড় দরং, জন্তিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এমন কি ভূটান প্রদেশেরও ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক চিঠিপত্র বাংলাভাষায় লিখিত হত যার নিদর্শন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সেই সময়ের রাজারা সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতদের স্বরাজ্যে ভূমি দান করতেন। নরনারায়ণ, বীরনারায়ণ, প্রাণ নারায়ণ রাজ্য জুড়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে প্রচেষ্টা করে গেছেন।[২]

এর পরে কোচবিহারে শিক্ষার ক্ষেত্রে নেমে এল অন্ধকার যুগ। একদিকে ভূটানী ও মুসলমান আক্রমণ অপরদিকে রাজপরিবারের অন্তর্কলহের সুবাদে রাজ্যটি ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ করদ রাজ্যে পরিণত হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস, হেনরী ডগলাস সাহেবকে কোচবিহারের প্রথম কমিশনার নিযুক্ত করেন। শিশু রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, ৩-বছর ৯-মাস। রাজ্য রক্ষাণাবেক্ষণ ও রাজার শিক্ষার জন্য ডগলাস সাহেব সদা সতর্ক ছিলেন। সিংহাসনে অরোহণ করে বহুগুণ শালী রাজা কোচবিহারে শিক্ষার প্রসার ঘটান। ইতিমধ্যে মহারাজের রাজত্বকালে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ আগস্ট রংপুরের জজ ম্যাজিস্ট্রেট ন্যাথানিয়েল স্মিথ সাহেব সেই অঞ্চলের জমিদারদের সহযোগিতায় এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের মানসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সে সময়ের পত্র পৃত্রিকা "সমাচার দর্পন" জানুয়ারী ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর তার রংপুরাস্থ জমিদারির ধামের মোকামের এক অতি উত্তম দালান পাঠশালার নিমিত্ত প্রদান করে; তার মেরামতি খরচ বাবদ ২০০০ টাকা ও পাঠশালার অনুকুলে এক কালীন ২০০০ টাকা প্রদান করেন। তখন সবে মাত্র ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্মেষের যুগ। তাই তাকে কোচবিহারের নবযুগের প্রতিভূ বলা যায়। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে রাজার রংপুরস্থ জমিদারী ইজারা দিলে উক্ত বিদ্যালয় হাতছাড়া হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হলে উক্ত বিদ্যালয় রংপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[৩]

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত ছাড়া আরবী ভাষা জানতেন। তিনি তার দত্তকপুত্র মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে ইংরেজী ও বাংলায় সুশিক্ষিতকরণের নিমিত্ত ইংরেজ গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করেন। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে শিবেন্দ্রনারায়ণ জেনকিনসের কাছে কোচবিহার রাজধানীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সদিচ্ছা প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের জন্য আবেদন করেন। সে বছর জেনকিনস সে ব্যাপারে ১৫ মার্চ সরকার বাহাদুরের সেক্রেটারী টি ডাব্লু ম্যাডক প্রতিউত্তরে জেনকিনস সাহেবকে জানান, "The governor-General in council is disposed to encourage the proposition of the Rajah for the establishment of a school and when arrangements shall have been completed for appropriating sufficient funds for its maintenance, the subject of supplying teachers for the presidency will be taken into consideration" ইতিমধ্যে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফের প্রচেষ্টাতে অন্দর মহলের মহিলাদের জন্য জেনানা শিক্ষার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কোচবিহার হিতৈষণী সভার কার্যবিরণীতে দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিচিন্তার মধ্যে স্ত্রী ও শিশু শিক্ষার প্রতি বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতাতে শ্রী ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষার উপর জোর দেন। শতকুসংস্কারের মধ্যেও সে সময়ের এরূপ চিন্তাধারা প্রশংসনীয়। ১৮৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেপুটি কমিশনার ডালটনের প্রতিবেদনে

দেখা যায় এই সময়ে অন্তপুরের মহিলাদের জন্য "পুনরাস বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় ছাড়াও একটি "জেনানা অ্যাসোসিয়েসন" এবং "রতিবাবুর বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটি স্থানীয় গ্রামার স্কুলের অস্তিত্ব ছিল।[৪]

১৮৪৭ শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুকালের ইচ্ছা-তার দুই মহারানী কমেশ্বরী ও বিন্দেশ্বরী সেই ইচ্ছায় মত প্রকাশ করলে কর্নেল জেনকিনস মহারাজার ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিবেন্দ্র পুত্র নিজরাজধানীতে গৃহশিক্ষক ডাক্তার র‍্যালফ ম্যুর এর শিক্ষা নেবার পর প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে ও পরবর্তীতে কলকাতার ওয়াডস ইনস্টিটিউসনের ব্যবস্থাধীনে বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করেন।

কোচবিহারের বিদুষী মহারানী শিবেন্দ্র পত্নী বিন্দেশ্বরী দেবী অবশ্য তার পালিত শ্রীযুক্ত রঙ্গিলা নারায়ণ কোঙর সাহেবকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য রাজদ্বারে একটি টোল স্থাপন করেন উক্ত টোলে রঙ্গিলা নারায়ণ সাহেব ও রাজার নিকটতম ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিকুটুম্ব ৫/৭ জন গুরুমহাশয়দিগের প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তখন কোচবিহারে আগমণ করেন। তাঁর কাছে মাঝে মধ্যে টোলের ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করত। শ্রীঘোষের অনুরোধে মহারানী একজন ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত করেন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। উক্ত শিক্ষক রাজদ্বারে তাদের ইংরাজী শিক্ষা দিত। ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০ জন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে যে পর্যন্ত না রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদূর দেশে ফিরেন ততদিন বিদ্যোৎশাহী মহারানী বিন্দেশ্বরী উক্ত বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণে সচেতন ছিলেন। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। শ্রীঘোষ প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য রেখে পন্ডিত প্রবর অভয়চরণ ঘোষ মহাশয়কে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ৪০ জন।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ তার বাল্যকালের জমা রাজস্ব ৬,৫২,৬২০ টাকা তার পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত মেজর জেনারেল ফ্রান্সিস জেনকিন্সকে দান করেন যাতে রাজ্যের কোন ভাল কাজ হয়। জেনকিনস সেই অর্থ দিয়ে কোচবিহারে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার জন্য তার নাম অনুসারে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে জেনকিনস স্কুল স্থাপিত করেন। হয়তোবা রাজদ্বারের ইংরাজী টোলটি জেনকিনস বিদ্যালয়ের আদি রূপ ছিল এবং রাজদ্বারের টোলটি হয়তো সদর এম-ই-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এটা অবশ্য সত্য কথা-যে নরেন্দ্রনারায়ণ হলেন কোচবিহারের নূতন (ইংরেজী) শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তক। হরিমোহন বাবু তৃতীয় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলে ছাত্র সংখ্যা হয় ৮০ জন। ১৮৭০ সালে উক্ত স্কুল থেকে এট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৩ জন ছাত্র।[৫]

নরেন্দ্রপুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের রাজত্বকালকে কোচবিহারের নবযুগ বা রেনেসাঁ বলা হয়। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে হটন সাহেব মহকুমা সাবডিভিশনেও পঠন পাঠনের

জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। রাজার পৃষ্টপোষকতায় রাজভাণ্ডার হতে শিক্ষার জন্য অর্থদান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কোচবিহার রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সুবিধা ছিল তা বাংলার অন্যত্র ছিল না। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের অভাব ছিল না। ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি কোচবিহারে চালু হল। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৮ টি, তার মধ্যে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল ৩৭টি ও সাহায্যবিহীন বিদ্যালয় ছিল ২১টি। ৫টি ছিল বালিকা বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল ছিল ৩টি, একটি ছিল মাদ্রাসা, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় ছিল ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৭০২২ টাকা, ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে দাড়ায় ২৯৫১ টাকা। জনসাধারণের দেয় চাঁদা ছিল ২৮৮৪ টাকা।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবস্থানগত দূরত্বের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কর্মসূচী ও তত্ত্বাবধানের জন্য এডুকেশন দপ্তর সৃষ্ট হয় আর রবিনসন প্রথম শিক্ষা অধিকর্তা পদে বহাল হন। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের দেখভালের জন্য ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রী কৈলাস নাথ মুখার্জ্জীকে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল, সাব ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল এবং চারজন ইনস্পেকটিং পণ্ডিতের পদ সৃষ্টি হয়, যথাযোগ্য ব্যক্তিদের ঐ সকল পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে রাজপরিবারের একজন ফার্স্ট আপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

নিম্নলিখিত সারণী থেকে ১৮৭১-৭২ হতে ১৮৭৯-৮০ খ্রিষ্টাব্দের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার জানা যায়—

ইংরাজী সাল	সরকারী বিদ্যালয়	অনুমোদিত বিদ্যালয়	অননুমোদিত বিদ্যালয়	মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৮৭১-৭২	৪	৪৯	২৯	৮২
১৮৭৫-৭৬	৭	১১৭	৯৮	২৮২
১৮৭৯-৮০	৬	২৮৯	৯৫	৩৯০

ব্যয়

ইংরাজী সাল	সরকারী ব্যয়	বে-সরকারী ব্যয়	শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয়
১৮৭১-৭২	২২,২৩৩টাকা	৬,২৭৩ টাকা	২৮,৫০৬ টাকা
১৮৭৫-৭৬	৪২,৪৯১ টাকা	২২,৩৫৭ টাকা	৬৪,৯৪৮ টাকা
১৮৭৯-৮০*	৬০৬৮৫ টাকা	৩৩,২১৩ টাকা	৯৩৮৯৮ টাকা

কোচবিহারের শিক্ষার সহিত তুলনা করলে দেখা যায় যে ১৮৭১-৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাজসাহী রংপুর দিনাজপুরের শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ।

জেলা	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা হিন্দু	ছাত্র সংখ্যা মুসলিম	অপরাপর	মোট ছাত্র সংখ্যা	সরকারী ব্যয়	বেসরকারী ব্যয়	মোট ব্যয়
						পা-শি-পে	পা-শি-পে	পা-শি-পে
রাজশাহী	১৭৪	২৮৯৬	১৭৯১	১	৪৮৬২	২৭১৪-১৬০	১৫১০-১০-১	৫২২৫-৬-১
						পা-শি-পে	পা-শি-পে	পা-শি-পে
রংপুর	২৩০	২৬৮১	২৫৭৪	৩৭	৫৩৬১	২৮১১-৩-১	১৭৫৭-১৮-১	৪৫০৯-১৭-৭
						পা-শি-পে	পা-শি-পে	পা-শি-পে
দিনাজপুব	২৪৭	২৪১২	৩৩৯৯	১২	৫৭২৩	২৪৭৭-৩-৭	১৪৪৮-১৭-৬	৩৯১৯-১৬-১

এদের মধ্যে রংপুরের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক রিটার্ন না পাওয়াতে ছাত্রসংখ্যা ও ব্যয়ের সঠিক বর্ণনা দেওয়া হয়ে উঠেনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে কোচবিহার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেরীতে শিক্ষা আরম্ভ হলেও তা দ্রুতগতিতে উন্নতিপথে এগিয়ে চলে তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায় সাবডিভিশনের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল বাঙালী আমলাদের পরিবারভুক্ত। ডাক্তার, উকিল, জমিদারদের সন্তান সন্ততি। ব্রাহ্মণ বিশেষ করে খাগড়াবাড়ীর ব্রাহ্মণরা ইংরেজী শিক্ষায় উৎসুক ছিল না হয়তো আর্থিক অনটন নচেৎ রক্ষণশীলতা। মুসলমানগণ রক্ষণশীলতার জন্য নব্যশিক্ষা গ্রহণ করেনি। এছাড়া কোচবিহারের ৭৫% ভাগ দেশীয় প্রজা-রাজবংশী গারো, মেচ, রাভা, ইত্যাদি প্রজারা ছিল জোতদার ও কৃষক সমাজ। তারা এই নব্য শিক্ষা গ্রহণ করেনি। কারণ চাষবাস ছেড়ে ছেলেরা পড়াশুনা করে তা অভিভাবকগণ অনিচ্ছুক ছিল।[৬]

১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৮৪-৮৫ খ্রিষ্টাব্দের সময়ে দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় কমে আসছে এবং বেসরকারী ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে গেছে। এই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে জনসাধারণের উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে মহারাজা রতিবাবুর বালিকা বিদ্যালয়টি ভার অধিগ্রহণ করেন। যা ১৮৮১-তে সুনীতি কলেজ পরে সুনীতি একাডেমি নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয়ে মহারানী পাঠ্যসূচী বহির্ভূত মেয়েদের সুচারু করার নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দটি ছিল রাজার অভিষেক বছর। ঐ বছর রাজ্যের মোট বিদ্যালয় ছিল ২৮৩ টি শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে মোট ব্যয় হয় ৭৬,৪১৬ টাকা যার মধ্যে জনসাধারণের চাঁদা ছিল ১৮,৮২০ টাকা নিম্নলিখিত সারণী থেকে ১৮৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৪-৮৫ এর সময়বর্তী শিক্ষার চিত্র পাওয়া যায় ঃ—

ইংরাজী সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩১ শে মার্চের ছাত্র সংখ্যা
১৮৮০-৮১	৩২৪	৯,৩৫৫
১৮৮২-৮৩	৩৩০	৯৫৪১
১৮৮৪-৮৫	৩২৬	৯২৬০

ইংরেজী সাল	সরকারী ব্যয়	বেসরকারী ব্যয়		মোট ব্যয়
		ফিস + ফাইন	অপরাপর	
	টা-আ-প	টা-আ-প	টা-আ-প	টা-আ-প
১৮৮০-৮১	৫৮৬১৯-১৪-২	৪৫৩৫-১২-৯	১৭৭৩৮-৯-৯	৮০,৮৯৪-৪-৮
১৮৮২-৮৩	৫৬৭৭৬-৫-৯	৪৫৬২-৩-৩	১৫৮০৫-৬-৯	৭৭,১৪৩-১৫-৯
১৮৮৪-৮৫	৫৭৬০৫-৫-৪	৫৩৩০-১১-৬	৯২৮০-১০-০	৭২,২১৬-৯-১০

ইতিমধ্যে ১৮৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৩২৭টি। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় দাঁড়াল ৮১,১৪৪। ইতিমধ্যে ভারত সম্রাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার রজত জয়ন্তী বর্ষ উপস্থিত। তাঁর স্মারক হিসাবে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জুন কোচবিহারে স্থাপিত হল প্রথম শ্রেণীর মহাবিদ্যালয়—ভিক্টোরিয়া কলেজটি গৃহ নির্মাণ, আসবাব পত্র, বইপত্র, ছাত্রবৃত্তি, লাইব্রেরি ইত্যাদির জন্য ২৫,০০০ টাকা রাজ্যসরকার দান করেন প্রথম অধ্যক্ষপদটিতে জে সি গডলে যোগদান করেন। বর্তমানে কলেজটি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজের অধ্যক্ষপদে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বহাল হন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ঐ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২৪ জন ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা হয় ১৬৮ জন তার মধ্যে ৯ জন ছিল সেই দেশীয় (আদিবাসী)। ঐ সালেই কলেজে ১৯৯ জন আণ্ডার গ্রাজুয়েট, ৭৩ জন বি.এ, ৪ জন এম-এ এবং ১৯ জন বি এল পাশ করে। উচ্চশিক্ষার জন্য নিম্নশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন হয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুদান কমিয়ে দেওয়া হল। শিক্ষাদপ্তরের পদটি তুলে দেওয়া হল, নর্মাল স্কুল বন্ধ হল, গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় বন্ধ হল। কোচবিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিত হয় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষাবিধানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেকটরদের তরফ থেকে একটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় আদেশ পত্র ভারতবর্ষে এসে পৌছালে যার খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন সুবিখ্যাত বাগ্মী জন স্টুয়ার্ট মিল। দেখা গেল শিক্ষাক্ষেত্রে রাজার ব্যয় সংকোচন হলেও জনসাধারণ উৎসাহ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এল। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের জনসাধারণ এনট্রান্স স্কুলস্থাপনের জন্য ২৫,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে ঐ মহকুমাগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপন করে।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে রাজ্যের মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫৩ টি ছাত্রসংখ্যা ১১,৭৪০ জন রাজসরকারের দেয় অর্থ ছিল ৬৩,৭১০ টাকা জনসাধারণের দেয় চাঁদা ছিল ১৯৮১৯ টাকা মোটখরচ ছিল ৮৩,৫২৯ টাকা।[৭]

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানী সুনীতিদেবী যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন তা তার পরবর্তী বংশধর মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ও জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ক্রমশ উন্নতির পথে নিয়ে চলেন।

ইংরেজী সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩১ শে মার্চ এর ছাত্র সংখ্যা	ব্যয়		
			সরকার	ফিস এবং ফাইন	মোট ব্যয়
১৯১৩-১৯১৪	৩৯৮	১৪৮২৭	২৯৮৪৬ টাকা	৩৫৫৮৩ টাকা	৬৫,৭২৯ টাকা
১৯১৪-১৯১৫	৩৯৭	১৪৮৭৪	২৯৬২২ টাকা	৩৮৭৬০ টাকা	৬৮৩৮২ টাকা
১৯১৫-১৯১৬	৩৮২	১৪৩১৫	৩০৩৭২ টাকা	৪০১২২ টাকা	৭০৪৯৪ টাকা
১৯১৬-১৯১৭	৩৭৭	১৪৪২২	৩২৬৩০ টাকা	৪১৮৮৬ টাকা	৭৪৩৯১ টাকা
১৯৩৩-১৯৩৪	৩৪৫	১৩০১৪	৪২,৪১১ টাকা	৫০,৩২১ টাকা	৯২,৭৩২ টাকা
১৯৩৪-১৯৩৫	৩৭৪	১৪৫০৫	৪২,৬৫৩ টকা	৫২৬১০ টাকা	৯৫২৬৩ টাকা
১৯৩৫-১৯৩৬	৩৪৯	১৫৩৫৭	৪৩,৩৫৬ টাকা	৫৬,৬৪৮ টাকা	১০০০০৩ টাকা
১৯৩৬-১৯৩৭	৪১০	১৬৪০৮	৪৩,৬৯৫ টাকা	৫৯,৬৪৯ টাকা	১,০৩,৩৪৬ টাকা

জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের আমলে শিক্ষা ব্যপারে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কোচবিহারের স্টেট কাউন্সিল এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি "পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করা কিন্তু সেই কার্য অসমাপ্ত রয়ে যায়। ভারত স্বাধীন হল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে গেল। ১৯৫০ সালে কোচবিহার রাজ্য যোগ দিল ভারত ইউনিয়নে। তখন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের উপর।[৮]

দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থা ঃ—

উত্তর পূর্ব ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ। মহাভারতের কিরাত ভূমি ও জাতির উল্লেখ আছে। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মাণিক্যবংশের সূচনা এবং ভারত স্বাধীন হবার পরে সমাপ্তি। মাণিক্যবংশীয় রাজারা ইন্দোমঙ্গোলীয় বা কিরাত ও ভাষাগত দিক থেকে বড়ো জাতিভুক্ত তিপ্রা বা ত্রিপুরী জনজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃত।

মাণিক্যবংশের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ফা উপাধিধারী দলপতি। তারা পার্বত্য ত্রিপুরায় একটি রাজ্যের পত্তন করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জনজাতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, বাংলা দেশে তুর্কি আক্রমণে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ত্রিপুরার রাজারা সমতলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে সমতলের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে।

রাজন্যবর্গের অনুকুল সহায়তায় সমতলের বহুবাঙ্গালী ত্রিপুরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে (চাকলা ও রোশনাবাদ) জমিদারি ছিল। সে জমিদার হিসাবে ইংরেজ সরকারের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য ছিল।

যদিও রাজ্য পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে স্থাপিত তবুও দেখা যায় ১৯ শতকের শেষ ভাগে ত্রিপুরার রাজবংশের প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য। রাজত্ব কাল ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমসাময়িক। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি সবদিক থেকেই ত্রিপুরার আধুনিকীকরণের সূত্রপাত হয়েছিল বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে। উনবিংশ শতকের শেষে দেশীয় রাজ্যটি দ্রুত মধ্যযুগীয়তাকে অতিক্রম করে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত ভারতের সাথে ত্রিপুরার লোকগণনা শুরু হয়। এই সময়ে পোষ্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালায় ছাড়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ত্রিপুরার প্রথম হাইস্কুলটি স্থাপিত হয় ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে পরে সেটি উমাকান্ত একাডেমি নামে পরিচিত। বীরচন্দ্র মাণিক্যই প্রথম রাজ্যবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব সরকারীভাবে স্বীকার করেন যদিও তা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল।

পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য রাজ্যের আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও বাংলাদেশের বহু পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিককে বিভিন্ন ভাবে অর্থ সাহায্য দান করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। তিনি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেন ও আর্থিক সাহায়তা করেন। জগদীশ চন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় অর্থদান করেন। উচ্চশিক্ষাব জন্য রাধাকিশোর মাণিক্য আগরতলায় একটি অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে। এফ.এ.কলেজটির নিজস্ব ভবন না থাকায় উমাকান্ত বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন হতো। প্রথম সেশনে তিন জন এবং দ্বিতীয় সেশনে দুজন এখান থেকে এফ-এ-পাশ করেন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যক্ষের নিযুক্তকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন না পাওয়ায় কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক, ফলে পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ ত্রিপুরা থেকে শিক্ষার্থীরা ভীড় জমায়। ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়। কলেজে ছাত্রবেতন ধার্যকরা সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু হিন্দু রাজার পক্ষে শিক্ষা বিক্রয় সুপ্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বিরোধী। রাজা কলেজটি বন্ধ করে দেন।

আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কেবল মাত্র ছাত্রদের নয় শিক্ষকদেরও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাব্যবস্থা চালুকরার জন্য অর্থদান করেন।

পরিচালনার জন্য নায়েব, দারোগা তহশীলদারদের নির্দেশ দেন। তার আমলে পাঠশালা, মক্তব, কলেজ, আট্রেজিয়ান স্কুল, মেডিকেল ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মনিপুরিদের উৎসাহ দেখে তাদের জন্য বোর্ডিং স্থাপন করেন। তবুও দেখা যায়—শিক্ষার পরিচালনাগত ত্রুটি, বিভিন্নশ্রেণীর শিক্ষক ও পরিচালকদের বেতনহারের বৈষম্য সর্বোপরি দূর দূর পাহাড়ের (মুড়া) অনুন্নত রাজভক্ত শান্তিপ্রিয় প্রজাদের শিক্ষার প্রতি অনীহার ফলে শিক্ষাকে রাজ্যের সর্বস্তরের প্রজার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হননি। এর কারণ ছিল ত্রিপুরা রাজ্যটির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দূরদূর টিলা (মুড়া) বসবাসকারী প্রজার শিশুরাও ছিল শ্রমিক ও কৃষক। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের আয় নষ্ট করে শহরে শিখাতে পাঠায়নি,

নিম্নলিখিত সারণী থেকে বীরেন্দ্র কিশোরের রাজত্বকালের শিক্ষার চিত্র জানা যায়ঃ—

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা

ইংরাজি সাল	হাই ইংরেজী স্কুল	মিডল ইংরেজী স্কুল	মিডল বালিকা ইংরেজ স্কুল	উচ্চ ভার্নাকুলার স্কুল	নিম্ন ভার্নাকুলার স্কুল	পাঠ শালা	বেসরকারী পাঠশালা
১৯১২ খ্রিঃ	—	—	—	—	—	—	—
১৯১৭ খ্রিঃ	৩ ৬৮২০ ছাত্র	৪ ৪৬৫০	১ —	২ ১২৬০ছাত্র	— —	৮৯ ২৩৩৬০ছাত্র	১৩ বিদ্যালয় ২৬৪ ছাত্র
১৯২৩ খ্রিঃ	৫ ৬৮৭০	৫ ৫৪১০	১ ১৩০ছাত্র	১ ৪৫০ছাত্র	২৩ ১১৪৬০ছাত্র	১১৫ ২৭৪১০ছাত্র	১১ বিদ্যালয় ২০২ ছাত্র

শিক্ষাখাতে তার আমলে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মোট খরচ হয় ৬২,৮৬১ টাকা, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে মোট খরচ হয় ৯৮,১২২ টাকা, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মোট খরচ হয় ১,২৩,৮৬১ টাকা। এতে দেখা যায় যে রাজার শিক্ষার খরচ ক্রমশ বৃদ্ধি হয়।

গতিশীল আধুনিকতার এক স্বপ্নদ্রষ্টা ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তিনি ইউরোপ আমেরিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। "বিদ্যাপত্তন" নামে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলায় একটি গ্রামীণ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তার "বিদ্যাপত্তনের" কেন্দ্রে থাকবে একটি ডিগ্রি কলেজ, সে সঙ্গে মেডিকেল কলেজ, কৃষি, সঙ্গীত, চারুকলা, শারীরশিক্ষা ও কারিগরি প্রভৃতি কলেজ। এরজন্য থাকবে ছাত্রদের জন্য হাসপাতাল, রঙ্গমঞ্চ এবং রাজ্যের বিভিন্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য এগারোটি ছাত্রাবাস।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে "বিদ্যাপত্তনের" জন্য ২৩৪ একর জমি বরাদ্দ করা হল। মহারাজ

নিজে মুল দ্বিতল ভবনের নক্‌শা প্রস্তুত করেন। দুলাখ টাকা বিদ্যাপত্তনের পরিচালক কমিটির হাতে অর্পন করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। অসমাপ্ত রইল গৃহনির্মাণের কাজ। ভবনটির নীচের তলা যুদ্ধকালীন হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছাল। স্বাধীনতার তিন মাস পূর্বে মহারাজার মৃত্যু হল। কাজটি সফল হল না অবশ্য স্বাধীনতার পরে রিজেন্ট মাতা মহারানী কলেজটি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হন ও নিজ তহবিল থেকে কলেজ তৈরি খরচ দান করেন। শুরু হল "মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ"। তুলনা হিসাবে বলা যেতে পারে উভয় রাজ্য পঞ্চদশ শতকের স্থাপিত হলেও কোচবিহার রাজ্য ষোড়শ শতকে নরনারায়ণের আমলেই শিক্ষাসংস্কৃতির সৃষ্ট হয়। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরার কিন্তু অন্ধকার যুগের অবসান হয়নি। ঐ সময়ে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কিন্তু কোচবিহার রাজ্যটির শিক্ষার চরম উন্নতি হয়। অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কোচবিহার রাজ্যটিতে ১৮৮৮ খ্রিঃ একটি প্রথম শ্রেণীর মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেছে। এছাড়া প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বালিকা বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই। এতে বোঝা যায় প্রত্যন্ত অঞ্চল কোচবিহার রাজ্যটির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।[৯]

সূত্র-নির্দেশ

সাক্ষাৎকার ঃ— শ্রীমতী অরুণা রায় বর্মা, পত্নী—স্বর্গীয় হেমন্ত কুমার বর্মা, এম.এ,বি.এল, কোচবিহার রাজ্যের প্রাক্তন আহিলকর (এস ডি ও)

রাজা জগদ্দীপেন্দ্র ভূপবাহাদুরের সমবয়সী ছিলেন। "কোচবিহারের ইতিহাস" এর লেখক শ্রীমতী রায় বর্মার বয়স ৮৬। সাক্ষাতকার সময় বিকাল ৬ টা, তারিখ ডিসেম্বর ২০, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ, মেগাজিন রোড, কোচবিহার

১. হেমন্ত কুমার বায় বর্মা, *"কোচবিহারের ইতিহাস"* পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৩,১৩৪।
হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৫ " দ্য কোচবিহার স্টেট"
২. খা চৌধুরী আমানত উল্ল আহমেদ *"কোচবিহারের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২
তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩
তদেব, পৃষ্ঠা সংখা ১০৪-১০৫
তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩ এবং ১৫৬
হেমন্ত কুমার রায় বর্মা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১৪৪,৪৫
৩. *সমাচার দর্পন* পত্রিকা জানুয়ারী ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যা
৪. *"কোচবিহার হিতৈষিণীসভা"* বক্তৃতামালা বক্তৃতা ৯ম সংখ্যা, বক্তা রামচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদনায় নৃপেন্দ্র নাথ পাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৪, তাদের বক্তৃতা তৃতীয় সংখ্যা বক্তা-শ্রী ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠাসংখ্যা-৬৪, সম্পাদনায় নৃপেন্দ্র নাথ পাল।
৫. কোচবিহার হিতৈষিণী সভার বক্তৃতামালা, ৯ম সংখ্যা, বক্তা রামচন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪
৬. হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, "দ্য কোচবিহার স্টেট" পৃষ্ঠাসংখ্যা-৩১৮, কোচবিহার পরিক্রমা,

"শিক্ষার একাল সেকাল" কৃষ্ণেন্দু দে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪,৪৫, ডাব্লু ডাব্লু হান্টার "দ্য স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল" ভলিউম ৭ম, তদেব, ভলিউম ৮ম, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৩৭, ৪৩১, ১১০, ১১১, ১১৫

৭. *"দ্য কোচবিহার স্টেট"* হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৩২০-২৪, কোচবিহার পরিক্রমা কৃষ্ণেন্দু দে "শিক্ষার একাল সেকাল" পৃষ্ঠাসংখ্যা-৪৭-৪৮।
অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এডুকেশন অধ্যায় বছর—১৮৮০-৮১,১৮৮২-৮৩, ১৮৮৩-৮৪, ১৮৮৪-৮৫, (কোচবিহার স্টেট)

৮. এনুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোচবিহার স্টেট শিক্ষা বিষয়ক অধ্যায়, ইংরাজী সাল ১৯১৩-১৪, ১৯১৪-১৫, ১৯১৫ ১৬, ১৯১৬ ১৭, ১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬, ১৯৩৬-৩৭।
কোচবিহার পরিক্রমা *"শিক্ষার একাল সেকাল"* কৃষ্ণেন্দু দে, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০

৯. *স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অব হিল* ত্রিপুরা ডাব্লু ডাব্লু হান্টার, পৃষ্ঠাসংখ্যা-৫১৮
বিতর্কিত গ্রন্থ সমালোচনা পত্রিকা, আশ্বিন ১৪০৫ 'প্রসঙ্গ শিক্ষা' পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৬০,৬৬২-৬৬৩, লেখিকা চম্পা দাশগুপ্ত "পঞ্চাশের দর্পনে"
প্রোসিডিংস অব নর্থ ইষ্ট-ইন্ডিয়া হিসটরি এ্যাসোসিয়েশন ৭ম সেশন
পশিঘাট, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, লেখক দীপক কুমার চৌধুরী, "ত্রিপুরা ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ" পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০০, ৪০২
আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ "বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ১৯০৯-১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ, লেখক ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩-২৬।

জনসংস্কৃতিতে নদী ঃ প্রসঙ্গ দামোদর

পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায়

ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকলেও ভূগোলকে ইতিহাসের অঙ্গণে পরিবেশনের প্রথম প্রয়াস সম্ভবত লক্ষ্য করা যায় ফরাসী আনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের রচনায়।[১] তবে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও এই প্রয়াস একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না।[২] একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি যে সেই অঞ্চলের মানুষের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা নদীমাতৃক দেশ । নদীকে কেন্দ্র করেই বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল।[৩] নদী যে মানবসভ্যতার স্নায়ুকেন্দ্র তা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। আদিম মানব সভ্যতার-উষালগ্নে আদিম মানব পর্বত নির্গত জলের উৎসের অদূরে, পর্বত গুহায় বসতি স্থাপন করেছিল। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন বাসস্থানের আশায় ঐ জলের উৎস ধরেই নেমে এসেছিল সমতল ভূমিতে। সেখানে ঐ জল-উৎসধারাকে দেখেছিল নদীরূপে। কৃষির প্রয়োজনে আর সুনির্মল নদীজলের আকর্ষণে। নদ-নদীর তীরে গড়ে তুলেছিল জনবসতি। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে নদীর এই যোগাযোগ কৃষিনির্ভর মানবসভ্যতার পত্তন করেছিল। এই উৎপাদনব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে জনসংস্কৃতি। নদীব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদনব্যবস্থার যে বিবর্তন ঘটে তা জনসংস্কৃতির ধারারও বিবর্তন ঘটায়। নদীকে আশ্রয় করে নদীর উভয় তীরে যে জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে তাদের অর্থনৈতিক জীবনেই শুধু নয়, তাদের চিন্তা ও চেতনায় নদী যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কারণ নদী এক চলমান জীবনের প্রতীক। নদীর সাথেই গড়ে ওঠে মানুষের সখ্যতা, সুখ দুঃখের বারমাস্যা। তাই মানুষের কাছে নদী হয়ে ওঠে কখনো বা জননী, কখনো বা রাক্ষসী, কীর্তিনাশা। নদীকে কেন্দ্র করেই যুগ যুগ ধরে রচিত হয় অসংখ্য শ্লোক, গাথা-কাহিনী।

বাংলার জনজীবনের উপর নদনদীর প্রভাব নিয়ে যে সকল আলোচনা আমরা সাধারণত পাই তা মূলত সরকারী প্রতিবেদন, ভূতত্ত্ববিদ্ ও নদী বিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে।[৪] কিন্তু এই সকল আলোচনায় ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার ইতিহাসের উপর নদনদীর প্রভাব নিয়ে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।[৫] গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনকে অস্বীকার করে মানুষের হস্তক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতি নদী ও মানুষের মৌলিক সম্পর্ককে যে কতটা প্রভাবিত করে তা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। এরপরেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা

পাই নীহাররঞ্জন রায়[৬] ও পরবর্তীকালে কপিল ভট্টাচার্যের সুচিন্তিত রচনাবলীতে।[৭] এছাড়াও সাম্প্রতিককালে সুনীল কুমার মুন্সী এ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন।[৮]

বর্তমান প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ঔপনিবেশিক যুগে উচ্চ দামোদরের উভয় তীরে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের সংস্কৃতি কিভাবে দামোদরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তবে এই আলোচনার পূর্বে দামোদর নদীব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

দামোদর নদীব্যবস্থা

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ মূলত গড়ে উঠেছে গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা-মেঘনাকে কেন্দ্র করে। এই মূল নদীগুলি ছাড়াও এগুলিরই অসংখ্য উপনদী। শাখানদী বাংলায় অসংখ্য জাল বিস্তার করেছে। বাংলার ভূমিরূপ গঠনে এই নদীগুলির গুরুত্ব কম নয়। দামোদর এরকমই ভাগীরথীর একটি অন্যতম উপনদী। এ প্রসঙ্গে কপিল ভট্টাচার্য বলেছেন যে ভাগীরথী-হুগলীর পর বাংলার পশ্চিমাংশে দামোদরের স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৯] কারণ রাঢ় বঙ্গের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দামোদর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বিহারের পালামৌ জেলার খামারপাট পাহাড় থেকে বৃষ্টির জলে জন্ম দামোদরের। দামোদর তার ৩৭০ মাইল দীর্ঘ প্রবাহে বিহার ও বাংলার এক বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই অঞ্চলের ভূমিরূপ ও গাঙ্গের ব-দ্বীপ গঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই দীর্ঘ প্রবাহের মধ্যে উচ্চ দামোদর উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়ার কিয়দংশ ও বিহারের হাজারীবাগ, গিরিডি, ধানবাদ, রাঁচী, সাঁওতাল পরগণা ও পালামৌ।

উচ্চ দামোদরের তীরে জনবসতির বিস্তার

নদীজ সম্পদের আকর্ষণেই যে সুদূর অতীতকাল থেকেই উচ্চ দামোদরের উভয় তীরে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত।[১০] প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে এ অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল দামোদরকে কেন্দ্র করেই। এই নদীতীরে গড়ে ওঠা জনসংস্কৃতির মূল স্থপতি ছিল। হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। এই অঞ্চলের জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে এরা যে একটি অন্যতম অংশ তা নিম্নের তালিকাটি থেকেই স্পষ্ট হয়।

উচ্চ দামোদর উপত্যকার সাঁওতাল পরগণায় জনবিন্যাসের রূপরেখা

(১৯০১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী)

মোট জনসংখ্যা-১,৮০৯,৭৩৭ জন

	জনসংখ্যা	আনুপাতিক হার
উচ্চবর্ণের হিন্দুজাতি	৮৯,৪৮০	৫ %
আহির, গোয়ালা, কাহার, কুর্মী প্রভৃতি কৃষিজীবী শ্রেণী	১৮৩,৪২০	১০ ১ %
ব্যবসায়ী, মহাজন শ্রেণী	২৩৩,৪৬৯	১২·৯ %

সাঁওতাল, ওঁরাও, পাহাড়িয়া প্রভৃতি আদিম অধিবাসী	৭৪৮,৭৭১	৪১.৩ %
মুসলিম সম্প্রদায়	১৫১,৯৯৩	৮.৩ %

উৎস ঃ- এল.এস.এস.ও.ম্যালি, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : সাঁওতাল পরগণা, ১৯১০ প্রথম পুনর্মুদ্রন, ১৯৯৯, পৃ : ৮৪

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে বিস্তৃত বনভূমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল এরাই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অঞ্চলে কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি ভারী শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল দামোদরের জল, খনিজ সম্পদ ও এই সকল উপজাতিগোষ্ঠীর শ্রম সম্পদকে কেন্দ্র করেই। অর্থনীতির এই পরিবর্তন যে সাবেকী সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এনেছিল তা আদমসুমারীর রিপোর্টগুলিতেই স্পষ্ট ধরা পড়ে।[১১] একদা উপজাতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক নেতৃত্ব কিভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে চলে যায় তাও উক্ত আদমসুমারীর রিপোর্টে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২] এর ফলে দেখা দেয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বের পরিণতিই হল উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন। আর এই প্রতিরোধ আন্দোলনে মূল প্রতীকের ভূমিকা নিয়েছিল দামোদর।

উচ্চ দামোদর উপত্যকার জনসংস্কৃতিতে দামোদর

উচ্চ দামোদর উপত্যকার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনেও এক ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রবাহ আলোচ্য সময়কালে লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি প্রান্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যা তাদের মধ্যে একটি পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তা ও চেতনাবোধ গড়ে তোলে। যদিও এই প্রান্তিক সংস্কৃতিরই পাশাপাশি বর্ণ সংস্কৃতিরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বর্ণ সংস্কৃতি যে প্রান্তিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেনি তা নয়, এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু দেবদেবীর প্রত্ন তাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেই সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের প্রমাণ মেলে।[১৩] ঔপনিবেশিক যুগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভূত ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থা, শিল্প অর্থনীতি ও নগরায়ণ এবং ঔপনিবেশিব স্বার্থে খ্রিষ্টান মিশনারীদের আধুনিক শিক্ষার প্রসার এই অঞ্চলে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। উচ্চ দামোদর উপত্যাকায় এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতায়ণ—উভয় ক্ষেত্রেই দামোদর যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তা তাদের লোক সংস্কৃতি, অতিকথা, গান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

গঙ্গা যেমন দেবনদী, দামোদরও তেমনি সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের কাছে দেওনদ। দামোদর নামের মধ্যেই আদিবাসী সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে। বিহারের আদিম অধিবাসীদের দেওয়া 'দা-মুণ্ডা' নামটি থেকে প্রথমে 'দামুদা' ও পরে দামোদর নামের উৎপত্তি। 'দা-মুণ্ডা' মানে মুণ্ডাদের জল।[১৪] আদিবাসী লোককথায় তাদের পিতৃভূমি ছিল দামোদর ও কাঁসাইয়ের মধ্যবর্তী এলাকায়। দামোদরকে তারা বলত সমুদ্র। এই দামোদরকে ঘিরেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন লোকাচার ও লোকসংস্কার গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে দামোদর এতই পবিত্র যে মৃত ব্যক্তির অস্থি তারা দামোদরেই বিসর্জন দেয়।[১৫] তাদের মৃতদেহ সৎসারের আদর্শ স্থান হল দামোদর তীরবর্তী শ্মশানঘাটগুলি।[১৬] সাঁওতালদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'তেলমাহান' (ছোট শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান) ও 'ভান্ডানতেৎ' (বড় শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান) এর সাথেও দামোদর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।[১৭] দামোদর নিয়ে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিথও রয়েছে। দামোদর যেন এক রূপকথা। লোকে বলে কংসাবতী ছিল সমুদ্রের বাগদত্তা। কৃষ্ণ দামোদর নদের রূপ ধারণ করে তাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন। সে আলিঙ্গন এড়াতে কংসাবতী তাড়াহুড়ো করে আগেই সমুদ্রসঙ্গমে মিলিত হয়েছিল।[১৮] উপজাতি সমাজের সাংস্কৃতায়নের প্রতীকও যে দামোদর, তা প্রমাণিত হয় এই উপকথা ও রাজারাপ্পা অঞ্চলে দামোদরের তীরে ছিন্নমস্তার মন্দিরে তাদের জনসংস্কৃতির অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। তবে এই সাংস্কৃতায়ন যে সুদূর অতীতকাল থেকেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে দামোদর তীরবর্তী জৈন তীর্থস্থানগুলির অবস্থান থেকে। দামোদর তীরবর্তী তেলকূপি ও বুধপুরে জৈন সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল।[১৯]

জৈন, বৌদ্ধ,, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ্য ও খ্রিষ্টান ধর্মের মাধ্যমে দামোদর উপত্যকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনে বহিঃসংস্কৃতির আগমন ঘটলেও প্রান্তিক সংস্কৃতির নিজস্ব ধারাকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল গান, উৎসবের মধ্যে দিয়ে। আর এক্ষত্রেও দামোদর যে মূল ভূমিকা নিয়েছিল তা প্রমাণিত হয় অসংখ্য ঝুমুর, টুসু গানে দামোদরের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে। যেমন দুটি ঝুমুর গান—

"ঝিমিক ঝিমিক জলে
চিতা মাটি গলে
আমি ছলকে গেলিগো
আমি পিছলে হলিগো
আমি দামোদরে"।[২০]

"ছেল্যায় খুঁজে মাছ মাছ কুথায় পাব মাগুর মাছ
দাজং দেখে ঝাঁপ দিব দামোদরে হে।"[২১]

এছাড়াও উপজাতি সম্প্রদায়ের উৎসব পূজা পার্বণের সাথেও দামোদর ছিল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ইঁদ উৎসবে করম গোঁসাইকে মুণ্ডা, মাহাতো, ভূমিজ, লোধা, শবর গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতিরা দামোদরের জলেই বিসর্জন দেয়।[২২]

এর পাশাপাশি ভাদু, টুসু, মকর উৎসবেও দামোদরের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি

উচ্চ দামোদর উপত্যকার জনসংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দামোদর যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তা পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির চাপে চিরাচরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যা উপজাতি জনসমাজের পক্ষে শুভ হয়নি। ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে ভূমিপুত্রদের অধিকারচ্যুত করে বহিরাগত 'দিকু'দের এই অঞ্চলে আধিপত্যলাভ সূচনা করেছিল এক সাংস্কৃতিক সংকটের। উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে করে তুলেছিল বিপন্ন। ব্রিটিশ কোম্পানীর স্বার্থে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর এক ব্যাপক অংশের চুক্তি শ্রমিকে যোগদান সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত করে।[২৩] উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঔপনিবেশিক শাসকদের উচ্চদামোদর উপত্যকায় দ্রুত নগরায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজীকরণ কারণ, ব্যাপক বনচ্ছেদন, জঙ্গল আইন (১৮৮০), বৃহৎ নদী বাঁধের পরিকল্পনা এই অঞ্চলে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টিই করেনি, ব্যাপক অংশের জনগোষ্ঠীকে করেছিল ভূমিচ্যুত ও দামোদর থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা দামোদর তীরবর্তী জনসমাজের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র অসন্তোষ যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সংগঠিত বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর এই আন্দোলন, সন্দেহ নেই। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতিধারাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য-মরিস আইমার্ড ও হরবংশ মুখিয়া (সম্পাদিত), *ফ্রেঞ্চ স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি* (প্রথম খন্ড) দি ইনহেরিটেন্স, ওরিয়েন্ট লংম্যান, নিউদিল্লী, ১৯৮৮।

২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য রাধাকমল মুখার্জী, *দি চেঞ্জিং ফেস অব বেঙ্গল : এ স্টাডি ইন রিভারাইন ইকনমি,* ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা, ১৯৩৮;
নীহাররঞ্জন রায়, *বাংলার নদনদী,* বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা ১৩৫৪; কপিল ভট্টাচার্য্য, *বাংলা দেশের নদনদী ও পরিকল্পনা,* কলিকাতা, ১৯৫৪; রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *দি ভেদিক এজ,* ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৯৬; সুনীল কুমার মুন্সী, *জিওগ্রাফি অব ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া আণ্ডার দ্য ব্রিটিশ রাজ,* কলিকাতা, ১৯৮০; ইরফান হাবিব, *অ্যাটলাস ইন মুঘল এম্পায়ার,* নিউদিল্লী, ১৯৮৬; অমিতা বাভিসকার, *ইন দ্য বেলি অফ দ্য রিভার,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী, ১৯৯৫।

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ,* পৃ : ৫

৪. এ প্রসঙ্গে রিভার্স অব বেঙ্গল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স,*

কলিকাতা, ২০০১; রিভার্স অব বেঙ্গল (তৃতীয় খণ্ড), ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলিকাতা, ২০০২।

৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্য রাধাকমল মুখার্জী, *পূর্বোক্ত* গ্রন্থ।

৬. বিস্তৃত আলোচনার জন্য নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত* গ্রন্থ।

৭. বিস্তৃত আলোচনার জন্য কপিল ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত* গ্রন্থ।

৮. সুনীল কুমার মুন্সী, *নদী তুমি কার?* সুশোভন চন্দ্র সরকার, স্মারক বক্তৃতা ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ : ১-১৬।

৯. কপিল ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত* গ্রন্থ, পৃ : ৬৯।

১০ ডঃ অমিত রায়ের প্রবন্ধ *"অ্যান্টিকুয়িটি অফ দামোদর ভ্যালি"* প্রকাশিত দামোদর ভ্যালি ঃ *ইভোল্যুশন অফ গ্র্যান্ড ডিজাইন,* দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ পৃ : ২৭ ৫৬।

১১. সেন্সাস রিপোর্ট ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১ ও ১৯৩১।

১২ তদেব।

১৩. ডঃ সরজিৎ দত্তের প্রবন্ধ *"টেক্সচার অফ দ্য রুট কালচার"* প্রকাশিত দামোদর ভ্যালি ঃ *ইভোল্যুশন অফ গ্র্যান্ড ডিজাইন,* দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, কলিকাতা, ১৯৯২ পৃ পৃ : ১৭৯-১৯৪।

১৪. অশোককুমার বসু, *পশ্চিমবঙ্গের নদনদী,* কলিকাতা, ২০০২, পৃ : ৪০।

১৫. সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৫১, বাঁকুড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, পৃ : CLxxiii

১৬. তদেব, ঘাটগুলি হল 'গাই' ঘাট, 'তিরিও' ঘাট, 'তেলকুপি বারনি' ঘাট, 'হাতকুন্ডা বান্দা' ঘাট, 'হাড়াভাঙ্গা' ঘাট ও 'জমালিয়া' ঘাট।

১৭. তদেব।

১৮. নমিতা মন্ডলের প্রবন্ধ *'জলাশয়, দীঘি, বাঁধ, জল ও নারী সমাজ'* প্রকাশিত লোক, বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা, কলিকাতা, ২০০৩ পৃ পৃ : ৩৭৬-৩৮৭।

১৯. এইচ কুপল্যান্ড, মানভূম, *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স,* ১৯১১, পৃ : ২৮৯।

২০. এই ঝুমুর গানটি বিশিষ্ট গবেষক ডঃ পশুপতিপ্রসাদ মাহাতোর নিকট থেকে সংগৃহীত।

২১. সুধীর কুমার করণ, *সীমান্ত বাংলার লোকযান.* কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ : ৩৩০।

২২. তদেব, পৃ : ১৩০।

২৩. ড. সরজিৎ দত্তের *পূর্বোক্ত* প্রবন্ধ ,পৃ পৃ : ১৭৯-১৯৪।

এই প্রবন্ধটি লিখতে বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য জুগিয়ে ডঃসুভাষচন্দ্র সেন ও ডঃ পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ধর্মান্তরের বিপদ ঃ সাঁওতাল প্রেক্ষাপটে

তিতাস চক্রবর্তী

২২ শে আগস্ট ২০০২, মালদা জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম একলাশপুরে সাত সদস্যের একটি সাঁওতাল পরিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে ধর্মান্তরিত হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংবাদ মধ্যমে শুরু হয় হৈচৈ। আমিও ছুটে যাই এই গ্রামে। তা ছাড়াও ঘুরে দেখি খড়িবারি, রহুতারা, ওলাকান্ড।

দুঃখের বিষয় ধর্মের স্বতন্ত্র্যবোধ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগে গেছে। এদিকে ধর্মান্তর একটু একটু করে নষ্ট করে চলেছে আদিমকাল থেকে চলে আসা আদিবাসীদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি নীতি।[১] সাঁওতাল পরিবারটির ধর্মান্তরকে ভিত্তি করে আমি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি এর পদ্ধতি , বার বার সফল হওয়ার কারণ, ও এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা।

একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মান্তর বড়জোর এই ছঁকে-বাঁধা পৃথিবীতে পরিচয়-ধন্ধ ঘটাতে পারে। কিন্তু আদিবাসী সমাজে ধর্মান্তর বা সমাজের প্রান্তিক মানুষের ধর্মান্তর রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের প্রতিফলন। খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রায় দু'শ বছর ধরে এই ধর্মনীতি পালন করেছে আর এখন গেরুয়া করণের রাজনীতির জোয়ারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খ্রিষ্টান মিশনারিদের পথ বেছে নিয়েছে।

প্রথমে দেখা যাক সাঁওতালদের প্রকৃত ধর্ম কেমন?

সাঁওতালদের 'সান্না ধর্ম' মূলত animistic। একটি অলোক শক্তি বা সব কিছুর উৎস, সাঁওতাল ধর্মচিন্তার মূলে। এর নাম বোঙ্গা, বুড়ো কোলিয়ান গুরুর[২] গল্প থেকে সাঁওতালদের বিশ্ব দর্শন বা জীবন দর্শন জানতে পারি—ঠাকুর জিঁউ একটা কচ্ছপের পিছনে পৃথিবী তৈরীর নির্দেশ দেন। আর কেঁচো রোজ মাটি খুঁড়ে এনে তৈরী করে পৃথিবী। এই সদ্য তৈরী করা পৃথিবীর উপর, দুটি রাজহাঁস (হাঁস-হাঁসিল) দুটো ডিম পাড়ে। এই দুটি ডিম ফুটে বেড়োয় প্রথম মানব, মানবী—পিলচু হারাম। পিলচু বুধি—সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ। ঠাকুর জিঁউ এদের নিয়ে আসে সমস্ত সাঁওতাল জাতির আদি ভূমি, হিহিরি পিপরিতে। এখান থেকে আস্তে আস্তে তারা ছড়িয়ে পড়ে খোঁজ খামান, হরতা, শশানবেদা, কাম্পায়, একজন বহিরাগত (ডিকো) সাঁওতাল মেয়েদের অপহরণের ভয় দেখায়। অপহরণকারীর লালসা থেকে বাঁচতে তারা রাজমহল পাহাড় অতিক্রম করে। সাঁওতালদের ধারণা এই পাহাড়ই তাদের প্রাণ বাঁচাল, মেয়েদের সম্মান রক্ষা করল। তাই রাজমহল পাহাড় সাঁওতালদের কাছে ঈশ্বর। মারানবুরুর (অর্থাৎ বিশাল পর্বত) শক্তি এই রাজমহল পাহাড়ে প্রকাশ পায়। ১৮৩০ প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের

পর দাক্ষিণ-ই-খোহ্ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একত্রিত করে তৈরী করা হয় সাঁওতাল পরগনা।[৩] সিন্ বোঙ্গার (সূর্য দেবতা) আশীর্বাদে সাঁওতাল অঞ্চলে ভাল ফসল হয়। আর মারনাবুরু তাদের সমস্ত বিপদে আপদে পথ দেখায়। এভাবেই শুরু হয় সাঁওতাল ধর্মের পথ চলা।

প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্মের সংস্পর্শে এসে তাদের ধর্মের ছোট খাটো কিছু পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে ১৯ শতকের গোড়ায় যখন তারা খ্রিষ্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে আসে এবং ১৯ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে যখন খ্রিষ্টান মিশনারিরা ধর্মান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৪] এখানে একটা নথিভুক্ত ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। ১৯৫৬ সালে মালদা জেলার রাহুতারা ক্যাথলিক মিশনের বিশপ ফাদার এম.ক্যারারো একটি সাঁওতাল পরিবারকে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তর করবার চেষ্টা করেন। পরে পরিবারটি পিছিয়ে এলে, তিনি তাদের মারধোর করেন। দায়রা আদালতে তাকে দু'মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপিল করলে তার শাস্তি মকুব হয়। কিন্তু তাকে ধর্ম অধ্যক্ষের পথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরের পদ্ধতিটা কি? তারা সাঁওতালদের নানা রকমের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য কিছু জিনিস যেমন জামাকাপড়, ওষুধ, টাকা, এসবের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে চার্চে। একলাশপুর গ্রামে কুষ্ঠরোগ বিভাগে সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী, সেবেস্তিয়ান হেমব্রম বলছেন। সমস্ত রকমের দাতব্য কাজ চার্চে করা হয়। কিন্তু তার আগে চার্চের সন্ন্যাসীনীরা (nun) বুঝিয়ে শুনিয়ে সাঁওতালদের নিয়ে আসে চার্চে। সেবার সাথে সাথে বলা হয় ধর্মের মাহাত্ত্বের কথা, বলা হয় পাকাপাকিভাবে খ্রিষ্টান হয়ে গেলে এই সুযোগসুবিধা তারা আজীবন পেতে পারবে। কিছুক্ষণ গ্রামে ঘোরবার পর দেখতে পেলাম সাঁওতালরা একটা সমাধি পুজো করছে। জানতে পারলাম সমাধিটি হেমব্রম বাবুর স্বর্গীয় পিতার মধ্যেও নাকি বোঙ্গার অবস্থান।

সাঁওতাল সমাজের সঙ্ঘবদ্ধতা কিছুটা নষ্ট হলেও এখনও তা প্রায় আগের মতন আছে। একজন সাঁওতাল কখনওই কোন অপরিচিত বা তার সমাজের বাইরের লোক, ডিকোর কথা মেনে নেয় না। যতক্ষণ না তার নিজের গোষ্ঠি সদস্য তাকে তা বুঝিয়ে বলে। ধর্ম সংগঠনগুলি এটা বুঝতে পেরে সাঁওতালদের মধ্য থেকে কিছু এজেন্ট তৈরী করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সব কিছুটা লেখাপড়া জানা বেকার সাঁওতাল। এভাবে কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত হয়।

ধর্মান্তর হওয়ার কিছু শর্ত আছে। একজন খ্রিষ্টানকেই বিয়ে করতে হবে ধর্মান্তরিত সাঁওতালকে। আর তার সন্তানদের খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত (baptize) করতে হবে। রাহুতারা ক্যাথলিক মিশনের ফাদার ভারগিসির মতে খ্রিষ্টান ধর্ম 'জংলী' সাঁওতালদের সভ্য সমাজের আদব কায়দা শিখিয়ে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই ধারণা বহুকাল থেকে

চলে আসা সাঁওতাল সংস্কৃতির গোড়ায় আঘাত করেছে। সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতির বদলে আসছে ইউরোপীয় আদব কায়দা। বিয়ের উৎসবের প্রধান পর্বটি এখন চার্চে সম্পন্ন হয়। এর ফলে সাঁওতাল সমাজের একটা অংশে জাত্যভিমান সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আদিমকাল থেকে চলে আসা ভিন্ন গোত্রে বিবাহের নিয়ম এখনও মানা হয়। খ্রিষ্টান পরিবারটিকে চার্চ নানাভাবে অন্যান্য পরিবার থেকে আলাদা করবার চেষ্টা করেছে। খ্রিষ্টান ঘরগুলিতে বড় সড় ক্রস এঁকে। খোদাই করে বা চালার মাথায় বসিয়ে দিয়ে তাদের আলাদা করে দেখান হয়। এখন আবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকলাপের কারণে ধর্ম নিয়ে সাঁওতালদের মধ্যে আলাপ আলোচনা অনেকটাই কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বহুকাল ধরে চলে আসা সাঁওতাল জাতির সম্প্রীতি অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

একলাশপুরের মোড়ল। জগন্নাথ মাড্ডি দুঃখ করে বলেন। 'গরিবের কোন ধর্ম হয় না' যেখানে যেমন প্রলোভন দেখান হয়েছে, সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সাঁওতালরা। তাই তারা একবার খ্রিষ্টান তো একবার হিন্দু। তবুও আজ রাহুতারার সরকার কিস্কু কিংবা খড়িবাড়ির এলবার্ট হাঁসদার একটাই অভিযোগ-ধর্মান্তরের পর সব সুবিধা বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যিই, উন্নত জীবনের রঙবেরঙের প্রতিশ্রুতিগুলো ভুলতে বেশী সময় লাগে না খ্রিস্টান মিশনারিদের, আর তার জন্যই জমছে ক্ষোভ।

এরকম অবস্থায় বিশ্বহিন্দু পরিষদ কাজে লাগিয়েছে সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে জমতে থাকা ক্ষোভ ও হতাশাকে। মালদা জেলার সাংগঠনিক সভাপতি কিশোর দাস আক্ষেপ করে বলেন, খ্রিষ্টান মিশনারিদের মতন আর্থিক সংহতি তাদের নেই। কথাটা অনেকটাই সত্যি। আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকায় বিশাল জায়গা নিয়ে তৈবী খ্রিষ্টান মিশন ও তার সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এর প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ভি.এইচ.পি একটা ভিন্ন পথ নিয়েছে। হতাশা গ্রস্ত সাঁওতালদের তারা বোঝাচ্ছে যে তাদের আদি ধর্ম প্রকৃতার্থে হিন্দু ধর্ম। তাই মারানবুরুকে বলা হচ্ছে শিবের আরেক রূপ। বাদনা বা জাম্থার আসলে নবান্ন আর বাহা হোলির অন্য নাম। তারা লোভের বশে পরে ধর্ম খুইয়েছে। এখন তাদের উচিত পুরোন ধর্মে ফিরে আসা। এরপরে বোঝানর কাজ আবার সেই এজেন্টের হাতে। এরকমই একজন এজেন্ট সরকার হেমব্রম, ভি.এইচ.পির সর্বক্ষণের কর্মী বলছেন, সাঁওতালদের রাজি করান মুশকিল। ইতিমধ্যে শহরে তৈরি হচ্ছে ফটো সহ প্রমাণপত্র (photo affidavit)। অক্ষরজ্ঞানশূন্য সাঁওতালকে নিয়ে গিয়ে আঙুলের ছাপ নিয়ে নেওয়া হয়। মালদা জেলা ভি.এইচ.পি-এর প্রাক্তন সভাপতি, এডভোকেট বিমলেন্দু সরকার বলছেন যে পার্টির সৌজন্যে এরকম অনেক প্রমাণ পত্র (affidavit) বানাতে হচ্ছে তাকে। কাগজপত্রে ব্যাপার বুঝে শুনে নেওয়ার পর কোন একটি শুভ দিনে, কোন হিন্দু আশ্রমে শুদ্ধিযজ্ঞের দ্বারা ধর্মান্তরের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সাথে থাকে একটা ছোট খাটো ভোজ ও বস্ত্রবিতরণী অনুষ্ঠান। সাঁওতালদের কাছে এই উৎসব 'পরাবর্তন' নামে পরিচিত।

সাঁওতাল গ্রামগুলিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কী পদ্ধতিতে ঢুকেছে? গ্রামে গ্রামে তারা একটিকরে এক-শিক্ষক স্কুল চালু করেছে। এদের নাম একল বিদ্যালয়। যেসব জায়গায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বা অনেক দূরে আছে। সেই অঞ্চলে এই বিদ্যালয়গুলি কার্যকর হয়েছে। এই সব স্কুলে কচি কাঁচাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে গীতা, রামায়ণ, বা মহাভারতের কথা। তবে এর মধ্যেও একটা শাপে বর হওয়ার মতন ব্যাপার হয়েছে। ডাইনী হত্যার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়গুলি নানাভাবে স্থানীয় মানুষদের সচেতন করবার চেষ্টা করছে। তাদের বক্তব্য যে খ্রিষ্টান মিশনারিরা ডাইনী হত্যার ক্ষেত্রে কোন কার্যকর ভূমিকা নেয়নি বা এর কোন প্রতিকার করেনি। কথাটা ভেবে দেখতে গেলে সঠিক।

যাই হোক, গরীব সাঁওতালদের জীবনে কোন উন্নতির আলো দেখা দেয়নি। কিশোর দাসের কথায় ভি.এইচ.পি সাঁওতালদের 'নৈতিক' দিক রক্ষা করছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন মানের কোন পরিবর্তন হয়নি, কিংবা অন্য হিন্দু প্রতিবেশীদের মত বর্ণানুক্রমে তারা কোন স্থান পায়নি।

সরকারের কাছে ধর্মান্তরের বিষয়-এ কোন তথ্য নেই। জেলা শাসক অশোক কুমার বালার মতে, জোর করে ধর্মান্তরের নালিশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা অসহায়। তাই তাঁর যত রাগ সংবাদ মাধ্যমের উপর।

এবার ধর্মান্তরের কারণে আসা যাক। মালদা জেলার বারেন্দ্র অঞ্চলে সাঁওতালদের বসবাস। এদের গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে আশে পাশে ছড়িছে ছিটিয়ে আছে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, কাপালিকদের বসতি। বেশীরভাগ সাঁওতাল কৃষিশ্রমিক। কারও কারও জমির মালিকানা আছে। কিন্তু অর্থের অভাবে এমনকি চাষের বীজও কিনতে পারে না। তাই নিজের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। নমঃশূদ্রদের জমিতে পরিশ্রমের বিনিময়-এ তারা বীজধান ও সার পায়, কিংবা ভাগ চাষ করে আবাদের পর উৎপাদিত শষ্যের দশভাগের মাত্র দুভাগ তাদের বরাদ্ধ। সাঁওতালদের নিজস্ব জমিতে শুধু একবার ফসল উৎপন্ন হয়। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অধীনে তাদের বাড়তি রোজগারের সুযোগ নেই কারণ উন্নয়ন মূলক কোন পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায় না।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভ্য সংখ্যা সীমিত থাকবার ফলে, তাদের দাবি গ্রাম সংসদ পর্যন্ত পৌছাঁয় না, পাঁচটা গ্রামে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম। কেবল দুটিতে একটি করে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে। জলস্তর মাটির অনেক নীচে থাকার ফলে বৈদ্যুতিক পাম্প ছাড়া কোন গতি নেই। কাজেই হাতে খোঁড়া কুঁয়ো ওপুকুর তাদের একমাত্র ভরসা। জলের দুর্গতির কারণে এত জলবাহিত রোগের শিকার হচ্ছে তারা।

এই পরিস্থিতিতে সাঁওতালরা বিভিন্ন কুসংস্কারে আত্মসমর্পণ করছে। ডাইনী হত্যা এরকমই একটা কুসংস্কারের পরিণতি। কোন এক মোহময়ী নারী, যার কারণে গ্রামে ব্যাখ্যাতীত মৃত্যু ঘটে, তাকে বলে ডাইনী। এমনিতে ডাইনী অবশ্য যে কেউ হতে

পারে। সুন্দর অসুন্দর। নারী কিংবা পুরুষ।[৫] চিকিৎসার অভাবে, কোন রোগেভোগে ওঝা ও শেষমেশ যানগুরুর শরণাপন্ন হতে হয় সাঁওতালদের রোগীর গ্রামের কিছু লোক, রোগীকে না নিয়ে যানগুরুর কাছে যায়। এই যানগুরুর যোগসাজশ অদ্ভুত। নিজের অলৌকিক শক্তির দ্বারা সে বলে দেবে কে রোগী এবং এরজন্য ডাইনীই বা কে। ডাইনীর পরিবারকে একটা মোটা টাকা জরিমানা দিতে হয়। এর একটা অংশ যায় যানগুরুর কাছে আর বাকিটা নাচগান খানা পিনায় ব্যয় করা হয়। তারপর প্রয়োজন বুঝে ডাইনী মেরে ফেলা হয়। অসুস্থকে কিংবা কাকেই বা ডাইনীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবে যানগুরু সব ঠিক করে এজেন্টের মাধ্যমে। এই এজেন্ট রোগীর গ্রামের কোন নিকটবর্তী গ্রামের বাসিন্দা। যানগুরুকে সে বলে দেয় কে অসুস্থ। আর নিজের ইচ্ছেমত ঠিক করে কাকে ডাইনী সাব্যস্ত করা উচিত। অসহায় ডাইনীকে বিক্রী করতে হয় তার জমি। এজেন্টরা সাধারণত আদিবাসী সমাজের সদস্য নয়। আদিবাসী সমাজের বহির্ভূত কোন লোককে আদিবাসীর জমি বিক্রী করা বেআইনি। তাই ডাইনী হত্যা শুধুমাত্র কুসংস্কার নয়। সাঁওতালদের প্রতারিত করবার বা শোষণ করার একটা পদ্ধতি বিশেষ।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের সাংগঠনিক সভাপতি, জেলাশাসক সবাই মনে করেন শিক্ষার অভাব সাঁওতালদের দূরবস্থার কারণ। এখানে বলা দরকার সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপি আছে, এর নাম অলচিকি, সীতাকান্ত মহাপাত্র আমাদের বার বার বলেছেন ওদের ভাষার পড়াশুনা প্রচারের যৌক্তিকতাকে।[৬] চেষ্টা করলে বিজ্ঞান পরিষদ, কিংবা অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র অলচিকি ভাষায় ছোট ছোট বই-এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচার করতে পারত। আর তা ছাড়া, যাদের দুবেলা দুমুঠো জোটে না, তাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ জন্মাবে কিভাবে।

শিক্ষার মান নিয়ে বিতর্কে রাজনৈতিক মতবাদে যাওয়ার দরকার নেই। যে সমস্ত গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সেখানে কিছু শিশু শিক্ষাকেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে। এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পঞ্চায়েতের গ্রামশিক্ষা কমিটির অধীন। শিক্ষকের বয়স চল্লিশ উর্দ্ধ হতে হবে এবং তার যোগ্যতা ম্যাট্রিক পাশ। অনেক ঘুরে স্কুল ঘর চোখে না পড়ায় বলা হল একটা ন্যাড়া গাছের নীচে রোজ ক্লাস বসে। শিক্ষার কি নিদারুণ নমুনা। ধর্মান্তর যে কোন রকমেরই হোক কিংবা তা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা প্ররোচিত হোক না কেন। সাম্প্রদায়িকতা তাকে ইন্ধন জোগায়। সাঁওতালরা হিন্দু ধর্ম বা খ্রিষ্টান ধর্মের আদর্শ বোঝে না। তবুও মাত্র দুচার বছর আগে কোচপাড়া, বালদালতোলা, ভাগুরজীবী এসমস্ত জায়গায় ছোট ছোট গির্জা মাথা ফুঁড়ে উঠেছে। তবুও প্রত্যেক রামনবমীতে পোপড়া বৃন্দিকামঞ্চচিত্রকূট আশ্রমে গণধর্মান্তর হয়।

একজন শহুরে শিক্ষিত লোক নিজের ধর্ম পরিবর্তন করবার আগে নানা প্রকার ভাবনা চিন্তা করে। গরীব সাঁওতাল ধর্ম নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পায় না। তাদের

সরলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত রেখেছে। সংবাদ মাধ্যমে আমাদের চারপাশের পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের মতামত তৈরী করে। আমরা দূরদর্শনে যা দেখি বা খবরের কাগজে যা পড়ি তাতেই বিশ্বাস করি। এতদিন ধর্মান্তরের বিষয় আমরা দেখেছি শুধু হিন্দুত্বের ভয়াবহতা, কিন্তু এটাও মনে রাখবার বিষয় যে ২২ আগস্ট ২০০২-এ সাঁওতাল পরিবারটি হিন্দুধর্মে পরিবর্তিত হওয়ার আগে খ্রিষ্টান ছিল। ধর্মান্তর নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে নারাজ রাহুতারা ক্যাথলিক মিশনের ফাদার ভার্গিসি সরাসরি উত্তর দেন যে 'ভারতীয়রাই তো আগে ধর্মান্তর শুরু করেছিল, আমাদের দোষ কি'? এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের কাছে আমাদের আশা আরেকটু গভীরে গিয়ে ঘটনাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা। এটা সত্যি যে গেরুয়াকরণের জোয়ার আজ সারা ভারতবর্ষে প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যার সমাধানের পথে না হেঁটে কখনো কখনো এই জোয়ারে গা ভাসিয়েছে। তবুও আদিবাসী অঞ্চলে ধর্মান্তরের ইতিবৃত্ত আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে।

সাঁওতালরা তাদের পুরোন জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। খ্রিষ্টান মিশনারি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এজেন্ট আর সাংবাদিকদের হানায় তাদের জীবন ওষ্ঠাগত। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্মের একটা বিশেষ উপকারিতা আছে। তাদের ধর্ম শেখায় কীভাবে নিজের পরিবেশের সাথে কিংবা জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে চলবে। তার অর্থ খুঁজে নিতে। তাই গীর্জায় প্রতি রবিবারের প্রার্থনা কিংবা লক্ষ্মীপূজা বা সরস্বতী পূজোয় যোগদান করলেও ঘরের বাছুর মরলে আবার কোন বোঙ্গাকে তুষ্ট করতে হয়। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বেচ্ছায় ভিন্ন জীবননীতি গ্রহণ করলে ক্ষতি কি? হলওয়েলের কথায় 'accumulation under conditions of voluntary imitative learning is not disruptive'.[9] যেখানে শিক্ষার দৌড় নাম সই করাতে সীমাবদ্ধ। যেখানে দিনাতিপাত করেও দুবেলা দুমুঠো জোটে না সেখানে স্বেচ্ছায় ভিন্ন জীবননীতি গ্রহণ করবার অবকাশ থাকে না।

নব্য সাঁওতালরা নিজেদের ধর্ম অস্বীকার করে আজ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অংশীদার হতে চাইছে। অন্যদিকে বৃদ্ধরা সমাজ ধর্মের দুস্তর পরিবর্তন দেখে হা-হুতাশ করছে। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্মাচরণের মূল ভিত্তি সাম্য ও সম্প্রীতি। তাই সাঁওতাল উপজাতির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে ধর্মান্তরের যে কোন রকমের প্রচেষ্টা।

ধর্মান্তরের বিপদ বুঝে বহুত্ববাদের প্রবক্তাদের, এমনকি নিজস্ব সমাজ ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে নব্য সাঁওতালরা মূলস্রোতের গৌরবে গৌরবান্বিত হতে চাইছে, তাদের মধ্যেও প্রকৃত চেতনা গড়ে তোলার সংগঠিত প্রয়াস চালাতে হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১. নবেন্দু দত্ত মজুমদার, *দা সানথাল ঃ এ স্টাডি ইন কালচার চেঞ্জ*, ১৯৫৫,
২. পি.ও.বডিঙ্গ, *ট্র্যাডিশন এণ্ড ইনস্টিটিউশনস্ অব দা সানথালস্*, ২০০১, প্রথম অধ্যায়
৩. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ : ৭-১৩
৪. নির্মল মিন্জ *'আইডেনটিটি অব ট্রাইবাল ইন্ডিয়া'* ওয়ান্টার ফার্নানডেজ (সম্পাদিত) *দা ইন্ডিজেনাস কোয়েশচেন ঃ মার্চ ফর আইডেনটিটি*, ১৯৯৪
৫. ডাব্লু.জি.আর্চার, (আর্টিকেল), *দা সানথাল ট্রিটমেন্ট অব উইচক্রস্টি ম্যান ইন ইন্ডিয়া*, ১৯৪৭
৬. সীতাকান্ত মহাপাত্র, *মর্ডানাইজেশেন রিচুআল ঃ আইডেনটিটি এন্ড সোশাল চেঞ্জ ইন সানথাল সোসাইটি*, ১৯৯০
৭. নবেন্দু দত্ত মজুমদার, *দা সানথাল ঃ এ স্টাডি ইন কালচার চেঞ্জ*, ১৯৫৫

অমৃতলাল রায় ঃ এক বিস্মৃত স্বদেশী ব্যক্তিত্ব

মৃণালকুমার বসু

কার্জনের বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় ও বাংলার বাইরে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র বদলে গিয়েছিল এ কথা যেমন সত্য তেমনি স্বাদেশিকতার ঐতিহ্যের শেকড় ছিল আরো অনেক গভীরে ও অতীতে একথাও তেমনি জানা। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই স্বাদেশিকতার নতুন চেতনা বিভিন্ন কর্মবীর ও চিন্তাশীল মানুষের মনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।[১] এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী পূর্বযুগের এক স্বল্পপরিচিত চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আজকের এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম অমৃতলাল রায় যাঁর গুণপনার অকুণ্ঠ তারিফ করেছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, তেমনি তাঁর বহুমুখী তৎপরতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছিল। তবু স্থায়ী কীর্তি অর্জন করতে ব্যর্থ এক বিচিত্রকর্মা মানুষ হিসেবেই তাঁর পরিচয়।

স্বদেশীয়ানায় সম্পৃক্ত কর্মবীরদের নানা কর্মকাণ্ড দেশজ শিল্পকে সমৃদ্ধ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাসায়নিক বস্তু উৎপাদন থেকে চর্মশিল্প উৎপাদনে যখন ব্যস্ততার সূত্রপাত ঘটেনি তখনই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি নতুন পথে বাঙালীর কর্মোদ্যোগকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্য স্বদেশী কর্মবীরদের ব্যক্তিগত পেশাদারী দক্ষতা তাঁদের নিজস্ব পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করেছিল সেখানে অমৃতলাল রায়ের পেশাদারী দক্ষতার অভাব তাঁকে নিজস্ব অর্জিত অভিজ্ঞতায় দূরপ্রসারী কর্মোদ্যোগকে অভিনব পন্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করেছিল। সোজা কথায়, ব্যক্তিগত দক্ষতা ভিত্তিক শিল্প গঠনের পথে নয় বহুমানুষের সংঘশক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ রেলপথ প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলার গ্রামাঞ্চলে নতুন বার্তা পাঠাবার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। এখানেও লক্ষ্য করা যায় আর এক দ্বন্দ্ব কেননা তখনকার শিল্পের মধ্যে রেলপথ বিস্তারের মত সবচেয়ে আকর্ষক স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করলেও ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না।

অন্যদিকে, এই নতুন স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ এমন এলাকায় সূত্রপাতকরা হল যেখানে মূলত ভারীশিল্প নেই। কিন্তু দেশীয় শিল্পোদ্যোগের এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় মানুষদের অর্থে ও দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বদেশী কর্মপন্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সঙ্গতকারণে প্রখ্যাত পণ্ডিত সুকুমার সেন অমৃতলাল রায়ের

পরামর্শে স্থাপিত রেলপথটিকে "একটি জাতীয় অর্থাৎ বাঙালীর টাকায় স্থাপিত এবং বাঙালীর পরিচালিত রেলপথ"[২] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই রেলপথ দুটি প্রাচীন তীর্থ ক্ষেত্রকে যুক্ত করেছিল। একদিকে মগরা যা সুপ্রাচীন ত্রিবেণীর প্রান্তে ও অন্যদিকে তারকেশ্বর-যার সুখ্যাতি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে যথেষ্ট পরিচিত। কার্যত কলকারখানা বর্জিত এই এলাকায় রেলপথ প্রবর্তনের মাধ্যমে বাঙালীর স্বদেশীয়ানা নতুন মাত্রা পেলেও দেশীয় পুঁজিতে গড়ে ওঠা এই রেলপথ যাত্রীপরিবহণের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে বাধ্য ছিল বলে অতিশয় দক্ষ ও তৎপর প্রশাসন ছাড়া এই রেলপথটিকে টিকিয়ে রাখা সহজ ছিল না। এই মূল সমস্যা মনে রেখে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

অমৃতলাল রায়ের জন্ম হয় সম্ভবত [৩] ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক উত্তর চব্বিশ পরগণার গরিফায়। নৈহাটী শহরের প্রান্তে গরিফা একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা যেটি সে যুগে পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এখানের সবচেয়ে বিখ্যাত বৈদ্য পরিবার হল সেন পরিবার যে পরিবারের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দুজন হলেন নিযুতপতি পণ্ডিত রাজকর্মচারী রামকমল সেন ও তদোধিক বিখ্যাত পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন। গরিফা হল রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহপাঠী বিহারীলাল গুপ্তেরও পৈতৃক গ্রাম। অমৃতলাল গরিফা-নিবাসী বৈদ্য পরিবারে জন্মালেও তাঁর পিতৃকুলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। তাঁর পিতা মধুসূদন রায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর কেরানী ছিলেন। প্রথম জীবনে বর্তমান উত্তরপ্রদেশে চাকরী করলেও পরে তিনি হাওড়াতে বদলী হল ও সালকিয়া এলাকায় বাস করতেন। এখানেই সম্ভবত অমৃতলালের লেখাপড়ার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ডাক্তারী পড়ার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। মোটামুটি সফল মধ্যবিত্ত জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা যখন গড়ে উঠেছে তখন অমৃতলাল বৃহত্তর সাফল্যের জন্য সাগরপাড়ি দেন। এবার ভর্তি হন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারীর ছাত্র হিসেবে।[৪] সমসাময়িক গিরিশচন্দ্র বসু। যিনি পরে বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্টা করেন ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত তিনি বৃত্তি পেয়ে এডিনবার্গে যাননি। তবু এখানের ছাত্র হিসেবে উজ্বল ভবিষ্যৎ যখন সুনিশ্চিত তখনই ভাগ্যের ফেরে পড়াশোনা ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান এমন সময়ে যখন এই মহাদেশের প্রতি ভারতীয়দের তেমন আকর্ষণ গড়ে ওঠেনি। এখানে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিভিন্ন পেশা তিনি অবলম্বন করেন যা সে যুগের ভারতীয় ছাত্রদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। অবশেষে, অর্থোপার্জনের জন্য তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। ইংরিজিভাষায় তাঁর দক্ষতা নিয়ে কোনও সন্দেহ করা চলে না কিন্তু ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁর ধারণা সে যুগের অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগের আমলের পক্ষে তার ধারণা খুবই অগ্রসর ছিল। তাঁর 'British Rule in India' লেখাটি North American Review পত্রিকায় প্রকাশিত হলে

যথেষ্ট আলোড়ন হয়। ভারতের ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাগুলি তাঁর এই উত্তেজক প্রবন্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিত ছিল বলেই 'Pioneer' পত্রিকা তাঁকে 'Red Amrita' বলে চিহ্নিত করে। বোঝা যায়, যে ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাটি অমৃতলালের মতামত আদপে সহ্য করতে পারেনি। এ সব ঘটনা আমেরিকায় যখন ঘটছিল। মনে রাখতে হবে, তার দশ বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে পরবর্তীকালে তাঁর জীবন গড়ে উঠতে পারে একথা তিনি সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন।

সাংবাদিকতাই তাঁর সঠিক পথ একথা অনুভব করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। সুনিশ্চিত ইঁল্যাণ্ডের উপাধি ও আয়াসপূর্ণ জীবনের বদলে অমৃতলাল ফিরে এলেন একেবারে রিক্ত হাতে নতুন এক পেশা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। মনে রাখতে হবে যে তখন যাঁরা বাংলা বা ইংরিজি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন তাঁদের অনেকেরই অন্য পেশায় বা পারিবারিক সূত্রে সুনিশ্চিত আয় ছিল। কিন্তু, অমৃতলালকে কিছু পরিমাণে নির্ভর করতে হয় বৃদ্ধ দরিদ্র পিতার ওপর যিনি নিজেই নানাভাবে বিব্রত। একদিকে আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার মত কঠিন পেশা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কেননা পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর নিজের ছিল না। মনে হয় বৃদ্ধপিতার অর্থে তিনি ফরাসী চন্দনগর থেকে সে কারণে 'Hindu Maga-zinc' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নতুন পত্রিকা 'Bearer' প্রকাশ করেন। ফল একই। তবুও হাল ছাড়েননি অমৃতলাল। অবশেষে তিনি কোলকাতা থেকে 'Hope' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার নামকরণ থেকে অমৃতলালের দুর্মর আশার কথা যেমন বোঝা যায় তেমনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হোপ' নামের একটি প্রাইজের কথাও মনে পড়ে যা প্রফুল্লচন্দ্র রায় কৃতী ছাত্র হিসেবে সেখানে পেয়েছিলেন।[৫] তবু, এই নামের মধ্যে দিয়ে অমৃতলালের সাহসী উদ্যমের কথা জানা যায়। পত্রিকাটি পরবর্তীকালের বিখ্যাত ইংরিজি পত্রিকা মর্ডার্ন রিভিউ এর অনেক আগের আমলের ও নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁর জীবনধারণ ও চিন্তা প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পত্রিকাটি অন্তত ১৮৯২ তে ছিল সাপ্তাহিক। ছাপা হত প্রতি বৃহস্পতিবার ৬৫, অখিল মিস্ত্রি লেন, কোলকাতা থেকে। পত্রিকাটির 'object' হিসেবে ছাপা হত "Social, Industrial and Political Reform by self-help" যা থেকে অমৃতলালের আত্মনির্ভর স্বদেশী সংস্কারের ছবি স্পষ্ট হয়।[৬] পত্রিকাটির গ্রাহক চাঁদা ৪ টাকা মাত্র। ওই বছরে দৈনিক 'Englishman' পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদা ৪৫ টাকা ও সাপ্তাহিক Friend of India এর চাঁদা বাৎসরিক ১০্ টাকা মাত্র। 'Bengalee' পত্রিকার চাঁদা ১০্ মাত্র যদিও ছাত্রদের জন্য এর চেয়ে সস্তা দরে দেওয়া হত। অন্যদিকে গ্রামবাসী (হাওড়া) পত্রিকার চাঁদা ১-৮ আনা মাত্র ছিল।

ইংরিজি পত্রিকার মাধ্যমে ইংরিজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিজের মতামত

করার প্রয়োজনীয়তা যেমন স্পষ্ট তেমনি তাঁর স্বদেশী চেতনা ইংরিজি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করার মধ্যে স্বাভাবিক বৈপরীত্য আজকে যতটা চোখে পড়ছে তখন ততটা স্পষ্ট ছিল না। এমনকি বেশ কিছুকাল পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত এককালের শিক্ষক ব্রাহ্ম সাংবাদিকের কাছে ইংরিজি পত্রিকা প্রকাশ করে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও বিত্ত অর্জন করা সম্ভব হয়। তবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পাশাপাশি বাংলায় 'প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশ করে দুধরনের পাঠককুলকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। অমৃতলালের পক্ষে একই সঙ্গে দুভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি। তেমনি, একথা বলা যায় যে অমৃতলাল ইংরিজি ভাষায় যে দক্ষতা করায়ত্ত করেছিলেন সে ধরনের এলেম নিজের মাতৃভাষাতে হয়ত ছিল না যদিও তাঁর মানসিক গঠনে স্বদেশীভাবনার অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। এই বৈপরীত্যই তাঁর অনুক্ষণ সঙ্গী ও বৈশিষ্ট।

অবশ্য, শুধু ইংরিজি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। অন্যান্য স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত ও সংস্থা গড়ার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ ছিল। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বলে তিনি বেঙ্গল উইভিং এণ্ড স্পিনিং মিলস নামের এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন হাইকোর্টের উকিল হেমচন্দ্র মিত্রের সহায়তায়। অবশ্য এই ক্ষীণজীবী সংস্থা বেশিদিন বাঁচেনি।[৭] তবু, এ থেকে বাঙালীর দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার সঙ্গে তাঁর যোগ বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের ইংরিজি নাম রাখার আকাঙ্খা স্বদেশী নেতাদের ও প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের যথেষ্ট জোরালো ছিল বলা যায়। অনেক সফল বাঙালী শিল্পোদ্যোগীদের নিজ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ থেকে একথা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

অমৃতলাল অন্যান্য বিলেত ফেরৎ বিশেষত ব্রাহ্ম বিলেত ফেরৎদের মত নিজের দেশ ও সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। এখানে তাঁর চরিত্রের এক বিশিষ্ট লক্ষ্মণ ফুটে ওঠে। দুর্দান্ত ইংরিজিনবীশ ও বিলেত ফেরৎ অমৃতলাল গড়পড়তা ধর্মভীরু বাঙালীর মতই সাধুসেবা করায় মুক্ত হস্ত ছিলেন। নিয়মিত নানা ধরনের সাধুদের উদারভাবে যেমন সাহায্য করতেন তেমনি বিখ্যাত ভক্ত সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। অমৃতলালের চরিত্রের এই বৈশিষ্টের কথা হেমেন্দ্র প্রসাদ শুধু লক্ষ্য করেছেন তাই নয় এর জন্য অমৃতলাল কিভাবে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন সে কথাও জানিয়েছেন।[৮] ফলে গড়পড়তা দেশভক্তদের থেকে তাঁর স্বদেশপ্রেম শুধু নয় তাঁর ঔদার্যের পরিচয় পাই যেমন তেমনি এই স্বদেশভক্ত মানুষটির অবিবেচনা ও সাংসারিক বুদ্ধির অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

একই সঙ্গে নিজের পত্রিকাতে তিনি নতুনত্ব এনেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র ছেপে। সে যুগে নানা ভারতীয় পরিচালিত পত্রিকার প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে শুধুমাত্র পত্রিকা নির্ভর আয়ের ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকা সহজ ছিল না। বিশেষত এমন ব্যক্তির

যিনি আর্থিক ব্যাপারে অবিবেচক শুধু নন বেহিসেবীও বটেন। এটা বোঝা যায় যখন জানতে পারা যায় যে সে সময়ে তিনি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন।[*] তবু অমৃতলাল তাঁর স্বোপার্জিত ধ্যানধারণা বিসর্জন না দিয়ে স্বদেশী প্রকল্প সমর্থন করে গেছেন। এমনকি, আগের মত ছোটখাটো শিল্পোদ্যোগ সমর্থন না করে অনেক বৃহৎ প্রকল্প পরিকল্পনা করে বাঙালীর স্বদেশী প্রকল্পকে নতুন উচ্চতায় পৌছে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে রেলপথ নির্মাণকে সর্বোত্তম প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হত বলে বাঙালীদের মাধ্যমে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এর মধ্যে তাঁর বৌদ্ধিক চেতনার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি তাঁর দুর্বলতার কথাও জানা যায়। রেলপথ নির্মাণের কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কেননা তিনি পেশায় এঞ্জিনীয়ার ছিলেন না। অন্যদিকে, অর্থাভাব হেতু পুঁজির যোগানদার হিসেবে এই অভিনব ও বৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না । ফলে, এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার সীমাবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ত। অন্যদিকে শুধু পরিকল্পকের গুরুত্ব যে যুগে স্বীকৃত হবার সম্ভাবনা আদপে ছিল না। তবু, এই আদর্শবাদী স্বদেশের হিতচিন্তক নিরুৎসাহ হননি।

তাঁর নিজস্ব 'হোপ' পত্রিকা ছিল সে যুগের পক্ষে অভিনব রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনার সূতিকাগার। এখানেই তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেন শ্রীরাম চন্দ্র ঘোষ নামে এক রেল কর্মচারী। নতুন এই রেলপথের নাম ঠিক হল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে। ঠিক হল এই রেলপথ যুক্ত করবে দুটি রেলওয়ে স্টেশনকে সম্পূর্ণ আলাদা পথে। একটি স্টেশন হল তারকেশ্বর ও অন্যটি মগরা-ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের একটি স্টেশন। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে যে মূলধন প্রয়োজন তা অমৃতলাল বা শ্রীরাম ঘোষের ছিল না। এ কাজে পেশাগত দক্ষতা দিয়ে আর একজন এগিয়ে এসেছিলেন। ইনি হুগলী জেলার এক এঞ্জিনীয়ার নাম অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায়। রুরকি কলেজ থেকে এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন একেবারে কলেজের প্রথম যুগে ও ইণ্ডিয়ান মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীতে চাকরী করতেন।[১০] পেশাগত যোগ্যতা থাকলেও এর পক্ষে বেশী সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য, এই পরিকল্পনা হুগলী জেলার ভূস্বামীদের অকৃপণ সাহায্য পেয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছিল, বিশেষত উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা পেয়ে পরিকল্পনাটি মূর্তকরা সম্ভবপর হয়েছিল। হুগলী জেলার সম্ভ্রান্ত জমিজদারদের কৃপায় হুগলী জেলা বোর্ড এই রেলপথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১১] ঠিক হল মোটামুটি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রায় ন লক্ষ টাকা লাগবে। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন জোরকদমে কাজ চলছে তখন এডুকেশন গেজেট জানায় যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হয়েছে ও আগামী বৎসর তারকেশ্বর-মগরা রেলপথ খোলা হবে।[১২] কুচবিহার-রেলপথের আদলে ঠিক হল রেলপথটি হবে ২ফিট ৬ইঞ্চি মাপের।

মগরা-তারকেশ্বর রেলপথের জন্য দরকার হয়েছিল অন্তত চারটি পুল তৈরী করবার যার জন্য যথেষ্ট কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। শুধু মূলধন জোগাড় করাই নয় বাঙালীরা এখানে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিল ও এ ব্যাপারে অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায়ের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সবচেয়ে বড় সেতুটি নির্মিত হয় মগরাতে কুন্তী নদীর ওপর। এটি হল দামোদরের প্রাচীন খাত। কিন্তু বাঙালী এই প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করে দ্রুত প্রকল্পটি রূপায়ণে সমর্থ হয়।

পেশাদারী দক্ষতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূলত হুগলী জেলার মানুষ বিশেষত ভূস্বামী ও সফল আমলারা প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করে দেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী বাজারে শেয়ার ছাড়ে। প্রতিটি দশটাকা মূল্যের। অবশ্য বেশির ভাগ শেয়ার হুগলী জেলা বোর্ড কিনে নেয়। বাকি শেয়ারগুলির মধ্যে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় একাই কেনেন ৬০০ টি শেয়ার। দেশী শিল্পের প্রতি তাঁর সমর্থন স্পষ্ট চোখে পড়ে। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারের নন্দলাল গোস্বামী ও চণ্ডীলাল সিংহ দুজনে ৫০০ টি করে শেয়ার কেনেন।[১৩] নগেন্দ্রনাথ বসু কেনেন ৫০০ টি শেয়ার। আড়াইশো শেয়ার কেনেন মানকুণ্ডুর বিখ্যাত খাঁ পরিবারের কানাইলাল খাঁ[১৪] এবং হুগলীর বিখ্যাত উকিল ঈশানচন্দ্র মিত্র যিনি পরে কোলকাতায় ওকালতিতে সাফল্য লাভ করেন। এরা সকলেই প্রথমাবধি রেলপথ গড়ার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের গোষ্ঠীর বাইরের একজন রামগতি মুখোপাধ্যায় সে যুগের একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি আড়াইশো শেয়ার কেনেন। এদের সহায়তায় অতিদ্রুত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানীর লাইন পাতার কাজ নিষ্পন্ন হয়।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বড় শেয়ার হোল্ডাররা ডিরেক্টর হন। অমৃতলাল রায় নিযুক্ত হলেন প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক সেক্রেটারী হিসেবে। নিজের 'Hope' পত্রিকার কার্যালয়ে যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল সেখানে অমৃতলাল রায় একজন কর্মচারী হলেন মাসিক ২০০্ টাকা মাইনের। নিজের পত্রিকাটির ওপর আর ভরসা করা যাচ্ছিল না। তাঁর সঙ্গে আর একজন অর্থাৎ অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় এই কোম্পানীতে তাঁর পেশাদারী দক্ষতার কারণে চাকরী পান। এঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও আদর্শবাদী এই এঞ্জিনীয়ার জীবনে যথোপযুক্ত সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য সুধীরকুমার মিত্র ওঁকে ইণ্ডিয়ান মিডল্যান্ড কোম্পানীর এক প্রধান এঞ্জিনীয়ার হিসেবে বর্ণনা করলেও[১৫] ওই কোম্পানীর তালিকায় তাঁর নাম নেই। হয়ত অন্য কোথাও বা অন্য কোনও সময়ে তিনি চাকরী করেছেন।

বাঙালী এই শিল্পোদ্যোগকে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছিলেন ও ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার চার্লস এলিয়ট এর উদ্বোধন করেন ও যথোচিত প্রশংসা করেন।

বহু বিশিষ্ট আমলা ও নাগরিক এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কোম্পানীর সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।[১৬]

অবশ্য, কোম্পানীর কাজকর্ম শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট অর্থাৎ দলাদলি প্রকটিত হয়। এর লক্ষ্য ছিলেন দুজন। অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও অমৃতলাল রায় এঁদের অর্থবল না থাকায় দুজনেই ছিলেন আক্রমণের পক্ষে বেশ নিরাপদ লক্ষ্য। এঁদের সম্পর্কে বিখ্যাত ব্রাহ্ম পত্রিকা সঞ্জীবনীর মন্তব্য বেশ চিত্তাকর্ষক। একজন পত্রলেখক চিঠিতে জানালেন যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী রেল বিষয়ে অজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করায় কোম্পানী অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায়কে বরখাস্ত করেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য, অমৃতলাল সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আরো তীক্ষ্ণ। কোম্পানীর অনেক যোগ্য ডিরেক্টার আছেন তবু অমৃতলালকে নিয়োগ করেছে যার ব্যাখ্যা পাওয়া ভার। ফলে, অমৃতলালকে বরখাস্ত করলে কোম্পানী খরচ কমাতে পারবে। এসব সত্বেও পত্রলেখক স্বীকার করেন যে অমৃতলালের একমাত্র গুণ হল যে তিনি অসম্ভব ভাল ইংরিজি লিখতে পারেন।[১৭] পত্রলেখক স্বীকার করেন যে বহু সঙ্গত সমালোচনা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করেছেন সত্যি তবু নতুন কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর উন্নতি করেছেন একথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি আরো জানান যে কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মী অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় কোম্পানী সম্পর্কে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছিলেন সেগুলো কি আজও পরীক্ষা করা হয়েছে?[১৮] অন্নদাপ্রসাদের একটি অভিযোগ ছিল গুরুতর। কোম্পানীর রেললাইন পাতার মধ্যে নানা রকম ত্রুটি আছে।

অন্নদাপ্রসাদ কোম্পানী থেকে হঠে গেলেন কিন্তু অমৃতলাল কষ্ট করেও টিকে ছিলেন। অবশ্য, সমালোচকরা তাঁদের ছুরি শানাতে ছেড়ে দেয়নি। এঁদের কাছ্ থেকে জানা গেল যে পরিচালন সমিতির সভায় অমৃতলাল জানিয়েছেন যে যতদিন কোম্পানী লাভের মুখ দেখবে না ততদিন তিনি পুরো মাইনে নেবেন না। পত্রলেখক জানান যে অমৃতলাল পুরো মাইনে নিচ্ছেন সুতরাং ধয়ে নেওয়া যেতে পারে যে কোম্পানী লাভ করছে [১৯] সঞ্জীবনী পত্রিকাতে সমালোচনার ধার থেকে অমৃতলাল বিরোধিতার ব্যাপকতা ও তীব্রতার আন্দাজ করা যায়।

কোম্পানী অবশ্য কাজকর্ম খারাপ করছিল না। কেননা ১৮৯৫ এর শেষেই কোম্পানী ত্রিবেণীর তীর্থযাত্রীদের নিজেদের যাত্রী হিসেবে পাবার আশায় মগরা থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের দাবী করে।[২০] অমৃতলাল অবশ্য নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছিলেন। একদিকে তাঁর 'Hope' পত্রিকা ভাল চলছিল না ও অন্যদিকে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী থেকে তাঁকে তাড়াবার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, এর মধ্যে বহু স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে টানাপোড়েন যেমন দায়ী তেমনি পেশাদারী দক্ষতা ও অর্থবলের অভাবের সঙ্গে সে যুগে বুদ্ধিগত বিচক্ষণতা ও কৌশলের

প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সঠিক সচেতনার অভাবও দায়ী ছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ[২১] জানিয়েছেন যে অমৃতলাল ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন[২১] কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়।

প্রথমত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী তার সদর দফতর কোলকাতা থেকে সরিয়ে নেয় মগরায় কেননা কোম্পানী সেখানে তার সদর কার্যালয় তৈরী করে। এটি একদিকে অভিনব ব্যাপার, কেননা রেলওয়ে কোম্পানীর সদর দফতর রাজধানী কোলকাতা থেকে উঠে গেল বাংলার এক গ্রামে। বিশাল এক মাঠে কোম্পানী নিজস্ব এক ভবন তৈরী করে তার সদর কার্যালয় তৈরী করল।[২২] ফলে, প্রশাসনের সামনে স্থানীয় বাসিন্দাদের কিছু চাকরীর সুযোগ গড়ে উঠল যা প্রকারান্তরে দলাদলিকে জোরদার করে। এতে অমৃতলালের সুবিধে হয়েছিল বলা যায়না তবে কোম্পানী থেকে তিনি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হয়েছিলেন একথা প্রমাণ করতে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখা দরকার।

সরকারী খাতা পত্রে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ছিল "Steam Tramways Outside Municipal Limits" হিসেবে। এ ধরনের অন্য রেলপথ হল হাওড়া-শিয়াখালা ও হাওড়া-আমতা রেলপথ। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিবেদনে BPR কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টারস এর চেয়ারম্যান হলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ডিরেক্টাররা হলেন নন্দলাল গোস্বামী, চণ্ডীলাল সিংহ, জানকীনাথ রায়, রায় ঈশানচন্দ্র মিত্র রায়বাহাদুর, রায় রামগতি মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর, রামনারায়ণ মিত্র ও দুই এঞ্জিনীয়ার উমেশচন্দ্র ঘোষ ও ভবদেব চট্টোপাধ্যায়। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার হলেন রামগতি মুখোপাধ্যায়। অমৃতলাল রায় হলেন সেক্রেটারী ও ট্র্যাফিক সুপারিন্টেন্ট।[২৩] ফলে, অমৃতলাল ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানী থেকে পদচ্যুত হয়েছেন এ কথা ঠিক নয়। এমনকি, তাঁকে শুধু সেক্রেটারী হিসেবে না দেখিয়ে তাঁকে সেক্রেটারী ও ট্রাফিক বিভাগের কর্তা করে দেওয়া হয়েছে যদিও এবিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল বলা চলে না, তবু, বোঝা যায় কোম্পানীর পরিচালকবর্গের একাংশ অন্তত তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন বলে তাঁকে রাখার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

কোম্পানী কোলকাতা থেকে মগরায় স্থানান্তরিত হলে অমৃতলাল বাধ্য হয়ে কোলকাতার বাস উঠিয়ে দিতে বাধ্য হন ও পৈতৃক বাড়ি গরিফায় চলে আসেন। বহু বছর বাড়িটিতে কেউ বাস করেনি তবু আজ তাঁকে সেখানেই নতুন করে বাস করতে হল।[২৪] কিন্তু সেখানেই শান্তিতে বাস করা সম্ভব হল না। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের একাংশ দীর্ঘদিন অমৃতলালকে হঠাতে চেষ্টা করছিলেন ব্যয় লাঘবের যুক্তিতে। অবশেষে তাঁরা সফল হলেন ও এই বছরে অমৃতলাল হঠে গেলেন কোম্পানী থেকে। কিন্তু দেখা গেল ব্যয় লাঘব করার সাধু প্রস্তাব শিকেয় তোলা থাকল। পরের বছর ১৯০০ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে অমৃতলাল রায় পদচ্যুত হলেও রামনাথ ভট্টাচার্য এই পদে

নিযুক্ত হয়েছেন।[২৫] ফলে, খরচ কমেনি, তবে অমৃতলালকে তাড়াতে কোম্পানীর দলাদলির মধ্যে কারা জড়িত সেব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য না জোগাড় করতে পারায় সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

অবশ্য, নিজের পত্রিকার অবলুপ্তি ও চাকরী থেকে বিতাড়নের ফলে অমৃতলালের ভাগ্য নেমে এল নিদারুণ বিপর্যয়। আর্থিক চাপে অমৃতলাল তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন আজমীরে এক আত্মীয়ের কাছে। পৈতৃক বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হলেন। শুরু হল নতুন চাকরীর সন্ধান। নিজের পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও একথা তাঁর অজানা ছিল না যে সাংবাদিকতাই তাঁর সত্যিকারের কর্মক্ষেত্র। কিন্তু অবিবেচক আদর্শবাদী অমৃতলালের ঋণভার লাঘব কবার জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত কর্মসংস্থান। তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও অন্যান্য পত্রপত্রিকাতে তিনি চাকরীর সন্ধান শুরু করলেন। কাজটা সহজ ছিল না।

সারা ভারতে বিশেষত উত্তরভারতে অবশ্য ইংরিজিনবীশ বাঙালীদের কদর ছিল। উনিশ শতক জুড়ে সামরিক বাহিনী, ওকালতি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় বাঙালীদের ভূমিকা নগণ্য ছিল না। সুদূর লাহোরে বহু বাঙালী সাংবাদিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সব মানুষদের পথ অনুসরণ করে অমৃতলাল লক্ষৌয়ের 'Expres' পত্রিকায় চাকরী পেলে তাঁর সমস্যা কিছুটা মেটে। পরে Punjabee ও শেষে Tribune পত্রিকায় চাকরী ও সম্পাদক হন। এসময়ে তার গুণাবলী বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায় এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল [২৬] পত্র পত্রিকার পরিচালনা বা ব্যবসায়িক দিক তাঁকে দেখতে হত না বলে নিজের প্রকৃত গুণ প্রকাশ করার সুযোগ পেযে নিজেকে উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে জাতীয়তাবাদী স্বদেশী চিন্তাধারা প্রসার করার কাজে তাঁর ভূমিকা একেবারে নগণ্য ছিল না। এখানে তাঁর গভীর দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিশেছিল তাঁর অসাধারণ পেশাদারী দক্ষতা যা আগের কর্মক্ষেত্রে তাঁর ছিল না। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে একসময় তাঁর মাইনে মাসিক ৫০০্ টাকা ছিল যা সে যুগের সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভাল কিন্তু বাংলার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।

অবশেষে, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে যখন রাজনীতিতে গান্ধীযুগ শুরু হয়েছে তখন তাঁর মৃত্যু ঘটে। সে খবর বেঙ্গলী কাগজে শুধু গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হল তাই নয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর স্মৃতিচারণায় তাঁর জীবনের কৃতিত্ব ও সাধনার কথা যে ভাষায় প্রকাশিত হল তা থেকে তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। এর তিনযুগ পরে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে যখন ত্রিবেণী-মগরা তারকেশ্বর রেলপথে তাদের রেল পরিবহন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল তখন প্রবীন সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অমৃতলাল রায়কে স্মরণ করে প্রবন্ধ লিখে জানালেন যে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের থেকে অনেক অগ্রসর ব্যক্তি। এই দুধরনের পত্রিকার বক্তব্য থেকে তাঁর মত বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা

ধারণা গড়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 'বেঙ্গলী পত্রিকা তাঁকে 'a well known kinght of the pen' হিসেবে প্রথমেই বর্ণনাকরে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাঁর গতযুগের কৃতিত্ব ইতিমধ্যেই বাঙালীরা বিস্মৃত হয়েছে। তাঁর সাধের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেনি তবু বাঙালী শিল্পোদ্যোগের মধ্যে এর ভূমিকা নগণ্য ছিল না। অন্যদিকে ইংরিজিভাষায় সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে "Indeed there are few persons who could weild the resources of the English language with such perfect mastery[১৮] কোনও বাঙালী ইংরিজিনবীশের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের পত্রিকার তরফে এর চেয়ে বেশী স্বীকৃতি ও প্রশংসা হতে পারে না। তবু এই স্বদেশানুরাগী দেশপ্রাণ ব্যক্তির প্রশংসার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অমৃতলালের জীবনের এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব যার নিষ্পত্তি সহজসাধ্য ছিল না।

উনিশ শতকীয় আদর্শবাদী জাতীয়তাবাদী চিন্তা দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল যখন সদ্যোত্থিত গান্ধীযুগে তখন অমৃতলাল রায়ের মৃত্যু একদিকে স্বাভাবিক। অমৃতলালের স্বদেশভক্তি ও স্বদেশীভাবনা দেশে ও বিদেশের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জারিত হয়েছিল। কিন্তু তার প্রকাশের দুটি পথ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর স্বদেশীয়ানা ও অসাধারণ ইংরিজিভাষায় অধিকার সত্ত্বেও তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হননি বলে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মতামতের পাশাপাশি সাধুদের প্রতি অকৃপণ ঔদার্য তাঁকে অনন্যতা দিয়েছিল। অন্যদিকে, স্বদেশভক্তি প্রসূত দেশীয় শিল্পের বিকাশ সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর প্রায়োগিকজ্ঞানের অভাব তাঁকে এই কর্মোদ্যমের মধ্যে সম্পৃক্ত করেনি। অর্থবলের অভাব এই ত্রুটিকে প্রকট করেছিল। ফলে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর সহযোগীদের থেকে তিনি ছিলেন একেবারে পৃথক গোষ্ঠীর। একইসঙ্গে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল ইংরিজিতে যার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে বাধা দিয়েছিল। একই সঙ্গে তাঁর ব্যর্থতার সঙ্গে প্রতিতুলনায় বাংলা-ইংরিজি বা প্রবাসী মডার্ন রিভিউ এর মালিক-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাফল্য সহজেই চোখে পড়ে। ইংরিজি আত্মজীবনীর লেখক হওয়া সত্ত্বেও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনও সুযোগ তিনি পাননি। তবু, নানা দ্বন্দ্বে দীর্ণ এই ব্যর্থ প্রতিভাবান স্বদেশ ভক্তের কথা বাঙালী জীবনের নানা জটিলতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

সুত্র-নির্দেশ

১. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, *অটোবায়োগ্রাফি অফ এ বেঙ্গল কেমিষ্ট*, কোলকাতা, ১৯৫৮ খ্রি: অমিত ভট্টাচার্য, রাগুম নোট্‌স অন বেঙ্গলী এন্টারপ্রাইজ, *জার্নাল অফ হিষ্টরি*, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম ৫,১৯৮৪ ইত্যাদি

২. সুকুমার সেন, *রেলের পা-চালি*, পৃ-১৭, কলিকাতা, ১৯৯০

৩. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

৪. এডিনবার্গে মুষ্টিমেয় ভারতীয় থাকতেন। তাই ১৮৮৩ সালে একটি ভারতীয় সংসদ গড়ে উঠলেও ১৯১৩ সালে সংসদের নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠে। এম.এম. জাকি, এডিনবার্গ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, মডার্ন রিভিউ, মে, ১৯১৩

৫ অমৃতলাল রায়, *রেমিনিসেন্সেস ইংলিশ এণ্ড আমেরিকান।* দুষ্প্রাপ্য এই বইটি লেখা হয়েছিল এমন সময়ে যখন সবেমাত্র রমেশচন্দ্র দত্তের এ ধরনের আত্মজৈবনিক রচনা লিখিত হয়েছে।

৬. থ্যাকার্স ইণ্ডিয়ান ডিরেক্টরী, ১৮৯২ ও নিমাই সাধন বসু, রামানন্দ চ্যাটার্জী, নিউদিল্লী ১৯৭৪

৭. *হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অ্যাহেড অফ দ্য টাইম,* অমৃতলাল রায়, অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৫

৮ ঐ

৯ ঐ

১০. সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

১১. সুভাষচন্দ্র সেন, *বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী ঃ এ স্বদেশী এন্টারপ্রাইজ,* অভিজিৎ দত্ত ইত্যাদি (সঃ) এক্সপ্লোসনস ইন হিস্টরি, কলকাতা ২০০৩

১২. এডুকেশন গেজেট, ২০ শ্রাবণ ১৩০০

১৩ *সঞ্জীবনী,* জুলাই-আগস্ট ১৮৯৫, রিপোর্ট ইন দ্য নেটিভ নিউসপেপারস ১৮৯৫

১৪. মৃণালকুমার বসু, এ নোট অন এ ট্রেডিং ফ্যামিলি অফ মফঃস্বল বেঙ্গল, প্রসিডিংস ইণ্ডিয়ান হিষ্টরী কংগ্রেস, ১৯৮৬

১৫. সুধীর কুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড পৃ : ৮০

১৬. *দ্য ইণ্ডিয়ান মিরার,* ৪ এপ্রিল, ১৮৯৫

১৭. *সঞ্জীবনী,* ১৩ জুলাই, ১৮৯৫, রিপোর্ট অন দ্য নেটিভ নিউসপেপার্স, ১৮৯৫

১৮. *সঞ্জীবনী,* ৩ আগস্ট, ১৮৯৫ ঐ

১৯. *সঞ্জীবনী,* ১০ আগস্ট, ১৮৯৫ ঐ

২০. *সমাচার চন্দ্রিকা,* ৫ নভেম্বর, ১৮৯৫, রিপোর্ট অন দ্য নেটিভ নিউসপেপারস ১৮৯৫

২১. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*

২২. সম্প্রতি এই প্রাচীন ইমারতটি ভেঙ্গে এক সরকারী ভবন তৈরী হয়েছে।

২৩. থ্যাকার্স ইণ্ডিয়ান ডিরেক্টরী, ১৮৯৯

২৪. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পূর্বোক্ত

২৫. থ্যাকার্স ইণ্ডিয়ান ডিরেকটারী, ১৯০০;মফঃস্বল ডিরেকটরীতেও ১৮৯৯ অমৃতলালের ঠিকানা ছিল মগরা।

২৬. লালা লাজপৎ রায় ১৯১৪ তে আমেরিকা যান ও দেশে ফেরেন ১৯২০ এর ফেব্রুয়ারীতে, ফলে তার আগেই ঘনিষ্ঠতা হয়, দ্রষ্টব্য, ভি.পি. যোশী, *লাজপৎ রায় অটোবায়োগ্রাফিকাল রাইটিংস,* পৃ xviii নিউ দিল্লী, ১৯৬৫

২৭. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*

২৮. দ্য বেঙ্গলী, ৩ অগস্ট, ১৯২১ আরো বলে যে "Who in any other Country would have made himself a centre of power and influence".

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন ও লোকশিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ

কাকলি সিংহ

"মাটি তোদের ডাক দিয়েছে—
আয় রে চলে আয় আয় আয়।" (চণ্ডালিকা)

রবীন্দ্রনাথ কবি। শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর আবির্ভাব বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের স্কুল শিক্ষার স্মৃতি পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাদর্শনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলো। তিনি বুঝে ছিলেন দেশবাসীকে স্ব-শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন-"ভারবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে[১]।" পল্লীর উন্নতি না করে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। দেশ সেবা করতে হলে সর্বাগ্রে গ্রামসেবা প্রয়োজন। গ্রামীন উন্নতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-" আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতে হইবে। ....চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তান-দিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব ....."[২]।

যে শিক্ষার সঙ্গে লোকসমাজের প্রত্যক্ষ যোগ আছে তাই লোকশিক্ষা। লোকশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারের প্রজাদের মধ্য দিয়ে শুরু করেন। "১৮৯০ সালে নিছক পারিবারিক ও বৈষয়িক কারণে জমিদারি পরিদর্শনের ফলশ্রুতিতে কবি চিত্তে যে গ্রামচেতনা পল্লী পুণর্গঠন ও সংগঠন মুখী নানা পরিকল্পনা ক্রমশঃ দানা বেঁধে ওঠে তা শিলাইদহ, পতিসর, শান্তিনিকেতনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী কর্মচেতনার স্তর অতিক্রম করে শ্রীনিকেতনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে"[৩]।

গ্রামীন উন্নয়ন সাধনের জন্য, গ্রামের সাধারণ মানুষের এবং পল্লীর কৃষিজীবিদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু উন্নয়ন মূলক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীন মানুষদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পতিসরে তাঁর পল্লীসংগঠনের কাজ শুরু করেন[৪]। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠনের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় জানিয়েছেন শিলাইদহে কিশোরদের নিয়ে কবির পল্লীসংগঠনের কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্ব শুরু হয় ১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ সালে[৫]। শিলাইদহে কাজের তিনটি ধারা ছিল—

ক) হাতে কলমে শিক্ষা।

খ) আদর্শ গ্রাম তৈরী।

গ) ব্রতী বালকদল গঠন[৬]।

জমিদারির পুরাতন নিয়মকানুন সংস্কার করে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যে পদ্ধতি চালু করেছিলেন তার নাম 'মন্ডলী প্রথা'। "জমিদারির প্রধান কাজ অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার, পথঘাট সংস্কার, কূপ-পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির সঙ্গে সমবায়। ধর্মগোলা, মহাজনদের কাছ থেকে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা করা এবং কুটিরশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি জনকল্যানমূলক কাজ পল্লীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যাতে জমিদার ও প্রজার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রচেষ্টাই করেছিলেন মন্ডলী প্রথার মাধ্যমে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ বলতেন-...."একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই। আজ তাহার সংগে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে।"[৮] এইজন্য বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ, কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার ও গো-পালন বিদ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ, বন্ধু শ্রীশচ্চন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। গ্রাম জীবনের প্রতিটি দিকই রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষার কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল। সমাজসেবা এবং গ্রামোন্নয়নই ছিল তাঁর কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। গ্রামোন্নয়ন উপলক্ষে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন কবি। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন-" আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয়না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই"।[৯] তিনি অত্যাবশ্যক শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন পাঠ মেশাতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহতে শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলের জন্য দিন এবং রাত্রির উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করে নিরক্ষরতা দুরীকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে পড়া, লেখা, পাটিগণিত এবং বক্তৃতার দ্বারা ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি পাঠ দেবার ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। শিলাইদহ জমিদারিতে ছোটবড় চারটি মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করে নিয়মিত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম (সদর পতিসর) পরগনায় রবীন্দ্রনাথ মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের উদ্ধার করে, চাষের উন্নতি করে ঘরে ঘরে ছোট খাটো শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কালীগ্রামে কুটির শিল্পের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"মুসলমানদের মধ্যে কয়েক ঘর জোলা ছিল তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতের কাপড় বোনা শেখবার জন্য। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল, সাধারণ ফাণ্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়ন

শিক্ষার ইস্কুল খোলা হল"।[১০] ১৮৯৩ সালে তিনি শিলাইদহে কৃষিব্যাংক স্থাপন করেছিলেন।[১১] ১৯০৫ সালে পতিসরে 'সমবায় ব্যাংক' স্থাপন করে নোবেল প্রাইজের সমস্ত টাকা (১,০৮,০০০) ঐ ব্যাংকে রেখেছিলেন। পতিসরে চিকিৎসাকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং বয়নশিল্প স্থাপন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯১৬ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী পতিসর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ভাজন প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন-"পতিসরের পল্লী সংস্কারের কাজটা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেছে।"[১২]

কবির পল্লী সংগঠনের কাজে নতুন মাত্রা সংযোজন করলো শান্তিনিকেতন (১৯০১) এবং শ্রীনিকেতন (১৯২২, ৬ই ফেব্রুয়ারী)। এই দুই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "ভারতবর্ষে প্রাচীন কালচারের প্রতি আমার যে অনুরাগ তার অভিব্যক্তি এই 'শান্তিনিকেতন'। আর আমার দেশবাসী কোটি কোটি নরনারী যারা সারা বৎসর একদিনও পেটভরে আহার করতে পায় না তাদের প্রতি আমার অন্তরের যে বেদনা তার অভিব্যক্তি হবে এই 'শ্রীনিকেতন'।[১৩] প্রমথনাথ বিশী বলেছেন-"সত্যকার দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একই ভাবের ভিন্ন বিকাশ মাত্র;একটি শিশুচর্যা প্রতিষ্ঠান আর একটি বয়স্ক শিশুচর্যার স্থান"।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র স্মৃতি প্রবন্ধে সুন্দর বিররণ দিয়েছেন—"আশ্রমের এক একটি ছেলে গ্রামের এক একটি ছাত্রের ভার লইত। সেই তাহাকে বাংলা লেখা পড়া ও অংক শিখাইত। নিয়মিত পাঠের পরে কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা হইত। তাহাতে গ্রামের ছেলেরা আনন্দ পাইত। আশ্রমের মতো গ্রামেও গাছের তলাতেই আমাদের ইস্কুল বসিত"। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে ইংল্যান্ড থেকে লেনার্ড এলমহার্স্ট এলে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন পরিকল্পনা বা 'শ্রীনিকেতন' পূর্ণ রূপ পায়। জীবনের সমস্ত রকম সৃষ্টি ও কাজের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তার আয়োজনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র তৈরী হয় এই শ্রীনিকেতনে।

শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ভাবনাগুলি বাস্তবায়নের পথ-প্রদর্শন করেছিলো। এখানে গবেষণা মূলক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। গ্রামের জনসাধারণকে তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এবং তাদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্রদের মধ্যে সার্বিক শিক্ষার বিস্তার করে তাদেরকে দেশের সুযোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। শ্রীনিকেতনের কর্ম ধারাকে কতকগুলো বিভাগে ভাগ করা হয়েছিলো—

ক) কৃষি

খ) শিল্প

গ) গ্রামকল্যাণ

ঘ) শিক্ষা

কৃষিবিভাগ ঃ—এই বিভাগের অধীনে গ্রামের জনসাধারণকে উন্নত প্রথায় কৃষিকার্যে শিক্ষা দেওয়া ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ফলের বাগান তৈরী, গো-পালন, মুরগী পালন, গুটি পোকার চাষ ও মৎস চাষ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

শিল্প বিভাগ ঃ— এখানে বিভিন্ন কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তাছাড়াও দেশীয় বিভিন্ন মৃত শিল্পকে জাগিয়ে তোলা, স্থানীয় শিল্পীদের নানা ভাবে সাহায্য করা নূতন শিল্পের প্রচলন করা ইত্যাদি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো।

গ্রাম-কল্যাণ বিভাগ ঃ—এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল গ্রামবাসীদের নানা সমস্যার সমাধানে তাদের সাহায্য করা।

শিক্ষাবিভাগ ঃ—গ্রাম কল্যাণ বিভাগের পরিচালনাধীনে নৈশ বিদ্যালয়, স্কাউট ট্রুপ, ট্রেনিং ক্যাম্প এবং অন্যান্য বিভাগগুলোর কিছু পরে শিক্ষা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য পৃথক একটি শিক্ষা বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। এই বিভাগে চার রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি হল—

ক) পল্লীসংগঠন প্রণালীতে ডিপ্লোমা (১৯২২) কলেজের ছাত্রদের জন্য।

খ) শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় (১৯২৪) গ্রামের কিশোরদের জন্য।

গ) লোকশিক্ষা সংসদ (১৯৩৬) ইস্কুল কলেজে না পড়ে যাঁরা বিদ্যাচর্চা করতে চান তাদের জন্য।

ঘ) শিক্ষাচর্চা ভবন (১৯৩৭) প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষকদের জন্য।[১৪]

লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য রবীন্দ্রনাথ অখন্ড বাংলার শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হককে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে গড়ে তোলা হয় লোকশিক্ষা সংসদ। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক 'বিশ্বপরিচয় '(১৯৩৭)' বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) রচনা করেন। লোকশিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠাকালে সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৭-৪০) এবং সহ সম্পাদক ছিলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের অনুষ্ঠান পত্রে (১৯৪০, সেপ্টেম্বর) লোকশিক্ষা সংসদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন-"প্রাথমিক শিক্ষা বলিয়া বিশেষ ভাবে পল্লীবাসীর জন্য পরিমিত কোন জ্ঞান বিতরণ এই সংসদের উদ্দেশ্য নহে। দেশের

জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে আধুনিক যুগের উৎকর্ষ প্রাপ্ত সর্ব প্রকার বিদ্যানুশীলনের প্রচার সাধন এই সংসদের উদ্দেশ্য"। এখানে প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা ছিলো।

এই শিক্ষাধারার ছটি পর্যায় ছিল-আক্ষরিক, প্রাথমিক, প্রবেশিকা, আদ্য, মধ্য এবং অন্ত। পরীক্ষার্থীদেরকে নীচের দিকে অভিজ্ঞান পত্র এবং শেষ পরীক্ষায় সাহিত্য ভারতী, সাহিত্যতীর্থ, ইতিহাসভারতী বা ইতিহাসতীর্থ উপাধি দেওয়া হোত। এই প্রতিষ্ঠানে এক সময় ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দেড় হাজার পর্যন্ত উঠেছিল।[১৫]

লোকশিক্ষা সংসদ বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেলেও এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। কারণ জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন, জাতীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ, জাতীয় মূল্যবোধের বিকাশ সাধন একমাত্র লোকশিক্ষা বিস্তৃতির মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। পরাধীন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষাবিভাগ) কবির আহ্বানে সাড়া না দিলেও স্বাধীন দেশের সরকার বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কবির আশাকে, কবির চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। বর্তমানে অ-বিধিবদ্ধ (Nor-Formal) শিক্ষার প্রতিটি উদ্যোগের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনাগুলি কম বিস্তর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার বিবিধ উদ্যোগের পরীক্ষামূলক ভিত্তি হিসাবে লোকশিক্ষা সংসদকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠনের চিন্তা-ভাবনা তাঁকে শিক্ষা সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। শ্রীনিকেতন বিশ্বমানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষা বিস্তারের বাস্তব প্রতিফলন। ভারতে গ্রামোন্নয়নের তিনিই পথিকৃৎ।[১৬] তাঁর প্রবর্তিত 'মন্ডলী প্রথা' বর্তমান পঞ্চায়েত পদ্ধতির অগ্রদূত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ যে রীতিতে গ্রামোন্নয়ন করেছেন বর্তমান ভারতবর্ষ তার অনেকখানিই গ্রহণ করেছে।

সূত্র-নির্দেশ

১. *রবীন্দ্ররচনাবলী* ২৭, পল্লী প্রকৃতি, অভিভাষণ, বিশ্বভারতী পৃ-৫৬৫।

২. *রবীন্দ্ররচনাবলী* ১২, পঃ বঃ সঃ, পৃ-৭৫১।

৩. ডঃ সুকুমার মল্লিক, *রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা,* নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ-১৭৫।

৪. উমা দাশগুপ্ত, *শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন,* বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪০৪, পৃ : ১৪

৫. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ,* জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, পৃ-৬৮।

৬. তদেব, পৃ-৭১।

৭. ডঃ সুকুমার মল্লিক, *রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা,* নবপত্র, প্রকাশন, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পৃ-৯

৮. *রবীন্দ্ররচনাবলী* ২৭, পল্লী প্রকৃতি, ভূমিলক্ষী, বিশ্বভারতী, পৃ-৫২৬।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষা, শিক্ষার হেরফের,* বিশ্বভারতী পৃ-১৪

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি,* জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ-২১৫

১১. Sudhir Sen, *Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction,* P-93
১২. ডঃ সুকুমার মল্লিক, *রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা,* নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ-১০৮।
১৩. চিত্তরঞ্জন দেব, *শ্রীনিকেতন পরিচয়,* পৃ-১।
১৪. উমা দাশগুপ্ত, *শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন,* বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪০৪, পৃ-১৬।
১৫. প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়, *গ্রাম সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ-২৭।
১৬. *তদেব,* পৃ-২১।

সংবাদ প্রভাকর ও ঈশ্বরগুপ্ত

অঞ্জলি দাস

ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন হরিনারায়ণ দাসের দ্বিতীয় পুত্র। ১২১৮ সনের ২৫ শে ফাল্গুন কাঁচরাপাড়ার কবিরাজি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পরবর্তীকালে এই ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্কিমের ভাষার খাঁটি সেকেলে বাঙালী কালব্যাপী তুফান তুলেছিলেন সাংবাদিকতার জগতে। কোন অভিজাত ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত তিনি ছিলেন না। তাঁর রচনা তাঁর ব্যঙ্গ প্রবণতা অশ্লীলতা শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্য। একথা ঠিক যে সেই যুগে অশ্লীলতাপ্রিয় ছিল প্রায় সকলেই। আগেকার রুচি এখনকার মত ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে কোন অশ্লীলতা ছিল না। বরং তিনি সাধু প্রকৃতির ছিলেন। রসিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত যাহার উদ্দেশ্য তাহার ভাষার রুচি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে হইলেও অশ্লীল নহে"।[১]

তিনি ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর বার বছর পরে লিখলেন—"As a writer of light satiric verse he occupies the first place and he owned his success as a poet and as an editor to this special gift ....(Calcutta Review-1817) বঙ্কিম চন্দ্র বলতেন—"ঈশ্বরগুপ্তের যে ইয়ারকি তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া বাঙ্গলা সহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন" আমার বিশ্বাস তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সুশিক্ষিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত।[২]

'প্রভাকর' দৈনিকের জন্ম মাত্র তিনবছর বয়সেই কলম ধরে কবিতা লিখেছিলেন যিনি

'রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়াতে কল্‌কেতায় আছি'

তিনি সৃষ্টি করলেন সাংবাদিকতার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'সংবাদ প্রভাকর'। বয়স তখন তাঁর মাত্র উনিশ। ১২৩৭ সনের ১৬ই মাঘ যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সাহায্যে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামে এক সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় প্রভাকর দৈনিকে পরিণত হয় যা ভারতের দেশীয় ভাষার দৈনিক সংবাদ পত্রের মধ্যে প্রথম দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ঈশ্বরগুপ্তের মাতার বাড়ীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীর পরিচয় ছিল নিবিড়। সেই সূত্রে কোলকাতায় থাকার সময় ঠাকুর বাড়ীর গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয়-পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্বই ঈশ্বরগুপ্তকে সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের সুযোগ এনে দেয় যা তাঁর যশোকীর্তির সোপান স্বরূপ। বাংলা সাহিত্য 'প্রভাকর' সংবাদপত্রের কাছে চিরঋণী থাকবে। প্রভাকরই ছিল তখন বাংলা সাহিত্যের চারণ ভূমি!

সংবাদ প্রভাকর
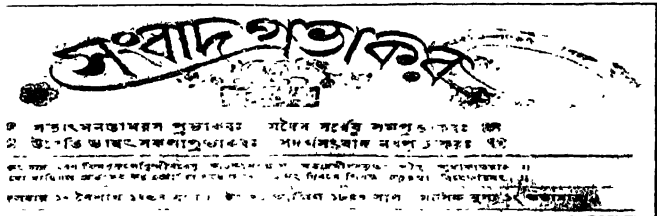
এক যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রভাকরের পথ চলা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম তিন দশক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্খা বাংলায় যে ভাবে দেখা দিয়েছিল তা আর অন্য কোন রাজ্যে দৃশ্যত হয়নি। নবীন ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে কয়েকজন আবার পাশ্চাত্য জীবন দর্শনে প্রভাবিত হয়ে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। এঁরা ডিরোজিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। ডিরোজিওর জীবনাদর্শে প্রেরণা পেয়ে তাঁরা সংস্কারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একদিকে রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন অপর দিকে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ও পাশ্চাত্য আদর্শের আঘাতে সমাজজীবন যখন আলোড়িত হচ্ছিল সেই সময় রামমোহনের বিলাতযাত্রার ফলে তাঁর কাঙ্খিত পথে সংস্কারপন্থীরা এগিয়ে যেতে পারলেন না। মনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব থাকা স্বত্ত্বেও তাঁরা রক্ষণশীলদের সঙ্গে সরাসরি বিদ্বেষ বিরোধ না করে ব্রহ্ম উপাসনা ও পুতুল পূজা দুটোকেই প্রথা হিসাবে গ্রহণ করে আপোসে চলার নীতি গ্রহণ করলেন।

সে সময় সমাজে লক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সতীদাহ প্রথা বন্ধ, ধর্মসভা স্থাপন, ডাফের সস্ত্রীক আগমন ইত্যাদি ঘটনাগুলি। এমনই আলোড়িত সমাজে এক যুগ সন্ধিক্ষণে 'প্রভাকরের' জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার "এই প্রভাকর ঈশ্বরগুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি"।

ঈশ্বরগুপ্তের এ সময় অনেকেই রক্ষণশীল হিন্দুদলভুক্ত বলেছেন। কিন্তু সেই সময় হিন্দুসমাজের আদর্শগত দিকটিও বিবেচনায় আনা উচিত হবে। রামমোহনের বিলাতযাত্রার পর সমাজে রক্ষণশীলদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। উদার ব্রাহ্মসভাপন্থীদের মানসিক আস্থা দৃঢ় ছিল না। সমাজের পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে যুবক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সাধারণ জনস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত

পরিবারে বড় হয়ে ব্রহ্মসভাপন্থী বা মডারেট কোন দিকেই প্রবেশের যোগ্য শিক্ষা ও আর্থিক সঙ্গতি কোনটাই তাঁর ছিলোনা। তথাপি তিনি স্বতন্ত্রতাকে জলাঞ্জলি দেননি। যদি তিরিশের দশকের সংবাদ প্রভাকর উদ্ধার হত তাহলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হতো।

প্রথম দিকের 'সংবাদ প্রভাকর' ধর্মসভার মুখপত্র সমাচার চন্দ্রিকার প্রতিচ্ছবি না হলেও কিছুটা সহযোগীর মত দৃশ্যমান ছিল। তিরিশের শেষদিকে সমাজের ভিন্নমুখী গতিধারা তাঁর কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পত্রিকাটির পরবর্তী রচনাবলীগুলিতে তাঁর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ স্পষ্ট হয়ে থাকে। চল্লিশের পর থেকে প্রভাকর স্বতন্ত্র উদারপন্থী হিন্দুমধ্যবিত্তের মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৩] বাংলার নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশ স্বাতন্ত্র উদারপন্থী এবং বিকাশোন্মুখ বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবশত প্রভাকরের প্রতি তাঁদের অনুরাগ প্রকাশ করেন। পঞ্চাশের শিক্ষিত তরুণদের কলমচালনা প্রমাণ করে যে স্বতন্ত্রতা ও উদার মনোভাবের জন্যই তাঁরা প্রভাকরের লেখক হয়েছিলেন।

বিদেশী শাসনের পটভূমিতে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের অসন্তোষগুলি সে সময় সাহিত্য রচনা, সংবাদ প্রচার ও নানা রাজনৈতিক সমিতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর উপর বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্য প্রথমে ও পরে অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যের ইয়োরোপীয় দর্শন তার ভাবধারা শিল্পশৈলী গ্রহণ করা হলেও পশ্চিমের হুবহু অনুকরণ ছিল না। উপনিষদ, দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও বিষয় নির্বাচন ও শব্দ চয়ন বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা এনে দেয়। বাঙালির মনে যে রাজনৈতিক চেতনা বোধ জাগ্রত হয়েছিল তার সঙ্গে নতুন যুগের সাহিত্যের প্রভাব জাতীয়তা বোধের স্ফুরণে সহায়তা করেছিল। এমনই যুগ সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরগুপ্তের লেখার মধ্যে আমরা প্রথম সেই জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখতে পাই। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ও পাশ্চত্য আদর্শের প্রতি মোহগ্রস্তদের তিনি বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা সচেতন করেছিলেন। তাঁর বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও স্বাধীন নির্ভীক সাংবাদিকতা জাতীয়তাবোধের পথকে প্রশস্ত করেছিল এবং মোহগ্রস্তদের মোহভঙ্গের হাতিয়ার রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

'সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে প্রভাকর ভয়ার্তকণ্ঠে ব্রিটিশ রাজভক্তির আতিশয্য প্রকাশ করেছে।[৪] 'বিধবা বিবাহ' সম্বন্ধে অনুদার সমালোচনা করতে পশ্চাদপদ হননি। তেমনি স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কথা আধুনিক শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনের কথা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা, বিজ্ঞানশিক্ষা, শিল্প শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ করে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধির বিভিন্ন পথ যুক্তিসহকারে বর্ণনা করেছেন। তথাপি তিরিশের প্রত্যক্ষ ও প্রবল সামাজিক সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রভাকর স্থির বিচারবুদ্ধির হাল ধরে রাখতে পারেনি।[৫]

পরবর্তী কালে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সেই সভায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল কিন্তু স্বধর্মের স্বামী লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মদের মতন কোন পৃথক ধর্মচক্র সংস্থাপন তিনি হয়ত অনাবশ্যক মনে করতেন। সমাজের কল্যাণকর কাজে ঈশ্বরগুপ্ত সমাজকল্যাণ কর্মে ব্রতী ব্রাহ্মদের সঙ্গে থেকেও নিজের হিন্দুত্ব বজায় রেখেই চলতেন। এতে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল পরবর্তীকালে হিন্দুদের ধর্মসভার প্রতি 'প্রভাকরে' কঠোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩৩ সালে ২৭ শে জানয়ারী ধর্ম্মসভা স্থাপনের পর তাদের কর্ম্মপদ্ধতি দেখে স্বভাবজাত বাচনভঙ্গীতে কৌতুকরস মিশ্রিত করে সম্পাদকীয় লেখেন—"ধর্মসভা" এই শব্দটি শুনতে অতি উত্তম কারণ 'ধর্ম' শব্দটি অতিশয় জাঁকজমক পূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের ধর্ম অন্বেষণ করলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না। কেননা এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে।......কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্মাণ প্রতিভা দলাধক্ষ্য মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে (সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্তে) সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন। সে ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে পরিলেন না। 'ধর্ম্ম' আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহাদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন। অর্থাৎ মৃত মহাত্মা লর্ড বেন্টিক বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আপিল করেন সেই আপিলের মোকদ্দমায় পরাজয় হইলেন; চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা ন দেবায় ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়ভুড়ি কাটিত। তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যাথার ব্যথী ব্যাথীসাহেবের উদরায় স্বাহা হইল। মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সদস্যেরা আর কি করিবেন, ভাবিয়া পান না, সভার কাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনি ও রাঁধুনি মাত্র সার হইল। মনসার কাঁদুনি কত গাহিবেন, পরিশেষে বড় ২ চাঁই মহাশয়েরা বুদ্ধির খেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া ধরিলেন। সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষে ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সৎকার্যের সৎকার্য হইল, আর পূর্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না। দলপতিরা দলচক্রে পড়িয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন। মহামতি সভাপতি সভার গৃহে এক হাড়িকাষ্ঠ লগ্ন করিলেন, তাহাতে প্রতিদিন শত শত ব্রহ্মবলি হইতে লাগিল। ... যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবক সেই শূদ্রেরাই ভূদেব দিগের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে লাগিলেন।[৮]

ধর্ম্মসভার সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি 'প্রভাকরের' স্পষ্ট ভাষণ ছিল যে সম্পাদককে কখনও তাঁর বক্তব্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁর অভিপ্রায়কে বিক্রি করতে নেই। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু তাই কবছেন বলে ঈশ্বরগুপ্তর মতে এভাবে নিজস্ব সত্তাকে বিক্রি করে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করাই তাঁর পক্ষে উচিত কাজ হয়নি।

ধর্ম্মসভা পচিরচালনার ক্ষেত্রে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁর নজরে আসত তিনি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে 'প্রভাকরে' কৌতুক সহ তা প্রকাশ করতেন। 'চন্দ্রিকা' পত্রে একটি পত্র পরিবেশিত হয়েছিল ধর্ম্মসভায় কার্যধারাসম্বন্ধে। সেটি পাঠ করে 'প্রভাকর

সম্পাদক তাঁর হাস্য সম্বরণ করতে পারেননি। পত্রটি নিম্নরূপ—

"মহামহিম শ্রীযুক্ত ঃ দেব দত্ত রাজা বাহাদুর দলপতি মহাশয় ধার্মিক বরেষু"।

"আমাদিগের এ বাটির সকলে শারিরীক ভালো আছেন। তাহাতে ভাবিত নহিবেন, যাতায়াতে তখনকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। গত পরশ্ব দিবস আমাদের ও বাড়ীর বড় মহাশয়ের পিশের শালার মামার মেসোর দাদার খুড়ার জামায়ের ভেয়ের মামাশ্বশুর পদব্রজে গমনকালীন সিংহ বাবুদের বাটির সংলগ্ন এক পুরাতন প্রাচীরের একখানা পতিত পাটকেল স্পর্শ করিয়াছেন। অতত্রব সভার-রীতি মতে তাহাকে দল হইতে পরিত্যাগ করা উচিত হয় ইত্যাদি' "ধর্মসভা সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে বিদ্রূপ করতেন তাতেই বোঝাই যায় যে তিনি ধর্মাত্মা হিন্দু হলেও তিনি মেকি ধর্ম এবং মেকি মানুষের শত্রু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন "ঈশ্বরগুপ্ত মেকির বড় শত্রু।" নতুন যুগের সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে প্রত্যক্ষ করে নিজের বুদ্ধি, একাগ্রতার সাহায্যে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি আধুনিক পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

তৎকালীন সমাজে যখন আধুনিক শিল্পস্থাপন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার সাহায্যে উৎপাদন, কারিগরীবিদ্যার কারখানা ইত্যাদির কথা উপলব্ধিতেও আনেননি তখন ঈশ্বরগুপ্তের কালোপযোগী চিন্তার পরিচয় প্রভাকরের লিখিতসম্পাদকীয় পাঠকরে জানতে পারা যায়। প্রভাকরের অর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এদিক দিয়ে 'আধুনিক' ও কালানুবর্তী বলতে বাধা নেই।[৮] এদেশীয় লোকের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তাদের প্রধান দোষ হলো আলস্য। তারা অল্প সুখের মুখ দেখলেই পরিশ্রম করতে চায় না অথচ এই দেশে এমন দ্রব্য উৎপাদিত হয় তা শিল্পবিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইংরেজদের বাণিজ্য তা প্রমাণ করে। তিনি আরো বলেন "বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাদুর্ভাব না হইলে কোন রূপেই দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই" (সম্পাদকীয় ১২.৭.১৮৪৭) তাঁর মতে বিজ্ঞানে উন্নতি করেই ইংরেজজাতির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এদেশেও বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যখন এদেশেও শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয় তখন তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সম্পাদকীয় লেখেন—সম্পাদকীয়" ১২.২.১২৬১—

আমরা পরম আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগরস্থ লোকদিগের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেবার নিমিত্ত কতিপয় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহী মহানুভব একত্রিত হইয়া এক শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনাপন সন্তানদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যোপার্জ্জনায় প্রেরণে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিবেন ....শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ নারায়ণ (চন্দ্র) সিংহ বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগের চীৎপুর রোডে যে অপূর্ব অট্টালিকা আছে তাহা বিনা ভাড়ায় সমর্পন

করিযাছেন এবং নিম্নলিখিত মহোদয়েরা নীচের লিখিত মুদ্রা দান করিয়াছেন ।

	এক কালীন দান	মাসিক দান
শ্রীযুক্ত এচ গুড উইল	১০০	১০
শ্রীযুক্ত সি আলান	২০০	১০
শ্রীযুক্ত এসকট মিলস্	১০০	৫
শ্রীযুক্ত আর বার্লো	১০০	৫
শ্রীযুক্ত আলথর বুলার	১০০	৫
শ্রীযুক্ত জে কলবিল	১০০	৫
শ্রীযুক্ত সিসিল বিডন	১০০	১০
শ্রীযুক্ত রি, পিকক	১০০	৫
শ্রীযুক্ত বামগোপাল গোষ	১০০	৫
শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ	২০০	৮
শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর	—	৫
শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর	১০০	১০

প্রমুখ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ দান করেছিলেন।[৯]

শিল্পবিদ্যার প্রতি অনুরাগে তিনি যেমন খুশী হয়েছিলেন তেমনি আক্ষেপ করেছেন যখন তিনি দেখলেন এ দেশের লোকেরা আলস্যের অনুগামী হযে শিল্পবিদ্যাব অনাদর কবছেন। তাবা শিল্পবিদ্যার লিপ্ত হওয়া অপমান বোধ করেন। বাবু হয়ে থাকতেই ভালোবাসেন। তিনি বাবে বারে পত্রিকার মাধ্যমে 'মেকানিক ইনস্টিটিউশন' পুনর্স্থাপন বিষয়ে আবেদন জানান।

সেসময় কুমারহট্টের বিদ্যালয়, হিন্দু স্কুলের ও হুগলী কলেজের বিবরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা. বঙ্গভাষার অনুশীলন, শিক্ষার ভাষা কি হবে ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য প্রভাকরে প্রকাশিত হত। শিক্ষার ভাষা কি হবে সে বিষয়ে একটি সম্পাদকীয়—১৯ শে চৈত্র ১২৫৪—প্রশ্ন উঠিয়াছে এদেশে কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাংলা এবং ইংরাজীর স্বপক্ষে ও 'বিপক্ষে বহু লোক মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ....একটি জাতির ভাষা ইচ্ছা করিয়া বদলাইয়া দেওয়া যায় না। তাই ইংরাজী ভাষার প্রসারের জন্য যে পরিমান অর্থব্যয় করা হইতেছে তাহা যদি বাংলাভাষা প্রসারের জন্য ব্যয় করা হইত তবে দেশের অনেক উপকার হইত।"[১০] সম্পাদকীয়তে হজসন সাহেবের মতকে শিক্ষাসংসদে গ্রহণ করাব জন্য বলা হয়েছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে ২৮ শে বৈশাখ ১২৫৬-র সম্পাদকীয় পাঠ করে ঈশ্বরগুপ্তর বলিষ্ঠ

মত জানা যায়—"ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়" উদ্বোধনের সংবাদ প্রচার করে বেথুন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার এইরূপ এদেশের লোকের হিতকারী অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ৮ হাজার টাকা দানের কথাও উল্লেখ ছিল।[১১]

স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—প্রকৃত স্বাধীন হইয়া সত্তা থাকাই যথার্থ সতীত্ব। বিদ্যাশিক্ষার উপায় হিসাবে লোকাচারকে অক্ষুন্ন রাখিয়া পাঁচ বছর হইতে দশ বছরের বালিকারা পাঠশালায় যাইতে পারে। এবং তাহাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এমন ভাবে প্রণীত হওয়া দরকার যাহাতে এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা প্রয়োজনীয় বিদ্যা আয়ত্ব করিতে পারে। পাঠশালায় না গিয়াও বাড়ীতেও অবশ্য শিক্ষা দেওয়া যায়। পরিশেষে বলা হয়েছে স্ত্রীবিদ্যার সুফল অনেক এবং এ বিষয়ে দেশবাসীর বিশেষ তৎপর হওয়া উচিত[১২] ২৩ শে ভাদ্র ১২৫৭ সম্পাদকীয়-বেথুন সাহেব (শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি) হিন্দু কলেজ প্রভৃতি সরকারী বিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক (বাংলা) নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ফলে বাংলা ভাষার প্রতি যত্ন বাড়িয়ে এবং সার্থকভাবে ইংরেজীচর্চা হইবে।[১৩] শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রামাণ্য ইংরেজী গ্রন্থগুলির অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় ' বেঙ্গল হরকরা ' ঐ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। সংবাদ প্রভাকরে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলা হয় "এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 'বেঙ্গল হরকরা'র মতে অনুবাদ করা উচিত নয়। কারণ অনুবাদে মূলের ভাব গাম্ভীর্য রক্ষা করা যায় না। 'হরকরার' যুক্তিকে খণ্ডন করে বলা হয়েছে। অনুবাদ করিলে দেশে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে দেশে শিক্ষিতের হার বাড়িবে। দ্বিতীয়ত অনুবাদ করিলেই মূলের ভাব নষ্ট হয় না। গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষা হইতে ইংরেজীতে বহু গ্রন্থ অনুদিত ও আদৃত হইয়াছে। (সম্পাদকীয়-১১ই পৌষ ১২৫৭)[১৪]

এইভাবে সেই যুগে দাঁড়িয়ে কোন তক্‌মা না এঁটে তিনি সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। বর্তমান সংবাদপত্রগুলি নিরপেক্ষ নামধারণ করে নানা ভাবে পক্ষপাতমূলক লেখা পরিবেশন করে থাকেন কিন্তু তৎকালীন বঙ্গ সমাজে এক 'সেকেলে বাঙালী' যে ভাবে সমাজচিত্র অঙ্কন করে গেছেন শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা করতে। স্তাবকগোষ্ঠীকে কৌতুকরসমিশ্রিত বিদ্রূপ করতে এবং দেশকে পথ দেখাতে তাঁর কলম কোন সময়েই পক্ষপাতিত্ব করেনি। তখনকার তরুণ লেখকগণ দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, গোঁসাই দাস, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বলদেব পালিত, যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রভাকরের স্বতন্ত্রতায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। মনমোহন বসু, অক্ষয় কুমার দত্তের শিক্ষানবিশী হয়েছে প্রভাকরের বার্তাপত্রে।

যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই গর্জে উঠেছে প্রভাকর। নীলকরদের অত্যাচারকে তিনি আমেরিকায় দাসদের উপরে অত্যাচারের চেয়েও ঘৃণ্য বলতে কুণ্ঠিত

হননি। নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমার বিচারকে সাদা হাকিমের দ্বারা সাদা নীলকরদের বিচারকে প্রহসন বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলতেন কালা ব্যতীত এই জ্বালা নিবারণ হবার নয় (১.১০.১২৬৫ প্রভাকর)। তুলাজাত দ্রব্যের উপর আমদানী কর রহিত করার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে বলেন—টোরিদের মঙ্গলের জন্য ভারতের ভাগ্যে এই বজ্রাঘাত। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় ব্রিটিশ গভঃ ভারতের উপর চাপালে এর বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তুলতে অভাবনীয় ভূমিকার কথা ছড়িয়ে রয়েছে প্রভাকরের পাতায় পাতায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজচিত্রের বর্ণনা যা সাময়িক পত্রগুলি থেকে সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। এ বিষয়ে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় বাংলার বিশেষ করে বাঙালীর পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলির সংকলনের যে মহামূল্যবান কাজ করে গেছেন তারই প্রথম খণ্ড সংবাদ প্রভাকরের সংকলিত গ্রন্থ। সংবাদ প্রভাকরের অনেক সংখ্যা এখনও সংগ্রহকরা যায়নি। বর্তমানে যে গুলি রয়েছে তার অবস্থাও সঙ্গীন। এমতাবস্থায় শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় যে অসাধ্যসাধন করেছেন বিদগ্ধ পাঠক সমাজ তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। এই অমূল্য গ্রন্থটি আমার আলোচ্য প্রবন্ধের পথ প্রদর্শক।

প্রভাকর সম্পাদকই এ পথের প্রথম সন্ধান দেন। তাঁরই অমূল্য কীর্তির নিদর্শন হল বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাচীন কীর্তির পুনরুদ্ধার। বাংলা দেশের লুপ্তপ্রায় কবিদের জীবনী, সঙ্গীত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তিনি সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন। আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি কোন ধনী ব্যক্তির কাছে আবেদন না জানিয়ে সর্বসাধারণের কাছে তা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রভাকরের সংকলন করাও তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি সেকাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তাঁর শরীর যখন ভেঙে পড়েছে তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন—

"আমার একান্তই অভিলাষ ছিল, একাল পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি। তাহা একত্র সঙ্কলন করত সংশোধন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে এক এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিব, তদ্ব্যতীত ও সাধ্যমত মধ্যে মধ্যে মন হইতে অতি প্রয়োজনীয় নূতন নূতন উত্তম উত্তম সকল গদ্য পদ্যে রচনা করিয়া গ্রন্থ করিব। শরীরের ব্যাঘাতে তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, এই খেদ বড় রহিল, বর্তমান দেহের ভাবে যখন আমিই আমার হইয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে পারিলাম না। তখন আমার এই অভিলাষ সুসিদ্ধ হওনের আশার উপর আর কি প্রকারে ভরসা করিতে পারি?

সংবাদ প্রভাকর—২ পৌষ ১২৬৩ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বর গুপ্ত কি চিরকাল গুপ্তই থেকে যাবেন? কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও আশার কথা কাঁচরাপাড়ার (উত্তর ২৪ পরগণায় অবস্থিত) কিছু উদ্যোগী সাহিত্য সেবী মানুষ কবিবরের

নামে একটি পরিষদ গঠন করে তাঁর জন্মদিনে গুণীজন সম্বর্ধনার মাধ্যমে উদযাপন করছেন বিগত তিন বছর ধরে। গুপ্তকবির জন্মশতবর্ষ পালিত হয়নি। কিছু উদ্যোগী মানুষ ১৯৫৭ সালের ৯ই মার্চ ঈশ্বরগুপ্তের পৈত্রিক গ্রামে ঈশ্বর গুপ্ত জন্মজয়ন্তী কমিটি জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। ৩৫ জনের কমিটি হয়েছিল একমাত্র সঞ্জীব কুমার বসু ছাড়া কেউই জীবিত নেই। মূলকমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ইলা পাল চৌধুরী। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গকে নিয়ে গঠিত কমিটি একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ সালের ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করেছিলেন বেলগাছিয়া ভিলায় (জগদীপ চন্দ্র সিংহের) প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্র চৌধুরী। পৌরহিত্য করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত।[১৫]

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙালীর ইতিহাস বোধ নেই"। ঈশ্বর গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই একথা বলেছেন।

বাঙালী এগোবে, বাংলা সাহিত্যও এগোবে। কিন্তু এক আধবার পিছনে তাকিয়ে নিজেদের ইতিহাসটা জানতে চাইলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে উজ্জ্বল হরফে অনেক নাম। যাঁদের মনের চোখ ঝাপসা হয়নি তাঁরা ঠিক খুঁজে পাবেন ঈশ্বর গুপ্তের নাম।[১৬] স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁরাও কিছু করবেন। ভাববেন সশ্রদ্ধ হৃদয়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (পঃবঃ) মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয়ের কল্যানী-হুগলীর সংযোগকারী সেতুটির নাম 'ঈশ্বর গুপ্ত সেতু' রেখে কৃতজ্ঞ ভাজন হয়েছেন। এছাড়া তাঁকে নিয়ে কোন সরকারী উদ্যোগ নেই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের আক্ষেপ দিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানছি—

স্রোতপথ ধরে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণকাল স্বল্পায়ু পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে দৈব বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুরঙ্গ মণ্ডলে
তোমার কবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে
নাহি কি কেহ তব বান্ধবের দলে,
তবচিতাভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে
স্নেহশিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল রাজা কাব্য ব্রজধামে
যমুনা করেছ পার তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভূলিল তোমা? স্মরণ নিকশে
মন্দ স্বর্ণ রেখা তব এবে নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ ভাল স্বর্ণের পরশে?

সূত্র-নির্দেশ

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কার্তিক, চৈত্র ১৪০৮, পৃ : ৩১
২. কবি ঈশ্বরগুপ্ত স্মারক গ্রন্থ, পৃ : ১১, ১২৯২ সালে প্রকাশিত/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩. *সাময়িক পত্রে,* বাংলার সামাজচিত্র, ১ম খণ্ড, বিনয় ঘোষ, পৃ : ২৭
৪. ঐ পৃ :-২৮-২৯
৫. ঐ পৃ :- ২৯
৬. ঐ পৃ :-১৬৮-১৬৯
৭. ঐ পৃ :- ১৬৯
৮. ঐ পৃ ·- ৩৩
৯ ঐ পৃ :- ৩৫১-৫২
১০. ঐ পৃ :- ২৬৯
১১. ঐ পৃ :- ২৭৩
১২. ঐ পৃ :- ২৭১-৭২
১৩. ঐ পৃ :- ২৭৩
১৪. ঐ পৃ :- ২৭৩-৭৪
১৫. সাহিত্য-সংস্কৃতি, কার্তিক-ভাদ্র সংখ্যা-১৪০৮, ভূমিকা, পৃ :- ৩০২
১৬. ঐ পৃ :- ৩৯৩

প্রতিবাদী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন

দেবশ্রী দাশ

বর্ণময় চরিত্রের অধিকারী রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সুবক্তা, সাহিত্যিক তথা নাট্যকার, সর্বোপরি একজন সমাজ-সচেতন মানুষ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হতে সাহায্য করেছিল তাঁর পরিবেশ, পারিবারিক ঘরাণা এবং বড়দাদা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সাহচর্য। সাহিত্য-রচনায় তাঁর প্রেরণা ছিলেন তাঁর বড়দাদা। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তিনি সমকালীন যুগকে আলোড়িত করেছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত মন তাঁকে সমসাময়িক কুসংস্কার ও অনাচারকে কশাঘাত করতে উৎসাহিত করেছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগণার আলিপুর মহকুমার হরিনাভি গ্রামে। সেইসময়ে হরিনাভি, রাজপুর, চিংড়ি পোতা, লাঙ্গলবেড়ে অঞ্চল ছিল সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান' বহু স্বনামধন্য পণ্ডিতের বাসস্থান এই অঞ্চল। সংস্কৃত কলেজের বহু পণ্ডিত জন্মেছিলেন এই স্থানে। এই বিখ্যাত পণ্ডিতের অন্যতম হলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও রাম নারায়ণ তর্করত্ন নিজে। এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্যামসুন্দর ন্যায় পঞ্চানন, হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, ধনেশ্বর ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, নন্দলাল বিদ্যাবগীশ, ভারত শিরোমণি, হরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি, নবকুমার ন্যায়লঙ্কার, রামকমল ভট্টাচার্য, বাসুদেব বেদান্তবাগীশ, দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, মধুসূদন বাচস্পতি, চণ্ডীচরণ ন্যায়বাগীশ,। হেরম্বচন্দ্র তর্করত্ন, রামতারণ শিরোমণি, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হরানন্দ ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী। অনধিক ছাব্বিশ জন বরেণ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপস্থিতি এই অঞ্চলকে উজ্জ্বল করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই এই স্থান পরিচিতি লাভ করেছিল দক্ষিণ নবদ্বীপ নামে। গড়ে উঠেছিল বহু চতুষ্পপাঠী। এই সংস্কৃতচর্চা তথা জ্ঞানচর্চার পরিবেশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রভাবিত করেছিল বালক রামনারায়ণ তর্করত্নকে। তাঁর পিতা রামধন শিরোমণিও ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। কিন্তু পিতার সাহচর্য তিনি দীর্ঘদিন লাভ করতে পারেনি। পিতা-মাতাকে হারান অতি বাল্যকালেই। লালিত-পালিত হন তাঁর বড়দাদা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও তাঁর পত্নীর কাছে। পড়াশোনা করেছেন দেশ-বিদেশের চতুষ্পাঠীতে। শিক্ষা করেছেন ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের

প্রথমভাগ পর্যন্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেনে। এই সময়ে তাঁর বড়দাদা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে ব্যাকরণের প্রাথম শ্রেণীর অধ্যাপক হন। ২০ মে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রামনারায়ণ বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।[১]

রামনারায়ণের কর্মজীবনও ছিল কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠ শেষ করেন। ঐ বছরেই হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় রাম গোপাল মল্লিকের গৃহে। রামনারায়ণ নিযুক্ত হন মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতর পদে। ১৫ জুন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি সংস্কৃত কলেজে ১৫ জুন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্যূন সাড়ে সাতাশ বছর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ পণ্ডিত হিসাবে তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। তখন তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৪০ টাকা। তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন সহকারী অধ্যাপক হিসাবে। তাঁর বেতন হয়েছিল তখন ১০০ টাকা। তাঁর পেনসন আবেদনপত্র সুপারিশ করেছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৬ জানুয়ারী ১ জানুয়ারী ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পেনসন মঞ্জুর হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর শূন্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।[২] তিনি ছিলেন আমৃত্যু শিক্ষক। অবসর গ্রহণ করলেও ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নিজের গ্রামে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি বিদেশী ছাত্রদের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক ১০ টাকা অনুদান প্রদান করে।[৩] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী তিনি উদরীরোগ আক্রান্ত হয়ে মারা যান। অধ্যাপক হিসাবে ন্যায়রত্ন চিলেন অত্যত জনপ্রিয়। এছাড়া ছিলেন সুবক্তা। অত্যন্ত সরসতার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণভাবে তিনি বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে পারতেন। তাঁর মিষ্টি আলাপচারিতায় মানুষ বিমুগ্ধ হতেন।

কিন্তু তাঁর আপাদমস্তক শিক্ষক সত্ত্বাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর পরিচিতি। সাহিত্যসৃষ্টির নজির তাঁর পরিবারেই ছিল। দাদা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থগুলি হল **কুলরহস্য** (১৮৪৪ খ্রিঃ), **শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণশত** (১৮৪৫ খ্রিঃ) **ধর্ম্মসভাবিলাস** (১৮৫০ খ্রিঃ), **শিবশতক স্তোত্ররত্ন** (১৮৫৪ খ্রিঃ)। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে **'সমাচার চন্দ্রিকা'**-র সম্পাদক ছিলেন।[৪] কিন্তু সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে দাদাকে অতিক্রম করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। নাট্যকার হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন নাটুকে রামনারায়ণ হিসাবে। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা তেইশটি। চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে তাঁর নাটকগুলো। সামাজিক নাটক ও প্রহসন হিসাবে পরিচিত হয়েছিল **কুলীন কুল সর্বস্ব** (১৮৫৪), **নবনাটক**

(১৮৬৬), **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল** (১৮৬৫), **উভয় সঙ্কট** (১৮৬৯), **চক্ষুদান** (১৮৬৯)। অনুবাদমূলক নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে **বেনীসংহার** (১৮৫৬), **রত্নাবলী** (১৮৫৮), **অভিজ্ঞান শকুন্তলা** (১৮৬০), **মালতী মাধবী** (১৮৬৭)। মৌলিক পৌরাণিক নাটকের গোত্রভুক্ত হয়েছে **রুক্মিনীহরণ** (১৮৭১), **ধর্মবিজয়** (১৮৭৫), **কংসবধ** (১৮৭১)। মৌলিক রোমান্টিক নাটক একটি মাত্র। তা হল **স্বপ্নধন** (১৮৭৩)। এছাড়া রচনা করেছিলেন **পতিব্রতোপাখ্যান**। পতিব্রতাদের গুণাবলী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে, তিনি দিয়েছিলেন ভাষণ। তা **'প্রকাশ্য বক্তৃতা'** হিসাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।[৫] সংস্কৃত রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল **মহাবিদ্যারাধন** নামে দশমহাবিদ্যা স্তোত্র (১৮৭০), **আর্যাশতকম্** (১৮৭২), **দক্ষযজ্ঞম্** (পূর্ব্বার্দ্ধম) ১৮৮১, **দক্ষযজ্ঞম** (উত্তরার্দ্ধম) ১৮৮২। তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সংক্ষেপে আত্মকথা লিখেছিলেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তা ভারতবর্ষে প্রকাশ করেন।[৬] রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনা ছিল প্রাঞ্জল কিন্তু অলঙ্কারবহুল। **সোমপ্রকাশ** তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল যে রামনারায়ণ রচিত আর্য্যাশতকম্ ও দক্ষযজ্ঞম্ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচনা বলে ভ্রম হয়। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ই.বি. কাউয়েল বিলাত থেকে তাঁকে কবিকেশরী উপাধি প্রদান করেন।[৭]

নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণ পেয়েছিলেন বিপুল পরিচিতি। তাঁর পূর্বে তারাচরণ শিকদার ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে **ভদ্রার্জুন** নাটক এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে **কীর্তিবিলাস** নাটক জি. সি. গুপ্ত রচনা করেছিলেন।[৮] কিন্তু সেগুলিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল। সেগুলি অভিনীতও হয়নি। নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণের প্রতিভা মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্রের সমতুল ছিল না। কিন্তু সেই যুগে তিনি নিজেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি প্রথম বাংলার মৌলিক সামাজিক নাট্যকার। বাংলা-ভাষায় সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধভাবে নাটক রচনার জন্য 'দি বেঙ্গল ফিলহার্মেনিক অ্যাকাডেমি' ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৯ মার্চের অধিবেশনে তাঁকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও 'হরকুমার ঠাকুর কনক কেয়ূর' প্রদান করেছিল।[৯] নাট্যকার হিসাবে তিনি যে পারিতোষিক পেয়েছিলেন এবং তাঁর নাটক অভিনয়ের সংখ্যা বিচার করলে তাঁর জনপ্রিয়তার পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পতিব্রতোপাখ্যান রচনা করে রংপুরের জমিদারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ৫০ টাকা পারিতোষিক। রংপুর কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী। ১৫০ টাকা ব্যয়ে এই গ্রন্ত প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁর অন্যতম নাটক **'কুলীনকুলসর্বস্ব'** রচনার জন্যও তিনি রংপুর কুণ্ডীর জমিদারের কাছে পেয়েছিলেন ৫০ টাকা। ঐ গ্রন্থ মুদ্রণের জন্যও ঐ জমিদার দান করেছিলেন ৫০ টাকা। কান্দীনিবাসী শ্রী প্রতাপচন্দ্র সিংহ

তাঁর **রত্নাবলী** নাটকের জন্য দান করেছিলেন ২০০ টাকা। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর **নব-নাটক**-এর জন্য গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছ থেকে লাভ করেছিল ১০০ টকা পারিতোষিক। এছাড়া কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক তাঁর **সুনীতি সন্তাদ** নাটকের জন্য ২০০ টাকা এবং **রুক্মিনীহরণ** নাটকের জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৫০ টাকা পারিতোষিক দান করেন। প্রহসনগুলোও যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি।

কিন্তু শুধুমাত্র পারিতোষিক বা অর্থানুকূল্য নয় তাঁর নাটক সেকালে বহুবার অভিনীত হয়েছিল নাটকগুলোর বিষয় ও রচনাশৈলীর গুণে। নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেনি। তিনি অত্যন্ত সহজ, সাবলীল, কথ্যভাষায় বাংলার সামাজিক দোষ-ত্রুটিগুলো তুলে ধরেছিলেন। তাঁর একই নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছিল বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বা কোন অভিজাত-গৃহে। **কুলীন কুল সর্বস্ব** অভিনীত হয়েছিল ১৮৫৭ খিস্টাব্দে রামজয় বসাকের বাড়িতে, ১৮৫৮ খ্রিস্টাদে গদাধর শেঠের বাড়িতে এবং ঐ সালেই চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়িতে। **রত্নাবলী** নাটক ১৮৫৮ খ্রিস্টাদে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়েছিল ছয়-সাতবার। এখানেই মধুসূদন আকৃষ্ট হন বাংলা ভাষায় নাটক রচনায়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে এবং ১৮৭৩ ও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে **রত্নাবলী** নাটক অভিনীত হয়। **যেমন কর্ম তেমনি ফল** ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আট-নয়বার অভিনীত হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারও (চুঁচুড়ামঞ্চ) মঞ্চস্থ করে এই প্রহসনটি। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে **নবনাটক** পরপর নয়বার অভিনীত হয়। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে। এছাড়া ১৮৭৩ খ্রিস্টাদে ন্যাশনাল থিয়েটার ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঐ নাটক মঞ্চস্থ করে। **মালতী মাধব** ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার এবং ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের সুযোগ পায়। **উভয় সংকট** ১৮৭০, ৭২ ও ৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাদে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে এবং ১৮৭৩ ও ৭৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় **চক্ষুদান** প্রহসনটি। তাঁর **রুক্মিনীহরণ** নাটক ১৮৭২ ও ৭৩ খ্রিস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে সর্বশুদ্ধ ১০-১১ বার এবং ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়।[১১] নাট্যকার হিসাবে তাঁর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁর পণ্ডিত হিসাবে পরিচিতিকে প্রায় ভুলিয়ে দেয়। তিনি বঙ্গসমাজে পরিচিত হন নাটুকে রামনারায়ণ নামে।

নাটুকে রামনারায়ণ ছিলেন সর্বোপরি একজন সমাজ সচেতন মানুষ। নিজে ব্রাহ্মণ। লালিত-পালিত হয়েছেন ব্রাহ্মণ সমাজে। তবুও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণ-পীড়িত সামাজিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিকে কশাঘাত করেছেন তাঁর নাটক ও প্রহসনগুলিতে।

কৌলিন্য প্রথা নিয়ে ফরমায়েসী লেখা **কুলীনকুল** সর্বস্ব। কিন্তু এই নাটটিকে ব্রাহ্মণ-দর্পণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। সেনরাজা বল্লাল সেন প্রকৃত ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সেই প্রথার কতটা অধোগতি হয়েছিল তা রায়নারায়ণ তাঁর এই নাটকে চিত্রিত করেছেন। একদিকে অনুঢ়া কন্যাদের দুর্দশা, বিধবাদের দুঃখ তিনি দক্ষহাতে মর্মস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে মিথ্যাচারী, লোভী ও মুর্খ ব্রাহ্মণদের কদাচার ও ব্যাভিচারকে তিনি তুলে ধরেছেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের ব্যাভিচার, অল্প-বয়স্কা বিধবাদের উপর একাদশীর গুরুভার তাঁকে বিচলিত করেছিল। এই নাটকের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল।

"অধর্মরুচি শুনতে পাবেন কেন? আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর বে করি নাই কতগুলো বে কল্যে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারকুড়ি পোনেরটা বে করেছন, এখন তিনি অন্তদন্তহীন হয়েছেন। তবু পেলে ছাড়েন না।

ধর্ম পুরোহিত (সহাস্য মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি আপনার বিবাহিত ৭৪টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্মরক্ষা করিতে পরেন?

অধর্ম্মরুচি—ধর্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারধারিনে, অথবা যার ধর্ম সেই রক্ষা করে...."[১২]। নব-নাটকে এবং প্রহসন উভয়-সংকটে তিনি বহু বিবাহ সমস্যারত চিত্রিত করেছেন। **চক্ষুদান** প্রহসনে পুরুষদের চরিত্রদোষ এবং **যেমন কর্ম তেমনি ফল** প্রহসনে তিনি পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তিও তার ফলাফল সম্পর্কে অলোকপাত করেছেন। **নব-নাটকে** তিনি ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে কথা বলার রীতিকে আঘাত করেছেন। গ্রাম্য ও নগরের কথোপপথনে তা পরিস্ফুট হয়।

নাগর-হাঁ, আমার হেল্‌থ মচ্‌ ইম্‌প্রুবড বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার কলকাতায় ছিলাম, টৌনের ভেতরটা না কি বড় ডার্টি তাতে তত স্ট্রং ফিল্‌ কচ্যিনে। তা ভাই তুমি একটু ওয়েট্‌ কর, আমার একটি ফ্রেণ্ড আসবে, দেখি আস্‌চে কিনা (পশ্চাদ্বর্ত্তনে প্রস্থান) গ্রাম্য (স্বগত) হরি বোল হরি? ওঁর সে পীড়া সাল্যে কি হবে? মাতৃভাষায় অরুচি, এই একটি মহৎ পীড়ান্তর উপস্থিত।"[১৩]

পতিব্রতোলাখ্যানে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি যুক্তিপূর্ণভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেছেন। শুধু ধর্ম উপার্জনের জন্য নারীদের শিক্ষা দেওয়া নয়। তার অন্যান্য দিকগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

....কিন্তু এতদ্দেশীয়া অভাগা ঘোষজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইঁহারা কন্যসন্তানকে অনাস্থা করিয়া যে বিদ্যা শিক্ষা করান না এমত নহে অস্মদ্দেশীয়রা অতি

ধনলোভি, ইঁহারা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জ্জন করিবে যে তাহাদিগাকে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক কিন্তু আমি এই ধনদাস দেশীয়দিগাকে জিজ্ঞাসা করি ধনই কি কেবল তাঁহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধবিধুর উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, সচ্চরিত্রারূপ চন্দ্রিকার প্রচার অন্তঃকরণ কৈরব প্রফুল্ল, সুখসাগর বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত, সাহসিকতার ব্যাপারে সঙ্কোচ হয়, বিদ্যার এই সকল ফল কি তাঁহারা দেখিতে পান, না। অতএব বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নয়........।"[১৪]

তাঁর সংস্কারমুক্ত, সমাজ সচেতন, প্রতিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর **প্রকাশ্য বক্তৃতা** নামক রচনায়। মেট্রোপলিটন স্কুলের হেডপণ্ডিত হিসাবে তিনি ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাতে বিদ্যাশিক্ষার উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইংরেজি শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে তিনি ছাত্রদের করেছেন ওয়াকিবহাল। আবার একইসঙ্গে মাতৃভাষাচর্চার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দেই তিনি জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষা শিক্ষার উপর। "আর তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্বক ইংরেজী শিখিবে বাঙ্গালাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই ভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষার প্রতি ধাবমান হবেন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।"[১৫]

সমসাময়িক সামাজিক সমস্যালোকে সংস্কারমুক্ত মনে তিনি আলোচনা করেছিলেন। এই মানসিকতা গড়ে ওঠার পিছনে সমকালীন সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব তাঁর উপরে ছিল। কিন্তু তাঁর স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা, সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে সমাজ সচেতন ও প্রতিবাদী করে তুলেছিল। গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে তিনি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রচবচন, শ্লোক তিনি অনায়াস দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন তাঁর রচনায়। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ তাঁর রচনাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। উনিশ শতকের সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার জন্য তাঁর নাটকগুলো পড়া একান্ত আবশ্যক।

সূত্র-নির্দেশ

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, **রামনারাণ তর্করত্ন**, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-১, কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৬, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৭।

২। তদেব, পৃঃ ১০।

৩। তদেব।

৪। তদেব, পৃঃ ৬।

৫। সন্ধ্যা বক্সী (সম্পাদিত), *রামানারায়ণ রচনাবলী,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯১, পৃঃ ২২।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, উল্লিখিত পৃঃ ৩৭।

৭। তদেব, পৃঃ ১৫।

৮। তদেব পৃঃ ১৪।

৯। তদেব।

১০। তদেব পৃঃ ৩৫-৩৭।

১১। সন্ধ্যা বক্সী (উল্লিখিত), পৃঃ ৬১-৬২।

১২। তদেব, পৃঃ ৪২।

১৩। তদেব, পৃঃ ২৪৪।

১৪। তদেব, পৃঃ ৬৩৬।

১৫। তদেব, পৃঃ ৬৭৫।

চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক

শুভেন্দু শিকদার

চল্লিশের দশকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নানা বেদনাবহ ও গৌরবময় অধ্যায়ের বলিষ্ঠ প্রতিরূপ শিল্প-সাহিত্যসহ সংস্কৃতির সমস্ত সৃজনশীল শাখায় ফুটে উঠেছে। শ্রমিক জীবন ও সংগ্রাম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে কেমনভাবে ধরা পড়েছে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

এই সময় ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বিপন্ন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা ও কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধের লাইন' (ডিসেম্বর ১৯৪১) গ্রহণ করার ফল ছিল বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক শ্রেণীর ফ্যাসিবিরোধী ভাবমূর্তির আত্মপ্রকাশ। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সামন্ত ও পুঁজিপতিদের আঁতাত বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ভবিষ্যতে' (১৯৪০) ছড়ায় 'চাষা-মজুরের' স্বাধীনতার আহ্বানের[১] পরিবর্তে স্থান নিল আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষক-মজুরের পৌরুষের প্রতিধ্বনি বিষ্ণু দে'র '২২শে জুন, ১৯৪১', সমর সেনের 'ক্রান্তি' (পূর্বনাম জাতীয় সংকট) (১৯৪২/৪৩), গোলাম কুদ্দুসের '৭ই নভেম্বর' (১৯৪২) কবিতায়। রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' (১৯৪৫) উপন্যাসে দেশীয় কৃষক-শ্রমিক সচেতনতা বৃদ্ধি বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' কবিতাতে মজুরদের শোষণের পাশাপাশি দেখানো হল কৃষক-শ্রমিক নির্ভর জাতীয় চরিত্রের শোষণহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' (১৯৪৪) উপন্যাসে আগষ্ট আন্দোলনে শ্রমিকদের ডাক দিতে দেখা গেলেও, ফ্যাসিস্ট শক্তির মোকাবিলায় কৃষক-মজুরের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জয়গান গীত হয় বিষ্ণু দে'র 'গান' (১৯৪২) ও 'তোমরাই মহাকাল' (১৯৪২) কবিতায় এবং ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়ের গানে।[২] হাওড়ার রাজগঞ্জের চটকল কর্মী সুরেন নস্করের ঘেঁটুগানগুলোতে, হিটলার হয় 'রাবণ' আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হদিশ' কবিতাতে এই যুদ্ধ মজুরদের লড়াই। দুর্ভিক্ষও তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারেনা তার নজির 'শত্রু এক' (সম্ভবত ১৯৪৩) ও 'বিবৃতি' কবিতা দুটি। কমিউনিস্ট পার্টির উৎপাদন বাড়ানোর নীতি ধ্বনিত হয় গোপাল হালদারের 'আর এক দিন' (১৩৫৮), সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' (১৯৮৩) উপন্যাসে ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'জাপানকে রুখতে হবে' (সম্ভবত ১৯৪২) নাটকটিতে। জাপানকে রুখবার সঙ্কল্প নেয় মজুররা সমর সেনের

'পঞ্চম বাহিনী' কবিতায় ও সুধাংশু ঘোষের গানে (১৯৪২/৪৩)।[৩] এর জন্য কৃষক মজুরের সম্মিলিত শক্তির আবাহন করা হয় সমর সেনের 'খোলাচিঠি' (১৯৪২), সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'জবাব' (১০৪৩) ও 'মণিপুর' (১৯৪৪) কবিতাতে এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস,[৪] রমেশ শীল,[৫] সত্যেন সেন,[৬] দয়াল কুমার[৭] প্রমুখের গানে।

পাশাপাশি বাংলায় ছড়িয়ে পড়া দুর্ভিক্ষে অন্যান্যদের মতোই শ্রমিকরাও অসহায় বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' নাটকে প্রকাশ পায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' (১৯৪৩) গল্পে আছে কারখানায় শ্রমিকদের বঞ্চনাকারীরাই এর জন্য দায়ী তা লোকের অজানা। তাঁর 'কিশোরের স্বপ্ন' (১৯৪৩) গল্পে বাংলার মা বাচ্চাদের কাছে কৃষক -মজুরদের সাহায্যে তাঁর দুঃখ দূর করার আবেদন করছেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' (১৯৪৫) গীতিনাট্যে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে মজুররাও লড়াই করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যুদ্ধাবসানের পর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম, কমিউনিস্ট পার্টির 'লাইন' পরিবর্তন ও অভূতপূর্ব গণ সংগ্রামের ঢেউ বাংলা সাহিত্যের শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুর ফিরিয়ে আনে সুনীল দত্তের 'লুঠতরাজ' নাটকে, রমেশ শীল[৮] ও সাধন দাশগুপ্তের[৯] গানে এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'কবে', 'চরম পত্র' ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'চৌমাথা' কবিতায়।

১৯৪৫ এর নভেম্বরে নিহত শ্রমিক আবদুস সালামকে স্মরণ করলেন সলিল চৌধুরী তাঁর গানে[১০] ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'ডাক' (১৩৫৪)[১১] কবিতায়। ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটের (১৯৪৫) কথা আছে গোপাল হালদারের 'আর এক দিন' উপন্যাসে। এর শেষ দিনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসমাবেশে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'লেলিন' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন নীহার দাশগুপ্ত।[১২] খিদিরপুরের ব্রেথওয়েট কারখানায় ধর্মঘট (১৯৪৫)ও গোয়ালিয়রে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলিচালনাকে (১২ জানুয়ারী, ১৯৪৬) কেন্দ্র করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'জবাব চাই' (১৯৪৬) কবিতাটি।

অগ্নিগর্ভ ১২৪৬ যেন 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের ১ মে'র কবিতা' ৪৬-কবিতায় ধ্বনিত। রশিদ আলি দিবসে শহীদ শ্রমিক কদম রসুলকে স্মরণ করেছেন সলিল চৌধুরী[১৩] ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস[১৪] তাঁদের গানে। এই সময় মজুর ছাত্র মধ্যবিত্তের ঐক্যের জয়গান করেছেন বিনয় রায় তাঁর 'জয়ের মত জয়' (১৯৪৬)[১৫] গানটিতে। নৌবিদ্রোহে নৌসেনা ও শ্রমিকদের সম্মিলিত সংগ্রাম জীবিত হয়েছে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' (১৯৬৫) নাটকে। ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘট উপলক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখলেন 'রানার' কবিতাটি। একে কেন্দ্র করে ২৯ জুলাই ডাক দেওয়া সারা বাংলা ধর্মঘটের মেজাজ ধরা পড়েছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অনুভব ১৯৪৬', 'কলম', 'আমরা এসেছি'; গোলাম

কুদ্দুসের '২৯ জুলাই'; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ময়দান চলো'; বিষ্ণু দে'র '১৫ আগস্ট' (১৯৪৭) কবিতায় এবং সলিল চৌধুরীর গানে।[১৬]

১৯৪৬ এর প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থিদের সমর্থনে জীবন ব্যানার্জী মজুর-কিষান রাজ প্রতিষ্ঠার ও বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন 'আমলা জামলার গান'।[১৭]

ভয়াবহ ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের দুইজন শ্রমিকের মালিক ও তার রক্ষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি হারানোর আফশোসের কথা আছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'খতিয়ান' (১৯৪৭) গল্পে। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাই ডাক তার ধর্মঘটের সংগ্রামী ঐক্যের দিনগুলোকে ফিরে পেতে চেয়েছেন তাঁর 'সেপ্টেম্বর ৪৬' কবিতায়। তবে মালিক পক্ষের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকতে পারার[১৮] ইঙ্গিত আছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) উপন্যাসে। কিন্তু আবুল মনসুর আহমেদের 'জীবন ক্ষুধা' (১৯৫৫) উপন্যাসে শ্রেণী সংগ্রামকে বিসর্জন দিয়ে কৃষক-শ্রমিকরা পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তেভাগা আন্দোলনে কৃষক-মজুর ঐক্যের জয়গান গেয়েছেন যশোরের চাষী পঞ্চানন দাস 'হওরে সবে আগুয়ান' (১৯৪৭)[১৯] গানে। মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ধান কাটার লোহা পেটার গান' (১৯৪৭) কবিতায়[২০] এবং বিষ্ণু দে তাঁর 'মৌভোগ' (১৯৪৭) কবিতায়। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) গল্পে চাষীদের সঙ্গে রেল শ্রমিকদের মতো চা-বাগানের কুলিরাও হাত মিলিয়েছে।

শিল্প কারখানা গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে কী জাতীয় আলোড়ন আনে তা বুঝতে পারা যায় তিরিশের দশকের পটভূমিতে রচিত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে অথবা 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) উপন্যাসে গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন মানুষকে কলে-কারখানার পথে পা বাড়াতে দেখলে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'বাগদি পাড়া দিয়ে' (১৯৪৮) গল্পে ও 'চিন্তামণি' (পূর্বনাম রাঙামাটির চাষী) (১৯৪৬) উপন্যাসে, সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩' গল্পে, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মাটির মায়া' (১৯৪৩) নাটকে এবং তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১) উপন্যাসে যুদ্ধ সংকট, মন্বন্তরের দুর্দিনে সমস্ত অনুশাসন পিছনে ফেলে রেখে জীবিকার তাগিদে গ্রামে মানুষ হয়েছে শ্রমিক, শেষোক্ত উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় তাদের গ্রামে প্রত্যাবর্তন বোধহয় ঔপন্যাসিকের ইতিহাস বোধের অভাব।

তিরিশের দশকের সময়কালের মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬) ও যুদ্ধোত্তর কালের 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫৯) উপন্যাসে গ্রামের কৃষক হয়েছে শ্রমিক, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের রমেশ চন্দ্র সেনের 'শতাব্দী', 'গৌরীগ্রাম', 'কুরপালা'

(১৩৫৩) বা ১৯৪৩-৪৭-সময়কালের অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড়শ্রীখণ্ড' (১৯৮৭) উপন্যাসে গ্রামীণ মানুষ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নতুন পথ সন্ধান করেছে।

কোম্পানীগুলোর যুদ্ধের বাজারে প্রয়োজনে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের কথা প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার', মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'বাগদি পাড়া দিয়ে' (১৯৪৮) গল্পে ও জীবনানন্দ দাশের 'এই সব দিনরাত্রি'[২১] কবিতায়। এদের ছাঁটাই পর্বের কাহিনী হল মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ছাঁটাই রহস্য' (১৯৪৭) গল্প।

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের পরিবর্তে শ্রমিক জীবনের কর্মকাণ্ডে যে একটা বৈপ্লবিক শক্তির উদ্ভাস দেখা যেতে পারে তা সোমেন চন্দ তাঁর 'ইঁদুর' (১৯৪১) গল্পে; সমর সেন তাঁর 'নববর্ষের প্রস্তাব' (১৯৪২), 'গৃহস্থ বিলাপ' (১৯৪৩/৪৪) ও 'পঞ্চম বাহিনী' (১৯৪০/৪২) এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কানামাছির গান' (১৯৪০) কবিতায় উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'রবিবার' (১৯৩৯) গল্পের নায়ককে জীবনের একটা পর্বে শ্রমিকে রূপান্তরিত করেছিলেন।

মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' সমাজের এক্টা বড় অংশ যুদ্ধের অর্থনৈতিক ধাক্কায় শ্রমিক শ্রেণীতে নেমে যেতে বাধ্য হল। সুবোধ ঘোষের 'তিন অধ্যায়' গল্পের 'অহিভূষণ' ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ভদ্রলোক' (১৯৪৭) গল্পের 'সুরেন' এর দৃষ্টান্ত। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'শান্তিসভা' (১৯৬০) উপন্যাসের 'সুখেন্দু' সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (অভিনয়কাল ১৯৫১) নাটকে উদ্বাস্তু 'মোহন', কৃষ্ণচক্রবর্তীর 'সীমান্ত পেরিয়ে' উপন্যাসের উদ্বাস্তু 'ভবানী' ও গোপাল হালদারের ১৯৪৮ এর প্রেক্ষাপটের 'আর একদিন' উপন্যাসের বাঙালী গৃহবধূ 'পার্বতী' সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই ধারা বজায় ছিল তার পরিচয় বহন করছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' (১৯৫৯) নাটকে শ্রমিকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে এক উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত পরিবার শ্রেণীচ্যুত হয়েছে।

আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ স্বার্থের জন্য ধনিকেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ধনিকরাও সৃষ্টি করেছে দালালী করবার জন্য বংশবদ মানুষকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বড় খবর' (১৯৪১) গল্পে রূপকের ভঙ্গিতে যে নৌকোর মাঝি (মধ্যবিত্ত) দাঁড়রূপী শ্রমিকদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানারকম উৎসাহ দেয় সে আসলে নৌকোর পালের (মালিক) দালাল। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ধন জন যৌবন' (১৯৪৪) গল্প ও 'সহরতলী' (১ম, ১৯৪০, ২য়, ১৯৪১) উপন্যাসে 'জ্যোতির্ময়' এবং সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু' গল্প, 'গোত্রান্তর' (১৯৪২) গল্পে 'সঞ্জয়' ও 'ভাটতিলক রায়' গল্পে ' তিলক রায়' এই রকমই চরিত্র। জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নিশীথ শ্রমিক কৃষক স্বার্থই শুধুঁ রাজনৈতিক দল গুলো দেখছে বলে আক্ষেপ করেছে। অথচ খবর রাখেনা এরাই তাদের চাহিদার জোগান দিতে দিনরাত পরিশ্রম করছে বলে কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য 'খবর' কবিতায়।

তবে সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে মধ্যবিত্ত মিঃ মুখার্জির ছিল দ্বন্দ্ব, চাপা অনুশোচনা, কিন্তু জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪) উপন্যাসের নায়ক, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' (১৯৪৯) নাটকের 'বিশ্বনাথ', মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'কংক্রীট' (১৯৪৬) গল্পের 'রঘু', গোপাল হালদারের 'আর এক দিন' উপন্যাসের 'তপন ভট্টাচার্য' জীবনানন্দ দাশের ' সুতীর্থ' (১৯৪৮) উপন্যাসের 'সুতীর্থ', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহনা' (১৯৪২) উপন্যাসের 'খগেন বাবু', তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' (১৯৪৮) নাটকে বুদ্ধিজীবিদেব বিশেষ করে একজন লেখককে বিকিয়ে না গিয়ে শ্রমিকদের জন্য লড়াই করতে দেখা যায়।

বনফুলের 'সে ও আমি' (১৯৪৩) উপন্যাসের 'প্রেমসিন্ধু দত্ত' জীবনের নানা স্তরের মধ্যে হয়েছে শ্রমিক নেতা। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ধর্ম' (১৯৪৮) গল্পে 'সৌমেন' ও তার পত্নী বা 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' (১৯৪৪) গল্পে 'মৃত্যুঞ্জয়' সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেও; 'দর্পন' (১৯৪৫) উপন্যাসের 'কৃষ্ণেন্দু' বা 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩) উপন্যাসে 'তারক' - এর শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে এই একাত্মতায় খাদ থেকে গেছে। 'দর্পন' উপন্যাসে ধনী পরিবারের 'হীরেন' ও 'মমতা'র শ্রমিক প্রীতির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি' (১৯৩৯) নাটকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পুত্র 'অবিনাশ' সাম্যবাদী থেকে পুঁজিপতিতে বিচ্যুত হয়ে শ্রমিকদের ক্ষোভানলে পড়েছে। কিন্তু সাম্যবাদী শ্রমিক চেতনায় ব্যস্ত কমিউনিস্ট চরিত্র হিসাবে এসেছে গোপাল হালদারের 'আর এক দিন' উপন্যাসের মজুর আন্দোলনের তাত্ত্বিক 'কমরেড দাশ', বিশ্ব বিশ্বাসের 'মজদুর' (১৯৩৯) উপন্যাসের ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক নেতা, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' (১৩৫৩) উপন্যাসেব প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাথী 'নীতিশ', সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাকে'গল্পের নায়ক এবং সমরেশ বসুর ১৯৪২-৪৮ কালসীমার 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসের শ্রমিক নেতা 'নিত্যানন্দ'।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নির্ভর রাষ্ট্রে ধনিকের স্বার্থসর্বস্ব কৌশলের জালে শ্রমিক শ্রেণীকে ফেলায় কোন অসুবিধা থাকে না তা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' উপন্যাস বা তাঁর 'দর্পন' উপন্যাসে 'রামপাল' - এর পরিণতি দেখলে বোঝা যায়। বিমল ভট্টাচার্যের অবরোধ (১৯৪৭) ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানী' (অভিনয় কাল ১৯৪০) নাটকে এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬), জীবনানন্দ দাশের 'সুতীর্থ' ও 'মাল্যবান' (১৯৪৮) উপন্যাসে মালিক পক্ষের চক্রান্তের কাছে ধর্মঘটী শ্রমিকরা কত দুর্বল ও অসহায় তা প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রমিকদের সামান্যতম প্রতিরোধটুকু ভেঙে দিতে মালিকপক্ষ ও তার ভাড়াটে গুন্ডা,

দালাল শ্রেণী তৎপর, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে 'মশাল' (১৯৫৪) নাটক, সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাস ও 'কিমলিস' গল্প ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহনা' উপন্যাস, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী',সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হরতাল', নবেন্দু ঘোষের 'কান্না' গল্প, কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'সীমান্ত পেরিয়ে' উপন্যাস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' (১৯৪৫) গল্পে আছে আসামের চা বাগানের কাজে সাঁওতাল পরগণা থেকে কুলি সংগ্রহের দালাল 'সুন্দরলাল'।[২২] এদেরকে এক হাত নিয়েছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর অনুদিত কবিতায় ও মেটিয়াবুরুজের চটকল শ্রমিক গুরুদাস পাল তাঁর গানে।[২৩]

মালিকের শোষণ ও একঘেয়েমিতার কারণে হতাশ শ্রমিক জীবনের কুরুচিকর দিকগুলো দেখতে পাওয়া যায় সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে লোহা কারখানার ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসে, গ্রাম থেকে কলে-কারখানায় কাজ নেওয়া মজুরদের জীবনে। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পের যুদ্ধকারখানার লম্পট, নেশাগ্রস্থ শ্রমিকটি বা 'সেই পুরাতন' গল্পের উচ্ছৃঙ্খল 'হরিপদ', এমনকি তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র 'করালী'-র নারীর উপর অধিকার স্থাপন এমনিতর দৃষ্টান্ত। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬) উপন্যাসের জগদানন্দের মতে শহরে খারাপ স্ত্রীলোকের অবস্থানের পেছনে কুলি মজুর সমেত ভদ্রোলোকদের সপরিবারে বাস না করাটা অনেকটাই দায়ী।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'চা'[২৪] কবিতায় ও সুধাংশু ঘোষের গানে[২৫] যাদের শোষক শ্রেণীর জন্য প্রতিনিয়ত প্রাণপাত করার কথা বর্ণিত হয়েছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপকধর্মী 'বড়োখবর' গল্পে নৌকোর দাঁড়দের কথায় ঃ 'আমরা যদি ছোটলোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব'। গুরুদাস পাল তাঁর গানে শ্রমিক জাগরণ কামনা করেছেন।[২৬] সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের গান' (১৯৪০) ও পদাতিক (১৯৪০), বিষ্ণু দে'র 'বৈকালী' (১৯৪১), সমর সেনের 'রোমন্থন' (১৯৪০-৪২) কবিতায় শোনা যায় তাদের সংগ্রামী পদক্ষেপ। শ্রমিকদের উত্থানে আতঙ্কিত ধনিক সমাজের অবস্থা বলশেভিক উত্থানের দিনগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রেষ্ঠী বিলাপ' (১৯৪০) কবিতায়। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'সিগারেট' (১৯৪৬), 'সিঁড়ি' (১৯৪৬), 'চারাগাছ' বা 'দেশলাই কাঠি' কবিতায় শোষণ ব্যবস্থার ফাটল ধরাবে, দুলিয়ে দেবে বা পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেবে কৃষক-শ্রমিক-তারই আগাম বার্তা রূপকের মাধ্যমে শুনিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের 'অবরোধ' (১৯৪৭) নাটক ও তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক'

নাটকে শ্রমিকদের সংগ্রামের দিকটা আবছা, আর সতীনাথ ভাদুড়ির 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে শ্রমিক আন্দোলন নষ্ট হওয়ার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী 'শিউচন্দ্রিকা'র কোন দ্বন্দ্ব নেই। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসে ' অনিরুদ্ধ কর্মকার' মারফৎ কলের মজুরদের কাছ থেকে গ্রামীণ গরীবরা মুক্তির নতুন বার্তা পায়নি। আর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় করালীর হাত থেকে লাল ঝাণ্ডা কেড়ে রেখেছেন, বনফুলের 'অগ্নি' (১৯৪৬) উপন্যাসে কমিউনিস্ট 'নীহার সেন' এর হুকুমে পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়েছে। শ্রমিক জীবন ও সংগ্রামের ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বোধের অভাব, মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহা এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

এসত্ত্বেও শ্রমিক সংগ্রামের কাণ্ডারীর সংখ্যা কম নয়। গোপাল হালদারের 'আর এক দিন' উপন্যাসে 'পার্বতী', 'বিলাস পুরিয়া মংলী' ও 'বুলকন' এবং ১৯৩৭-৩৮ এর সময় কালের 'অন্যদিন' (১৯৫০) উপন্যাসে 'মোতাহের'; মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' উপন্যাসে 'যশোদা', 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী' গল্পে 'দিবাকর', যুদ্ধোত্তর কালের 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে 'কৈলাস দত্ত'; ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহনা' উপন্যাসে 'সফিক', 'বিজন' ও 'উধমজী'; সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে 'লছুমন' ও 'নাওয়াল', 'বিটি রোডের ধারে' উপন্যাসে 'গোবিন্দ' 'কিমলিস' গল্পে 'বেচন'; সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে 'দুলাল মাহাতো' এবং নবেন্দু ঘোষের কান্না গল্পের 'বিপিন' এমনই সব লাল তারা।

সূত্র-নির্দেশ

১। 'স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন / আমরা সবাই স্বরাজ যজ্ঞে হব রে ইন্ধন / .... / চাষা মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই, / এক স্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই।'

২। 'শোন দেশপ্রেমিকের দল, শোন মজুর-কিষাণ দল / মরেই আছি বাঁচব এবার একসাথে সব চল।'

৩। 'হাম্‌রা কোদাল চালাই পাতি উঠাই/চা ঘরে কাম করি/ দেশ বাঁচাবার ডাক এলে আজ / চুপে রইতে নারি।'

৪। 'এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ। / এক নিমেষে আসবে স্বরাজ পালাবে জাপান রে। / কাস্তেটারে দিও জোরে শান।।'

৫। 'আমি কৃষক তুমি মজুর দিনে রাতে খাটি / দুই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি।'

৬। 'বাজে তূর্য তৈরী হল সেনাগণ / ঐ শোন আকাশে জাপানী বোমার গর্জন।'

৭। 'ওরে ও মজুর কিষাণ, লড়াইয়ে উঠল নিশান।'

৮। 'যাইট বছরে হইনি বলে হতাশার কি আছে ভাই / রুখে দাঁড়াও কৃষক-মজুর, এবার মোদের শেষ লড়াই।'

৯। 'উড়াওরে উর্ধ্বে লাল নিশান / বাজাওরে ডঙ্কা বাজাও বিষাণ/জাগবে ছাত্র মজুর কিষাণ / জাগ্ জাগ্ জাগ্ তোরা জাগ্।'

১০। 'চল, চূর্ণ করি এ জীর্ণ কারাগার।'

১১। 'জালিয়ানাবাগ থেকে / এই সে দিনও কলকাতার রাজপথে / রামেশ্বর আর সালাম দু'ভাই যে কথা গিয়েছে হেঁকে...।'

১২। নীহার দাশগুপ্ত, 'দরিদ্র যে কবিকে মহান করেছে' -- বিশ্বনাথ দে সম্পা ঃ সুকান্ত বিচিত্রা। পুনর্মুদ্রন ১৯৮৭। পৃঃ ২০৩।

১৩। 'কদম রসুল শপথ তোমার, / ভুলো না ধর্মতলা, / ভুলোনা মিছিলে, রাজপথে পথে / পতাকা পতাকা মেলা।'

১৪। 'ডাকে ঐ ডাকে ঐ / ডাকে রামেশ্বর ডাকে মনোরঞ্জন/কদম রসুল ডাকে, / ডাকে ধীররঞ্জন / ভুলো না ভুলো না ভুলো না / রাজপথে যত রক্তের লিখন।'

১৫। 'মজুর ছাত্র মধ্যবিত্ত কোটি পরাণ একই চিত্ত / ছিনিয়ে আনবে পরম বিত্ত কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে ভাই।।'

১৬। 'শোষণের চাকা আর ঘুরবে না / চিমনীতে কালো ধোঁয়া উঠবে না উঠবে না। / বয়লারে চিতা আর জ্বলবে না জ্বলবে না / চাকা ঘুরবে না, চিতা জ্বলবে না, ধোঁয়া উঠবে না / লাখো লাখ করতাল হরতাল হেঁকেছে, হরতাল, হরতাল, হরতাল। / আজ হরতাল, আজ চাকা বন্ধ।।'

১৭। 'নির্বাচনটা ঘোলাপাক, লড়াই নদীর একটা বাঁক / হুঁশিয়ার হো মজুর চাষী, পান্সী তোর সামাল।'

১৮। নির্বান বসু, 'সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্প-শ্রমিক আন্দোলন'— গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পা ঃ- ইতিহাস অনুসন্ধান। ১৯৮৬। পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

১৯। 'ভারত জুড়ে বেড়াক উড়ে মজুর চাষীর জয় - নিশান / হওরে সবে আগুয়ান।'

২০। 'আমরা ধান কাটার গান গাই। আমরা লোহাপেটার / গান গাই। আমরা গান গাই। / ভাবছি বীজ বোনার দিনকাল, ভাবছি কারখানার / রোশনাই আজতো ঝলমল।'

২১। 'অনেক শ্রমিক আছে এইখানে। / বেরিয়ে এসো আরো ঢের লোক আছে / সঠিক শ্রমিক নয় তারা।'

২২। 'এখন এই তো সময়- / কই? কোথায়? ধর্মঘট-ভাঙা দালালরা; / সেই সব দালালরা- / ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়, / বেরিয়ে এসো, / জাহান্নামে যাওয়া মূর্খের (মজুরদের ঝড় - ল্যাংস্টন হিউজ) দল, / বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য।'

২৩। 'বেশ্যার স্বভাব যেমন ধারা চার আনাতে স্বামী / এদের স্বভাব তেমনি ধারা ধনিকের গোলামী।'

এবং

'হায় রে হায় মান বাঁচানোর কি উপায় / ঘুরে ফিরে পড়েছি এক জোচ্চোরের পাল্লায়।'

২৪। 'চা-কাদের রক্ত, / চা কাদের জীবন যৌবন আশা আনন্দের নির্যাস।'

২৫। 'হামদের পয়দার ধনদৌলত / বল হচ্ছে ইমারত / হামদের খুনে বনা হলা / এ দুনিয়াদারী।'

২৬। 'জাগুক মজুর জাগুক চাষী / কাঁপুক বিশ্ব চরাচর।'

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)
উনিশ শতকের বাংলা নাটকে নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব

শ্যামলী সুর

গত দুই দশক ধরে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ধারণা বহুল প্রচলিত।[১] আবার, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চাও পাল্টে গেছে।

ঔপনিবেশিক সমাজে ইতিহাসের মালমশলা স্বভাবতই সংগৃহীত ও রক্ষিত হয় শাসক উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে — উচ্চবর্গের মাপকাঠিতেই নির্মিত হয় ঘটনায় নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব।

অধ্যাপক রণজিৎ গুহের মতে, ঔপনিবেশিক শাসক-জমিদার-মহাজনের সমবায়ে গঠিত এক জাঁতাকলে নিষ্পেশিত হয়েছিল নিম্নবর্গের কৃষক[২], আর নিম্নবর্গের নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল উচ্চবর্গের পুরুষের হাতে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ মাধ্যমের অভাবে তার বক্তব্য নথিবদ্ধভাবে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় না। তা বলে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ছিল না, বিদ্রোহ ছিল না একথা ঠিক নয়। সরকারী নথিপত্র এই প্রতিবাদ প্রতিরোধকে অপরাধ বা পাগলামির মোড়কে উপস্থাপিত করতে চাইলেও কবিয়ালের তরজায়, বাউলের গানে, লৌকিক ছড়ায় রয়ে গেছে নিম্নবর্গের স্বর। অন্য দিকে দেশীয় উচ্চবর্গ তার শিক্ষা দীক্ষা স্বার্থ অনুসারে নির্মাণ করে তোলে নিম্নবর্গের চিত্ররূপ-সংবাদে, প্রহসনে, নাটকে।

১৯৮৫ সালে গায়ত্রী স্পিভ্যাক চক্রবর্তী উচ্চবর্গের অপর রূপ নিম্নবর্গের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই টেক্সট বা পাঠ্যের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণই নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকের প্রধান বিচার্য হয়ে ওঠে।[৩] এভাবে গঠিত নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন এবং অসম্পূর্ণ। একটি বিশেষ কালপর্বের সামগ্রিক ইতিহাসের এক খন্ডাংশ নিম্নবর্গের ইতিহাস। এই খন্ডত্বের মধ্যেই এই ইতিহাসের যথার্থ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাজাত্যবোধ গড়ে ওঠার প্রাকপর্বে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রচনায় নিম্নবর্গের আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চবর্গীয় নির্মাণ উপস্থাপিত হয়। উচ্চবর্গের ছিল নানা ভাগ-বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুশক্তির দুই ভাগ সরকারি অর্থাৎ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী এবং নীলকর, চা-কর প্রভৃতি

বেসরকারি শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী। দেশীয় উচ্চবর্গের অন্তর্গত ছিল জমিদার, মহাজন ইত্যাদি।[৪] উচ্চবর্গের সকল অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক সবসময় একমাত্রিক নয়। জমিদারও কখন কখন রায়তের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বিদেশি নীলকরের বিরুদ্ধে দেশীয় ছোট জমিদার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নীল বিদ্রোহে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ভূমিসত্ত্বে সংযুক্ত, রাষ্ট্রপরিচালনায় বিদেশি শাসকের সহযোগী, আবার অন্তরের অন্তস্থলে বিদেশি শাসক বিরোধী। নীল বিদ্রোহে রায়তের ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। তারই সাক্ষ্য বহন করে সমকালীন নাটক প্রহসন।

অভিজাতের আঙিনা পেরিয়ে বুড় সালিকের *ঘাড়ে রোঁ* বা *নীলদর্পণের* মত নাটক নেমে এসে ছিল সাধারণ মানুষের মাঝখানে। উপস্থিত দর্শকমন্ডলী এক যৌথ অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়-জান্ম নেয় যৌথ চেতনা। নাট্য রচয়িতা-অভিনেতা-দর্শক এক অমোঘ যুথবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়। নাট্যকার গড়ে তোলেন এক বিশিষ্ট নাট্য মূহূর্ত। প্রকাশিত হয় নিম্নবর্গের বঞ্চনা ও প্রতিবাদের কাহিনী। শোনা যায় *নীলদর্পণ* দেখতে দেখতে বিদ্যাসাগর চটিজুতো খুলে ছুঁড়ে মেরেছিলেন রোগ সাহেববেশী অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে।[৫] নাটক শুধু ইতিহাসের উপাদান নয়, ইতিহাসের ফসল।

বিষয় ও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০) প্রহসনটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁকে একটি প্রহসন লেখার ফরমাস করা সত্ত্বেও, প্রবীণদের আপত্তিতে তা মঞ্চস্থ হতে পারেনি। আলোচ্য প্রহসনটিকে কেন্দ্রে রেখে সমসাময়িক আরও তিনটি নাটক বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্গের নির্মাণ প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করা যেতে পারে, দীনবন্ধু মিত্রের লেখা *নীলদর্পণ* (১৮৬০), মীর মসাররফ হোসেনের লেখা *জমীদার দর্পণ* (১৮৭৩) এবং দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের *চা-কর দর্পণ* (১৮৭৫)। এই তিনটি নাটকের মধ্যে *নীলদর্পণ* সবচেয়ে মঞ্চসফল নাটক। ১৮৭৩ সালে রচিত *জমীদার দর্পণ* অভিনয়ের কোন খবর আমরা জানিনা। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত চাকর দর্পণেরও অভিনয় হয়নি। তবে অভিনীত না হলেও নাটক দুটি বহুল আলোচিত হয়েছিল।

চারটি নাটক থেকে চারটি বিরোধের নির্মাণ বিশ্লেষণ করা যায়। এক : জমিদার/রায়ত, দুই : নীলকর/রায়ত, চা-কর/বাগিচাশ্রমিক, তিন : উচ্চবর্গের পুরুষ / নিম্নবর্গের নারী, চার : হিন্দু/মুসলমান। এই ধারণা যুগ্মগুলির সম্পর্ক দ্বান্দিক ও জটিল। আবার নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়াও ছিল পৃথক পৃথক। উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ ধারণাযুগ্মের দ্বিতীয় মাত্রা লিঙ্গ দ্বান্দিকতার মাত্রা এবং তৃতীয় মাত্রা সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা।

১. জমিদার রায়ত : জমিদার/রায়ত দ্বান্দ্বিক যুগ্মের উভয়েই দেশি। মোগল আমলে রায়তের জমিতে ভোগ দখলের অধিকার ছল। জমিদার প্রজার কল্যাণের সঙ্গে

যুক্ত থাকতেন। কিন্তু ১৮২০ সাল নাগাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর বাংলায় নায়েব গোমস্তারাই প্রকৃত নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়।[৬] প্রজা পীড়ণের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে ভূমিক্ষেত্রে মধ্যসত্ত্ব সৃষ্টি। জমিদার-রায়ত সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কৃষক আন্দোলন বেড়ে যায়।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনটি পটভূমিকা বাংলার কৃষক আন্দোলন। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে কোন নাটক আত্মীয় জমিদার চরিত্রের উপর ভিত্তি করে মধুসূদন ভক্তপ্রসাদ চরিত্রটি রচনা কবেছিলেন।[৭] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উত্তর বাংলায় এ ধরনের ভন্ড জমিদার ছিল একটি পরিচিত সামাজিক টাইপ। এই জমিদারদের প্রতিনিধি প্রহসনের ফরমাশকারী সিংহ রাজারা নাটকের পরিণতি মেনে নিতে পারেননি। নাটকটি অভিনয়ের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েও পরিত্যক্ত হয়। ছয় বছর পর ধনীদের নাট্যশালার বাইরে মধ্যবিত্ত যুবকদের নিয়ে গঠিত আরপুলি নাট্য সমাজ নাটকটি অভিনয় করে। ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ রজনীতে নাটকটি পুনরায় অভিনীত হয়।[৮]

মধুসূদনের রচনায় প্রহসনের চৌহদ্দির ভিতরেই পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে দরিদ্র মুসলমান রায়তের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। হানিফ গাজী ও পত্নী ফতেমা বাংলা প্রহসনে প্রথম নিম্নবর্গীয় চরিত্র। 'এরা ছাঁচে ঢালা আদর্শ চরিত্র নয়, রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত সার্থক নাটকীয় চরিত্র।[৯] হানিফকে বাদ দিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের তোরাপকে কল্পনা করা যায় না। প্রথমাঙ্কে হানিফ দু:খ করে বলেছে, 'এবার যদি লাঙ্গলখান আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো।[১০] দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভক্তপ্রসাদ হানিফের স্ত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় হানিফের গলায় বেজে উঠেছে বিদ্রোহের সুর। 'শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মার্যে, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তারপর এই কয়ে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ (ন্যায়বিচার) আছে কিনা?'[১১] ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনা জেলায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় *জমিদার দর্পণ* নাটকটি রচিত হয়। নাটকের ভূমিকায় তাঁর জমিদারি ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি মীর মশাররফ 'পাঠক সমীপে নিবেদন জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।[১২] রায়ত আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহার অভিযোগ করেছে, 'এই কি জমীদারের বিচের? জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা কর্বেন। ওমা! তা গেল মাটি চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী!'[১৩] ক্ষোভ আছে কিন্তু বিদ্রোহ নেই। কিন্তু তাসত্ত্বেও বাংলা ১২৮০ সনের ভাদ্র মাসের *বঙ্গদর্শনে* বঙ্কিমচন্দ্র নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে নাটকটি বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করার সুপারিশ করেছেন[১৪]

২. **বিদেশি নীলকর, চা-কর বনাম দেশীয় রায়ত, বাগিচা শ্রমিক** : দীনবন্ধু মিত্রের

বিখ্যাত নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়েছিল ১৮৫৬-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায়। নীলবিদ্রোহের পেছনে রায়তী অসন্তোষের পাশাপাশি অন্যান্য কারণও ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগত নীলের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় দাদন নেওয়া অলাভজনক হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে স্বাধীন কৃষক হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৮৫০-এর দশকের শেষে নীলচাষে একজন চাষীর বিঘাপ্রতি আয় হত ধানচাষ থেকে লব্ধ আয়ের এক তৃতীয়াংশেরও কম।[১৫] ১৮৬০ সালের একাদশ আইনের সময় সীমা শেষ হবার পর নীলকররা জমিদার রূপে চাষীদের উপর দমন পীড়ন চালাতে তাকে। ১৮৬০ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ নীলকর বিরোধী আন্দোলন খাজনা বয়কট আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৮৫৯-৬০ সালে ব্যাপক নীল বিদ্রোহ এবং নীলকর চাষী সংঘাত নীলচাষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[১৬]

নীলচাষের প্রথম দিকে নীলকর জমিদার মিলিত ভাবে রায়তের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও পরবর্তী পর্যায়ে জমিদার নীলকর বিরোধ বাড়তেই থাকে।[১৭] চিত্তব্রত পালিতের মতে নীল আন্দোলনে নেতৃত্ব এসেছিল ভূস্বামী শ্রেণী থেকে। ভূস্বামীরা নীলকরদের ধ্বংস করার জন্য পরোক্ষভাবে চাষীদের উস্কে দেন। উনিশ শতকের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কোন না কোন ভাবে এই ছোট ভূস্বামী, মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা *আলালের ঘরে দুলালে* (১৮৫৮) ব্যাপক ভাবে নীলচাষের খবর পাওয়া যায়। হরিশ মুখোপাধ্যায় রচিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় নীল বিদ্রোহের সমর্থনে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রতিবেদনগুলিতে প্রকাশিত উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ বর্গীকরণ জমিদার/রায়ত বিরোধের বর্গীকরণের সমান্তরাল নয়।

১৮২৯ সালে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি নীলকরের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। নদীয়ার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নাটকটির ভিত্তিভূমি। সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর খুলনার ইতিহাসে এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন।[১৮] এমন কি পল্লী কবির গানেও এই লড়াইএর কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

'নিলকরের কি অত্যাচার।

এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের নিলে বোঝা ভার।[১৯]

নীলদর্পণ নাটকে প্রকাশিত হয়েছে বিদেশি নীলকরের বিরুদ্ধে ছোট ভূস্বামী নবীনমাধব ও গরীব চাষী তোরাপের সম্মিলিত প্রতিরোধ। পিতা গোলক যে কোন মূল্যে দুর্দান্ত নীলকরের সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিল। পুত্র নবীন মাধব তখনও ইংরাজের ন্যায়বোধে বিশ্বাসী। সে আদালতের আঙিনায় নীলকরের অন্যায়ের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। সে জানত না ঔপনিবেশিক আদালতে কোন দেশি ন্যায় বিচার পাবে না।

প্রতিরোধের অন্য প্রান্তে রয়েছে বিদ্রোহী রায়ত তোরাপ। নীলকরকে আক্রমণের দৃশ্যে সে নবীনমাধবকে বলছে 'বড়বাবু, সুমুন্দির কি এমান আছে, তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর-(গাল টিপিয়া ধরিয়া) পাঁচদিন চোরের, একদিন সেদের (সৈয়দের) পাঁচদিন খাবালি একদিন খা (কানমলন)।[২০] এতদিন নীলকরেরা এভাবেই রায়তদের আক্রমণ করে এসেছে। বিদ্রোহের ফলে প্রচলিত ভাষারীতি ব্যবহার পদ্ধতি উল্টে যাচ্ছে। রায়ত নীলকরকে গালি দিচ্ছে, আঘাত করছে। ১৮৫০ সালের মোপলা বিদ্রোহেও প্রচলিত ভাষারীতি, ব্যবহার রীতির আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[২১]

বাংলা নাটক ধনীর প্রাসাদ মঞ্চ থেকে সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করার ক্ষেত্রে *নীলদর্পণের* এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হবার পর ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে নাটকটির বেশ কিছু অংশ মানহানিকর সাব্যস্ত হয়। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঐ অংশ বাদ দিয়েই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় *নীলদর্পণ* নাটক দিয়ে। ১৮৭৫ সালের শেষের দিকে গ্রেট ন্যাশনালের একটি দল ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে উত্তর ভারত ভ্রমণ করে। লক্ষ্ণৌতে *নীলদর্পণ* অভিনয়ের সময় উত্তেজিত সাহেব দর্শকরা কিভাবে মঞ্চে উঠে এসে অভিনেতা অভিনেত্রীদের আক্রমণ করেন তার কৌতূহলজনক বর্ণনা আছে নটী বিনোদিনীর লেখা *আমার কথায়*।[২২]

নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সরকারি বেসরকারি শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বাংলার নিম্নবর্গ/উচ্চবর্গের যে সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল তার রূপক *নীলদর্পণ* নাটকটি। ১৮৬১ সালে নাটকটির প্রকাশক রেভারেন্ড জেমন লঙের বিরুদ্ধে মামলায় শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফরম্যান্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট-এ এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

নীলকর-রায়ত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি উল্লেখ করা যায় চা-কর/বাগিচা শ্রমিক দ্বন্দ্ব। অবার আসামের চা বাগিচা শ্রমিক আদতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা দুর্ভিক্ষের ফলে উৎখাত হয়ে যাওয়া রায়ত।

১৮৭৬-৭৭ সালের পর ভারতীয় চায়ের রপ্তানির হার বৃদ্ধি পায়। তবে সিপাহী বিদ্রোহের পর চা উৎপাদকের অসুবিধা বেড়ে যায়। চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আসাম অঞ্চলে ভাড়া করা শ্রম প্রায় অজানা ছিল। তাছাড়া, যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানি সম্ভব ছিল না।[২৩] আড়কাঠির মাধ্যমে ভুলিয়ে ভূমিহীন কৃষক বা জমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া রায়তকে আসামে নিয়ে যাওয়া হত। *চাকর দর্পণের* আড়কাঠি হরির ভাষায় '...*এদেশে ধান জন্মায় নাই চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে, তাদের ভুলিয়ে পাঠাতে পারলেই ঠিক হবে।*'[২৪] ১৮৪১ সালে প্রথম যে কুলিদের

পাঠান হয় তারা পথেই মারা যায়। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ঠিকাদারদের নজরে পড়ে।[২৫] ১৮৬১-১৮৬২ সালে কুলি বাণিজ্যের বীভৎসতা ক্রীতদাস বাণিজ্যের বীভৎসতাকে হার মানাত। অত্যাচার জনিত মৃত্যু ও বলাৎকার জাতীয় ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। *ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার* প্রতিনিধি সম্ভবত সভ্য জগতের প্রতিনিধিদের কাছে চা-করদের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা প্রথম প্রকাশ করে দেন।[২৬]

এর কিছু পরে রচিত হয় চা-কর দর্পণ। দেশ থেকে, সমাজ থেকে উৎখাত রায়তের চা-করদের শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত হওয়ার কাহিনী চা-কর দর্পণ। উপজাতীয়, আদিবাসী কৃষক হয়ে গেল সর্বহারা চা-মজুর। সে যে শুধু তার ক্ষেত হারাল তাই নয়, সে হারাল তার স্বভূমি, তার কৌম সমাজ, তার ধর্মীয় আচার। নাটকের শেষে সারদা, বরদা দুই ভাইকে পাইকরা যে দ্বীপে ফেলে পালায়, সেই শ্বাপদসংকুল দ্বীপ যেন স্বজন বিরহিত চা বাগানের রূপক। মৃত্যু ছাড়া সেখান থেকে মুক্তি পাবার দ্বিতীয় উপায় নেই।

উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের অন্য মেরুতে বিদেশি নীলকর, চা-কর ও দেশি জমিদার বনাম নিম্নবর্গীয় নারী। উচ্চবর্গের স্ত্রীরংসা ও নিম্নবর্গের নারীর বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। পুরুষ শাসিত সমাজে সব মেয়েই এক অর্থে নিম্নবর্গীয়। কিন্তু নারীর আবার পৃথক শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয়ও আছে। 'সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমন অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি কিভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়।'[২৭]

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনের কেন্দ্রবিন্দু জমিদার ভক্তপ্রসাদের নারী লোলুপতা। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি কুলপতি, পরম বৈষ্ণব, অথচ অন্তরের অন্তস্থলে তিনি নারী লোলুপ এক পুরুষ। পীতাম্বর তেলির অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে পঞ্চি থেকে মুসলমান রায়তের স্ত্রী ফতেমা কেউই তার লুব্ধ দৃষ্টির বাইরে নয়। *নীলদর্পণে* নীলকর রোগ সাহেব রায়ত সাধুচরণের কন্যা গর্ভবতী ক্ষেত্রমণিকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল। *জমিদার দর্পণে* জমিদার হাওয়ান আলি রায়ত আবু মোল্লার অন্তসত্ত্বা পত্নী নুরন্নেহারকে বলাৎকার করে হত্যা করে। *চা-কর দর্পণে শ্বেতাঙ্গ* ম্যাকলিন সাহেব সরমাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। নৃত্যকালী ধর্ষণ এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার ঔপনিবেশিক আদালতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ বিচারক উচ্চবর্গের জমিদার অথবা নীলকর, চা-করের পক্ষ অবলম্বন করতেন।

একমাত্র মৃত্যুতেই অত্যাচারিতা নারীর মুক্তি। গর্ভবতী নুরন্নেহারের মৃত্যু হয় ধর্ষণে। সরমা ধর্ষণের লজ্জায় প্রাণত্যাগ করে। ক্ষেত্রমণিকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করল বিদ্রোহী নবীন মাধব ও তোরাপ। কিন্তু তার অমোঘ নিয়তি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারল না। নুরন্নেহার মৃত্যুতেও ইংরেজদের ন্যায়বোধে তার আস্থা হারায়নি। সে আকুল বেদনা জানিয়েছে মহারাণী ইংলন্ডেশ্বরীর কাছে।

'তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না?'[২৮] *চা-কর দর্পণে* নৃত্যকালী আত্মহত্যা করার আগে বিদ্রুপ করে বলছে, 'শুনেছিলাম যে সাহেবরা বড় দয়ার জাতি, এঁরা দাস ব্যবসা দেখতে পারেন না, তারি জন্য এঁরা কত জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়িয়েছেন। আবার এঁরাই তা করেন কেন?'[২৯]

নাটকে বিধৃত এই ঘটনাগুলির ভিত্তি সমকালীন রিপোর্টে। ব্লেয়ার ক্লিং উল্লেখ করেছেন আর্চিবল্ড হিলস নামে এক ইংরাজ কুঠিয়াল হরমণি নামে এক কৃষক কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। রেভারেন্ড জেমস লঙ এ ধরনের ঘটনার কথা শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। সরকারিভাবে এ ঘটনা প্রকাশ না করার কারণ, মেয়েটির সামাজিক মর্যাদা রক্ষা। অথচ ইন্ডিগো কমিশন রিপোর্টে বলা হয়, বহু অনুসন্ধানে এ ধরনের ঘটনার একটি মাত্র উল্লেখ পাওয়া গেছে।[৩০] আসাম ও কাছাড়ে চা বাগিচাতে নারীর ওপর অত্যাচারের ঘটনা অহরহ ঘটত। ১৮৮৩ সালে *সঞ্জিবনী* পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে ইন্ডিয়ান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কোকিলামুখ ঘাটের কর্মচারী ওয়েব শুকুরমণি নামে এক কামিনকে বলাৎকার করে। কয়েকদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এরপর বিচারের প্রহসন হয়।[৩১] চাকরদর্পণ নাটকটি পরবর্তীকালে চা-শ্রমিকদের অবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তিনটি দর্পণ নাটকেই নায়িকাদের মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়। একমাত্র ফতেমাই তার প্রতিপক্ষকে কৌশলে পরাস্ত করতে পেরেছিল। বাস্তবে ফতেমার জয় সম্ভব না হলেও, তা শিল্পে সম্ভব হয়েছিল। প্রহসন মাধ্যমে মধুসূদন বাস্তব সম্পর্কে অনেকটা স্বাধীনতা নিতে পেরেছিলেন। ফতেমার জয় নারীর বিদ্রোহী চৈতন্যের জয়। নিম্নবর্গীয় নারী চৈতন্যের এই নির্মাণ মধুসূদনের সৃষ্টি।

উনিশ শতকের বাংলায় উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম বিশিষ্ট মাত্রা সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক। দরিদ্র ও শোষিত হলেই তারা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী এবং সেকুলার রাজনীতির সমর্থক হবে এই সরল সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না।[৩২] আবার উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে একমাত্রিকভাবে হিন্দু/মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত করাও সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বিশেষে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে

প্রতিরোধ জানিয়েছে। আবার তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সম্প্রদায়গত ভিন্নতার উপস্থিতিও স্পষ্ট। হিন্দু ও মুসলমান নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে আচারগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকলেও, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা অবস্থানগত কোন তফাৎ ছিল না। অভিজাত আশরাফের দৃষ্টিতে নিম্নবংশীয় স্থানীয় আজলাফ ও নিম্নবর্গীয় হিন্দু ছিল সমান।[৩৩]

বাংলায় বিশেষত পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু এবং প্রজারা মুসলমান। স্বভাবতই শোষক শোষিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মের মাত্রা এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। আবার, পরিস্থিতি বিশেষে ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে এক সম্প্রদায়ের মানুষ অপর সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তবে হিন্দু মুসলমানের আচার আচরণের পার্থক্য গ্রামীণ সমাজে সূক্ষ্ম রঙ্গ রসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত। *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, র দুই কুশীলব, হানিফ ও পঞ্চানন বাচস্পতি দুজনেই জমিদার ভক্তপ্রসাদের অত্যাচারে জর্জরিত। পঞ্চাননের ব্রহ্মত্র জমি ভক্তপ্রসাদের বাগানের মধ্যে পড়ায় বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে অজন্মার জন্য হানিফ এ বছর খাজনা দিতে না পারায় ভক্তপ্রসাদ তার স্ত্রী ফতেমাকে অন্যায়ভাবে ভোগ করতে চায়। ফতেমার কাছে সব কথা জেনে হানিফ ও বাচস্পতি ভক্তপ্রসাদকে ফাঁদে ফেলল। *নীলদর্পণে* নবীন মাধব ও তোরাপ একযোগে ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার করে। সমকালীন ইতিহাসে, নীলবিদ্রোহে, কৃষক আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার এরকম অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। উচ্চবর্গের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ধর্ম কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। *জমিদার দর্পণ* নাটকে পাষন্ড জমিদার হাওয়ান আলির পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিল মুসলমান মোল্লা জিতু ও হিন্দু হরিদাস বৈরাগী।

আবার কোথাও কোথাও বর্গগত বিদ্বেষ চেতনা স্পর্শ করে থাকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। ভক্তপ্রসাদের বিরুদ্ধে হানিফের শ্রেণীগত ক্ষোভের সঙ্গে মিশে থাকে সাম্প্রদায়িক বিরূপতা, 'হা আল্লা এ কাফের শালা কি মুসালমানের ইজ্জত মাত্যি চায়।[৩৪] কিন্তু বাচস্পতির সঙ্গে সহযোগিতা করার সময় তার ধর্মগত পার্থক্য বড় হয়ে দেখা দেয় না। গ্রামীণ সমাজে আদান প্রদানের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের জটিল ওঠাপড়া।

উপসংহার - উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় জমিদার, শাসক, সিপাহিদের মিলিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পূর্ব ভারতেও নীলবিদ্রোহ, পাবনার কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গের বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়। তবে আধুনিক গবেষণার নিরিখে নীল বিদ্রোহকে এক কথায় নিম্নবর্গীয় আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায় না এবং এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই

গ্রামীণ কৃষক, মজুর, ছোট জমিদারের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মিক যোগ ঘটেছিল। এই ঘটনার প্রভাবেই বাংলা প্রহসন, নাটকে নিম্নবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিল। রঙ্গমঞ্চ পাদপ্রদীপের আলোয় নিম্নবর্গীয় কুশীলবের আবির্ভাব, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় নাট্যশালা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল অনুমোদিত হবার পর নিম্নবর্গীয় চরিত্র সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়ে যায় বাংলা নাটমঞ্চের আঙিনা থেকে।

বাংলা নাটকে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের উপস্থিতির সঙ্গে যেমন সমকালীন গণ আন্দোলনের সম্পর্ক আছে, তেমন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাট্য রচয়িতার সৃষ্টিশীলতার তারতম্য। মীর মশাররফ হোসেন ও দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় বেদনা আছে, কান্না আছে, কিন্তু বিদ্রোহ নেই। হানিফ ও তোরাপ-এই দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গের বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে নিম্নবর্গের নির্মাণে বাস্তবও আছে, কল্পনাও আছে—আর আছে বাস্তবের সারাৎসার।

নীলদর্পণ, জমিদার দর্পণ, চা-কর দর্পণ তিনটি নাটকই বিয়োগান্তক এবং কালের মাত্রায় সীমায়িত। কিন্তু *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ* একই সঙ্গে কালিক ও কালাতীত। দুই প্রজন্মের বিরোধ, উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সংঘাত, তথাকথিত দুর্বল নারীর সঙ্গে শক্তিমান পুরুষের দ্বন্দ্ব-এই প্রহসনটিতে এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তায়, বিমূর্ততায় উন্মোচিত হয়েছে। তাই এই প্রহসনটি বারে বারে অভিনীত হয়েছে। এমন কি ২০০৩ সালেও এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মঞ্চস্থ হয়েছে।[৩৫] আজও ভক্তপ্রসাদ আছে, আছে তার ভাবের ঘরে চুরি। ফতেমা আজ বয়স্ক শিক্ষালাভ করেছে, পঞ্চায়তের সদস্য হয়েছে। কিন্তু তার ওপর যৌন অত্যাচারের ফলা আজও শাণিত। কেবল, উচ্চবর্গের রূপ পাল্টেছে। প্রান্তিক চাষিকে আজও আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়, বন্ধ চা বাগান শ্রমিক মারা যায় অনাহার আর অপুষ্টিতে। তবু বদলেছে নিম্নবর্গের চৈতন্য, নিম্নবর্গের নারী পুরুষ আজ অনেক বেশি অধিকার সচেতন, অনেক বেশি বাঙ্ময়। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে হানিফ ও ফতেমা এই বাঙ্ময়তার আধার।

সূত্র-নির্দেশ

১। 'নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস', পার্থ চট্টোপাধ্যায়. *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদনা, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৯, পৃ: ১-২১।

২। Ranjit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, 1983,* P. 8.

৩। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*. তদেব, পৃ. ১৭।

৪। রণজিত গুহ, *একটি অসুরের কাহিনী*, তদেব. পৃ: ৩২।

৫। সুকুমার মিত্র, *উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র,* ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৬৬।
৬। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (অর্থনৈতিক) . ১৭০৪-১৯৭১, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ২৩২।
৭। যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত্র,* কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৬৭।
৮। দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস,* কলকাতা, ২০০৩ পৃ: ১০৬, ১১৪।
৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা, ২০০২, পৃ: ১৬৭।
১০। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী,* কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ: ২৫৫।
১১। তদেব, পৃ: ২৫৫।
১২। প্রভাত কুমার গোস্বামী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের দর্পণ নাটক,* কলকাতা ১৯৭৮, পৃ: ৮৬।
১৩। তদেব, পৃ: ১০০-১০১।
১৪। বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্গদর্শন,* ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র উদ্ধৃত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ: ৩৩৭।
১৫। ব্লেয়ার বি. ক্লিঙ, 'নীলবিদ্রোহ', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলা দেশের ইতিহাস* (রাজনৈতিক) প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ২৪৯-২৬৮।
১৬। বিনয় ভূষণ চৌধুরী, *'কৃষির বাণিজ্যিকরণ',* তদেব, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৩৪৫।
১৭। স্বপন বসু, *গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ,* কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ১৯।
১৮। শিব শঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ: ১২৫।
১৯। সুকুমার মিত্র, তদেব, পৃ: ৬২।
২০। *দর্পণ নাটক,* তদেব, পৃ: ৪২।
২১। Guha, op. cit. P. 49.
২২। দর্শন চৌধুরী, তদেব, পৃ: ১১১-১২৩।
২৩। বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, তদেব, পৃ: ৩৩৮।
২৪। দর্পণ নাটক, তদেব, পৃ: ১৩৮।
২৫। Umananda Phukan, *Ex-tea Garden Labourer of Assam,* Delhi, 1984, P. 5.
২৬। অমর দত্ত, *আসামে চা কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ,* কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ২৩-২৯, এই বইটির খোঁজ দিয়েছেন আমার সহকর্মী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৭। নিম্নবর্গের ইতিহাস, তদেব, পৃ: ২০।
২৮। দর্পণ নাটক, তদেব, পৃ: ১১১।
২৯। তদেব, পৃ: ১৭৫।
৩০। Blair B. Kling, *Blue Mutiny,* P. 198.
৩১। অমর দত্ত, তদেব, পৃ: ৩৬।
৩২। নিম্নবর্গের ইতিহাস, তদেব, পৃ: ১৯।
৩৩। বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ: ২১।
৩৪। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, তদেব, পৃ: ২৬০।
৩৫। আলোলিকা মুখোপাধ্যায়, *প্রবাসীর চিঠি,* সাপ্তাহিক বর্তমান, জানুয়ারি, ২০০৩।

ধূমকেতু সাময়িকপত্রে বাঙালি নারী সমাজের চিন্তার প্রতিফলন

শামসুন নাহার

অভিমত প্রকাশ এবং জনমত গঠনে সংবাদ সাময়িক পত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র তাৎক্ষণিকতার দাবী পূরণের মধ্যদিয়েই সাময়িকপত্রের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। এর সার্থকতা উত্তরকালের অঙ্গন পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সমকালীন প্রত্যক্ষ নানাবিধ প্রয়োজনে সাড়া দিয়েও সাময়িক পত্র-পত্রিকা সমাজের মানুষের মানস ভাবনা এবং তার ইতিহাসকে ধারণ করে থাকে। আর সে কারণে, সামাজিক ইতিহাস গঠনের স্বার্থে মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহের আকর-উৎস হিসাবে সাময়িকপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।[১] কুড়ি শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজে যে সকল সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ঘটেছিল—*ধূমকেতু* তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধসাপ্তাহিক *ধূমকেতু* মোহাম্মদ আফজাল-উল্-হক কর্তৃক ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং মেট্‌কাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।[২] *ধূমকেতু*'র আয়ুস্কাল ছিল পাঁচ মাস ষোল দিন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের ১১ আগষ্ট, বাংলা শ্রাবণ, ১৩২৯। শেষ *ধূমকেতু*'র তারিখ ১৩ মাঘ, ১৩২৯ সাল, ২৭ জানুয়ারী ১৯২৩। *ধূমকেতু*'র মোট ৩২টি সংখ্যা বের হয়েছিল। তবে *ধূমকেতু* শুধুমাত্র বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়েরই নয় প্রকৃত অর্থে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের বাঙালির মুখপত্র ছিল। নজরুল ইসলামের প্রগতিশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী বিপ্লবী সমাজ চিন্তার প্রতিফলন এই পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। ধূমকেতু'তে নজরুল 'সারথী' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। নজরুল নারী-পুরুষ সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং ভারতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে আপোষহীন ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক এই পত্রিকায় আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত ছাড়াও অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের সমাজ সচেতনতামুলক ও রাজনৈতিক চিন্তা সম্বলিত লেখা দেখতে পাই। আলোচ্য প্রবন্ধে *ধূমকেতু* পত্রিকায় নারীদের সমাজ ভাবনা, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার যে প্রতিফলন ঘটেছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৩২৯ সালে *ধূমকেতু*'র ১ম বর্ষ/১ম সংখ্যায় দেখা যায় হিন্দু সমাজের বাল্যবিবাহ

ও পণ-প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে শ্রী তমলিলতা বসু একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত 'মেকি প্রবন্ধে' এক শ্রেণীর লোকের তিনি এই বলে সমালোচনা করেছিলেন যে, সমাজে কিছু ব্যক্তি আছেন যারা নারীদের সম্বন্ধে বড় চিন্তা, বড় কথা প্রকাশ করলেও বাস্তবে দেখা যায় তার বিপরীত কাজ করছেন। তারা নয় বছরের শিশু সন্তানকে বিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়মুক্ত করেছেন। এর প্রতিকার কামনা করে তিনি লিখেছিলেন।

> এই মেকি দেশ বা সমাজ-হিতৈষণার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কি কেউ নেই? এই সব কপট লোকের নাম প্রকাশিত হোক, তাদের অসরল মতি-গতির ওপর দেশের সমস্ত নিন্দাবিষ ক্ষরিত হোক্ নারীদের এ কপটতা বাঙলার জননী জাতির কলঙ্কের নিদান, অচিরে এর উচ্ছেদ হোক।[৩]

তবে পত্রিকাটিতে নারীর আধুনিকায়ন ও নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে নারীদের মধ্যেই বিতর্কের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। শ্রী কমলাবালা গঙ্গোপাধ্যায় 'নারী বাঘিনী' নামক এক প্রবন্ধে নারীর স্বাধীনতার বিপক্ষে কথা বলে সমাজের পুরাতন ধ্যান-ধারণার প্রতিধ্বনি করেছিলেন। পাশ্চাত্য নারী সমাজের সঙ্গে এ দেশীয় নারীদের সামাজিক মর্যাদার তুলনামূলক আলোচনা করে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তাদের সমালোচনা করে তিনি লিখেছিলেন ঃ

> আজ নারীর জাতি চাহিতেছেন স্বাধীনতা, চাহিতেছেন পুরুষকে অতিক্রম করিয়া যাইতে। একটা উৎকট বন্ধন কল্পনা করিয়া তাহা ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি তাঁহার চির মহিমাময়ী গরিমাকে স্বেচ্ছায় খর্ব্ব করিতেছেন। এই করালিনী নারীশক্তি বুঝিতেছেন না, তিনি কি আছেন আর কিই বা হইতে চাহিতেছেন।[৪]

নারী স্বাধীনতা বলতে তিনি নারীর চিরাচরিত জায়া, জননী রূপের বিপরীত চরিত্রকে বুঝিয়েছিলেন এবং নারীকে 'বিদোহিনী' বিশ্লেষণে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে পুরুষের সমকক্ষতা লাভের দাবী নাবী চরিত্রের দৈবী মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছে। নারী জাতি সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বিশ্বের জননী হয়ে বরণীয়া, মহনীয়া পূজনীয়া হয়ে আছে, সেই গণ্ডিতেই তিনি তাদের দেখতে আগ্রহী ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আরো লিখেছিলেন ঃ

> নারী তুমি জগৎ প্রসব করিয়াছ স্নেহ-সুধায় সৃষ্টিকে বাঁচাইতেছ। ভগবানের কৃপায় তুমি জননী। বাঘিনী হইতে চাহিতেছ কেন?[৫]

শ্রী কমলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে শ্রী জগমোহন বসু পত্রিকাটির চৈত্র সংখ্যায় 'ভূতের মুখে রাম-নাম' শিরোনামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

> আমাদের এই 'পোড়া দেশ' যে সম্মান যে স্বাধীনতা মেয়েদের দিয়ে

আসছে, পৃথিবীর কোন দেশ তা পেরেছে? এখানে মা—স্বর্গাদপি গরিয়সী; স্ত্রী সহধর্ম্মিণী এই-দুটো কথার মধ্যে অন্ততঃ আমি ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোন চ্যুতি দেখতে পাচ্চি না।[৬]

তাঁর মতে, নারী যদি সংসার ধর্ম উপেক্ষা করে পুরুষের মত রাজনীতি, ওকালতি নিয়ে কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেন তা হলে সমাজে শান্তির পরিবর্তে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। তাঁর কথায় ঃ

আজ স্ত্রী যদি হঠাৎ পুরুষের অধিকার দাবী করে বসে, (বসে কেন, বসেছে) তা হলে সেটা যে শুধু অসঙ্গত হবে তা নয়, সংসারে কোন রকম শান্তি-শৃঙ্খলা থাক্‌বে বলে আমার মনে হয় না। মা সন্তান পালন ছেড়ে পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, স্ত্রী সংসারের কাজ কর্ম্ম-ছেড়ে my lord বলে কোর্টে মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করতে লাগলেন, কুমারীরা ভোট-ব্যালট সংগ্রহ করতে লাগলেন, আর সংসার পালন সংসারের কাজ-কর্ম্ম, চাকর-দাসীরা করতে লাগল। সুন্দর ব্যবস্থা।[৭]

তবে, এ বিতর্কে *'ধূমকেতু'* পত্রিকার সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম পুরুষ সমাজকে অনুরোধ করে 'সারথির কথা' কলামে মন্তব্য করে বলেছিলেন ঃ

পুরুষের মুখে মেয়েদের কথা সত্যি সত্যিই "ভূতের মুখে রাম নাম" হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের অভাব-অভিযোগের কথা মেয়েরাই বলুন। তা থেকে আমরা অর্থাৎ পুরুষ-কমিটি বুঝে নিতে পারব যে, মেয়েরা কি রকম স্বাধীনতা চান আর তাঁদের সে চাওয়ার দৌড়ই বা কত দূর পর্য্যন্ত! মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে পুরুষদের মধ্যে এখন দু'টো দল হ'য়ে পড়েছে, অতএব পুরুষদের এই দু'টো দল মিলেই যদি কামড়া-কামড়ি লাগিয়ে দেয়, তা হ'লে মেয়েরা অবসর পাবেনা সব কথা গুছিয়ে ব'লবার।[৮]

ধূমকেতু'র ৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া 'যৎকিঞ্চিৎ' এ 'নারী-বাঘিনী' প্রবন্ধে প্রকাশিত চিন্তাধারার ব্যাখ্যা উল্লেখসহ এর বিস্তারিত সমালোচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন ঃ

...তেস্‌রা সংখ্যায় 'ধূমকেতু'র মারফৎ "নারী-বাঘিনী" উপহার পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। কিন্তু বড় দুঃখেই একটু হাসতে বাধ্য হচ্চি। কারণ, নিছক কল্পনার কাঁধে ভর দিয়ে যথেচ্ছ উপদেশ বর্ষণের ইচ্ছা হলে, আমরা যে দায়িত্ব জ্ঞানের খোঁজ কতটা রাখি, এই "বাঘিনী'র চেহারাতেই তা সুপ্রকাশ।[৯]

ঐ প্রবন্ধের এক স্থানে ইউরোপের নারীদের 'স্বেচ্ছাচারিণী' এবং এক মুঠা অন্নের জন্য তাহারা লালায়িতা শব্দ দুটি প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ

> ইউরোপ কি শুধু স্বেচ্ছাচারিণী অন্ন-কাঙালিনী নারী-সম্প্রদায়ই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে? আর কিছুই দেয় নি? তা যদি তিনি বলেন তা হলে জোয়ান অব আর্ক, এলিজাবেথ ফ্রাই থেকে শুরু করে বর্ত্তমানের হিমালয়-অভিযানকারীদের দলের কাছাকাছি পর্য্যন্ত সত্যের সন্ধান নিতে তাঁকে অনুরোধ করছি। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ওই স্বেচ্ছাচারিণী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জগৎ-ধাত্রী রূপিনী মহা-শক্তির লীলা প্রকটিত হয়েছিল, তার খোঁজ-খবর নিতেও অনুরোধ কর্‌ছি।[১০]

পত্রিকাটির ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রী বিন্দুবাসিনী রায় তাঁর রচিত 'বাণী' শীর্ষক আলোচনায় এ প্রসঙ্গে শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, অমিয়বালা, তমলিলতা, কমলাবালা সকলের লেখার স্ব স্ব দৃষ্টিকোণের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন ঃ

> তবে আমি মোটামুটী রকমে মানি যে তাঁদের কথা যতই পারিপার্শ্বিক নিজ অবস্থা আনুসঙ্গিক মতবাদ হোক্ না কেন তা অনেক খানি হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে।[১১]

এক্ষেত্রে তিনি তাঁর অন্তরতমের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ

> আমি বলি পুরুষ সমাজের মধ্যে অনেকে ভাল আছেন, পুরুষ আছেন একথা জানি তাঁদের বিরুদ্ধতাও আমরা করছিনে করবও না বা এমন কথা উঠতে পারেনা, আমরা যা করব সেটা হচ্ছে নির্জ্জীব, ক্লিষ্ট, অধঃপতিত শয়তানের স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত সঙ্ঘ (Commune) হ'তে তাঁদের বহিষ্কৃত করা উপলক্ষে, শয়তানীর সঙ্গে, অঙ্গে বিষাক্ততা দুষ্ট-গন্ধতা প্রভৃতি সংক্রামক বীজানুগুলি পরিষ্কার অর্থে, পবিত্র করবার জন্যে বিপ্লব (Revolution) হবে মোদের সম্মার্জ্জনী। এ সম্মার্জ্জনী আমাদের পবিত্রতা রক্ষার একটী ভূষণ—ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করবার দুষমণ নয়। তাহলেই ঝিয়েরও লোভ নাই, গৃহস্থের ও অমঙ্গলের ভয় নাই।[১২]

অন্যদিকে মিসেস ডি. এম রহমান নারী সমাজের শিক্ষা, স্বাধীনতার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে 'আমাদের অভাব-অভিযোগ' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন যা পত্রিকাটির ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, ব্রাহ্ম সব ধর্মাবলম্বিনী নারীগণের কথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, স্রষ্টা একজনই, দু'চারটে নয় এবং

ধর্ম্ম কখনও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেয় নি। আর তাই ইসলামের দৃষ্টান্তে সবার কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করে লিখেছিলেন ঃ

> প্রথমেই জানতে চাই, আমাদের এ বন্দিনী অবস্থা কিসের জন্যে? ইস্‌লাম তো আমাদিগকে কারাপ্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ থাকতে বলে নি। তার পর, ইস্‌লাম ধর্ম্মে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে জ্ঞানলাভ অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দিষ্ট। তবে কেন আমরা তা থেকে বঞ্চিত?[১৩]

তিনি নারী সমাজের সেই স্বাধীনতা অধিকারের কথা তুলে ধরেছিলেন যা তাদেরকে অবরোধ ও শিক্ষাহীনতার পথ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে এবং তাদের ধর্মতঃ প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা এনে দিবে। তাঁর কথায় ঃ

> আমরা চাই আমাদের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অধিকার ও স্বাধীনতা,যা থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হ'য়েছে। আমরা চাই আমাদের ব্যক্তিত্বের স্বীকার, চাই আমাদের নারীত্বের সম্মান।[১৪]

অন্যদিকে মিসেস এম রহমান 'আমাদের দাবী' নামক এক প্রবন্ধে যুগে যুগে নারী জাতি পুরুষ কর্তৃক কিভাবে নিগ্রহের শিকার হয়ে জ্ঞানহীন, অধিকারহীন থেকে অন্ধকার জীবনে দিন অতিবাহিত করছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটির এক স্থানে তিনি নারীজাতিকে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

> উহাদের গঠিত সমাজ, উহাদের মনগড়া নিত্য নূতন ধর্ম্ম গ্রন্থ আমাদিগকে তিল তিল ধ্বংস ক'রছে। যতক্ষণ না বিদ্রোহী হয়ে আমরা ওদের ভুল বুঝিয়ে দেবো, ততক্ষণ ওরা নিজেদের দুষ্কর্ম্মের মাত্রা অনুভব ক'রতে পারবে না। জ্ঞান হেন অমূল্য রত্নে বঞ্চিত করে ওরা আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রছে।[১৫]

মিসেস এম, রহমান 'আমাদের স্বরূপ'নামক আর একটি প্রবন্ধে নারী জাতিকে শুধুমাত্র ধনী জমিদারের কন্যা, জজের স্ত্রী পরিচয়ে গৃহকর্তার অনুগ্রহে প্রতিপালিত পশু বিশেষ এবং দাসী হয়ে না থেকে বরং সংঘবদ্ধ হয়ে যার যতটুকু শক্তি আছে তাকে সেই ভাবে কাজে লাগাবার জন্য তিনি সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর এজন্য কে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী তা দেখবার মোটেই আবশ্যক নেই, সবচেয়ে বড় করে দেখতে ও ভাবতে হবে যে, আমরা সকলেই 'একমাত্র স্রষ্টার সৃষ্ট জীব' বলে মন্তব্য করেছিলেন।[১৬]

শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী 'সন্ধ্যা-প্রদীপ' এ তাই অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন ঃ

আমাদের আজ ভাববার দিন এসেছে। গর্জ্জন যে বিনা কারণে বর্ষণে পরিণত হয় না সে কথা আমাদের ভুললে চলবে না।[১৭]

অন্যদিকে শ্রীমহামায়া দেবী 'নারীর মুক্তি কোন্ পথে'? নামক লিখিত প্রবন্ধে নারীর অধিকার এবং তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয় — নারী প্রকৃতপক্ষে সমাজে তার সত্যকার স্থান পাওয়ার লক্ষ্যেই ব্যগ্র।[১৮] আর এ সত্যকার স্থান লাভের জন্য নারীর সর্বপ্রথম প্রয়োজন আত্মজ্ঞান এবং নিজস্ববোধ। সুতরাং নারীর সত্যের আবরণ নারীকেই উন্মোচন করার পরামর্শ দিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ

নারীর স্থান নির্ব্বাচন নারীকেই করতে হবে; নারীর জীবন সমস্যা নারীকেই মেটাতে হবে, নারীর সত্যকারের অধিকার নারীকেই নিতে হবে। সত্যবস্তু প্রতিজনের নিজস্বতা কেউ কা'কেও দিতে পারে না এবং কারো কাজে দাবী করবার ও নয়।[১৯]

এজন্য কিভাবে শিক্ষা প্রদান করলে নারীর প্রকৃত শিক্ষা লাভ করবে সে ব্যাপারে তিনি শিক্ষিত নারীদের মনোযোগী হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং নারী পুরুষ উভয়ের মিলনের উপর দেশের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আহ্বান রেখেছিলেন।[২০]

পত্রিকাটিতে বাঙালি নারী সমাজের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় সমকালীন রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন। ১১শ সংখ্যায় মিসেস আর, এস, হোসেন 'কানাইলাল দত্ত' কে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ঐ কবিতায় কানাইলাল দত্ত মৃত্যুজ্ঞান তুচ্ছ করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে আত্মবলিদান করেছিলেন, তিনি এসম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তাঁর আত্মত্যাগের স্মৃতি বাঙালি হৃদয় চিরকাল স্মরণে রাখবে বলে উল্লেখ করেছিলেন।[২১]

১৪শ সংখ্যায় 'সান্ধ্য-প্রদীপ' আসরে শ্রীমতী নলিনী বসু 'মায়ের-বোধন' নামক এক প্রবন্ধে বাঙালি হিন্দু মুসলমানকে একতাবদ্ধ হয়ে পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যার সুফল সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন ঃ

সেই দিন দেখবি বাঙালী, তোদের বাঙলার পরাধীনতার কিছুই লেশ নেই, সেদিন আবার ভারতে সকলে মিলে গাইবে, সুজলাং সুফলাং মলয়ং বহতি।[২২]

১৫শ সংখ্যায় শ্রী লীলা মিত্র 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামক এক রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইংরেজ শাসক সমর্থক এক শ্রেণীর ভারতীয়দের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। নিরস্ত্র

অসহায় স্বদেশবাসীদের ইংরেজ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে তাদেরকে বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২৩]

ধুমকেতু পত্রিকায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, সমাজ প্রচলিত পণপ্রথা ও বাল্য বিবাহের মত কুপ্রথার বিরুদ্ধে ঐ সময়কার সচেতন নারীগণ লেখনীর মাধ্যমে এর সমালোচনা করে তা উচ্ছেদের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। সমাজে নারীর শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মময় জীবনের মর্যাদা লাভের জন্য তারা সুপারিশ করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে দুই ধরনের মত পত্রিকাটিতে লক্ষ্যণীয়। একদল আধুনিক শিক্ষা ও মতের গুরুত্ব আরোপ করে জোর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে অপরদল চিরাচরিত ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে নারীদের পরিচালিত হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উল্লেখ যে, সনাতনী পরিমন্ডল থেকে নারীকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর মত সমাজ সংস্কারকদের অবদান সর্বজনবিদিত।[২৪] পরবর্তীকালে নারী মুক্তি আন্দোলনে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বলিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন। তবে নারীর অধিকার অর্জনের জন্য বিদ্রোহী না হয়ে নারী-পুরুষ উভয়েরই মিলিত প্রচেষ্টায় সুখী ভারতবর্ষ গড়ে তোলা সম্ভব—এই মত জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়। বস্তুতঃ নারী মুক্তি প্রশ্নে বিভিন্ন পক্ষের মতামত *ধুমকেতু* পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত ও স্বাধীন করার স্বপক্ষেও পত্রিকাটিতে নারীরা তাদের প্রাজ্ঞ মতের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। *ধুমকেতু* সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাদের রচনাগুলির মধ্যে যে সকল চিন্তারই প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

সূত্র-নির্দেশ

১। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত : ১৯০১-১৯৩০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ : ৩।

২। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ পৃ: ৩৬২।

৩। *ঐ*, ২৬শে শ্রাবণ, পৃ: ১৩।

৪। ৩য় সংখ্যা, ১লা ভাদ্র, ১৩২৯, পৃ: ৭।

৫। *ঐ*, পৃ: ৭-৮।

৬। ৫ম সংখ্যা, ৮ই ভাদ্র, পৃ: ৪

৭। *ঐ*, পৃ: ৫।

৮। *ঐ*।

৯। ঐ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২ই ভাদ্র, পৃ: ৫।
১০। ঐ, ৮ম সংখ্যা, ২৮শে ভাদ্র, পৃ: ৫-৬।
১১। ঐ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২ই ভাদ্র, পৃ: ৬।
১২। ঐ।
১৩। ঐ, ৭ম সংখ্যা, ১৬ই ভাদ্র, পৃ: ১০।
১৪। ঐ।
১৫। ঐ, ১০ম সংখ্যা, ২রা আশ্বিন, পৃ: ৮।
১৬। ১৩শ সংখ্যা, ২৬শে আশ্বিন, পৃ: ৯-১০।
১৭। ১৪শ সংখ্যা, ৩০শে আশ্বিন, পৃ: ১৫।
১৮। ঐ, ১৮শ সংখ্যা, ১৪ই কার্তিক, পৃ: ৭।
১৯। ঐ।
২০। ঐ, ২২শ সংখ্যা, ১লা অগ্রহায়ণ, পৃ: ৬
২১। ঐ, ১১শ সংখ্যা, ৫ই আশ্বিন, পৃ: ৮।
২২। ঐ, ১৪শ সংখ্যা, ৩০শে আশ্বিন, পৃ: ১৫।
২৩। ঐ, ১৫শ সংখ্যা, ৩রা কার্তিক, পৃ: ৩।
২৪। বিস্তারিত : Mrs. Gray, The Progress of women in L.S.S. O'Malley (ed), *Modern India and the west*, Oxford, 1968, P-456.

এবং

Jogesh Chandra Bagal, *Women's education in Eastern India*. Calcutta, 1956, PP.5-6.

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লা সাময়িকপত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও বাংলা সাহিত্যে অবদান

শিতি কুমারী কুন্ডু

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মত জ্ঞাপন করেছেন—

> *"বাংলাদেশে গদ্যভাষায় রচনাকর্ম যেমন উনিশ শতকের দান, তেমনি বাংলা সাময়িকপত্রও উনিশ শতকেই জন্মগ্রহণ করে।"*

কিন্তু সাময়িকপত্র প্রকাশ একান্তভাবে আধুনিক কালের ঘটনা। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে এর আত্মপ্রকাশের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র এবং সাময়িকপত্র পরিচালনের গৌরব শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রাপ্য। যদিও শ্রীরামপুরমিশন সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্রতী হওয়ার পূর্বেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং সেখানে সর্বপ্রথম যে গদ্যরচনার প্রয়াস শুরু হয়, তা বিশেষভাবে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হওয়ায় সে গদ্যের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ হয়েই ছিল। সাময়িকপত্র বাংলা গদ্যের শক্তিকে বর্ধিত করে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করল। এতে কেবল বাংলাগদ্যের বিবর্তনের রূপটাই যে লক্ষ্য করা যায় তা নয়, বাঙালি সমাজের সমসাময়িক জীবনচর্চার দলিল রূপে এর মধ্যে থেকে অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। উনিশ শতকের নামকরা বহু বাঙালি লেখক সাময়িকপত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

ইংরেজ আমলেই বাংলায় প্রথম সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয়, এর পূর্বে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের কোন প্রকার প্রয়াস দেখা যায় নি। মুঘলযুগে দেশের অভ্যন্তরে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল, এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য ওয়াকেয়ানবীশ (সংবাদ সংগ্রহকারী) নিয়োগ করা হত। এঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে রাজধানীতে সম্রাটের কাছে পাঠাতেন। এই সংবাদ সংগ্রহের কাজটি যেমন অনেকটা গোপনে সম্পন্ন হত, তেমনি সংগৃহীত সংবাদ নিবদ্ধ থাকত ব্যক্তিগত পর্যায়ে, সাধারণত জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হত না। ইংরেজ আমলেই প্রথম মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকা জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়। এদেশের প্রথম সাময়িক পত্রিকা হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়, তবে একটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। যেমন—

১) 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচারদর্পণ' এর প্রকাশকাল ১৮১৮ সাল থেকে 'বঙ্গদূত' প্রকাশের কাল ১৮২৯ সাল পর্যন্ত।

২) ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' প্রকাশের কাল থেকে ১৮৪০-৪১ সাল পর্যন্ত।

৩) ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত।

৪) ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কাল থেকে ভারতী (১২৮৪) প্রকাশের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত একটি যুগ।

১) <u>প্রথম যুগ ঃ 'দিগ্‌দর্শন'</u> (১৮১৮) —

বাংলা সাময়িকপত্রের অগ্রদূত হল 'দিগ্‌দর্শন'। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন এর কর্তৃপক্ষস্থানীয় জন ক্লার্ক মার্শম্যান এর সম্পাদনায় প্রথম মাসিক পত্রিকা হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল— 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। নিম্নে রচনার একটি নিদর্শন দেওয়া হল—

''দিগ্‌দর্শন। প্রথম ভাগ। আমেরিকার দর্শন বিষয়। পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত আছে— ইউরোপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগে এক মহাদ্বীপে আছে। ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয়, কিন্তু আমেরিকা পৃথক্‌ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে যে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই সালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল। তাহার পূর্বে আমেরিকা কোন লোককর্তৃক জানা ছিল না।''[২]

ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে এই মাসিক পত্রে নানা কৌতূহলজনক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, ফলে স্কুলেও এর কোন কোন সংখ্যা পাঠ্য ছিল।

<u>সমাচারদর্পণ ঃ</u>

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে 'সমাচারদর্পণ'। ১৮১৮ সালেব ২৩-এ মে তারিখে মার্শম্যান এর সম্পাদনায় 'সমাচারদর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হতে থাকে। এদেশীয় অনেক বিদ্বজ্জন ব্যক্তি পত্রিকাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে এর মান বিশেষ উন্নত ছিল। এঁদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি মিশনারী ইংরেজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকলেও মিশনারীরা কখনো মাত্রাজ্ঞান হারান নি।

বাঙ্গালগেজেটি ঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্তৃক উল্লিখিত দুটি পত্রিকা প্রকাশের প্রায় সমসাময়িক কালেই (১৮১৮ জুন) কলকাতা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটিই সম্ভবত: বাঙালী পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা।

'ব্রাহ্মণসেবধি', 'সংবাদকৌমুদী ঃ

'সমাচারদর্পণ' এ প্রথমদিকে কেবল সংবাদ পরিবেশিত হলেও পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্মের বিপক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ মুদ্রিত হতে থাকে। এতে রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিরক্ত হয়ে এ সমস্ত প্রবন্ধের উত্তর দেওয়ার জন্য পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। রামমোহন রায় প্রথমে তাঁর নিজের সম্পাদনায় 'ব্রাহ্মণসেবধি' (১৮২১) একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে রামমোহন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর যুগ্ম সম্পাদনায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে রামমোহন সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে যখন লিখতে শুরু করলেন তখন ভবানীচরণ সম্পাদকের পদে ইস্তাফা দিলেন, এরূপ অবস্থায় রামমোহনকে পত্রিকাটি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল।

রামমোহন চেয়েছিলেন হিন্দুসমাজ অন্ধ আচার-নিষ্ঠা ও মূঢ় সংস্কারবন্ধন কাটিয়ে উঠুক, পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে স্নাত হোক। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এই মর্মে লেখা হল—

> "লোকহিতসাধনই এই সংবাদ প্রচারের প্রধান লক্ষ্য..........দেশবাসীর অভাব অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।"[৩]

সমাজবিপ্লবী রামমোহন ' সংবাদকৌমুদী'র পাতায় সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করাতে এই পত্র হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন হারালো। ফলে পত্রিকাটি দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হল না।

সমাচারচন্দ্রিকা ঃ

গোঁড়া বাঙালী সমাজের মুখপত্র রূপে 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকা 'সংবাদকৌমুদী'র প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। রামমোহন রায় এর বৈপ্লবিক মতবাদের বিরোধিতাকল্পে রক্ষণশীল হিন্দুরা ১৮২২ সালের মার্চ মাসে 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদক হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহন বিপক্ষীয় এই পত্রিকাটি 'সংবাদকৌমুদী'র সঙ্গে প্রবল মসিযুদ্ধ চালাতে থাকে। প্রাচীনপন্থী হিন্দুর মতবাদকে 'সমাচারচন্দ্রিকা'র পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হল। কেবল রামমোহনের বিরুদ্ধে

লেখনী ধারণ করেই ভবানীচরণ ক্ষান্ত থাকেন নি, বিদ্রোহী 'ইয়ংবেঙ্গল'ও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। পত্রিকাটি সমগ্র হিন্দু সমাজের মুখপত্র হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জন্য আধুনিক ও প্রগতিশীল পাঠকেরা এর সংস্পর্শ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের সাংবাদিক দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্গদূত ঃ

'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রকাশ (১৮২২) এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের গতি অনেকটা রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও এই সময়ের মধ্যে আরও কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাময়িকপত্রের আসরকে যে মাতিয়ে তোলে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বঙ্গদূত পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন নীলরতন হালদার। এ ছিল সংস্কারকামী মতবাদের একটি বাহন, প্রগতির বাণীবাহক।

২) দ্বিতীয় যুগ ঃ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠছে যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদূত' প্রকাশ পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্র প্রধানত সংবাদ বিতরণের জন্যই প্রকাশিত হত। কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যিক প্রেরণায় 'সংবাদপ্রভাকর' প্রকাশিত হল এবং বলতে গেলে 'সংবাদপ্রভাকর' এর মাধ্যমেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে নিয়োজিত হওয়ার উপযোগী সামর্থ্য লাভ করল।

সংবাদপ্রভাকর ঃ

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮-এ জানুয়ারী কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তর সাধিত হয়। প্রথমে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুন থেকে পত্রিকাটির দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসাবে 'সংবাদপ্রভাকর' এর নাম আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রত্রিকাটিতে দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকত। এখানে অলঙ্কৃত গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া ঈশ্বরগুপ্ত অখ্যাত ও অল্পখ্যাত বহু প্রাচীন কবির উপাদেয় কবিতাবলী সংগ্রহ করে তাঁর এই পত্রিকাটিতে প্রকাশ করতেন। বাঙ্গালার বহু কবির জীবনী রচনার প্রচেষ্টাও তিনি পত্রিকাটিতে করে গেছেন। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রমুখের জীবনী ও কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করে তিনি ভবিষ্যৎ সাহিত্যানুরাগীদের যে মহদুপকার সাধন করে গেছেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উৎকৃষ্ট সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক একটি লেখকচক্র গড়ে ওঠে। 'সংবাদপ্রভাকর'কেও কেন্দ্র করে একটি লেখকচক্র গড়ে উঠেছিল। এই লেখকচক্রের মধ্যমণি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ববর্গের হাতে-খড়ি পর্ব সমাধা হয়েছিল 'সংবাদপ্রভাকর' এর পৃষ্ঠায়। প্রথম স্বদেশানুরাগের বীজ বপনের জন্যও প্রত্রিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংবাদপ্রভাকরে দেশপ্রীতির প্রেরণামূলক উৎকৃষ্ট রচনা থাকত।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলমে নামহীন ও ছদ্মনামে চিঠি ছাপানোর বিশেষ রেওয়াজ ছিল। এই সমস্ত চিঠিপত্রের বক্তব্যের সঙ্গে ওই বিশেষ সংবাদপত্রে নীতির এত মিল ছিল যে অনেক সময় মনে হতে পারে চিঠিপত্রগুলো সম্পাদকীয় বিভাগেরই প্রণোদিত। অনেক বেনামী চিঠিপত্রে, পত্রলেখকের দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিও থাকত। 'সংবাদপ্রভাকর' এই চিঠিপত্র কলমগুলো নিয়ন্ত্রিত করে একটি নীতি নির্ধারিত করে। ১৮৪৭ সালের ৫ই জুন প্রভাকরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে প্রভাকরের পলিসির পরিচয় পাওয়া যায় —

> "বিদেশীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা বিবেচনা করেন যে, তাঁহারা ছাইভষ্ম যাহা পাঠাইবেন তাহাই সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবেক, এই অভিপ্রায়ে যাঁহার মনে যাহা উদয় হয় তিনি তাহাই লিখিয়া পাঠান, কিন্তু সম্পাদকেরা কত সাবধানে কার্য সম্পন্ন করেন তাহা বিবেচনা করেন না, ছাইভষ্ম বিষয় সকল প্রকাশকরণের জন্য সমাচার পত্রের সৃষ্টি হয় নাই, যে সমুদয়বিষয় সাধারণের উপকার ও হিতজনক আমরা কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকি, নিন্দাজনক কুৎসিত বিষয় কখনই প্রকাশিত করি না, বিশেষত: পরগ্লানি প্রকাশে অতিশয় দুঃখবোধ করিয়া থাকি,...... .... ?"[৪]

'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'

১৮১৮ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা, মফঃস্বল এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। কোনটির বিষয় বিজ্ঞান, কোনটির বিষয় জীববিজ্ঞান, কোনটিতে রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা। এরূপ পত্রপত্রিকার সংখ্যা ২২০। এর মধ্যে দুটো পত্রিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — ১৮৩১ সনে প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ' ও ১৮৪২ সালে প্রকাশিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। এই দুটো পত্রিকা ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষিত আধুনিক যুবসমাজের মুখপত্র। এতে সমাজ, রাজনীতি ও বিজ্ঞানবিষয়ে চিন্তাগর্ভ আলোচনা থাকত।

৩) তৃতীয় যুগ ঃ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা থেকে সাময়িক পত্রের তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে সাময়িকপত্রের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করল। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই পত্রিকাটিকে প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্র বলা যায় না। যদিও সংবাদ এ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সংবাদ নির্ভর পত্রিকা ছিল না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই পত্রিকাটি ছিল ধর্মভিত্তিক সাময়িকপত্র। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (১লা ভাদ্র, ১৭৬৫ শক) বলা হয়েছে—

> ''বৈষয়িক সংবাদপত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশেতে প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলক্ষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত হইল, এবং সর্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।''[৫]

১৭৬১ শক বা ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার' প্রচারই ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য। এই সভার মুখপত্র হিসাবেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় বলা হয় —

> ''মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে সে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার অর্থ জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্বৃত হইবেক।''[৬]

ধর্মব্যাখান ছাড়া এতে নীতিগর্ভ বিজ্ঞান বিষয়ক এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব ঘটিত জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ভাষাসৌষম্য, গাম্ভীর্য, যুক্তিনিষ্ঠা ও বাক্‌সংযম ছিল 'তত্ত্ববোধিনী'র গদ্যের প্রধান গুণ। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রধান কৃতিত্ব 'তত্ত্ববোধিনী'র মারফতেই তিনি যুক্তিবাদে ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বাঙালীকে দীক্ষিত করেছেন, আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে একেবারে কেন্দ্রচ্যুত হতে দেন নি। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীই প্রথম এ পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর সর্বোত্তম রচনা 'প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য', 'পান্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষা', 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা' প্রভৃতি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের সূচনা হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতায়। উনবিংশ

শতকের জ্ঞানতৃষ্ণা ও আদর্শবাদ —যা রামমোহনের জ্ঞান থেকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তারই ঐশ্বর্যদীপ্ত 'তত্ত্ববোধিনী'তে পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠিত গদ্যভাষার আদর্শই ক্রমে 'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এ একটা বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করেছিল।

অন্যান্য প্রধান সাময়িকপত্র ঃ

এ যুগের কয়েকটি প্রধান সাময়িকপত্র হল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'রহস্যসন্দর্ভ, (১৮৫৩), 'মাসিক' পত্রিকা (১৮৫৪)।

বিবিধার্থ সংগ্রহ ঃ

বিবিধার্থ সংগ্রহ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা, প্রথম বাঙ্গালা সচিত্র মাসিকপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। গ্রন্থ সমালোচনা, পুরাবৃত্তর আলোচনা প্রভৃতি এবং দুরূহ বহু বিষয়ের গবেষণামূলক আলোচনা করাই এই পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল। এখানে মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

মাসিক পত্রিকা ঃ

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সমবেত চেষ্টায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর ভূমিকায় লিখিত ছিল—

> "এই পত্রিকা সাধারণের — বিশেষত: স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচিত হইবেক।"[৭]

উক্ত প্রতিশ্রুতি পত্রিকার সম্পাদকগণ পালন করেছিলেন। আসলে বাঙলা মাসিক পত্র বাঙলা সাহিত্যের আসর হতে থাকে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'মাসিকপত্র' (১৮৫৪) এর সময় থেকে।

৪) চতুর্থ যুগ ঃ

বঙ্গদর্শন পত্রিকা ঃ

১৮৭২ সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' এর সূচনা থেকে বাঙলা সাময়িকপত্রের এক ঐশ্বর্যময় যুগ, তথা সাহিত্যযুগের আরম্ভ হল। বঙ্কিমচন্দ্র একাই তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রসরচনা, উপন্যাস, সমালোচনা, ইতিহাস, ধর্ম — ইত্যাদি রচনায় স্বীয় শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভাবে ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যকে যে পরিমাণে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল, ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন সাময়িক পত্রিকার দ্বারাই তেমন আর সম্ভব হয় নি। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের উন্নতি সমৃদ্ধির বিভিন্ন পথ খুলে যায়,

বাঙলা গদ্য এই পত্রিকায় নানা বিষয়ক আলোচনায় নিয়োজিত হওয়ায় তা সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী সামর্থ্যও লাভ করে।

উপসংহার ঃ

সামগ্রিক বিচারে বলা যেতে পারে যে বাঙলা সাময়িকপত্র প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য সাধন করেছে — এক, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। বাঙলা সংবাদপত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য বাঙলা ভাষায় জুগিয়ে সমাজের চেতনাকে প্রসারিত করেছে। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় দান 'সমাচারদর্পণ', এর পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও জ্ঞানোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দুই, ভাষা ও সাহিত্য গঠন। যে আটপৌরে বাঙলা গদ্য গড়ে না উঠলে সামাজিক চেতনা আত্মপ্রকাশের পথ পায় না সে গদ্য গঠনে সংবাদপত্রই সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সংবাদের সঙ্গে শুধু তথ্য জুগিয়েও সংবাদপত্র চলত না, সেই সঙ্গে লোকের মনোরঞ্জনেরও চেষ্টা করতে হত। সরস লেখা যোগাবার চেষ্টায় সাহিত্যিক রচনারও তাই প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই 'সংবাদপ্রভাকর' এর নামোল্লেখ করতে হয়। অবশ্য পরবর্তীক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী'র পরে সাময়িকপত্র সাহিত্যেরই উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে — আর আজও তা আছে। সাময়িক পত্রের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেন এর মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য —

> "পুঁথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ তর্কাতর্কি ধর্মপ্রচার পুস্তিকা ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি 'কেজো' রচনার বাইরে নিছক সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায় তাহার প্রথম আস্বাদ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে প্রথমে আনিয়া দেয় সাময়িকপত্র। সমাচারদর্পণ সংবাদকৌমুদী সমাচারচন্দ্রিকা বঙ্গদূত জ্ঞানান্বেষণ সংবাদপ্রভাকর ইত্যাদি সাময়িকপত্রের দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচিপ্রবেশ। কিন্তু সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের রূপ অপূর্ণ এবং সৌষ্টববর্জিত, তাই সাময়িকপত্রের দ্বারা তখন নূতন সাহিত্যের পথ পরিষ্কার ছাড়া কিছু সম্ভব হয় নাই।"[৮]

সূত্র-নির্দেশ

১। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।*
২। *দিগদর্শন পত্রিকা,* সম্পাদক মার্শম্যান।
৩। সংবাদ কৌমুদী, প্রথম সংখ্যা, সম্পাদক - রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। সংবাদপ্রভাকর, সম্পাদক—ঈশ্বর গুপ্ত, তাং ১৮৪৭ সাল, ৫ই জুন।
৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্পাদক — অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রথম সংখ্যা, ১লা ভাদ্র, ১৭৬৫ শক।
৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্পাদক — অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রথম সংখ্যা।
৭। মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক — প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীঃ।
৮। ডঃ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২৫, প্রথম প্রকাশ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ - ১৩৮৬।

ঔপনিবেশিক বাংলায় বিভিন্ন আধুনিক পেশার উদ্ভব ও প্রথম পেশাদার সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব

গার্গী নাগ

উনবিংশ শতকে এদেশে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রসার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সময় ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রসারের ফলে একশ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সরকারী চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন। বেশিরভাগে ক্ষেত্রেই সেগুলি ছিল করনিকের পদ। আসলে সেই সময় এদেশে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে বহু নতুন নতুন পেশারও উদ্ভব ঘটেছিল।[১] করনিকের পেশা ছিল সেকালের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে বেশ গ্রহণীয় একটি পেশা।

এর পাশাপাশি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীন পেশার অন্বেষণেও নেমে পড়েছিল। এর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় পেশা ছিল — আইনব্যবসা। পেশা হিসাবে এই বৃত্তির সম্ভাবনার ক্ষেত্রেটি ছিল বেশি প্রসারিত। ঔপনিবেশিক শাসনের পরবশ্যতার গ্লানি অন্তত খানিকটা হলেও মোচনের সুযোগ ছিল এই পেশায়। তাছাড়া পসার জমাতে পারলে অপর্যাপ্ত আয়ের সুযোগ তো ছিলই।

ওকালতির মতই এইসময় আর একটি স্বাধীন পেশা হিসাবে উদ্ভব হচ্ছিল সাংবাদিকতার, সংবাদপত্র সম্পাদনা করার। আয়ের দিক থেকে হয়তো এই পেশা আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। উপরন্তু প্রতি পদে সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা ছিল প্রবল। তবুও এযুগের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির দেশীয় সম্পাদকরা সেই ঝুঁকি মাথায় নিয়েও এই পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন।

এরই পাশাপাশি অপর একটি স্বাধীন পেশাও এইসময় সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিচ্ছিল ধীরে ধীরে। তবে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল বিংশ শতকের প্রথমার্ধে — তা হল 'সাহিত্যিকের পেশা'। ইতিপূর্বে বাংলায় স্বনামধন্য কবি ও লেখক আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি। কিন্তু তাঁরা কেউই সেই অর্থে পেশাদার ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি:) ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। অবসর সময়ে তিনি উপন্যাস লিখতেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি:) সেই অর্থে পেশাদার সাহিত্যিক বলা যাবে না কোনমতেই। শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রিঃ) হলেন বাংলার সেই সাহিত্যিক, যিনি প্রথম সাহিত্যরচনাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন। আসলে বিংশ শতকের প্রথমার্থে বাংলায় তাঁর আগে জীবিকা নির্বাহের জন্য পুরোপুরিভাবে লেখার ওপর নির্ভরশীল আর কাউকে হতে দেখা যায়নি।[২] অথচ শরৎচন্দ্র ১৯০৩-১৯১১ খ্রিঃ পর্যন্ত তাঁর বর্মাপ্রবাসেব প্রথমদিকের প্রায় নয়-দশ বছর বাংলার সাথে সম্পর্করহিত ছিলেন বললেই চলে।

একদা অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে সুদূর বর্মামুলকে পাড়ি দেওয়া এই ভাগ্যান্বেষী কি করে মাত্র পরবর্তী এক দশকের মধ্যে বাংলার সাহিত্যজগতের একটা পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিলেন, এবং ১৯৬১ সালের মধ্যে একজন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত পেশাদার লেখক হয়ে উঠলেন — সেই ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই নবউদ্ভূত স্বাধীন বৌদ্ধিক পেশার যে চ্যালেঞ্জ — তাকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন — তা ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সমকালীন এবং তাঁর অনুজ সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাদ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রিঃ) স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, আবার সাহিত্যরচনাও করতেন। তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রিঃ) আবার সাহিত্যসৃষ্টিকেই পেশা হিসাবে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্যসেবাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যথার্থ অর্থে পথপ্রদর্শক। তাঁর পেশাদার সাহিত্যিক হয়ে ওঠাব প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে সমসাময়িক যুগের বাংলার সাহিত্য জগতের একটি রূপ ভেসে ওঠে। যেখানে বিশেষ করে বাংলার নামকরা সাময়িক পত্রিকাগুলির ইতিহাস, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, পাঠক টানার নানা কাযদা ও প্রকরণ, পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনাসমূহের মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু মহিলা কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা, পত্রিকাগোষ্ঠীগুলির তথা প্রকাশনা সংস্থাগুলির তীব্র দলাদলি, পাঠকদের রুচি ও চাহিদার বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক এই সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের লেখক হয়ে ওঠার ইতিহাসে তাঁর বর্মাপ্রবাস কালের একটা বড় ভূমিকা আছে। সেখানকার 'বহুবিতর্কিত' 'বিশৃঙ্খল' জীবনযাত্রার মধ্যেও তিনি নিয়মিত Bernard Free Library-তে গিয়ে ইংরেজী, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন সম্বন্ধীয় বই পড়তেন ও নোট নিতেন।[৩] আর তার বহু পূর্বে কৈশোরে ভাগলপুরে মামারবাড়িতে থাকাকালীন সেখানে তাঁর সমবয়সী আত্মীয়বন্ধুরা মিলে গড়ে তুলেছিল একটি ক্ষুদে সাহিত্যিক গোষ্ঠী। সেখানে বাংলায় সাহিত্যচর্চা চলত জোরকদমে।[৪] তখন থেকেই বিদেশী সাহিত্যপাঠের প্রতি তাঁর প্রচন্ড ঝোঁক ছিল। দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে তিনি ছিলেন বৈষ্ণবসাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত। প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্কিম সাহিত্যের অর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রচনার গভীর অনুরাগী।

১৯০৭ সাল কতকটা আকস্মিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কিশোরবেলার রচনা 'বড়দিদি' গল্পটি। উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরই বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গল্পটি অসামান্য প্রশংসা পেয়েছিল পাঠক মহলে। এই সাফল্যসত্ত্বেও ১৯১১ সালেব আগে পর্যন্ত তাঁকে লেখার ব্যাপারে সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায় নি। তবে এই সূত্রে তাঁর সব বাল্যসুহৃদ ও ভাগলপুরগোষ্ঠীব সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত পত্রবিনিময়ের সূত্রপাত হয়েছিল। এই সুবাদে সৌরীন্দ্রমোহনের মধ্যস্থতায় শরৎচন্দ্র অনুমোদনক্রমে সমকালীন একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা 'যমুনা'-র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক 'বড়দিদি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। ১৯১২-১৯১৩ সালে স্বল্পবিরতিতে তিনি বারকয়েক বর্মা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তখনই বাল্যসুহৃদ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি 'যমুনা'-র সম্পাদকের সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

সেইসময় বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে 'ভারতী', 'যমুনা' — ইত্যাদি সচিত্র মাসিক পত্রিকাগুলি বেশ নাম করেছিল। এগুলির সম্পর্কে দু-চার কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ তখনকারদিনে লেখক পরিচিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের ভূমিকাই ছিল এইসব পত্রিকার। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করেই তখন সাহিত্যরচনার উদ্দীপনা, পাঠকদের আগ্রহাতিশয্য, পত্রিকা গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা — অর্থাৎ সবমিলিয়ে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহের একটা অনুকূল বাতাবরণ গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত পত্রিকাগুলি অর্থাৎ 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'যমুনা', প্রবাসী', ইত্যাদির যেমন আলাদা আলাদা লেখকগোষ্ঠী ছিল, তেমনই ছিল পৃষ্ঠপোষকের দলও। সেকালের বিদগ্ধ অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিকদের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় উঠতি তরুণ লেখক লেখিকাদেবও যে, লেখার সুযোগ করে দিয়ে অফুরন্ত উৎসাহ যুগিয়েছিল এই পত্রিকাগুলি — তারও অজস্র প্রমাণ রয়েছে। যেমন সৌরীন্দ্রমোহন ওকালতি পাশ করেও সক্রিয়ভাবে সাহিত্যচর্চায় মেতে উঠেছিলেন। 'ভারতী' সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি সরলাদেবীকে সাহায্যও করতেন। শরৎচন্দ্রর মামাও বাল্যবন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ওকালতি পাশ করে, ওকালতির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় প্রচুর সময় ব্যয় করতেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সাথে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। আবার সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথ উভয়ের সঙ্গেই 'যমুনা' সম্পাদকের ছিল বিশেষ সুসম্পর্ক। এঁদের মাধ্যমেই শরৎচন্দ্রও ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়েছিলেন 'যমুনা'-র সাথে। অবশ্য আলোচ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে — 'যমুনা'-ই ছিল সবচেয়ে ম্রিয়মান। শরৎচন্দ্র যখনই বর্মা থেকে দেশে আসতেন, তখনই যেতেন 'যমুনা'-র অফিসে। কি করে 'যমুনা'র শ্রীবৃদ্ধি কবা যায় — সেই বিষয় নিয়ে সবিস্তার আলোচনাও করতেন। এই সময় তিনি বর্মা থেকেও নিয়মিত লেখা পাঠাতেন

'যমুনা'য়। সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথের লেখা তো ছিলই। এছাড়া ভাগলপুর সাহিত্যসভার সদস্যদের, যেমন — গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, বিভূতি ভূষণ ভট্ট প্রমুখের লেখাও এইসময় বিশেষ করে ১৩১৯, ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'র সিংহভাগ জুড়ে ছিল।

এই পর্বে শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, তিনি, 'যমুনা'র ভালোমন্দ সম্পর্কে সত্যিই চিন্তিত। কিন্তু সেইসাথে নিজের লেখক পরিচিতি নিয়েও তাঁর চিন্তা নেহাত কম নয়। ১০.০১.১৯১৩ তারিখে উপেন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে তিনি অনুযোগ জানিয়েছেন — তাঁর প্রথমজীবনের লেখা গল্প 'কাশীনাথ', 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁকে না জানিয়ে ছাপতে দেবার জন্য। নিজে তখনও প্রবাসে ছিলেন বলে স্বদেশে পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলি পাঠকদের কাছে কতটা গ্রহণীয় হচ্ছে না হচ্ছে তা জানার জন্য তিনি উদগ্রীব ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর 'বড়দিদি' গল্পটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে সমাদর পেয়েছিল। পত্রমারফৎ এসব খবর তিনি রাখতেন, আর এর নিতান্ত কম মূল্য ছিলনা তাঁর কাছে। পেশাদার লেখক হিসাবে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের আগে এই পর্ব তাই তার আত্মবিশ্বাস অর্জনের পর্ব।

'যমুনা'র শ্রীবৃদ্ধি যে এইসময় তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল একথা সর্বজনবিদিত। আবার 'যমুনা'র মাধ্যমে নিজের লেখক পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠা করতেও তিনি প্রাণপণ সচেষ্ট। লেখক হিসাবে নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাই তাঁর উচ্চাশাও সম্ভবত বাড়ছিল। তখনও তিনি সুদূর বর্মায়। তবু বাংলাদেশের একটি পত্রিকা (যমুনা) অন্তত পরোক্ষভাবে হলেও সম্পাদনা করার লোভ তিনি সামলাতে পারেননি তাঁর চিঠিতে এই আগ্রহের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎচন্দ্রের নির্দেশ প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই মানতেন। কারণ শরৎচন্দ্র যেমন একসময় 'যমুনা'কে আশ্রয় করে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছিলেন, 'যমুনা'রও তেমনি শরৎচন্দ্রর লেখাকে আশ্রয় করেই দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু তা যমুনার ভবিষ্যতের পক্ষে খুব একটা শুভ হয়নি। 'যমুনা' যেন দিনে দিনে আরও বেশি শরৎচন্দ্র নির্ভর হয়ে পড়ছিল এবং 'যমুনা'র ওপর লেখক শরৎচন্দ্রের ছায়া ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছিল। 'যমুনা'র এক একটি সংখ্যায় স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশিত গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছিল।

ঠিক এই সময়েই তিনি তাঁর সাড়াজাগানো বিতর্কিত উপন্যাস 'চরিত্রহীন' নিয়ে নানারকম ভাবনাচিন্তা, আলাপ আলোচনা করছিলেন। ব্যাপারটি একধরনের বিজ্ঞাপনী প্রচারের কাজ করেছিল। 'ভারতী' মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা — এই অজুহাতে তিনি

নিজেই এটি 'ভারতী'তে ছাপাতে দেননি। বিতর্ক দেখা দিতে পারে সেই আশঙ্কায় 'সাহিত্য' - সম্পাদক উপন্যাসটি ছাপাতে সাহস পাননি। 'যমুনা'র সম্পাদক অবশ্য এব্যাপারে আগাগোড়াই রাজী ছিলেন। তথাপি শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের পান্ডুলিপি দিয়েছিলেন আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়রত 'বিগ্‌বাজেটের' বাংলা মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম কর্মকর্তা ও তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অপছন্দ হওয়ায় সেটি ফেরৎ আসে। ফলে 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করাটা শরৎচন্দ্রের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত যমুনাতেই (১৯১৩ সালে) এটি ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।

এরপরই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশিত হল ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ। প্রথমদিকে শরৎচন্দ্র নামকরণে এই পত্রিকার প্রতি প্রসন্ন ছিলেননা। পরে অবশ্য তাঁর মত বদলায়। পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষে'র সাথে তাঁর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্টতা দেখে উদ্বিগ্ন ফণীন্দ্রনাথ ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে 'যমুনা'র সম্পাদনা কার্যে যোগদান করিবেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও শেষপর্যন্ত উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। 'বড়দিদি' গ্রন্থের কপি বিক্রয় করা নিয়ে ও তার লাভের অর্থ নিয়ে এক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং 'যমুনা'র সাথে শরৎচন্দ্রের যাবতীয় সংশ্রব ছিন্ন হয়।[৪] এরপর প্রধানত 'ভারতবর্ষ' এই তাঁর গল্প-উপন্যাস ছাপা হতে থাকে।

'ভারতবর্ষ' লিখতে লিখতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'হোলটাইমার লেখক'। বাংলার সাহিত্যজগতে তাঁর লেখার চাহিদা এবং কদর সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েই তিনি চাকরি ছেড়ে দেশে ফেরার তোড়জোড় করছিলেন। সেজন্য 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে প্রতি মাসে একশতটাকা এলাউন্স পাওয়ার সুনিশ্চিত আশ্বাস এবং যাতায়াতের ব্যয়বাবদ অর্থ পাবার পর ১৯৬১ সালে তিনি চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে, রেঙ্গুনের পাট চুকিয়ে পাকাপোক্তভাবে দেশে ফিরে এলেন সপরিবারে।[৫]

কিন্তু তিনি যখন দেশে ফিরলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন স্বমহিমায় উদ্‌ভাসিত। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর সাহিত্যিক ঋণের কথা বেশ খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেছেন। তাসত্ত্বেও নিজের গল্প-উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি এমন কিছু বিশেষ বিষয়কেই নির্বাচন করেছিলেন — যা তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ছায়ার নীচে হারিয়ে যেতে দেয়নি, বরং এক স্বতন্ত্র ঘরনার পেশাদার কথাশিল্পী হিসাবে পূর্ণ স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। তাঁর গল্প-উপন্যাসে ধরা পড়েছে সেই সময়ের বাঙালীর পারিবারিক জীবন, সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে নর-নারীর বাঁধাগতের সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে

এসে, পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্কের নতুন সমীকরণ; নারীর সামাজিক অবস্থান ও তার জটিল বিন্যাস, হিন্দু বিধবার নানা অব্যক্ত চাওয়া-পাওয়ার কথা, হিন্দুঘরের বিবাহযোগ্য অনূঢ়াকন্যার বিবাহের সমস্যা, আর সর্বোপরি সমাজেব সেই অন্ত্যজশ্রেণী — মূলস্রোতের সাহিত্যে এর আগে কখনো যাদের সেভাবে ঠাঁই হয়নি — সেই পতিতাদের জীবনের মানবিক প্রত্যাশাগুলোকে সংবেদনশীল লেখনীর মধ্যে দিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন তিনি, আর আদায় করে নিয়েছেন তারিফ ও অকুণ্ঠ জনপ্রিয়তা। এই ভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক বাংলার প্রথম পূর্ণসময়ের সফল পেশাদার সাহিত্যিক।

সূত্র-নির্দেশ

১। Rajat Kanta Roy : *The Evolution of the professional Structure in Modern India Older and New Professions in a Changing Society* (The Indian Historical Review Vol - IX, No. - 1-2 July 1982 - Jan., 1983)

২। Humayun Kabir : *Saratchandra Chatterjee Silpa Sangstha Prakashani.* 1st edition - 1963, 17 Sept , Page No 27.

৩। গিরীন্দ্রনাথ সরকার ঃ *ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র*, পৃ. ১১।

৪। অজিত কুমার ঘোষ ঃ *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার*, পৃ: ১৬০।

৫। অজিত কুমার ঘোষ ঃ *শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার*, পৃ: ২১০।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে 'পুনরাবৃত্তের' উপর একটি সমীক্ষা—(দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা)

দীপক মণ্ডল

দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এক বিশেষ অবদান আছে। নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা অবস্থিত।· ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বব বাংলার নবাব মীরজাফর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ২৪টি পবগণার জমিদারিসত্ব উপহাব দেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ সালেব পলাশী যুদ্ধের পর ২৪টি পবগণা সরাসবি ইংরেজদের কর্তৃত্বে চলে যায়। ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আয়তন ৮১৬৫.০৫ বর্গকিলোমিটার। জেলায় ৫টি মহাকুমাঃ আলিপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ। এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের চারটি বরোকমিটি এই জেলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়ে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার লোকসংখ্যা হলো ৬৯,০৯,০১৫ জন। এর মধ্যে গ্রামে বাস করে ৫৪,৬৭,২৭১ জন। ফলে এই অঞ্চলেব অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা নির্ভর করে কৃষি ও মৎস্য শিকাবের উপর। এই জেলার শিক্ষার উন্নয়ন হোঁচট খাচ্ছে দারিদ্র্যতার কারণে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা। বিদ্যালযছুটের সঙ্গে সঙ্গে 'পুনরাবৃত্ত' বা Repetition-এর সংখ্যা কম নয়।

সংবিধানের সূচনা পর্ব ১৯৫০ সাল নাগাদ সংবিধানের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। সেখানে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া সমস্ত শিশুদের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে হবে। সংবিধানের নির্দেশকে মাথায় রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। District Primary Education Progiamme (DPEP). Paschimbanga Rajya Prarambhik Shikha Unnayan Sanstha (PBRPSU), বর্তমানে সর্বশিক্ষা অভিযান। এছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যালয স্থাপন, বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষকের ব্যবস্থা, পঠন পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবশ্যই যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। গ্রামীন

জনসংখ্যার ৯৪ শতাংশের জন্য ১ কিমির মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮৪ শতাংশের জন্য ১ কিমির মধ্যে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যালয় ছুটের পাশাপাশি 'পুনরাবৃত্ত' বা Repetition দেখা দিচ্ছে। ফলে দেশের অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পুনরাবৃত্ত' বা Repetition একটি সমস্যা রূপে দেখা দিচ্ছে। তার কয়েকটি চিত্র নিম্নোক্ত টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।[২]

South 24 Parganas Reptition Rate-1997-98

Class	Enrolement 1997	Enrolment 1998	Repeaters	Promotion Rate%	Dropout Rate %	Repetition Rate%
I	5466	5067	1250	68 97	8 16	22.87
II	3483	4354	584	81.69	1 (adjusted)	16.77
III	2844	3379	255	90.33	0.7	8.97
IV	NA	2824	-	-	-	-

1998-99

Class	Enrolement 1998	Enrolment 1999	Repeaters	Promotion Rate%	Dropout Rate %	Repetition Rate%
I	5067	4508	1128	70.24	7 5	22.26
II	4354	3850	291	80.89	12 43	6 68
III	3379	3763	241	77 31	15 56	7.13
IV	2824	2867	255	-	-	9.3

1999-2000

Class	Enrolement 1999	Enrolment 2000	Repeaters	Promotion Rate%	Dropout Rate %	Repetition Rate%
I	4508	-	780	76.31	6.39	17.30
II	3850	3624	184	89.58	5.64	4.78
III	3763	3689	240	87.22	6.41	6.38
IV	2867	3523	242	-	-	8.41

Repetition Rates (For 97-98, 98-99, 99-2000)

Class	1997-98	1998-99	1999-2000
I to II	22.87	22.26	17.30
II to III	16 77	6.68	4 78
II to IV	8 97	7 13	6 38

Report on Repeaters in district of South 24 Parganas-NIAS

2000-2001 SOUTH 24 PARGANAS

Class	GE 00-01	GE 01-02	RPts 01-02	Pro	Pro Rate%	Do Rate%	R pts%	
I	39525	288715	85888	172579	50 83%	23 87%	25 30%	
II	193014	189753	17174	154596	80 10%	11 01%	8 90%	
III	184334	169864	15268	145795	79·09%	12 62%	8 28%	Total-
IV	167490	158238	12443	0	0 00%	0·00%	7·43%	49·91%

Server D/old/Disc Spl Reports/2002/SRC/classwise GE DO and Rep 01.02 Phase-11 × Ls

2001-2002 SOUTH 24 PARGANAS

Class	GE 00-01	GE 01-02	RPts 01-02	Pro	Pro Rate%	Do Rate%	R pts%	
I	167111	142306	42104	86469	51·74	23 06	25·20	
II	95969	94922	8453	77531	80·79	10·40	8 81	
III	91416	84947	7416	73177	80·05	11·84	8·11	Total-
IV	83093	79189	6012	0	0 00	0 00	7 24	49·36%

পুনারাবৃত্তি বা Repetition এর কারণ নির্ণায়ক সমীক্ষাতে অধিকাংশ অভিভাবকের মতামত আর্থিক দুরাবস্থা জনিত কারণে পুনরাবৃত্তি সমস্যা প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকদের অসচেতনতা ও অজ্ঞতাই পুনারাবৃত্তের কারণ। বর্তমানে সরকার মিড ডে মিল চালু করার ফলে অভিভাবকরা তাদের অপরিনত অল্প বয়স্ক বাচ্চা কে জোর করে স্কুলে ভর্তি করান। ফলে শিশু-যেমন স্কুলে অনিয়মিত হয়ে যায়, তেমনি বছর শেষে প্রচুর পরিমাণে পুনারাবৃত্ত থেকে যায়। ফলে প্রথম শ্রেণীতে পুনারাবৃত্তের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া মাঠের কাজ, বাড়ীর কাজ, দর্জিরকাজ, কাঠের কাজ, নদীতে মিন বাগদা ধরা, পেশাগত কাজের জন্য স্কুলে অনিয়মিত উপস্থিতি ও পরবর্তীকালে পুনরাবৃত্ত থেকে যায়। স্কুলের পঠন-পাঠন সম্পর্কে প্রশ্নতুলে অভিভাবকদের পুনরায় বাচ্চাকে একই শ্রেণীতেরেখে দেওয়া, ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় স্কুলের পড়াশুনা

সঠিক না হওয়া, চতুর্থ শ্রেণী থেকে পাশ করে পঞ্চম শ্রেণীতে Admission Test পাশ না করা, পিতা-মাতার মৃত্যু জনিত কারণে, বাড়ী থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশী হওয়া, ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষক কম জনিত কারণে, শিক্ষকদের অবহেলাও অনিয়মিত উপস্থিতি, ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনায় হওয়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পিতা-মাতার অশিক্ষা ও অসচেতনতার জন্য পুনারাবৃত্ত বেড়ে চলেছে।

প্রধান শিক্ষক; সহশিক্ষক, VEC কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীতে আর্থিক ও পিতামাতার অশিক্ষাই হলো Repetition এর মূল কারণ। বিভিন্ন প্রতিকূল[৪] পরিস্থিতির মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ দিনতিপাত করে। তবে অপসংস্কৃতি, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, কমবয়সে বিবাহ, বাড়ীর কাজে সাহায্য, শিক্ষকদের বেশীর ভাগ সময় অশিক্ষার কাজে ব্যয় করা, ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সঠিক বুঝতে না পারা, সর্বপরি গ্রামীন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করতে না পারা ও প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে না পারার জন্য পুনারাবৃত্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই জেলার পুনারাবৃত্তদের মধ্যে বেশীর ভাগ মুসলিম ও তপশীল জাতিভুক্ত। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে মোট ৪৯·৩৬% পুনরাবৃত্তের মধে ৩৬·০৭% ছাত্রী।

সংবিধানের সূচনা লগ্ন থেকে শিশুশিক্ষার যে উন্নয়শীল প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে, তা বর্তমানে সফলতার শিখরে পৌঁছেদিতে হলে উন্নয়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলকেই (সরকারী দপ্তর, সংস্থা) জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের কথা ভাবতে হবে। জনসাধারণ কে আরো শিক্ষামুখী করে তোলার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সর্বপরি জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, বিদ্যালয় সমূহের জেলা পরিদর্শক, পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলির প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদানের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান হতে পারে।

সূত্র-নির্দেশ

১। শিক্ষা দর্পন, ২০০১ সেপ্টেম্বর সংখ্যা, পৃষ্ঠা নং ৪১.

২। Report on Repeaters in the Districts of South 24 Pargans. Netaji Institute of Asian Studies-2001-2002

৩। District Primany Education Programme Report-2001-2002

৪। পশ্চিমবঙ্গ—জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃষ্ঠা-৩০৬,
(এছাড়াও নিজের প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা)

সারাংশ

বাংলা ছোটগল্পের সংস্কৃত অনুবাদ

শমিতা সিংহ

সংস্কৃত থেকে বাংলায় উনিশ শতকে অনেক অনুবাদ হয়েছে যেমন মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা ইত্যাদি। অনুবাদের ফলে বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদের উল্লেখ করা যায়। সাহিত্যের ইতিহাসে আমি আরেক ধরনের অনুবাদের উল্লেখ করতে চাই যার ঐতিহাসিক সম্ভাবনা বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিহিত আছে। তার মধ্যে একটি হল বাংলা ছোটগল্পের সংস্কৃত অনুবাদ। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং বনফুল পর্যন্ত ছোট ছোট বাংলা গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সংস্কৃত সম্বন্ধে অবহিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আমার বক্তব্য হল এই যে সংস্কৃত ভাষাকে ন্যায়, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আরও বিস্তৃত করা যায় কিনা। বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে বাঙালী জীবনের টুকরো টুকরো অংশগুলি এখানে প্রতিভাত হয়েছে। সংস্কৃত অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালীর অতীত জীবনের কিছু কিছু অংশ আমি তুলে ধরতে চাই।

আমার বক্তব্য হল এই যে সংস্কৃত চর্চা একসময়ে বাংলাভাষী অঞ্চলে খুবই প্রচলিত ছিল। আধুনিক কালে সংস্কৃত চর্চার দুর্বলতা বাঙালীর সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। সংস্কৃত যদি অতীতে একটি প্রচলিত ভাষা হয়ে থাকে তবে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ সাধন করতে গিয়ে ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। নীচে দুটো বাংলা গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হল।

বনফুল রচিত — অদ্বিতীয়া

তারবার্তাং প্রাপ্য নভসঃ নিপতিতোহম্ ইতি অমনে বিনামেঘেন বজ্রাঘাতঃ ইব। সন্তানস্য জন্মনঃ অনন্তরম্ পত্নী উপরেমে। শ্বশুরালয়ে গমনম্ ন সম্ভবম্ যতঃ কার্যালয়তঃ অবকাশঃ নানুমোদিতঃ। মাসৌ দ্বৌ অতিক্রান্তৌ। জায়াভগিন্যায়াঃ উপদেশপূর্ণম্ পত্রম্ লব্ধম্ যৎ পুনর্বিবাহঃ হি মম কর্তব্য নোচেৎ সংসারঃ বিনষ্টঃ ভবিষ্যতি। সা অলিখৎ চ যৎ সাকাঙ্খিৎ বিবাহযোগ্যা-কন্যাম্ জানাতিস্ম। যদি ময়ি সম্মতে সা বিবাহস্থিরং করিষ্যতি। প্রত্যুত্তরেণ অলিখম্ যৎ পুনর্বিবাহ নেচ্ছামি। যৎ সদা পত্নি-প্রভাম্ স্মরামি।

পরন্তু সংসারস্য প্রয়োজনার্থং তে পরামর্শেন সম্মতঃ অহম্। বিবাহকালঃ আগতঃ। শুভদৃষ্টিকালে কন্যাননম্ ন দৃষ্টম্ যতঃ ব্রীড়াবনতা সা। বরবধূ শয়নকক্ষে নাটকস্য যমনিকা পতনম্। কক্ষং প্রবেশমাত্রং দৃষ্টম্ যৎ প্রভা সসন্তানা উপবিষ্টা। মাম দৃষ্টবা তৎক্ষণাৎ তয়োক্তম্ ধিক্ ত্বাম্ গুম্ফ অপি ন দৃশ্যতে। শিশোঃ জন্মনঃ কালে ময়া অতীব কষ্টম্ অনুভূতম্। তর্হি ভগিনীম্ অবদম্ যৎ মম মৃত্যুঃ তস্য অতীব ক্লেশস্য কারণং ভবেৎ। ভগিন্যা উক্তম্ কিমপি ন ভবিষ্যতি। সঃ অবশ্যম্ পুনঃ উপযমিষ্যতে। শতং পণঃ। শান্তায়ৈ দেয়ঃ। অধুনা কেবলম্ গুম্ফ প্রোরোহঃ কামনীয়ঃ।

সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা কাহিনী - দেয়ং প্রাপ্যং চ

পঞ্চপুত্রাণাম্ জন্মনঃ অনন্তরম্ কন্যা অজায়ত। ততঃ আহ্লাদেন পিতৃভ্যাম্ সা নিরুপমেতিনামধেয়াকিতা। বর্ষকতিপয়ানন্তরম্ পিতা নিরুপমায়াঃ বিবাহার্থম্ যোগ্যপাত্রম্ অন্বিষতিস্ম। কোঽপি তস্য ন মনঃপূতঃ। অন্তে পিত্রা রামসুন্দরমিত্রেণ কস্যচিৎ রায়বাহাদুর-উপাধিধারিনঃ পুত্রেণ সহ কন্যা বিবাহঃ স্থিরিকৃতঃ। যদ্যপি রায়বাহাদুর-উপাধিধারিণঃ বিষয়ঃ তদা হ্রাসপ্রাপ্তঃ তথাপি সম্ভ্রান্ত কুলম্ অবশ্যম্। বিবাহে পণঃ দশসহস্রংমুদ্রা অপি চ বহুলা দানসামগ্রী দেয়া। পরন্তু রামসুন্দরেণ সম্মতঃ। বিবাহদিবসঃ আগতঃ। বহুপ্রয়াসেন অপি রামসুন্দরঃ দেয়স্য সংগ্রহেণ ন সমর্থঃ। বিবাহদিবসে সায়ংকালে পিতা বিবাহসভায়াঃ পুত্রম্ নয়নায় উদ্যতঃ। কিন্তু পুত্রঃ অসম্মতঃ। তেনোক্তম্ বিবাহার্থম্ আগাচ্ছামি বিবাহকার্যম সমাপ্য গচ্ছামি। অতঃ নিরুপমায়াঃ বিবাহঃ অনুষ্ঠিতঃ। পরন্তু শ্বশুরালয়ে তয়া পুত্রবধ্বা সম্মানঃ ন লব্ধঃ। কেবলম্ পিতৃগৃহস্য নিন্দা শ্রূয়তে। যদি কোঽপি তস্যাঃ সৌন্দর্যম্ প্রশংসতিস্ম বধূম্ বিদ্রবেণ শ্বশ্রূঃতাম্ নিবারয়ৎ। শ্বশ্রূঃ প্রায়ঃ অবদৎ যদি পিতা পূর্ণ-মূল্যম্ দদ্যাৎ কন্যা পূণ-সম্মানম্ প্রাপ্নুয়াৎ। নিরুপমায়াঃ পতিরপি কর্মস্থলে। নাসীৎ তত্র কোঽপি তস্যাঃ করুণ কাহিনীম্ শ্রবণার্থম্। রামসুন্দর প্রায়েণ কন্যদর্শনার্থং তস্যাঃ শ্বশুরালয়ে গচ্ছতিস্ম। তত্র অসম্মানিতঃ সঃ কিংচ ভৃত্যাঃ তম্ অবজানন্তিস্ম। রামসুন্দরঃ বাসগৃহং বিক্রীয় দেয়ম্ অর্থম লব্ধবান্। নিরুপমায়াঃ শ্বশুরায় অর্থম্ দত্ত্বা কন্যাম্ পিত্রালয়ে নয়নায় আগতঃ। পরন্তু কন্যয়া নিবারিতঃ সঃ। তয়োক্তম্ যদি অর্থঃ ত্বয়া প্রদত্তঃ তর্হি মে অপমানঃ। রামসুন্দরঃ প্রস্থিতঃ। ভৃত্যমুখেন ইদম্ শ্রুত্বা শ্বশ্রূঃ অতীব ক্রুদ্ধা ভূতা। শ্বশুরগেহম্ শরশয্যা ইব মন্যতো তদনন্তরম্ সা অতীব পীড়িতা ভূতা। রোগপ্রতিকারস্য কাপি প্রচেষ্টা শ্বশুরালয়ে ন গৃহীতা। কিংচ তস্মিন্ সময়ে অপি উপহাসেন বিদ্ধা সা। ততঃ সা অম্রিয়ত। আড়ম্বরেণ তস্যাঃ দাহঃ সম্পন্নঃ। শ্রাদ্ধকর্ম চ অনুষ্ঠিতম্। নূনম্ সম্ভ্রান্তগৃহস্য পুত্রবধূঃ। সম্মানঃ রক্ষিতব্য অথ ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারি - পুত্রঃ গৃহে পত্রম্ অলিখৎ অত্র বাসস্য উপযোগি আয়োজনম্ ময়া গৃহীতম্, স্ত্রীম্ প্রেড়য়তু। মাত্রা লিখিতম্ বৎস তুভ্যম্ অপরা কস্যাশ্চিৎ কন্যায়াঃ

বিবাহসম্বন্ধঃ স্বীরিকৃতঃ ততঃ শীঘ্রম্ আগচ্ছ। অস্মিন্ বিবাহে পণঃ বিংশসহস্রংমুদ্রা। অপিচ তৎধনম্ তৎক্ষণাৎ এব প্রাপ্তব্যম্।

দেনাপাওনার মধ্যে দেখা যায় যে শিক্ষিত সমাজেও পণপ্রথার করুণ পরিণতি কি রকম হতে পারত।

অদ্বিতীয়ার মধ্যে শ্যালিকা ও ভগ্নীপতির পরিহাসের সম্পর্কের ছবি ফুটে উঠেছে।

এই গল্পগুলির সংস্কৃত অনুবাদ এই জন্য করা হল যে ইংরেজি ভাষা ছাড়াও ভারতবর্ষে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশে সংস্কৃত এখনও প্রচলিত আছে। ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও সংস্কৃত অনুবাদের মাধ্যমে এই শিক্ষিত সমাজের সামনে বাংলা গল্পের সামাজিক চিত্র তুলে ধরা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস (১৯২৯) ও সমকালীন সামন্ত-পুঁজিবাদী সমাজ-সম্পর্ক — একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

অসিত দত্ত

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস সামন্ত-পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কের একটি সামাজিক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক রূপরেখার সমৃদ্ধি আছে, কিংবা বলা যায় যে, সমকালীন সমাজ জীবনের সামগ্রিক শিল্পঋদ্ধ ইতিহাসের নির্মিতি আছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জমিদারতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রূপ প্রকট করেছেন। আবার পুঁজিতন্ত্রের ভোগসর্বস্বতা একদিকে, অন্যদিকে তৎপ্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, স্বাজাত্য, স্বাধীনতা, নারীর ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করেছেন।

ভারতবর্ষের সনাতন জীবনবোধ, ধ্যান ধারণা ও আদর্শের দাবি আছে। তার ক্ষয়িষ্ণুতা আছে, অন্যদিকে বলিষ্ঠ জীবনবোধের মূর্ততা আছে। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত উপাদান দিয়ে উপন্যাসের নির্মাণের আলোকদীপ্ত রূপ দিয়েছেন। নিছক কথাকাহিনীর বিস্তৃতি নয়। একটি ইতিহাস ও শিল্পসন্নিদ্ধিসহ জীবনের মহাকাব্য এ উপন্যাস। জীবনের অগণিত জটিলতা, ক্ষয়িষ্ণুতা একদিক, অন্যদিকে জীবনের জয়যাত্রা। নতুন অভিমুখিনতা, রেনেসাঁস দীপ্ত জীবনাদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে।

এককথায় বলা যায় 'যোগাযোগ উপন্যাস সমকালীন জীবনের সমগ্রতার দর্পন হিসেবে চিহ্নিত। একটি সমাজ জীবনের সামগ্রিক রূপ এ উপন্যাসে বিবৃত আছে। রবীন্দ্রনাথ দুই সমাজ সম্পর্কের দ্বন্দ্বময় অস্তিত্বের ছবি এ উপন্যাসে এঁকেছেন। বৃত্তের মহিমা নয়, বৃত্তহীন জীবনের সমৃদ্ধিই আছে এ উপন্যাসে। বিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের সার্থক রূপদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে।

দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে : উনিশ শতকে ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের বেশভূষা

ঊর্মিতা রায়

উনিশ শতককে বাংলায় সংস্কার আন্দোলনের যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। ঔপনবেশিক শাসক শ্রেণী এবং বিত্তশালী, শিক্ষিত বাঙালী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এই সময়ে এক যোগে সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার দ্রুত প্রসার, সমাজে নতুন এক শ্রেণীর জন্ম, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, সব কিছু মিলিয়ে সামাজিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। এর ফলে অতীতের সাথে বর্তমানের এক প্রগাঢ় ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং জন্ম নেয় এক ধরনের সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্কট। ধর্ম, সংস্কৃতি, পারিবারিক সম্পর্ক এমন কি সমাজে স্ত্রী - পুরুষ সম্পর্ক ও যৌনতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে এবং এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা ও নানা আলোচনা পত্র পত্রিকার পাতায় বিতর্কের ঝড় তোলে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব আলোচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে মতাদর্শগত অভিন্নতা নয় মতভেদই এদের মধ্যে প্রধান, এবং এর ফলে সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সময়কার এই সব সংস্কার প্রচেষ্টা, আলোচনা তর্ক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী সংক্রান্ত বিষয়টি। সমাজ সংস্কারকদের মতে বাংলায় সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ ছিল সমাজে এবং পরিবারে নারীর আস্থার অবনতি। তাই এদের সংস্কার প্রচেষ্টায় এবং মতাদর্শগত বিচার বিশ্লেষণে ঘুরে ফিলে এসেছে নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলি। তবে এক্ষেত্রে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সব সংস্কার প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর অবস্থার উন্নতি ও মেয়েদের দুঃখ মোচন করা নয় সামগ্রিক ভাবে বাঙালী সমাজের উন্নতি। যেহেতু এই সব বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবিরা মনে করতেন যে সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ হল নারীর দুরবস্থা, তাই তাঁরা নারী জাতির মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন দাম্পত্য সম্পর্কের পরিবর্তন ও পরিবারে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই বাঙালি সমাজের উন্নতি সম্ভব। তাঁরা মনে করতেন নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথেই, শিক্ষায় রুচিশীলতায়, পরিশীলনে নারীকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সংস্কার প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটটি ছিল ঔপনিবেশিক। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, 'আধুনিক', পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজেদের শ্রেণীর নারী সমাজকে সভ্য করে তোলা। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে নাটক, উপন্যাস, কবিতা, প্রহসন প্রভৃতি অসংখ্য লেখার বিষয়বস্তু ছিল দাম্পত্য সম্পর্ক, স্ত্রীশিক্ষা, মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য জীবন প্রভৃতি। কিন্তু এই সব সংস্কার প্রচেষ্টা বা নারী জাতিকে তথাকথিত 'সভ্য' করে তোলার চেষ্টা কিন্তু সব সময়েই ঔপনিবেশিকতা বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পন বলে মনে করা উচিত নয়। সভ্যতা বলতে কি বোঝায় এই নিয়ে নানা বিতর্ক চলছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে একে বিচার করার নানা প্রয়াস দেখা গেছে। পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা মূল্যবোধ অনুকরণ করাকে সমালোচনাও করা হয়েছে। কিন্তু এই সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার সামগ্রিক আধারটি ছিল ঔপনিবেশিক। এই ধরনের প্রয়াস প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে।[১]

এই ভাবে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় এবং পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, শিক্ষিত বাঙালী, বুদ্ধিজীবী, পুরুষ সম্প্রদায় ব্রতী হন তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর নারী জাতিকে নূতন শিক্ষায়, ভাবধারায়, পরিশীলনে পরিমার্জিত করে এক নতুন নারী নির্মাণের কাজে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী মধ্যবিত্ত পুরুষ সমাজের মনে যে আদর্শ নারীর চিত্রটি ছিল তারই রূপদানে তারা সচেষ্ট হয়েছিল। এই নারী সাংসারিক কর্তব্য, নিষ্ঠায়, পুরুষের চিত্ত বিনোদনে, পরিশীলনে, সর্বতোভাবে পারদর্শী এক নারী, যার নাম দেওয়া হল 'ভদ্র মহিলা'।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা নারী জীবনের কোন ক্ষেত্রকেই তার দৃষ্টির বাইরে রাখেনি। তাঁর শিক্ষা, নৈতিক উন্নতি, গার্হস্থ জীবন, সাংসারিক কর্তব্য, সন্তান পালন, দাম্পত্য জীবন, যৌনতা, এমনকি তার ব্যক্তিত্ব ও বেশভূষা সব কিছু ছিল তাদের নির্মাণ কার্যের পরিধির মধ্যে। এই নতুন নারী নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মেয়েদের বেশভূষা। ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের পুরোভাগে। উনিশ শতকে বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে নারী উন্মেষণের যে অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল, তাতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশী। কাজেই ঠাকুর পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছেও বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল এই নির্মাণ কাজ। অর্থাৎ নতুন মূল্যবোধ, নতুন রূপ ও নতুন শিল্পবোধ নিয়ে এক নতুন নারী নির্মাণ। এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পরিবারের মহিলাদের বেশভূষা। ঔপনিবেশিক বাংলায় ভদ্রমহিলার পোষাক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হিমানী ব্যানার্জী বলেছেন যে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরুষ সমাজ সংস্কারকদের তাঁদের নিজেদের সমাজের নারীর জন্য একটি নতুন পোষাক

তৈরির পিছনে নিহিত কারণটি ছিল তাদের শ্রেণী / সমাজের সংস্কৃতি এবং নৈতিকতাকে ব্যক্ত করা এবং একই সাথে তা নির্মাণ করা।[২] ঠাকুর পরিবারের ক্ষেত্রেও এ কথাটি প্রযোজ্য। এই প্রবন্ধটিতে ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের বেশভূষার পরিবর্তন এবং এর পিছনে নিহিত তাত্ত্বিক অবস্থানটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে ঠাকুর পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পরিবারের মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সৌদামিনী দেবীর স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় "মেয়েদের কেবল লেখাপড়া শেখানো নয় তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাটো বিষয়ে পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল"। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন ঃ—

> *কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোট বোনদের চুল বাঁধার ভার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দমত না হইলে পুনর্বার খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইত।*[৩]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের জন্য একটি নতুন পরিচ্ছদ তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর মেয়েদের পোষাক সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে শালীনতার প্রশ্নটি। পরিবারের মেয়েদের পোষাকে পবিবর্তন আনা দরকার বা তাদের জন্য একটি নূতন পরিচ্ছদের প্রয়োজন এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে ভাবছেন যখন প্রথম ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরে কোন অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশ ঘটছে। ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরে কোন অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশ মানে 'অবরোধ' প্রথার অবসান। তৎকালীন সংস্কার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল অবরোধ প্রথার অবসান ঘটান। ঠাকুর পরিবারে এটি সংঘটিত হয় ধাপে ধাপে। এর প্রথম সোপান হিসাবে কেশবচন্দ্র সেন কিছুদিন সপরিবারে ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সোপান হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। মেয়েদের শিক্ষা ঠিক মতো এগোচ্ছে না দেখে তিনি তাদের পড়াবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে গৃহশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন। সেই প্রথম একজন 'অনাত্মীয় পুরুষ' ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এই ঘটনার কালক্রম স্বর্ণকুমারী দেবীর মতে ১৮৬১ বা তার সামান্য কিছু পরে। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী বাড়ির ছোট ছোট মেয়ে এবং বউদের স্কুল পাঠ্য বইগুলি পড়াতেন। এই উপলক্ষে অন্তঃপুরের মেয়েদের পরিচ্ছদ সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "মহিলার সাধারণ প্রচলিত একখানি মাত্র শাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের জন্য একটি "ভদ্রজনোচিত" পোষাক তৈরীর ব্যাপারে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেছেন ও বাড়িতে দর্জি রেখে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন ঃ

> বাঙালী মেয়ের বেশের প্রতি অনেক দিন অবধিই পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল, মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশু কন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ক্রটি করেন নাই। আমাদের বাড়িতে সেকালে ঘরের খুব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতা মহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাশ করিয়াছেন, দর্জি প্রতিদিন তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও।[৪]

এই সময়ে সংস্কারকদের মধ্যে নারীর অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে তার বেশভূষার একটি সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নারীর বেশভূষাকে তার নৈতিকতার ও তার সামাজিক রোল এর প্রতিফলন হিসাবে তুলে ধরা হয় এবং নারীর বেশভূষা সেই সমাজের কৃষ্টির পরিচায়ক হিসাবে ভাবা হতে থাকে। সৌদামিনী দেবী লিখেছেন যে তাঁদেব মা সারদা দেবী একবার তাঁর ছোট দুই বোনের নাক বিঁধিয়ে দিয়ে বাড়ির কর্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তা দেখিয়ে নোলক চেয়ে আনতে বলেন। তিনি নাক বেঁধান দেখেই বলে উঠলেন "একি সং সাজিয়াছ। যাও যাও খুলিয়া ফেল। বন্য বর্বররাইতো নাক কান ফুঁড়িয়া গহনা পরে -- একি ভদ্র সমাজের যোগ্য"।[৫] এই ভাবে নারীর বেশভূষাকে সমাজের প্রগতির চিহ্ন স্বরূপ মনে করা হতে থাকে। সমাজে নারীর বেশভূষাকে ঐ সমাজের বর্ববতা থেকে সভ্যতার পথে অগ্রগতির নির্ণায়ক হিসাবে তুলে ধরা হয়। দেবেন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই বোঝা যায় এই সময়ে ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের বেশভূষার আর একটি লক্ষণীয় দিক হল শুভ্র নিরাভরণ সজ্জার প্রতি আগ্রহ। এর কারণ কিছুটা ভিক্টোরিয়ান প্রভাব কিছুটা পোষাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন নৈতিকতা। যার একটি দিক হল নারী যৌনতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা। শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ভিক্টোরিয়ান প্রভাব ছিল খুব বেশী। ঠাকুর পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়।

এতদিন পর্যন্ত নারীর পরিচ্ছদ কি হবে তার নান্দনিক, নৈতিক সব ব্যাপারেই পুরুষের আধিপত্য ছিল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে দেখা গেল পরিবারের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত মহিলারাও পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শ সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে এ কাজে এগিয়ে এলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব নারীর পরিচ্ছদ সম্পর্কে ভাবনা

চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সার্থক রূপ পেল তাঁর পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাতে। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন ঃ

> কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই পোষাক ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেজ বধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁর ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিল।[৬]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের মেজ বৌ। বলা হয়ে থাকে তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলার স্ত্রী - স্বাধীনতার পথিকৃৎ। ইংল্যান্ডে বসবাস কালে তিনি সেখানকার সমাজে নারীদের দেখে মুগ্ধ হন এবং 'স্ত্রী - স্বাধীনতার' প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন। কিন্তু স্ত্রী - স্বাধীনতা বলতে তিনি ঠিক কি বুঝেছেন? মনে হয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে তাঁর মনে যে ধারণাটি ছিল তা হল অবরোধ প্রথা বা পর্দা প্রথার অবসান, অর্থাৎ মহিলাদের বাড়ির অন্তঃপুরের বাইরে পা রাখার অধিকার। এছাড়া রয়েছে কিছুটা শিক্ষিত হয়ে ওঠা, বাল্য বিবাহ প্রথার অবসান, নিজের মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করার স্বাধীনতা প্রভৃতি। এর মধ্যে তাঁর মতে সব থেকে যেটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল অবরোধ প্রথার অবসান। সতেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে মেয়েরা "জীবন উদ্যানের পুষ্প" তাদের "আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত করে ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মারলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা?"[৭] স্ত্রী - স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নারীকে নতুন করে গড়ে নিতে। তাঁর মনেও ছিল উনিশ শতকের 'ভদ্র মহিলার' ছবিটি। তাঁর নির্মাণ কার্য তাই তিনি শুরু করলেন বালিকা বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে দিয়েই। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন "তাঁকে (জ্ঞানদানন্দিনীকে) যে কত করে গড়ে পিটে নিতে হয়েছে তা আর কি করে বলব" জ্ঞানদানন্দিনীর বাবা গৌরী দান করেছিলেন সাত বছরের মেয়েকে। যশোর নরেন্দ্রপুরের গ্রাম্য জীবনে শৈশব কাটিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করার পর থেকেই তাঁকে গড়ে পিটে নেবার পর্ব শুরু হয়। বিয়ের কিছু পরেই সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত চলে যান। জ্ঞানদানন্দিনীর পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয় সেজো দেবর হেমেন্দ্রনাথের কাছে। বিলেত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। দূরে থেকেও তাঁর স্ত্রীকে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এই প্রসঙ্গে যখনই তিনি স্ত্রীর অন্তঃপুরের বাইরে যাবার

কথা ভেবেছেন তখনই পোষাক সংস্কারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন "তোমার যদি কাপড় পরিবর্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না। সত্য বলিতে কি, আমাদের স্ত্রী লোকেরা যেরূপ কাপড় পরে তাহা না পরিলেও হয়। তাহা পরিয়া কোন ভদ্র সমাজে যাওয়া হইতে পারে না।[৮] এই ভাবে দেখা যাচ্ছে নারীর পোষাক সংস্কারের প্রয়োজন তখনি অনুভূত হচ্ছে যখন তার অন্দর মহলের বাইরে যাবার কথা উঠছে বা কোন পুরুষের অন্তঃপুরে প্রবেশের কথা ভাবা হচ্ছে। অর্থাৎ নারীর পোষাক নির্ধারিত হচ্ছে অনাত্মীয় পুরুষের উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং নারীর পোষাকের উপর সভ্যতা/ভদ্রতা এই ধরনের নৈতিক/সামাজিক মূল্যবোধের আরোপ করা হচ্ছে। জ্ঞানদানন্দনী দেবীর প্রথম অন্তঃপুরের বাইরে পা রাখার প্রসঙ্গটি স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিজের স্মৃতি কথাতেও বর্ণিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ সালে বিলেত থেকে দেশে ফেরেন। তাঁর কর্মস্থল ঠিক হোল মহারাষ্ট্র। সে যুগের নিয়ম ছিল ছেলেরা চাকরি করতে বাইরে যেত, ছেলের বউ থাকত শ্বশুর বাড়িতে। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। আপত্তি উঠলেও শেষ অবধি দেবেন্দ্রনাথ অনুমতি দিয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীর কর্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন ঃ

> তখন অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনও মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে হইলে ঘেরাটোপে মোড়া পালকির সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গা স্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পালকি শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজ দাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্র পার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ি চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই লজ্জা জনক যে বাড়ি শুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন অগত্যা পালকি করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। .... (কিন্তু) দুই বৎসর পরে মেজ দাদা যখন সস্ত্রীক বাড়ি ফিরিলেন তখন আর কেহ বধূকে পালকি করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বউকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাব অতীত।[৯]

এই সময়ে সমগ্র বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজে নারীব উপস্থিতির ও বিচরণের সামাজিক প্রেক্ষাপট পাল্টে যাচ্ছিল। যতটা না বাস্তব পরিস্থিতিতে তার থেকে বেশী তত্ত্বগত ভাবে। এতদিন পর্যন্ত বৃহৎ যৌথ পরিবারগুলিতে নারী ও পুরুষ অন্তঃপুর ও বাহির

বিশ্ব এই দুই ক্ষেত্রে বিন্যস্ত ছিল। তাদের শ্রমদানের ক্ষেত্র ছিল পৃথক। নারীর অন্তঃপুরে ও পুরুষের বাইরে। বৃহৎ যৌথ পরিবার নতুন ভাবে বিন্যস্ত হল, অন্তত তত্ত্বগতভাবে। অন্তঃপুরেব জায়গা নিল গৃহ যাতে নারী ও পুরুষ উভয়েই স্থান পেল। সাথে সাথে নারীর আবির্ভাব ঘটল বহির্বিশ্বে। একেই বলা হচ্ছে অবরোধ প্রথার অবসান এবং একেই স্ত্রী স্বাধীনতা হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এটি ছিল তৎকালীন সামাজিক সংস্কারের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এবং একেই সমাজের অগ্রগতির সূচক হিসাবে বর্ণনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথের মত ঠাকুর পরিবারের সমাজ সংস্কারকরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র প্রক্রিয়াটির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

আমার মনে পড়ে প্রথম যখন মেয়েরা গাড়ি করে বেড়াতে আরম্ভ করেন-গাড়ির দরজা খুলতে আমি কিছুতেই দিতেম না — ক্রমশ একটু একটু খুলে দিতে আরম্ভ করলেম — সিকি খানা — আধখানা ক্রমে ষোলোআনা। তখন বাহিরের কোন পুরুষ মেয়েদের দেখলে আমার যেন মাথা কাটা যেত, প্রথমে দরজা বন্ধ ঢাকা গাড়ি, পরে দরজা খোলা ঢাকা গাড়ি, পরে টপ খোলা ফিটেন গাড়ি — ক্রমে একেবারে খোলা ফিটেন গাড়ি ধরা গেল।[১০]

কিন্তু অবরোধ প্রথার অবসান বা পরিবারের মহিলাদের অন্তঃপুরের বাইরে পা রাখার একটি প্রাথমিক শর্ত ছিল "সুসভ্য পরিচ্ছদ"। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন "বাহিরে যাইতে হইলে (নারীর পক্ষে) রীতিমত ভদ্রবেশ পরিয়া যাওয়া আবশ্যক"।[১১] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন প্রথম অন্তঃপুরের বাইরে গেলেন তখন তাঁর পরিচ্ছদ কি হবে তাই নিয়ে এক বিপর্যয় উপস্থিত হল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন "তখন সে সময় আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে তো বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি কোনো ফরাসি দোকানে ফরমাস দিয়ে একটি কি পোষাক আমার জন্য করালেন বোধ হয় তাদের মতে ওরিয়েন্টাল যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে উঁব পরিয়ে দিতে হত, আমি পরতুম না"। স্বভাবতঃ এই পোষাক ছিল তাঁর পক্ষে খুবই অসুবিধা জনক ও অস্বস্তিকর। এই হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচাব জন্যই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজেই এক অন্য পরিচ্ছদের কথা ভাবলেন যাতে স্বাচ্ছন্দ বেশী। সাথে সাথে ছিল জাতীয় পোষাকের অন্বেষণ যা ঠাকুর পরিবারের মতাদর্শের সঙ্গে অনেক বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বেতে গিয়ে উঠেছিলেন এক পারশি পরিবারে। ক্রমে তিনি সেই অদ্ভুত পোষাক ছেড়ে পারশি কায়দায় শাড়ি পরতে শুরু করেন। শুধু ডান কাঁধের পরিবর্তে আঁচল দিতেন বাঁ কাঁধে। এর সাথে থাকত সায়া, শেমিজ ও পাতলা পিরাণ। এই সবগুলি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পারশি রীতি থেকে গ্রহণ করেন। তাঁর শাড়ি পরার ধরনটির নাম হল বোম্বাই দস্তুর। এটি সত্যেন্দ্রনাথের প্রশংসাও অর্জন করে। তিনি ১৮৬৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছেন, ... My wife

has adopted the Parsee costume, It is our saree, but I like their mode of putting it on. It looks decent and pretty. কলকাতায় এসে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিজ্ঞাপন দিলেন নতুন ধরনের শাড়ি পরা শিখাবেন বলে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে এই রীতি খুব জনপ্রিয় হল। এই ধরনটির নতুন নাম হয় ব্রাহ্মিকা শাড়ি। এই রীতিতে পরা শাড়ির সাথে ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢাকা দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ মনে করতেন ঘোমটার পরিবর্তে আবরন আবশ্যক। তাই তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে headdress তৈরী করতে বলেন। শাড়ির আঁচল মাথায় দিয়ে ঘোমটা দেবার প্রবর্তন করেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরা দেবী। তার আগে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা টুপি পরতেন। সুষমা দেবী টুপি পরে আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। শাড়ির সাথে জুতো মোজাও পরা হত। এই নতুন রীতিতে শাড়ি পরার ক্ষেত্রে দেহ সম্পূর্ণভাবে আবৃত রাখার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১২]

এই বৈশিষ্ট্যটি থাকার কারণে এই রীতিতে পরা শাড়ি ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের একমাত্র পোষাক হয়ে ওঠে। এবং ক্রমে এটি হয় বাঙালী ভদ্রমহিলার একমাত্র পোষাক। স্বর্ণকুমারী দেবী এই নতুন পোষাক সম্পর্কে বলেছেন "দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্বাঙ্গীন সম্মিলন"। এই শব্দগুলি থেকেই বোঝা যায় যে পোষাকের সাথে একধরনের নৈতিক মূল্যবোধ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছুটা পরে লেখা হলেও (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার লাবণ্যর বর্ণনা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতিতে নারীর আদর্শ বেশভূষা যা হওয়া উচিত লাবণ্য তারই প্রতিমূর্তি ঃ

> মেয়েটির পরনে সরু পাড় দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মত রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জী পর্যন্ত, দু হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধন-হীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কট্‌কি-কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।[১৩]

এখানে যে নারীর যৌনতাহীন, পরিপূর্ণভাবে আবৃত, শুচি, শুভ্র রূপটি ফুটে উঠেছে সেটি সম্ভবত ঠাকুর পরিবারের আদর্শ নারীমূর্তি এবং উনবিংশ শতকের আদর্শ ভদ্রমহিলার ছবি। নারীর পোষাক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য (১৮৯৮ সালে করা) উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন "বাঙালী স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং সর্বদাই অসম্বৃত - তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে, এই জন্য ভাশুর শ্বশুর-সম্পর্কীয় গৃহ প্রচলিত যে সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমানে আছে, কিন্তু সাধারণ

ভদ্র সমাজ সঙ্গত লজ্জা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্য দেখা যায়''।[১৪] নারী দেহ আবৃত রাখার ক্ষেত্রে এই যে বাড়াবাড়ি এর পেছনে কারণ হিসাবে মনে হয় কাজ করেছে নারীর যৌনতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতনতা। নারী যৌনতা সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি কাজ করেছে। নারী যৌনতাকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে পোষাকের মধ্যে দিয়ে এবং পোষাকের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক নৈতিকতা দিয়ে। হিমানী ব্যানার্জী এই সময়কার নারীর পোষাক সংক্রান্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন যে লজ্জা (যা ভদ্র মহিলার বৈশিষ্ট্য), শালীনতা প্রভৃতি মূল্যবোধ (যা পোষাকের সঙ্গে যুক্ত) দিয়ে নারী যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে নারীর প্রকাশ্যে, পুরুষের জগতে প্রবেশ করার ফলে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একধরনের সঙ্কট উপস্থিত হয়। রক্ষণশীল সনাতনপন্থীদের লেখায় এর চেহারা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু উদারপন্থী সংস্কারকরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁরা মহিলাদের অন্তঃপুরের বাইরে, প্রকাশ্যে বিচরণের ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচারক হলেও তাঁরাও ছিলেন একই উৎকণ্ঠার শিকার। সমাজে নারী পুরুষে যে ধরনের শ্রমবন্টন ছিল তা বিপর্যস্ত হতে পারে বা নারী সত্যিকারের স্বাধিকারের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে এই উৎকণ্ঠা থেকে তাঁরাও অব্যাহতি পাননি। তাঁরা নারীর নতুন পোষাক, যার মূল উদ্দেশ্য শরীরকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করা ও পোষাকের সাথে সংযুক্ত নতুন নৈতিকতা / মতাদর্শ তৈরী করে এক ধরনের নতুন সামাজিক অনুশাসন নারীর উপর কায়েম করেন। এই সামাজিক অনুশাসনের উদ্দেশ্য ছিল নতুন পরিস্থিতিতেও নারীর উপর পুরান পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা। তাই হিমানী ব্যানার্জী বলেছেন .. .. The emergence was also a continuation of the enclosure, a continuation of control of woman's bodies, labour and sexuality into the new phase of colonial middle class formation.[১১]

নারীর অন্তঃপুরের বাইরে পা রাখার ফলে যে সমাজে একধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি রচনায় যাতে তিনি অনামী একজন লেখকের লেখা থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

...''কেবল লেখা পড়া শিখিলেই তো চলিবেনা, ইহার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আমাদের শিখিবার আছে। ... আজকাল স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী অনেকে মহিলাদিগের প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইতে চান, অনেকে বা ইচ্ছা না থাকিলেও দায়ে পড়িয়া স্ত্রীকে বাহিরে আনেন — অথচ ইহার আগে যে সোপান দিয়া উঠিতে হইবে — এই জন্য স্ত্রীদের যে রূপ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক তা হয়তো অনেক স্থলে হইয়া উঠেনা। ইহাতে দাঁড়ায় এই, সমাজে একটি দারুন বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় .. আজকাল প্রায়

দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেলগাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এইরূপ উদাহরণ আরো বাড়িতে থাকিবে। ইহার নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায় ... সমাজের পরিবর্তনের প্রবল প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবেই তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ী প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে যাত্রা করেন অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জা রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে — রীতি মত ভদ্র বেশ পরিতে হইবে"।[১৬]

মনে হয় মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে পা রাখার সাথে সাথে ঠাকুর পরিবারেও জন্ম নেয় এক পুরুষ সুলভ উৎকণ্ঠা। ঠাকুর পরিবারে নারী সংক্রান্ত সংস্কার প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক মনস্ক পুরুষের সমধর্মী এক নারী গড়ে তোলা। কিন্তু সনাতনপন্থী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সংস্কারপন্থী, স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথ এমনকি রবীন্দ্রনাথ সকলেই সমাজে নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। নারীর শ্রমদানের ক্ষেত্র গৃহ এবং পুরুষের বহির্বিশ্ব এই ছিল তাদের বিশ্বাস। এর অন্যথা হলে সামাজিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। তাঁদের এই উৎকণ্ঠারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় নারীর জন্য নতুন এক বেশভূষা তৈরী করার প্রয়াসে যার মূল উদ্দেশ্য নারীদেহ আবৃত রাখা ও তার যৌনতাকে দমন করে রাখা। পোষাকের সাথে সংশ্লিষ্ট এক নতুন মূল্যবোধ/নৈতিকতা/ভাবাদর্শ নির্মাণ করা হয় যার উদ্দেশ্য নারীর শরীর, শ্রম ও যৌনতার উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য হল ঠাকুর পরিবারের বিদগ্ধ বাতাবরণে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা, অন্তঃপুরের বাইরে বেরিয়ে তাঁদের সামাজিক মেলামেশার পথ সুগম করে তোলা, প্রভৃতির ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক মনস্ক পুরুষের সমধর্মী এক নারী তৈরী করা, স্বাধীন নারী সত্তার বিকাশ ঘটান নয়। তাই মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে পা রাখার সাথে সাথে জন্ম নিয়েছিল যে পুরুষ সুলভ উৎকণ্ঠা তাও অস্বীকার করা যায় না। এই উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে মেয়েদের বেশভূষার সঙ্গে শালীনতার প্রশ্ন তুলে এক নৈতিক মূল্যবোধ আরোপ করার মধ্যে। এই মূল্যবোধ সম্যক রূপে আত্মস্থ

করেছিলেন ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা। তাই উনিশ শতকে তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল দেহকে পুরোপুরি আবৃত করা, শুভ্র, নিরাভরণ এক সজ্জারীতি।

সূত্র-নির্দেশ

১। S.C. Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, কলকাতা, ১৯৭৩, V.C.Joshi (ed.), *Rammohan Ray and the proces of Moderization in India*, দিল্লী, ১৯৭৫ 1975 S. Sarkar, *A Critique of Colonial India*, কলিকাতা, ১৯৮৫, M. Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905*, প্রিন্সটন, ১৯৮৪।

২। Himani Bannerjee, "Attired in Virtue The Discourse on Shame (Lajja) and Clothing of Bhadramahila in Colonial Bengal" in Bharati Ray (ed.) *From the Seams of History*.

৩। সৌদামিনী দেবী, *পিতৃস্মৃতি*।

৪। স্বর্ণকুমারী দেবী, "সেকেলে কথা", *ভারতী*, চৈত্র, ১৩২২ চিত্রা দেব, *ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল*, কলকাতা, ২০০৩।

৫। সৌদামিনী দেবী, তদেব।

৬। স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত।

৭। চিত্রা দেব, *ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল*, পূর্বোক্ত, অমিতা ভট্টাচার্য, *সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলকাতা, ১৯৮৬।

৮। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *পুরাতনী*, পৃঃ ২০, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পারিবারিক খাতা*, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

৯। স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্বোক্ত।

১০। চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।

১১। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রবাস পত্র", *ভারতী* চৈত্র, ১২৯১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, পূর্বোক্ত।

১২। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, পূর্বোক্ত।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা*, কলকাতা, ১৯৩০, পৃঃ ৩১।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পঞ্চভূত", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ৯৮২।

১৫। Himani Bannerjee, পূর্বক্ত।

১৬। স্বর্ণকুমারী দেবী, "একটি প্রস্তাব", *ভারতী* চৈত্র, ১২৯৩।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মহিলা সংগঠনগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাজশ্রী দেবনাথ

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মহিলাদের স্থান নির্ণয় একটি বহু আলোচিত বিষয়। পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি মহিলার ভূমিকার পাশাপাশি মহিলা সংগঠনগুলির ভূমিকাও আলোচনা করা দরকার। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারী শিক্ষার যে সুযোগ উন্মুক্ত ও বিস্তৃত হয়েছিল তাকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষালোক প্রাপ্তা হন এবং নিজ নিজ কৃতিত্বে ভাস্বর হয়ে ওঠেন, অগণিত সাধারণ, আটপৌরে মহিলার তুলনায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত হন। সমাজ, সাহিত্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইসব বিদুষী মহিলার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে বেশ কিছু মহিলা সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রথমদিকে সমাজ সংস্কারকামী দলগুলির শাখা হিসাবে বেশ কয়েকটি মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যেমন — ব্রাহ্ম সমাজের মহিলা শাখা ব্রাহ্মিকা সমাজ, আর্যসমাজের মহিলা শাখা আর্য মহিলা সমাজ, ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্সের ভারত মহিলা পরিষদ ইত্যাদি। এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা এবং মহিলাদের জন্য গঠিত মহিলা সংগঠনগুলির আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মহিলাদের দ্বারা এবং মহিলাদের জন্য গঠিত মহিলা সংগঠনগুলি আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা ব্যক্তি মহিলার তুলনায় মহিলা সংগঠনগুলির ভূমিকা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয় যেহেতু সাফল্য এবং প্রভাবের প্রশ্নে ব্যক্তি অপেক্ষা সংগঠন প্রায়শই বেশী কৃতিত্ব দাবি করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে বাংলায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, মাদ্রাজে কুন্দকুরি বীরসালিঙ্গম পন্টলু, আর. ভেঙ্কটরত্নম নাইডু, মহারাষ্ট্রে ধন্দোকেশব কার্ভে, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, উত্তর ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতী, হুজুর মহাবাজ প্রমুখের নেতৃত্বে যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান বিযয় ছিল নারী শিক্ষার

প্রসার। এই শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হলেও তা গ্রহণ করে যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পন্ডিতা রামাবাঈ সরস্বতী, আনন্দীবাঈ যোশী, ফ্রাঙ্কিনা সোরাবজী, রমাবাঈ রাণাডে, সরোজিনী নাইডু, স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সরলাদেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রমুখী বসু, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী, দুর্গাবাঈ দেশমুখ, বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এইসব কৃতী মহিলা শিক্ষাকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সাফল্য হিসাবে সীমিত না রেখে কোনো না কোনো সংগঠন গড়ে তুলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন আরো অনেকের মধ্যে। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন কিংবা এক বা একাধিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে নিজেদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মোদ্যোগকে বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই সংগঠনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই বেশ কয়েকটি মহিলা সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এগুলির মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখী সমিতি' (১৮৮৬), পন্ডিতা রামাবাঈ প্রতিষ্ঠিত 'সারদা সদন' (১৮৯২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সখী সমিতির' লক্ষ্য ছিল অসহায় অনাথ ও বিধবা মহিলাদের সাহায্য করা এবং মহিলাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে তার সমাধানের চেষ্টা করা।[১] অন্যদিকে 'সারদা সদনের' উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের মধ্যে শিক্ষারবিস্তার করা, বিশেষ করে বিধবা মহিলাদের মধ্যে।[২] এই ধরনের সংগঠন অনাথ, অসহায় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও সীমিত হলেও স্বনির্ভরতার সুযোগ করে দিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা মহিলা সংগঠনগুলিকে উদ্ভবকালের নিরিখে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে উদ্ভুত মহিলা সংগঠন এবং দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে উদ্ভুত মহিলা সংগঠন। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যে সমস্ত মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে মহিলা সমিতি (১৯০৩), স্ত্রী জুরাষ্ট্রীয়ান মন্ডল (১৯০৩), সেবা সদন (১৯০৯), ভারত স্ত্রী মহামন্ডল (১৯১০), অঞ্জুমান খোয়াতেঁ (১৯১৬), ওমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন্ (১৯২৩), দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ওমেন ইন ইন্ডিয়া (১৯২৫), দি অল ইন্ডিয়া ওমেন্স কনফারেন্স (১৯২৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব সংগঠনগুলি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও এদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুঃস্থ, নিপীড়িত মহিলাদের সাহায্য করা, তাদের শিক্ষিত করে তোলা এবং স্বনির্ভর হবার জন্য কিছু কারিগরী শিক্ষা দেওয়া ছিল সংগঠনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। কয়েকটি মহিলা সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরোজনলিনী দেবী বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায়, শহরে ও গ্রামে মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। মহিলা

সমিতি মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি তাদের কিছু কিছু হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করত।[৩] পুণেতে রমাবাঈ রাণাডের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল সেবা সদন। এই সংগঠনটি মেয়েদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্যবিধি এবং শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল।[৪] সরলাদেবী চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামন্ডল ছিল এমন একটি সংগঠন যেখানে সকল ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মহিলারা একত্রিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় মহিলাদের 'নৈতিক ও বৈষয়িক' ('moral and material') উন্নতি ঘটানো।[৫] মুসলিম মহিলাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ প্রদানের জন্য বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অঞ্জুমান খোয়াতেঁ। বিংশ শতকের গোড়াতেই এই সংগঠনটি মুসলিম মহিলাদের বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিম মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে এবং কারিগরী শিক্ষা দিতে উদ্যোগী হয়েছিল।[৬] মার্গারেট কাজিনস্ এবং ডরোথি জিনারাজাদাসার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ওমেনস ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি এবং জনহিতকর বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে এই সংগঠনে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হত।[৭] ইন্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ওমেনের ভারতীয় শাখা হিসাবে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ওমেন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অভিজাত ও ধনী মহিলাদের প্রাধান্য থাকায় সংস্থাটি সাধারণ মহিলাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৮] ১৯২৭ সালে মহিলাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় মহিলাদের মতামত জানতে চেয়ে মিঃ ওটেন, ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নির্দেশিকা পাঠালে প্রধানত শ্রীমতী মার্গারেট কাজিনস্-এর উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল অল ইন্ডিয়া ওমেন'স কনফারেন্স। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই সংগঠনে অভিজাত, উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের প্রাধান্য থাকায় সাধারণ মহিলাদের শিক্ষা বা তাদের কোনো সমস্যা সমাধানে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। তবে ধীরে ধীরে সংগঠনটি অরাজনৈতিক চরিত্র পরিত্যাগ করে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। যেমন—বিচার বিভাগ, প্রশাসন এবং আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি, 'সারদা বিলের' প্রতি সমর্থন, খনিতে কর্মরত মহিলাদের স্বার্থরক্ষা, ডাক-তার বিভাগে কর্মরত মহিলাদের সমস্যার প্রতি সহানুভূতি জানানো প্রভৃতি। তবে সামগ্রিকভাবে সাধারণ ও দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে এই সংগঠনটির কার্যাবলীর প্রভাব ছিল সামান্য।[৯] এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা মহিলা সংগঠনগুলির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন—গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা মহিলা সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলায় নারীকর্ম মন্দির, নারী সত্যাগ্রহী সমিতি, সত্যাগ্রহী সেবিকা দল, মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ, মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সংঘ

বা দেশ সেবিকা সংঘ, মাদ্রাজের ওমেন'স স্বদেশী লীগ, কেরালার রাষ্ট্রীয় স্ত্রী সভা, কেরালা মহিলা দেশ সেবিকা সংঘ, স্বদেশী কমিটি প্রভৃতি। এইসব সংগঠনগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন প্রভাত ফেরী, ধর্না, সভা, সমাবেশ, পিকেটিং, মিছিল প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ধারা সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনে (১৯০৫-১৯৩৯) অসংখ্য মহিলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত বঙ্গনারী সশস্ত্র আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই এসেছিলেন লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত 'দিপালী সঙ্ঘ' এবং কল্যানী দাস প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রী সংঘ' থেকে।[১০] ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের দ্বারিবেড়িয়া গ্রামে গড়ে উঠেছিলেন ভগিনী সেনা। প্রধানত ব্রিটিশ পুলিশের বর্বর অত্যাচার থেকে মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে এই সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। এই সংগঠনের শৌর্য এবং জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার এটিকে বে-আইনী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল।[১১]

বিংশশতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক মন্দা সমগ্র বিশ্বের সাথে ভারতীয়দেরও এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল। এ অবস্থায় সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছিলেন মহিলারা। কারণ যুদ্ধজাত বিভিন্ন সমস্যা যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খাদ্য সংকট, কালোবাজারী প্রভৃতির কুফল ভোগ করতে হত তাদেরই। এই দুর্বিষহ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন— বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, অন্ধ্র, কেরালা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য স্থানে গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এইসব স্থানে বিশেষ করে বাংলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এখানে দরিদ্র মেয়েদের বিধিবদ্ধ রেশনকার্ড পেতে সাহায্য করা, রেশন দোকানের মালিকের দুর্ব্যবহার থেকে মহিলাদের রক্ষা করা, নতুন নতুন রেশন দোকান খোলার দাবি জানানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মুসলীম ওমেন'স ডিফেন্স লীগের সাথে যৌথ উদ্যোগে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বিধানসভায় প্রথম 'ভুখা মিছিল' সংগঠিত করেছিল ১৯৪৩ সালের ১৭ মার্চ। শুধু তাই নয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে বাধ্য করা হয়েছিল সেই মুহূর্তেই প্রত্যেককে দু'সের করে চাল দিতে।[১২] বাংলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এতটাই সক্রিয় ও জনপ্রিয় ছিল যে ১৯৪৪ সালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩,৫০০।[১৩]

ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল থেকে বাংলায়, তেভাগা কৃষক আন্দোলন এবং পূর্বতন হায়দ্রাবাদ বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। এই দুটি কৃষক বিদ্রোহেই অগণিত মহিলা যোগদান করেছিলেন।

লক্ষণীয় এই যে এই দুটি স্থানেই মহিলারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের সংগঠন। যদিও এই দুটি কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের সংগঠিত করার ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী রাণী দাশগুপ্তা ও পি. সুন্দরাইয়ার বক্তব্য থেকেই এ তথ্য জানা যায়।[১৪] তেভাগা আন্দোলন বাংলার যে সমস্ত জেলায় প্রবল আকার ধারণ করেছিল সে সব জেলাতেই যেমন—যশোর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতিতে মহিলারা গড়ে তুলেছিলেন নারী বাহিনী। এই নারী বাহিনী তেভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে মহিলাদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে, পুলিশী অত্যাচার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছিল।[১৫] একইভাবে তেলেঙ্গানা আন্দোলনেও অত্যাচারিত, শোষিত মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ হতে, আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রতিরোধে ও আত্মরক্ষায় জোট বাঁধতে সাহায্য করেছিল অন্ধ্র মহিলাসভা। অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘই ছিল সবচেয়ে বড় সংগঠন এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি হাজার।[১৬]

প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে গড়ে ওঠা এইসব মহিলা সংগঠনগুলির কার্যকলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলি হল - প্রথমত, মহিলা সংগঠনগুলি প্রথমদিকে সমাজসেবামূলক বা জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য গড়ে উঠেছিল। সখী সমিতি, সারদা সদন, সেবা সদন, মহিলা সমিতি, অঞ্জুমান খোয়াতেঁ প্রভৃতির কাজ ছিল প্রধানত দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের সাহায্য করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মহিলাদের কিছু হাতের কাজ শেখানো যার মাধ্যমে তারা কিছুটা হলেও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে বা সংসারে কিছুটা আর্থিক সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মহিলা সংগঠনগুলির কাজ ধীরে ধীরে সমাজসেবা বা জনকল্যাণকর কাজের পরিধি অতিক্রম করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। একদিকে সত্যাগ্রহী সেবিকা দল, নারী সত্যাগ্রহী সমিতি, স্বদেশী লীগ প্রভৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে যোগদান করতে থাকে অন্যদিকে ওমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ওমেন ইন ইন্ডিয়া এবং অল ইন্ডিয়া ওমেন'স কনফারেন্স সম্মিলিতভাবে ১৯১৭ থেকে ১৯৩৫ দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে সংগ্রাম করে মহিলাদের জন্য ভোটাধিকার তা সে সীমিত হলেও আদায় করে নেয়। তৃতীয়তঃ, এই পর্বে মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধ করার জন্য গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নারী বাহিনী, অন্ধ্র মহিলা সভার মত মহিলা সংগঠনগুলি।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভারতে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দান এবং সার্বিক প্রাপ্ত

বয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ নিঃসন্দেহে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং ১৯৭৫-১৯৮৫-র দশককে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসাবে ঘোষণা। এগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে বিশ্বের অর্দ্ধেক জনসংখ্যা যে নারী, যারা এতদিন ছিল অবহেলিত তাদের বিষয়গুলি যথাযথ গুরুত্ব পেতে থাকে। ভারতেও এর অন্যথা হয়নি। এই সময় থেকে ভারতীয় মহিলাদের মর্যাদা, সমস্যা, অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয় পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় মহিলাদের সামনেও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে অসংখ্য মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে ভারতে যে সমস্ত মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—আমেদাবাদের সেল্ফ এমপ্লয়েড ওমেন'স এ্যাসোসিয়েশন্ বা সেওয়া (Self-Employed Women's Association/SEWA), অন্ধ্রপ্রদেশের রীতু কুলি সঙঘম (Rytu Coolie Sangham), দিল্লীর কালি ফর ওমেন (Kali for Women), মহারাষ্ট্রের শেতকারি সংগঠন, সমগ্র মহিলা আগাধি, স্ত্রী মুক্তি সংগঠন, সংঘর্ষ বাহিনী, পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী, দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, সংলাপ, সচেতনা, মৈত্রী, জবলা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশন, বিহারের কিশোরী সভা, সংসর্গ প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাম্প্রতিককালে বিশেষ কোনো ঘটনা বা ইস্যুকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ফোরাম বা মঞ্চ যেমন—দহেজ বিরোধী চেতনা মঞ্চ, ফোরাম এগেনস্ট সেক্স ডিটারমিনেশন এ্যান্ড সেক্স প্রি-সিলেকশন (Forum Against Sex Determination and Sex Pre-selection), ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেসন অফ ওমেন (Forum Against Oppression of women), ছত্তিশগড়ে মহিলা মুক্তি মোর্চা, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে মহিলা মঙ্গল দল অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছে।

আমেদাবাদের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হতদরিদ্র মহিলাদের সাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে 'সেওয়া' (SEWA)। এছাড়াও আর্থিক ঋণদান, আইনী পরামর্শ দিয়েও 'সেওয়া' এইসব মেয়েদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।[১৭] অন্ধ্রপ্রদেশে প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে রীতু কুলি সঙঘম্। এর পাশাপাশি জমিদার, জোতদার ও পুলিশী নির্যাতন থেকে রক্ষা করা বা এসব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য রীতু কুলি সঙঘম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।[১৮] দিল্লীর প্রকাশনা সংস্থা কালি ফর ওমেন মহিলা বিষয়ক প্রবন্ধ, পুস্তক, গবেষণাধর্মী কাজ প্রভৃতি প্রকাশনা করে মহিলাদের কণ্ঠস্বর, তাদের বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। অন্যদিকে শেতকারি সংগঠন, সমগ্র মহিলা আগাধি, স্ত্রী মুক্তি সংগঠনের মতো সংস্থাগুলি মহারাষ্ট্রে মহিলা পঞ্চায়েত গঠন করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।[১৯] বিহারে

মহিলাদের কুসংস্কার দূর করতে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে কাজ করে চলেছে কিশোরী সভা।[২০] পণপ্রথা এবং পণসংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য দিল্লীর বেশ কয়েকটি সংস্থা যেমন—মহিলা দক্ষতা সমিতি, স্ত্রী সংঘর্ষ, প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার জন্য গড়ে তোলে দহেজ বিরোধী চেতনা মঞ্চ এবং তাদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে সরকার ১৯৬১ সালের পণপ্রথা বিরোধী আইনটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের একটি যৌথ কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়।[২১] মহিলা সংগঠনগুলি মথুরা ধর্ষণ মামলার সময়েও ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলা সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেসন অফ ওমেন গঠন করে এবং এক্ষেত্রেও তারা কিছু দাবি আদায় করে নিতে সফল হয়।[২২] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা মহিলা সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের মহিলা সংগঠনগুলি প্রধানত সমাজসেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এদের গঠন, কার্যকলাপ অনেক বেশী বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে মহিলা সংগঠনগুলির কার্যকলাপ জনকল্যাণ থেকে রাজনীতি, গবেষণা থেকে পরামর্শদান (counselling), অর্থনৈতিক থেকে আইনী সাহায্য দান, প্রকাশনা থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, এই সব সংগঠনগুলি সাধারণত স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে কাজ করলেও প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে এবং দলমত নির্বিশেষে ও অন্যান্য বিভেদ ভুলে বৃহত্তর স্বার্থে শামিল হয়েছে। এই একতার মনোভাব নিঃসন্দেহে একটা বড় প্রাপ্তি।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে গড়ে ওঠা মহিলা সংগঠনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও কয়েকটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখও এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সংগঠনগুলির উদ্ভব ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, মহিলা সংগঠনগুলির অধিকাংশই নগরকেন্দ্রিক। নগর জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে এই সংগঠনগুলি কাজ করে, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে তাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী সেখানে হয় তাদের অস্তিত্ব নেই নতুবা তাদের দেখা মেলে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে বা বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে। দ্বিতীয়ত, এইসব মহিলা সংগঠনগুলির অধিকাংশই পরিচালিত হয় অভিজাত, উচ্চশিক্ষিত, শহুরে বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা। যাদের জন্য এই সংগঠন সেই সব পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ, বিপন্ন মহিলারা যেন শুধুই সদস্য, অন্য কোনো ভূমিকা নেই তাদের। তৃতীয়ত, এইসব সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে কিছু দক্ষতাগত অভাব বা পেশাদারী মনোভাবের অভাব লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থত, অনেক মহিলা সংগঠন রাজনৈতিক দলের সাথে এত বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে যে তাদের পক্ষে

স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কোনো বিশেষ বিষয়ে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা সম্ভব হয় না। পঞ্চমত, অর্থনৈতিকভাবে এই সংগঠনগুলির মধ্যে অনেকেই বিদেশী সাহায্য বা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। এই ধরনের সংগঠনগুলিতে সেবার মনোভাবের আদর্শের পরিবর্তে চাকরির মানসিকতা এবং আর্থিক দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়।

মহিলা সংগঠনগুলির কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এইসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, এইসব সংগঠনের কার্যকলাপ ক্রমবর্দ্ধমান এবং যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক। প্রাথমিক পর্বে যে কোন সংগঠনকেই কিছু না কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, ভারতের মহিলা সংগঠনগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। অদূর ভবিষ্যতে এইসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে এদের ভূমিকা আরো ইতিবাচক হয়ে উঠবে এমন আশা করা যায়। বাস্তবিকই এইসব মহিলা সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা ভারতের নারী আন্দোলনকে এক স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

সূত্র-নির্দেশ

১। লতিকা ঘোষের প্রবন্ধ, "সোশ্যাল এ্যান্ড এডুকেশনাল মুভমেন্টস্ ফর ওমেন এ্যান্ড বাই ওমেন (১৮২০-১৯৫০)", কালীদাস নাগ (সম্পাদিত), *বেথুন কলেজ এ্যান্ড স্কুল সেন্টেনারী ভল্যুম (১৮৪৯-১৯৫০)*, কোলকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ১৪৮।

২। জেরাল্ডাইন ফর্বস, *ওমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া*, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮, পৃঃ ৪৭।

৩। জেরাল্ডাইন ফর্বসের প্রবন্ধ, "দি ওমেন'স মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া : ট্রাডিশনাল সিম্বল এ্যান্ড নিউ রোল স" এম. এস. এ. রাও (সম্পাদিত), *সোশ্যাল মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া*, দ্বিতীয় খন্ড, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ১৫৪।

৪। পদ্মিনী সেনগুপ্ত, *দি স্টোরী অফ ওমেন ইন ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৬৭।

৫। সরলা চৌধুরাণীর প্রবন্ধ, "এ ওমেন'স মুভমেন্ট," *মডার্ন রিভিউ*, অক্টোবর, ১৯১১, পৃঃ ৩৪৭।

৬। সেরিনা জাহান, রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, কোলকাতা, ১৯৯৮, পৃপৃঃ ৪০,৪১।

৭। জেরাল্ডাইন ফর্বস, ওমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃঃ ৭২-৭৫।

৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৮।

৯। লতিকা ঘোষের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পৃঃ ১৫৮ ১৫৯ ছবি বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, কোলকাতা, ১৯৪৮, পৃপৃঃ ১১৫ ১১৭।

১০। জেরাল্ডাইন ফর্বসের প্রবন্ধ, "গডেস অব রিবেলস্? দি ওমেন রেভিলিউশনারীস্ অফ বেঙ্গল," দি ওরাকেল, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮০, কোলকাতা, পৃঃ ৪।

১১। বীণা পালের প্রবন্ধ, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মেদিনীপুরের নারী", *সমাজ জিজ্ঞাসা*, ২০০৩, পৃঃ ৭৭, মেদিনীপুর।

১২। রেণু চক্রবর্ত্তী, *কমিউনিস্ট ইন ইন্ডিয়ান ওমেন'স মুভমেন্টস্, ১৯৪০-১৯৫০,* নতুন দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ২৯-৩০।

১৩। কুনাল চট্টোপাধ্যায়, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস,* কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১০৫।

১৪। রাণী দাশগুপ্তার প্রবন্ধ, ''তেভাগার লড়াই -এ কৃষক মেয়েদের ভূমিকা'', *তেভাগা সংগ্রাম,* রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, তেভাগা রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, কোলকাতা, পৃঃ ১১০ ''স্ত্রী শক্তি সংগঠন'', উই ওয়ার মেকিং হিস্ট্রী, লাইফ স্টোরীজ অফ ওমেন ইন তেলেঙ্গানা পিপলস্ স্ট্রাগল, নতুন দিল্লী, ১৯৮৯, পৃঃ ২৩।

১৫। কল্যানী দাশগুপ্তার প্রবন্ধ, ''তেভাগায় জেলার মেয়েরা'', *পশ্চিমবঙ্গ* (তেভাগা সংখ্যা), কোলকাতা, ১৯৯৭, মণি সিংহের প্রবন্ধ, ''তেভাগা সংগ্রামের স্মৃতিকথা'', *তেভাগা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ।*

১৬। রেণু চক্রবর্ত্তী, পূর্বোক্তি, পৃঃ ১৩৯।

১৭। জয়ন্ত সিংহের প্রবন্ধ, ''মেয়েদের মুখে হাসি ফোটানোই তাঁর ব্রত'', *সংবাদ প্রতিদিন,* ২৮-০৯-২০০২।

১৮। আর. কে. ট্যান্ডন, *ওমেন ইন মডার্ন ইন্ডিয়া,* নতুন দিল্লী, ১৯৯৮, পৃঃ ১৩৯।

১৯। কল্যানী বন্দোপাধ্যায়, *রাজনীতি ও নারীশক্তি,* হাওড়া, ২০০২, পৃঃ ৮২।

২০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯, ১১০।

২১। রাধা কুমার, *হিস্ট্রী অফ ডুইং, এ্যান ইলাসট্রেটেড এ্যাকাউন্ট অফ মুভমেন্টস ফর ওমেন'স রাইটস এ্যান্ড ফেমিনিজম্ ইন ইন্ডিয়া ১৮০০-১৯০০,* নতুন দিল্লী, ১৯৯৮, পৃঃ ১১৮-১১৯।

২২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯ ইন্দু অগ্নিহোত্রী ও বীণা মজুমদারের প্রবন্ধ, ''চেঞ্জিং টার্মস অফ পলিটিক্যাল ডিসকোর্স, ওমেন'স মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া ১৯৭০-১৯৯০'', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি,* ২২ জুলাই, ১৯৯৫, পৃপৃঃ ১৮৭০-১৮৭১।

বিশ্বায়ন ও চা বাগানের নারী শ্রমিক

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

এই প্রবন্ধে আমি পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত ডুয়ার্সের চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করব।

এক

যদিও বিশ্বায়ন কথাটার সঙ্গে আমরা অনেকদিন থেকেই পরিচিত, ১৯৮০-১৯৯০ এর দশক থেকে নতুন কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় যাকে বিশ্বায়ন বা Globalisation বলা হয়েছে। গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ থেকে নব্বুইয়ের গোড়ার দিকে সোভিয়েত রাশিয়া সহ গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের পর বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতি একমেরুকরণ সম্পূর্ণ হয়।[১] বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে (W T O) সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি তাদের আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়, যার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির বেসরকারীকরণ হতে থাকে।[২]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিশ্বায়নের বহুমুখী প্রভাব সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ১৯৮৮-১৯৯৮ খ্রিঃ এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র নিজেদের কর্তৃত্ব হ্রাস করতে থাকে। বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের দাবিগুলি অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে।[৩] ফলে, সমাজের দুর্বল অংশগুলি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী নীতিগুলি বাতিল করে সরকারের ব্যয় সংকোচন করা হয়। শ্রমজীবি মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়।[৪] স্বাভাবিক কারণেই শ্রমজীবি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মহিলারা এই নীতির দ্বারা আক্রান্ত হন। এছাড়া, যখন আয়ের বৈষম্য বাড়ে এবং পরিবারের জীবন যাপনের মানের অবনতি হয়, তখন মহিলারা এই নতুন বঞ্চনার দায় পুরুষদের থেকে বেশি বহন করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে নারী এবং শিশু কন্যা পরিবারের সম্পদ বাঁচিয়ে পারিবারিক প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করে, যেমন - জ্বালানি না কিনে জ্বালানি সংগ্রহ করা। মৌলিক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে

গেলে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যয় সংকোচন হলে, সাধারণ ভাবে সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্পগুলি গুটিয়ে নেওয়া হলে, মহিলারা অনেক বেশি আক্রান্ত হন।[৫]

আর্থিক সংস্কার নীতির কয়েকটি দিক মহিলাদের সরাসরি আক্রান্ত করে। যেসব শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশি সেখানে মন্দা দেখা দিলে মহিলারা সরাসবি আক্রান্ত হন। এক্ষেত্রে চা - শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়, যা পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে। উদারীকরণ নীতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংকোচনের নীতি।[৬] ইনফরম্যাল (বিধিবহির্ভূত) ক্ষেত্রে মহিলারা অনেক বেশি সংখ্যায় নিযুক্ত হন। এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজের কোনো শর্ত বা নিয়ম থাকে না। বিশ্বায়নের হাত ধরে যে আর্থিক সংস্কার নীতির সূচনা হয় তার ফলে ইনফরম্যাল এবং ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৭] সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের সংকোচন মহিলাদের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে কারণ দেখা যায় যে প্রকল্পগুলি ক্রমশ গুটিয়ে নেওয়া হয়, তার মধ্যে অনেকটাই মহিলা ও শিশুদের লক্ষ্য করে গঠিত হয়েছিল। শ্রমজীবি মহিলাদের ক্ষেত্রে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের পরিষেবা যথেষ্ট নয়।

দুই

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য ভারতে তৈরি হয় চা-শিল্প। চীনের একচেটিয়া চা বাজারে ভাগ বসাতে ব্রিটিশরা অন্যান্য উপনিবেশে চা চাষের চেষ্টা চালায়।[৮] ভারতবর্ষে চা চাষের সূচনা হয় অসমে। চা উৎপাদনের শুরু ১৮৫৩ সাল থেকে।[৯] জলপাইগুড়িতে প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৪ সালে, গজল ডোবায়।[১০] এটি ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ১৭০টি চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় এই অঞ্চলে।[১১] ক্রমশ ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়রাও চা ব্যবসায় প্রবেশ করেন। ১৮৭৭ সালে এই জেলায় প্রথম ভারতীয় একটি জমির গ্রান্ট পান। তাঁর নাম মুন্সি রহিম বকস্।[১২]

চা বাগানগুলিতে কাজ করার জন্য ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা থেকে আদিবাসী শ্রমিক আনা হত।[১৩] স্থানীয় জনজীবন থেকে চা শিল্পের এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন ছিল চা করদের শোষণকে কায়েম রাখার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে, ব্রিটিশদের ভূমিরাজস্ব নীতির কারণে দলে দলে মানুষ উত্তর বাংলার চা বাগানে চলে আসতে থাকে।[১৪]

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের বাগানের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এরফলে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা থেকে সপরিবারে মানুষ আসে চা বাগানগুলিতে। বাগান মালিকদের পক্ষে এই ব্যবস্থা লাভজনক ছিল, কারণ মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করলে পুরুষদের সমপরিমান বেতন দিতে হত না। এছাড়াও, সপরিবারে

থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমিক উৎপাদন করা কঠিন হবে না। মহিলারা চা বাগান গুলিতে প্রধানত পাতা তোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকত। ১৯২০-১৯৩০ এর দশকে যখন অন্যান্য শিল্প (যেমন পাট) ও খনিতে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা কমে গেছে, বাগিচা শিল্পে তাদের সংখ্যা অপরিবর্তিত থেকেছে।[১৫]

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আইনের সাহায্যে মহিলা শ্রমিকদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হয়। ১৯৫১ সালে বাগিচা শ্রম আইন (Plantation Labour Act.) অনুযায়ী স্থায়ী নারী শ্রমিকদের বিশেষ কিছু সুবিধা দানেব কথা বলা হয়।[১৬] যেমন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং কাজে যোগদান করার পর শিশুদের দেখার জন্য ক্রেশ (creche) ব্যবস্থা। কিন্তু ৮০র দশকের শেষ দিক থেকে বিশ্বায়নেব যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার প্রভাব এসে পড়েছে চা বাগানগুলিতে।

এই প্রসঙ্গে সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে চা শিল্পে সংকট আলোচ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। শিল্পে সংকট বলতে সাধারণভাবে মানুষ বোঝে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রী না হওয়া। বাগিচা মালিকেরা অভিযোগ জানায় যে তাবা চায়ের দাম পাচ্ছেন না। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে বিদেশী চা ভারতে ঢুকছে। কিন্তু টি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় চা-এর বিপুল উৎপাদনের পাশে সেই বিদেশী আমদানী আজও দশ শতাংশ পৌঁছায়নি।[১৭]

এদিকে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির অভিযোগ যে চা শিল্পে নতুন বিনিয়োগ এবং আধুনিকীকরণ যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে হচ্ছে না। আধুনিক যুগে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। চা শিল্প মূলত কৃষি ভিত্তিক শিল্প। চা গাছের আয়ু অনন্তকাল থাকে না। ফলে, নতুন বাগিচা তৈরি করতে হয়। দুর্ভাগ্য বশত উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগানে এই ধরনের উন্নয়ন হয়নি।[১৮] বাগানগুলিতে কথা বলে দেখি যে চা শিল্পের জন্য সংগৃহীত ব্যাঙ্ক লোন অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এই শিল্প শ্রমিক নির্ভর (Labour-oiriented) উন্নয়নশীল সংস্কারের দিকে তেমনভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়নি।[১৯]

সাম্প্রতিককালের আরেকটি সমস্যা হল "bought leaf factory"।[২০] এগুলি নতুন চা কারখানা যেখানে বিভিন্ন বাগান থেকে চা পাতা আনা হয় এবং চা তৈরি করা হয়। চা বাগিচার থেকে এই কারখানাগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ফলে, মালিকদের শ্রমিকদের প্রতি কোন দায়িত্ব থাকে না। এই নতুন ধরনের কারখানা গড়ে ওঠার ফলে "কন্ট্র্যাক্ট ফার্মিং" এর (contract farming) প্রচলন হয়। একজন শ্রমিক যত বেশি পাতা তুলতে পারবে, তার তত বেশি আর্থিক লাভ। এখানে নির্দিষ্ট কোনো মজুরী ধার্য করা হয় না।

তিন

চা বাগিচায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে মহিলারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা প্রধানত পাতা তোলা ও বাগান পরিষ্কারের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।[২১] আলিপুরদুয়ার মহকুমার কালচিনি ব্লকের অন্তর্গত বাগান পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। কালচিনি বাগানে (যা সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে) পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা শ্রমিক আছেন যাঁরা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত (পাতা তোলার মাধ্যমে)। বাগানের অফিস কর্মচারীদের মধ্যে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব এখনো নগণ্য।[২২]

যে প্রক্রিয়া গত শতকের আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে, তা হলো মহিলাদের ক্রমশ অস্থায়ী বা বিঘা (casual) শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা। এর অন্যতম প্রধান কার হল ১৯৭৬ সালের সম-মজুরী আইন, সেখানে বলা হয় যে পুরুষ ও নারী শ্রমিক এক কাজের জন্য এক মজুরী পাবে।[২৩] কিন্তু এই আইনগত অধিকার শুধুমাত্র স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য।

রেশন, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিসেবা, ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা বাগিচা শ্রম আইনে আছে, তাও শুধুমাত্র স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য। কয়েকটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝানো যাবে।

১.১১.২০০১ তারিখে নেপুচাপুর এস্টেটে কথা বলি সত্তর বছর বয়সী যমুনা মাহালীর সঙ্গে। তিনি আটচল্লিশ বছর ধরে এই বাগানে পাতা তোলার কাজ করতেন। এখন কাজ করছেন তাঁরই পরিবারের পুত্রবধু লাগান মাহালী। তিন সন্তানের জননী লাগান বলেন যে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন (Maternity Benefit Act) তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। তিনি বিঘা শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন বলে এই আইন অনুযায়ী কোনো আর্থিক সুবিধা পাননি। বাগানে কাজ করার বাইরে তিনি সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করলেও, পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাঁর স্বামীর।[২৪]

কুড়ি বছর বয়সী কলাবতী ভুইয়ার নেপুচাপুর চা বাগানে পাতা তোলার অভিজ্ঞতা ছিল দু বছরের। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ন মাস পযন্ত পাতা তোলা আর পিঠে পাতার বোঝা বহন করেছেন। সন্তানের জন্মের পর ছয় মাসের শিশুকে গাছ তলায় রেখে আবার পাতা তুলতে যেতে বাধ্য হয়েছেন।[২৫]

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চা বাগান বন্ধ হয়ে যাবার ফলে যে অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে বাগান শ্রমিকেরা, তারই হাত ধরে এসেছে বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা, যার অন্যতম প্রধান দিক হল মদ্যপান। পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আর্থিক অনটন ও দুর্দিনে এই অভ্যাসের দায়ভার বহন

করতে হচ্ছে পরিবারের মহিলাদের। শারীরিক নির্যাতন, ঋণের জালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতেও এরা অনেক ক্ষেত্রে অসমর্থ হয়।

কালচিনি ব্লকের অধীনে বারোটি চা বাগানের মধ্যে বেশ কয়েকটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ফলে মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীতে থাকছেন এবং পুরুষেরা ঠিকা শ্রমিক হিসেবে মফস্বলে কাজ করছেন। বাগান বন্ধ হওয়ার ফলে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা শ্রমিক শিলিগুড়ি থেকে আলিপুর দুয়ার পর্যন্ত মিটার গেজ রেল লাইন তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। যে সব চা বাগান মালিকেরা বাগান পরিত্যাগ (abandon) করে চলে গেছেন, যেমন চিনচুলা, রাফমাটুং, ভিমা চা-বাগান, সেখানে তাঁরা বাগান খোলার শর্ত হিসেবে শ্রমিকদের পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস করার কথা বলেছেন।[২৬]

অপর একটি বিষয় যা চা বাগান শ্রমিকদের দুর্গতি বাড়িয়ে তুলেছে তা হলো বাগিচা অঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। বন্ধ বা পরিত্যক্ত বাগানের শ্রমিকদের নির্ভর করার মতো বিকল্প কর্ম সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাগান বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাগানের শিশুদের স্কুলে পৌঁছে দেবার যানবাহন (যেমন বাস) বন্ধ হয়ে গেলে তাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

বেন্তগোরী চা বাগান থেকে জানা যায় যে বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান প্রভাব হলো লোকসংস্কৃতির ওপর আঘাত। চা বাগান শ্রমিকদের নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতি আজ বিলুপ্ত প্রায়। ঘরে ঘরে, মহল্লায়, মহল্লায়, আচার অনুষ্ঠানে এখন আর ধামসা মাদলের আওয়াজ শোনা যায় না। তার পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত লঘু হিন্দী চলচ্চিত্রের গান এবং বহুজাতিক সংস্থার চটকদার বিজ্ঞাপন, যা সাধারণ শ্রমিকদের প্রলুব্ধ করে নিয়ে চলেছে এক অজানা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। বিভিন্ন উপায়ে শ্রমিকদের ঐক্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টাও করা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে।[২৭]

চার

একদিকে বিশ্বায়নের সর্ব ব্যাপী সর্বগ্রাসী আক্রমণ, অন্যদিকে চা শিল্পের বর্তমান সংকট, এই দুয়ের চাপে চা বাগানের শ্রমিকেরা আজ দিশাহারা। মালিকদের অমানুষিক, একতরফা শর্তাবলীর সামনে ট্রেড ইউনিয়ন আজ অনেকটাই রক্ষণাত্মক। সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা শ্রমিকেরা। তবে এ কথাও ঠিক, যে নিজেদের অর্জিত অধিকার রক্ষার বিষয়ে আজ মহিলা শ্রমিকেরা আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং বেশি সংখ্যায় প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল

হচ্ছেন। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের স্থানেও মহিলা শ্রমিকদের দেখতে পাওয়া যাবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। চন্দন সেনগুপ্তর প্রবন্ধ, "কনসেপটুয়ালাইজিং গ্লোবালাইজেশন, ইস্যুস এন্ড ইমপ্লিকেশনস্" *ই.পি.ডব্লু*, আগষ্ট ১৮, ২০০১, পৃঃ ৩১৩৭।

২। অমিয় কুমার বাগচীর প্রবন্ধ "গ্লোবালাইজেশন, লিবারালাইজেশন এন্ড ভালনেরাবিলিটি, ইন্ডিয়া এন্ড থার্ড ওয়ার্লড" *ই.পি.ডব্লু*, নভেম্বর ৬, ১৯৯৯, পৃঃ ৩২২৩।

৩। দেবী চ্যাটার্জির প্রবন্ধ "বিশ্বায়ন ও দলিত", অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, *বিশ্বায়ন, ভাবনা দুর্ভাবনা*, প্রথম খন্ড, ২০০২, পৃঃ ১৩৪।

৪। যশোধরা বাগচীর প্রবন্ধ "বিশ্বায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন" অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, ভাবনা-দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খন্ড, এন.বি.এ ২০০২, পৃঃ ২৩৯।

৫। মথুরা স্বামীনাথন ও ভি.কে রামচন্দ্রনের প্রবন্ধ "কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও ভারতীয় নারী সমাজ", অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত ভাবনা - দুর্ভাবনা, প্রথম খন্ড, এন.বি.এ, ২০০২, পৃঃ ১২৪।

৬। মথুরা স্বামীনাথন ও ভি.কে রামচন্দ্রন এর প্রবন্ধ "কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও ভারতীয় নারী সমাজ" অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত, তদেব, ভাবনা দুর্ভাবনা প্রথম খন্ড, এন.বি.এ, ২০০২ পৃঃ ১২৬।

৭। ইবিড, পৃঃ ১২৬-২৭।

৮। স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথস, *দা হিষ্ট্রি অফ্ দা ইন্ডিয়ান টি ইন্ড্রাষ্ট্রি*, লন্ডন, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৯।

৯। রণজিৎ দাশগুপ্ত, *লেবার এন্ড ওয়ার্কিং ক্লাস ইন্ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ঃ স্টাডিজ্ ইন কলোনিয়াল হিষ্ট্রি*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৪৬।

১০। *তদেব* পৃঃ ১৪৬-৪৭।

১১। স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথস্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

১২। পরিতোষ দত্তর প্রবন্ধ "দুটি পাতা একটি কুঁড়ির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি জেলা" *পশ্চিমবঙ্গ*, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃঃ ৪৬।

১৩। সরিৎ কুমার ভৌমিক *ক্লাস ফরমেশন ইন দা প্লানটেশন সিস্টেম*, নিউ দিল্লী, ১৯৮১, পৃঃ ৪৪।

১৪। ইবিড, পৃঃ ৪৫।

১৫। শমিতা সেন এর প্রবন্ধ "কোয়েশ্চনস্ অফ কনসেন্ট ঃ ওমেনস্ রিক্রুটমেন্ট ফর আসাম টি গার্ডেনস্, ১৮৫৯ - ১৯০০, *স্টাডিজ ইন হিষ্ট্রি*, নিউ সিরিজ, ভলঃ১৮, নং ২, জুলাই-ডিসেঃ ২০০২, পৃঃ ২৩১।

১৬। দা প্লানটেশন লেবার এ্যাক্ট, ১৯৫১, বুক-এন ট্রেড, ২০০০, পৃঃ ১৩।

১৭। টি স্ট্যাটিস্টিকস, ১৯৯৯ ২০০০, টি বোর্ড অফ্ ইন্ডিয়া, ২০০২, পৃঃ ১৮৪ ১৮৫।

১৮। সাক্ষাৎকার, কাজিমান গোলে, "চা শ্রমিক মজদুর ইউনিয়ন", কালচিনি চা বাগান, আলিপুরদুয়ার, ২৮.১২.২০০৩।

১৯। সাক্ষাৎকার, নির্মল দাস, বিধায়ক, আলিপুরদুয়ার, ২৭.১২.২০০৩।

২০। সাক্ষাৎকার, পূর্ণমান রাই, "ডুয়ার্স চা - বাগান ওয়ারকার্স ইউনিয়ন" কালচিনি চা - বাগান, ২৮.১২.২০০৩, কাজিয়ান গোলে, ২৮.১২.২০০৩।

২১। লেবার ব্যুরো, *ইকোনমিক এন্ড সোসাল স্ট্যাটাস্ অফ্ ওমেন ওয়ারকার্স ইন ইন্ডিয়া, গভঃ অফ ইন্ডিয়া*, ১৯৫৩, পৃঃ ২০।

২২। মৈত্রেয় ঘটক ও লিপি চক্রবর্ত্তী, "দা ডুয়ার্স স্টোরি ঃ এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন এন্ড কম্যুনিটি পার্টিসিপেশন ইন হেলথ্ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার", ইউ.এন. এফ.পি.এ- ইউ, নি.সেফ, ইন্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ২৭।

২৩। *দা ইকুয়াল রেমুনারেশন এ্যাক্ট*, গভঃ অফ্ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮, পৃঃ ২।

২৪। সাক্ষাৎকার, যমুনা মাহালী, লাগান মাহালী, নেপুচাপুর টি এস্টেট, মালবাজার, ৯.১১.২০০১।

২৫। সাক্ষাৎকার, কলাবতী ভূইয়া, নেপুচাপুর টি এস্টেট, মালবাজার, ৯.১১.২০০১।

২৬। সাক্ষাৎকার, নির্মল দাস, বিধায়ক আলিপুরদুয়ার, ২৭.১২.২০০৩।

২৭। সাক্ষাৎকার, রুক্মিনী ওরাঁও, বেতগুড়ী টি এস্টেট, জিতেন সেন, (স্কুল শিক্ষক), মালবাজার, ১০.১১.২০০১।

স্বাধীনতাপূর্ব কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকায় নারী

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধে এবং তারও আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দি পত্রপত্রিকায় কীভাবে নারীসমাজকে চিত্রিত করা হয়েছিল, ভারতীয় নারীর ইমেজ নির্মাণ ও তার কর্তব্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে উক্ত পত্রপত্রিকাগুলি কী ভূমিকা পালন করেছিল সেবিষয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে। পরিবার, সমাজ তথা পরাধীন দেশে আলোচ্য কালপর্বে নারীকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং হিন্দি রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী ও উদারপন্থী পত্রপত্রিকাগুলি তার কী সমাধানসূত্র নির্দেশ করেছিল তাও এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভারতীয় নারীকে বিদেশী শাসকের প্রতিনিধিরা বারবার অপমান করেছে — বাড়িতে, চা বাগানে, রেলে সর্বত্র। বহির্জগতে ব্রিটিশকে কোনভাবেই পরাভূত করতে পারছিল না ভারতের পুরুষ সমাজ। তাই দৃষ্টি দিয়েছিল অন্তঃপুরে, নারীকে চেয়েছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে; সহবাস সম্মতি বিল থেকে শারদা বিল সবেরই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল, ভেবেছিল মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়লে ভেঙে পড়বে সমাজ, বিয়ে দিলেই তাদের রক্ষা করা যাবে বিদেশী ম্লেচ্ছর কলুষস্পর্শ থেকে। শ্বেতাঙ্গ শাসক বহির্জগতে প্রভুত্ব করছে, অন্তঃপুরেও তার প্রভুত্ববিস্তার বন্ধ করতে প্রবলভাবে উদ্যোগী হয়েছিল ভারতীয় পুরুষসমাজ। বাংলা পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' ভেবেছিল সরকার ভারতীয়দের সামাজিক স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায়।[১] হিন্দি পত্রিকাগুলিও দ্বিমত প্রকাশ করেনি।

এই ধরনের মানসিকতাই ছিল দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের মত সাহসী সাংবাদিকেরও। কলকাতার হিন্দি সাংবাদিকতার জগতে যার আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৭৮ সালে মূলত 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদক রূপে। পরবর্তীকালে তিনি 'উচিতবক্তা', 'সারসুধানিধি' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সহযোগীরা ছোটুলাল মিশ্র, গোবিন্দনারায়ণ মিশ্র, বাসুদেব মিশ্র প্রভৃতিরা প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী হলেও সামাজিক ভাবনায় রক্ষণশীল ছিলেন। অবশ্য তাদের পুরোপুরি প্রগতিবিরোধী মনে করাও ঠিক নয়। 'ভারতমিত্র' সম্পাদক ছোটুলাল মিশ্রকে রক্ষণশীল বলা যায় এই অর্থে যে, তিনি এমন আমূল পরিবর্তন চাননি যা ঐতিহ্যগত ভারতীয় সমাজকে সম্পূর্ণরূপে উল্টেপাল্টে দেবে। এই ব্যক্তি বাল্যবিবাহকে "প্রগতির মূলধারা" বলেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র হিন্দু সনাতন ধর্মের সমর্থক হয়েও সামাজিক স্থিতিশীলতার বিরোধী ছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে যে বিষয়টি কলকাতার পত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে সেটি হল ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি বিল। তনিকা সরকার বলেছেন, ঐ বিলটি হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। এই বিলে মেয়েদের বিয়ের বয়স দশ থেকে বাড়িয়ে বারো বছর করার সুপারিশ করা হয়। বিলটির প্রস্তাবনার ফলে সমগ্র দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৮৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী কলকাতা ময়দানে বিলটির প্রতিবাদে দুই লক্ষ লোকের একটি জনসভা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের বাংলা পত্রিকা 'মিহির ও সুধাকর' - ও বিলটির প্রতিবাদ করেছিল।[৪] মারাঠী পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশ' লিখেছিল "বাংলা প্রেসিডেন্সি সবচেয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। কলকাতা উন্মত্ত ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল।[৫]

ঐ বিল পাশ হলে হিন্দুসমাজের একটি প্রধান সংস্কার 'গর্ভাধান' (fertilization) সম্পন্ন করা যেত না। ঐ সংস্কার অনুযায়ী রজোদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পতিসংসর্গ করতে হবে — এই বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। বাংলো মাসিক 'জন্মভূমি'র ১২৯৭ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। বিলের বিরুদ্ধে যারা ছিলেন তাদের বক্তব্য ছিল, ভারতের মত উষ্ণমন্ডলীয় দেশে বারো বছর বয়সের পূর্বেই মেয়েরা ঋতুমতী হয়। বারো বছরকে বিবাহের ন্যূনতম বয়স করা হলে তা হবে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ।[৬]

কলকাতার বেশীর ভাগ হিন্দি পত্রপত্রিকা বাংলা পত্রপত্রিকার মতই সহবাস সম্মতি বিলের বিরোধিতা করে। একটি হিন্দি পত্রিকা লিখেছিল বিল কার্যকরী হলে তা হিন্দুধর্ম ও সমাজের মূলে আঘাত করবে। যাদের জন্য এই বিল আনা হচ্ছে তাদের রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের যৌবনের প্রারম্ভে তাদেরই স্বামীদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। পত্রিকাটির মতে, উপযুক্ত শিক্ষাই এই প্রতিকার করতে পারে।[৭]

"বঙ্গবাসী" ছাড়া যেসব বাংলা পত্রপত্রিকা সহবাস সম্মতি বিলের বিরোধিতা করে সেগুলি হল 'দৈনিক' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' 'সহচর', 'সারস্বত পত্র', 'পরিদর্শক', 'উলুবেড়িয়া দর্পণ', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বর্ধমান সঞ্জীবনী', 'সমাজ ও সাহিত্য' 'সুরভি ও পতাকা' প্রভৃতি।

'হিন্দি বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ছিলেন রক্ষণশীল উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। তার তীব্র ব্রিটিশবিদ্বেষ শুধু 'বঙ্গ বাসী' গোষ্ঠীর পত্রিকাকেই প্রভাবিত করেনি, অন্যান্য দেশীয় পত্রপত্রিকাকেও প্রভাবিত করে। 'হিন্দি বঙ্গবাসী' সম্পাদক অমৃতলাল চক্রবর্তী লেখেন, 'সরকার ভারতীয়দের বিষপানে বাধ্য করেছেন।[৮]

'আর্যাবর্ত', পত্রিকা লিখেছিল, বিলটি পাশ হলেও হিন্দুদের বাল্যবিবাহে এর

কোনও প্রভাব পড়বে না।[৯] কয়েকটি পত্রিকা বিলটি সমর্থন করেছিল, কিন্তু যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি বিল[১০] সমর্থন করে, তখনই দেশীয় পত্রিকাগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। তারা মনে করেছিল, বিলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয়দের ধর্ম নষ্ট করা। 'আর্যাবর্ত লিখেছিল, 'মহারানীর প্রতিশ্রুতি স্বত্ত্বেও সরকার ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমদৃষ্টিতে দেখছেনা। বড়লাটকে এটা বোঝানো অসম্ভব যে, ইউরোপীয়দের জীবনে ধর্মের স্থান নগণ্য হলেও হিন্দুদের সমস্ত কার্যকলাপ ধর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। যদি শত শত ফুলমণিরও[১১] মৃত্যু হয়, হিন্দু নারীদের পতিভক্তির হ্রাস হবে না'।[১২]

ভারতীয়দের কাছে এটি ছিল "The last unconquered space."[১৩] ব্রিটিশরা এখনো যাকে জয় করতে পারেনি, সহবাস সম্মতি বিল আইনে পরিণত হলে ভারতীয়রা হারাবে ঐ একমাত্র অবিজিত অঞ্চলটি।

জনগণ সন্দেহ করেছিল তাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি উদাসীন সরকার হঠাৎ বালিকাবধূদের রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠল কেন?[১৪]

সহবাস সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে লেখার জন্য 'বঙ্গবাসী' গোষ্ঠীব স্বত্তাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং ঐ পত্রিকার কয়েকজন কর্মচারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ৫০০ ধারায় গ্রেপ্তাব করা হয়। এরা ছিলেন রাজদ্রোহেব জন্য দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত প্রথম দেশীয় সাংবাদিক।[১৫] 'বঙ্গবাসী'র সাংবাদিকদের দণ্ডাদেশ হিন্দি বাংলা ২টি কাগজেরই জনপ্রিয়তা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দেয়। সেই সময় এই দুটি পত্রিকার মিলিত সার্কুলেশনের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ সংখ্যা, যা ভাবতের অন্যান্য সাংবাদপত্রের একক সার্কুলেশনের পবিমাণেব চাইতে অনেক বেশী।[১৬] বড়লাট ল্যান্সডাউন ঠিকই ভেবেছিলেন যে, পত্রপত্রিকাগুলি জনমতকে সবকারবিরোধী করে তুলছে। বস্তুতঃপক্ষে অভিযুক্ত হওয়া স্বত্বেও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাগোষ্ঠী[১৭] সবকারবিরোধিতা থেকে বিরত হয়নি।

'বঙ্গবাসী'র দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তি গোটা দেশের পত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেহেতু বিষয়টি প্রেসের মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত ছিল। এই মামলায় 'বঙ্গবাসী' কে আর্থিক সাহায্য করার জন্য বহু পত্রিকা এগিয়ে এসেছিল। প্রচণ্ড ব্রিটিশবিরোধী এই আন্দোলন ভবিষ্যৎ স্বদেশী আন্দোলনেব ভিত্তি প্রস্তুত করে "There were an upsurge of National pride which would glorify all that was Indian."[১৮]

ভারতীয় নারীর বিষয়ে বিদেশী শাসক হস্তক্ষেপ করবে এটা সহ্য করতে পারেনি ভারতীয়রা, প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। কিন্তু এত সব করেও বিজেতা জাতির দ্বারা মেয়েদের অপমানিত হওয়া বন্ধ করা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯২৪ সালে ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর বার্ষিক কুচকাওয়াজ উপলক্ষ্যে বাংলার ছোটলাট লিটন বলেছিলেন, ভারতীয় মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা উস্কানি পেয়ে পুলিশকে শাস্তি দেওয়ানোর জন্য

নিজেদের উপরে দৈহিক অত্যাচার হওয়ার মিথ্যা অভিযোগ আনে। এই উক্তিতে ভারতীয়রা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকাও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে আয়োজিত প্রতিবাদ সভার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেয় সাপ্তাহিক 'শ্রীসনাতনধর্ম' গান্ধী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারাও ছোটলাটের উক্তির[১৯] সমালোচনা করেন।[২০]

আমেরিকান মহিলা মিস ক্যাথারিন মেয়োর লেখা "মাদার ইণ্ডিয়া" পুস্তকে ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে যেসব অপমানজনক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট লেখিকা ও রাজনৈতিক নেত্রী চন্দ্রাবতী লখনপাল "মাদার ইণ্ডিয়া কা জবাব" (১৯২৭) নামে বই লিখেছিলেন।[২১] উমা নেহরুও 'মাদার ইণ্ডিয়া'র প্রত্যুত্তরে বই লিখেছিলেন।[২২] বইটিতে 'মাদার ইণ্ডিয়া'-র প্রতিবাদে গান্ধী, লালা লাজপতরাই, কে. নটরাজন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায়, মিস মেয়োর লেখা বইটি ভারতীয়দের কতটা ক্ষুব্ধ করেছিল। কলকাতার হিন্দি কাগজগুলিও অর্থাৎ 'সমন্বয়', 'হিন্দুপঞ্চ', 'বিশ্বমিত্র', 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ'। 'নবযুগ' প্রভৃতিও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।[২৩]

ভারতীয় নারীসমাজ অত্যন্ত হীন এবং নিন্দার্হ জীবনযাপন করে, তাদের মধ্যে নৈতিকতার চিহ্নমাত্র নেই, তাদের সন্তানরাও তাদেরই মত - মিস মেয়োর এই বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের বর্বর ও স্বাধীনতালাভের অযোগ্য বলে বিশ্বের মানুষের সামনে উপস্থাপিত করা একথাই বলেছিল হিন্দি পত্রপত্রিকাগুলি।[২৪] 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইটি কলকাতায় বিক্রি হওয়ার কথা জানিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দি মাসিক 'সমন্বয়'।[২৫] 'সমন্বয়' লিখেছিল, "কুকুরকে যদি রাজা বানানোও হয়, সে চিৎকার করতে ভুলবে কি? ....এদেশে মিস মেয়োর দুই-চারটি পরম বন্ধু আছে, যারা পাশ্চাত্যের রঙীন পোশাকে মোড়া সভ্যতাকেই সর্বদা কল্যাণকর মনে করেন, তাদের আমরা বলতে চাই, ভারতে কিছু হীন বস্তু থাকতে পারে। .... কিন্তু তারা কী জানে না, শুধু ভারতের হিন্দুরাই সব দেশের সব বয়সের মেয়েদের 'মাতৃসম্বোধন' করেছে?"[২৬]

গান্ধীপত্নী কস্তুরবা 'হিন্দুপঞ্চ' পত্রিকায় চিঠি লিখে জানান যে, 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকের উপযুক্ত জবাব দিতে গেলে মানুষকে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটি পড়তে হবে।[২৭]

'বিশ্বমিত্র' পত্রিকা লিখেছিল, 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইটির প্রকাশক মিষ্টার জোনাথন কেপ বলেছেন, বইটি নিয়ে এত গোলমাল হবে তিনি ভাবতে পারেননি। তিনি বলেছেন, কয়েকজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তিনি বইটি ছেপেছেন, যাদের একজন

হলেন ভ্যালেন্টাইন চিরোল।[২৮] 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' লিখেছিল, "মিস মেয়োর দেশ আমেরিকায় ১০ লক্ষ নারী দেহব্যবসার দ্বারা উদরপূর্তি করে"।[২৯]

তবে মিস মেয়োর বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেও কলকাতার বেশ কয়েকটি হিন্দি পত্রপত্রিকা ভারতীয় নারীর দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত ছিল। যে চিত্র তারা তুলে ধরেছিল মিস মেয়োর আঁকা চিত্রের সঙ্গে তার কোথাও কোথাও মিল ছিল। ঐ পত্রিকাগুলি ভারতীয় নারীর দুর্দশার কথা বলেই নিবৃত্ত হয়নি, তার প্রতিকারেরও পন্থানির্দেশ করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, মিস মেয়ো যদি ভারতের দুর্দশায় এতই কাতর হয়ে থাকেন, তাহলে সে দুর্দশা মোচনের জন্য নিজে সচেষ্ট না হয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করছেন কেন? মিস মেয়ো অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় নারীর হীন অবস্থানকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবেন এটা সহ্য করতে পারেনি হিন্দি পত্রিকাগুলি।

তবে এটাও ঠিক যে, ভারতীয় নারীর লজ্জা ও গৌরবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল কলকাতার হিন্দি পত্রজগত। সেজন্যই কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন প্রকারের নারী এবং নারী সংক্রান্ত বহু বিষয় আলোচিত হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল ব্যভিচার এবং তজ্জনিত নারী নির্যাতন। মারবাড়ী সমাজে ব্যভিচার খুব বেশী মাত্রায় রয়েছে এ বক্তব্য রেখেছিল এলাহাবাদের প্রখ্যাত হিন্দি মাসিক 'চাঁদ'।[৩০] উপরোক্ত বক্তব্য হিন্দি পত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'চাঁদ' এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ফলে বাংলা সরকার 'চাঁদ'-এর মারবাড়ী বিশেষাঙ্ক অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রকাশক ও সম্পাদককে অভিযুক্ত করে জামিনে ছেড়ে দেয়।[৩১]

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, কলকাতার বেশীর ভাগ হিন্দি পত্রপত্রিকাই ব্যভিচার ও মেয়েদের প্রতি অত্যাচারকে তুলে ধরার একটি মঞ্চ ছিল। 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' রাজস্থানের চুরুর এক পুরোহিত গোপালদাসের লাম্পট্যের শিকার বিধবা যুবতী সরস্বতীর হৃদয়বেদনাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে গোপালদাসের কঠোর শাস্তির দাবী তুলেছিল। 'চাঁদ' গেপি মারবাড়ী সমাজকে দুশ্চরিত্র বলায় আপত্তি ছিল[৩২] কলকাতার 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' এর মত পত্রিকার।

কলকাতার মারবাড়ীদের একটি উপাসনাগৃহ গোবিন্দভবনের মুখ্য মহান্ত হীরালাল গোয়েঙ্কার ব্যভিচারের কাহিনী প্রকাশ করে ধিক্কার জানিয়েছিল 'হিন্দুপঞ্চ', 'মতবালা' এবং 'মারবাড়ী অগ্রবাল' পত্রিকা। গান্ধীকেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তিনি 'হিন্দি নবজীবন'-এ[৩৩] 'ভক্তির নামে ভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে মেয়েদের জীবিত পুরুষকে ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন। গান্ধীর রচনাটি 'হিন্দুপঞ্চ' পুনর্মুদ্রণ করে।[৩৪]

আলোচ্য কালপর্বে নারীর জীবন সম্বন্ধে বুঝতে গেলে সে বিষয়টি আলোচনা করা অবশ্য প্রয়োজন সেটি হল বিবাহ। হিন্দি পত্রপত্রিকার বৈবাহিক বিজ্ঞাপনগুলি থেকে এর একটি ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালের 'সাপ্তাহিক বিশ্বমিত্র' তে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় — "১২ বছরের মারবাড়ী অগ্রবাল কন্যার জন্য স্বচ্ছল পরিবারের ধার্মিক, পর্দাবিরোধী, শিক্ষিত, সদাচারী, খাদিপ্রেমী, ১৬ থেকে ২০ বছরের সুযোগ্য পাত্র চাই। কন্যা হিন্দিতে বিদ্যাবিনোদিনী পরীক্ষা পাশ, হারমোনিয়াম, সাঁতার, অশ্বারোহণ ও গৃহকর্মে দক্ষ কন্যার ১৪ বৎসর বয়সের আগে বিবাহ হবে না। বিবাহে অনর্থক অর্থব্যয় না করে কন্যাকে ৩০,০০০ টাকা স্ত্রীধন রূপে দেওয়া হবে।" 'বিশ্বমিত্র' তে এই ধরনের অনেক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৫]

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটিতে পাত্রীপক্ষ স্বচ্ছল এবং মানসিকতার দিক থেকে গান্ধীবাদী। যে সময় বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে তার ঠিক পূর্বেই অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শারদা আইন পাশ হয়েছে। শারদা আইনের নিয়ম মেনেই বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের[৩৬] 'যোগাযোগ' উপন্যাস ৩৩দিনে হিন্দিতে অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখান হয়েছে যে, অসম প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষ[৩৭] বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে সে বিবাহ সার্থক হতে পারে না। হিন্দিতে অনুদিত হওয়ার ফলে হিন্দিভাষী পাঠক সমাজ এ বিষয়ে অবহিত হয়েছিল।

এর অনেকদিন পরে 'অলমস্ত' পত্রিকায় শ্রীমতী সূর্যকুমারী এম. এ. 'স্ত্রিয়াঁ ক্যা চাহ্‌তী হ্যায়' প্রবন্ধে বলেছেন, পুরুষদের উচিত নারীর মানসিকতা বুঝে তবেই তাকে জীবনসঙ্গিনী বেছে নেওয়া। পুরুষদের এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, নারী আর দাসী নেই; সে নিজের মতামত জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে শুরু করেছে। সে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবী করছে। পুরুষের উচিত পত্নীর মধ্যে যোগ্য সহচরীকে খুঁজে নেওয়া। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রভু-দাসীর সম্পর্ক এখন অচল হয়ে গেছে, আর ঐ ধরনের সম্পর্ক মোটেই আদর্শ দাম্পত্যজীবনের ছবি নয়।[৩৮]

শারদা আইন নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল পক্ষে এবং বিপক্ষে। 'বিশ্বমিত্র', সাপ্তাহিক 'হিন্দুপঞ্চ', 'সাপ্তাহিক অগ্রসর' প্রভৃতি শারদা আইনের পক্ষে এবং 'ভারতমিত্র', 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি পত্রিকা এর বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিল।

শুধু বিবাহ নয়, বিবাহিতা নারীর দুর্দশাও তুলে ধরেছিল পত্রপত্রিকাগুলি। সাপ্তাহিক 'লোকমান্য' লিখেছিল, মারবাড়ী স্ত্রীলোকদের আলোচ্য বিষয় হল, শাড়ি, গয়না, ছেলেমেয়ের বিঁয়ে, কোনও আত্মীয়ের পুত্রসন্তান না হওয়া ইত্যাদি। কলকাতার মারবাড়ী মেয়েরা অন্ধকার, বদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর বাড়িগুলিতে থাকে বলে তাদের দ্রুত স্বাস্থ্যহানি হয়। তাদের লেখাপড়া, খালি হাতে ব্যায়াম, পর্দাপ্রথার বিরোধিতা এবং সভ্যসমাজের

উপযুক্তভাবে শাড়ি পরা শেখানো দরকার।[৩৯] প্রভা খেতানের সাম্প্রতিককালে লেখা উপন্যাস 'পীলী আঁধী' তে এসম্পর্কে প্রায় বাস্তবানুগ চিত্র পাওয়া যায়। মূলচন্দ্র অগ্রবালের আত্মজীবনী 'পত্রকার কী আত্মকথা' তেও একই বক্তব্য আছে।

সাপ্তাহিক 'বিশ্বমিত্র' গান্ধীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, সেখানে গান্ধী মেয়েদের গয়না না কিনে ব্যাঙ্কে স্ত্রীধন রূপে টাকা রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। বিবাহের উৎসবে মারবাড়ী মেয়েদের মূল্যবান অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে[৪০] রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে যাওয়ার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ'। লিখেছিল, মেয়েরা যদি এমন আচরণ করে তাহলে তাদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না।[৪১]

কেমন আচরণ মেয়েদের করতে হবে সেটা তারা লেখাপড়া না শিখলে কিছুতেই বুঝতে পারবেনা। সেজন্য পত্রপত্রিকাগুলি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের পক্ষে সোচ্চার হয়েছে। অত্যাবশ্যক স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন অনেক বেশী জোরদার করতে হবে বলে মন্তব্য করেছে 'সরোজ' পত্রিকা। 'লোকমান্য' পত্রিকা গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের[৪২] প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল। 'বিশাল ভারত' পত্রিকা লিখেছিল, সহশিক্ষা দরকার কারণ তাহলেই[৪৩] স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক হবে সহজ ও স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় আদর্শ মিলিয়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষাপ্রণালী।[৪৪] প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছিল 'সমন্বয়'। এবিষয়ে খুবই আধুনিক বক্তব্য রেখেছিলেন 'বিশ্বমিত্র' পত্রিকার সম্পাদক 'মূলচন্দ্র অগ্রবাল'। ১৯৩৫ সালে অখিল ভারতবর্ষীয় মারবাড়ী অগ্রবাল মহাসভার সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, স্ত্রী শিক্ষারও ব্যবহার হচ্ছে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য - তার মনের মত নারী সৃষ্টি করতে — নারীর নিজের উন্নতির জন্য নয়। তিনি বলেন যে, ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের উচিত সমান অর্থব্যয় করা।[৪৫]

কেবলমাত্র শিক্ষা নয়, নারীদের দৈহিক শক্তি এবং সাহস বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিল হিন্দি পত্রপত্রিকাগুলি। 'বিশ্বমিত্র' লিখেছিল, নারী যদি দৈহিকভাবে শক্তিশালী হয়, তবেই সে ধর্ষণকারীদের প্রতিহত করতে পারবে।[৪৬] ডায়মণ্ডহারবারের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে শীতলমণি দাসী কর্তৃক তার ধর্ষণকারীকে ধারালো অস্ত্রাঘাতে আহত করার ঘটনাটি প্রশংসার সঙ্গে উদ্ধৃত করে 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' ও 'মতবালা' পত্রিকা।[৪৮] তবে নারীর সাহস ও তার সতীত্ব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ রূপেই দেখান হয় কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকায়। এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পতিশোকে পত্নীরও মৃত্যু হওয়ার সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আদর্শ পতিব্রতা' নাম দিয়ে।[৪৯] তবে নারীসম্পর্কে চিন্তাভাবনা অনেকটাই যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ধর্ষিতা নারী তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী নয়, এবং ধর্ষণে নারীর সতীত্বনাশ হয় না, এই বক্তব্যই রেখেছিল 'অগ্রসর' এর মত প্রগতিশীল পত্রিকা থেকে শুরু করে 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' এর মত রক্ষণশীল পত্রিকাও।[৫০]

কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দি পত্রপত্রিকাগুলি সাধারণভাবে যেকোন পরিবর্তনেরই বিরোধী ছিল। বিধবা বিবাহের বিষয়টিও এর মধ্যে পড়ে। বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র বিধবাবিবাহকে মেনে নিতে বলেছিলেন, মূলত সামাজিক অনাচার বন্ধ করার জন্য।[৫১]

বিধবাসমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়, তা নিয়ে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে মতভেদ ছিল। অবশ্য রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় পত্রপত্রিকার বক্তব্য ছিল, বিধবার সংখ্যা যাতে না বাড়ে তার চেষ্টা করতে হবে। বাল্যবিবাহই বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী এই মর্মে 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ' একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল।[৫২] প্রগতিশীল পত্রিকাগুলি বিধবাবিবাহের প্রবল সমর্থক ছিল। এখানে রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। 'মতবালা' 'বিশ্বমিত্র' প্রভৃতি পত্রিকা বিধবাবিবাহের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল।[৫৩]

পণপ্রথা নিয়ে পত্রপত্রিকায় বরাবরই লেখালেখি চলত। 'সরোজ' পত্রিকা এই মর্মে একটি খবর দিয়েছিল যে, বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলায় কিছু রাজপুত কন্যাসন্তান জন্মালে গোপনে হত্যা করে। ১৯২৮ সালে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিহারের রাজপুত যুবকরা আন্দোলন শুরু করলে এবিষয়ে জানাজানি হয়। পণপ্রথাকে এই শিশুকন্যা হত্যার জন্য দায়ী করেছে 'সরোজ'।[৫৪] ১৯৩৯ সালে 'বিশ্বমিত্র' পণপ্রথাবিরোধী বিলকে স্বাগত জানায়। ঐ বিল সিন্ধুপ্রদেশের অ্যাসেম্বলীতে পাশ হয়েছে, সেখানে পণ নেওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে ঐ আইনভঙ্গকারীদের একমাস জেল ও ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সুপারিশ করা হয়েছে। 'বিশ্বমিত্র' লিখেছে, বঙ্গদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশে পণপ্রথার জুলুম বেশী। বঙ্গদেশে এই প্রথার জন্য কুলীন বংশগুলির অবস্থা শোচনীয়।[৫৫] 'লোকমান্য' পত্রিকা লিখেছে, বঙ্গদেশ শিক্ষায় সবথেকে অগ্রসর হলেও এখানেই পণপ্রথার জুলুম খুব বেশী। বৈবাহিক বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখা যায়, পাত্রের বিলেত যাওয়ার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ পাত্রীপক্ষের কাছে দাবী করছে।

পণপ্রথা নিয়ে বারবার আলোচনা হলেও হিন্দুনারীর সম্পত্তির অধিকারের বিষয়টি কিন্তু অনেক পরে কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। 'বিশালভারত' পত্রিকায় ১৯৪০ সালে লেখা হয়েছিল, অনেক আন্দোলন করেও যখন পণপ্রথা ওঠানো যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বিয়ের সময় পণের অর্থ স্ত্রীধন রূপে কন্যার সম্পত্তি হিসাবে লেখাপড়া করে দেওয়া উচিত।[৫৬]

নারীর পশ্চাদপদ অবস্থার একটি কারণ ছিল, পর্দাপ্রথা। গান্ধী 'Young India' তে

লিখেছিলেন, পর্দাপ্রথার সঙ্গে নৈতিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। পতিব্রতা সীতাদেবী এবং গর্বিতা দ্রৌপদীর সময়ে পর্দাপ্রথার অস্তিত্ব ছিল অসম্ভব।[৫৭] 'মারবাড়ী অগ্রবাল' -এ জনৈকা লেখিকা সাবিত্রী একই মতের প্রতিধ্বনি করেছেন।[৫৮] পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকায় তীব্র আন্দোলন দেখা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। 'নবযুগ' পত্রিকা 'পর্দানির্বারক অঙ্ক' প্রকাশ করেছিল। সেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও প্রদেশের পর্দাপ্রথা নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৫৯] 'মারবাড়ী অগ্রবাল'-এ মোতিলাল লাঠ পর্দার ইতিহাস, পর্দা থাকাব জন্য মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের হানি এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার কথা ব্যাখ্যা করেন।[৬০] 'সরোজ' পর্দাপ্রথার সঙ্গে মেয়েদের বেশীমাত্রায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার অমোঘ সম্পর্কের কথা লিখেছিল।[৬১]

একান্তবর্তী পরিবারের বিষয়টিও হিন্দি পত্রপত্রিকায় আলোচিত হয়েছিল। 'বিশ্বমিত্র' পত্রিকায় 'সমাজকা অগ্নিকুণ্ড' বিভাগে সাহারানপুরের এক গৃহবধূর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে তিনি একান্নবর্তী পরিবার কর্তৃক তার ও তার স্বামীর অত্যাচারিত হওয়ার কথা লিখেছেন। যদিও তার স্বামীর উপার্জনে সংসার চলে, এবং তাকে সংসারের জন্য ভোর থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়, তা স্বত্ত্বেও পণ না পাওয়ার জন্য তাকে অহরহ শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে তার স্বামী নিজের বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে পৃথক থাকতে চায় না। এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বধূটি এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় জানতে চেয়েছিল।[৬২]

এর দশ বছর পরে প্রকাশিত রাজেন্দ্র যাদবের 'সারা আকাশ' উপন্যাসে যেন এই চিঠিটিরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। লেখক নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের এক শ্বাসরোধকারী ভয়াবহ অবস্থার মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন। লেখক তাদের জীবন, যৌবন ও স্বপ্ন একান্নবর্তী পরিবারের তীব্র নিষ্পেশণে কিভাবে শেষ হয়ে গেল তা দেখিয়েছেন।

'বিশ্বমিত্র' পূর্বোক্ত চিঠির উত্তরে একান্নবর্তী পরিবারকে একটি যাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করেছে। যেখানে বিভিন্ন স্বভাব, রুচি ও চিন্তাধারার মানুষ একত্রে বাস করে। এই একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থাকে এক অসঙ্গত ব্যবস্থা বলেছেন সম্পাদক। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়েছে, এবার এর সঙ্গে জড়িত একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থাও ধ্বংস হতে বাধ্য। এই প্রথার সবচেয়ে বিচিত্র এবং অন্যায় বিষয়টি হল, একজন সদস্য উপার্জন করবে, তার অর্থে অন্যরা জীবিকানির্বাহ করবে, আবার সেই উপার্জনকারী সদস্যের স্ত্রীকেই সংসারে ক্রীতদাসীর মত থেকে গালি শুনতে হবে। যদি শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রবধূকে কন্যার মত না দেখে, তাহলে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে বাধ্য। পত্রিকাটির মতে, লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী একান্নবর্তী পরিবারে অত্যাচারিত হচ্ছে।[৬৩]

'সাম্যবাদী' এলাহাবাদের একটি মেয়ের সতী হওয়ার প্রশংসা করেছিল।[৬৪] ভারতীয় নারীর মহত্তম আদর্শ ছিল স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা। নারীর উন্নয়ন ছিল কাঙ্খিত, কিন্তু উন্নত নারীদের আদর্শ ছিল সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীরা।[৬৫] নারীরা সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করবে। ভারতবর্ষের উন্নত নারীরাই শক্তির মূর্ত রূপং মহৎ হওয়ার জন্য তারা নিজেদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে প্রস্তুত। পাশ্চাত্যের চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের থেকে এক্ষেত্রে তারা পৃথক। অন্তত এই জায়গায় তাদের অবস্থান তাদের বিজেতা জাতির থেকে উচ্চে। হয়ত এজন্যই উচ্চশিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত 'সাম্যবাদী' পত্রিকা ভারতীয় নারীদের সতীত্বকে তুলে ধরার প্রবণতা ত্যাগ করতে পারেনি। কিন্তু উমা নেহরুর মত নারী, যিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করাকে অবাস্তব ভেবেছিলেন। তার মতে, যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে ভারতীয় নারীর ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়েছে।[৬৭]

মাসিক 'অলমস্ত'তে স্বাধীনতার আগে থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক জনার্দন মিশ্র 'পঙ্কজ'-এর উপন্যাস "আজকী দুনিয়া" (হাহাকারময় জগৎ) তেও নারীর সংগ্রাম, বেদনা এবং কামনা-বাসনা বাস্তবসম্মতভাবে আঁকা হয়েছে। 'অলমস্ত' তেই প্রকাশিত জীতনারায়ণ প্রসাদের গল্প 'ধর্মকী ওটমে' (ধর্মের মুখোশে) তেও নারীর ইমেজে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। গল্পের নায়িকা শীলা কখনোই তার প্রেমিককে তাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করে না, নিজের পথ সে নিজেই বেছে নেয়। সে সমাজ বিনাদোষে তাকে ধর্ষকের হাতে তুলে দেয়, তারপর তার মাথায় আরোপ করে কলঙ্কের বোঝা, সেই সমাজের কাছে তার কোনও প্রত্যাশা নেই, সে সমাজের সে কেউ নয়, সে সমাজকে সে অস্বীকার করে — তাই তার মধ্যে ফেরার কোনও মোহ তার নেই। সে নিজের পথে একাই চলার সিদ্ধান্ত নেয় — সিনেমার অভিনেত্রী হয়।[৬৬] উভয় কাহিনীতে নারীচরিত্রগুলিকে প্রথমে মানুষ, তারপরে নারী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের পথে চলতে পারে।

'বিশ্বমিত্র' তে 'সমাজ কা অগ্নিকুণ্ড' বিভাগে বাংলায় খুব বেশী সংখ্যায় নারী অপহরণের খবর দিয়ে বলা হয়েছিল, এগুলির অধিকাংশই মুসলিম গুণ্ডাদের কাজ। বাংলায় মুসলিমের সংখ্যা বেশী হওয়াটা এর কারণ নয়। যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের কোথাও কোথাও ৭৫ শতাংশ মুসলিম থাকলেও সেখানে নারী অপহরণের সংখ্যা খুব কম। বাংলায় এসব ঘটনা ঘটছে পুরুষ জাতির কাপুরুষতার জন্য। পত্রিকাতে মেয়েদের অস্ত্র ও বাহুবলের সাহায্যে এসব প্রতিহত করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া তাদের পাশ্চাত্য ধরনের দৃষ্টি আকর্ষণকারী পোষাক বর্জন করতে বলা হয়েছে। পুরুষদের এমনকি প্রাণের

বিনিময়েও নারীহরণকারীদের বাধা দিতে বলা হয়েছে। ধর্ষণ ও অপহরণ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে কঠোরতম শাস্তিবিধান, সভা সমিতি ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এজাতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রকৃত মুসলমান কখনোই এসব অপরাধকে সমর্থন করবেন।[৮]

স্বাধীনতা সংগ্রাম নারীকে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে আসার একটি সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছিল, পথ প্রশস্ত করেছিল নারীমুক্তির। এই সংগ্রামে কলকাতার নারীদের অংশগ্রহণ এবং সে বিষয়ে হিন্দি পত্রপত্রিকাগুলি কী ভূমিকা পালন করেছিল তা বিশ্লেষণ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এলাহাবাদের 'গৃহলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকা লিখেছিল, 'দেশসেবা' ও 'পাতিব্রত্য ধর্ম' সমান মর্যাদালাভের যোগ্য।[৯] সত্যাগ্রহ আন্দোলন নারী আন্দোলনকে সংস্কারবাদী আন্দোলন থেকে এক বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণত করেছিল, যা থেকে পিছিয়ে আসার পথ ছিল না।[] 'কলকাত্তা সমাচার' এর মত রক্ষণশীল পত্রিকাও নারীদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পক্ষে ছিল।[১০] নারীদের রক্ষণশীলতার আবরণ ত্যাগ করে তারা কী করতে পারে তা জগৎকে দেখাতে বলা হয়েছিল। ১৯২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার 'নারী কর্মমন্দির' এর স্বেচ্ছাসেবিকারা বাড়ী বাড়ী চরখা ও খাদি দ্রব্যাদি বিক্রয় করেছিলেন।[] ঐ সংস্থার দুইশত মহিলা, যাদের মধ্যে ছিলেন চারুলতা দেবী, সুষমাদেবী এবং কিছু শিখ মহিলা একটি স্বদেশী মিছিল নিয়ে ভবানীপুর, কালীঘাট ও হাজরা রোড হয়ে প্রেসিডেন্সী জেল পর্যন্ত গিয়েছিলেন।[] জনৈকা কৌশল্যা দেবী একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন অসহযোগ এক অসাধারণ সুযোগ এনে দিয়েছে। যখন স্বামী পুত্ররা কারাগারে, তখন মেয়েদের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকলে চলবেন না। তিনি সমস্ত মহিলাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়েছিলেন,[১৩] এমনকি লক্ষ্ণৌর পতিতারাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।[১১]

নারীরা বহির্জগতে ব্যাপকভাবে এসেছিল আইনঅমান্য আন্দোলনের সময়ে। এই আন্দোলনে কলকাতার নারীরা যোগ দেয় বিপুল সংখ্যায়। ১৯৩৫ সালের 'বিশ্বমিত্র' পত্রিকা অনুযায়ী সমগ্র ভারতে কারাবরণকারী নারীদের সংখ্যা ছিল ৫০০০। উত্তর ভারতের প্রখ্যাত দেশনেত্রী এবং মহিলা কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহান ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে ঐ সময় যে কবিতা লিখেছিলেন, কলকাতার "বিশালভারত" পত্রিকা তা প্রকাশ করেছিল।[] কবিতাটির একটি পংক্তি শ্লোগানের মত ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে, ভারতীয় নারীকে টেনে এনেছিল ঘরের বাইরে; পংক্তিটি হল, "খুব লড়ী মর্দানী ওতো ঝান্সীওয়ালী রানী"।[]

পদ্মরাজ জৈনের কন্যা ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা ছিলেন বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা। তিনি একটি পুস্তিকা লিখে পুলিশদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে

নিজের দেশের মানুষের উপর অত্যাচার না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।[৭৭] মীরাবেন কলকাতায় এলে কলকাতার যশোদাদেবী তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ একটি মিছিলে অংশ নেন। এজন্য তাকে ২০ দিনের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। 'লোকমান্য' তার ফটোগ্রাফ প্রকাশ করে।[৭৮] কলকাতার মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য 'লোকমান্য' বোম্বাই ও মাদ্রাজের লবণ-সত্যাগ্রহী নারীদের ফটো প্রকাশ করেছিল।[৭৯] জাতীয় পতাকা বহন করে কলকাতার রাস্তায় যে শত শত হিন্দু মুসলিম নারী মিছিল করেছিল তাদের ফটো প্রকাশ করেছিল 'লোকমান্য'।[৮০] 'লোকমান্য' ১৬ জানুয়ারী, ১৯৩১ সালে বড়বাজারে পিকেটিং করার জন্য ধৃতদের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল তাতে ছিল মোতিবেন, মহালক্ষ্মী উপাধ্যায়, অন্তকবেন, শোভারানীদেবী, সরযূবালা দেবী ইত্যাদির নাম।[৮১]

'লোকমান্য' চেয়েছিল নারীদের আইন অমান্য আন্দোলনে নিয়ে আসার আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে। মুনশী প্রেমচন্দ্রের 'আহুতি' গল্পটি হয়ত এই উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল ঐ পত্রিকায়।[৮২] গল্পের নায়কা কলেজ ছাত্রী রূপমণি ধনী সহপাঠী আনন্দের প্রতি আগ্রহী হয় না, কারণ আনন্দ কংগ্রেস ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েই দেশের প্রতি কর্তব্য সমাধা করে। রূপমণি আকৃষ্ট হয় দরিদ্র সহপাঠী বিশ্বম্ভরের প্রতি, যেহেতু বিশ্বম্ভর কংগ্রেস কর্মীদের দলে নাম লিখিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ায়। 'লোকমান্য' হয়ত চাইছিল রূপমণির মত মেয়েদেব।

সূত্র-নির্দেশ

১। *সোমপ্রকাশ*, ২৮ অক্টোবর, ১৮৬০, কলকাতা

২। *ভারতমিত্র*, ২ জুন ১৮৭৮, কলকাতা

৩। Tanika Sarkar - *Hindu wife, Hindu Nation Community, Religion and Cultural Nationalism,* P-23, New Delhi, 2001

৪। 'মিহির ও সুধাকর' ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১, কলকাতা

৫। *ইন্দুপ্রকাশ*, ৯ জানুয়ারী ১৮৯১

৬। Tanika Sarkar, "Rhetoric against Age of Consent : Resisting Colonial Reason and death of a child wife", *Economic and Political Weekly*, 4 sept, 1993, P.1870.

৭। *ভারতমিত্র*, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ R.N.P. File No. 7 of 1891, West Bengal State Archives.

৮। এদের মধ্যে ছিল সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ছাড়াও 'বঙ্গবাসী', 'হিন্দি বঙ্গবাসী' 'দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'Telegraph' কলকাতা

৯। *হিন্দি বঙ্গবাসী*, ৬ এপ্রিল ১৮৯১, R.N.P. File No. 5 of 1891, Part II, West Bengal State Archives.

৯. ক। *আর্যাবর্ত*, ২৪ জানুয়ারী, ১৮৯১

১০। 'আখবার-ই-আম লাহোর; 'পৈসা-আখবার', লাহোর; 'সঞ্জীবনী', 'সময়', 'সুরভি ও পতাকা', কলকাতা; 'হিন্দোস্তান' কালাঙ্কাকর

১১। ১২ বছরের কম বয়সী ফুলমণির সঙ্গে তার তিনগুণ বয়সের স্বামীর সহবাসের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ফুলমণির মৃত্যু হয়েছিল। এবিষয়ে মামলা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য তণিকা সরকারের 'Hindu Wife Hindu Nation' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ বিবরণ ১৮৯১ সালের *বঙ্গবাসী* ও *হিন্দি বঙ্গবাসী* পত্রিকায় আছে

১২। *'আর্যাবর্ত'*, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১, R.N.P. File No. 8 of 1891, West Bengal State Archives.

১৩। Tanika Sarkar, Hindu Conjugality and Nationalism in the late nineteenth century Bengal in "*Indian Women - Myth and Reality,*" ed. Jasodhara Bagchi, P-28, Hyderabad, 1995.

১৪। Prem Narain - Press and Politics in India, P-178, Delhi, 1970

১৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থখণ্ড, মুক্তি সংগ্রাম পৃষ্ঠা ৪৬২, কলকাতা ২০০০।

১৬। Native Newspapers File 1891, West Bengal State Archives.

১৭। Lansdown's Minute 15 September 1890, National Archives of India, Microfilm.

১৮। Prem Narain, পূর্বোক্ত।

১৯। সাপ্তাহিক *'শ্রীসনাতনধর্ম'* ২৩ আগস্ট ১৯২৪, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৯, কলকাতা

২০। 'Adding Injuries to Insult' *The Hindu*, August 29, 1924, Madras; সনৎকুমার বাগচী, *রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ*, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

২১। Francesca Orsini, *The Hindi Public Sphere 1920-40 Language and Literature in the Age of Nationalism,* P-406, New Delhi, 2002.

২২। Madhavi Yasin - Hindu Womens' Struggle for Rights as reflected in Hindi Journals (1918-1941), *The Quarterly Review of Historical Studies*, Vol. XL, PP 43-55, October 2000-March 2001, Nos. 3 & 4., Kolkata.

২৩। রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দি মাসিক *সমন্বয়*, পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৬; কলকাতা; কার্ত্তিক বিক্রম সম্বত ১৯৮৪

সাপ্তাহিক 'হিন্দু পঞ্চ', পৃষ্ঠা ৪৫, কলকাতা, ১ জানুয়ারী ১৯২৮ ঐ, পৃষ্ঠা ১০, ২৬ এপ্রিল ১৯২৮;

সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, পৃষ্ঠা ৩৩, কলকাতা, হোলি-বিক্রম সম্বত ১৯৮৩; সাপ্তাহিক *মারবাড়ী ব্রাহ্মণ*, পৃষ্ঠা ৪, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭; মাসিক *নবযুগ*, পৃষ্ঠা ১৪৩, কলকাতা, নভেম্বর ১৯২৮

২৪। *নবযুগ*, কলকাতা, নভেম্বর ১৯২৮
২৫। *সমন্বয়*, পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৬, কার্ত্তিক, বিক্রম সম্বত, ১৯৮৪
২৬। পূর্বোক্ত
২৭। সাপ্তাহিক *হিন্দুপঞ্চ* 'পঞ্চরাজ কীড়াক', পৃষ্ঠা ৪৫, ১২ জানুয়ারী ১৯২৮
২৮। সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, পৃষ্ঠা ৩৩, হোলি বিশেষাঙ্ক, বিক্রম সম্বত ১৯৮৩
২৯। সাপ্তাহিক *মারবাড়ী ব্রাহ্মণ*, পৃষ্ঠা ৪, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭
৩০। *চাঁদ*, এলাহাবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯২৭
৩১। সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, ২৫ মার্চ ১৯৩০
৩২। *মারবাড়ী ব্রাহ্মণ*, ২৫ অক্টোবর, ১৯২৬
৩৩। সাপ্তাহিক *হিন্দুপঞ্চ* ১৭ মে, ১৯২৮, 'মারবাড়ী অগ্রবাল' কলকাতা, এপ্রিল মে ১৯২৮
৩৪। *হিন্দুপঞ্চ* ২৪ মে ১৯২৮
৩৫। সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, পৃষ্ঠা ৩০, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০
৩৬। ১৯২৯ সালে Child Marriage Restraint Act দ্বারা ১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে কন্যার এবং ১৮ বৎসর বয়সের পূর্বে পুত্রের বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৫৬২
৩৭। মাসিক *বিশালভারত*, কলকাতা-র জুলাই ডিসেম্বর ১৯৩০ -এর সংখ্যাগুলিতে তার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।
৩৮। মাসিক *অলমস্ত*, পৃষ্ঠা ৯, কলকাতা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭
৩৯। হীরালাল গুপ্ত "মারবাড়ী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে" সাপ্তাহিক *লোকমান্য*, পৃষ্ঠা ৪, কলকাতা, ৭ এপ্রিল, ১৯৩০
৪০। সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, পৃষ্ঠা ৩১, ২৮ জানুয়ারী ১৯৩০
৪১। সাপ্তাহিক *মারবাড়ী ব্রাহ্মণ* পৃষ্ঠা ৩, ১৫ মার্চ, ১৯২৬
৪২। মাসিক *'সবোজ'* পৃষ্ঠা ৮৫৬, কলকাতা, বৈশাখ, বিক্রমসম্বত ১৯৮৬
৪৩। বেগম আমীরুদ্দীন - "বয়স্ক শিক্ষা এবং নারীরা", সাপ্তাহিক *'লোকমান্য'*, পৃষ্ঠা ১৩, কলকাতা, ১২ মে, ১৯৩৯
৪৪। 'স্ত্রীশিক্ষণ এবং সহশিক্ষা' মাসিক 'বিশালভারত', কলকাতা, জুলাই ১৯৪০
৪৫। মাসিক *সমন্বয়*, পৃষ্ঠা ১৮৪, বৈশাখ বিক্রমসম্বত ১৯৮৪
৪৬। *'মারবাড়ী অগ্রবাল'* ১৯৩৫, অস্পস্ট ছাপার জন্য তারিখ বোঝা যায়নি।
৪৭। *'মহিলামণ্ডল'* বিভাগ সাপ্তাহিক বিশ্বমিত্র পৃষ্ঠা-৮, ৬ জুন ১৯৩৯
৪৮। সাপ্তাহিক *'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ'* পৃষ্ঠা ১, ৩ আগস্ট ১৯২৬ 'মতবালা', পৃষ্ঠা ৯ ১৪ আগষ্ট ১৯২৬
৪৯। সাপ্তাহিক 'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ', পৃষ্ঠা ১, ৩০ আগস্ট ১৯২৬
৫০। সাপ্তাহিক *'অগ্রসর'*, কলকাতা, ২১ জানুয়ারী ১৯২৫; *'মারবাড়ী ব্রাহ্মণ'* ৩ আগস্ট ১৯২৬
৫১। কবিবচনসুধা, বারাণসী, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭১
৫২। সাপ্তাহিক *মারবাড়ী ব্রাহ্মণ*, ২ মে, ১৯২৭
৫৩। সাপ্তাহিক *'মতবালা'*, পৃষ্ঠা ৮১৮, কলকাতা, ৬ জুন, ১৯২৫; সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, ১৩ জুন ১৯৩৯

৫৪। মাসিক *'সরোজ'* পৃষ্ঠা ৫৭৪, পৌষ বিক্রমসম্বত ১৯৮৫
৫৫। সাপ্তাহিক *বিশ্বমিত্র*, ১৩ জুন, ১৯৩৯
৫৬। মাসিক *'বিশালভারত'* সেপ্টেম্বর ১৯৪০
৫৭। সাপ্তাহিক *'মতবালা'* পৃষ্ঠা ১১৩৭, ১৪ মে, ১৯২৭
৫৮। *'মারবাড়ী অগ্রবাল'* পৃষ্ঠা ৪৯৬, মার্গশীর্ষ বিক্রম সম্বত ১৯৮৫
৫৯। *'নবযুগ'*, পর্দা-নিবারক অঙ্ক, ১৯২৮
৬০। *'পর্দা'*, প্রবন্ধ, মারবাড়ী অগ্রবাল, ১৯৩৫ তারিখ অস্পষ্ট
৬১। মাসিক *'সরোজ'*, অগ্রহায়ণ বিক্রম সম্বত ১৯৮৫
৬২। *বিশ্বমিত্র*, পৃষ্ঠা ৫, সেপ্টেম্বর ১৯৪২
৬৩। *বিশ্বমিত্র*, পূর্বোক্ত
৬৪। *'সাম্যবাদী'* কলকাতা, ১৮ জুন ১৯২১
৬৪ক। Orsini - The Hindi Public Sphere, pp 289-308.
৬৫। Madhavi Yasin - Hindu Womens.
৬৬। *'অলমস্ত'*, পৃষ্ঠা ২৫-২৮, নভেম্বর ১৯৪৭
৬৭। 'সাপ্তাহিক বিশ্বমিত্র' পৃষ্ঠা ৫, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২
৬৮। Orsini - The Hindi Public Sphere P.265
৬৯। Madhavi Yasin - Hindu Womens. P. 49.
৭০। *'কলকাতা সমাচার'*, ২৭ জুলাই ১৯২৪
৭১। সাপ্তাহিক *'স্বতন্ত্র'*, কলকাতা, ৪ জানুয়ারী ১৯২২
৭২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩, ৮ জানুয়ারী, ১৯২২
৭৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬।
৭৪। পূর্বোক্ত, ১৯ জানুয়ারী ১৯২২
৭৫। *'বিশালভারত'* ফেব্রুয়ারী ১৯২৯
৭৬। ভুবনেশ্বর গুরুমৈতা - আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য মে রাষ্ট্রীয় চেতনা, পৃষ্ঠা ৯৪, দিল্লী ১৯৯৪। কবিতাটি আছে সুভদ্রাকুমারীর লেখা *মুকুল* কাব্যগ্রন্থে। দ্রষ্টব্য 'মুকুল', সুষমা সাহিত্য মন্দির, জব্বলপুর, ১৯৪৪ পৃষ্ঠা ৫৫।
৭৭। সাপ্তাহিক *'লোকমান্য'* শ্রাবণ কৃষ্ণ ৪, সম্বত ১৯৮৩
৭৮। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
৭৯। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪, ১৭ জুন, ১৯৩০
৮০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮, ১৪ অক্টোবর ১৯৩০
৮১। Bengal Govt Intelligence Branch File No. 43/31 - Sl. No. 1-2.
৮২। সাপ্তাহিক *লোকমান্য*, ১ এবং ১০ ডিসেম্বর ১৯৩০

ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনাপর্বে মহিলা-রচিত সাহিত্যে নারীভাবনা ঃ ১৮৫০ - ৭০

সুমনা ঘোষাল

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পর সমাজ সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলন ও আলোচন সবচেয়ে বেশি আবর্তিত হয়েছিল মেয়েদের সামাজিক মর্যাদাকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই মেয়েদের উন্নতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাভাবনাটি ও সংস্কারকার্য সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমদিকে নারীর ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে পুরুষের ভূমিকা ছিল প্রধান। ধীরে ধীরে নারীরাও তাঁদের অধিকার অর্জনে তৎপর হয়েছেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মনোজগতে। এর পরিণতি চিন্তাজগতে পরিবর্তন ও মহিলাদের লেখনীধারণ।

খ্রিষ্টান মিশনারী ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদেরা এদেশের নারীদের নানা সমস্যার কথা অষ্টাদশ শতক থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণও নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ছাড়াও রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ, রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল, জয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জী, রাজকৃষ্ণ মুখার্জ্জী প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তিদের নারীশিক্ষার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেবার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা স্মরণীয়। কিন্তু শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টা নয়, মেয়েরাও নিজেদের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, কু-সংস্কারের মায়াজাল ছিন্ন করে, পর্দানশীন ধর্মভীরু মেয়েরা ন্যায়বাগীশ, নীতিশাস্ত্র মুখাপেক্ষি গোঁড়া পুরুষ সমাজের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজে পেতে অগ্রণী হন। তাদের মনোজগতে, চিন্তাজগতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। নিজেদের একাকীত্বের মধ্যে মেয়েরা বাধ্য হয়েছিল নিজেদের সম্বন্ধে আরো বেশী করে চিন্তা করতে। নিজস্ব অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে বুঝতে পেরে, তাদের নিজস্ব কিছু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে

থাকে। রক্ষণশীল পরিবারের পর্দানশীন মেয়েদের এই প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে।

তবে নব্যশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকেদের কেউ কেউ চেয়েছিলেন সহধর্মিণীকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে। আবার কোন কোন মেয়েরা নিজেদের একান্ত চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত দু-একটি পত্রিকায় (যেমন সমাচার দর্পণ) মহিলাদের নানা অভাব অভিযোগ, দাবী ও আবেদন স্পষ্ট হতে থাকে। এই সময় মহিলাদের সাহিত্য চর্চায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। কিন্তু ১৮৪৯ সালের ৭ মে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে দেখা দেয় সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশের বাসনা। অল্পদিনের মধ্যেই সংবাদ প্রভাকরে লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য বেথুন স্কুল-এর উদ্বোধন উৎসব সংঘটিত হবার তারিখেই সংবাদ প্রভাকরে একটি নয় বছরের মেয়ের লেখা কবিতা প্রকাশিত হয় (৭ মে, ১৮৪৯), যা মহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত সাহিত্যকর্ম। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকারূপে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ফলেই সৃষ্টি হতে শুরু করে মহিলারচিত সাহিত্য কর্মগুলি। শিক্ষার আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসারের ফলেই মহিলাদের আশা-আকাঙ্খা, ক্ষোভ-বিক্ষোভের তরঙ্গগুলি ক্রমশ সাহিত্যে দানা বাঁধে। যার প্রকাশ ঘটে ১৮৫২ সালে শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ঃ স্ত্রীলোকের শিক্ষার্থে বিরচিত' নামক গ্রন্থে।

বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যমে ভদ্রঘরের হিন্দুমেয়েদের ধর্মশিক্ষাবিহীন বিদ্যাপ্রদানের জন্য এবং মিশনারিদের আওতার বাইরে থাকার ফলে ধর্মান্তরীকরণের ভয় না থাকার জন্য — এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। "বেথুন নারীর অবগুণ্ঠনের বহর কমিয়ে দিয়ে তাদের জগৎ ও জীবনকে দেখার ও বোঝার, শক্তি ও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন।"[১] "ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনতিকাল মধ্যে আমরা কোন কোন ভদ্রমহিলাকে পর্দার অন্তরাল ভেদ করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তাহাদের রচিত কবিতাবলী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রে সাদরে গৃহীত হইতে থাকে।"[২]

কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ এবং এদেশীয় সমাজ সংস্কারকদের স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা নারীমনে কি প্রভাব ফেলেছিল এবং বাঙালী মেয়েদের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনা কি ছিল তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তাঁদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে

মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনালগ্নে মহিলা রচিত সাহিত্যে (১৮৫০-৭০) তৎকালীন সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ, সমাজে মেয়েদের অবস্থা এবং সেই অবস্থা থেকে উন্নতির উপায়, তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা, শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের সামগ্রিক ধারণা, নারীর অধিকার, মূল্যবোধ, অর্থাৎ সমকালীন মেয়েদের চাহিদা, অভাব-অভিযোগ, সমাজে তাদের স্থান প্রভৃতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য, বৈধব্য সর্বোপরি অশিক্ষা ও কুসংস্কার সমাজ জীবনকে যে কতখানি ক্লেদাক্ত করে তুলেছিল তার করুণ চিত্র যে সময়কার মহিলা লেখকদের রচনায় ছড়িয়ে আছে। এসব চিত্র পুরুষ কথিত নয়, নারীর নিজের জীবনের সমাজ অভিজ্ঞতার প্রকাশ। জীবনের কঠিন বাস্তবই তাঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। কাজেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বৈধব্য, পণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, বিধবাবিবাহ এবং নারীশিক্ষাই তাঁদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র এবং রচনার পরিধি। তৎকালীন মহিলা সাহিত্যিকরা তাই ভাবাবেগের উর্দ্ধে উঠে বলিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা কেবলমাত্র পরিস্থিতি, পরিবেশ ও সমস্যার কথাই তুলে ধরেননি, সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পথও তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য ১৮৫২ সালে শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' - গ্রন্থটি। ফুলমণি ও করুণা কাহিনীটির মুখ্য চরিত্র। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর রমণী হিসাবে এই চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব এবং তাদের সমস্যাবলী তৎকালীন সমাজেরই প্রতিফলিত চিত্র। যদিও গ্রন্থটিকে মৌলিক রচনা রূপে অনেকে স্বীকার করেন না; 'দি লাস্ট ডেইজ অব দি উইক' নামক ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ বলে মনে করেন তবুও "তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি বিদেশী গল্পটিকে এ দেশের উপেক্ষিত একটি সমাজ জীবনের উপর স্থাপন করে স্থানও কালগত বৈশিষ্ট্য আরোপে সক্ষম হয়েছিলেন"।[৫]

পরবর্তী রচনাটি হল ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী'। গদ্যে-পদ্যে রচিত এই গ্রন্থটিতে লেখিকা কৌলীন্য প্রথার দোষ তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে তিনি নারীর বেদনা ও নির্যাতনের কথাই বলেছেন। বাংলার কৌলীন্য প্রথা ও বাল্যবিধবা নিপীড়িত পরিবারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি নারীদের ক্ষোভ, বেদনা, অভিযোগ এবং আশা-আকাঙ্খার প্রথম সার্থক প্রয়াস বলা যায়।

১৮৬১ সালে প্রকাশিত 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে'— এই পুস্তকে বামাসুন্দরীদেবী নারীজাতির উন্নতির পথে অন্তরায়গুলোর কথা আলোচনা করেছেন। নারীশিক্ষা ও সমাজসেবা ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। নানা প্রকার সামাজিক বিরোধিতা সহ্য করেও তিনি সে যুগের নারীদের পথপ্রদর্শিকা ছিলেন।

তাঁর প্রবন্ধে তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের উপর জোর দিয়েছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন যে শুধুমাত্র জ্ঞানারোহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যোগ্য স্ত্রী হবার জন্যও যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। কৌলিন্যপ্রথার দোষ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখলেন, ''কৌলীন্য প্রথা এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে এদেশের অশেষ মঙ্গল সংসাধন হইতে পারে। ....বহু বিবাহকারী একটি পুরুষের মৃত্যু হইলে কত কত স্ত্রী বৈধব্যদশায় পতিতা হইয়া কী এক অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে থাকেন। অতএব এই বিবাহই সকল অনিষ্ট এবং সকল প্রকার অধর্মের প্রধান ভাণ্ডার হইয়াছে। ইহাকেই ভ্রূণহত্যা এবং ব্যভিচার দোষের আকর বলিয়া সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক।''[৪] এছাড়াও তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি দেশের তৎকালীন দূরবস্থার জন্য জাতাভিমানকেও দায়ী করেছিলেন।

এত গেল সামাজিক অনাচার, অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বামাসুন্দরী দেবীর সরব প্রতিবাদ। কিন্তু পরাধীনা নারীর অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর গভীর দুঃখ ব্যক্ত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দূরবস্থা মোচনের উপায় কী? — নামক পত্রে। মুঙ্গের থেকে তাঁর স্বামীর বন্ধু ওই স্থানের বর্ণনা করে তাঁকে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রটি তারই প্রত্যুত্তর। পত্রটিতে পরাধীনা নারীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে ব্যথা উঠে এসেছিল তা প্রকাশিত হয়েছে — ''আমরা এত পরাধীন যে আশা যাহাকে বলে তাহাও করিতে পারি না, ... আমাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্যই কি সৃষ্টি করিয়াছ?''[৫] আশাহীন, দেশভ্রমণের আনন্দলাভে বঞ্চিতা, সর্বদা, রান্নাঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধা নারীদের দূরবস্থার চিত্র তিনি পুরুষ সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন ''স্ত্রীজাতির দুঃখে যদি তাঁহারা দুঃখিত হইতেন, তবে হতভাগিনীদের এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। তাঁহারা দুঃখিত হইবেন কেন? তাঁহাদের চাকরানির কাজ, রসুয়ের কাজ অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে।''[৬]

১৮৬১ সালে প্রকাশিত হরকুমারী দেবীর 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' — যদিও এটি কবিতা তথাপি এটি উল্লেখ্য এই কারণে যে, এর মাধ্যমে শিক্ষার উপকারিতা ও বিদ্যার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে।

কৈলাসবাসিনী দেবী ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'—পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন, ''কতদিন এই বঙ্গদেশে জ্ঞানসূর্য উদয় হইয়া অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিবে? হে বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণ। কতদিনে তোমরা সর্বগুণাকৃতা হইয়া এই বঙ্গ মাতাকে শোভিতা করিবে''?[৭] এই গ্রন্থে তিনি নারী শিক্ষার জন্য যেমন আবেদন রেখেছেন তেমনি হিন্দু নারীদের জীবনে বৈধব্যযন্ত্রণার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ-এর মতো সামাজিক কুপ্রথার নিন্দা করার পাশাপাশি তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। বৈধব্যযন্ত্রণা যে কত অসহনীয় ছিল তা ফুটে ওঠে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে — "এই বৈধব্যযন্ত্রণা যে কতদূর অসহনীয় তাহা বলিবার নহে। হায়! এই বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া পূর্বতন কামিনীগণ সহমরণরূপ কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু এক্ষণে সে প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং আধুনিক বিধবাগণ সেই হৃদয়বিদারক বিষম যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া দিবানিশি অতি প্রদীপ্ত অনলে দগ্ধ হইতে থাকেন।"[৮]

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' — নামক পুস্তকে কৈলাসবাসিনী দেবী প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নারী শিক্ষার উদাহরণ দিয়ে নারী শিক্ষার প্রমাণ দেন এবং নারী শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ, নারীমুক্তি প্রভৃতি সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। নারী শিক্ষার পশ্চাৎপাদতার জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় পুরুষগণকেই দায়ী করেন। "তাঁহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না .....।"[৯]

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত মার্থা সৌদামিনী সিংহের 'নারী চরিত' নামক জীবনীগ্রন্থটি বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম পাঠ্যপুস্তক। এটি বিদ্বান ইউরোপীয় মহিলাদের জীবনচরিতের সংগ্রহমালা, হানামুর, হাইপেসিয়া প্রমুখ বিদ্বান ইউরোপীয় মহিলাদের জীবনচরিত। এটি পাঠ করলে এদেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে লেখিকা মনে করেছিলেন।

১৮৬৫ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় 'সম্পাদক সমীপেষু'-তে সৌদামিনী দেব্যাঃ নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সমাজপতিদের কাছে তাঁর একান্ত আবেদন, — "স্বদেশবাসী ভ্রাতাদিগের নিকট করপুটে নিবেদন করি, যে তাঁহারা স্ব স্ব কলত্র ও কন্যাদিগকে বিদ্যারূপ অমূল্য রত্ন প্রদান করতঃ এই ঘৃণিত দেশাচার সমূলে নির্মূল করিতে মনোযোগী হইবেন। তাহা না হইলে আর বঙ্গ অঙ্গনাগণের মঙ্গলের পথ দৃষ্টিগোচর হয় না।"[১০] ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কী কী বিষয়ে কুসংস্কার আছে?' —প্রবন্ধে শ্রীমতী সারদা দেবী সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। "বঙ্গদেশের লোকদিগের মনে যেসকল কুসংস্কার আছে, তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ, বার্ধক্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যমর্যাদা প্রথা, জাতিভেদ ও বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা না দেওয়া ও স্ত্রী দিগকে

পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা ইত্যাদি অতি ভয়ংকর। বাল্যবিবাহ্ থাকাতে বঙ্গদেশের কী সর্বনাশা না হইতেছে। দারিদ্র্য, অনাহার ও উৎকট পীড়া ও মহামারী ভয়, প্রভৃতি ভয়ানক দুঃখসকল এই বাল্যবিবাহ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। .... ভার্যার মূর্খতা, সন্তানগণের দুর্বলতা, নিবীর্যতা ও নিকৃষ্ট স্বভাব, এই বাল্যবিবাহ্ জন্যই ঘটিয়া থাকে।[১১]

কৌলীন্য প্রথা যে তৎকালীন সমাজকে কীভাবে জর্জরিত করেছিল তার চিত্রও ফুটে ওঠে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। "বাল্যবিবাহের ন্যায় কৌলীন্যবিবাহ্ গুরুতর পাতক কতদিনে নিবারণ হইবে। ...... যে কুলীনেরা পাত্র অভাবে গঙ্গাযাত্রার মড়াকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, সেই কন্যা যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।"[১২] জাতিভেদ প্রথারও তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। "সকল প্রকার কুসংস্কারের মধ্যে জাতিভেদকে এক প্রধান কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ...জাত্যাভিমান আমাদের দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।"[১৩]

নারীশিক্ষার বিষয়ে তাঁর আবেদনও যথেষ্ট জোরালো ছিল। বিদ্যার অভাবে নারী সমাজের উন্নতি যে সর্বদা ব্যাহত হচ্ছে তা তিনি সর্বদা উপলব্ধি করতেন। "...বিদ্যাভাবে কামিণীগণ কোনো প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন না। .. তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতি অভাবে সর্বদাই মূর্খতা নিবন্ধন অজ্ঞান তিমিরে নিমগ্ন হইয়া আছেন।"[১৪] অন্যদিকে বিধবাবিবাহের পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল — "যখন পুরুষেরা এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের পাপগ্রস্ত হইতে হয় না, তখন পতিহীনা অবলা কামিনীরা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহারা তাহাতে কেন দুষিত হয়েন?"[১৫]

১৮৬৬ সালে প্রকাশিত কামিনী সুন্দরী দেবীর 'উর্ব্বশী' নাটকটির বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও তার মধ্যে সমকালের নারীদের পারিবারিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির মত সামাজিক অনাচার ও অভিশাপের চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাল্যবোধিকা' পুস্তকটি বলা যায় বালিকা-শিক্ষার প্রথম পুস্তক, এতে পাঁচটি অধ্যায়ে বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষা, নীতি শিক্ষা, সৎ ও সুশীলা হবার শিক্ষা এবং মায়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন এই পুস্তক পাঠ করলে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। ১৮৬৬ সালে লিখিত (কিন্তু ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত) হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' নিজনামে বাঙালী নারী লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস রূপে চিহ্নিত হয়। এই উপন্যাসটিতে নারী শিক্ষা, নতুন পরিবার গঠনের কথা, ব্রাহ্মধর্মের নতুন পরিবেশ, স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ, দাম্পত্য জীবনের সামাজিক ও ধর্মীয় লক্ষ্য বিবৃত হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক উপন্যাসরূপে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

নারী শিক্ষার প্রারম্ভে নারী শিক্ষার প্রতি মেয়েদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা যেমন তাঁদের

লেখায় ফুটে উঠেছিল, ঠিক তেমনি বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার অবসানেও তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। আবার নারী পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্নেও মেয়েরা সরব হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সমাজের উচুঁতলার মহিলাদের পাশাপাশি সমাজের নিচুতলার মহিলারাও নিজেদের উন্নতির জন্য, সমানাধিকারের জন্য অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন লেখনীকে। তাঁদের সংখ্যা সীমিত হলেও সমাজের অন্ধকার দিকগুলিকে তাঁরা আলোয় টেনে আনেন। ১৮৬৮ সালে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্র এমনই এক মহিলার লিখিত; যিনি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নাম মনোমোহিনী দাসী। তিনি তাঁদের জগতের মহিলাদের অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন। একটি আইনকে কেন্দ্র করে তাঁদের আত্মাভিমানে যে আঘাত লাগে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে এই পত্রে। "এতদ্দেশীয় বেশ্যাদিগের রোগ পরীক্ষার আইন ভদ্রলোকদিগের পীড়া নিবারণার্থ প্রচলিত হইবে। .... ইহাতে হিতসাধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো মন্দ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদিগের বেশ্যালয় গমনের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে; কেবল পীড়ার ভয়ে যান না তাঁহাদিগের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই আইনটি কি পক্ষপাতী আইন হয় নাই? মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন যেমন স্ত্রীলোকদিগের পীড়া থাকিলে পুরুষের হয়, সেইরূপ পুরুষের পীড়াতেও তো স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে। অতএব যখন উভয় উভয়ের পীড়ার কারণ, তখন উভয়েরই পরীক্ষা দেওয়া উচিত কিনা?"[১৬]

আবার অনেক মহিলা স্বনামে না লিখে নাম গোপন করে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের মতামত তুলে ধরেছিলেন। কুলীন বিবাহের প্রথাজনিত বঞ্চিত হতভাগ্য নিজের জীবনকথা বা বৈধব্যযন্ত্রণায় কাতর অভিব্যক্তি বা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত মেয়েদের শিক্ষাহীন জীবনের অসহায়তা, সমাজবিধির প্রতিবাদ করে প্রতিকার চেয়ে 'অমুকী দেবী' প্রভৃতি নামের আড়ালে তাঁরা শামিল হয়েছিলেন সাময়িক পত্রের খোলা আঙিনায়। এইভাবে নিতান্ত অল্পসংখ্যক মহিলা, যাঁরা কোনোভাবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, যাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন, বেথুন স্কুলের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যাঁদের নারীমনে জাগিয়েছিল আশার আলো তাঁরা জীবন পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানানোর জন্যই তুলে নিয়েছিলেন কলম; যা ছিল সামাজিক বিধিনিষেধের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত মেয়েদের দুঃখ বেদনা জানানোর একমাত্র হাতিয়ার। মেয়েদের অসহনীয় দুর্দশা, যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনার কাহিনী তাঁরা জানিয়েছিলেন এই ভরসায়, যাতে মেয়েদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

মহিলা সাহিত্যিকদের রচিত এবং প্রকাশিত প্রাথমিক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমস্যাবলী এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে মহিলাদের চিন্তাভাবনা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল

যা পূর্বোক্ত রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হল ১৮৭০ সালে উপন্যাস সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত। কারণ স্বর্ণকুমারী দেবীর আবির্ভাবের ফলে উপন্যাস সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের লেখার পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং পারিবারিক সমস্যা, অভাব অভিযোগ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সমস্যাবলীকে ছড়িয়ে সাহিত্য উঠে আসে বৃহত্তর সমাজের আঙিনায়।

সূত্র-নির্দেশ

১। জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা ১৯৮৭, পৃঃ৫০।
২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে নারী*, পৃঃ৪
৩। জ্ঞানেশ মৈত্র, নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ৯১
৪। বামাসুন্দরী দেবী, *কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।* সোমপ্রকাশ, ১৫ ফাল্গুন, ১২৬৭
৫। বামাসুন্দরী দেবী, *ভারতবর্ষীয় রমনীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কী?* সোমপ্রকাশ, ১০ ভাদ্র, ১২৬৯
৬। বামাসুন্দরী দেবী, ঐ
৭। কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, কলিকাতা, ১৮৬৩
৮। কৈলাসবাসিনী দেবী, ঐ
৯। কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, কলিকাতা, ১৮৬৫
১০। সৌদামিনী দেব্যাঃ, সম্পাদক সমীপেষু, *'বামাবোধিনী'* পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭২
১১। শ্রীমতী সারদা, *বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কী কী বিষয়ে কুসংস্কার আছে?* 'বামাবোধিনী' পত্রিকা, আশ্বিন-কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১২৭৩
১২। শ্রীমতী সারদা, ঐ
১৩। শ্রীমতী সারদা, ঐ
১৪। শ্রীমতী সারদা, ঐ
১৫। শ্রীমতী সারদা, ঐ
১৬। মনোমোহিনী দাসী, পত্র, *সোমপ্রকাশ*, ২১ বৈশাখ, ১২৭৫

বিভাগপূর্ব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর

আফরোজা খাতুন

"কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে,"[১] স্বায়ত্বশাসিত মানুষ হওয়ার সুযোগ না দিয়ে পুরুষতন্ত্র তাকে নারী করে তোলে — জোরালো যুক্তিতে প্রগতিবাদীদের এই ঘোষণা জানান দেয়, নারী নামক এক ধারণা সৃষ্টি করেছে পুরুষ, তার সংজ্ঞা রচনা করেছে, তার সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান হাতিয়ার শাস্ত্রের বচন। যা সহজে মানাবে না বুঝেছে, তাকেই ধর্মের আদেশ বলে শিরোধার্য করিয়েছে। শিশুকে জুজুর ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার মত, নারীদেরও নরকের ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করা হয়েছে। কারণ নারীর জীবন যে আইনের অধীন, তার উৎস মূলত ধর্ম। এরমধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলাম নারীকে কিছু অধিকার দিলেও অন্য ধর্ম তা দেয়নি। অথচ এখনও সবচেয়ে শৃঙ্খলিত মুসলিম নারীরা। অন্য ধর্মের সংস্কার আন্দোলন বিবর্তন ঘটালেও, মুসলিম ধর্ম বিবর্তনকে রোধ করেই চলেছে। বিশেষত ইউরোপীয় শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু সমাজের মধ্যে 'আধুনিক মহিলা' তৈরির এক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই নবজাগরণের বিশাল পটভূমিকায় হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে আসেনি বাংলার মুসলমান সমাজ। এমনকি স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) মত শিক্ষাবিদ ইংরেজি শিক্ষাকে মেনে নিলেও মুসলিম মহিলাদের জন্য সংস্কারের কট্টর বিরোধিতা করলেন। বাংলায় মুসলিম মহিলাদের অধিকারের কথা সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। রোকেয়া বলেছিলেন, "ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে।"[২] অবশ্য তিনি বুঝিয়েছিলেন ধর্মের সামাজিক বিধানকেই। এই ধর্মীয় বিধি-বিধানের বেড়াজালে মুসলিম অন্তঃপুরের কান্না যতটুকু প্রাচীরের বাইরে বেরিয়েছে তাকেই খোঁজার চেষ্টা করেছি বিভাগপূর্ব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আঙিনায়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যখন হিন্দু মহিলাদের জন্য সংস্কার আন্দোলন শুরু হল, তখন বেশি প্রচার চলল তাদের শিক্ষার সপক্ষে। অথচ পাশাপাশি মুসলিম সমাজে তখনও স্ত্রী-শিক্ষার কোনও চিত্রই তৈরি হয়নি। তোতাপাখির মত অনুচ্চ কণ্ঠে সুর করে কোরান পাঠই ছিল একমাত্র নারীশিক্ষা। বাংলা পড়া মেয়েদের গর্হিত

অপরাধ বলে গণ্য হত। ১৮৬৮ সালে আবদুল লতিফ 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 'বেঙ্গল সোস্যাল এসোসিয়েশনে'র এক সভায়। সেই সভায় অংশগ্রহণ করে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রশ্ন করেছিলেন হিন্দু সমাজের নারীশিক্ষার মত মুসলমান সমাজের নারীশিক্ষার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। কলকাতা মাদ্রাসার আবদুল হাকিম উত্তরে বলেছিলেন, "নারী পুরুষ উভয়ের শিক্ষাতেই ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে অন্য সম্প্রদায়ের নারীদের মত স্কুলে কলেজে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। ধর্মের কারণে পর্দানসীন থেকে আরবি ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করবে।"[৩] মুসলিম সমাজের এই স্থিতিশীলতা ও পশ্চাদপদতার যুগে বসে কঠিন বেড়াজালের মধ্যে থেকেও কুমিল্লার হোসনাবাদের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী চরম সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে হোস্টেলও নির্মাণ করেন। আর নারী মুক্তির বানী প্রচারক বেগম রোকেয়া মনে করলেন নারীর আর্থিক স্বাবলম্বন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। তাঁর ঘোষণা 'মতিচুর' (১৯০৪), 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫) 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী'তে (১৯২৮) লক্ষ্য করা যায়। 'সুলতানার স্বপ্ন'-তে একটি রূপক কাহিনীব ভিতর দিয়ে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরেছেন। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কাহিনীতে দেখা যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেনের তরুণী বিধবা দীন তারিণী 'তারিণী-ভবন' নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন। "তারিণী ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিলেন এবং 'নারী ক্লেশ নিবারণ সমিতি' নামে একটি সভা গঠন করিলেন।"[৪] নারীজাগরণের মত একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেগম রোকেয়া তাঁর কলম ধরেছিলেন। তাই লেখিকার কল্পনার ইচ্ছেপূরণ এই কাহিনীর তারিণী-ভবন। মুসলমান মেয়েদের বাংলা শেখা নিয়ে যে মন্তব্য তিনি করেছেন তা সেই সময়ের নিঁখুত চিত্রই বটে। "মুসলমান মেয়েদের বাঙ্গালা পদ্য বলা শুন আসিয়া। যেন কি বিপদে পড়িয়াছে।"[৫] অথবা "মুসলমান মেয়েরা নাকি ঠিক-মত বাঙ্গালা উচ্চারণ করিতে পারে না?"[৬] মুসলিম মেয়েদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রবল বাধা ছিল, উক্ত দৃষ্টান্তে সেটাই প্রমাণিত। রোকেয়া তাঁর চিন্তাজগতের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন।

আখতার মহল সৈয়দা খাতুনের 'নিয়ন্ত্রিতা' (১৩৩৪) ও 'মরণবরণ' (১৩৩৬) উপন্যাসের দুই মুখ্য নায়িকাই বাংলা পড়ার জন্য কীভাবে লাঞ্ছিত হত, লেখিকা তাঁর নারী-হৃদয়ের গভীর মমতা দিয়ে তা বিবৃত করেছেন। বিমাতার কাছে আশ্রিতা 'নিয়ন্ত্রিতা'র নায়িকা আয়েশার সঙ্গিনী ছিল ছিন্ন পাতা পুস্তকখানি। বইখানির উপর

অত্যধিক অনুরাগের ফলে সকলের কাছেই তাকে উপহাসিত হতে হত। 'বিদ্রূপকারীরা তাহার সংকল্প অটল দেখিয়া একবাক্যে স্বীকার করিল যে, বাংলা শিখবার যার এত আগ্রহ পরিণামে সে একটি ডাকসাইটে 'অসৎ' না হয়ে যায় না।

কিন্তু নির্লজ্জ গোঁয়ার মেয়েটির পাঠে কিছুমাত্র অবহেলা দেখা গেল না। সে নিয়মিত সুলতান ভাইয়ের কাছে গিয়ে ধন্না দিত এবং তেমনি করিয়া বলিত, ও ভাই, তোমার পায়ে পড়ি এই ছওরটা বলে দাও।''[৭] লেখিকা সৈয়দা খাতুন আয়েশার জীবন-যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে বহু মুসলিম নারীর সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর 'মরণবরণ' উপন্যাসের নারীরা (হাসেনারা, লায়লী) খ্রিষ্টান শিক্ষিকার কাছে পড়াশোনা করে। কারণ ''নব্যসভ্যতা-স্রোতে কাঠ-মোল্লাদের কদর মূর্খ গ্রামবাসীও মানিতে চাহে না; হাদিসের প্রকৃত তথ্য জানিতে আজ সকলেই আকুল — সকলেই আজ স্বচক্ষে হাদিস দেখিতে — শুধু দেখিতে নহে — কোনটি ঠিক, কোনটি বেঠিক তাহারও সন্ধান চাহে।''[৮] লেখিকা জীবনসত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর বিদ্রোহী মন হাদিসের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থানে ব্যথিত লেখিকা চেয়েছিলেন নব্যশিক্ষার আলোয় মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিবাদ গড়ে উঠুক। তাঁর দুই কাহিনীর নায়িকাই পড়াশোনা করার জন্য হৃদয়হীন বিধি-ব্যবস্থার কবলে পড়ে দুঃসহ গালিগালাজের শিকার হয়েছে। হাসেনারার নানী শাশুড়ী তাকে গালাগাল দিয়ে বলেন — ''লেখাপড়া শিখলে কি মানুষ এমনি বাজারী মাগী হয়ে পড়ে। সাধে কি মৌলবীরা মুসলমান মেয়েদের বাংলা শিখতে দিতে মানা করেন।''[৯] আখতার মহল তাঁর দুটি কাহিনীতেই বাস্তব অভিজ্ঞতার যথার্থ রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

প্রগতিশীল লেখক আবুল ফজল মুসলিম নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করলেন তাঁর 'চৌচির' (১৯২৭) উপন্যাসে। আখ্যানের বেগম সাহেবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠেনি শিক্ষার অভাবে। তাই সে পরমুখাপেক্ষী এবং প্রতারিত। শিক্ষার অনগ্রসরতার সঙ্গে কড়াকড়ি রকম অবরোধের চাপে পড়ে বিধবা বেগম সাহেবা পিষ্ট হয়েছে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে। অতুল সম্পত্তি, পুত্রকন্যা সবই তাঁর আছে। কিন্তু সম্পত্তি-শাসন ও পুত্র-কন্যার আদর আবদার পূরণের জন্য তাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। রাগ হয়, বাড়ির চতুর্দিকে ঘেরা দেওয়ালের বাইরে গিয়ে, তহশীলদার, কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে টাকা-পয়সার হিসাব নেওয়ার অধিকার না পাওয়ার জন্য। বিধবা বেগম সাহেবা নিজেকে তুলনা করেছে পাশের পাড়ার উকিল বরদাবাবুর বিধবা কন্যার সঙ্গে। স্কুলে পাঠিয়ে ইংরেজি বাংলায় ভালো করে শিক্ষিত করার জন্য আর পর্দার কঠোরতা না থাকায় বরদাবাবুর কন্যা নির্ভীকভাবে স্বামীর সম্পত্তি শাসন করছে। এই চিন্তার সূত্র ধরে মৃত পিতামাতার উপর বেগম সাহেবার রাগ হল, তাকে শিক্ষাদীক্ষা

না দিয়ে পিঁজরার পাখি করে রাখার জন্য। কেবল সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে বাড়ির ম্যানেজার ফকির মহম্মদের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হল বেগম সাহেবা। স্বামীত্বের স্বীকৃতি পাওয়া মাত্রই শুরু হল ফকির মহম্মদের প্রতারণা। এই প্রতারণা বেগম সাহেবার মত বহু মুসলিম নারীর জীবনের অনিবার্য ঘটনা। ইসলাম ধর্ম নারীদের সম্পত্তির মালিকানার প্রথম স্বীকৃতি দিল। অথচ মুসলিম পিতৃতন্ত্রের দাপটে সম্পত্তি দেখাশোনার স্বাধীনতা তাদের তৈরি হল না। তার ফলে কতখানি আর্থিক শোষণের শিকার তাদের হতে হল তারই বাস্তব চিত্র উপন্যাসিক আবুল ফজল তাঁর চৌচির উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

কাজী ইমদাদুল হক তাঁর আবদুল্লাহ উপন্যাসেও (১৯৩৩) নারীর অবরোধের কঠোরতার চিত্র তুলে ধরেছেন। আর এই অবরোধকে কেন্দ্র করেই ইংরেজি শিক্ষিত নায়ক আবদুল্লাহর সঙ্গে প্রাচীনপন্থী শ্বশুর সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের সংঘাত লেগেছে ঘন ঘন। কাহিনীর নারী চরিত্র হালিমা বা সালেহার মধ্যে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ পায়নি। লেখক আবদুল্লাহকে দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মৌলবাদীদের সঙ্গে তার সংঘাত বেধেছে। যেখানে নারীদের চেতনা বা প্রতিবাদের ভাষা অনুজ্জ্বল সেখানে নায়কের সোচ্চার বিরোধিতা নজর কাড়ে — ''অত শরীয়তের ধার ধারিনে ভাই সাহেব; এইটুকু বুঝি সে মানুষের সুখ সুবিধারই জন্য শরা-শরীয়ত জারি হয়েছে;[১০] কাহিনীর শেষ পর্যন্ত নায়কের এই কণ্ঠস্বর উচ্চকিতই থেকেছে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং চারপাশের অবরোধবন্দিনী নিগৃহীতা নারী-সমাজের বেদনা বেগম রেকেয়াকে অস্থির করে তুলেছিল। মুসলিম পিতৃতন্ত্রের রচিত এই কঠোর বিধান, তার বাস্তব প্রয়োগ কত মর্মান্তিক রূপ নিতে পারে নারীদের জীবনে তার প্রত্যক্ষ চিত্রই তিনি অবরোধবাসিনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর অবরোধবন্দিনীদের অপমান ও অত্যাচারের জ্বালা নিজ হৃদয়ে বহন করে বলেছেন।

> ''কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে,
> কেন জন্ম লভিলাম পর্দা-নশীন ঘরে।''[১১]

দীর্ঘদিন আধুনিক শিক্ষার দ্বারে প্রবেশের অধিকার না পাওয়ায় আর চাপিয়ে দেওয়া অবরোধের কঠোরতায় মুসলিম নারীরা পিছিয়ে পড়ে উন্নতির পথ থেকে। হেরে যায় প্রতিযোগিতার আসরে। আর তাই আজও নজর কাড়ার মত পরিসংখ্যান নেই অর্থনৈতিক আত্মনির্ভর বাঙালি মুসলিম নারীর জগতে।

বিবাহবিচ্ছেদ ও সপত্নী-সমস্যার মর্মান্তিক ঘটনাকে ঔপন্যাসিকরা তাঁদের আখ্যানে বুনেছেন পারিপার্শ্বিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ইসলামের আবির্ভাব-কালে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং সন্তানদের মর্যাদা সম্পর্কে যে প্রথা এবং রীতিনীতি প্রচলিত

ছিল তা বড়ই অনিশ্চিত। সেকালে একদিকে ছিল নিয়মিত বিবাহপ্রথা, আবার অন্যদিকে বিবাহের নামে নারী পুরুষের বিচিত্র যৌন মিলন। আরব সমাজের সেই ক্রান্তিকালীন প্রেক্ষাপটে প্রবর্তিত হয়েছিল ইসলামী আইন। যে আইনে বিবাহের জন্য উভয় পক্ষেরই সম্মতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার ক্ষেত্রে স্বামীর একচেটিয়া অধিকার থাকে। আর স্ত্রীরা সে অধিকার লাভ করে বিবাহের সময় চুক্তিমূলে। তবে কার্যত প্রয়োগের অভাবে স্ত্রীদের সে ক্ষমতা একেবারেই অবলুপ্ত। অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী মুসলিম পিতৃতন্ত্র ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগ করায় বাঙালী মুসলিম নারী কতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তার নজির বিভাগপূর্ব বাংলা উপন্যাসগুলিতেও জায়গা করে নিয়েছে। আখতার মহল সৈয়দা খাতুনের 'মরণবরণ' কাহিনীর নায়িকা হাসেনারা শ্যামাঙ্গিনী। তার বিয়ে ঠিক হয় চাচাতো ভাই আজিজের সঙ্গে। আজিজের মা ছেলের পড়ার খরচ যোগানোর জন্যই বড়লোকের কালো মেয়ের সঙ্গে পুত্রের বিয়ে ঠিক করে। এ মেয়ে আজিজের পছন্দ নয় জেনে মা ইসলামী আইনের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আজিজকে বুঝিয়েছে, সে পুরুষ, একটা ছেড়ে পাঁচটা বিয়ে করলে অসুবিধা হবে না। কালো বউ পছন্দ না হয় পরে একটা কিছু দোষ দেখিয়ে তালাক দিলেই বালাই যাবে।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী তাঁর বঞ্চিত জীবনের কাহিনীকে রূপকের আড়ালে 'রূপজালাল' (১৮৭৬) গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। ফয়জুন্নেসার মা সপত্নী দেখেও গাজী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। সতীনের চেষ্টায় ফয়জুন্নেসার সঙ্গে স্বামীর চির বিচ্ছেদ ঘটে। এই ব্যক্তিগত জীবনকেই তিনি ফুটিয়ে তুললেন 'রূপজালাল'-এ। কাহিনীর নায়িকা রূপবানু লেখিকা নিজে। নায়ক জালাল লেখিকার স্বামী গাজী চৌধুরী। নায়ক জালাল রূপবানুকে ভালোবাসে। অথচ ঝমঝম রাজের কন্যা হুরবানুকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। গাজী চৌধুরী যেমন নাজমুনকে বিয়ে করেও ফয়জুনকে আকাঙ্খা করে তেমনই জালালও হুরবানুকে বিয়ে করলেও রূপবানুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রূপবানু-লাভের পর আবার জালালের মন বিষাদে ঢেকে গেল হুরবানুর কথা ভেবে। জালালের এই অস্থির চিত্ততায় খেদে রূপবানু বলে—

নাগরগণের সত্য বটে হেন রীতি।
একজন প্রাপ্ত হলে অন্যে যায় মতি।[১২]

যদিও জালালের কথা ভেবে রূপবানু হুরবানুকে নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়। 'রূপজালাল' গ্রন্থের শেষে রূপবানু আর হুরবানুকে নিয়ে জালাল সুখের সংসার গড়ে তোলে। বাস্তবজীবনে কিন্তু ফয়জুন্নেসার স্বামী গাজী চৌধুরী ফয়জুন ও নাজমুনকে নিয়ে সুখী সংসার গড়ে তুলতে পারেননি। এই মিলন লেখিকার অবদমিত আকাঙ্খারই প্রতিফলন।

এক স্ত্রী বর্তমানে আর এক স্ত্রী গ্রহণ যে শর্তসাপেক্ষ, এই গভীর বোধ অনেক মানুষের মধ্যেই নেই। স্বার্থান্বেষী পুরুষরা নিজেদের অভিলাষ চরিতার্থ করতে অধিক বিবাহ করে ধর্মের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে। কোরান শরীফে চারটি বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষিতও আছে — "সমান ব্যবহার করতে না পারলে একটি বিয়ে কর। আবার কোরান পরেই বলেছে — 'সমান ব্যবহার করতে পারবে না।' তাহলে কোরানের শেষ আদেশ এটাই দাঁড়াল — তোমরা একটিই বিয়ে কর।"[১২] বিস্ময়কর যে, এর পরও অনেক পুরুষ ন্যায় বিচার ও সমান ব্যবহারের হাস্যকর দাবি নিয়ে একাধিক স্ত্রী রাখে। এবং তাদের ন্যায় বিচারের নমুনা ফুটে ওঠে ফয়জুন্নেসার মত নারীদের জীবনে।

বেগম রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের জমায়েত করেছেন তারিণী ভবনে। এই নারীদের অতীতচারণায় আছে পুরুষপীড়া। তারিণী ভবনের রাফিয়া বেগম ছিলেন জনৈক ব্যারিস্টারের পত্নী। ব্যারিস্টার বিবাহের তিন বছর পর ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। দশবছর পর স্বামীর ফেরার কিছুদিন আগে একটি রেজিস্ট্রি পত্র স্বাক্ষর দিয়ে রাফিয়া গ্রহণ করলেন। "তিনি পত্রের মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন, তাহা সুবিস্তৃত ত্যাগপত্র (তালাকনামা) তিনি ত্যাগপত্র দিয়াছেন, ইনি স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন — সুতরাং তাঁহাদের বিবাহসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।[১৪] ধর্মের আবেদন বিবেকের কাছে। ফলে বিবেকবান মানুষরাই কেবল ধর্মীয় বোধে উদীপ্ত হয়ে সৎ পথে চলার অনুশীলন করে। আর সুযোগসন্ধানীরা করে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ। তারা ভয় পায় আধুনিক আইনী ব্যবস্থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তার বাস্তব প্রয়োগে এদেশে আইনী হস্তক্ষেপ না থাকায় মুসলিম নারীরা বিপরীত পক্ষকে শাস্তিদানের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। নিজস্ব ধ্যানধারণা ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে গেলে যে আর্থিক স্বাবলম্বন দরকার সেটা লেখিকা অনুভব করেছিলেন। তাই শুধু মুসলিম নারী নয়, সব সম্প্রদায়ের নারীদেরই আর্থিক স্বনির্ভরতার স্বপ্নে তিনি তাঁর আখ্যানে তারিণী ভবনের জন্ম দেন।

পদ্মরাগ উপন্যাসের নায়িকা শিক্ষিত জয়নব ওরফে সিদ্দিকার জীবনেও ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগে বিপর্যয় নেমে এসেছে। তিনিও আশ্রয় নিয়েছেন তারিণী ভবনেই। নায়ক লতীফের সঙ্গে তিন বছর পর বিয়ে হওয়ার শর্তে তাঁর 'আক্‌দ্‌বস্ত' হয়েছিল। 'আক্‌দ্‌বস্ত' (বাগদান) হল প্রায় একপ্রকার বিবাহই। ইতিমধ্যে লতীফ ব্যারিস্টার হয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফেরেন। অর্থলোভী চাচা হবীব আলম অর্থের লোভে কৌশলে অন্য পাত্রীর সঙ্গে লতীফের বিবাহ দিলেন। ইসলামে একাধিক বিবাহ প্রচলিত বলেই নারীদের অপমানজনক সেই নিয়ম মেনে নিতে হবে বলে লেখিকা মনে করেননি। তাই তাঁর জয়নব চোখের জলে চারদিক ঝাপসা না করে, জীবনযুদ্ধে লড়ার জন্য

নিজেকে পারদর্শী করার অনুশীলন অভ্যস্ত করেছেন। জমিদারী সংক্রান্ত সকল বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। আইনত জয়নব লতীফের স্ত্রী। তাঁর অন্য জীবন গ্রহণের অধিকার নেই লতীফ তালাক না দেওয়া পর্যন্ত। আর এই তালাক দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা মুসলিম-পুরুষের হাতে অর্পিত হওয়ায় নারীকে মুক্তি (তালাক) ভিক্ষা করতে হয়। জয়নবকে মুক্ত করার জন্য তাঁর দাদা সোলেমানের তাই বক্তব্য — "আমি একবার সে নরাধমের বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি তিনি তোমাকে 'তালাক' দেন তবে ত পরম মঙ্গল: তোমার জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিবে। আর যদি 'তালাক' না দেন তবে আর গতি কি — তোমাকে 'চিরদিন' এ জীবন তারি তরে কাঁদিতে হইবে,.....।"[১৫] ঘটনাচক্রে লতীফের সঙ্গে জয়নবের দেখা হয়। উভয়ের ভালোলাগাও গড়ে ওঠে। তবু জয়নব ওরফে সিদ্দিকা দাম্পত্যজীবন গড়ে তুলতে রাজি না হয়ে বলেন - "তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই। আমি আজীবন তারিণী-ভবনের সেবা করিয়া নারী-জাতির কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিব।"[১৬]

জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সে সচেতনতা লেখিকার পূর্ণমাত্রায় ছিল। হৃদয়কেও তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্ককে অপমান করে যে মুসলিম পিতৃতন্ত্র, তার সঙ্গে কোনও আপস লেখিকা পছন্দ করেননি। মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন আর্থিক স্বনির্ভরতা। তাই লতীফকে ভালোবাসা নিবেদন করিয়েও জয়নবকে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর নিজস্ব জমিদারীতে। কারণ তাঁর নায়িকা সিদ্দিকা ওরফে জয়নব মনে করেছেন এত ঘটনার পরও যদি সংসারের নিকট ধরা দেন তাহলে "...পুরুষ সমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিত, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহিয়সী, গরীয়সী, হউক না কেন, — ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে।"[১৭] একমাত্র বিবাহিত জীবন, আর সংসার ধর্মই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নয় বলে লেখিকা মনে করেছেন। এখানেই অন্য ঔপন্যাসিকদের থেকে বেগম রোকেয়ার ব্যতিক্রমী চিন্তা চেতনা ধরা পড়ে।

সূত্র-নির্দেশ

১। হুমায়ুন আজাদ, *নারী* ঃ তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০০০, ঢাকা, পৃঃ ১৯।

২। বেগম রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত ঃ *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৩, ঢাকা, পৃঃ ১২।

৩। ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা* (২য় খণ্ড) ঃ প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, ঢাকা, পৃঃ ১২৫।

৪। *পদ্মরাগ*, বেগম রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মার্চ ১৯৯৩, ঢাকা, পৃঃ ২৯৭।

৫। ঐ, পৃঃ ৩৭০।

৬। ঐ, পৃঃ ৩৭২।

৭। রায়হানা বেগম, *নিয়ন্ত্রিতা, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন* ঃ প্রথম প্রকাশ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭৯, ঢাকা, পৃঃ ৬।

৮। ঐ, পৃঃ ৫৭।

৯। *'মরণ বরণ'*, নিয়ন্ত্রিতা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৭।

১০। ইমদাদুল হক আবদুল্লাহ ঃ আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২০ মার্চ, ১৯৬৮, ঢাকা, পৃঃ ১৮।

১১। *অবরোধবাসী* ঃ বেগম রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মার্চ ১৯৯৩, ঢাকা, পৃঃ ৪৬৮।

১২। নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, *রূপজালাল* ঃ মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, ঢাকা, পৃঃ ৩০৮।

১৩। ডঃ ওসমান গনি, *কোরান শরীফ* (বঙ্গানুবাদ) ঃ মল্লিক ব্রাদার্স কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়াবি ১৯৯৮, পৃঃ ৮০।

১৪। *পদ্মরাগ* ঃ বেগম রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, মার্চ ১৯৯৩, ঢাকা, পৃঃ ৩৪৮।

১৫। ঐ, পৃঃ ৩৮৭।

১৬। ঐ, পৃঃ ৪১৪।

১৭। ঐ, পৃঃ ৪১৪।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নারীর অধিকার

সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট

উন্নয়নের ইতিহাসে নারীরা শুধু গৃহবধূ এই বোধের জন্ম মোটামুটিভাবে সাম্প্রতিকই বলা যায়। দেড়শো বছর আগেও আমরা দেখতে পাই নারীরা অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ কাজে। উনবিংশ শতাব্দীর লোকগণনা বা আদমসুমারী এবং পর্যটক বিবরণী থেকে মহিলা শ্রমিকের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে সব শ্রেণীর নারীরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভারতীয় অর্থনীতিতে সুতো কাটা ও তাঁতবোনা এই দুই জাতীয় শিল্পই ছিল নারীশ্রমিক অধ্যুষিত। মহিলারা তাঁতবোনার সঙ্গে সঙ্গে তা' বেচার কাজেও লিপ্ত ছিল। এই সামাজিক দায়িত্বপালন, মা-য়ের কাজ ও গৃহবধুর কাজ এবং উৎপাদক হিসেবে তার ভূমিকা — এই সবকটিই ছিল তার স্বাভাবিক ভূমিকা বা Natural role। কিন্তু সে সময়ে উৎপাদনের প্রকৃতি ও সংগঠন ছিল অন্য ধরনের এবং আজকের যুগ অপেক্ষা অনেক সরল ও শ্রমনির্ভর। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমশ তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে এলো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জোর ধাক্কা। ফলস্বরূপ লক্ষ্য করা যায় নারীশ্রমিকের অলক্ষ্যতা ও অপসারণ। দেখা যায় নারীর অধিকারের ও সম্পদের পরিবর্তন।

এই আলোচনাটির মূল বিষয় আজকের নারীসমাজ উন্নয়নের প্রভাবে তাদের অধিকারের দিক থেকে কোথায় দাঁড়িয়ে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে তাদের আপাত অবস্থানটি কিরূপ? আলোচনাটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো যে কোন ধরনের উন্নয়ন ভিত্তিক কর্মসূচী একজন নারীর উপর কোন কোন দিক থেকে প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় আছে পরিবার মধ্যস্থ সম্পদের বন্টন তত্ত্ব। এখানে আমরা দেখবো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য তত্ত্বগত দিক থেকে কিভাবে শুরু হয়। তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বর্তমান যুগে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। চতুর্থ পর্বের আলোচনায় মূলত আজকের তথাকথিত বহমান উন্নয়নের প্রভাব নারীশ্রমিক ও নারীসমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার বিবরণী দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। আজকের বিশ্বায়ন যদি বহমান

হয় তাহলে নারীর আপাত ও পরিবর্তিত স্থান সেখানে কতটা খাপ খাবে এবং উন্নততর হবে সে বিষয়ের একটা ইঙ্গিত এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। উপসংহারে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী উন্নয়নের দিক ও ধারা যা সময় ও আর্থসামাজিক উপযোগী হবে। আলোচনার মূল সময় নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকে আজকের দশক।

উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচী ও নারীর স্থান ঃ

একজন নারী তার ঘরেব ও চারপাশের পরিবেশের মধ্যে নিজের স্থান বা পরিসরকে আপস মীমাংসার (negotiation) মাধ্যমে নির্ধারণ করে। এই স্থানীয় পরিবেশটি আবার বৃহত্তর পরিবেশের (macro environment) একটা অংশ হিসাবে যুক্ত হয়। এখানে একজন নারী ব্যক্তি হিসাবে তার স্থানকে প্রতিষ্ঠা করে। এই দুটি পরিবেশের চারটি করে উপাদান আছে। গঠনমূলক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, এবং রাজনৈতিক। বৃহত্তর গঠনমূলক পরিবেশ নির্ভর করে ভৌগলিক অবস্থান, সেই স্থানের মাটি, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর। বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক সুযোগ ও সম্পদ, শিল্পকরণ, বিভিন্ন সংস্থা ও তাদের কর্মপদ্ধতি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর। সমাজ সংস্কৃতি নির্ভর করে তৎস্থানীয় জাতি, শ্রেণী ও ধর্মের কাঠামোর উপর। এক্ষেত্রে, এক গোষ্ঠির অন্তবর্তী মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক ও আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠির আন্ত আদানপ্রদানও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশ আবার নির্ভর করে যে কোনো জনসাধারণের কাজের ধরন, গুণ ও তার কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির স্বচ্ছতা এবং রাজ্যের শাসনের উপর। তাহলে যে কোনো পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজ এই পথ অনুসরণ করে প্রথমে বৃহত্তর পরিবেশ ও স্থানীয় বা ঘরোয়া পরিবেশের বন্ধনের ভিতর দিয়ে নারীর সুযোগ ও প্রাপ্তির ধরনকে প্রভাবিত করবে। ফলে নারীর চূড়ান্ত স্থান এভাবে নির্ধারিত হবে।[১] এই সমগ্র বিষয়টি একটি ছকের মাধ্যমে বোঝানো যায় ঃ
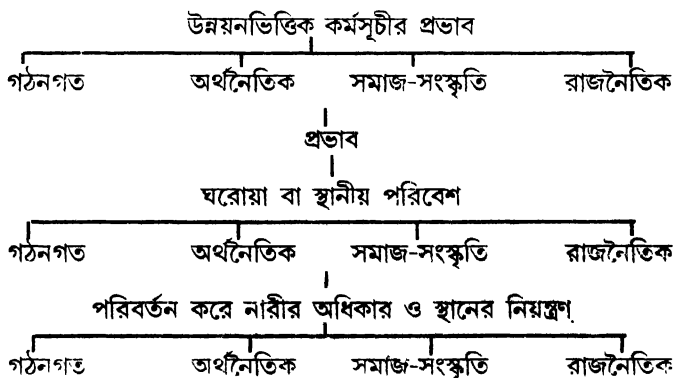
পরিবার মধ্যস্থ সম্পদের বন্টন তত্ত্ব ঃ

সম্পদের অধিকার ও প্রাপ্তি অর্থাৎ entitlement and access এবং বঞ্চনা অর্থাৎ deprivation একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অধিকার শুধু কোনো কিছুর প্রাপ্তি বা হারানোই নয়, একজনের অধিকার যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, ঔষধপ্রাপ্তি ইত্যাদি অপরজনের সঙ্গে জোট করে দেখতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বলা ভালো আপাত অধিকারই নির্দেশ করে প্রাপ্তির সঠিক মূল্যায়ন। পরিবারের মধ্যেই দেখা যায় সম্পদ বন্টনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য যা বেশীরভাগ নারীর বিরুদ্ধেই যায়। এই বৈষম্য কোন কোন ক্ষেত্রে বয়স ও জাতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমে বঞ্চনায় পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ বয়স-ভিত্তিক ও জাতি ভিত্তিক বৈষম্য একজন নারীর ক্ষেত্রে তার দারিদ্র ও বঞ্চনার কিছুটা নির্ধারক হয়ে পড়ে।[২]

পরিবার মধ্যস্থ সম্পদের বন্টন সাধারণত দুটি তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমটির প্রবক্তা মূলত বেকার ও টমস্[৩] ও পরেরটির প্রবক্তা মূলত ম্যাকেলরয় ও হনি।[৪] প্রথমতত্ত্ব অনুসারে একজন সফল পরার্থবাদী পরিবারের মধ্যের সম্পদ বন্টন করেন। দ্বিতীয় তত্ত্বে দেখা যায় সম্পদের সামগ্রিক বিভাজন হয় ব্যক্তির আদান-প্রদান সম্পর্কিত চুক্তির ক্ষমতার দ্বারা। পরার্থবাদ অনুসারে যদি কোনো অধিক গুণসম্পন্ন শিশুর প্রদত্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশী প্রতিদান দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে বা আশা দেয় তাহলে তার পিতা মাতা প্রথম থেকে অর্থাৎ সেই আশার ভিত্তিতে তাকেই বেশী সম্পদ দেবে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি পিতা-মাতা তাদের জ্ঞান বা অনুভবের ভিত্তিতে মনে করেন যে পুরুষ শিশুর তুলনামূলক ভাবে চাকরী পাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী তাহলে পরিবার সেই শিশুকে প্রাথমিকভাবে অধিক সম্পদ দেবে। এক্ষেত্রে মহিলা শিশুটির অধিকার ও প্রাপ্তি তার প্রয়োজনের তুলনায় হ্রাস পায় এবং কোনক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে পরিবারের সম্পদে স্বল্পতা আছে সেখানে বা গোষ্ঠি ও জাতির বৈষম্যে জড়িয়ে তার তুলনামূলক বঞ্চনা তার টিঁকে থাকার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। অপর তত্ত্ব অর্থাৎ গোষ্ঠিমূলক তত্ত্বে সম্পদ বন্টন নির্ধারিত হয় তার শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদানের মাধ্যমেই নয় বরং সম্পদের উপর তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এটা বলা হয় যে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণই পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ের ক্ষেত্রে তার চুক্তির ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় যার ফলে তার নিজের স্থান উন্নতি হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিস্কার হবে।

ধরা যাক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি শিশুর টিকে থাকার ক্ষেত্রে, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে ভিন্নধর্মী স্বার্থ আছে। সেক্ষেত্রে যদি স্ত্রী চুক্তির দিক কম ক্ষমতাসম্পন্ন হন এবং বাঁবা পুরুষ শিশুটিকে বেশী চান তার অনুভূত প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা বেশী হবে মনে করেন, তবে সেই পরিবারে নারী শিশুর মৃত্যুর হার বা স্বাস্থ্যের অবস্থা পুরুষ শিশুর তুলনায় খারাপ হয়।[৫]

পরার্থবাদ তত্ত্বটি বেশী খাপ খায় সনাতন (traditional) প্রাক-শিল্পায়ন যুগে এবং চুক্তিবাদ বা গোষ্ঠিমূলক তত্ত্বটি বেশী উপযোগী শিল্পভিত্তিক সমাজে।[৮] এক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক পরিবেশ যা মূলত টিকে থাকার বা বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদের উপর নির্ভরশীল সেই সমাজ ও অর্থনীতি প্রথম তত্ত্বটি অনুসরণ করে। অপরপক্ষে ধনী পরিবার মধ্যস্থ একজন ব্যক্তি যার অর্থনৈতিক সম্পদ এবং অধিকার বেশী এবং বাজারে শ্রমিক হিসেবে অংশগ্রহণ করে অথবা পার্থিব বস্তুর বিনিয়োগে সচেষ্ট হয় সে চুক্তিবাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম বন্টনের আবার উদ্দীপনার দুটো দিক আছে। প্রথমটি মজুরির দিক ও দ্বিতীয়টি সম্পদের দিক। গরীব পরিবার যাদের সম্পদ সীমিত তারা মনে করে টিকে থাকাটাই যথেষ্ট। সুতরাং তারা বিচার করে কাকে সম্পদ বেশী দিলে সে তাকে দ্রুত প্রতিদান দেবে। এটা হলো মজুরীর দিক। আবার ধনী পরিবার কিছুটা দীর্ঘমেয়াদী দিক দেখে। তারা দেখে মূলধন কিভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্ম এবং আরো পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। এটা হলো প্রবহমান সম্পদের দিক। এই ধরনের পরিবার মূলত উত্তরাধিকার সূত্র বা ধারা বা বৈবাহিক হস্তান্তরজনিত আয়কে বেশী গুরুত্ব দেয়। সুতরাং শারীরিক ক্ষমতা বা শ্রমের জন্য নয় সম্পদ বহমন করার উদ্দেশ্যে পুরুষ শিশুর চাহিদা বাড়ে। সেখানে নারী হলো সম্পদ হস্তান্তর প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি। এখানে মনে রাখতে হবে গোষ্ঠিভূত সমাজের ধরন ও সাংস্কৃতিক দিকের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই ধনী পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতিতে। ভারতে গোষ্ঠিভূত সমাজ মূলত পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষনির্ভর। ফলে অচল সম্পদ মূলত পুরুষের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে ও বৃদ্ধি পায়। সনাতনী ধারা অনুসারে একটি মহিলা সাধারণভাবে গৃহবধূ এবং তার মুখ্য কাজ হলো জন্ম দেওয়া ও রন্ধন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া। ফলে তার বিবাহের সময় সে স্থানান্তরিত হয়। এটাও মনে করা হয় যে সাধারণভাবে সে তার পুরনো পরিবারে আর্থিক সাহায্য করবে না এবং সে যদি কোনো সম্পত্তি পায় তা রক্ষা করতে পারবে না অর্থাৎ ধনী বা মালিকানাভুক্ত পরিবার পুরুষ শিশু পছন্দ করতে পারে।[৯] হায়ার বলেন যে, নারী এক্ষেত্রে সম্পদ হস্তান্তর এবং প্রদর্শন এই দুই-এরই মাধ্যম এবং একটি নারীর বিয়ে এবং পণের ক্ষেত্রে যত বেশী ব্যয় যে পরিবার করে উদ্দীপনার এই প্রবহমান সম্পদের দিক অনুসারে তার যশ তত বেশী হবে। সুতরাং অর্থনৈতিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক গঠন সম্পদ বন্টনকে প্রভাবিত করে। একটি মহিলার অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদা তার উপর নির্ভর করার মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। নারী যদি চাকুরীজীবি হন তাহলে তার আয় এবং তার উপর নিযুক্ত পূর্বের ও ভবিষ্যতের ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাবে প্রথমটিই জ্ঞানসম্মত ভাবে ভরসা হারায়। এক্ষেত্রে যে ঝুঁকি পরিবার বহন করবে বিনিয়োগের হিসাবে অর্থনৈতিক

বিচারে সে প্রতিদান তত বেশী চাইবে। অপরপক্ষে ভাবিষ্যত ব্যয়ের নিশ্চয়তা ও আয়ের অনির্ভরতার সঙ্গে কোন ঋণাত্মক সম্পর্ক পুরুষ শিশুর ক্ষেত্রে অনেক কম থাকে।

আজকের নারী ও তার আর্থ সামাজিক দিক ঃ

১৯৭০ সালে নয়া আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন সম্পর্কিত তত্ত্বের গোড়াপত্তন ও নারী শ্রমিক নিয়ে বিশেষ ভাবে গবেষণার সূত্রপাত হয়। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের শ্রমনির্ভর শিল্পগুলি উন্নতশীল বা অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেয়। ১৯৬৫-১৯৯৫ সালের মধ্যে বিশ্বের কর্মনিয়োগ প্রায় দ্বিগুণ হয়। এর মধ্যে নারীশ্রমিকের বৃদ্ধি হয় অপেক্ষাকৃত বেশী হারে। কিন্তু এর বেশীর ভাগ নিয়োগই হয় অবিন্যস্ত ক্ষেত্রে (informal sector)। ফলে শ্রমিকের আয় ও জীবনযাত্রার মানের খুব একটা উন্নতি দেখা যায় না। শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্স এবং বেশীরভাগ মধ্য আমেরিকার দেশে দেখা যায় বেশীর ভাগ কর্মনিয়োগ হয়েছে স্বাধীন ব্যবসা ক্ষেত্রে (free trade zone)। এখানে শ্রমিক সংগঠন মূলত নিষিদ্ধ। অবিন্যস্ত ক্ষেত্রের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয় ভারতে এবং কিছুটা পাকিস্তানে, অর্থাৎ নারীশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের সামগ্রিক মান মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কথাও জোরগলায় বলা যায় না। নারীর কর্মনিয়োগ ও কর্ম মর্যাদার আলোচনা করতে গেলে তার পিছনে লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ক, তার পারিবারিক পরিস্থিতি ও পারিবারিক সম্পদের নিরিখে করতে হবে। বর্তমানে লিঙ্গবৈষম্য এবং সামাজিক শ্রেণীকে নারীর কর্মনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। এ নিয়ে বহু বির্তক আছে। এই লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিক শ্রেণীর মর্যাদার ও কর্মনিয়োগের মধ্যে কেউ কেউ ঋণাত্মক সম্পর্ক লক্ষ্য করেন যেমন বুভিনিক ও লাইসিট,[৮] গ্রিনহালগ[৯] ও শর্মা।[১০] কেউ কেউ এই দুই-এর ভিতর ধনাত্মক সম্পর্ক লক্ষ্য করেন যেমন কিং ও হিল,[১১] সুব্বারাও ও লরা[১২] ইত্যাদি। পান্ডা[১৩] কেরালার ক্ষেত্রে দেখান যে কর্মনিয়োগ ও আর্থসামাজিক মর্যাদার-মধ্যে U (ইউ) আকৃতির সম্পর্ক রয়েছে। শ্রেণী বা জাতি মর্যাদার নীচের সারির মহিলাদের কর্মাধিক্য মূলত প্রয়োজন ভিত্তিক এবং উপরের সারির মহিলাদের কর্মাধিক্য সম্পদ বা গুণভিত্তিক এবং এক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করে।

নারীশ্রমিকের অপসারণ ও অলক্ষ্যতা লক্ষিত হয় মূলত অসংগঠিত এবং কৃষিভিত্তিক ক্ষেত্রে। উন্নয়নের পথ ধরে একটা বোধ খুব জোরদার হয় যে কৃষকরা যেমন মূলত পুরুষ তেমনি কৃষি শ্রমিকরাও পুরুষ। কিন্তু যেসব জায়গায় নারীশ্রমিক আছে সেখানে তাদের নিয়োগের মাত্রা এবং মজুরীর অংক দিয়েই কি উন্নয়ন ব্যাখ্যা করা যায়? নারী উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে গঠনগত তারতম্য, অসমতা এবং তাদের কিভাবে

কাজে লাগানো হচ্ছে বা তার শ্রমের ব্যবহারের ধরন। হ্যাডেড ও ক্যানবার[১৪] দেখান যে অসমতাকে যদি ক্যালোরীর পর্যাপ্ততার নিরিখে মাপা যায় তাহলে যত আয় বাড়ে তত অসমতাও বাড়ে, যথক্ষণ না পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ আয় বাড়ছে। এক্ষেত্রে গঠনমূলক সম্পদ যেমন নিয়োগ, আয়, দক্ষতা, কার্যগত সম্মান এবং শিক্ষার প্রভাব পরিবার মধ্যস্থ শক্তির সম্পর্কের উপর, লক্ষ্য করার মতো।

বেশীর ভাগ গ্রামেই লক্ষ্য করা যায় কৃষিক্ষেত্রে নারীর লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন একটি বিশেষ ধারণা অনুসারে হয়। যেমন সমস্ত পুরুষরা ভারী কাজ করবে, কিছু মহিলা দক্ষতাসম্পন্ন কাজ করবে এবং বেশীরভাগ নারীরাই হাল্কা কাজ করবে। মজুরীও নির্ধারিত হয় এই ধারণানুসারে, যদিও দক্ষকাজে নিযুক্ত নারীশ্রমিকদের মজুরী পুরুষদের গড় মজুরী অপেক্ষা অনেক কম। ভূমিহীন নারী শ্রমিক কৃষি-নির্ভরশীল কাজে যে মজুরী পায় তা মহিলাদের গড় মজুরী অপেক্ষা অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগাল জেলার পুডুপাট্টি গ্রামের উল্লেখ করা যায়।[১৫] উৎপাদন পদ্ধতিতে ভাড়াটে নারীশ্রমিক দেখতে পাওয়া যায়। যে সব খামারের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে সেখানে ভাড়াটে নারীশ্রমিকের প্রাবল্য রয়েছে। এক্ষেত্রে মজুরীর হারকে কোন তাৎপর্যপূর্ণ নির্ধারক হিসাবে খামারের মালিক গণ্য করেন না যখন নারীশ্রমিক নিযুক্ত করেন। ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় উপযুক্ত লাভে পণ্যসামগ্রীর যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা, অধিক মজুরীসম্পন্ন দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন নির্দেশ করে, অপরপক্ষে যেসব ক্ষেত্রে কৃষকদের বাজারের সঙ্গে যোগ দুর্বল, সেক্ষেত্রে মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে ভাড়াটে শ্রমিকদের চাহিদা কমে। মরশুমি প্রভাব, কম মজুরী, বহুবিধ জীবনযাত্রার সুযোগের অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে দেখা যায় বেকারত্ব ও দারিদ্র। আসলে আগে অর্থনৈতিক সম্পদ বা কাঁচামালের উপর তাদের স্বাভাবিক অধিকার ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তার বেশীরভাগ এই সব নারীশ্রমিকরা হারাতে থাকে। কাপাডিয়া[১৬] দেখান যে দলিত গোষ্ঠির নারীকর্মীরা মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপস মীমাংসার সাহায্য নেয় কিন্তু দলিত বহির্ভূত গোষ্ঠির নারীরা এটা পারছে না। বর্তমান সামাজিক গঠনে (kinship) লিঙ্গসম্পর্কের যে তফাৎ তার একটা ভূমিকা এখানে লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ উচ্চবর্ণের নারীরা হবে গৃহবধু ও মা। এটাই তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা এবং নিম্নবর্ণের নারীরা হবে কর্মী এবং সংসারে পুরুষের মতো সমান আর্থিক সাহায্য তারা করতে পারে।

শুধুমাত্র প্রাপ্তি দিয়েই যে নারীর দারিদ্র দূর করা যায় তা আদৌ নয়। কারণ জাতি, শ্রেণী এবং লিঙ্গভিত্তিক পদ্ধতির দাপটে তার আয় বা ধার কখনই তার জীবনকুশলতায় পর্যবসিত হয় না। যদিও দক্ষ নারীশ্রমিকরা সময় ব্যবহার বা সচলতার নিরিখে এদিকে

উন্নত কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া, পরিবারের সম্পদ ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা স্বাভাবিক ভাবেই সীমিত। অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক দিক, জীবনকুশলতা ভোগ ও পণ্যব্যবহারেও তাদের অধিকার কমতে থাকে। পরিবারের মধ্যেও তাদের গুরুত্ব কমে যাওয়া তাদের দরিদ্র করে।

বহমান উন্নয়ন ও নারী ঃ

ক্রমশ ঢুকে পড়েছে বিশ্বায়নের বাজার ভিত্তিক মুক্ত অর্থনীতি ও বহমান উন্নয়নের ধারা। বহমান উন্নয়ন হলো সামাজিক সর্বস্তরের ভাল থাকাকে সময়ের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা এবং এই ধারা সর্বসময় উর্দ্ধগামী। এখানে নিরাপত্তাহীন দুর্বল ক্ষেত্রগুলিকে সবল করা হয়। এবার দেখা গেল বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার জন্য যে সব উৎপাদন ছিল যা ছিল নারী অধ্যুষিত তা গঠনগত দিক থেকে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্য গরিব নারীর কাছ থেকে বহুজাতিক সংস্থার কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব ভীষণভাবে পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। বাজার নির্ধারিত দাম, খাদ্য ভর্তুকি হ্রাস এবং শুধুমাত্র কিছু কিছু পরিবারের টার্গেট হওয়ার প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না আজকের গরীব নারী। বিশ্বের বাজারতন্ত্র অতিমাত্রায় পুরুষপ্রবণ যেখানে কিছু কিছু জ্ঞান বাজারে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক বাজারে যে সব নারী অধিকারে পিছিয়ে পড়ছে, তাদের বাজার কোথায়? খাবারের ব্যবসা, মিষ্টির দোকান, গৃহভিত্তিক কাজ, বিনোদন ও যৌনকর্মে যেখানে নারীর উপর অধিকার রাখা যায়, তাদের প্রয়োজনানুসারে ছাঁটাই ও পুনর্নিয়োগ করা যায় সেখানে তাদের ভীড় দেখা যায়। এই নারীসুলভ কাজগুলির ফলে নারীর স্থানান্তকরণ এবং লিঙ্গভিত্তিক দুর্বল অবস্থা বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিসাবে দেখা যায় আর্থিক অবস্থা নব্বই-এর গোড়াতে ভেঙে পড়লে চাকুরী অনেক বেশী হারিয়েছে নারীশ্রমিক। আবার এই বিপদ যখন ঠিক করা হচ্ছে তখন নারী কোথাও স্বাধীন ব্যবসা কোথাও কম মজুরীতে (sub contract) আবার কোথাও ঠিকা কাজে অংশ নিয়েছে।

উপসংহার ঃ

উন্নয়নের প্রভাবে দেখা যায় যে নিয়োগকে যা ব্যহত করেছে, সম্পদ বন্টনকে যা অসমান করেছে, মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ যতটুকু কমেছে তা নারীর উপর বিভিন্নভাবে বেশী প্রভাব ফেলেছে। প্রয়োজন কি? নারীর অর্থনৈতিক মূল্য সমাজে বাড়ানো, সে ধরনের নিয়োগ করা যার জন্য প্রয়োজন মানব-মূলধনের বিনিয়োগ এবং বংশানুক্রমে সম্পদের সমান বন্টন। তাহলেই বহমান উন্নয়নে সময়ের সঙ্গে সর্বস্তরের নারীর কল্যাণ সাধন গতিময় হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। দেশমুখ ও রণদিভে, "প্রেসিং জেন্ডার ইক্যুইটি ইন দি ফ্যামিলি সেন্টার স্টেজ: ইউজ অফ্ কলা-জাথা থিয়েটার", *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি*, এপ্রিল, ২৬ মে ২, ভলিউম ৩৮, নং ১৭, পৃঃ ১৬৭৭, ২০০৩

২। আর চোপরা "ফ্রম ভায়োলেন্স টু সাপোর্টিভ প্র্যাকটিস, ফ্যামিলি জেন্ডার অ্যান্ড ম্যাসকুলিনিটিস", *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি*, এপ্রিল ২৬ মে ২, ভল: ৩৮, নং ১৭, ২০০৩, পৃঃ ১৬৪৬

৩। জি. এস বেকার ও এন্ টম্‌স, চাইল্ড এনডাওমেন্ট্‌স অ্যান্ড দি কোয়্যালিটি অফ্ চিলড্রেন, *দি জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমি*, পৃঃ এস ১৪৩-৩২

৪। এম. বি. ম্যাকেলরয় "দি এম্পিরিক্যাল কনটেন্ট অফ্ ন্যাস বারগেইন্ড হাউসহোল্ড বিহেভিয়ার", *দি জার্নাল অফ্ হিউম্যান রিসোর্সেস*, ১৯৯০, পৃপ্ ৫৫৯, ৮৩

৫। পল্ নিলেসন ও আক্সেল গিলফার্ট, 'পারসেপশন অ্যান্ড প্রেজুডিস্, আনসারটেইন্টি অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন জেন্ডার', *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি*, অক্টোবর ২৬-নভেম্বর ১, ভল্ ৩৭, নং ৪৩, ২০০২, পৃঃ৪৩৮৬

৬। ক্যাথলিন ক্লাউড, 'উইমেন, হাউসহোল্ডস্ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট: এ পলিসি পারস্পেকটিভ', প্রকাশিত কে ক্লাউড ও এ ভার্মা (সংকলিত) *ক্যাপচারিং কম্প্লেকসিটি*, মেজ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪, পৃপ্, ৬০-৮৩

৭। হায়ার, 'দি রোল অফ ডাউরিস, অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশ্যান অফ্ ক্যাপিটাল ইন এ সাউথ ইন্ডিয়ান কম্যুনিটি', *জার্নাল অফ্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট*, ১৯৮৯

৮। জে বুভিনিক ও ক্রম লাইসিট, 'উইমেন পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন দি থার্ড ওয়ার্ল্ড', প্রকাশিত জন পি লুইস(সংকলিত) *স্ট্রেংদেনিং দি পুওর হোয়াট হ্যাভ ইউ লার্নড*, ট্রান্সন্যাশনাল বুক্‌স, নিউ ব্রুনস্উইক, ১৯৮৮, পৃপ্ ১৪৯-৮২

৯। এস্ গ্রীন হ্যলগ্, 'ইন্টার্ন্যাশনাল কন্ট্রাকস্: ফ্যামিলিয়াল রুট্‌স অফ সেক্সুয়ল স্ট্র্যাটিফিকেশন ইন তাইওয়ান', প্রকাশিত ডি ডোয়্যের ও ব্রুস (সংকলিত) *এ হোম ডিভাইড: উইমেন অ্যাণ্ড ইনকাম ইন দি থার্ড ওয়ার্ল্ড*,

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, স্ট্যানফোর্ড, ১৯৮৮, পৃপৃ ৩৯-৭০

১০। ইউ শর্মা, *উইমেন ওয়ার্ক অ্যান্ড প্রপার্টি ইন নর্থ - ওয়েস্ট ইন্ডিয়া*, তাভিস্টিক পাবলিকেশন, নিউ ইয়র্ক।

১১। এলিজাবেথ হিল অ্যান্ড অ্যানে হিল, *উইমেন এডুকেশন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস, বেরিয়ারস, বেনিফিট্স অ্যান্ড পলিসিস্*, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, বালটিমোর, ১৯৯৩, পৃপৃ ৩৫-৬১

১২। কে সুব্বারাও ও লরা রেইনি, 'সোশ্যাল গেইন্স ফ্রম ফিমেল এডুকেশন, এ ক্রস ন্যাশনাল স্টাডি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ডিস্কাশন পেপারস', নং ১৯৪, *দি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক*, ওয়াশিংটন ডি সি, ১৯৯৩

১৩। প্রদীপ পান্ডা, পভার্টি অ্যান্ড ইওং উইমেন্স এমপ্লয়মেন্ট, লিংকেজেস ইন কেরালা, *ইকনমি অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি*, ভল ৩৮, নং ৩৮, সেপ্টেম্বর ২০-২৬, ৪০৩৭

১৪। এল হ্যাডেড ও অর ক্যানবার, 'ইজ দেয়ার অ্যান ইন্ট্রাহাউসহোল্ড কুজনেটস কার্ভ? সাম এভিডেন্স ফ্রম দি ফিলিপিনস্', ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক রিসার্চ সেন্টার, *ডিসকাশন পেপার* ১০১, ইউনিভার্সিটি ওফ ওয়ারউইক্

১৫। কে বালাসুব্রামনিয়ান, পি তামিজোলি, এস মুরুগাকানি, 'লেবার মার্কেট লিংকেজেস অ্যান্ড জেন্ডার, কেস স্টাডি অফ এ ভিলেজ ইন্ তামিলনাড়ু', *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি*, ভল, ৩৭ নং ৪৩, অক্টোবর ২৬, নভেম্বর ১, ২০০২, পৃ ৪৩৯৪ - ৪৩৯৫

১৬। কারিন কাপাডিয়া, মিডিয়েটিং দি মিনিং অফ মার্কেট অপরচুনিটিস; জেন্ডার, কাস্ট, অ্যান্ড ক্লাস ইন রুরাল সাউথ ইন্ডিয়া, *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লি*, ডিসেম্বর ২৭, ১৯৯৭

বিভাগপূর্ব তেভাগা আন্দোলনে (১৯৪৬-৪৭) অংশগ্রহণকারী মহিলাদের আন্তঃসম্পর্ক ঃ গ্রামীণ বনাম নাগরিক — একটি পর্যালোচনা

ব্রততী হোড়

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে, অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা সংগ্রাম একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম যা ক্রমশ বাংলার প্রায় ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এক ব্যাপক গণ-সংগ্রামের রূপ নেয়। তেভাগা আন্দোলন ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ বড় কৃষক আন্দোলন। ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশ বিভাজনের পরেও বিভিন্ন এলাকায় তেভাগার দাবীতে লড়াই চলতে থাকে। তেভাগা আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত প্রবন্ধে/স্মৃতিচারণায় বিপুল সংখ্যক মহিলাদের অংশগ্রহণ, অসীম সাহস এবং আত্মত্যাগের কাহিনী বারবার শ্রদ্ধাব সঙ্গে উঠে এসেছে।

১৯৪৭-এ সেপ্টেম্বরে ভবানী সেন, তেভাগা আন্দোলনে, চরিত্র বিশ্লেষণে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ ''সবচেয়ে অবদমিত, পদদলিত, পশ্চাদপদ ও নিরক্ষর কৃষক রমনী ধান রক্ষায়, তাদের ঘর-বাড়ী-সম্মান রক্ষায় আর রক্তপতাকা রক্ষায় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে। রামমোহন রায় যখন রেনেসাঁর শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত কবেন, তারপব থেকে নারীমুক্তি মহানগর গুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার গ্রামের নারী সমাজকে এই প্রথম জাগিয়ে তুলেছে তেভাগা আন্দোলন।'' কৃষ্ণবিনোদ রায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ ''নারীগণ এই আন্দোলনে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা ইতিহাসে গাঁথা হয়ে থাকবে। ... এঁদের তুলনাহীন সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ত্ব সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা, উন্নততর সাংস্কৃতিক চেতনা সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল।''[১]

তেভাগা আন্দোলন, গ্রামীণ মহিলাদের রাজনৈতিক দৃশ্যদিগন্তকে ধীরে কিন্তু সুনির্দিষ্ট ভাবে সম্পূর্ণ করেছিল। একদিকে এটা মহিলাদের মধ্যে প্রয়োজন তৈরী করেছিল গার্হস্থ্য সীমাবদ্ধতা থেকে বেড়িয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয় লড়াইয়ে অংশগ্রহণের সচেতনা; অন্যদিকে মহিলাদের অংশগ্রহণ লড়াইটাকেই একটা অভিনব আকার দিয়েছিল।

তথাপি, অবিভক্ত বাংলার এই শেষ কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ মহিলাদের পাশাপাশি কিন্তু সেভাবে শহুরে মহিলা কমরেডদের দেখা গেল না। বিস্ময়কর লাগে এজন্যই যে এতদিন পর্যন্ত এবং পরেও এই শহুরে মহিলা কমরেডরা শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলিতে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বস্তুত তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ মহিলাদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে শহুরে মহিলা কমরেড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন — যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৪৩-এর মন্বন্তর — যখন দলে দলে নিরন্ন মানুষের ঢল নেমেছিল শহরে। কেবলমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লঙ্গরখানার খিচুড়ি বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ এবং শহুরে মহিলা কমরেডদের একটা সদর্থক ইতিবাচক কার্যসম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রামীণ মহিলাদের মানসিক সচেতনতাবৃদ্ধিতে এঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[২] একইসঙ্গে উল্লেখের প্রয়োজন পুরুষদের পাশাপাশি, বিভিন্ন কৃষক সম্মেলনে/সভায় গ্রামীণ মহিলাদের উপস্থিতি যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল অবশ্যই।[৩]

তেভাগা আন্দোলনে গ্রামীণ মহিলাদের অবিস্মরণীয় ভূমিকায় শহুরে মহিলা কমরেডদের উপস্থিতি প্রায় নেই রাণী দাশগুপ্তা, কল্যাণী দাশগুপ্তা প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া। অথচ অমিয় দে, মণিকুন্তলা সেন, সরযূ সরকার, সুষমা দত্ত, অমিয়া ঘোষ, মৃণালিনী তলাপাত্র প্রভৃতি আবো অনেক শহুরে মহিলা কমরেডরা, গ্রামে থেকে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সর্বতোভাবে জড়িয়ে একদিকে যেমন গ্রামীণ মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতাবৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন, ঠিক তেমনি অন্যদিকে, নিজেরাও শিক্ষিত হয়েছেন। — এইভাবে কিষাণ মেয়েরা সর্বস্তরের মেয়েদের সংস্পর্শে আসে।

একমাত্র আন্দোলনের অন্তিম পর্বে, যখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে - তখনই কেবল শহরে মহিলা কমরেড়রা এর প্রতিবাদে মিটিং/মিছিল/প্রতিবাদ সভা করছেন, ঘটনাস্থলে তদন্তকারী দল পাঠাচ্ছেন। কিন্তু সে তো অন্য অনেক সংগঠন-ই রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ভাবে এর প্রতিবাদ করছেন যেহেতু অত্যাচারের প্রকৃতি-ই ছিল অমানবিক — যা যে কোন সংবেদনশীল মানুষকে-ই নাড়া দিয়েছিল ভয়ংকরভাবে।

শহুরে মহিলা কমরেডদের প্রতিবাদ আন্দোলনেরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল — যেমন ওঁরা স্বীকার করেছিলেন যে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের জন্য যে দেশজোড়া প্রতিবাদের প্রয়োজন তা নেই। অথচ তার ব্যবস্থাও তাঁরা করছেন না। পুলিসি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন কেবলমাত্র 'মধ্যবিত্ত মহিলাদের'।[৪]

শহুরে মহিলা কমরেডরা জোরালো আবেদন রাখছেন যে শহুরে মহিলাদের গ্রামীণ অত্যাচারিত মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে-ই হবে।[৫]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিনিধিরা পুলিশি জুলুমের তদন্তে দিনাজপুরে যাচ্ছেন, কিন্তু পথিমধ্যে তালপুকুর গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাঁদের ঘেরাও করেন এবং ১২ ঘন্টার নোটিশে ঐ প্রতিনিধিবৃন্দকে দিনাজপুর শহর ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। এরকম মোট চারটি প্রতিনিধিদলকে এভাবে ফেরানো হয়।[৬] যদিও এরই মধ্যে মহিলা প্রতিনিধিদলের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। ঐ সকল অঞ্চলের নারীদের কাছে শুনেছেন তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। পুরুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই হয় জেলবন্দী অথবা পালিয়ে গেছেন। জোতদার/জমিদারের ভাড়া করা গুন্ডা এবং পুলিশী জুলুমের শিকার এ অবস্থায় নারীরাই।[৭] রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়াবহতায় এমন কি কংগ্রেসী এম. এল. এ বীণা দাসও মর্মাহিত — তীব্র ভাষায় তিনি এর নিন্দা করেন।[৮] রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা, গণসাক্ষর সংগঠিত হচ্ছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, এ.আই.ডব্লিউ.সি (AIWC), বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত নারী পুরুষের বাংলাদেশের প্রায় সব জেলা জুড়ে।[৯]

কেবলমাত্র প্রতিবাদ করাই নয়, কিভাবে তদন্তকারী মহিলাদলগুলি এই আন্দোলনকে দেখছিলেন, সেটাও উল্লেখের দাবী রাখে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা সহজ হবে। যেমন পার্কসার্কাস এর একটি মুসলিম মহিলা প্রতিনিধিদল ১৯৪৭-এ এপ্রিলে সন্দেশখালির একটি গ্রামে যান, কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছিলেন যে সম্প্রতি কৃষক মহিলাদের উপর পুলিশী নির্যাতনের কাহিনী জেনে তাঁরা মর্মাহত। ঐ ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাঁরা ঐ বিশেষ গ্রামটিকে বেছে নেন কারণ ঐ গ্রামটি ছিল 'কলকাতার নিকটে'।[১০]

এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ব্যাপার স্পষ্ট হয় যেমন প্রথমত, ১৯৪৭ -এর মার্চ পর্যন্ত ঐ মহিলা প্রতিনিধিদল আন্দোলন সঞ্জাত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মন্তব্য থেকেই এটা পরিষ্কার যে তাঁরা সন্দেশখালি ঐ গ্রামে গেছিলেন কলকাতার সঙ্গে নৈকট্যের কারণে।'

শহুরে মহিলা কমরেডদের দৃষ্টিভঙ্গীর অপর একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। শ্রীমতী গীতা মল্লিক স্বাধীনতায় একটি বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে ঘটা দাঙ্গা থামানোর অজুহাতে পুলিশ বিশেষ করে ঘরে ঘরে, তল্লাশী চালানোর নামে মহিলাদের 'হেনস্থা' করছেন। তিনি এর নিন্দা করেন। একই সাথে গ্রামবাংলায় কৃষক মহিলাদের উপর পুলিশী নির্যাতনেরও নিন্দা করেন।[১১]

এখানে মনে হচ্ছে যেন শ্রীমতি গীতা মল্লিক, যিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা, তিনি গ্রামবাংলায় তেভাগা আন্দোলনে গ্রামীণ মহিলাদের উপর রাষ্ট্রীয় ভয়াবহ সন্ত্রাস এবং কলকাতা শহরে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনায় মহিলাদের উপর পুলিশী

'হেনস্থা'-র ঘটনাকে সমার্থক ক'রে দেখছেন। এখানে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে, তাই জানাই যে, যে কোন ধরনের অন্যায্য হেনস্থার প্রতিবাদ নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনাগুলির মধ্যে যে বিশাল গুণ-গত এবং পরিমাণগত পার্থক্য আছে তা গীতা মল্লিক খেয়াল করেননি। অন্যভাবে বলা চলে যে শহুরে মহিলা কমরেডরা যেন তাঁদের স্থানিক গন্ডির বাইরে আর বেরুতে পারছেন না।

এটা অনেকটা যেন প্রতীকি। পার্টি নিজেও নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনে মহিলাদের বৃহত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা রাখলেও গ্রামকেন্দ্রিক আন্দোলনে সেই ধারণা অনুপস্থিত ছিল। পার্টির মহিলা সংগঠন/মহিলা কমরেডদের মধ্যেও যেন সেই একই ভাবনার অনুরণন ঘটছে। ধারণাটা আরো স্পষ্ট হয় ঐ সময়ের স্বাধীনতা দেখলে। নেত্রী স্থানীয় মহিলারা গোটা তেভাগা আন্দোলনে, পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতায় মাত্র একটি লেখা লিখেছেন — সেটাও আবার ৮ জুন, ১৯৪৭-এ যশোরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অধিবেশনের উপর লিখতে গিয়ে।

ঐ বছরই তৎকালীন লড়াকু নেত্রী মণিকুন্তলা সেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ইন্দোনেশিয়ার নারী আন্দোলন' নিয়ে দু কলাম লিখেছেন, ১৫ই জুন, ১৯৪৭, মণিকুন্তলা সেন এবং রেণু চক্রবর্তী যৌথভাবে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার গুরুত্ব নিয়ে লিখেছেন কিন্তু বিস্ময়করভাবে তেভাগা আন্দোলনে গ্রামীণ কিষাণ মহিলাদের উপরে পুলিশি অত্যাচার নিয়ে কিছু লেখা নেই।[১২]

সম্ভবত গ্রামীণ এবং নাগরিক মহিলাদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা মানসিক ব্যবধান হয়তো কাজ করেছিল।[১১] এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বাধীনতায়, ১৫ জুন, ১৯৪৭-এ জেল থেকে গ্রামীণ কিষাণ মহিলা কমরেডদের লেখা শহুরে মহিলা কমরেডদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠিতে। চিঠির বিষয়বস্তুতে তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে পুলিশ/জোতদারের মোকাবিলা করার অপরাধে তারা জেলে। নিচুমানের খাবার, জমাদারের দুর্ব্যবহার, তীব্র গরমে দিনের পর ছিল বিচারের নামে কোর্টে অপেক্ষা করিয়ে রাখা - এ সমস্তই তাঁরা সহ্য করেছেন। কিন্তু শিক্ষিতা মহিলা পরিদর্শকের ব্যবহার তাঁদের কাছে দুঃসহ না ভোলা স্মৃতি। অনেক আশা নিয়ে তাঁর কাছে বন্দী মহিলারা সমাধানের প্রত্যাশায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানালে তাঁর (মহিলা পরিদর্শকের) উপেক্ষা মিশ্রিত উত্তর ছিল 'জেলে এসব সহ্য করতেই হয়'।

চিঠির বিষয়বস্তু জানিয়ে বন্দী ঐ কিষাণ মেয়েরা শেষে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রথমত ঃ আমাদের প্রশ্নের এই একই উত্তর কি ঐ মহিলা পরিদর্শক দিতে পারতেন, যদি আমাদের পরিবর্তে জেলে শহরের মহিলা কমরেডরা থাকতেন?

দ্বিতীয়ত ঃ গ্রামের মেয়ে বলে কি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা এতই তুচ্ছ?

তৃতীয়ত ঃ শহরের মহিলা কমরেডরা কি তাহলে আমাদের মানুষ বলে মনে করেন না?

লক্ষণীয় যে তীব্র অভিমানের পাশাপাশি ক্লেশ ভরে কিন্তু দৃপ্তকণ্ঠে তাঁরা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে তাঁরা ভয় পান না। জীবনে অনেক কিছু না শেখার মত' অত্যাচারীর সামনে মাথা নত করতে তাঁরা শেখেননি। কিন্তু তবুও, নিজের দেশের, কাছের মানুষের অবহেলা তাঁদের বুকে বেঁধে।

সূত্র-নির্দেশ

১। কৃষ্ণবিনোদ রায় 'তেভাগার সংগ্রাম', *তেভাগা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ*, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃঃ২৮

২। মণিকুন্তলা সেন *'সেদিনের কথা'*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২

রেণু চক্রবর্তী 'ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট মেয়েরা ১৯৪০-১৯৫০', *মণীষা*, ১৯৮০, কলকাতা

কবিতা পাঞ্জাবী ও শিবানী ব্যানার্জী চক্রবর্তী

'*ওরাল হিস্ট্রী অব্ তেভাগা ইন্ দিনাজপুর এ্যান্ড নড়াইলঃ জেন্ডার পলিটিক্স অব্ ইমার্জেন্ট গ্রাসরুটস্ উইমেনস্ গ্রুপস্ ইন্ দা কনটেক্সট অব এ লেফট মুভমেন্ট* (অপ্রকাশিত) ('Oral History of Tebhaga in Dinajpur and Narail : Gender politics of emergent grassroots women groups in the context of a left movement').

৩। ব্রততী হোড় 'ফর্মেশন এ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস্ অব্ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বেঙ্গল, এ কেস্ স্টাডি, ১৯৪৩-৪৫' (এম্ ফিল থিসিস,১৯৯০) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ('Formation And Activities of Mahila atma Raksha Samity : Bengal, A case study, 1943-45)

কল্যাণী দাশগুপ্ত 'তেভাগা জেলার মেয়েরা', *পশ্চিমবঙ্গ*, তেভাগা, সংখ্যা ১৪০৪ পৃষ্ঠা ৪০-৪১

খালেকা বেগম 'তেভাগা আন্দোলন ও গ্রামীণ নারী জাগরণ', *তেভাগা সংগ্রাম*, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৫-৬৬

৪। *স্বাধীনতা*, ১ এপ্রিল, ১৯৪৭

৫। তদেব

৬। তদেব, ৬ এপ্রিল, ১৯৪৭

৭। তদেব, ৪ এপ্রিল, ১৯৪৭

৮। *পিপলস্ এজ*, ১৫ মার্চ, ১৯৪৭

৯। *স্বাধীনতা*, ১০ এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল, ১৮ এপ্রিল, ১৯ এপ্রিল, ২৩ এপ্রিল — মে ১৯৪৭

১০। *স্বাধীনতা*, ১৯ এপ্রিল, ১৯৪৭

১১। *স্বাধীনতা*, ১১ এপ্রিল, ১৯৪৭

১২। প্রয়াতা মণিকুন্তলা সেন, লেখিকার সাথে আলাপচারিতায় বলেছিলেন যে তখন তাঁরা কলকাতায় ঘটে যাওয়া এবং ঘটতে থাকা সম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে বিব্রত এবং তা ঠেকাতে অনেক বেশী ব্যস্ত ছিলেন, আলাপচারিতা, ২ এপ্রিল, ১৯৮৭।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও উনবিংশ শতকের শেষার্ধে নারীপ্রগতির বিষয়

সারদা ঘোষ

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ভারত তথা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর বহন করে আনে, যার একদিকে ছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কিছু যুগোপযোগী পরিবর্তন, অন্যদিকে ছিল নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে রূপান্তর। ফলে 'নারী প্রগতির' বিষয়টি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয় এবং এক্ষেত্রে যে দেশীয় উদ্যোগ গৃহীত হয় তাতে মহিলারাও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল উনবিংশ শতকের বাংলার তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবার, যার পুরুষ ও মহিলা সদস্যারা বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁদের সুস্পষ্ট প্রভাব রেখে গেছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রী এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর অবদান উল্লেখ না করলে উনবিংশ শতকের নারীপ্রগতির বিষয়টি অসমাপ্ত থেকে যায়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পুরুষ সদস্যবৃন্দ — দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা বঙ্গসমাজে নারীর অবহেলিত ও অবদমিত অবস্থানকে পরিবর্তন করার সপক্ষে বিশেষভাবে সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এই পরিবারের মহিলা সদস্যারাও 'নারী প্রগতি' সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীদেবী এবিষয়ে এক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রচলিত রীতি অতিক্রম করে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল এবং ইংল্যাণ্ডে গমন করেন, ইউরোপীয় শিক্ষিকাদের কাছে শিক্ষা ও আদবকায়দা অধ্যয়ন করেন, সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গে অবাধে যোগদান করেন, বাঙালী মহিলাদের জন্য নতুনধরনের পোষাকের প্রচলন করেন, 'বালক' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ছিলেন সূক্ষ্মরুচি ও সংস্কৃতিমনস্কা মহিলা। উনবিংশ শতকের সামাজিক পরিবেশে তিনি ময়দানে স্বামীর সঙ্গে অশ্বারোহণে ভ্রমণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপর পুত্রবধূ, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নিপময়ী দেবী পেশাদার শিক্ষকের কাছে সেতার: ছবি আঁকা চর্চা করতেন। স্বর্ণকুমারী

দেবীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চৌদ্দ বছর বয়সে স্বামীর আগ্রহে তিনি শিশুকন্যা হিরন্ময়ী সহ বোম্বাই যান, ইংরেজী শিক্ষা অর্জনের জন্য। নিজ জীবনে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের এই অবদানকে স্বর্ণকুমারী দেবী সগৌরবে স্বীকার করতেন।[১]

স্বর্ণকুমারী দেবীর পারিবারিক পরিবেশ ও তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ তাঁকে উনবিংশ শতকের বাংলার মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করে তোলে। বঙ্গ মহিলাদের সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবীর চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে, তাঁর পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে এবং সর্বোপরি তাঁর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। তিনি প্রায় সাতাশটি গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে পাঁচটি ছিল গদ্যরচনা। তাঁর দুটি উপন্যাস, চোদ্দটি গল্প এবং একটি নাটক ইংরেজীতে অনুদিত হয়। তাঁর রচনাগুলিতে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিন্তু অভিজাত, শিক্ষিত ও ব্রাহ্ম পরিবারের সদস্যা হওয়ার দরুন তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একধরনের বৈপরীত্য ও অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। সমাজের দরিদ্র, অশিক্ষিত, গ্রাম্য মানুষদের দৈনন্দিন সমস্যা ও মানসিকতা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে অনুপস্থিত। বরং তাঁর মানসিকতার মধ্যে নারী প্রগতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। তিনি তাঁর উপন্যাস 'স্নেহলতাতে' (১৮৯০-৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) হিন্দু বিধবাদের সমস্যাকে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। সমাজ ও পরিবারের বিধিনিষেধের বেড়াজালে পড়ে নায়িকার শিক্ষিত মানসিকতা কিভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার চিত্র খুবই স্পষ্টভাবে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। অথচ স্বর্ণকুমারী দেবী বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যথেষ্ট অস্পষ্ট মানসিকতার শিকার ছিলেন। ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে তিনি 'বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহ আবশ্যক, কারণ তা না হলে অল্পবয়সী বিধবাদের 'চরিত্রস্খলনের' সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হিন্দুসমাজ ও পরিবারে বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কীত ধারণা এত সুদৃঢ় যে কোন মহিলাই সাধারণত পুনর্বিবাহের পক্ষপাতী নয়।[২] মহিলাদের আত্মবিকাশের জন্য পুঁথিগত শিক্ষার আবশ্যকতাকে স্বীকার করলেও তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে শুধুমাত্র শিক্ষিত মানসিকতা বা আর্থিক স্বনির্ভরতা সমাজে মহিলাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে অপারগ। তাঁর অপর উপন্যাস 'কাহাকে' (১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) এর নায়িকা হল ইংরেজী শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত পরিবারের পশ্চিমী আদবকায়দায় অভ্যস্ত এক তরুণী। একজন পুরুষের প্রতি তার মানসিক আবেগ ও অভিব্যক্তি, তার আকাঙ্খা, জীবনসঙ্গী সম্পর্কে তার কল্পনা ও বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাত উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, সমাজের সাধারণ মহিলাদের

মানসিকতার প্রতিফলন তাঁর রচনাগুলিতে পাওয়া যায় না। একই ধরনের চিন্তাধারা লক্ষিত হয় ভারতী পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা ও সম্পাদকীয়গুলিতে। তিনি উনবিংশ শতকীয় শিক্ষিত ব্রাহ্ম মহিলাদের অন্যতমা ছিলেন, যাঁরা বিজ্ঞান চর্চাকে জনপ্রিয়তা দান করেন। বাঙালী মহিলাদের বিজ্ঞান সচেতনতা সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে অনেকাংশেই সাহায্য করে, তা বলাই বাহুল্য। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তিনি রচনা করেন 'পৃথিবীর উৎপত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ।[৫] তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে ছিল 'পৃথিবীর পরিণাম', 'ভূগর্ভ', 'সৌরপরিবার', 'সূর্য', 'বিজ্ঞানশিক্ষা', 'ছায়াপথ', 'তারকারাশি' ইত্যাদি।[৬]

সমাজ সংস্কার বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজস্ব রচনার সংখ্যা প্রচুর। সেইসঙ্গে তিনি তাঁর সম্পাদনায় ভারতী পত্রিকায় মহিলাদের বিষয়ে সাহিত্যরচনাকেও বিশেষভাবে উৎসাহ দেন। 'ভারতী' তে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'লীলা' গল্পটিতে এক হিন্দুবালবিধবা ও এক সুখী, তরুণী, গৃহবধূর মধ্যে দৈনন্দিন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বৈপরীত্যকে স্বর্ণকুমারী দেবী বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন।[৭] ভারতী পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা কালে স্বর্ণকুমারী দেবী যেমন একদিকে নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন, তেমনই মহিলাদের জন্য প্রচলিত, প্রথাগত প্রশিক্ষণের উপযোগিতাও ব্যক্ত করেন যাতে তাদের প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকে। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে গৃহই হল মহিলাদের নিজস্ব ক্ষেত্র এবং গৃহকর্তব্য পালনই তাদের মূলধর্ম।[৮] তবে তিনি একথাও স্বীকার করতেন যে নারী শিক্ষার আলোকে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার দূর হতে পারে এবং যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারেই সামাজিক প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করা উচিৎ।[৯] ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতা রমাবাঈ-এর এক বক্তৃতার যে সমালোচনা করেন, সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী তাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রত্যুত্তর রচনা করেন। তার মধ্যে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে তৎকালীন ধারণা, রমাবাঈ-এর উদ্যোগ ও সেইসঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পার্থক্য, পারিবারিক জীবনে মহিলাদের চিরাচরিত দায়িত্ব ও তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং নারী স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক গণ্ডীকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারেননি।[১০]

শুধুমাত্র সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার মধ্যেই নয়, নারী স্বাধীনতা ও নারীদের জীবনে উন্নয়নের প্রশ্নটিকে স্বর্ণকুমারী দেবী বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখেও বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হন। মহিলাদের জন্য সংগঠন স্থাপনের মধ্যে তাঁর এই মানসিকতার আভাষ মেলে। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের থেকে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী। তাঁর কাশিয়াবাগান-এর আবাসস্থলে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের

মহিলারা এবং এই সোসাইটির সদস্যারা মিলিত হয়ে মহিলাদের দৈনন্দিন সমস্যা, গৃহবধূদের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। পরবর্তীকালে এই সোসাইটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে কলকাতাবাসী ঐ মহিলারা স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে 'সখি সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতির নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরের শিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিক্ষিতা অথচ দরিদ্র অবিবাহিতা মহিলা ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দান করা, ভবিষ্যতে তাদের অন্তঃপুরে শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত করা, স্থানীয় এলাকার ধর্ষিতা মহিলাদের আর্থিক সাহায্য দান করা, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনি সাহায্য দেওয়া, মহিলাদের হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করে তাদের শৈল্পিক দক্ষতাকে উৎসাহিত করা এবং মেলার মাধ্যমে সেগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।[৯] সখি সমিতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেন বঙ্গমহিলাদের পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান, সমাজের প্রয়োজনে দয়া, উদারতা প্রভৃতি গুণের প্রকাশ ঘটিয়ে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। সখি সমিতি অবশ্য তাদের সমাজসেবামূলক কার্যাবলী পরিচালনা করত অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এবং আর্থিক সমস্যার জন্য মহিলাদের শিক্ষাদান, ভরণপোষণ, শিক্ষয়িত্রীরূপে তাদের নিয়োগ সমস্ত প্রক্রিয়াই যথেষ্ট ব্যাহত হত।[১০] এজন্য সখিসমিতি কলকাতার বিদগ্ধ মহলে একদিকে যেমন অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করে, তেমনই প্রতিবছর সমিতির উদ্যোগে মহিলা শিল্পমেলাও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই মহিলাশিল্পমেলা ছিল সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও মহিলাদের জন্য আয়োজিত মেলা। এই মেলা প্রথম আয়োজিত হয় ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে।[১১] সখিসমিতির শিল্পমেলার নেত্রীবর্গই সমিতির কর্ত্রীসভার সদস্যা ছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন 'সম্ভ্রান্ত' বংশীয়া মহিলা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, বরদাসুন্দরী ঘোষ, ললিতা রায়, মনোমোহিনী দত্ত, সৌদামিনী গুপ্ত, থাকমনি মল্লিক, সরলা রায়, প্রসন্নতারা গুপ্ত, হিরন্ময়ী দেবী, সৌদামিনী দেবী, বসন্তকুমারী দাস, চন্দ্রমুখী বসু, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, মৃণালিনী দেবী, বিধুমুখী রায়, প্রসন্নময়ী দেবী, সুরবালা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী।[১২] প্রথম বছর মহিলা শিল্পমেলার উদ্বোধন করেন বাংলার লেফট্যানেন্ট জেনারেল স্টুয়ার্ট ক্যালভিন বেলির স্ত্রী। এই মেলা চলে তিন দিন ধরে। মহিলাদের হস্তশিল্পের নানা নমুনা এই মেলায় প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়। প্রথম বছরে মেলা থেকে উদ্যোক্তাদের লাভ হয় প্রায় ৪৩৪ টা. ১৫ পয়সা।[১৩] ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মেলায় প্রথম পুরস্কার বিজয়িনী ছিলেন শ্রীমতী মানুক। ভুবনমোহিনী দাসী দ্বিতীয় পুরস্কার পান এবং কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী ছিলেন তৃতীয় স্থানাধিকারিণী। চতুর্থ পুরস্কারের অধিকারিণী হন শ্রীমতী সরকার।[১৪] ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সখিসমিতির সদস্যা সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশজন। এই সমিতি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পারস্পরিক যোগাযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু যথেষ্ট অর্থানুকুল্য না থাকায় সমিতির কর্মপ্রক্রিয়া বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি।[১৫] স্বর্ণকুমারী দেবীর সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রধান সহায়িকা ছিলেন তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী। হিরন্ময়ী দেবী মহিলাদের কারিগরী শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের উপার্জনক্ষম করে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন। এজন্য তিনি মহিলা শিল্পসমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল 'অন্তঃপুরশিক্ষার' উদ্যোগকে আরো প্রসারিত করা, — মহিলাদের হস্তশিল্পের নানাদিক সম্পর্কে অবহিত করা ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই মহিলা শিল্প সমিতির উদ্যোগে মহিলারা গামছা, শাড়ি, লেস ইত্যাদি প্রস্তুত করত। রবীন্দ্রনাথের গৃহেই সর্বপ্রথম এই সমিতির অধিবেশন বসে। তিনি গ্রামাঞ্চলেও এই সমিতির কর্মপ্রক্রিয়া প্রসারিত করার জন্য বার্ষিক মেলার আয়োজন করতেন।[১৬] হিরন্ময়ী দেবী 'সেবাব্রত' শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরানগরস্থিত হিন্দু বিধবাআশ্রমের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখিসমিতি' তার অস্তিত্ব হারাবার পূর্বে এবং বরানগরের হিন্দু বিধবা আশ্রম ক্রমশ হিরন্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা শিল্পাশ্রম' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর ঐ সংগঠন পরিচিত হয় 'হিরন্ময়ী বিধবাশিল্পাশ্রম' নামে। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন। এই সংগঠন সখিশিল্পসমিতির দায়িত্বভারও গ্রহণ করে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থসত্ত্ব এই সংগঠনকে দান করেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন উনবিংশ শতকের বাংলার নারী উন্নয়নের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক সক্রিয় কর্মী। তাঁর উদার পারিবারিক প্রেক্ষাপট, সাহিত্য প্রতিভা, সাংগঠনিক দক্ষতা সবকিছুই সম্মিলিতভাবে নারী প্রগতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও প্রচেষ্টাকে পরিপুষ্ট করে। তাঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল উনবিংশ শতকের শেষভাগে কলকাতার শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের মানসিকতা। এঁরা মূলত ছিলেন ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত এবং নারীপ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের মানসিকতা কতগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। যথা — নারীদের জন্য অন্তঃপুর ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মহিলাদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি করা, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুসারী সহযোগী ও সহমর্মী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ধারণাকে দৃঢ় করা, পর্দাপ্রথার বাধানিষেধ অতিক্রম করে মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পুরুষদের সমতুল্য অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া, মহিলাদের পোষাক সংক্রান্ত প্রাচীন ধারণার বদলে 'আধুনিক' পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা, বিধবাদের মানসিক ও সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার জন্য আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কিন্তু জীবন ও সমাজের প্রতিক্ষেত্রে

মানুষ হিসাবে মহিলাদের অধিকারের সংরক্ষণ, তাদের আত্মমর্যাদা বজায় রাখার জন্য এক পরিপূর্ণ প্রয়াস স্বর্ণকুমারী দেবীর সমাজসংস্কারের ধারণার মধ্যে সামিল ছিল না। বরং প্রাত্যহিক জীবন ও সামাজিক পরিবেশের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত লিঙ্গ ভিত্তিক সীমারেখা বজায় রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি, তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সমস্তক্ষেত্রেই এই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে উনবিংশ শতকীয় সমাজসংস্কারের ধারার এটিই ছিল মুখ্য বৈশিষ্ট্য এবং স্বর্ণকুমারী দেবীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সূত্র-নির্দেশ

১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *'বঙ্গের মহিলা কবি; স্বর্ণকুমারী দেবী'* - ২য় সংস্করণ, ১৩৬০ সাল

২। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা', *ভারতী*, ভাদ্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

৩। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'পৃথিবীর উৎপত্তি', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পৌষ ১৮০২ শকাব্দ

৪। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'পৃথিবীর পরিণাম', *ভারতী*, ভাদ্র, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ 'ভূগর্ভ', *ভারতী*, আশ্বিন, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ 'সৌরপরিবার', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১৮০৩ শকাব্দ 'সূর্য', ভারতী ও বালক, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ 'বিজ্ঞানশিক্ষা', *ভারতী*, শ্রাবণ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ 'ছায়াপথ', *বালক*, ফাল্গুন, ১২৯২ বঙ্গাব্দ 'তারকারাশি', *ভারতী ও বালক*, মাঘ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ

৫। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'লীলা', ভারতী, *জ্যৈষ্ঠ* ১২৯১

৬। ঈশানচন্দ্র বসু, 'নারীনীতি' (গ্রন্থ সমালোচনা) - স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, শ্রাবণ, ১২৯১

৭। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'স্ত্রী আচার', *ভারতী*, ভাদ্র, ১২৯১

৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'রমাবাঈ', *ভারতী ও বালক*, শ্রাবণ, ১২৯৬

৯। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'সখিসমিতি', *ভারতী ও বালক*, পৌষ, ১২৯৮

১০। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'সাতবৎসরে সখিসমিতি', *ভারতী*, আষাঢ়, ১৩০০

১১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী (তৃতীয় খণ্ড)*, প্রথমসংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৯৪

১২। চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল (সপ্তদশ সংস্করণ)*, বৈশাখ, ১৪০০

১৩। প্রশান্ত কুমার পাল, *রবিজীবনী (তৃতীয় খণ্ড)*, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৯৪

১৪। চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল (সপ্তদশ সংস্করণ)* বৈশাখ, ১৪০০

১৫। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'সাতবৎসরে সখিসমিতি', *ভারতী*, আষাঢ়, ১৩০০

১৬। হিরন্ময়ী দেবী, 'প্রস্তাব; শিল্পসমিতি বা মহিলা শিল্পসমিতি', *ভাণ্ডার*, খণ্ড ১, সংখ্যা ১২, চৈত্র, ১৩১২

প্রবাসী পত্রিকায় বাঙালি নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ : ১৯০১-১৯৪৭

আরিফা সুলতানা

বাংলাভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সমূহের মধ্যে প্রবাসী একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় বিশ শতকের শুরুতে। প্রকাশের পর থেকে ভারতের স্বাধীনতার উত্তরকালেও এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে। প্রথম থেকেই পত্রিকাটি তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রকাশিত এসব বিষয়সমূহে সমকালীন জীবন-সমাজভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অবহেলিত ও পশ্চাদপদ বাঙালি নারী বিষয়ক ভাবনাকে পত্রিকাটি প্রাধান্য দেয়। নারী শিক্ষা, বাল্যবিয়ে, বিধবা বিয়ে নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নারীকল্যাণে স্থাপিত বিভিন্ন সংগঠনের কার্যাবলী ইত্যাদি যাবতীয় নারী বিষয়ক সংবাদ প্রবাসীতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে পত্রিকাটিকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে আলোচ্য কালপর্বের নারীশিক্ষা প্রসঙ্গই শুধু নয়, সামগ্রিক অবস্থাও আলোচনা করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গেই আলোচনা সীমাবদ্ধ। প্রবাসীতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন থেকে (১) নারীশিক্ষা সম্বন্ধে সমকালীন ভাবনা (২) নারীশিক্ষা উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা (৩) নারীশিক্ষা উন্নয়নে বেসরকারী প্রয়াস (৪) নারীশিক্ষার প্রকৃত অবস্থা (৫) নারীশিক্ষাব অগ্রগতিতে অন্তরায় ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

উনিশ শতকের বাংলায় 'শিক্ষিত হলে নারী বিধবা হবে' এমন ধরনের নেতিবাচক মত সমাজে প্রচলিত ছিল। ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে এ মত যে অচল হয়ে পড়ে প্রবাসীতে প্রকশিত নারীশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ-প্রবন্ধসমূহ থেকে তা স্পষ্ট হয়। তবে এ কালপর্বেও নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহুধা বিভক্ত সমাজে একদল ছিল প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার বিরোধী। তাঁদের মতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও নারীরা শিক্ষিত হতে পারে। নারীরা গুরুজনদের কাজ দেখে বাড়িতেই শিখবে বলে তাঁরা অভিমত দেয়।[১] আরেক দলের মতে নারীশিক্ষা পুরুষদের অনুরূপ না হয়ে ভিন্ন হওয়া উচিৎ। মৌলিক বিজ্ঞান দর্শনের পরিবর্তে তারা নারীদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সূচীশিল্প, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাকে জরুরী

মনে করেছেন।[২] একই সঙ্গে তারা নারীদের সহশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। নারী চাকরী করে সংসার প্রতিপালন করবে না বলে উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁরা এ রকম নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরা এও মনে করতেন যে উচ্চ শিক্ষা নারীস্বাস্থের অবনতি ঘটায় এবং এতে নারীসুলভ কমনীয়তা কমে যাওয়ার ফলে তারা পুরুষের মতো হয়ে যায়।[৩] অন্য আরেক দলের মত ছিল সরাসরি নারী শিক্ষার অনুকূলে। তারা যতদূর সম্ভব নারীকে শিক্ষিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৪] মায়েরাই সন্তান লালন পালনের দায়িত্বভার বহন করেন বলে এ দলভুক্তদের কেউ কেউ পুরুষ শিক্ষার চেয়ে নারী শিক্ষাকে বেশি জরুরী বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] প্রবাসীতে প্রকাশিত নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচিত এসব মতভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে একটি কথা বলা যায় যে, আলোচ্যকালপর্বে অর্থাৎ ১৯০১-১৯৪৭ সময়কালে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। তবে নারীশিক্ষা-প্রণালী নিয়ে বিতর্কের অবসান তখনও হয়নি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে একটি সার্বজনীন শিক্ষার পরিবর্তে জনগণের একাংশের মনোভাব তখনও মেয়েদের জন্য আলাদা পাঠ্যসূচি এবং পৃথক শিক্ষায়তনের পক্ষে ছিল। এমনকি তারা পুরুষের শিক্ষা-চাকুরীকে নির্বিঘ্ন করা ও সংসারের উন্নতি করা সহ গৃহকর্মে পারঙ্গমতার জন্য স্ত্রীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজনেই কেবল নারী শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

দুই.

প্রবাসী পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে নারীশিক্ষার উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। যেটুকু জানা যায় তা থেকে মনে হয় এ ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াস ছিল অপ্রতুল। এতে দেখা যায় সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষশিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছিল নারীশিক্ষার জন্য তার অর্ধেকও ব্যয় করেনি। ১৯১৫-১৬ সালের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট হতে দেখা যায় ঐ বছর বাংলায় সকল পর্যায়ে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় ছিল মোট ১,৪৯,১১,৭৭১.০০ টাকা ও ছাত্রীদের জন্য ১৪,৮২,৭৯২.০০ টাকা।[৬] অর্থাৎ ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল দশগুণেরও বেশি। ১৯৩১-১৯৩২ সালে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা খাতে নারী পুরুষদের জন্য ব্যয় বরাদ্দের বৈষম্য তেমন দূর হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এ বৈষম্য দূর করার কার্যকর সরকারী প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় না। তাই দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৯৪২ সালে সরকারী তহবিল থেকে ছেলেদের স্কুলের জন্য খরচ করা হয় ৩৬ লক্ষ টাকা আর মেয়েদের স্কুলের জন্য মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। একই বছর জেলা ও পৌর বোর্ড সমূহ থেকে ছেলেদের স্কুলবাবদ খরচ হয় ২২ লক্ষ টাকা আর মেয়েদের জন্য মাত্র ২ লক্ষ টাকা।[৭]

প্রবাসী পত্রিকা শুধু নারীশিক্ষার পিছনে সরকারী অর্থ বরাদ্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, এটি নারী শিক্ষার অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার বিষয়টিও তুলে ধরে। ১৯৩০-৩১ সালের বঙ্গীয় শিক্ষা রিপোর্টে বাংলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় ঐ সালে ছাত্রদের জন্য প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল ৪২,৭১২ টি, মধ্য বাংলা স্কুল ছিল ৫৪টি, মধ্য ইংরেজি স্কুল ছিল ১৮১৫ টি এবং উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল ১০৫৫টি। অথচ ছাত্রীদের জন্য এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৯৭৭, ১২, ৫১ ও ৩৪টি। এতে দেখা যায় মেয়েদের জন্য প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা সামান্য কিছু থাকলেও তার পরবর্তী স্তরের শিক্ষার আয়োজন ছিল খুবই কম। সারা বাংলায় ছেলেদের জন্য যেখানে কলেজ ছিল ৪৪টি মেয়েদের জন্য সেখানে ছিল মাত্র ৪টি। এর মধ্যে একটি আবার রিপোর্ট প্রকাশের বছর বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলের সংখ্যায়ও ছিল উল্লেখযোগ্য বৈষম্য। শিক্ষকদের জন্য ৯২ টি ট্রেনিং স্কুলের বিপরীতে শিক্ষিকাদের ট্রেনিং স্কুল ছিল মাত্র ১০টি।[৮] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এ প্রতিবেদন থেকে সহজেই অনুমিত হয় বাংলায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকার যথেষ্ট বন্দোবস্ত ও সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রবাসী থেকে কলেজ পর্যায়েও নারীশিক্ষা বিস্তারে সরকারী অনীহার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় সরকারী লেডী ব্রেবর্ণ কলেজ স্থাপিত হয়। এর আগে পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলাতেই বেথুন কলেজ ছিল একমাত্র সরকারী মহিলা কলেজ। অথচ এ কলেজটির উন্নয়নেও সরকার যত্নবান নয় বলে প্রবাসী মতামত প্রকাশ করে।[৯] পরবর্তী সময়েও প্রবাসী বেথুন কলেজ সম্পর্কে সরকারের একই ধরনের অমনোযোগিতার সংবাদ সবিস্তারে পরিবেশন করে।[১০]

তিন.

সরকারী অমনোযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরেই প্রবাসী পত্রিকা নারীশিক্ষা উন্নয়নে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে নি; একই সঙ্গে পত্রিকাটি বেসরকারী পর্যায়ে নারীশিক্ষা প্রসারে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সে সবের সংবাদও গুরুত্বসহ প্রকাশ করে। ১৯১১ সালে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারত বর্ষের সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্রিত করে তাদের নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কলকাতায় ভারত স্ত্রী মহামন্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। এ মহামন্ডলের উদ্যোগে অন্তঃপুরে নারীশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে প্রবাসী এর বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করে।[১১]

ভারত স্ত্রী মহামন্ডলের পর কলকাতায় ১৯১৯ সালে নারীশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়। 'নারীশিক্ষা সমিতি' নামে স্থাপিত এ সমিতির সভাপতি

ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং লেডী অবলা বসু।[১২] নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপনই ছিল এ সমিতির প্রথম ও অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই যে সমস্ত গ্রামে একটিও স্কুল স্থাপিত হয়নি, সেখানে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্রত এ সমিতি গ্রহণ করে। কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীর অভাব পূরণের লক্ষ্যে সমিতি ১৯২২ সালে বিদ্যাসাগর বানীভবন নামে একটি বিধবা আশ্রমও স্থাপন করে।[১৩] বিনা খরচে এ আশ্রমে দরিদ্র বিধবাদের শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯১৯ সালে নারীশিক্ষা সমিতি বালীগঞ্জে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং ১৯৩০ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী এ সমিতি ১৯৩১ এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৪০টি বিদ্যালয় স্থাপন করে।[১৪] ১৯৪১ সালে এ সংখ্যা ৫৬ টিতে উন্নীত হয়।[১৫] এভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত নারীশিক্ষা সমিতি নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে তার প্রয়াস অব্যাহত রাখে। এসব সমিতি ছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ১৮৯৩ সালে আত্মপ্রকাশকৃত মাতাজী গঙ্গাবাঈ-এর মহাকালী পাঠশালা,[১৬] ১৯২৫ সালে স্থাপিত 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'[১৭] এবং এগুলোর শাখাসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রবাসী ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করে।

কলকাতা ছাড়াও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে নারীশিক্ষার উন্নয়নে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল 'দীপালি' সমিতি। শ্রীমতী লীলা নাগ ও অপর ক'জন মহিলার উদ্যোগে ১৯২৩ সালে ঢাকায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী-কল্যাণে এর বহুবিধ কর্মসূচীর মধ্যে একটি ছিল শিক্ষা বিস্তার। এ সংগঠনের প্রয়াসে স্থাপিত দীপালি হাইস্কুল, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কিত সংবাদও প্রবাসী প্রকাশ করে।[১৮] এছাড়া লীলা নাগের উদ্যোগে 'নারী শিক্ষা মন্দির' নামে একটি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হলে প্রবাসীতে তার পক্ষেও ইতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়।[১৯] প্রবাসী থেকে জানা যায় ঢাকা ছাড়া কলকাতাতেও লীলা নাগ দীপালি সঙ্গের কর্মসূচী বিস্তৃত করেছিলেন।

দীপালি সংঘের পর ঢাকায় যে প্রতিষ্ঠানটি নারীশিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখে সেটি হল ইডেন স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী চারুশীলা দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দ আশ্রম'। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিখ্যাত কর্মী শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী কর্তৃক আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কেন্দ্র ও আনন্দ আশ্রমের শাখা হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রমবাসী মেয়ে ছাড়া বাইরের মেয়েরাও এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেত। এখানে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও সন্তান

পালন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া আশ্রমে স্থানীয় গৃহিনী ও বয়স্কা বধূদের অবসর সময়ে জ্ঞানার্জন ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তবে আশ্রমের অন্যতম কাজ ছিল দরিদ্র ও নিরাশ্রয় মেয়েদের আশ্রমে রেখে শিক্ষাদান করা।[২০]

সমকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়া সভা সমিতির মাধ্যমেও অনেকে নারীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে ১৯০৬ সালে বেথুন কলেজে পার্সি, আরবি, বাঙালি, গুজরাটি, মাদ্রাজি, উত্তর পশ্চিম ও উৎকল দেশীয় নানাবর্ণ ও জাতির ৫০০ শতাধিক মহিলা একত্রিত হয়েছিলেন এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন।[২১] মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয়ের অভাবে যাতে নারীশিক্ষা সংকুচিত হয়ে না পরে সেজন্য ১৯২৪ সালে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী রাজকুমারী দাসের নেতৃত্বে একটি মহিলা ডেপুটেশন মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্র নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দশ বছর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদের একসঙ্গে শিক্ষা দেয়ার আবেদন করেন। এমনকি তারা মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করারও দাবি জানান।[২২] ঢাকায় বালিকা বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রীগণের এক সম্মেলনেও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের অন্তর্গত স্থানসমূহের বাসিন্দা বালিকাদের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে এ ধরনেব সমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'নিখিলভারত নারী সম্মিলনী''। ১৯২৮ সালে এর প্রথম অধিবেশন হয়। বিভিন্ন প্রদেশে এ সম্মিলনীব শাখা ছিল এবং প্রাদেশিক সম্মিলনীসমূহের উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিয়ে নিবারণ, মেয়েদের শারীরিক উন্নতি বিধান বিষয়ে জনমত সুগঠিত করা। এ উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালে বাংলাসহ ভারতের নানা প্রদেশে 'স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণী সভা' গঠিত হয় ও ৩০টির মত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সম্মেলনসমূহের অধিবেশন শেষে ১৯২৯ এ দিল্লীতে নিখিলভারত নারীশিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।[২৩] নারীশিক্ষা সম্পর্কিত এসব ব্যক্তিগত ও মিলিত উদ্যোগের খবর প্রবাসী যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। প্রবাসীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নারীশিক্ষার উন্নয়নে যে সব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল সেগুলোর অধিকাংশই পরিচালিত হতো নারীদের দ্বারা। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতেন বলে এরা স্ব সম্প্রদায়ের উন্নয়নে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন।

চার.

প্রবাসীতে প্রকাশিত নারী শিক্ষা সংক্রান্ত বেসরকারী ও সীমিত পরিসরে হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকাবী পদক্ষেপ থেকে অনুমিত হয় নারীশিক্ষা উন্নয়নেব পথ আলোচ্যকালে কিছুটা সুগম হয়েছিল। তবে প্রবাসী পত্রিকার প্রতিবেদনসমূহ থেকে এ

ক্ষেত্রে যে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রবাসীতে শিক্ষা বিষয়ক সরকারী প্রতিবেদন সমূহ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় নারীশিক্ষার ক্রমোন্নতির বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না। ১৯২৪-২৫ সালের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ থেকে জানা যায় ঐ বছর বাংলায় মোট ৩,৮০,৪৭০ জন মেয়ে লেখাপড়া করত। তবে এদের শতকরা ৯৫ জনই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালযের ছাত্রী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল ৪৫০৪ জন এবং কলেজ পর্যায়ে মাত্র ২৮৪ জন।[২৪] সমকালে বাংলার নারীশিক্ষার এ হতাশাজনক চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধেও প্রতিফলিত হয়।

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকেও নারীশিক্ষার একই ধরনেব চিত্র পাওয়া যায়। তবে ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় এ সময় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ইংরেজি, মধ্য ইংরেজি ও মধ্য বাংলা স্কুল সমূহে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলেজ পর্যায়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল সব চাইতে বেশি। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করে সবকার ১৯৩৯ সালে কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ স্থাপন কবেন।[২৫] তাছাড়া যুক্তরাজ্যে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারতীয় মহিলাদের দুটি সরকারী বৃত্তি প্রদান করেন।[২৬] এসব সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী-পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রবেশিকা, এফ. এ., বি. এ ও এম. এ পরীক্ষায় উর্ত্তীণ ছাত্রীদের সংবাদ পরিবেশন করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি জনমত গঠনের উদ্যোগ নেয়। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার্থে মেয়েদের বিদেশ গমন এবং শিক্ষা শেষে ফিরে আসার খবরও গুরুত্বের সাথে পরিবেশন করে।

প্রবাসী থেকে জানা যায় উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকলেও এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ছিল খুবই ধীর এবং পুরুষদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪৬ সালেও এ ক্ষেত্রে নারী অনেক পিছিয়ে ছিল এবং এ সময়ে ছেলেদের তুলনায় ও সামাজিক প্রয়োজনের বিবেচনায় উচ্চশিক্ষায় নারীর অগ্রগতি মোটেই আশানুরূপ ছিল না।[২৭] বস্তুত প্রবাসী নিশ্চিতভাবেই পাঠকের কাছে পরিষ্কার করে যে বাঙালি নারীদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত একশত বছরের প্রয়াস খুব একটা সাফল্য লাভ করেনি।

পাঁচ

বাংলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তার রিপোর্ট থেকে জানা যায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নারীশিক্ষার তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি।[২৮] পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও যে এ ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি প্রবাসীর রিপোর্ট ও প্রতিবেদনসমূহ সে সাক্ষ্য বহন করে। সেই সঙ্গে কি কারণে নারী শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে এবং কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব সে বিষয়গুলো তুলে ধরে। প্রবাসীর প্রতিবেদন

অনুযায়ী (১) বালক ও বালিকার প্রতি যত্নের তারতম্য, (২) বালিকাদের অবসরের অভাব, (৩) বাল্যবিয়ে ও পর্দাপ্রথা (৪) পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয়ের অভাব, (৫) উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও উপযোগী শিক্ষা প্রণালীর অনুপস্থিতি (৬) দারিদ্র (৭) সরকারের অমনোযোগিতা প্রভৃতি নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়।[২১] এসব অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্য প্রবাসী নির্দেশিত উপায়গুলো হলো (১) শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই নারীশিক্ষার জন্য উৎসাহী ও উদ্যমী হওয়া (২) সামাজিক অনুষ্ঠান বা পূজা পার্বণে বস্ত্র ও খাদ্য উপহারের পরিবর্তে সৎ গ্রন্থ উপহার দিয়ে অশিক্ষিতদিগকে শিক্ষার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেয়া (৩) প্রতিকূল পরিবারে অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীকে উৎসাহ দান (৪) বিয়ের ব্যয় সঙ্কোচ করে করে কন্যাশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করা (৫) শিক্ষিত ব্যক্তির অশিক্ষিত বালিকা বিয়ে না করা (৬) কন্যার মায়ের স্বার্থত্যাগ ও যত্নের চেষ্টা করা (৭) বাল্যবিয়ে বন্ধ করা এবং সকল পর্যায়ে সহশিক্ষা চালু করা।[২২] প্রবাসীর এসব প্রয়াস নারী শিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

ছয়.

সবশেষে আমরা বলতে পারি ১৯০১-১৯৪৭ কালপর্বে প্রবাসী পত্রিকায় নারীশিক্ষা সম্পর্কে জনমতের যে প্রতিফলন ঘটে তা থেকে ঐ সময়ের নারীশিক্ষার ক্রমোন্নতির একটি চিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট করে। আমরা লক্ষ্য করি নারীশিক্ষা সম্পর্কে উনিশ শতকীয় নেতিবাচক মনোভাব এ কালপর্বে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা, উদ্যোগের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে নারীদের মধ্যে এ কালপর্বে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয়নি। এ সময় পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রায় সকলেরই বক্তব্য ছিল আদর্শ জননী হিসেবে নারীর ভূমিকাকে সার্থক করার জন্যই নারীশিক্ষা প্রয়োজন। আদর্শ জাতি গঠনের লক্ষ্যে সমাজের ব্যাপকসংখ্যক নারীদের শিক্ষিত করা কিংবা নারীমুক্তি, নারীর কর্মসংস্থান, সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে জোর দিয়ে নারীকে শিক্ষিত করার কথা এ কালপর্বে তেমন কেউ ভাবেননি। ফলে আলোচ্য কালপর্বে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি।

সূত্র-নির্দেশ

১। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ১০৯।

২। ঐ, প্রভাত সান্যাল, 'নিখিল ভারত স্ত্রী শিক্ষা সম্মিলনী', 'প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৫, পৃঃ ৫০-৫৬।

৩। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ১০৯।

৪। *ঐ*, পৃঃ ১১০, অনাথনাথ বসু, 'বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ', *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৫২, পৃঃ ১৭৪।
৫। রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, 'ছেলেমেয়েদের একত্র-বিদ্যাশিক্ষা', *প্রবাসী*, পৌষ, ১৩৫০, পৃঃ ৪০৬। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমাজের বর্তমান অবস্থা ও মহিলাদের কর্তব্য', *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৪৮৬-৪৮৭।
৬। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ১০৮।
৭। অনাথনাথ বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭৫।
৮। রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪০৭।
৯। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ১১২-১১৩।
১০। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃঃ ৭৫৫।
১১। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩১৮, পৃঃ ৬১৯-৬২০।
১২। *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩২৮, পৃঃ ৯৭।
১৩। *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩৩১, পৃঃ ৫৪৬।
১৪। *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৩৮, পৃঃ ৮৯৩।
১৫। *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৪৮, পৃঃ ১`৮।
১৬। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, পৃঃ ১১৩।
১৭। *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৩৫, পৃঃ ৭৪৩।
১৮। *ঐ*, কার্ত্তিক, ১৩৩৫, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।
১৯। *ঐ*।
২০। নলিনী কিশোর গুহ, 'ঢাকার আনন্দ আশ্রম', *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃঃ ৬৩০ ৬৩৩।
২১। *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩১৩, পৃঃ ৬৪০।
২২। *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩৩০, পৃঃ ৬১২।
২৩। প্রভাত সান্যাল, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৫৩-৫৮।
২৪। *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৩৩, পৃঃ ৭৫৫।
২৫। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, পৃঃ ১৪৫।
২৬। *রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশান ইন বেঙ্গল* ১৯৩৮-৩৯, পৃঃ ২০-২২।
২৭। অনাথনাথ বসু, পূর্বোক্ত, *প্রবাসী*, পৃঃ ১৭৪।
২৮। *জেনারেল রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশান ইন বেঙ্গল*, ১৮৯৫ ৯৬, পৃঃ ৭৯ ২১৩২।
২৯। প্রভাত স্যানাল, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৫৫।
৩০। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪৮৬-৪৮৭ এবং রেণুকা মুখোপাধ্যায় 'বর্তমান ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতগুলি সমস্যা'; *প্রবাসী*, বৈশাখ ১৩৫২, পৃঃ ৬৭ ৬৮।

ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যে নারী

শুভদীপ মজুমদার

একথা অনস্বীকার্য যে মধ্যযুগের বাংলার নির্ভরযোগ্য দলিল খুঁজতে গেলে আমরা সঙ্কটের মুখোমুখি হই। সামাজিক, রাজনৈতিক দিক থেকে মধ্যযুগের বাংলার যে ছবি আমরা পাই, তা অসম্পূর্ণ এবং এই অন্ধকারে "an oasis in the desert of historical significance." একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, মীর্জা নাথানের 'বাহ্‌রিস্তান-ই-ঘাবী'। তবু বাংলা সাহিত্য এই অন্ধকারের মধ্যেই নিজস্ব আলোয় পূর্ণতা পেয়েছে। এরই সাথে বাংলা সাহিত্যে মিশে গেছে এক নতুন স্রোত — ইসলামীয় সাহিত্য। হিন্দু কবিরা যেখানে তাদের সাহিত্যে দেব-দেবীর গুণকীর্তন করেছে, সেখানে মুসলিম কবিরা বিভিন্ন প্রেম লীলা ও গীতিকাব্যের জন্ম দিয়েছে। ইসলামী বাংলা সাহিত্যে নারীর যে স্থান ছিল, তাই আমার আলোচ্য বিষয়।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। এরফলে মধ্যযুগীয় পুরুষ শাসিত সমাজে, নারী সর্বতোভাবে পুরুষ নির্ভর ছিল। কুমারী অবস্থায় পিতার, বিবাহিত জীবনে স্বামীর এবং স্বামীর অবর্তমানে জ্যেষ্ঠপুত্রের অভিভাবকত্বে জীবনযাপন করত। সামাজিক নীতির প্রধান লক্ষ্যই ছিল নারীজাতিকে মূর্খ এবং কোনো বড় কাজ করার অনুপযুক্ত প্রমাণ করা। সংসারে শিশুকন্যা জন্মানো এক লজ্জাকর এবং শোকাবহ ঘটনা ছিল। হিন্দুরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে অপয়া কন্যা তার পিতাকে — "তার অনবধানতবশে জমে যাওয়া অপরাধের বোঝা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না," কারণ মেয়ে "প্রায়শ্চিত্ত" করার অধিকারিণী নয় হিন্দু বিধান মতো। এর সঙ্গে ছিল কলঙ্কজনক আরো কিছু প্রথা — সতী ব্যবস্থা, পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা — যার প্রতিটিরই সামাজিক ছবি আমরা মুসলিম কবিদের লেখনীতে পাই।

ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যের জন্ম-লগ্নে, বহু কবির লেখনি একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে, মহানবী ও খলিফাদের আত্মজীবনীর লেখনের মাধ্যমে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে। রসুল বিজয় এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী'। এই কাহিনী ঠিক ঐতিহাসিক কাব্য নয়, কিছুটা ইতিহাস মিশ্রিত এবং কিছুটা রূপকথা ধর্মী ও তাত্ত্বিক রূপকখচিত প্রেমকাব্য। কাব্যটির দুটি ভাগ। প্রথমটি অনৈতিহাসিক উপাখ্যান,

রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতী কাহিনী এবং দ্বিতীয়টি অর্ধ-ঐতিহাসিক আখ্যান — আলাউদ্দীন - রত্নসেন - পদ্মাবতী প্রসঙ্গ।

জায়সীর 'পদ্‌মাবৎ' কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে দেখা যায় যে একাব্যের প্রথামাংশের রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর রোমান্স কাহিনীটি ঐতিহাসিক জগৎ থেকে বহু দূরবর্তী, — ভারতীয় কাব্যকাহিনীর অনেক কাছাকাছি। এবং পদ্মাবতী চরিত্র এক অবর্ণনীয়, অসামান্য চরিত্র, যা ঐতিহাসিক হয়েও ঐতিহাসিক নয়, অবাস্তব হয়েও বাস্তবিক। তার প্রকাশ আমাদের চেতনে, অবচেতনে, রূপকে, শিল্পে। এক কথায় পদ্মাবতী চরিত্র নিখুঁত সুফী ভাবনার সৃষ্টি — জায়সী ও আলাওল দুজনেই নিশ্চিতভাবে সুফী সাধনায় বিশ্বাসী।

আমরা দোহা অংশটিতে দেখি—

'তিনি আমার সৎগুরু, আমি তাঁর শিষ্যরূপে ভৃত্যের মতো নিয়ত বিনীত হয়ে থাকি।'

পদ্মাবতী আখ্যান, যে রূপকধর্মী কাব্য এবং সুফী ধারণায় প্রভাবিত তা বোঝা যায় 'শুক্লা' সংস্করণের এই স্তবকটিতে।

"মেঁ এহি অরথ পন্ডিতহু সুঝা।
কথা কি হম্‌হ কিছু ঔর না বুঝা।।"

এর কিছু পরে আমরা পাই —

"তন চিতউর মন রাজা কীহ্না।
হিয় সিংঘল বুধি পদমিনি চীহ্না।।
গুরু সুআ জেই পনু দেখারা।
বিনু গুরু জগত কো নিরগুণ পারা।।
নাগমতী য়হ দুনিয়া-ধন্ধা।
বাঁচা সোই ন এহি চিত বন্ধা।।
রাখর দূত মোঙ্গ সৈতানু।
মায়া অলাউদী সুলতানু।।
প্রেম-কথা এহি ভাঁতি বিচারহু।
বুঝি লেহু জো বুঝে পারখ।।
তুরকী অরবী হিন্দুঈ ভাষা জৈতী আহিঁ।
জেহি মহঁ মারগ প্রেম কর সবে সরাহেঁ তাহিঁ।।

অর্থাৎ চিতোর দেহ, রাজা রত্নসেন, মন, হৃদয় হল সিংহল দেশ, বুদ্ধি, পদ্মিনী। গুরু, পথপ্রদর্শক শুক, আলাউদ্দীন মায়া, নাগমতি, মর্ত্যাসক্তি, দূত, রাঘব (চেতন) শয়তান।

সুফী ধর্মের প্রেম লীলার একটি চমৎকার আখ্যান আমরা পাই উপসংহার খণ্ডের উনশেষ স্তবকে —

"মুহমদ কবি য়হ জোরি সুনারা।
সুনা সো পীর প্রেম কর পারা।।"

আবার সুফী ধর্মের অমরত্ব ফুটে ওঠে —

"কেই ন জগতে মম বেঁচা কেই লীক মম মোল।
জো য়হ পঢ়ে কথানী হম্‌হ সঁর্‌ রে দুই চোল।।"

অর্থাৎ কবির লেখনীতে সবাই প্রেমের জন্য পীড়িত হয়েছে। কিন্তু কালের আবহে পদ্মিনী, রাজা রত্নসেন, সুলতান আলাউদ্দীন, শুকপাখী—সবাই হারিয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে তাদের কাহিনী।

গন্ধর্বসেন মন্ত্রীমন্ত ২০তে আমরা আবার সুফী ধর্মের রূপ পাই। "তুমি যেমন তাঁর দেহ ঘটে রয়েছ, তিনিও, তোমার মধ্যে বর্তমান। কেমন করে মৃত্যু তাঁর ছায়া স্পর্শ করবে?"

কবির লেখনীতে

"জো ওহি বিথা সো তুম্‌হ কহঁ আঈ।।
তুম ওহিকে ঘট রহ তুম মাঁহা।"

পদ্মাবতী সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। রত্নসেনের সার্থক প্রেমাভিসারের পাশাপাশি আলাউদ্দীনের ব্যর্থ প্রণয়াভিযানকে চিত্রিত করে জায়সী এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, যে প্রেম সাধনাহীন কামনা, যা ক্ষমতা — মদমত্ততা কখনও যথার্থ প্রেম নয়। যে প্রেম মরণকে তুচ্ছ করে আত্মোৎসর্গ করতে চায় এবং যে প্রেম সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে সত্যের ও সতীত্বের মানসিক বলে বলীয়ান, দুঃখ ও বিরহশুদ্ধ প্রেমই সার্থক সুফী প্রেমতত্ত্বের যথার্থ মহৎ উপলব্ধি।

চরিত্র সৃষ্টিতেও এই কাব্য ঐশ্বর্যময়।

পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁট মন্তের পঞ্চবিংশ স্তবকে রত্নসেনের মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন —

"থল থল নগ ন হোহিঁ জেহি জোতী।
জল জল সীপ ন উপনহিঁ মোতী।।"

অর্থাৎ "জোতির্ময় রত্ন যেখানে সেখানে মেলে না. মুক্তোপূর্ণ শুক্তি প্রত্যেক জলাশয়ে পাওয়া যায় না।"

আবার এই কাব্য অনায়াসে সেক্সপীয়েরীয়ান ট্রাজেডির সমতুল্য হয়ে ওঠে যখন ব্যর্থমনোরথ সুলতান পদ্মিনীকে পেয়ে 'এ জগৎ মিথ্যা' বলে একমুঠো চিতাভস্ম নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়, পদ্মিনী যেন চিরন্তন গ্রীক নাটকের নায়িকা।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' জায়সীর পদ্মাবতীর চেয়ে ভিন্ন। এই পদ্মাবতীকে আলাওলাপুরোপুরি সৃষ্টি করেছেন বাংলার কাঠামোয় — অনেক সাংস্কৃতি মনসম্পন্ন এই নায়িকা।

কিন্তু এখানেও পদ্মাবতীর চরিত্র সুফী মতামত দ্বারা প্রভাবিত। পদ্মাবতীকে আলাওল সৃষ্টি করেছেন এক Romance of literature হিসেবে যার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের। এই Romance জায়সীর কাব্যেও ছড়িয়ে আছে তবে তা কতটা সমকালীন যুগের জন্যই, ভিন্নস্বাদের উপলব্ধিতে। একথা বলা যায় জায়সী ও সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' আসলে এক জায়গায় একই, পদ্মাবতী আসলে একটি Allegory, অবাস্তব এবং রূপকের জগতে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ। এই Allegory বা স্বপনচারিণী পদ্মাবতীকে ঘিরেই ইসলামীয় বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর অবাস্তব, Allegory বলেই পদ্মাবতী এক চিরন্তন অমরত্বের শিখরে পৌঁছে যাওয়া নারী।

'ময়মনসিংহ-গীতিকাব্য', বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিতেও আমরা বেশ কিছু নারীর ছবি পাই —

'মহুয়াতে' — দেখি, প্রেমের রূপ —

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুবে মর।।"

'মলুয়াতে' - দেখি — তেজস্বিতার নিদর্শন—

"কাজীরে কহিও কথা নাহি চাই আমি
রাজার দোসর সেই আম্মার সোয়ামী।।

কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা।"

'কর্ক ও লীলা' পালাটিতে দেখি হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞানহীন চরিত্র—

"তুমি রে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগা-রে বন্ধু ছাড়বাম জাতি কুল।।"

'চন্দ্রাবতী'তে পাই মর্মস্পর্শী ট্রাজেডি—

"আমিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে মাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।"

বাংলা সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকার' স্থাননির্ণয় করতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"মৈমনসিংহ থেকে যে সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। .... তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল — তা ধানের মঞ্জরী।"

বৈষ্ণব সাহিত্যেও আমরা অনেক মুসলমান কবির কলমে বাঙালী নারীর চিত্র পাই

"সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধে গোপালিনী
কানাইয়ার বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী।"

অথবা নিজাম গজ্‌নাভির 'সপ্তপাইকারে'—

"কোথা গেল বাহারাম কোথা সপ্তপিয়া
কোথা গেল রত্নটঙ্গ রঙ্গরস ক্রিয়া।।"

অথবা হাছ্‌ন রাজা চৌধুরীর কলমে—

"আমি তোমার বাঙালী গো সুন্দরী রাধা,
আমি তোমার বাঙালী গো।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে
হাছন রাজা বাঙালী গো।।

দেলি ত কাজীর 'সতীময়না' ও 'লোরচন্দ্রানে'তেও আমরা নারীজীবনের দুর্লভ তথ্য পাই। মার্সিয়া সাহিত্যেও পাই নারীর কথা —

"বাসর ঘরে বেওয়া হল বিবি সকিনা
হায় কাসেম ধনগো আমার, হায় সাকিনা।।"

অথবা লালন ফকীরের বাউল সাহিত্যে—

"ফুলবতীর কুল যে গেল
বাদশাহ বাদশাহী ছাড়লো
মধু কালারে ভেবে।"

পূর্বোক্ত সমস্ত আলোচনা থেকে এখন সহজেই এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যে নারীর স্থান কেবল চমকপ্রদই নয় তা গর্বের বস্তু।

নারীর চূড়ান্ত লাঞ্ছনার যুগে, ইসলামী বাংলা সাহিত্যে শুধু নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছবিই চোখে পড়ে না। তার সাথে তার জয়ী হওয়ার জেদটিও লক্ষণীয়। মুসলমান কবিরা তাদের সাহিত্যে নারীদের যে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যকে আরো পূর্ণ করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> "কারণ, প্রথমে বলিয়াছি, বাংলাদেশের সাধনা
> একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য।
> এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না
> হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত।"

সাহিত্য অমৃত আলোকের উৎস। সেখানেই জন্ম প্রেমের।

ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যে নারী, সেই আলোকই আরো অপার্থিব রক্তে ছড়িয়েছে। সেখানে ভালবাসা আছে বলেই বলতে পারি —

> "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন-না তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

সূত্র-নির্দেশ

প্রধান সূত্র (Primary Sources) গ্রন্থপঞ্জী

১। 'পদ্মাবতী — জায়সী ও আলাওল' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), অনুবাদ, দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদনা), পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৩০৭, প্রকাশক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশকাল, জুলাই ১৯৮৪

২। ময়মনসিংহ - গীতিকা, সম্পাদনা, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৩০৮, প্রকাশক, অশোককুমার বারিক, *ভারতী*, বুক ষ্টল, প্রকাশকাল, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯১

৩। ইমানুল হক, ইসলামী বাংলা সাহিত্য -

৪। হাছন উদাস, (পৃঃ ৮৬)

৫। 'সতীময়না ও লোরিচন্দ্রানী', সম্পাদনা, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, প্রকাশকাল, ১৩৬২ বাংলা সাল, প্রকাশক, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী

বিবিধ

১। কে. এম আশরফি, 'হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্যা', পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৯, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৮০, অনুবাদ, তপতী সেনগুপ্ত, প্রকাশক, পার্ল পাবলিশার্স

২। বিবিধসাহিত্য (মার্মিয়া, লালন ফকীর, সপ্তপাইকার গজনবী)

৩। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (২য়, চতুর্থ, ত্রয়োদশ, চর্তুদশ খণ্ড), প্রবন্ধ, সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্যের পথে, বাংলা ভাষা - পরিচয়, প্রকাশক, বিশ্বভারতী।

পাহাড়ের অগ্নিকন্যা ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে এক মহীয়সী নারী হেলেন লেপ্‌চা

রত্না রায় সান্যাল

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যাঁদের প্রেরণায়, পরিকল্পনায় ও সাংগঠনিক কর্মকুশলতায় ধাপে ধাপে বিস্তৃতি লাভ করে লক্ষ্যে পৌঁচেছে, তাঁদের অনেকেই বহুবার আন্দোলনের প্রচারে ও প্রসারে দার্জিলিং এসেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমাতা নিবেদিতা, মহাত্মাগান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, বাসন্তীদেবী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দার্জিলিং এসেছেন। তাঁদের পদ-ধ্বনিতে হিমালয়ের ঘুমও ভাঙতে শুরু করেছিল এবং ধীরে ধীরে সারা উত্তরবঙ্গেই সংগ্রাম দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। এই সংগ্রামে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন যাঁদের কথা ইতিহাসে যথাযথভাবে স্থান পায়নি। এমনই একজন মহীয়সী নারী হলেন কার্শিয়াং পাহাড়ের অগ্নিকন্যা হেলেন লেপ্‌চা,[১] পাহাড়বাসীদের আদরের ''সাইলি দিদি''। মহাত্মা গান্ধী যাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন সাবিত্রী দেবী। মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাবিত্রী দেবী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশ সেবায় ব্রতী ছিলেন।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে খুব বেশী গবেষণা হয়নি। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দেশের নারী জাগরণের প্রসঙ্গটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে নারী জাগরণের সূচনা হয়েছিল, তার পূর্ণতর বিকাশ ঘটেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে। জাতীয় পর্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণা হলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে গবেষণার সংখ্যা সীমিত।

বর্তমানে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক স্তরের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়েই একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাস গড়ে ওঠে। উত্তর বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যা নানা বইতে এবং নানা জনের স্মৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে তা একসঙ্গে আজও গ্রথিত হয়নি। বর্তমানে আলোচিত প্রবন্ধ মুখ্যত এই উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত।

সাবিত্রীদেবীর পূর্ণাঙ্গজীবনী ও কার্য্যাবলী গবেষণামূলক ভাবে লিখিত আকারে কোথাও নেই। তাঁর সম্পর্কে লিখিত যে সমস্ত কাগজপত্র ছিল ১৯৮৬'র বিধ্বংসী

অগ্নিকাণ্ডে কার্শিয়াং এ সব পুড়ে গিয়েছে। তাঁর জন্ম তারিখও নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। ইতস্তত ছড়ানো কিছু কাগজপত্র, কিছু সাক্ষাৎকার এবং নেপালীভাষায় লিখিত দু'একটি লেখা তর্জমা করে এই মহীয়সী নারীর একটি সংগ্রামী চিত্র এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে প্রবন্ধটির সীমাবদ্ধতা সবিনয়ে স্বীকার করছি।

সমসাময়িক সূত্র, সাক্ষাৎকার[২] ইত্যাদি থেকে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ১৯০২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা আব্রচু লেপ্চা ছিলেন সিকিমের নামচির বাসিন্দা। হেলেন ছিলেন তাঁর সাতটি কন্যার মধ্যে তৃতীয়া। তিনি স্কট মিশন স্কুলে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যা শুরু করেন এবং স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ১৯১৬ সালের পর তিনি আর পড়াশুনা করেননি।

হেলেন লেপ্চার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে ইংরেজ সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল নেপালী ও গোর্খা সৈন্য। এদের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জন্যে ইংরেজ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্জিলিং জেলায় দলবাহাদুর গিরীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বঙ্গদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই গিরি পরিবারের অসামান্য অবদান ছিল। দলবাহাদুর গিরীর বড় ভাই কবি অগম সিং গিরি দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম হোতা ছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দলবাহাদুর গিরি। তাঁর চেষ্টায় এবং অনুপ্রেরণায় মেয়েরা জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করে। হেলেন লেপ্চা ছিলেন এঁদেরই পথিকৃৎ।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে সক্রিয়ভাবে, রাজনীতিতে অংশ নেন। এই সময়ে গান্ধীজির 'চরকা' এবং 'খদ্দরের' প্রচার হেলেন লেপ্চার জীবনের গতি পরিবর্তিত করে দেয়। তিনি চরকায় সুতো কাটার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা নবিশীর জন্যে কোলকাতায় তাঁর দিদির কাছে চলে যান। সেখানে তিনি খাদি ও চরকা বোনার একটি শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হন। অতি অল্প সময়েই তিনি চরকায় সুতো বোনায় নিজের পারদর্শিতা প্রমাণিত করেন এবং মজফরপুরে "খাদি এবং চরকা" প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্যে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ঘটনা হেলেন লেপ্চার জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরপর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পটপরিবর্তন হয় এবং পাহাড়ের মেয়ে হয়েও বিহারই তাঁর কর্মযজ্ঞের অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়।[৩]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বিহারে ভয়াবহ বন্যায় প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। হেলেন লেপ্চা বন্যাপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজি এই সময়ে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে হেলেন লেপ্চার আর্তদের সেবার

প্রশংসা করেন। গান্ধীজির আমন্ত্রণে হেলেন লেপ্‌চা সবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে কথাপ্রসঙ্গে গান্ধীজি তাঁর এই 'হেলেন' নাম পরিবর্তন করে ভারতীয় মহীয়সী নারীর নাম 'সাবিত্রীদেবী' রাখেন। এ ভাবেই বাংলা/বিহারের হেলেন লেপ্‌চা সাবিত্রীদেবীতে পরিচিত হন। শুরু হল তাঁর রাজনৈতিক জীবন।[৩]

পাটনা, দানাপুর, বাঁকিপুর, ঝরিয়া প্রভৃতি জায়গা সাবিত্রীদেবীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং এই সমস্ত জায়গায় তিনি অবিসংবাদিত নেত্রী হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। সরকার তার কার্যাবলীতে যথেষ্ট সন্ত্রস্থ ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে সাবিত্রীদেবী কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বেশী সময় থাকতেন না, কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে যেতেন।[৫]

"আলি ভাতৃদ্বয়ের" সঙ্গেও সাবিত্রীদেবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আলিবন্ধুদের ভূমিকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ডঃ সরোজিনী নাইডুর সাথে তিনি আহমেদাবাদ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়কার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি মহম্মদ আলী পার্কে যে বিরাট জনসভা হয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীমতী উর্মিলা দেবী-দের সাথে তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন যোগ্য নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৬] মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে এই সময়ে তাঁকে নিজের শহর কার্শিয়াং-এ ফিরে যেতে হয়। এ সম্পর্কে অন্য একটি সূত্র[৭] থেকে জানা যায় যে সাবিত্রী দেবী মহাত্মা গান্ধীর এত প্রিয় ছিলেন যে গান্ধীজি তাঁকে লন্ডনে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। সাবিত্রী দেবী কার্শিয়াং-এ তাঁর বোনকে এ খবর জানালে তাঁর বাড়ীর আপত্তি থাকে এবং মায়ের অসুস্থতার অজুহাতে তাঁকে কার্শিয়াং-এ ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। শুরু হ'ল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর দেশের সর্বত্র আইন অমান্য চলতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী বরদৌলী তালুকে খাজনা বন্ধের আয়োজন শুরু করেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে সার্থক করার প্রেরণাতে সবাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং - সর্বত্র এই আন্দোলন অনুভূত হয়েছে। প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চল এবং শিলিগুড়িতেও এই আন্দোলন শুরু হয়। সাবিত্রী দেবী কয়েকজন ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা হন। অসহযোগ আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলনকে সফল করার জন্যে সাবিত্রীদেবী তাঁর সহযোগী ভলান্টিয়ারদের নিয়ে শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে ঘুরে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্ব'দেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবার জন্যে আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিদেশী দ্রব্য পোড়ানো হয়। সরকার তাঁর কার্যাবলীতে সতর্ক হন তাঁর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেন। তাতেও এই অগ্নিকন্যা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারে সক্রিয় থাকেন। একদিন যখন তিনি এরকম একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, অতর্কিতে পুলিশ মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। এতেও যখন মিছিল বন্ধ হয় না, তখন পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। কিছু ভলান্টিয়ার তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দিকে পাথর ছোঁড়ে। দু'পক্ষই কিছু আহত হয়। স্বভাবতভাবেই নিরস্ত্র মিছিলকারীরা সশস্ত্র পুলিশের সাথে পেরে ওঠেনা। সাবিত্রীদেবী তাঁর কয়েকজন অনুচরসহ গ্রেপ্তার হন।[৭] অমৃতবাজার পত্রিকা (৩১ জানুয়ারী, ১৯২২) তাঁর গ্রেপ্তার সম্পর্কে লিখেছেন[৮] "Smt. Savitri Debi with the Congress Secretary and E. Ahmed and 12 Gorkha Volunteers have been arrested। অমৃতবাজার পত্রিকার খবর পড়ে মনে হয় যে সাবিত্রীদেবী এই সময়ে জেলা কংগ্রেস কমিটির অথবা শিলিগুড়ি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তার হবার খবর দাবানলের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়। সাবিত্রীদেবীকে দার্জিলিং জেলা কারাগারে তিনমাস সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরও তাঁকে দীর্ঘ তিনবছর, তাঁর কার্শিয়াং-এর বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। কার্শিয়াং-এর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সময়েও সাবিত্রীদেবী গোপনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখতেন।[৯]

একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মহীয়সী মহিলার দেশপ্রেমের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রচন্ড অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিং-এ ছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। সাবিত্রীদেবী দেশবন্ধু এবং গান্ধীজি দু'জনের সাথেই দেখা করতে গিয়েছিলেন। নেপালীদের নিজস্ব প্রথা অনুযায়ী সাবিত্রীদেবী প্রচুর দামী পোষাক ও অলঙ্কার পরে গিয়েছিলেন। গান্ধী তাঁকে দেখে খুবই মর্মাহত হন এবং তাঁকে এ ধরনের পোষাক ও অলঙ্কার পরতে নিষেধ করেন। একজন প্রকৃত দেশ সেবিকার মতই সাবিত্রীদেবী সেই মুহূর্তে সমস্ত অলংকার খুলে গান্ধীজির পায়ের কাছে রাখেন এবং এগুলো দেশের কাজে লাগানোর জন্যে অনুরোধ করেন। এরপর কোনদিনও তিনি দামী পোষাক বা অলঙ্কার পরিধান করেননি। দেশমাতৃকার জন্যে এ ধরনের আত্মত্যাগ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক পাহাড়ী মেয়ের ক্ষেত্রে সত্যি অভূতপূর্ব।[১০]

১৯৩৯-৪০ খ্রিষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কার্শিয়াং গির্দা পাহাড়ে নজরবন্দী ছিলেন।

সাবিত্রী দেবী এই সময়ে প্রতিদিন পাউরুটির মধ্যে কাগজের টুকরোতে নেতাজীকে গোপন তথ্যাদি সরবরাহ করতেন। বলা হয়ে থাকে যে নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের পরিকল্পনা সম্ভবত এই কার্শিয়াং গির্দা পাহাড়ে বসেই তৈরী করা হয়েছিল। এমনকি যে পাঠান পোষাক পরিধান করে তিনি কোলকাতা থেকে কাবুলের পথে ইউরোপ পাড়ি দিয়েছিলেন, সেটিও কার্শিয়াং-এ তৈরী হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা থেকে সাবিত্রীদেবী যে কত দায়িত্বশীল দেশসেবিকা ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৭৬-এ প্রকাশিত Directory of Indian Women Today-তে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৮-তে দিল্লী থেকে প্রকাশিত Reference Asia : Asia's Who's Who of Men and Women of Achievement এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উল্লেখ আছে।[১১]

সাবিত্রীদেবী শুধুমাত্র একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সমাজসেবিকা। ১৯৩৬ সালে তিনি কার্শিয়াং-এর প্রথম মহিলা পৌর কমিশনার নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে কার্শিয়াং শেরপা সংগঠনের, কার্শিয়াং কংগ্রেস, আঞ্জুমান ই ইসলামি, কার্শিয়াং লেপ্‌চা সংগঠন প্রভৃতির সভাপতি পদ অলংকৃত করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি জাতীয় স্তরে বিভিন্ন নেতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি নেহেরু পরিবারের সাথে 'আনন্দভবনে' থেকেছেন। ইন্দিরা গান্ধী তখন ছোট্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী যখন দার্জিলিং গিয়েছিলেন, তিনি কার্শিয়াং-এ গাড়ী থামিয়ে সাবিত্রীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং যান।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে "Tribal Headman of the District" সম্মানে ভূষিত করেন।[১২] ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার রৌপ্য জয়ন্তী বছরে ভারত সরকার কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে 'তাম্রপত্র' প্রদান করেন। সাবিত্রী দেবী এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই সম্মান প্রদান করেন।[১৩]

সময়ের সাথে সাথে সাবিত্রীদেবীর স্বাস্থেরও অবনতি হতে থাকে। অবশেষে ১৮ আগস্ট, ১৯৮০ সালে তাঁর বর্ণময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। শোনা যায় তাঁর শেষকৃত কিভাবে হবে এই নিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম এঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী তাঁর শেষকৃত করতে চান। অবশেষে মন্দির মসজিদ, গীর্জা, মনাষ্টারি প্রতিটি জায়গায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষে বৌদ্ধমতে তাঁর শেষকৃত অনুষ্ঠিত হয়।

সাবিত্রী দেবীর জীবনী এবং কার্যাবলী থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সেই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে সদর কার্শিয়াং পাহাড় থেকে একজন মহিলার পক্ষে সর্বভারতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। সেই সময়ে

দার্জিলিং-এর চা-বাগিচার শ্রমিকদের, বিশেষত মহিলা শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা, জেলার মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর কোন কর্মসূচী ছিল কিনা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সূত্র-নির্দেশ

১। বীরজাতির অমর কাহিনী, নেপালী ভাষায় লিখিত; ভাষান্তর প্রমোদকুমার ছেত্রী, পৃঃ ২২২
২। সাক্ষাৎকার, মোহন লেপ্‌চা, গেলভিন স্ট্রীট, কার্শিয়ান, ১৯.৯.২০০৩, ২৭.১১.২২০৩
৩। বীর জাতির অমর কাহিনী, পৃঃ ২২৩ পূর্বোল্লেখিত কুমার প্রধান, নেপালী সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৭৮-৭৯, দিল্লী ১৯৮৪।
৪। তদেব।
৫। তদেব।
৬। তদেব।
৭। সমরেন্দ্র দত্ত রায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরবঙ্গ, পৃঃ ৩৫, শিলিগুড়ি-৯৭৬, মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট এ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্র্যাগল ইন সাম সিলেকটেড এরিয়াস অফ নর্দান বেঙ্গল (১৯৫৭-১৯৪৭) অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
৮। *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ৩১ জানুয়ারী, ১৯২২, *দি ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ*, ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২, কুমার প্রধান, পূর্বোল্লেখিত।
৯। বীর জাতির অমর কাহিনী পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২২৬, কুমার প্রধান, পূর্বোল্লেখিত, সমরেন্দ্র দত্ত রায়, পূর্বোল্লেখিত সাবিত্রী দেবী নিজেই বলেছেন যে নেতাজী গির্দা পাহাড়ে থাকাকালীন পাউরুটির মধ্যে ছোট্ট কাগজের টুকরোতে গোপন খবর নেতাজীর কাছে পাঠাতেন। খড়কা বাহাদুর নামে এক রুটি বিক্রেতার মাধ্যমে সাবিত্রী দেবী নেতাজীর কাছে খবর পাঠাতেন। সাক্ষাৎকার ঃ মোহন লেপ্‌চা, পূর্বোল্লেখিত।
১০। বীরজাতির অমর কাহিনী, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২২৬, সাক্ষাৎকার ঃ মোহন লেপ্‌চা, পূর্বোল্লেখিত
১১। ডাইরেক্টরী অফ্ ইন্ডিয়ান উইমেন টুডে, দিল্লী, ১৯৭৬, পৃঃ ৫৭৬ "Savitri Debi, First Nepali Women Freedom Fighter .... helped Netaji Subhas Chandra Bose escape from imprisonment in Kharsiang and migrate to Germany through Kabul....." ভারতছাড় আন্দোলন, ১৯৪২, *এ কালেকশান্ অফ ডকুমেন্টস* ভলুম-১, পৃঃ ৩৯, রেফারেন্স এশিয়া, ভলুম-১ (১৯৮৬), ভলুম-২ (১৯৮৬), ভলুম-৩ (১৯৮৮)।
১২। গভর্নমেন্ট অফ্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল অফিস অফ্ দি ডেপুটি কমিশনার, দার্জিলিং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, মেমো নং ২৬৮(৬) টি.ডাব্লু, ডেটেড ২২ মে ১৯৫৮।
১৩। বীর জাতির অমর কাহিনী, পূর্বোল্লেখিত, পৃষ্ঠা ২২৮, কুমার প্রধান, পূর্বোল্লেখিত সাক্ষাৎকার, মোহন লেপ্‌চা-পূর্বোল্লেখিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মোহন লেপ্‌চা, কার্শিয়াং পূরণকুমার ছেত্রী, দার্জিলিং প্রমোদকুমার ছেত্রী, প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

উনবিংশ শতকে বাংলার নারী বনাম বিজ্ঞানচর্চা

দেবযানী ব্যানার্জী

বিজ্ঞানচর্চা বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বকালেই পুরুষ প্রাধান্যর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নারীরা সেখানে প্রকৃতি হিসাবে পরিচিতা পুরুষালী বিজ্ঞান নারী প্রকৃতিকে জয় করবে এবং আধিপত্য বিস্তার করতে উদ্যত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতিতে নারীর বিজ্ঞানচর্চা করা এবং পুরুষের সঙ্গে সমানতালে অগ্রসর হয়ে নিজের জায়গা দখল করে নেওয়া নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষ করে বাংলায় নারীদের বিজ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধকারের বাধা অতিক্রম করে চলতে হয়েছে। এএক সুদীর্ঘ ইতিহাস যা বর্তমানেও ক্রমবহমান।

বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় উনিশ শতকের বিজ্ঞান চর্চার পথে নারীরা যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার আলোচনা করা। উনিশ শতকে যেখানে নারী শিক্ষায় গতিই ছিল অত্যন্ত শ্লথ সেখানে নারীদের বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারটি ভাবা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। আলোচনাতে দেখা হবে কিভাবে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে নারীরা ক্রমশ বিজ্ঞানের জগতে পা রাখছেন।

নারীর শিক্ষালাভের অন্যতম বাধা ছিল অবরোধ প্রথা। যদিও অভিজাত পরিবারের মেয়েরা বৈষ্ণবীদের কাছ থেকে অবরোধেই কিছুটা শিক্ষা লাভ করতেন।[১] যদিও ক্রমে শিক্ষার আলো বাংলার নারী সমাজের কাছে আসছিল কিন্তু সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। কৈলাসবাসিনী দেবী উল্লেখ করেছেন বৈধব্যর সংস্কার বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে এমন প্রচলিত ছিল যে তারা মেয়েদের হাতে একখণ্ড কাগজ দেখলেও রাগ করতেন।[২] তাছাড়া ১৮০০র দশকে ইয়ং বেঙ্গলরা যে উচ্ছৃংখল আচরণ করতেন তাতে মনে করা হত যে মেয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে অনুরূপ আচরণ করবেন।[৩]

স্ত্রী বিদ্যার বিরুদ্ধে সামাজিক সংস্কার ছাড়াও অর্থনৈতিক সংস্কার আরোপিত হয়। বলা হয় মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকরি বা ব্যবসা করতে পারবে না, তাহলে আর স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা কি?

তবে পাশ্চাত্য দর্শনে মেয়েদের যে সামাজিক অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল তা ভাবতীয়দেরও প্রভাবিত করে।[৪] এর প্রভাবেই ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক নিজের

পরিবারের মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারে সচেতন হয়ে ওঠেন। তারা মনে করেছিলেন মহিলাদের অবস্থার উন্নতি না ঘটলে নিজেদের জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের অবদান ছিল উল্লেখ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উন্নত সম্পর্ক বিষয়ক পাশ্চাত্য ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন। এর জন্য প্রয়োজন স্ত্রীদের শিক্ষিত করা।[৫]

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মিশনারীরা। তবে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতেন না বললেই চলে। তবে এক্ষেত্রে বেথুন নির্মিত ১৮৪৯ এ ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পর্দাপ্রথা অগ্রাহ্য করে ভদ্রলোকেরা পরিবারের মেয়েদের পাঠাতেন।[৬] যদিও এখানে শিক্ষার মাপ খুব একটা উন্নত ছিল না।

মেয়েদের শিক্ষিত করার পর্বটি ধীরগতিতে হতে শুরু করলে শিক্ষার পাঠ্যক্রমের বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমদিককার শিক্ষাবিদদের মতে নারীদের গৃহরন্ধন, সূচীকর্ম এবং শিশুপালন শিক্ষা দেওয়া উচিত। নারীশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র বেথুন স্কুলে প্রথমদিকে প্রথাগত নারীশিক্ষাই দেওয়া হত। বিশিষ্ট ব্রাহ্মসংস্কারক কেশবচন্দ্র ও তার অনুগামীদের মতে জ্যামিতি, দর্শনের মতো পুরুষালী বিষয় মেয়েদের পড়ানোর আবশ্যকতা নেই। তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা ভাল গৃহবধূ, মা, কন্যা এবং ভগিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্রমে নারীদের জন্য বিদ্যালয় ও পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও ছাত্রদের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে তার একটা পার্থক্য সূচিত হতে থাকে।[৭]

নারীরা বিজ্ঞান বুঝতে অক্ষম এই মনোভাব শুধু বাংলাতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই সাধারণভাবে ব্যাপ্ত ছিল। সেই সময়কার তত্ত্বের মধ্যে উল্লেখ্য হল 'Social Darwinism' এর ধারণা যেখানে বলা হয়েছিল মহিলাদের এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে তারা সমাজের উচ্চস্তরে টিকে থাকতে পারে না। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নারীকে আবেগপ্রিয়, পরনির্ভরশীল, শান্ত ও শিশুসুলভ বলে বর্ণনা করা হয়। বলা হয় মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা কম বলে তারা বিজ্ঞান বুঝতে অক্ষম।[৮]

পশ্চিমবঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রভাবে এই ধারণা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজের প্রচলিত ধারায় মেয়েরা বিজ্ঞান পড়বে এটা ভাবাও ছিল অকল্পনীয়। তাছাড়া সঠিক অর্থে বিজ্ঞানজগতে বাঙালী পুরুষের প্রবেশও তখন ছিল সঙ্কুচিত। ঔপনিবেশিক সরকার তার নিজের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে নিজের মতো করে পরিচালিত করতো। সেখানে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চার পথ খুব একটা সরল ছিল না।

অবশ্য নবীন ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ যথা শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ

গাঙ্গুলী দাবী করেছিলেন যে মহিলাদের সকল বিষয়ে জানবার ও জ্ঞান লাভের অধিকার আছে। ব্রহ্মবন্ধু সভা আয়োজিত স্ত্রীশিক্ষায় গণিত, ভুগোল শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হতে থাকে যার মাধ্যমে তাদের যুক্তি, বুদ্ধি ও বিজ্ঞান সচেতনতার বিকাশ হতে পারে। তবে বিতর্ক উঠল যে নারীদের গণিত শিক্ষার পরিবর্তে সীবনশিল্প শেখাতে হবে। কিন্তু *ভারতমিহির* পত্রিকা বলে গণিত শিখলেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে নারীদের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যার প্রকাশ করতে হবে সঠিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত নারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না।[৯]

অনেকক্ষেত্রে মহিলারাও ছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধী। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়েছিল "কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সত্য কণ্ঠস্থ করিলে যে জ্ঞানবান হওয়া যায় তাহা নহে, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মভাব বিকশিত করা ও সমুদয় জীবনের স্বাভাবিক উন্নতি সাধন করাই লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য"।[১০]

উনিশ শতকের শেষদিকেও অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের সাহায্যে মেয়েদের অধিকার নির্ধারিত হত। যেমন যুদ্ধবিদ্যা, অধিক অঙ্ক, রাজনীতি, স্ত্রী-প্রকৃতির বিরোধী বলে গণ্য করা হত।[১১] *পরিচারিকা* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল অঙ্ক ও সাহিত্যের শিক্ষা কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পদার্থবিজ্ঞান মেয়েদের বেশি শেখানো উচিত নয় কারণ এর ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে উঠবে। তৎকালীন সংস্কারক ও শিক্ষাবিদেরা সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে তারা যথেষ্ট সোচ্চার ছিলেন। মহিলা পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে কঠিন অঙ্ক পাঠের ফলে ছাত্রীদের মস্তিকের বৃদ্ধি ঘটছে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ফলেই তারা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে।[১২] *মহিলা* পত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষা পাঠ্যক্রমের কি বিষয় থাকা উচিত নয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করে 'নারীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত" প্রবন্ধে বলা হয়েছিল শরীরতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, পদার্থতত্ব ইত্যাদি নিয়ে মেয়েরা বড় বড় উপাধি লাভ করবে এটা ভাবাও নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ।[১৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই নারীদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানচর্চা অন্তর্ভুক্ত করা ও তাদের বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার বিষয়টি নানান বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। তবে নারীদের নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে এবং বিজ্ঞানচর্চা ও অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার সপক্ষে নিজেদের মত ব্যক্ত করতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হেমলতা সরকার লিখেছিলেন প্রত্যেক মেয়েকেই সহজ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি শেখানো দরকার।[১৪]

বিজ্ঞান চর্চার পথে বাংলার মেয়েদের অগ্রসর হওয়া ছিল এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। একে

কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। এর প্রথম পর্বে রয়েছে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদারপন্থী ব্রাহ্ম ও মিশনারীদের চেষ্টা। দ্বিতীয় পর্বে আছে বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা। তৃতীয় পর্বে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীদের পদক্ষেপ। ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায় মেয়েদের আগমণ রয়েছে চতুর্থ পর্বে এবং অন্তিম পর্বে রয়েছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure Science) চর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মেয়েদের আত্মপ্রকাশ। যদিও অন্তিম পর্বটির বিকাশ উনিশ শতকে ঘটেনি।

উনিশ শতকে মেয়েদের বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ ঘটেছিল প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর। তাছাড়া আরো অনেকেই প্রবন্ধ লেখার কাজে হাত দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুমুদিনী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, মোসাম্বৎ রাজা তুনেস্থ প্রমুখ।[১৫]

মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে ১৮৭৮ সাল বিশেষ উল্লেখ্য কারণ সরকার এই সালে মেয়েদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিলেন।[১৬] কাদম্বিনী বসু যিনি পরবর্তীকালে অন্যতম চিকিৎসক হয়েছিলেন তার এন্ট্রান্স পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে বাংলা, ইতিহাসের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিজ্ঞানও এবং তিনি সেক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে যা ছিল অচিন্তনীয়।[১৭] আর সরলা দেবী অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে শুরু করেছিলেন পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন। কিন্তু বেথুন কলেজে এই বিষয়টি পড়ার কোনো সুবিধা না থাকায় তিনি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে মহেন্দ্রলালের ক্লাসে যেতেন। এফ. এ ক্লাসে কোনো ছাত্রী না থাকায় তার দুই সম্বন্ধীয় দাদা তাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার সঙ্গে থাকতেন।[১৭]

১৮৮৩ সালে কেশবচন্দ্র সেন চালু করলেন ভিক্টোরিয়া কলেজ। এখানে সীবনশিল্প, ধর্মীয়শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ভূগোল শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল।[১৮]

ক্রমে নারীরাও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে থাকলেন। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়েছিল শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার জন্যই শিক্ষা নয়, তারা যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। পত্রিকা চেয়েছিল মেয়েরা ভূগোল, ইতিহাস, পাটিগণিত, পদার্থবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা শিক্ষা করবে।[১৯]

এইভাবে মহিলারা যখন বিজ্ঞান সচেতনতা ও বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনার কাজে ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তখন বিজ্ঞানের যে ধারাটিতে তারা সর্বোচ্চ প্রতিভার সাক্ষর রেখেছিলেন তা হল চিকিৎসাবিদ্যা নারীদের চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণের পর্বটি ছিল তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ফলশ্রুতি।

নারীদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের। দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নারীদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং পেশাগত জীবনে প্রবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। এর পাশাপাশি মেয়েরা বুঝতে পেরেছিলেন মহিলাদের স্বনির্ভর হতে গেলে শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পেশাগত জগতে প্রবেশ। বাঙালী মেয়েরা যে দুটি পেশাকে বেছে দিয়েছিল তা হল শিক্ষকতা ও চিকিৎসাবিদ্যা। তবে চিকিৎসাবিদ্যার পাশাপাশি মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[২৩]

১৮৮৩ সালে বাংলায় প্রথম মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাপাঠ নেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। এর পর একে একে আসেন বিধুমুখী বসু, ভার্জিণিয়া মেরী মিত্র, যামিনী সেন, বিন্দুবাসিনী দেবী প্রমুখ। যদিও মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও কর্মজীবনের পথটি খুব সহজ ছিল না। বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়েই তাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। তবে চিকিৎসাবিদ্যায় মেয়েদের অগ্রসরের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ এবং স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন।

সুতরাং উনিশ শতকে মেয়েদের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে তা একমাত্রিক নয়। এর এক দিকে রয়েছে এই ধারণা যে বিজ্ঞান ব্যাপারটিই নারীদের পঠনের যোগ্য নয়। ইংরেজ সরকারও যে এক্ষেত্রে খুব উৎসাহী ছিল একথা বলা চলে না। মেয়েদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিয়ে সমাজ সংস্কারকদের মধ্যেও যথেষ্ট দ্বন্দ্ব ছিল। তারা মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাইলেও এমন শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন যা তাদের যোগ্য সহধর্মিনীতে পরিণত করতে পারে। মেয়েদের নিজেদের মধ্যেও বিজ্ঞানশিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল। তা সত্ত্বেও যে সকল মেয়েরা বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসেন তারা বেশিরভাগই প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পারিবারিক জীবনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই তারা বিজ্ঞানচর্চার কথা বলতেন। মহিলা চিকিৎসকরাও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না।

এক্ষেত্রেই দেখি যে উনিশ শতকে সে অর্থে কোনো মহিলা বিজ্ঞানী ছিলেন না। চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উনিশ শতকে তাদের সেরকম পাওয়া যায় না। যে সব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা সবাই বিশ শতকের। এক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের নীতিও কিছুটা দায়ী ছিল। তাদের বিজ্ঞানচর্চার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাকে নিজের প্রয়োজনে লাগানো যাকে অভিহিত করা হয় ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান হিসাবে। সেক্ষেত্রে ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র সহায়কের।

তবে এক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় (চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া) নারীরা তেমন উৎসাহিত হলেন না কেন। এক্ষেত্রে কি দায়ী ছিল সমাজের পুরুষতান্ত্রিক

মনোভাব যেখানে পুরুষরা চাননি বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী বস্তু নিষ্ঠতার জগতে মেয়েরা পা রাখুক। সমাজ কি চেয়েছিল শুধুমাত্র বিজ্ঞান সচেতনতা ও নারীদের প্রয়োজন চিকিসাবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের আগমনের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তা খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়।

তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বিজ্ঞান সচেতনতা ও বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে যে নতুন জগতের প্রবেশের প্রয়াস উনিশ শতকের মেয়েরা শুরু করেছিল বিজ্ঞান তথা মানবীবাদী ইতিহাস চর্চায় তার একটা নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৩
২। কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি, কলকাতা - ১৭৮৭ শকাব্দ পৃষ্ঠা ৭
৩। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে, উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, পৃষ্ঠা ৪১
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩
৫। Shrabane Basu -- Women and Public issues -- The Changing role of Women in Bengal (1900-1920) (এমফিল ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় - ২০০০)
৬। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, পৃষ্ঠা ৪৫
৭। সোমা বিশ্বাস, উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষিতে বাঙালী মহিলা চিকিৎসক (এমফিল ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
৮। ঐ
৯। ঐ
১০। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, অন্দরে অন্তরে - উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, পৃষ্ঠা ৬১
১১। স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী', *পরিচারিকা*, বৈশাখ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১২
১২। মহিলা, ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ - পৃষ্ঠা ৪৪
১৩। 'নারীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত' *মহিলা* - মাঘ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৬৬
১৪। হেমলতা সরকার, নারীজাতির শিক্ষা - ভারত মহিলা - আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ - পৃষ্ঠা ৪৯-৫০
১৫। সোমা বসু — বাঙালী মেয়ের বিজ্ঞান ভাবনা - প্রাক স্বাধীনতা পর্ব (ইতিহাস অনুসন্ধান ১৮-২০০৪) পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৬৫
১৬। Chakraborty Usha – Condition of Bengal Women Around the 2nd Half of the 19th Century – Cal - 1963- page 49
১৭। Barthwick Meridith – Changing role or women in Bengal (1849-1905) Princeton, 1984-page 95

১৮। Indian Mirror, 18th March 1883 as quoted in chakraborty Usha, page 50

১৯। ভারতী রায় (সম্পাদিত) বামাবোধিনী পত্রিকা সেকালের নারীশিক্ষা কলকাতা ১৯৯৪ - পৃষ্ঠা (২৪৮-২৫০)

২০। Mausumi Bandyopadhyay - The First women medical practitioner and patriot in Bengal Kadambini Ganguly (1861-1923) -- (Unpublished P H.D. thesis - History Department. Jadavpur University - 2001)

মানুষ মানুষকে পণ্য করে —
মেয়েরা কি পণ্য?

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটি ছবির (ফটোগ্রাফ) প্রদর্শনী হয় — প্রদর্শনীর নাম 'Violence'। ছবিতে দেখা যায় না, যাকে হয়তো অত্যাচারও বলতে অনেকে আপত্তি করবেন — বলছিলেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায় ছবি দেখতে দেখতে। বোলান আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা। বোলানের গলাগুলোও আমার ছবির মত মনে হচ্ছিল।[১] বোলানের ভাষায় ঃ আমার এক জেঠতুতো দিদি অসাধারণ নাচতে পারতেন। বাড়ির লোকের খুশী আর উৎসাহে দিদি পড়াশুনোর চেয়ে নৃত্যশিল্পকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। বাড়ির একটা আলমারী দিদির পাওয়া কাপ/মেডেলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। দিদি যখন নাচকেই তার পেশা করে নিতে চাইল তখন আমাদের রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বাড়ি একেবারেই বেঁকে বসল। দিদি নাচ ছেড়ে দিল। একদিন সমস্ত কাপ/মেডেল গুলো ফেলে দিল — দিদির উপর এই যে অত্যাচার এবং দিদির নীরব যন্ত্রনা তার ছবি কে তুলবে?

আমার এক বন্ধু (সতীর্থ) দর্শন শাস্ত্রে অনার্স পড়তো। দেখতাম অবসর সময়ে সে লাইব্রেরীতে অথবা বাড়িতে ইকনকমিকসের বই পড়ে। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার অনার্স দর্শনে তুমি এত ইকনমিকসের বই পড়ো কেন? বন্ধু বলল ইকনমিকসে অনার্স পড়বো। তারপর উচ্চশিক্ষাও করবো অর্থনীতিতে এটা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন। কিন্তু কলেজে ভর্তির-সময় অর্থনীতিতে অনার্স নিতে চাইলে বাবা/কাকারা বললেন অর্থনীতি ছেলেদের বিষয় তুমি দর্শন বা বাংলায় অনার্স পড়বে। একি অত্যাচার! এ অত্যাচারের ভাষা নেই, অনেক সময় প্রতিবাদও নেই এমনকি এটা যে আদৌ অত্যাচার তা অভিভাবকরা মনেও করেন না। এই নীরব অত্যাচারে কত মেয়ের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, কে তার খবর রাখে।

তাহলে মেয়েদের স্বাধীনতা কোথায়? সমাজ ও পরিবার নানান দোহাই দিয়ে তার নিজস্ব বিকাশের পথে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছে। আজও চলে তবে হয়তো ভিন্ন পথে।

'সংলাপ' একটি বেসরকারী সংগঠন (NGO) যারা প্রধানত পাচার হয়ে যাওয়া

মেয়ে ও শিশু তাদের পুনর্বাসন, তাদের লেখাপড়া ইত্যাদি কাজ কর্মই করে থাকে। সংগঠনটি কলকাতার। সংগঠনটি মাঝে মাঝে যৌনকর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনার ব্যবস্থা করে, যেখানে তারা উপস্থিত থেকে তাদের সমস্যা দাবী দাওয়া (প্রধানত মানুষের মত বাঁচা, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ইত্যাদি) সম্বন্ধে খোলা মনে কথা বলেন। এরকম একজন মহিলা যিনি বাধ্য হয়েছিলেন পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "বলতে পারেন মানুষের" এত লোভ কেন? কেন কিছু মানুষ কান্ডজ্ঞানহীনের মত মেয়েদের শরীর ব্যবহার করে তাদের এত কষ্ট দেয়?" সংলাপের ইন্দ্রানী সিনহা বলেছিলেন আমি সেদিনও তাকে কোন উত্তর দিতে পারিনি আজও কোন উত্তর দিতে পারবো না।[২]

মানুষ মানুষকে পণ্য করে। নারী, শিশু (ছেলে/মেয়ে) পাচার তো আজকের ঘটনা নয়। এতো অনেকদিন ধরে চলে আসছে। দারিদ্র, খিদের জ্বালা, অপুষ্টি, অশিক্ষা এসবই এর পেছনে কাজ করে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই পাচার করার জন্য ছেলে মেয়েকে নানান লোভ দেখিয়ে, ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে যারা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসে অনেক সময়ই সেই সব পরিবারের আত্মীয় বা বন্ধু। আবার বলতে হচ্ছে করে, কেন কিছু মানুষ এত লোভী ('why are some human beings so greedy')।

দূরদর্শন আজ আর দুর্লভ নয়। সব বয়সের ছেলেমেয়েরা, মা বাবা অর্থাৎ বড়রা সবাই কোন না কোন সময়ে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখেন। অজস্র বিজ্ঞাপনে যেভাবে মেয়েদের শরীর ব্যবহার করা হয় তা আপত্তিকর। সাবান কি শুধু মেয়েরাই মাখেন। যেভাবে প্রায় নগ্ন অবস্থায় মেয়েদের সাবান ব্যবহার দেখানো হয় তার প্রয়োজন আছে কি?

বিজ্ঞাপনের 'মডেল' একটি পেশা। ছেলে মেয়ে উভয়েই এই পেশায় আসেন। জামা কাপড়ের বিজ্ঞাপন বা ফ্যাসান ডিজাইন দেখানোর জন্য ছেলে মেয়েদের যেভাবে পোষাক পরানো এবং হাঁটানো হয় তা বড়ই কুরুচিপূর্ণ মনে হয়।

দূরদর্শনের অধিকাংশ ধারাবাহিকে মেয়েরা অত্যাচারিত, আকছার তারা ধর্ষিত হচ্ছেন, একাধিক বিয়ে যে আজ বেআইনি তার তোয়াক্কা না করে একই সঙ্গে পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গ উপভোগ করছেন — এগুলো শুধু অসঙ্গত নয় বেআইনীও।

এসব কিশোর এবং যুবক যুবতীদের চিন্তা ভাবনাকে অস্বচ্ছ করে এবং তারা অনায়াসে অন্ধকার পথে পা বাড়ায়।

আজকাল এমন কিশোরীর কথাও শোনা যাচ্ছে যারা স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে আসছে যৌন সুখ উপভোগ করার লোভে — তারা জানে না এর পরিনাম কি হতে পারে। অনেক সময় তারা নিজ পরিবারে ফিরতে পারে না — পাচার হয়ে যায় নানান

জায়গায় — ধরা পড়লে বিভিন্ন হোমে আশ্রয় পায় — যা নরকের চেয়েও খারাপ, যেখানে সুরক্ষার নামে তাদের সর্বনাশ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

দশ বারো বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে যে স্কুল বাসের চালক এবং তার সহকারী, ১৫/১৬ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করে যে নিরাপত্তা কর্মীরা, জেলের মধ্যে অসহায় মেয়েদের ধর্ষণ করেও যারা রক্ষক হিসেবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় — তারা কি মানুষ না জানোয়ার!!

এক সময় আমাদের দেশেই অনেক জেলায় জমিদার ও মহাজনরা গরীব চাষী ও ভূমিদাসদের মেয়েদের বিয়ে করত — দিনের বেলায় তারা বাড়ির ঝি চাকর, রাত্রে তারা শয্যাসঙ্গী। এসব খুব বেশী দিনের পুরোনো কথা নয় — আজ জমিদারী নেই। কিন্তু অন্য চেহারায় এব্যবস্থাটা রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে এখনও যে বিয়ের পদ্ধতি আছে তাতেও কি মনে হয় না যে মেয়েরা পণ্য? অলংকার 'পাত্রে' দানসামগ্রির সঙ্গে মেয়েকে বাবা দান করেন — আশ্চর্য কেউতো তাতে আপত্তি করেন না। কন্যা কি দানসামগ্রী? আর এই দানের পদ্ধতি ও রীতি থেকেই জন্ম হয়েছে যৌতুক, পণ ইত্যাদি নানাবিধ দাবী যার থেকেই আসছে মেয়েদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার — যা অনেকের ক্ষেত্রে আত্মহনন অথবা হত্যায় পরিণত হচ্ছে। এ্ বিভৎসা করে দূর হবে? কবে মেয়েরা সবাই মাথা উচু করে বলবে আমরা জিনিষ না আমরা মানুষ।

এ সমস্যা শুধু ভারতবর্ষে বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেই নয় যারা পৃথিবীতে প্রায় সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে রয়েছে মেয়েদের উপর অত্যাচার মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা, মেয়েদের আত্মহত্যা।

এইডস নামক মারাত্মক অসুখকে সবাই ভয় পায়, অথচ যৌনসঙ্গ কিছু মানুষের স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পশ্চিমি দেশের মানুষের ধারণা কুমারী মেয়েদের ভোগ করলে (তারা অনাঘ্রাত কুসুম) এই রোগের সম্ভাবনা নেই। তাই নারী পাচার কারীরা আজকাল অল্পবয়সী মেয়েদের (৮-১৪ বছর বয়স) পাচার করতে বেশী উৎসাহী। অভাবের তাড়নায় অধিকাংশ শিশুই বিক্রী হয়ে যায়।

গোয়াতে একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে বেড়ানোর মরশুমে যখন বিদেশী পর্যটকদের সমাগম হয় তখন স্থানীয় স্কুলের ছেলে মেয়েরা হঠাৎ অনেকেই স্কুলে আসে না। তাদের দেখা যায় ছোট ছোট কটেজের কাছে যেখানে বিদেশীরা আস্তানা গাড়ে। স্কুল শিক্ষয়ত্রী এবং শিক্ষকরা বলছেন কিছুদিন পরে এরা স্কুলে আসে, এদের গায়ে বিদেশী পোষাক পায়ে বিদেশী জুতো, কিন্তু কেউ তাদের চোখের দিকে তাকায় না। পরে জানতে পারা গেল এই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এদের ফাই ফরমাস খাটার নামে

শরীরও বিকিয়ে দেয় — একে ধর্ষণ ছাড়া আর কি বলবো? আমাদের পর্যটন শিল্পের উন্নতি হচ্ছে, ব্যাঙ্কে ডলার জমা হচ্ছে — দেশ বিদেশে গোয়ার সৌন্দর্য নিয়ে লোকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে — বছর বছর বেশ কিছু ছেলে মেয়ের কৈশোরের আর তাদের একটা ছোট সুন্দর মনের বিনিময়ে।

ছেলে মেয়ে পাচার হয়ে যাওয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বলছে এটা আধুনিক দাসপ্রথা। লক্ষ লক্ষ ছেলে, মেয়ে, নারী পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশ দেশান্তরে। এর বিষময় ফল ভোগ করছে শুধু তারা নয় তাদের পরিবার ও সমগ্র সমাজ।[৩]

বিশ্বায়ন পৃথিবীর চেহারা ও চরিত্র দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। প্রত্যেক দেশে পতিতালয়ের সংখ্যা এবং পতিতার সংখ্যা বাড়ছে। আর বাড়ছে মেয়েদের উপর অত্যাচার। চীনের সাংহাই কুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেন য়ুনান বলছেন ঃ এত দ্রুত গতিতে চীনের সমাজ অর্থনীতি এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে তার একটা ভাল দিক যেমন আছে, একটা খারাপ দিকও আছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার অস্বাভাবিক রকমভাবে বেড়ে যাচ্ছে (বছরে নয় শতাংশেরও বেশী)। স্ত্রীকে মারধোর করা (চাকরী করা শিক্ষিত স্ত্রী) অসম্ভবরকম বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা চীনের পরিবর্তন এত দ্রুত হচ্ছে যে এতে লোকজন ভারসাম্য হারাচ্ছে, আইন, সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের দ্রুততার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।[৪]

ইরাকের যুদ্ধে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, মানুষ মরেছে অনেক, জীবনের অনিশ্চয়তা বাড়ছে, এর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। ইরাকীরা অনেকে মনে করছেন তাদের মা বোন স্ত্রীরা সতীত্ব হারাচ্ছে, পুরোনো ঐতিহ্য রীতি পদ্ধতির থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, সুতরাং পুরুষতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং মা বোন স্ত্রীকে হত্যা করছে — এ খবর বেড়িয়েছে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায়। পত্রিকাটি কিভাবে 'honour killing' হচ্ছে তা বলেনি কিন্তু লিখছে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, আত্মীয় স্বজনরা মেয়েদের মেরে ফেলছে — হয়তো, এই স্ত্রী মা বোনেরা এদের জন্যই প্রার্থনা করেছিলেন যেন এরা যুদ্ধে নিহত বা আহত না হন।[৫] মেয়েদের চরিত্র কলুষিত হয়েছে সন্দেহ করে তাদের খুন করে পুরুষতন্ত্র সততার পরাকাষ্ঠা দেখালেন!

ভাল কাজ, ভাল বিয়ের লোভ দেখিয়ে যে সব মেয়েদের বাইরে (মূলত মধ্যপ্রাচ্য উপসাগরীয় এলাকায়) চালান করে দেয় তারা বাধ্য হয় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে। অধিকাংশ মেয়ে ও শিশুদের (ছেলে এবং মেয়ে) বিদেশে যাবার ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) জাল থাকে। সেটাও দালালরা ওখানে গিয়ে নিয়ে নেয়।[৬] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে জাল পাসপোর্ট নিয়ে কিভাবে এই ছেলে মেয়েরা প্লেনে উঠতে পারে? সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে একটা নোংরা চক্র এখানে কাজ করে — এতে বড় বড় মানুষও জড়িত —

কারণ খেলাটা বহু টাকার। ছেলে মেয়েদের মা বাবাকেও অনেক টাকা দেওয়া হয়। সুতরাং এই বেচা কেনার জালটা ছড়িয়ে আছে অনেক দূর পর্যন্ত — দালাল অভিভাবক, বিমানবন্দরের অসাধু কর্মী এবং যে দেশে পাঠাচ্ছে সেখানকার দালালরা। এ সবই কিন্তু বেশ খোলা মেলা ভাবেই হয়, গোপনীয়তা কোথায়ও নেই। মাঝে মাঝে লোক দেখানো কিছু ছেলে মেয়েকে উদ্ধার করা হয় — ঐ পর্যন্তই — চক্র কিন্তু ধরা পড়ে না। ঐ অসহায় ছেলে মেয়েরা কিন্তু হারিয়ে যায় চিরদিনের মত। এখানেই ভূমিকা আছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর (NGO) তারাই পারে কিছু করতে চেষ্টা করলে এই নোংরা চক্রগুলোকে ধরিয়ে দিতে।

উদ্বেগের কথা হচ্ছে ভারতবর্ষ এই ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র। বাংলাদেশ থেকে শিশু ও মেয়েদের এখানে আনা হয় — এরা এখানকার পুরুষকে তৃপ্ত ক'রে বাকীরা চালান হয়ে যায় পাকিস্তানে এবং উপসাগরীয় এলাকায়। নেপালের নারী এবং অল্পবয়সী মেয়েরা ভারতে আসে যারা যৌনকর্মী হিসেবেই এখানে কাজ করে। চিন্তার কথা এদের অধিকাংশই হচ্ছে অল্পবয়সী মেয়ে। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় শহরে (Mega cities) ছড়িয়ে আছে এরা। ২০০২'র সমীক্ষায় জানা গেছে পশ্চিম বাংলার শিশু কন্যা পতিতালয়ে আছে সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০ শতাংশ শিশু কন্যা, যাদের বয়স ১৫ বছরের নীচে, যারা এই প্রথম যৌনসঙ্গ উপভোগ করল। উড়িষ্যায় এ সংখ্যা ৫০.৭ শতাংশ, বিহারে ৪৩ শতাংশ, হরিয়ানায় ৪০.৭ শতাংশ। পশ্চিমবাংলায় এ মেয়েদের মধ্যে বেশ কিছু বিবাহিত মেয়েও আছে। সরকারী এবং বেসরকারী ভাবে উদ্যোগ নিয়ে কাজে না নামলে সর্বনাশকে ঠেকানো যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাজেটের একটা অংশ দারিদ্র দূরীকরণ এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারী সংস্থাগুলোকে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে আসছে — কারণ আজ এ সমস্যা শুধু দরিদ্র দেশের নয় ধনী দেশগুলোরও।

ভারতবর্ষে পতিতা বৃত্তিতে শিশু (ছেলে ও মেয়ে) আছে প্রায় ২.৩ মিলয়ন — এরা ছড়িয়ে আছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ১০০০টি জেলায়। মূলত আসে শহরের বস্তি এলাকা থেকে আর গ্রামের খরা প্রবন এলাকা এবং বানভাসি এলাকা থেকে। যেখানে দারিদ্র, অশিক্ষা, কুশিক্ষা মানুষকে আর মানুষ থাকতে দেয় না। দেশকে সুন্দর করতে বস্তি, ঝুপড়ি ভাঙ্গা দরকার — কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি এরা কোথায় যাবে? কেন দেশের মানুষ ঝুপড়িতে ঠাঁই পেল?

এই কলকাতায়ই পতিতালয়ে আছে প্রায় ১,০০,০০০ মেয়ে এবং শিশু যার ৪০ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নীচে। কলকাতায় বেসরকারী সংস্থা সমীক্ষা করে জেনেছে

কলকাতার যত যৌন কর্মী আছেন, তার মধ্যে ৬০ শতাংশ মহিলা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাদের শশুরবাড়ি বা স্বামীর দ্বারা প্রতারিত ও অত্যাচারিত হয়ে।[৮] ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন পতিতা পল্লীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং *পরিচয়* পত্রিকায় এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখে এ ব্যাপারে আমাদের অবহিত করেছেন।[৯] যৌন কর্মীরা কোনদিন সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারবেন না, তাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে পিতৃপরিচয় হীন ভাবে, সমাজ ও পরিবারে তাদেরও জায়গা হবে না। ভুলে যাবার কোন কারণ নেই, যে এরা সুখে নেই।

যে মেয়ে ধর্ষিতা, অপরাধ কি তার? অথচ সমাজ তার দিকেই শাসনের তর্জনী তোলে। তার পরিবার লজ্জায় মরমে মরে যায়, কারণ প্রতিবেশীর বিদ্রূপ তাদের বিদ্ধ করে। হয়তো তাদেরই কোন ছেলে মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণকারীর কোন, শাস্তি নেই, তার মা বাবার লজ্জা নেই, ধর্ষিতা শাস্তি পায়। পুলিশ প্রশাসন নিরুদ্বেগ। তাদের বক্তব্য কোথায় আমাদের কাছে তো FIR আসে না। কোর্টে কটা কেস হয়? অধিকাংশ সময় FIR পুলিশ নেয় না ধর্ষিতাদের কাছ থেকে, আর বিচার! পুলিশ, বিচার সবই পয়সায় কেনা যায়। মেয়েরা বিকিয়ে যায়। আর অপরাধীরা পয়সা দিয়ে আইন বিচার মায় মানুষ পর্যন্ত সবই কিনে নেয়। মেয়েদের ঘুরে দাড়াতে হবে — ধর্ষণ অপরাধ, ধর্ষিতা অপরাধী নয় একথা বলতে হবে সমাজকে, প্রশাসনকে, বিচার বিভাগকে এটা মানতে বাধ্য করতে হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ২০০৩, এটি প্রবন্ধাকারে আনন্দবাজারেও ছাপা হয়েছে।

২। *জোনাকি*, সম্পাদিকা ইন্দ্রানী সিনহা, জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০০৩, সংলাপের মুখপত্র।

৩। *জোনাকি*, ২০০৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) *ট্র্যাফিকিং অ্যান্ড 'দি ব্যান্ডেট'*।

৪। *দি টেলিগ্রাফ*, ৮ আগস্ট, ২০০৪

৫। *দি টেলিগ্রাফ*, ২৫ জুলাই ২০০৪

৬। *জোনাকি, জুলাই-সেপ্টেম্বর*, ২০০৩, অলক গোস্বামী 'দি ইন্ডিয়ান ইনিসিয়েটিভ'।

৭। *জোনাকি*, 'আর উই অ্যাওয়ার'

৮। ঐ

৯। *পরিচয়*, ১৯৮৮, বেলা বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ *'যৌন কর্মীদের কথা'*

ভগিনী নিবেদিতা ও নারী শিক্ষা

শিবাজী কয়াল

ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে অনেক নারী তাদের কার্যের মহত্ত্বের জন্য অমর হয়ে আছেন। কিন্তু এদেশে দু-একজন নারী আছেন যাঁরা বিদেশিনী ছিলেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ইতিহাসের আঁধারে রয়ে গেছেন। এরূপ একজন বিদেশিনী মহীয়শী হচ্ছেন আয়ারল্যান্ডের কন্যা Margaret Noble যিনি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি সভ্যতা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এদেশকেই তিনি ভালবেসেছিলেন, আমৃত্যুও এখানেই তিনি বসবাস করেছিলেন এবং এদেশই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থ তাঁকে কতোটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন।

Margaret Noble ভগিনী নিবেদিতা নামেই জনপ্রিয়। ভগিনী ছিলেন স্বামীজির 'মানসকন্যা', রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা', অবনীন্দ্রনাথের 'মহাশ্বেতা', শ্রী অরবিন্দের 'শিখাময়ী' তথা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অন্যতমা প্রেরণাদাত্রী রূপে।

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায় যে ইংরেজরা মনে করতো, "ভারতবর্ষে লোক বসতি বড় ঘন এবং ইহার লোক সংখ্যা বৃদ্ধিও খুব বেশি হয় বলিয়া ইহা দরিদ্র দেশ, ইংরেজরা এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নিবেদিতা দেখান যে, মোটের উপর ইহা সত্য নহে যে, নিখিল-ভারত ঘনবসতি। কিন্ডার গার্টেন প্রণালীতে ভারতীয় জিনিসপত্র লইয়া কেমন করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা তিনি প্রদর্শন করেন"। (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃ.৫৯১, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩, ১৯৯৯)।[১] কাজেই স্কুল প্রতিষ্ঠা ভগিনীর মনকে আলোড়িত করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভগিনীকে বলেছিলেন, "আমার কাজ হচ্ছে রামকৃষ্ণের ন্যায় নয় বা বেদান্তের ন্যায় নয় বা অন্যকিছু নয়। আসলে তা হচ্ছে শুধু জনগণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধ আনয়ন করা।"

"স্বামী, আমি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবো ভগিনী উত্তর দিয়েছিলেন।"

"আমি সে কথা জানি" তিনি বলেছিলেন (প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা নিবেদিতার পত্রাবলী?, Vol. I. P. 82. April. 1992. কোলকাতা)।[২]

স্বামীজি ও ভগিনী বিশ্বাস করতেন যে নারী জাতির ও নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধনই তাঁদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এই মূলমন্ত্র ব্যতীত ভারতের জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান অসম্ভব।

ভারতীয় সমাজের দুটি বিরাট মন্দ দিক হচ্ছে রূঢ়ভাবে বা অবজ্ঞার সাথে নারীদের পদদলন করা বা সহজ ভাষায় অপমান এবং দরিদ্রদের ক্ষতিসাধন বা আরও দরিদ্রতর করা (প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, অধ্যায় ২১, পৃ.৮৮, Sister Nivedita, কোলকাতা-১৯৯২)।[৩]

নারীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন এবং জনগণের জাগরণ আনা প্রথম কাজ তবেই দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হবে।

সে পরিবারের বা দেশের উন্নতির কোন আশা নেই, যেখানকার নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নেই, যেখানে তারা দুঃখে বাস করে সেখানকার বা সে দেশের উন্নতির কোন আশা নেই। কাজেই তাদের উন্নতি হচ্ছে প্রথম কাজ এবং তা সম্ভব একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের দ্বারা ও একটা মঠ স্থাপনের মাধ্যমে।

স্বামীজি ও নিবেদিতা মনে করতেন "নারী জাতি ও নিম্নশ্রেণীর জনগণকে শিক্ষাদান পর্যন্তই অপরের অধিকার। তাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাদের নিজেদের ওপর। নারীরা কিরূপ জীবনযাপন করবে — বাল্যবিবাহ থাকবে কি না, বিধবা বিবাহের প্রয়োজন আছে কি না, অথবা যথাযথ শিক্ষালাভের পর কেহ কৌমার্যব্রত অবলম্বন করে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে কি না —এ সকল প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধানের ভার নারীগণের ওপর"। (ভগিনী নিবেদিতা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, পৃ.১৪৫, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, কোলকাতা-৩, ১৯৯২)[৪]

বিবেকানন্দ পরিকল্পিত স্ত্রী শিক্ষারও গোড়াপত্তন এই বাড়িতেই (১৬ নম্বর বোসপাড়া লেন), তিনটি ছাত্রী নিয়ে (স্বামী বিবেকানন্দ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৩)।[৫] স্বামী অসিতানন্দের স্মৃতি কথায় লিখেছেন "তখনকার হিন্দু সমাজ বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় উৎসাহী ছিল না। বিশেষ করে স্কুল বা কলেজের শিক্ষায়। নিবেদিতা খালি পায়ে পথ হেঁটে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের ধরতেন, যাতে তাঁরা বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠান। সেলাই শেখার জন্য তিনি মেয়েদের বিনামূল্যে কাপড় দিতেন। কাটবার সময়ে বা কাজ করবার সময়ে কাপড় যদি নষ্ট হয়ে যেত, তিনি বিন্দুমাত্র রাগ না করে নতুন কাপড় দিতেন। ছুঁচ, সুতোও তিনি দিতেন। ও দিকে রক্ষণশীল পরিবারের লোকেরা ম্লেচ্ছ অহিন্দুর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করত না। কিন্তু নিবেদিতার অপূর্ব ভালবাসায় এইসব বাধা ক্রমে দূর হল। তিনি মোটামুটি সব ঘরেই আদরের সঙ্গে গৃহীত হলেন"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৩, নিবেদিতার

জীবনীকার শ্রীমতী নিজেল রেঁমের গ্রন্থ থেকে তথ্যগুলো পাওয়া গেছে)।[৬] নিবেদিতা অর্থ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার বিদেশ যাত্রার সময় স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩০। স্বামীজীর মনে আনন্দ জেগেছিল এ কথা শুনে।

স্বামিজী ভগিনীকে বলেছিলেন, "আমার ছাত্রীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম কর, এবং ঐ নিয়ম সম্বন্ধে তোমার মতামতও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও। সুবিধা হলে একটু উদারভাবের প্রশ্রয় দাও"। (ভগিনী নিবেদিতা, প্রব্রাজিকা, মুক্তিপ্রাণা সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কোলকাতা, ১৯৯২)[৭] স্বামিজীর মতে, সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা থাকবে, আবার সেসঙ্গে সম্প্রদায়ের গন্ডির বাইরে যাবার ব্যবস্থারও অভাব হবে না। নিবেদিতাকে নিজের সহকারিণী নিজেই প্রস্তুত করে নিতে হবে। নিয়ম করা প্রয়োজন, কিন্তু সেই নিয়মগুলো এরূপ হবে যে, যাদের প্রয়োজন নেই তারা যেন অযথা নিয়মশৃঙ্খলের দ্বারা পীড়িত না হয়। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণ শাসন এটাই হবে স্কুলের মৌলিকত্ত্ব। স্কুল পরিচালনা করার জন্য অর্থ ও একদল নারীর যারা স্কুলের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এই দুটি প্রয়োজনের সমাধান করতে হবে। সে সময়ের হিন্দু সমাজে কোন কুমারী কন্যার আজীবন শিক্ষাব্রতীরূপে জীবন যাপনের প্রশ্নই উঠে না। কাজেই যারা বাল্যবিধবা, বিশেষত পিতৃমাতৃহীন, এরূপ বালিকাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে এক মহৎ উদ্দেশ্যে গঠন করতে হবে। ব্রতধারিণী রূপে তারাই সর্বত্র শিক্ষা প্রসারের ও নারীগণের সকল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই সকল ব্রতধারিণীরা কর্মক্ষেত্রকেই গৃহ এবং ধর্মকেই একমাত্র বন্ধন বলে মনে করবে। এরূপ একদল শিক্ষয়িত্রীর জন্য প্রয়োজন একটা আশ্রম স্থাপন। এরূপ ভাবে আশ্রম স্থাপনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের।

এভাবে আশ্রম স্থাপন করে স্বামিজী স্থির করলেন পুনরায় বিদেশ যাত্রা করবেন এবং নিবেদিতা ভারতেই থেকে যাবেন। কিন্তু পরে মনে হল ভগিনীও আমেরিকায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন তাহলে ভাল হবে। কাশ্মীরের মহারাজা স্বামিজীকে কিছু অর্থ দিয়েছিলেন স্কুল ও স্কুলের আশ্রমের জন্য। তার সঙ্গে যুক্ত হল নিবেদিতার নিজস্ব শেষ সম্বল ৬২০ টাকা (অবশ্য স্বামিজী সম্মতি দিলে পর)। স্বামিজী জানালেন যে তিনি একজন ছাত্রীর ব্যয় বহন করবেন। তিনি আরও প্রস্তাব করলেন বেলুড় মঠে গ্রামীণ শিল্প গড়ে তোলার। ইতিপূর্বেই সেলাই ইত্যাদির কথা আমরা গ্রহণ করেছি। এর সঙ্গে যদি আমের প্রস্তুতি যোগ করা যায় তার ফল ভাল ভালই হবে। (Sister Nivedita প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা নিবেদিতার পত্রাবলী,প্রথম খণ্ড, পৃ.১৬২)।[৮] নিবেদিতা স্কুলের জন্য মঠ ও আশ্রম স্থাপন করতে না পারলেও ভগিনী সুধীরা স্বামিজী যেরূপ চেয়েছিলেন সেরূপ একটা আশ্রম স্থাপন করেছিলেন—মাতৃ মন্দির যার নাম পরে হয়

সারদা মন্দির। স্বামিজী ভগিনীকে নতুন নতুন ধারণা দিতেন এবং ভগিনী সেগুলি তাঁর বক্তৃতায় যুক্ত করবেন এই চিন্তা নিয়ে যে সে আবেদন আমেরিকায় তাঁকে টাকা এনে দেবে।

"নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলতে আমার বাধে। আমার তো মনে হয় তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন" (রাসবিহারী ঘোষ)"। ভগিনী নিবেদিতার উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এরূপ ধারণা তিনি লিখেছিলেন, "I love India as the birth place of the highest and best of all religions. as the Country that has the grandest mountains the Himalayas. The Country where the homes are simple, where domestic happiness is most to be found and where the women unselfishly, unobtrecsively, ungrudgingly serve the dear ones from early morn to deny eve"।

এই তথ্যগুলো একত্রীভূত করে বলা যায় যে কিভাবে নিবেদিতা নীরবতার সাথে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একটা বিপ্লব সাধন করেছিলেন।

সূত্র-নির্দেশ

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *উদ্বোধন* পৃ.৫৯৯ (বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৯৯৯)
২। Parivrajika Atmaprana, *Sister Nivedita of Ramakrishna - Vivekananda* 4th Edn. Vol. 1, P. 28 (Calcutta, 1992)
৩। Ibid, P. 145.
৪। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা,* পৃ.১৪৫ (কলকাতা, মে, ১৯৯২)
৫। স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* (কলকাতা, ২৮/১০/২০০৩)
৬। তদেব
৭। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা,* পৃ.১৪৬ (কলকাতা. মে, ১৯৯২)
৮। তদেব, পৃ.১৬২

সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট, পিতৃতন্ত্র ঃ একটি আলোচনা

আইরিন মুস্তাফা মণ্ডল

আমার আজকের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল দাঙ্গার আক্রান্ত মহিলাদের চিত্র, রাষ্ট্রের তাদের প্রতি স্ব-বিরোধিতা ও দ্বৈততামূলক অবস্থান, মহিলাদের আচরণ অনেকক্ষেত্রে দাঙ্গা পীড়িত মহিলাদের প্রতি দ্বৈততামূলক একদিকে তাঁরা তাদের (দাঙ্গা পীড়িতাদের) সাহায্য করতে গেছেন, অন্যপক্ষে তাঁদের প্রতি রাষ্ট্র-অনুমোদিত ব্যবহার করছেন। রাষ্ট্র ও দাঙ্গা পীড়িতাদের উদ্ধার করতে যাওয়া সমাজের প্রথম শ্রেণীর মহিলা, পরিবার সকলেই কিভাবে পিতৃতন্ত্রের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে আমার আলোচনায় সেই দিকটি প্রাধান্য পাবে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সময় দাঙ্গ াপীড়িতাদের প্রতি রাষ্ট্রে ব্যবহার ও স।ম্প্রতিক কালে গুজরাট দাঙ্গার সময়ে অত্যাচারিত মহিলাদের প্রতি রাষ্ট্রের নির্মম দৃষ্টিভঙ্গি সবই আমার আলোচনায় প্রাধান্য পাবে।

সাম্প্রদায়িকতার শিকার যখন কিছু মেয়েরা হচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে কলম ধরছেন মেয়েরাই তখন 'নারীবাদী' চিন্তাধারাব প্রসার এই ধরণের লেখনীগুলিতে পাওয় যায়। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে যখনই তাঁরা মহিলাদের ভূমিকা, রাষ্ট্র ও পরিবারের ভূমিকা কিছু কিছু দিক বেরিয়ে এসেছে। যেমন—

প্রথমত ঃ নারীবাদী ঐতিহাসিকদের মতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বৃদ্ধি ও ধর্মীয় সত্তার বর্ধিত রাজনীতিকিকরণ পিতৃতন্ত্রের প্রচলনকে এক নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। ধর্মীয় অনুমোদনের আড়ালে রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত ঃ নারীবাদীরা যত্নের সঙ্গে তুলে ধরেছেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় মেয়েরা একদিকে সাম্প্রদায়িকতার শিকার, অন্যপক্ষে তা প্রচার ও পালনে নিয়োজিত হন। আমরা নারীবাদী ঐতিহাসিকদের কিছু লেখা বিশ্লেষণ করে প্রচলিত কিছু ধ্যানধারণাকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা তুলে ধরব। পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাকে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে এই ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণ করেছেন নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

উর্বশী বুটালিয়া-র' বক্তব্য প্রথমে দেখা যাক। ১৯৪৬-৪৭ এর দাঙ্গায়, দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রবন্ধগুলি লেখা। ঐসময় সেসব মেয়েরা অপহৃত হয়েছিলেন তাঁদের

ফিরিয়ে আনা-র দিকটি যত্নের সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখিকা। তিনি কিছু প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করেছেন। তাঁর মতে, এরকম কিছু চিন্তাভাবনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে মেয়েরা স্বভাবতই অহিংসা হন। কিন্তু বুটালিয়া দেখাচ্ছেন যে দাঙ্গার সময়ে মেয়েরা খুব হিংস্রভাবে পিতৃতন্ত্রের রক্ষণশীলতা ও আগ্রাসী দিকটিকে রক্ষা করেন। একটি ঘটনার উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে ১৯৪৭ এ মার্চে পাঞ্জাবের থোয়া খালসা গ্রামে নব্বই জন মহিলা কূয়োর ঝাঁপ দেন বিধর্মীদের দ্বারা ধর্ষণ ঘটার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, এই মেয়েরা আজও পাঞ্জাবে 'সতী' ও শহীদের মর্যাদা পান। বুটালিয়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে পুরুষ প্রধান সমাজের যে প্রচলিত ধারণা যে সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা পায় মেয়েদের পুরুষতান্ত্রিক হিংসার কবল থেকে রক্ষা করলে তার শরিক। এই অত্যাচার গুলি হল ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ ও ধর্মান্তরকরণ। সুতরাং তাঁরা যখন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করছেন তখন এই ভাবধারা দ্বারা চালিত হয়েই তারা তা করছেন নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। বুটালিয়া আরও তুলে ধরছেন যে হিংসা কেবল অত্যাচারকারী সম্প্রদায়ের দ্বারা অত্যাচারিত সম্প্রদায়ের উপরেই অনুষ্ঠিত হয় না। বিপুল সংখ্যক মেয়েরা যখন কূয়োয় ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে চান ও তাদের পরিবারের পুরুষেরা তখন তাঁদের হনন করে ঐ মেয়েদের ও পরিবার তথা সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা করতে উদ্যোগী হন, হিংসার প্রকাশ হিসাবে তার তাৎপর্য আরও গভীর সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার ভার মহিলাদের উপর অর্পন করা হয় যা একটি পিতৃতান্ত্রিক ধারণা, মহিলারা তাদের জীবন দিয়ে তা রক্ষা করেন।

উর্বশী বুটালিয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে মেয়েদের ধর্মীয় সত্তার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বলপ্রয়োগ করে বিবাহিতা মহিলাদের অপর রাষ্ট্র থেকে 'উদ্ধার' করে আনছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন কিছু মহিলা। একধারে রাষ্ট্র, উদ্ধারকারী মহিলা ও পরিবার এবং তার পুরুষ সদস্যরা সকলেই এক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সযত্নে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

অত্যাচারিতারাও নিজেদের উপরে ধর্ষণ ও যৌনলাঞ্ছনার কথা বলতে চান না। কখনো মা, কখনো মেয়ে কখনো হিন্দু, শিখ, মুসলিম এরকম বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সভার মধ্যে দিয়েই তাঁরা নিজেদের দেখছেন।

পরবর্তীকালে ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষিতে নারীবাদী ঐতিহাসিকদের লেখনী আরও পরিশীলিত হয়েছে। ঐই সময় ঐতিহাসিকেরা উপলব্ধি করছেন যে মেয়েদের সমস্যাগুলিকে আর পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গচেতনার নিরিখে বিচার করলে চলবে না, বরং তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাংখ্যালঘুর অধিকারের প্রতি নতুন যে আঘাতগুলি এসেছে তার প্রেক্ষিত থেকে।

ফ্লেভিয়া অ্যাগনেস[৭] লিখছেন যে সমাজ উভয় সম্প্রদায়ের (হিন্দু ও মুসলিম)

ব্যবহার করছে সম্প্রদায়ের 'ঐতিহ্য' বজায় রাখতে কতকগুলি ভূমিকা পালনে। তাঁরা এক্ষেত্রেও সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার্থে শহীদত্বের শপদ নিচ্ছেন। বোম্বাইয়ের বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে নিজ সম্প্রদায়ের যুবকদের পুলিসের হাত থেকে বাঁচানোর প্রয়োজনে এঁরা ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন। লেখিকা উল্লেখ করছেন যে দাঙ্গার সময় মেয়েদের পরিচয় কেবলমাত্র সম্প্রদায়ভিত্তিক ভাবে নির্মাণ করা হয়, এই ধারণা সযত্নে মুছে ফেলা হয় যে সম্প্রদায়গত ছাড়াও তাঁদের অন্য কোন পরিচয় আছে।

রামজন্মভূমি-আন্দোলন ও বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষিতে তানিকা সরকারের কিছু লেখা আমরা পাই। মেয়েদের ব্যাপক সংখ্যার এই আন্দোলনে যোগদানকে তুলনা করা যায় গান্ধীর দেশমুক্তির আন্দোলনে বা বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেয়েদের বিপুল সাংখ্যায় যোগদানের সঙ্গে। কিন্তু এই আন্দোলনেও মেয়েরা সবসময়ই স্থান পাচ্ছেন পুরুষ সহযোগীদের পরে। সাধ্বী ঋতম্ভরার ক্যাসেটে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাঁর সময় লড়াইয়ের আহ্বান জানানো হয় তখনও তা শুরু হয় 'বীরভাইয়োঁ জাগো' এই আহ্বানের মধ্যে দিয়ে। অথচ রামজন্মভূমি আন্দোলনে মেয়েদের যে সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবিকা সমিতি, তার প্রচারে মেয়েদের শারীরিক শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি-র উপর অত্যাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। রক্ষণশীল সামাজিক স্তর থেকে নারীদের ঘরের বাইরে বের করে এনে আন্দোলনে সামিল করা হচ্ছে। প্রায় সামরিক নিয়ন্ত্রণে এবং ক্রমাগত সহিংসা প্রচারে তাদের মধ্যে অন্ধ ঘৃণা উসকে দেওয়া হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে তাদের কর্তৃত্ববাদী হিন্দুরাষ্ট্রের উপযুক্ত-নাগরিকে পরিণত করবে। তনিকা সরকার দেখাচ্ছেন যে, যে মূল আদর্শ এই মহিলা কর্মীদের মধ্যে গ্রহিত করে দেওয়া হচ্ছে তা চরিত্রে রক্ষণশীল ও পিতৃতান্ত্রিক।

সাম্প্রতিক গুজরাট দাঙ্গা (২০০২)-য় রাষ্ট্রের দ্বৈততামূলক চরিত্রটি খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ৩০ শে এপ্রিল গুজরাট-দাঙ্গার পরে লোকসভায় যে বিতর্ক হয়েছিল তা দূরদর্শনে সম্প্রচারিত না হলেও সেখানে সাংসদদের বক্তব্যে তা পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ সরকার পক্ষের সাংসদদের বক্তব্যে। সাংসদ উমা ভারতী গুজরাট দাঙ্গার পর বক্তব্য রাখেন যে গুজরাটে নারীনির্যাতনের ঘটনা আদৌ ঘটেনি, কারণ নরেন্দ্র মোদী তাঁকে তাই জানিয়েছেন। নারোদা পতিয়ায় এক মহিলাকে ধর্ষণ করে তার গর্ভস্থ ভ্রূনটিকে পেট চিরে বার করে আগুনে নিক্ষেপ করার ঘটনাটি উমা ভারতী অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে ঐ মহিলার নাম কেউ জানাতে পারেননি। (ঐ মহিলার নাম ছিল কৌসর বানো।) প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নাডেজ ঐ দিনের (৩০ শে এপ্রিল) সভায় বক্তব্য রাখেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের উপর গণধর্ষণ, তাদের অঙ্গহানি করা এবং পুড়িয়ে মারার মত ঘটনাগুলি 'নতুন কিছু' নয়, বরং এই জাতীয় ঘটনা চুয়ান্ন বছর ধরে এদেশে ঘটে চলেছে। গুজরাটের উৎপীড়িত নারীরা মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। তারা চুয়ান্ন বছর ধরে

চলে আসা এক ঐতিহ্যের অংশ।[৪] এইভাবে রাষ্ট্র বর্তমান একবিংশ শতকেও একইভাবে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়ে তাদের উপর উৎপীড়নকে লঘু করে দেখাতে চায়। রাষ্ট্রকে বলা যেতে পারে এখানে 'father patriarch' এর ভূমিকা পালনকারী, যে নিজের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়ে পিতৃতন্ত্রের মোড়কে আশ্রয় খোঁজে।

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে। রাষ্ট, সম্প্রদায় ও পরিবারের এই পিতৃতান্ত্রিক আচরণ প্রকৃতপক্ষে সমাজের রক্ষণশীল দিকটিকে তুলে ধরে। মেয়েরা নিজেরাই যখন পিতৃতন্ত্রকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—সার্বিক ভাবে নারী-স্বার্থের ও অগ্রসরতার এক পরিপন্থী প্রতিষ্ঠান রূপে—তা এক নেতিবাচক কার্যধারার জন্ম দেয়। এখানে এই সূত্রটি আলোচনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে নারীবাদী-আন্দোলন সব স্তরের মহিলাদেরকে আন্দোলনে সামিল করতে পারেনি, তার ভাবধারাও সমাজের সর স্তরে পৌঁছয়নি তাই মেয়েদের ক্ষমতায়নের চিত্রটি এক নেতিবাচক রূপ নিচ্ছে। রাজনীতির নিরিখে দেখলে এই নেতিবাচক কার্যধারার রূপটি এক স্পষ্ট আকার পেয়েছে। বিশেষত ঃ রামজন্মভূমি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের চিত্রটি পুরোপুরি নেতিবাচক যা তাদের এক সম্পূর্ণ নেতিবাচক রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-কল্পনার দিকে ঠেলে দেয় যেখানে ভবিষ্যৎ 'রাম-রাজ্য' র ভারতে মুসলিম শূণ্য সমাজ, বা মেয়েদের বিশেষ অধিকার নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় ভবিষ্যৎ রাম-রাজ্য মুসলিম পুরুষ চারটি বিয়ে করতে পারবেন না। এই ধরনের বিশেষ নারী অধিকার রক্ষার কথাই তাঁরা আলোচনা করেন, বলা বাহুল্য এগুলি একান্তই নেতিবাচক কল্পনা।

এখানেই নারীবাদী ঐতিহাসিকদের এক বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি। তাঁরা সদর্থক পথে তাঁদের চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলে রাষ্ট্র ও পারিবারিক পিতৃতন্ত্রের বিপরীতে মেয়েদের জন্য এক উন্নত সামাজিক ও রাজনৈতিক সদর্থক ক্ষমতায়ন-এব চিত্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। উর্বশী বুটলিয়ার প্রবন্ধ 'কমিউনিটি, স্টেট এণ্ড গেণ্ডার : অর্থ উইমেনস্ এজেন্সি ডিউরিং পার্টিশন, ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি ২৪ শে এপ্রিল, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-ডব্লিউ এস ১২-২৪।

২। ফ্লেভিয়া এ্যাগনেসের প্রবন্ধ 'উইমেনস মুভমেন্ট উইদিন এ সেকিউলার ফ্রেমওয়ার্ক : রিডিফাইনিং দ্য এজেন্ড', ইকনমিক এণ্ড পলিটিকাল ইউকলি, ৭ই মে, ১৯৯৪, পৃ ১১২৩-১১৩২

৩। তনিকা সরকারের প্রবন্ধ 'দ্য উইমেন এ্যাস কমিউনাল সাবজেক্ট, রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি এণ্ড রামজন্মভূমি মুভমেন্ট, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকাল উইকলি, ৩১ শে আগস্ট, ১৯৯১, পৃ: ২০৫৭-২০৬২

৪। মুক্তিপ্রসাদ ঘোষকৃত অনুবাদ মূল প্রবন্ধ, জাভেদ আখতার 'হৃদয়হীন ভণ্ড, তপস্বীর দল, নরক গুজরাত, প্রকাশনা ক্যাম্প, জুন, ২০০২।

সারাংশ

বৈষম্য, বৈষম্যের প্রকৃতি এবং গ্রামীণ আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে নারী

অনিন্দিতা ঘোষাল

উন্নয়নপ্রক্রিয়ার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের পথে অন্যতম প্রধান বাধা হল — নারী পুরুষ বৈষম্য। এই বৈষম্য নারীর পরিপূর্ণ বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। তাই নারী পুরুষের বৈষম্যের পাশ কাটিয়ে সামাজিক সুবিচার সহ উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। অন্যদিকে, উন্নয়নের কর্মধারাকে অর্থবহ করতে হলে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পুরুষের সাথে নারীকেও যুক্ত করতে হবে। অথচ জনসাধারণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকে। তার কোনটিতেই নারীর ভূমিকা স্বীকৃত নয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়।

এই অসমতা পরিবর্তনে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। মূলত এই প্রশ্নটির সমাধান খুঁজতে হবে অর্থনৈতিক স্তরে। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে নারী পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ থাকলে উভয় উভয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যবশত ঘরের ভেতর যে কাজ মহিলাদের করতে হয়, তার উপযুক্ত স্বীকৃতি নেই এবং তার জন্য তারা কোন আর্থিক প্রতিদান পান না।

তবে নারীত্বের জন্ম এবং বিকাশ ধনতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সামাজিক বঞ্চনার উৎসমূল এই একই স্থানে। তাই যতদিন নারী পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। ততদিন সামাজিক জীবনকে এর প্রভাবের বাইরে নেওয়া সম্ভব হবে না। তাই সেই সময়কাল পর্যন্ত নারীমুক্তি কেবলমাত্র আলোচনাচক্রের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের পর গ্রামীণ আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোয় নারীরা কি ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন, আমার প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ বাল্যবিবাহ ঃ সময় ও সাহিত্যের দর্পণে

মণিদীপা ঘোষ

চিরাচরিতভাবে বিবাহ নারীকে পুরুষের সহবাসের সামাজিক স্বীকৃতি এবং সন্তান উৎপাদন দ্বারা উত্তরসুরী তৈরী করার প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে চলে এসেছে। ঔপনিবেশিক যুগে পাশ্চাত্যের আইন ব্যবস্থা এদেশে চালু হবার সাথে সাথে এমন কিছু সামাজিক সংস্কারকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হতে থাকে যার দ্বারা পরোক্ষভাবে ভারতীয় নারীর মৌলিক বেঁচে থাকার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। সতীদাহ রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আইন এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কি প্রেক্ষিতে এই আইনগুলি তৈরী হচ্ছিল এবং এই প্রচেষ্টাগুলি ঔপনিবেশিক সমাজ তথা উপনিবেশিক মননে কি প্রভাব ফেলেছিল সেটাই এই অনুসন্ধানের মূল পরিকল্প। এর জন্য আমরা বেছে নিয়েছি ঊনবিংশ শতকের যে বিষয়টি সমাজকে বিশাল নাড়া দিয়েছিল বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন। কন্যা শিশুকে একজন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত করা এবং তার নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার অনুকুল বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতার প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরীই এই আন্দোলনের মূল সূত্র ছিল। এই বিষয় নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা দ্বারা নিবন্ধীকৃত আইন ও তার ব্যবহার কিভাবে উপনিবেশিক মননে ছাপ ফেলেছিল তার সর্বত্তম প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্যের দর্পণে।

মনে রাখতে হবে এই সময় শুধু সমাজ সংস্কারের সময় নয় — স্বাক্ষরতা প্রসার, মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহারের প্রসারের ফলে মুদ্রিত বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে নাট্যরচনার মাধ্যমে সমকালীন বুদ্ধিজীবিদের চিন্তা-ভাবনা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলে। এই কারণে সমকালীন সমাজ মনের সার্বিক প্রতিফলন আমরা পেতে পারি নাটকের মাধ্যমে। বাল্যবিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত সহবাস সম্মতি আইন তৎকালীন সমাজজীবনে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এবং নাট্য সাহিত্যের মাধ্যমে তা প্রচার লাভ করে। নাট্য সাহিত্য মানবজীবনের দৈনন্দিন ও সাধারণ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, নাটক ও প্রহসনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ আন্দোলন বিষয়ক যে চিত্র প্রতিভাত হয় তা থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর সম্পর্কে ধারণার সম্যক রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া যায়।

পরিবেশ রক্ষার প্রয়াসের ইতিহাস ১৯৬২-২০০২

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

সালটা ১৯৬২, একটা বই এর জন্ম। বের হলো 'সাইলেন্ট স্প্রিং'।[১] লেখিকা র‍্যাচেল কারসন পৃথিবীকে বললেন, বসন্তর মৌন হতে আর বেশি দেরি নেই। পাখি আর গাইবে না গান। পাখির কলকাকলি ছাড়াই কেটে যাবে বসন্তের দিনগুলো। চমকে উঠল এই ভুবন গাঁয়ের মানুষজন। পাখির কলতানে এই ধরা আর মুখর হবে না কেন? প্রথম অধ্যায়ে 'মৌন বসন্ত'-র ছবি তুলে ধরার পর সারা বই জুড়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন কারসন। বললেন বিষাক্ত কীটনাশকই হল এই বিপর্যয়ের কারণ। ফসলের ক্ষেতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে পোকারা মারা যাচ্ছিল। সেই বিষ বিষিয়ে দিচ্ছিল ক্ষেতের ফসলকেও। বেচারা পাখি তাই, ফসল তোলার পর ক্ষেতে থেকে যাওয়া শস্যের অংশই খাক আর বিষাক্ত পোকামাকড়ই খাক, সেই মারণবিষের শিকার হচ্ছিল। যে বিষ, পোকা মারার জন্য দায়ী তাই নষ্ট করছিল পাখির শরীর। শুধু বর্তমান নয়, নষ্ট হচ্ছিল ভবিষ্যতও। ঐ রাসায়নিক কীটনাশকের প্রভাবে পাখির ডিমের খোসা যাচ্ছিল পাতলা হয়ে। কাজেই মা পাখি সেই ডিমে তা দিতে গেলে সেই খোসা যাচ্ছিল ভেঙে। ঘটছিল পাখির মৃত্যু। আর যে কটা ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোল তারা হল জন্ম বিকলাঙ্গ। ডানা ঝাপটে ওঠার আগেই জীবন শুকিয়ে যেতে লাগল। কাজেই ১৯৬২তে শুধু একটা বই ভূমিষ্ঠ হল না, ভূমিষ্ঠ হল এক ভাবনা। ভাবনার নাম পরিবেশ।

১৯৬২ সালের আগে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা চিন্তা যে একেবারে ছিল না তা মোটেও নয়। পুরোনো দিনের বই পড়ে তো বটেই এমনকি প্রাচীন সভ্যতার জীবনযাত্রার মধ্যেও সন্ধান মেলে পরিবেশ ভাবনার। কিন্তু কারসন যে কথা বললেন, তা পরিবেশ নিয়ে আগেকার রোমেন্টিক চিন্তাভাবনাকেই বদলে দিল। বুঝিয়ে দিল, পরিবেশ বিষয়টার অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক মাত্রা।

কারসনের বইটা বের হওয়ার পর বেজায় ক্ষেপে গেল রাসায়নিক কীটনাশক কোম্পানিগুলো। তাদের অভিযোগ কারসন ব্যবসা বিরোধী; তিনি বলতে চেয়েছেন ব্যবসাদাররা মুনাফালোভী আর এই মুনাফা করার চেষ্টা অনৈতিক। অথচ কারসন নিজে কিন্তু তা বলেননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন।[২] জানতে ছেয়েছিলেন মুনাফার স্বার্থে পরিবেশকে আর কত নষ্ট করা হবে? তাঁর এই প্রশ্ন জন্ম দিল আরও এক বড় প্রশ্নের।

তা হল, উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশকে কি নষ্ট করা যায়? উন্নয়ন আর পরিবেশ রক্ষা - দু'টো কি একই সাথে তাল মিলিয়ে কার চলে?

র‍্যাচেল কারসন যে ভাবনার বীজ বুনলেন ১৯৬২তে তা থেকে চাবাগাছ জন্ম নিল আরও দশ বছর পরে। ১৯৭২ সালে স্টকহোম শহরে বসল বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন। আয়োজক রাষ্ট্রসংঘ। এই সম্মেলনে যে ব্যক্তিরা যোগ দিলেন তাঁরা অংশ নিলেন তাঁদের দেশের হয়ে। অর্থাৎ এক কথায়, ৯৩টি দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন এই বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে। পরিবেশের নানান দিক নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর এই প্রতিনিধিরা ২৬টি নীতি সম্বলিত এক প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করলেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। পরিবেশ বাঁচানো বা অন্য কথায়, নিজেদের বাঁচার জন্যই গৃহীত হল এই শপথ। ভারত থেকে এইসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বস্তুত তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহন ভারতে সরাসরি পরিবেশ কেন্দ্রিক আইন প্রণয়নের সূত্রপাত ঘটালো। পরিবেশ রক্ষার প্রয়াসে সামিল হল ভারত সরকার। পরিবেশকে বাঁচানোর লড়াইতে মানুষের আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচ্য সময়কালে (১৯৬২-২০০২) ভারতে এই ধরনের বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ সত্তর দশকে এখনকার উত্তরাঞ্চলে গাছ বাঁচানোর 'চিপকো আন্দোলন' এবং কেরলে পরিবেশ বিরোধী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে 'সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন', আশির দশকে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন।'[৩] তবে এই নিবন্ধের লক্ষ্য এই ধরনের পরিবেশ আন্দোলন পর্যালোচনা করা নয় বরং রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ রক্ষার রূপরেখা প্রদান করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। ভারতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিবেশ রক্ষার আইন কানুন প্রণয়নের দিকে আলোকপাত করার আগে আবার ফিরে যাওয়া যাক্ স্টকহোম সম্মেলনে।

১৯৭২ সালে পরিবেশ রক্ষার জন্য যে 'স্টকহোম ঘোষণাপত্র' গৃহীত হল কেউ কেউ একে বিশ্ব পরিবেশের ম্যাগনাকার্টাও বলে থাকেন । এই ঘোষণাপত্রের ২৬টি ধারায় পরিবেশ বাঁচানোর জন্য কী বলা হয়েছিল তা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়' ৭২-এ পরিবেশ ভাবনা একটা সুসংহত রূপ পেয়েছিল।[৪]

প্রথম ধারায় বলা হয়েছিল বিশুদ্ধ নির্মল পরিবেশ মানুষের জন্মগত অধিকার। এই পরিবেশ বক্ষা করার ক্ষেত্রে তাই মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য বর্ণবিদ্বেষ, জাতিগত বৈষম্য, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং বৈদেশিক আধিপত্যর অবসান ঘটানোর কথ বলা হয়।

এই পৃথিবীর সম্পদ সীমিত। সেজন্যই দরকার এই প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ বায়ু, জল, মাটি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ঠিকমত সংরক্ষন করা। সুব্যবস্থাপনার দ্বারা বাস্তুতন্ত্রের এই উপাদানগুলোকে রক্ষা করা গেলে শুধু আমরা নয়, বাঁচবে ভাবী প্রজন্মও। (২ধাবা)

৩ থেকে ৫ নম্বর ধারায় বলা হয়, পরিবেশের যে সমস্ত সম্পদ পুনর্নবীকরণযোগ্য তাদের স্বাভাবিক নবীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কথা; যে সব শক্তির নবীকরণ সম্ভব নয়, যেমন- কয়লা, খনিজ তেল, পেট্রোলিয়াম গ্যাস প্রভৃতি, তা যথাযথ ব্যবহারের কথা। পৃথিবীর সব মানুষই যাতে এই সম্পদ দ্বারা উপকৃত হয় সে কথাও বলা হয়।

৬ থেকে ৯ নম্বর ধারায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়, ৭ নম্বর ধারায় সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার কথা উল্লিখিত হয়। ৮ এবং ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়, জীবনের মনোন্নয়নের জন্য আদর্শ পরিবেশ বজায় রাখার কথা। এ কাজে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

দশম নীতিতে, উন্নয়নশীল দেশে অত্যাবশ্যক পণ্যর দাম স্থিতিশীল রাখার গুরুত্বর কথা বলা হয়। তবে সে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে। আর দেশের অর্থনীতির সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সে কথা তো বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিবেশনীতি যেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভবিষ্যৎ বিকাশ প্রক্রিয়াকে বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক দেশকে একযোগে কাজ করার কথা বলা হয়।(১১ ধারা)। ১২ নম্বর ধারায় পরিবেশ রক্ষা এবং উন্নত করার কাজে সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৩ নম্বর ধারায় পরিবেশের উন্নতির জন্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়। ১৪ এবং ১৫ নম্বর নীতিতে এই বক্তব্যকে একটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়, বিকাশের প্রয়োজন ও পরিবেশ রক্ষার উন্নয়নের মধ্যে দ্বন্দ দূর করতে হলে যুক্তিসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই পরিকল্পনা যখন মানুষের বসতি এবং নগরায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তখন তা যেন পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে সে ব্যাপারে নজর রাখার কথা বলা হয়। সব মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সামাজিক, আর্থিক এবং পরিবেশগত সুবিধালাভের কথাও বলা হয়। ১৬ নম্বর নীতিতে সম্পদ অনুযায়ী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। পরের দুটি নীতিতে পরিবেশ সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথাযথ জাতীয় সংস্থাকে দায়িত্ব আরোপ করা, পরিবেশগত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, তা দূরীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করার কথা বলা হয় যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানবতার হিতসাধন করা।

১৯ নম্বর নীতিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি গণমাধ্যমেও পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়। ২০ নম্বর নীতিতে পরিবেশের নানান সমস্যা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণা পরিচালনা করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় উন্নয়নশীল দেশে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করার ওপর। উন্নত দেশগুলি থেকে উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

২১ নম্বর নীতিতে বলা হয়, সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজের নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বসময় কর্তৃত্ব স্থাপনের কথা। অর্থাৎ লক্ষ্য রাখতে হবে যে নিজের দেশের সম্পদ ব্যবহার করতে গিয়ে যেন অন্য দেশের কোন ক্ষতি না হয়। তাও যদি কেউ দূষণের শিকার হয় তবে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়। ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারায় এ ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একসঙ্গে কাজ করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য সার্বভৌমত্ব এবং সব রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। ২৫ নম্বর নীতিতে এরই ব্যাখ্যা করে বলা হয়, রাষ্ট্রগুলো এটা সুনিশ্চিত করবে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সমন্বয়পূর্ণ, কার্যকরী এবং গতিশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা এবং উন্নয়নের চেষ্টা করবে। আর ২৬টি ধারার শেষ নীতিতে বলা হয়, পৃথিবিতে মানবপ্রজাতি ও পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার এবং (ব্যাপক ধ্বংসলীলায় ব্যবহৃত) অন্যান্য অস্ত্র সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

কিন্তু মজা হল, এত কথা বলা হলেও বাস্তবে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো আদৌ মনোযোগী হল না। এই দশকে অবশ্য পরিবশে বিষয়ক একের পর এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন শুরু হল। ঐ বছরই পরিবেশ বিষয়ক কিছু আঞ্চলিক কর্মসূচী নেওয়া হল। পরের বছর (১৯৭৫) লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ প্রজাতির আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ১৯৭৬ সালে একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠিত হল। ১৯৭৯তে রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে বসল মরুভূমির বিস্তার বিষয়ক সম্মেলন। ১৯৮০ সালে পরিবেশ সংরক্ষণের পক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি গৃহীত হল যেমন বাস্তু সংস্থানচক্র রক্ষা, জীববৈচিত্র রক্ষা এবং স্থিতিশীল টেঁকসই উন্নয়নের পথে চলা।

ইতিমধ্যে ৫জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা হিসেবে বেশ কিছু বার্তা ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল একটাই পৃথিবী (১৯৭৪) আর ২০০২ এর বার্তা ছিল 'পৃথিবীকে একটা সুযোগ দাও'। ১৯৭৪ থেকে ২০০২ সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য 'সারণি- ১'।

ধ্বংস ছাড়া উন্নয়নকে নতুন দশকের নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হল ১৯৮০তে। ১৯৮২তে রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে নাইরোবি অধিবেশন বসল যেখানে 'প্রকৃতির জন্য বিশ্ব সনদ' গৃহীত হল। ১৯৭২ থেকে ৮২ এই দশ বছরের বিশ্ব পরিবেশের পর্যালোচনা প্রকাশিত হল ঐ বছরে। ১৯৮৩তে 'দ্য ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামে নতুন এক সংস্থা গঠিত হল। ১৯৮৪তে বের হল 'দ্য রিসোর্সফুল আর্থ ঃ এ রেসপন্স টু গ্লোবাল ২০০০'।

১৯৮৫ সালে ওজন স্তরের ছিদ্র সমস্যা নিয়ে বসল ভিয়েনা সম্মেলন। এই ওজন স্তরের ক্ষতির জন্য দায়ী ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের মত গ্যাস যা বের হয় রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশনার থেকে। বলা বাহুল্য তার ভোগ প্রবণতা উন্নত বিশ্বেই বেশি। অথচ এই সম্মেলনে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ সমান ভাগে ভাগ করার কথা বলা হল।

১৯৮৭ সাল স্মরণীয় 'মন্ট্রিয়ল প্রোটোকল'-এর জন্য। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ওজোন স্তরের হ্রাসের জন্য দায়ী উপাদান ক্লোরোফ্লুরোকার্বন যাতে বাতাসে যেমন খুশি ছাড়া না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই সি. এফ. সি. ব্যবহার বন্ধ করার জন্য উন্নত দেশকে সময় দেওয়া হয় ২০০০ সাল অবধি। আর গরিব দেশগুলোর জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয় ২০১০ পর্যন্ত। যাঁরা 'উন্নত' বিশ্বের মহানুভবতায় মুগ্ধ হচ্ছেন তাঁদের অবগতির জন্য জানানো যাক যে সি. এফ. সি. নির্গত করে এখন রেফ্রিজারেটর বা এয়ার কণ্ডিশনার যা ইতিমধ্যেই তৈরী অবস্থায় মজুত হয়ে পড়ে ছিল তা গরিব দেশগুলোকে বিক্রি করার জন্য ঐ দশ বছর সময়টা সাম্রাজ্যবাদীদের খুবই প্রয়োজন ছিল।[৫]

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা সারা বিশ্বেই ব্যপ্তি লাভ করছিল। ১৯৭২ এর স্টকহোম সম্মেলনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বলেছিলেন ঃ দারিদ্র বড় দূষক। ৭২ এর পর থেকে ভারতে পরিবেশ বিষয়ক একের পর এক আইন তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বন্যপ্রাণকে বাঁচানোর আইন, সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষার আইন ইত্যাদি। এই আইনের কালানুক্রমিক রূপরেখার জন্য দ্রষ্টব্য 'সারণি- ২'। শুধু আইন প্রণেতা বা প্রশাসকেরা নন, বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপেও পরিবেশ রক্ষার প্রয়াস চলেছে। এম. সি. মেহতা পরিবেশের প্রশ্নে যে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন, পরিবেশ বাঁচানোর ক্ষেত্রে আইনি সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তা আজ এক দৃষ্টান্তে পরিনত হয়েছে।[৬] তবে বিচারবিভাগের সব ভূমিকাই যে সদর্থক এমন বলা যায় না। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন-এর কর্মীরা মনে করেন, সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরীর পক্ষে আদালতের রায় সম্পূর্ণ পরিবেশবিরোধী। পরিবেশ বাঁচানোর ক্ষেত্রে ভারতের আদালতের সবচেয়ে বড় অবদান বোধহয় 'গ্রীন বেঞ্চ'-এর প্রতিষ্ঠা। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টগুলোতে বিভিন্ন গ্রীন বেঞ্চ স্থাপিত হয়। ১৯৭৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে কাজ শুরু করে পরিবেশ সংক্রান্ত বেঞ্চ বা 'গ্রীন বেঞ্চ', প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন এর বৈঠক বসে। আইন, শাসন, বিচার - সরকারের এই তিন বিভাগের পরিবেশ রক্ষার প্রয়াসের পাশাপাশি কখনও পরিপূরক, আবার কখনও সমান্তরাল হিসেবে গড়ে উঠেছে ভারতের পরিবেশ আন্দোলন যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিশ্বপ্রেক্ষিতে পরিবেশ বাঁচানোর প্রয়াসও সমানে চলেছে। ১৯৮৮তে অনুষ্ঠিত হয়েছে ওমলো সম্লেলন যার বিষয় ছিল স্থিতিশীল উন্নয়ন। পরের বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'সবুজ সম্মেলন' -এ সাতটি দেশ মিলিত হয়। এরা হল ঃ আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন, জাপান এবং (পশ্চিমে) জার্মানি। ১৯৯০তে জাপানের টোকিওতে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিয়ে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই দশকে বিভিন্ন সম্মেলনে আলোচ্য ছিল গীন হাউস গ্যাস। এই গ্রীন হাউস গ্যাসের জন্য পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ছে। কিন্তু এইসব গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি উৎপাদন করে কারা? অবশ্যই ভোগবাদী উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। অথচ ঐকিক নিয়মে ভাগ করা হল উৎপাদকদের আর সে ভাবেই ক্ষতিপূরণ করার কথা বলা হল। প্রথম বিশ্বের গবেষকরা বললেন, কৃষিপ্রধান দেশ বেশি উৎপাদন করে। অথচ তারা একবারের জন্যও বললেন না যে, যেসব দেশে সূর্যের আলো বেশি পড়ে সে সব দেশে মিথেন উৎপাদন কমে যায়! কাজেই এভাবেই চলছে পরিবেশ রক্ষার নামে, গরীব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে দায়ী করার, উন্নত বিশ্বের রাজনীতি।[৭]

১৯৯২তে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হল 'বসুন্ধরা সম্মেলন'। এতে আবার জোর দেওয়া হল স্থিতিশীল উন্নয়নের ওপর। পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে গৃহীত হল 'এজেন্ডা ২১' বা একুশ দফা কর্মসূচি। বলা হল বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ভূমি সম্পদের সার্থক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কথা। এককথায়, এই 'এজেন্ডা-২১'-এ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। ঐ বছর পরিবেশ বার্তাতেও বলা হল সে কথা ঃ 'যত্ন কর, ভাগ কর।'

মুখে ভাগের কথা বলা হলেও বাস্তবে কিন্তু ভোগের রাজনীতিই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উন্নত বিশ্বের ধনী দেশগুলো পরিবেশকে ভোগ করার ফলে বিনষ্ট হচ্ছিল পৃথিবী আর তার দোষ পড়ছিল গরিব দেশগুলোর ওপর। ১৯৯২ এর ১২ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান অর্থনীতিবিদ লরেন্স সামার্থ তাঁর সহযোগীদের একটা চিঠি লিখেছিলেন।[৮] এই চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল, নোংরা শিল্পকারখানাকে অনগ্রসর দেশগুলোতে স্থানান্তরিত করার কথা। তিনি চমৎকার তিনটি যুক্তি দিয়েছিলেন!

১। শিল্পদূষণে অসুস্থতা বা জীবনহানির জন্য উন্নত দেশে যা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তা উন্নয়নশীল দেশে দিতে হয় না। ফলে, উৎপাদন ব্যয় কম রাখা যায়।

২। আফ্রিকার অনেক দেশেই দূষনের মাত্রা আমেরিকা বা মেক্সিকোর থেকে কম। কাজেই সে সব জায়গায় কারখানা সরিয়ে নিলে তেমন কোনও ক্ষতি হবে না।

৩। স্বচ্ছল হলে তবেই সুখী স্বাস্থ্যসম্মত দূষণমুক্ত পরিবেশের চাহিদা তৈরী হয়। যেখানে জীবন স্বচ্ছল নয় সেখানে আর দূষণ মুক্ত পরিবেশের কী দরকার! অতএব যাবতীয় দূষণকারী শিল্প পাঠাও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

এর দশ বছর পরে ২০০২তে, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হল পরিবেশ বিষয়ক আর এক শীর্ষ বৈঠক। এই বৈঠক অর্থনৈতিক বিকাশ ও ন্যায়বিচার, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং সামাজিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হল। কিন্তু এই সম্মেলনে এলেন না পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি সম্পদের উপভোক্তা ও দূষণ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। এই সম্মেলনের সময় বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনেতারা এবং বৈঠকের বাইরে বিক্ষোভকারীরা অভিযোগের তীর ছুঁড়লেন উন্নত দেশগুলোর দিকে। তাঁরা পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী শক্তির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। ২০০২-এর এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয় যে পরিবেশ রক্ষার রাজনীতি নিয়ে উন্নতশীল দেশের মানুষ আদৌ অসচেতন নন।[৯]

১৯৬২ থেকে ২০০২ এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে পরিবেশ রক্ষার প্রয়াসের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার ঐতিহাসিক পরিক্রমা সম্পাদিত হল তা আসলে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য মানুষের সচেতনতা বিকাশেরই ইতিবৃত্ত। ৬২তে র‍্যাচেল কারসন যে চেতনার চারাটি রোপন করেছিলেন তা আজও পল্লবিত হয়েছে। একদিকে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ রক্ষার প্রয়াস চলছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বাঁচার 'অধিকার বুঝে নেবার প্রখর দাবিতে' আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। এই দুই ধারাই বহমান। সাধারণ মানুষ পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে সব সময় নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় নেই। বরং যে পুঁজিবাদী শক্তি বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রক, সেই পরিবেশ ধ্বংসকারী শক্তি, সাধারণ মানুষের চাপে সীমাবদ্ধ স্তরে হলেও সামিল হচ্ছে পরিবেশ রক্ষার কাজে। পরিবেশ রক্ষার প্রয়াস যত বৃদ্ধি পাবে তত সুরক্ষিত হবে এই পৃথিবী, এই 'ভূবন গাঁ'-এর মানুষজন। ২০০২তে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত পরিবেশ বার্তাতেও ধ্বনিত হয়েছে সে কথা ঃ 'পৃথিবীকে একটা সুযোগ দাও'।[১০]

সারণি-১

রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত পরিবেশ বার্তার সম্পূর্ণ তালিকা

সাল	বার্তা
১৯৭৪	একটাই পৃথিবী
১৯৭৫	মানব বসতি
১৯৭৬	জল ঃ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ

১৯৭৭	ওজোন স্তর - পরিবেশগত ভাবনা, ভূমিক্ষয়
১৯৭৮	ধ্বংস বিনা উন্নয়ন
১৯৭৯	আমাদের শিশুদের একমাত্র ভবিষ্যৎ - ধ্বংস বিনা উন্নয়ন
১৯৮০	নতুন দশকে নতুন চ্যালেঞ্জ ঃ ধ্বংস বিনা উন্নয়ন
১৯৮১	ভূগর্ভস্থ জল, মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে বিষাক্ত রাসায়নিক
১৯৮২	স্টকহোমের দশ বছর পর (পরিবেশ ভাবনার পূনর্নবীকরণ)
১৯৮৩	ক্ষতিকারক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অ্যাসিড বৃষ্টি এবং শক্তি
১৯৮৪	মরুভূমিকরণ (-এর আশঙ্কা)
১৯৮৫	যুব সম্প্রদায় এবং পরিবেশ
১৯৮৬	শক্তির জন্য একটি গাছ
১৯৮৭	পরিবেশ এবং আশ্রয় ঃ ছাদের থেকে বেশি
১৯৮৮	যখন মানুষ পরিবেশকে প্রথমে রাখে, তখনই উন্নয়ন চলে
১৯৮৯	গ্লোবাল ওয়ার্মিং
১৯৯০	শিশু এবং পরিবেশ
১৯৯১	জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা
১৯৯২	একটাই পৃথিবী - ভাগ কর, যত্ন কর
১৯৯৩	দারিদ্র এবং পরিবেশ - ক্ষতিকর চক্র ভাঙার জন্য
১৯৯৪	একটি পৃথিবী, একটি পরিবার
১৯৯৫	আমরা বিশ্ব পরিবেশের জন্য ঐক্যবদ্ধ
১৯৯৬	আমাদের পৃথিবী, আমাদের বাসস্থান, আমাদের ঘর
১৯৯৭	পৃথিবীতে জীবনের জন্য
১৯৯৮	পৃথিবীতে জীবনের জন্য - রক্ষা করুন সমুদ্র
১৯৯৯	আমাদের পৃথিবী - আমাদের ভবিষ্যৎ - একে বাঁচান
২০০০	পরিবেশ সহস্রাব্দ - সময় এসেছে কাজের
২০০১	জোড়ো বিশ্বময় জীবনের জাল
২০০২	পৃথিবীকে একটা সুযোগ দাও

এই সারণিতে উল্লিখিত বার্তাগুলোর আক্ষরিক এবং ভাবগত বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখককৃত।

সারণি-২

ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ (১৯৬২-১৯৯৮)

সাল	আইন, নিয়ম ইত্যাদি
১৯৭২	বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন
১৯৭৪	জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন
১৯৭৭	জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন) উপকার আইন
১৯৮০	বনভূমি রক্ষা আইন
১৯৮১	বায়ু (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন
১৯৮৬	বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন সংশোধনী
১৯৮৬	পরিবেশ রক্ষা আইন
১৯৮৮	বনভূমি রক্ষা আইন সংশোধনী
১৯৮৯	বিপজ্জনক রাসায়নিক উৎপাদন, মজুত এবং আমদানি সংক্রান্ত নিয়মাবলী
১৯৮৯	বিপজ্জনক বর্জ (ব্যবস্থাপন ও পরিচালন) নিয়মাবলী
১৯৮৯	বিপজ্জনক আনুবিক্ষণিক প্রাণী/জীব-প্রযুক্তিজাত প্রাণী অথবা কোষ ইত্যাদির উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি, রপ্তানি ও মজুত সংক্রান্ত নিয়মাবলী
১৯৯১	লোকদায় বীমা আইন
১৯৯১	বন্যপ্রাণ রক্ষা আইন ১৯৭২ - সংশোধনী
১৯৯১	উপকূলবর্তী অঞ্চল সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তি
১৯৯৩	পশ্চিমবঙ্গ মৎসচাষ (সংশোধনী) আইন
১৯৯৩	পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
১৯৯৪	পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত (সংশোধনী) প্রজ্ঞাপন
১৯৯৪	উপকূলবর্তী অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তি (সংশোধনী)
১৯৯৫	জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবুনাল আইন
১৯৯৬	রাসায়নিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আপৎকালীন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী
১৯৯৬	বিপজ্জনক বর্জ্য এবং রাসায়নিক সংক্রান্ত নিয়মাবলী (সংশোধনী)

১৯৯৭ পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন বিবরণী সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (দ্বিতীয় সংশোধনী)

১৯৯৮ জৈবনিক এবং চিকিৎসাঘটিত বর্জ্য (ব্যবস্থাপন এবং পরিচালন) নিয়মাবলী

তথ্যসূত্র ঃ এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্টস, রুলস অ্যান্ড নোটিফিকেশন, পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৯৯

সূত্র-নির্দেশ

১। র‍্যাচেল কারসন, *সাইলেন্ট স্প্রিং,* পেঙ্গুইন, ১৯৬২।

২। সবুজ মুখোপাধ্যায়, প্রকৃতি কন্যা র‍্যাচেল কারসন ও তাঁর 'সাইলেন্ট স্প্রিং' এক মৌন বসন্তের ইতিকথা, *শারদীয় কালান্তর,* ১৪০৮, পৃ.পৃ. ১৩৪ - ১৩৬।

৩। এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

নিরঞ্জন হালদারের প্রবন্ধ, 'পরিবেশ আন্দোলন', শিবনারায়ণ রায় (সম্পাদিত), *'জিজ্ঞাসা'* পত্রিকা, ১৭বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ - চৈত্র ১৪০৩, পৃ.পৃ. ৫১৬ - ৫২২।

৪। ইউ. এন. রিপোর্ট অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট, স্টকহোম, ১৫-১৬ জুন, ১৯৭২। নিউ ইয়র্ক ঃ ইউ. এন, ১৯৭৩।

বাংলায় ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

তারকমোহন দাস, স্টকহোম বিশ্বপরিবেশ সম্মেলন— একটি পর্যালোচনা , কলকাতা, ২০০১।

৫। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, 'আমাদের বিশ্ব, আমাদের পরিবেশ' *কালান্তর,* ৩ জুন ২০০২, পৃ.৩।

৬। এম. সি. মেহতা গঙ্গানদীকে বাঁচানোর জন্য জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন, কালক্রমে তা থেকে গৃহীত হয়েছিল ভারত সরকারের 'গঙ্গা অ্যাকশন প্লান' প্রকল্প।

৭। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশ রাখার রাজনীতি ঃ ইতিহাস কী বলে?', হোসেনুর রহমান (সম্পাদিত), *নবীনপত্র,* বর্ষ -২, সংখ্যা-৩, নভেম্বর ২০০৩ - জানুয়ারী ২০০৪, পৃ.পৃ. - ৩৮-৪১।

৮। লরেন্স সামার্থের চিঠি, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯২, *'দ্য ইকনমিস্ট',* লণ্ডন, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ বঙ্গানুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ আশিস দাশ, 'পৃথিবী হোক আমাদের সবুজ নিশ্চিন্ত আশ্রয়' (আমন্ত্রিত সম্পাদকীয়), আশিস দাশ (সম্পাদিত), *বিজ্ঞান মেলা,* জুন ১৯৯৬, পৃ.পৃ. ১-৫।

৯। রাহুল রায়, 'জোহানেসবার্গ সম্মেলন ঃ নতুন আলোকে', গৌরীশঙ্কর সরকার (সম্পাদিত) , ঐক্য, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, অক্টোবর ২০০২, পৃ.পৃ. ৪৭-৪৯।

১০। বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পবন্ধ 'পরিবেশ বার্তা- কেউ কথা রাখেনি', সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় .(সম্পাদিত), ধূসর বসুধা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.পৃ. ২০-২২।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কথা সাহিত্যে নদীচেতনা

মালঞ্চ লাহিড়ী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে যুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধের বিভীষিকা দেশ থেকে মুছে যায়নি এবং পৃথিবিতে শান্তিও আসেনি। দেশের ভিতরে ও বাইরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও নানা পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সারা দেশ জুড়ে এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। প্রাক্ স্বাধীনতাকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, মন্বন্তর, স্বদেশীআন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য নানা বিক্ষোভ আলোড়ন সারা বঙ্গদেশ জুড়ে এক চরম নৈরাশ্য ও হতাশার সঞ্চার করে ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশব্যাপী এই চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও হতাশার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক জীবনও এর ফলে বিপন্ন হয়েছিল, সে কারণে সাহিত্যজগতেও এর ফলশ্রুতি লক্ষিত হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক নিবিড় আত্মিক যোগ বিদ্যমান। নদীমাতৃক বাংলার মানবজীবন ধারার সঙ্গে নদীর প্রবহমান স্রোতধারার যোগীটিও অবিচ্ছিন্ন, নদীর সঙ্গে মানজীবনের ঐকান্তিক সম্পর্কটি নানা ভাবে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিতেও এর অজস্র উল্লেখ আমরা পাই। বহমান নদীর স্রোতধারার সঙ্গে মানবজীবন ধারার অন্তঃসলিলার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যে অসংখ্য ছোটগল্প ও উপন্যাস গড়ে উঠেছে। নদী হয়ে উঠেছে কখনো মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতির পালনী শক্তি, স্নেহময়ী শক্তি আবার কখনোবা বিপর্যয়কারী প্লাবনী শক্তি। আঞ্চলিক নিসর্গের সঙ্গে কখনো ভয়াল, কখনো মধুর বর্ণাময় প্রতিচ্ছবিরূপে নদীর বহুমাত্রিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নদীঅশ্রিত কথাসাহিত্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালপ্রবাহে রচিত অজস্র রচনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপন্যাসকে অবলম্বন করে দেখানোর চেষ্টা করেছি দেশের তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্য দিয়েও ফুটে উঠেছে হতাশা, নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের ছবি। নদীর অবক্ষয়ী রূপটি বর্নময়ভাবে কথাসাহিত্যে যে শিল্পসম্মত রূপ গ্রহণ করেছে স্বল্পপরিসরে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দশকে রচিত পাঁচটি উপন্যাসকে। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'মহানন্দা'(১৯৪৬), অদ্বৈতমল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ রচিত 'চরকাশেম' (১৯৫৯), শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' (১৯৬৫), এবং দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮)।

মহানন্দা ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'মহানন্দা' উপন্যাসটি একটি কালজয়ী সৃষ্টি। এ উপন্যাসের কাহিনী ধারায় বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে নদীর বৈপরীত্যময় প্রানবাণ ও অবক্ষয়ী রূপকে লেখক উপজীব্য করে তুলেছেন।

কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপটি এরকম — গ্রামের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব যতীশ ঘোষের একমাত্র পুত্র নীতিশ সতেরোবধূর মল্লিকাকে রেখে স্বদেশী হত্যার মামলায় বারো বছরের জন্য জেলে গেল। দীর্ঘদিন পরে জেল থেকে ফিরে সে দেখল স্ত্রী মল্লিকা ঈশ্বর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। শুধু তাই নয় স্বামী ফিরে এলেও সে শ্বশুরের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একদিন পিতার সঙ্গে নিজ স্ত্রী মল্লিকাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে মর্মাহত যতীশ গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় আসে এবং আবার আন্দোলনে মেতে ওঠে। ইতিমধ্যে খবর আসে মল্লিকা হাসপাতালে একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা গেছে। স্বদেশী আন্দোলন সূত্রে যে মেয়েটির সঙ্গে যতীশের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল সে তার সন্তানের দায়িত্ব নিল।

লেখক এখানে মহানন্দা নদীকে পরিবেশগত বা পটভূমিগত ভাবে দেখিয়েছেন। লেখক কাহিনীর শুরুতে মহানন্দা নদীর বাধাহীন উদ্দাম জলধারার গতিরোধ করে রেলব্রীজ গড়ার প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে — "মহানন্দা নদীতে অজগর সাপের দু দুটো ফাঁসের মতো দুটো রেল কোম্পানীর ব্রীজ পরেছে। খেদায় আটকে পড়ে বুনো হাতি পোষ মানে. তেমন করে হার মেনেছে"।[১] এ যেন প্রাক্ স্বাধীনতা কাল পর্বে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির শোষণে ভারতবাসীদের নিপীড়িত হবার চিত্রই ব্যাঞ্জিত। লেখক আরও বলেছেন — "মরে যাচ্ছে মহানন্দা, শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন, উত্তর বাংলার শ্যামল মাটির শ্রেষ্ঠ প্রাণ প্রবাহিনীর সর্বাঙ্গে নেমেছে অপঘাতের ছায়া — মরুনদী মহানন্দার দিকে তাকালে কষ্ট হয়।" ...."আজ নদী মরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে মরে যাচ্ছে সমস্ত।"[২]

কিন্তু এই মহানন্দাই একদিন পূর্ণতার প্রতিরূপ ছিল— "ঢল আসছে বর্ষার, নীল জলে নামে ঘোলা জলের বান, জেগে ওঠে ভৈরব গর্জন।"[৩] 'মহানন্দা' মানব সভ্যতার ইতিহাসে নীরব সাক্ষী — বাঁধের কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে মরছে — মহানন্দা মুক্ত

প্রাণের প্রতীক। লেখক বলেছেন — "মাথা ঠুকে নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলেছে — বছরের পর বছর সে লিখে চলেছে অবক্ষয়ের ইতিহাস।"[৪] ইতিহাসের সঙ্গে বিবর্তিত হচ্ছে সেই সব মানুষের জীবন মহানন্দাকে কেন্দ্র করে যারা ঘর বেঁধে ভালবেসেছিল — শ্মশানের পথে আজ তারা সহযাত্রী, মহানন্দা মরে যাচ্ছে — মরে যাচ্ছে গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি আত্মহত্যা আর অবক্ষয়।"[৫]

মহানন্দা এখানে ঐতিহ্যের স্মারক ও চলমান জীবনধর্মের প্রতিরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের করাল স্পর্শে নদীর অবক্ষয়ী রূপ ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়কে লেখক আমাদের কাছে উপজীব্য করে তুলেছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম'ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মন

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অদ্বৈতমল্লবর্মন কুমিল্লা জেলার (অধুনা পূর্ববঙ্গে) একটি অনামী নদী তিতাসকে কেন্দ্র করে তার তীরে বসবাসকারী মালো বা ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের কাহিনী এখানে উপজীব্য করে তুলেছেন। নদীর জোয়ার ভাঁটা খেলার সঙ্গে যে মানুষের জীবনের উত্থান পতন নির্ভর করে তা দেখানো হয়েছে।ধীবর সম্প্রদায়ের আশা - অকাঙ্খা সুখদুঃখের সঙ্গে নদীর তীরবর্তী মানুষের লৌকিক জীবনচর্যা ও সংস্কৃতিকে লেখক তুলে ধরেছেন।

তিতাসের পূর্নতা দিয়ে কাহিনীর শুরু, তিতাসের শূন্যতা দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। ব্যক্তিজীবন নয় গোষ্ঠী জীবনই এতে মুখ্য। নদীর উপরেই গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর করছে, নদী ধীবর ও কৃষকদের অন্নদায়িনী ও জীবিকার মাধ্যম। গোষ্ঠীজীবনের সূত্রে নদীকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় চেতনা, পূজা - পার্বন - সংস্কার, আচার আচরণেরও প্রকাশও ঘটেছে এ রচনায়।

লেখক মানবজীবন ইতিহাসের চিরন্তন সত্য এখানে তুলে ধরেছেন। নদী স্রোতধারায় উত্থানপতনের সঙ্গে মানবজীবনের সুখদুঃখ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মহাকালের ধারায় একদিন সবকিছুর বিনাশ হবে কিন্তু নদী প্রবাহের মতো প্রাণের প্রবাহ বা গতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না লেখক বলেছেন — "নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে - কালের বহার শেষ নাই, নদীর বহারও শেষ নাই। কতকাল ধরিয়া কাল নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়াছে, তিতাসও কতকাল ধরিয়া চলিয়াছে, কত অশ্রু আসিয়া তাহার জলের স্রোতে মিশিয়াছে।'[৬]

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক কাহিনীর অনুষঙ্গে লোকজীবন বা পরিবেশের উপর নদীর প্রবাহকে নানা ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন নৌকাকে বিবিধ উপকরণে সজ্জিত করে 'চৌয়ারি ভাসান অনুষ্ঠান', 'নৌকা বাইচ' নৌকার জাল টানার গান, নৌ-যাত্রার উপলক্ষ্যে লোকাচার, নদীকে কেন্দ্র করে গান, ধাঁধা, প্রবচন, লোকবিশ্বাস, সংস্কার,

স্বপ্নবিশ্বাস, তিতাসকে কেন্দ্র করে নানা রকম 'মিথ' (MYTH) এর ব্যবহার যেমন নদীকে মায়াবী, ডাকিনী, রাক্ষসী বলে ভাবা হচ্ছে প্রভৃতি।

কাহিনীতে এক জায়গায় দেখি স্বপ্নবিশ্বাসের কথা — নদীর অবক্ষয়ীরূপ ফুটে উঠেছে। মালো পাড়ার রাধাচরণ মালো স্বপ্ন দেখেছে — "তিতাস শুকাইয়া গিয়াছে। এই স্বপ্ন কি মিছা হইতে পারে। দেখলাম, যে গাঙ্গে বিশহতি বাঁশ ডুবাইয়া তলা ছোঁয়া যায় না সেই গাঙ্গের মাঝখান দিয়া ছোট একটা মানুষ হাইট্যা চলছে, শুকনা, ঠনঠন করছে, বুকটা ছাৎ কইর‍্যা উঠল। গ্রামের লোক কেউ বিশ্বাস করল, কেউ ভাবল দুঃস্বপ্ন।"[৭]

কাহিনীর সূচনায় লেখক তিতাসের তেরো মাইল দূরে অবস্থিত বিজয় নদীর তুলনা করে লিখেছিলেন তিতাস যদি কোন দিন ওরকম শুকিয়ে যায় তাহলে কি হবে? কাহিনীর অন্তিমে আমরা দেখতে পাই যে সত্যিই তিতাস নদী শুকিয়ে গেছে, মালোপরিবার অভুক্ত অবস্থায় কেউ কেউ গ্রাম ছেড়েছে, কেউ বা মারা গেছে। শুন্যতা ও রিক্ততার রূপ নিয়ে তিতাস আজ শুধু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। লেখক এখানেও সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপের অনুসঙ্গে নদীর শুকিয়ে যাওয়া রূপটিকে একাত্ম করে তুলে কাহিনীকে একটি ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছেন এবং তা উপন্যাসটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

চরকাশেম ঃ অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ

বাংলা কথা সাহিত্য নদী আশ্রিত উপন্যাসগুলির মধ্যে বিখ্যাক ঔপন্যাসিক অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ রচিত 'চর কাশেম' উপন্যাসটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নদীর পলিতে গড়ে ওঠা চরকাশেম ও তাতে বসবাসকারী মানুষের জীবন সহ গ্রামের কাহিনী এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

পূর্ববঙ্গে পদ্মা ও মেঘনার নদী তীরে এই চরকাশেম গড়ে উঠেছে। লেখক এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন। "পদ্মা ও মেঘনা যেন দুটি বোন। দেখা হয়ে গেছে এই মন্থর যৌবনে। কত ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস দুজনার বুকে। কত আনন্দ ও বিষাদের স্মৃতিকথা বলবে, কেন জানি বলতে পারছে না, শুধু অন্তঃসলিলা কথার কাকলি গুমরে গুমরে মরছে বুকের পাঁজরে। ....এ পাড় যখন ভাঙ্গে ওপার তখন ভরে, এই তো নিয়ম ....একটু দূরে পদ্মার ঘোলাজল ও মেঘনার কালোজল আর অলাদা করা যায় না।"[৮]

উপন্যাসে নদীর ভয়ঙ্করী রূপের ছবিটিও রূপকাশ্রিত — "দেখতে দেখতে নদী আরও ভয়াল হয়ে ওঠে.............নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে চাইলে বুক শুকিয়ে যায়। চর পরিচিতার এক প্রলয়ঙ্করী মূর্তি — স্নেহ নেই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষুধা, লাবন্য নেই, কেবলই উলঙ্গ নৃশংসতা, বর্বরতা। ক্ষুধার্ত নাগিনী গিলে খাচ্ছে সব।"[৯]

পদ্মানদীর এই রূপকল্পের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের ছবিটিই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত।

চরকাশেমের বুকে নেমে আসে প্লাবন। "নদীর বুকে তারপর মেঘ আসে কালো হয়ে .... ধেয়ে চলে চরকাশেমের নদী .... নদীর বুকে ওঠে বেসামাল মাথাভাঙ্গা ঢেউ। যেন পাগলা হাতী মেতেছে জলের বুকে, একটার গায়ে আছড়ে পড়ে আরেকটা। ভেঙে চুরমার ও একাকার করে দেয় চারিদিক,"[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ছন্নছাড়া বিশৃঙ্খল অবস্থার যেন এটী প্রতীকচিত্র। কাহিনীর শেষেও আমরা দেখতে পাই চরকাশেমের লোকেরা দুর্ভিক্ষ, অনটন ও জিনিসের দাম বৃদ্ধির কারণে চড় ছেড়ে পালাচ্ছে, জীবনের প্রতিকূলতার সঙ্গে তারা আপ্রান লড়াই করছে। এ যেন যুদ্ধ পরবর্তী কাল পর্বে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কিন্তু লেখক কাহিনীটি হতাশা বা নৈরাশ্য বোধের মধ্যে পরিসমাপ্ত করেননি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার সংগ্রামে মানুষ একদিন জয়ী হবেই — লেখকের এই আস্তিক্যবোধ ও আশাবাদই কাহিনীর অন্তিমে ধ্বনিত হয়েছে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়

প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় রচিত এটি একটি ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন —"এটি Fictionised History নয়। Historical Fiction." এর কাহিনী, চরিত্র ও প্রেক্ষাপট ঐতিহসিক হলেও কাহিনীটি লেখকের মৌলিক সৃষ্টি।

কাহিনীর শুরুতে লেখক তুঙ্গভদ্রা নদীর ভৌগোলিক বর্ণনা ও এই নদীকে কেন্দ্র করে যে সকল সংস্কার মানুষের মনে গড়ে উঠেছে তাকে চিত্রায়িত করেছেন —

দক্ষিন ভারতে একটি বাক্য প্রচলিত আছে গঙ্গার জলে স্নান, তুঙ্গার জল পান অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান করিলে যে-পূণ্য হয়, তুঙ্গার জলপান করিলেও সেই পুণ্য, তুঙ্গার জল পীযুষ তুল্য, মৃত সঞ্জীবন।"[১১]

'তুঙ্গভদ্রা' নদীকে কেন্দ্র করে লেখক তাঁর ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্য ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছেন।

"..............তুঙ্গভদ্রার জীবনে স্মরণীয় কিছু ঘটে নাই। তাহার তীরে তীর্থ, সিদ্ধাশ্রম মঠ মন্দির রচিত হয় নাই। একবার মাত্র দুইশত বৎসরের জন্য তুঙ্গভদ্রার সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছিল। তাহার দক্ষিণ তীরে বিরূপাক্ষের পাসান মূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গনগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। নগরের নাম বিজয়নগর। কালক্রমের এই বিজয়নগর সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, মাত্র ছয় শতাব্দীর কথা

..............কিন্তু বিজয়নগরের গৌরবময় স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতটে বিজয়নগরের বহুবিস্মৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে কি বিচিত্র ঐতিহ্য সমাহিত আছে তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল, কেবল তুঙ্গভদ্রা ভোলে নাই।''[১২]

লেখকের আরো মনে হয়েছে যে তুঙ্গভদ্রা আজ হৃতগৌরব হলেও সে তার অতীতের সৌভাগ্যময় দিনের গল্প বলছে বোন কৃষ্ণানদীর কাছে। —

''তুঙ্গভদ্রার এই উর্মিময় ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু সকল ইতিহাসের পিছনে স্মৃতিকথা লুকাইয়া থাকে। যেখানে স্মৃতি নাই, সেখানে ইতিহাস নাই। আমরা আজ তুঙ্গ ভদ্রার স্মৃতিপ্রবাহ হইতে একগন্ডুষ জল তুলিয়া লইয়া পান করিব।''[১৩]

তাই এই সময় কালে রচিত এ উপন্যাসে তুঙ্গভদ্রা এখানে ইতিহাসের গতিপ্রবাহের নীরব সাক্ষী।

সমগ্র উপন্যাসটিতে নদী তাই এর প্রবহমান পটভূমি, পরিবেশ, ইতিহাস চেতনা, কালচেতনা ও ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখক যেন আমাদের অতীতের সৌন্দর্য ময় জগৎ-কে একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে তিনি যেন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিময় অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।

তিস্তা পারের বৃত্তান্ত ঃ দেবেশ রায়

এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে তিস্তা নদীতে বাঁধ দেওয়ার প্রকল্প ও তার তীরবর্তী মানুষদের দৈনন্দিন জীবিকা ও জীবনধারণের বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ ৮৩৯ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে তিস্তানদী তীরবর্তী হাট, গ্রাম ও সেখানকার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাহিনীর শুরুতে একটি মানচিত্র যুক্ত করে তিস্তানদীর গতিপথ ও তার তীরবর্তী অঞ্চল-গুলির সীমা নির্দেশ করেছেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লেখক নদীতীরবর্তী জল্পেশ, ক্রান্তি হাট, চ্যাংমারি হাট, আপলচাঁদ ফরেস্ট, গাজোলডোবা প্রভৃতি আঞ্চলিক, ভৌগোলিক পরিবেশ ও স্থানগত তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন। তিস্তার দুপ্যারে গরে ওঠা জনসভ্যতা ও তাদের দিনলিপিকে লেখক উপজীব্য করে তুলেছেন। সেইসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকেও রূপায়িত করেছেন। যেমন উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি, সেখানকার রাজবংশী উপজাতিদের বিক্ষোভ, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প নিয়ে আন্দোলন, বিরোধিতা, মিটিং, মিছিল এতে স্থান পেয়েছে।

তিস্তা নদী এ উপন্যাসে বিশাল ভূখন্ডের তথা ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। তিস্তাকে কেন্দ্র করেই সেখানকার লৌকিক জনজীবন ও পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের সূচনায়

তিস্তা নদীর উপর বাঁধের যে পরিকল্পনার কথা ছিল কাহিনীর শেষে তিস্তা ব্যারেজ তৈরী হওয়ার সাথে এই বৃত্তান্তের সমাপ্তি হয়েছে। লিখক তিস্তা নদীর অনুষঙ্গে এই সত্যকে তুলে ধরেছেন যে কালের প্রবাহমানতার ধারা কখনো থেমে থাকেনা। অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে আগামী অনির্দেশ্য কালের দিকে ছুঠে চলে এই মহাকাল — তিস্তা যার প্রতীক। একই সাথে লেখক নদীর গতি রোধ করে সভ্যতার অগ্রগতির ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারেননি। তিস্তা নদীকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে দেওয়ার বিরুদ্ধে জন সাধারণ রুখে দাঁড়িয়েছে - তারা স্লোগান দিচ্ছে - " তিস্তা বুড়ি আমাদের দেবতা হন। সেই তিস্তা বুড়িকে বান্ধা আমরা সহ্য করিব না"।[১৪] এর মধ্য দিয়ে লৌকিক সংস্কার ভাবনাটি যেমন রূপায়িত, সেই সঙ্গে সভ্যতার ক্রমঅগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতিকে শাসন করে বিজ্ঞানের অগ্রসরমানতার প্রতিও লেখক যেন ইযৎ কটাক্ষ করেছেন। এগিয়ে চলে পৃথিবী, প্রকৃতির তথা নদীর প্রবাহমানতার স্রোত হচ্ছে ব্যাহত।

উপরের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালপ্রবাহে সৃজনশীল সাহিত্যে প্রকৃতির যে অবক্ষয়ী নদীরূপ প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে স্বল্প পরিসরে তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একদিন দূরীভূত হবে, ভারতবর্ষের স্বাধীন মাটিতে মানুষ আবার প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবে, প্রকৃতি আবার শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে, নদী পূর্ণতায় ভরে উঠবে কানায় কানায়, এই স্বপ্ন সাহিত্যিকেরাও দেখছেন। তাই নৈরাশ্য বা হতাশাই শেষ কথা নয় - আস্তিক্য বোধই হোক মানব সভ্যতার অজেয় মন্ত্র।

সূত্র-নির্দেশ

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহানন্দা, ১৯৪৬, পৃ. ১।
২। তদৈব, পৃ. ৩।
৩। ঐ পৃ. ৩।
৪। ঐ পৃ. ৫।
৫। ঐ পৃ. ৭।
৬। অদ্বৈত মল্ল বর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম, ১৯৫৬, পৃ. ১।
৭। তদৈব, পৃ. ৩২৯।
৮। অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, চরকাশেম, ১৯৫৯, পৃ. ৩।
৯। তদৈব, পৃ. ২।
১০। তদৈব, পৃ. ১২৬।
১১। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, তুঙ্গভদ্রার তীরে, ১৯৬৫, পৃ. ১।
১২। তদৈব, পৃ. ১-২।
১৩। তদৈব, পৃ. ১২৯।
১৪। দেবেশ রায়, তিস্তা পারের বৃত্তান্ত, ১৯৮৮, পৃ. ৭২৯।

পরিবেশ আন্দোলনে বাংলার নারী

সোমা বসু

আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তা - চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জীবনের সবক্ষেত্রেই নারী - পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। নারী আন্দোলনের পিছনে রয়েছে নারী সমস্যা যার শিকড় রয়েছে সমাজের গভীরে। পুরুষ প্রধান এই সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরনই যাবতীয় নারী নিগ্রহের মূলে।

বর্তমানে আর্থসামাজিক অবস্থা কিছুটা বদলালেও, সমাজে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। সংসারে সমাজে - উভয়মুখি সমস্যা ও শোষণের শিকার আজকের মেয়রা। বেড়েছে অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণের-মাত্রাও। ফলে, নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।

সামগ্রিক এই নারী আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে পরিবেশ আন্দোলন যেটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজে নারীর বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পরিবেশ সমস্যাও যাকে ঘিরেই আন্দোলন। পরিবেশ আন্দোলন সামগ্রিকভাবে সমাজেরই বিভিন্ন সমস্যা থেকে উদ্ভুত এবং নারীদেরও পরিবেশ সম্বন্ধে পৃথক ভাবনা ও আন্দোলনে অংশ নেওয়ার নজির রয়েছে।[১]

পরিবেশ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার শুরুতে পরিবেশ আন্দোলন কী এবং কেন — তা বলা দরকার।

পরিবেশ হল আমাদের চারপাশের যা কিছু, অর্থাৎ তা জড় পদার্থই হোক বা জৈব পদার্থই। 'পরিবেশ' বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী, অনুজীব অর্থাৎ সমগ্র জীবজগত এবং আলো, উষ্ণতা, জল, বাতাস ও মাটির মিলিত সক্রিয় অবস্থানকে বোঝায়। অন্যদিকে 'আন্দোলন'-এর আভিধানিক অর্থ 'কোন লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য গোলমাল ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা।'[২] পরিবেশ আন্দোলনে সঠিক অর্থেই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য পরিবেশমুখী মানসিকতা বিকাশের বা মেজাজ গঠনের চেষ্টা এবং প্রকৃতি - পরিবেশকে ধ্বংস না করে বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে জনকল্যানের, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা।

পরিবেশ আন্দোলনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। পরিবেশের অবক্ষয়জনিত সমস্যার শিকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে ধনী দরিদ্র কেউই রেহাই পাবে না। ভুপালের গ্যাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল ধনী-দরিদ্র সবাই। ফলে, পরিবেশ আন্দোলনের এক সর্বজনীন রূপ আছে, অ-সম ভোগবাদী জীবনযাত্রা পরিহার ও পরিবেশ দূষণকারক বন্ধ বা পরিত্যাগ করার দাবি থাকে নানাপ্রকার স্পষ্ট কর্মসূচী, যেমন- বনসৃজন, জৈবসার ব্যবহার, জৈববৈচিত্র সংরক্ষণ, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদির মধ্যে। মানুষের জীবিকা যেহেতু পরিবেশর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাই, পরিবেশ সংরক্ষণকারী আন্দোলনকেই 'পরিবেশ আন্দোলন' বলা চলে।

পরিবেশ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর উপর জীবন একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে। এই চিত্রই সম্পূর্ণ বদলে যায় শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। যখন স্থায়ী কৃষি জীবনে অভ্যস্ত মানুষ পরিবেশ ধ্বংস শুরু করে ব্যাপক ভাবে। অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত করতে কল-কারখানা গড়ে ওঠার সময় থেকেই এই ধ্বংস আরো ব্যাপক চেহারা নেয়। পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যে বাড়তে থাকে জনসংখ্যা। সাম্রাজ্যবাদের লেলিহান লোভের আগুন সারা পৃথিবীর প্রকৃতি-পরিবেশকে তছনছ করতে থাকে। উন্নতমানের জীবনযাত্রার জন্য যোগান দিতে হয় নানান ধরনের ভোগ্যপন্য। ফলে, পৃথিবীর সবুজ চুরি: হারিয়ে যাচ্ছে অরণ্য।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি ভারতবর্ষ তথা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভয়ানক।

ভারতের জনসংখ্যা একশ কোটি ছাড়িয়েছে অনেকদিন। প্রতিদিন ভারতে ৭২০০০ শিশু জন্মগ্রহন করে - যা পৃথিবীর যেকোন দেশের থেকে বেশি।

তথ্যগুলো ২০০০-এর 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট' অনুযায়ী। বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বেড়েছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই জীবিকা নির্বাহর স্বাস্থ, পরিষেবার সমস্যা। পরিবেশেরই অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে। মাটি, জল, বন ও বন্যপ্রাণী - সবই নষ্ট হতে যাচ্ছে। ফলে, নষ্ট হয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরিস্থিতি এখন বিপর্যস্ত হয়ে ভেঙে পড়ার মুখে।

পরিবেশের এই অবক্ষয়, দূষণ আজ জনসাধারণের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন ও নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিচ্ছে। কাজেই সমস্যা থেকেই জন্ম নিচ্ছে আন্দোলনের, -পরিবেশ আন্দোলন। এই পরিবেশ আন্দোলনেরও মূলে রয়েছেন এক আমেরিকান মহিলা। রাচেল কারসন। তাঁর বই "সাইলেন্ট স্প্রীং" (১৯৬২)এ দেখান কিভাবে কীটনাশক আমাদের প্রকৃতি - পরিবেশের বিশাল ক্ষতি করছে। শুরু হয় দুনিয়া জুড়ে

কীটনাশকের বিরুদ্ধে জেহাদ। আমাদের দেশেও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মহিলারাই প্রথম আন্দোলন শুরু করেন।

আমাদের রাজ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়েরা অনেক সময়ই যে চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন, তা রীতিমত চমকপ্রদ। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় শরৎকামিনী সেনচৌধুরানীর বন, বন্যপ্রানী ও পরিবেশ সংরক্ষণে অসীম আগ্রহ ও ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর জমিদারিতে কতকগুলো নিয়ম চালু করেন। যেমন - শীতের সময় নদীর চরের হাঁস মারা বন্ধ, বছরের কয়েকটি দিন ছাড়া বন্যজন্তু মারা বন্ধ, বনের যেসব পশু-পাখি লোকেরা বা জমিদারীতে পোষা হত - তাঁর জন্য পাঁচ টাকা বেতনে গ্রামীণ বৈদ্য ও পশুচিকিৎসালয় স্থাপন, জমিদারীতে যেসব হাতি ব্যবহার করা হতো তাদের তাদের একদিন দুটি দেওয়া ইত্যাদি। তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে বৃক্ষ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বহুবার আলোচনাও পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৩]

এ রাজ্যের আদিবাসী মেয়েদের পরিবেশ ভাবনার দিকে প্রাচীন কাল থেকেই তাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে জীবনচর্চা গড়েছিলেন। ঐ ইতিহাস আজকের পৃথিবীকে বিশেষকরে পরিবেশদূষণে জর্জরিত এই বর্তমান এবং আগামী সমাজকে আশার আলো দেখাচ্ছে। বনকে বাঁচিয়ে, জীবনধারণের উপকরণগুলোর সংগ্রহে আদিবাসী মেয়েদের চিন্তা এক সতন্ত্র ধারণাই শুধু নয় এক নতুন দর্শনেরও জন্ম দিয়েছে। '' ইকো-ফেমিনিজম বা সবুজ নারীবাদ'' -এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।[৪] এই প্রবন্ধে স্বাধীনোত্তর বাংলার ৭০-৮০ এর দশকে গড়ে ওঠা পরিবেশ আন্দোলনে বিশেষ কয়েকজন নারীর সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পরবর্তী দশকগুলোতে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ আন্দোলনে মেয়েদের অবস্থান ও ভূমিকার তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের বিশেষ ভূমিকা বয়েছে। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে আশির দশকের শুরুতেই। যদিও পরিবেশ সংরক্ষণে এ দেশের মাটিতে প্রথম আইন তৈরী হয় ১৯০৫সালে।[৫] কিন্তু, কার্যত সেই আইনের কোনরকম কার্যকারিতা ছিলো না যদিও প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অপচয় নিয়ে সাবধান বানী উচ্চারিত হয়েছে অনেকদিন থেকেই। এ দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাধারণ মানুষ, সর্বোপরি মেয়েরা, সক্রিয়ভাবে পরিবেশ আন্দোলন শুরু করেন আশি দশকের প্রথম ভাগে। বিগত আটের দশকের শেষভাগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রামচন্দ্রপুর গ্রামের ৮৬ বছরের বৃদ্ধা শ্রীমতি বিনয়বালা গুপ্তা কলকাতা উচ্চআদালতে অভিযোগ করেন যে তাঁর গ্রামের 'গায়ত্রী রসায়ন উদ্যোগ' রাসায়নিক কারখানা থেকে মাঝে মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এর প্রভাবে নানারকম শারীরিক অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। কারখানার

তরল বর্জ্য পদার্থ গিয়ে মিশছে আশেপাশের ক্ষেতে। ফলে, সেখানকার শস্য ও গাছপালা নষ্ট হচ্ছে। ১৯৮৯-এ বিচারপতি সুহাসচন্দ্র সেন 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে'র ছাড়পত্র ছাড়া কারখানাটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন কারখানায় কর্মরত কুড়িজন কর্মীর কর্মহীনতার সমস্যাটির কথা মাথায় রেখে।[৬] কারখানার কর্মীদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা হয়।

নব্বই-এর দশকের একইরকমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল কলকাতা লাগোয়া বেহালা অঞ্চলে। এই অঞ্চলে কলকারখানা জনিত শব্দ ও বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে জোরদার পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এতে ছিল অঞ্চলের গৃহবধূদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। শেষপর্যন্ত গৃহবধূরা আদালতের শরণাপন্ন হন ডক কলকাতা হাইকোর্টের গ্রিন বেঞ্চে ১৯৯৭ সালের জনুয়ারি মাসে। ওই অঞ্চলে ৬০২টি কারখানার মধ্যে ১৯টি কারখানা থেকে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ করা হয়। শব্দ ও বায়ুদূষণের অভিযোগ পেয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বেঞ্চ 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ'কে অভিযোগটি খতিয়ে দেখতে আদেশ দেন। পর্ষদের প্রতিবেদনে জানা যায় যে অভিযুক্ত কোন কারখানারই উপযুক্ত দূষণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা নেই। শব্দ ও বায়ুদূষণের জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত হয় কেবলমাত্র একটি কারখানাই। এই ব্যবস্থা মানতে না পেরে অভিযোগকারিনীরা পুনরায় আদালতের দ্বারস্থ হন। এলাকায় জোরদার গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আদালতে মামলাটি ঝুলে রইলেও, জনসাধারণের চাপে ওই এলাকার দূষণচিত্র আজ অনেকটাই বদলে যায়।

পশ্চিমী পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে এবং ধাঁচেই এ রাজ্যে পরিবেশ আন্দোলনের শুরু। তবে বেশ কিছু স্থানিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে। দেশীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণমুলক পরিবেশবাদী আন্দোলনের ধারা এদেশে গান্ধিজির সময় থেকেই আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশভাবনা এবং গ্রাম উন্নয়ন যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আণবিক বোমা, পরমানু বিদ্যুৎ কারখানার বিরোধিতা সহ বিভিন্ন পরিবেশ আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।[৭] বিজ্ঞান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রভৃতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছিল। এই সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবগুলিতে পরিবেশমুখী কাজকর্মে প্রায় ১৫ শতাংশ মহিলা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এ'ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের শাখা সংগঠন হিসেবে মহিলাসংগঠনগুলোও বর্তমানে নারীকেন্দ্রিক পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত করছে। বিশেষকরে, গ্রামাঞ্চলে ও শহরে জল নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলাসমিতি কাজ করছে।[৮]

বিগত কয়েক দশক ধরেই দরিদ্র ও উন্নতিকামী দেশগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার ফলে নারী ও জীবনরক্ষাকারী প্রাকৃতিক ও জৈব উপাদানগুলো গভীর বাস্তুতান্ত্রিক

সংকটের মুখে পড়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। সঙ্গে আছে দারিদ্র্য আর জনসংখ্যার চাপ। বাস্তুতান্ত্রিক এই ভারসাম্যহীনতা নারীকে সবথেকে বেশী আঘাত করে। পরিবেশের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক খুব কাছের — এটি ১৯৯২-এর সম্মেলনে স্বীকৃতি পেয়েছে।[৯] আমাদের দেশের বেশিরভাগ মেয়েরাই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। পুরুষপ্রধান এই সমাজ সংস্কৃতির লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার মেয়েরাই জ্বালানী, জল, পশুখাদ্য, এমনকি পরিবারেরও খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করার দ্বায়িত্ব পালন করে যার ফলে মেয়েরাই প্রকৃতির কাছাকাছি আসে বেশি। বন-জঙ্গল, জল নষ্ট হয়ে, জমির উর্বরতা কমে যাওয়ায় কাজগুলো ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে, এদের প্রান্তিকতাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১০] নতুন আর্থিক নীতি দেশে পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিপর্যয় ডেকে আনছে, কারণ এতে জোর দেওয়া হচ্ছে কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানির ওপরে। ফলে, ভূমিক্ষয় বাড়ছে। কীটনাশক, কৃত্রিমসারের ব্যাপক প্রয়োগে হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র। চোরাগাছশিকারি, কাগজকল মালিক, কাঠ ব্যবসায়ী আর ঠিকাদাররা যেভাবে জঙ্গল কেটে সাফ করছে বৈদেশিক ঋণ, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির আদানপ্রদানের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নানা প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার আঞ্চলিক গোষ্ঠীর হাতে না থেকে জাতীয় স্তরে বা ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাচ্ছে। ফলে বাড়ছে বিরোধ।

পশ্চিমবঙ্গের বুকে পরিবেশ সংরক্ষণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা সর্বপ্রথম শুরু হয় সামাজিক বনসৃজনের মধ্য দিয়ে। পরে তা ছড়িয়ে যায় সরকারী স্তরেও। সামাজিক বনসৃজনে গ্রামের মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এরফলে এই রাজ্য, বার-বার সামাজিক বনসৃজন সৃষ্টিতে সমগ্র দেশের মধ্যে এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে, মোট ১১টি বন রয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত।[১১] তবে, এখানেও আছে মহিলাদের আন্দোলন। পুরুষপ্রাধান্যের এই সমাজে বন পরিচালনা বা গ্রাম সভায় মেয়েদের মতামত গুরুত্ব পায় না। এতদিন বনসংরক্ষণে মেয়েদের ভূমিকাকে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। অথচ মেয়েরাই বনে সময় কাটান বেশি, জানেন অরণ্যের সমস্ত নিয়ম কানুনও। তাঁদের রয়েছে খুব স্পষ্ট এবং স্বচ্ছধারণা যাতে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই বাঁচতে পারে সহাবস্থানের ভিত্তিতে। এই ব্যাপারে মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের একটি অঞ্চলে একটি বাঁধ তৈরীকে কেন্দ্র করে মেয়ে-পুরুষে মতপার্থক্য চোখে পড়ে।[১২] মেয়েরা চেয়েছিলেন বাঁধটি তৈরী হোক গ্রামের কাছেই। যাতে ভূমিক্ষয় বন্ধ হবে, জলের প্রয়েজন মিটবে, মেয়েদের জল আনতে দূরে যেতে হবে না। কিন্তু দেখা যায় বাঁধটি তৈরী হয়েছে গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে! ফলে, পুরুষেরা বেশিদিনের কাজ পেয়েছে। তবে. পরিবেশ সমস্যা মিটে যায়নি। বনসুরক্ষা সমিতি এবং বনবিভাগকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়াতেও আরেকটি ঘটনায় মেয়ে-পুরুষের লড়াই জনসমক্ষে

আসে। গ্রামের মেয়েরা বনবিভাগের কাছে কিছু ফলের চারা দাবী করে। কারণ, এতে বনসৃজন, জ্বালানি এবং খাদ্য - সবকিছুই কিছুটা সমাধান হয়। কিন্তু, বনবিভাগ পুরুষের চাহিদা মতো ইউক্যালিপটাসের চারা দেয়।[১৩] এইভাবে, বারে-বারেই বাংলার পরিবেশ আন্দোলনে নারীর নিজস্ব ভূমিকা, অরণ্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। ১৯৯০ সালে ভারতীয় অরন্যনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে। বনবিভাগের প্রাধান্য কমে, অরন্যনিবাসী বা স্থানীয় মানুষের ভূমিকাই বড় হয়ে উঠেছে। বনসংরক্ষণে নারীদের ভূমিকাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে, মহিলারা বিভিন্ন এন জি ও-র মাধ্যমেও পরিবেশ আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে সার্ভিস সেন্টারের কাজ উল্লেখযোগ্য। কীটনাশক ও সারদূষণযুক্ত খাদ্যের বিপদ সম্বন্ধে এবং সার্বিক পরিবেশবান্ধব কৃষির চাষবাসের জন্য এরা মূলত কাজ করে। এদের সংস্থার অন্যতম কর্ণধার একজন মহিলা। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ভারতে এসে পৌঁছুনো জিন পরিবর্তিত খাদ্যের বিপদ সম্বন্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এতে কলকাতার বেশ কয়েকটি কলেজের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের বিরোধীতায় সুপরিচিত নাম জয়া মিত্র।[১৪] বর্তমানে নিজের উদ্যোগে ও কর্মকুশলতায় প্রচুর তরুণীকে তিনি এই আন্দোলনে সামিল করেছেন।[১৫] এছাড়াও লেখনীর দ্বারা পরিবেশ ভাবনাকে জোরালো করে তুলেছেন। গাছ সংরক্ষণে কলকাতার মুকুতা মুখোপাধ্যায় কলম নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন।[১৬] রয়েছেন আরো অনেক লেখিকা, যাঁরা লেখনির মাধ্যমে পরিবেশ আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন। কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৫টি মহিলা সংগঠন পরিবেশমুখি নানান সমস্যায় সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছে। যদিও এদের বেশির ভাগেরই কাজের পরিধি শহরমুখী। তবে গ্রামে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাজ প্রশংসনীয়। এরা বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে। ফলে, সমগ্র বাংলায় আজ এক সচেতন পরিবেশ আন্দোলন ও ভাবনা গড়ে উঠতে পেরেছে। যদিও পরিবেশ সমস্যা আজও রয়েছে। জনকল্যানমুখি ও পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচী গ্রহণ সংক্রান্ত আন্দোলনে নারীর ভূমিকা যত বাড়বে, ততই সুষ্ঠু সমাধানের পথে ভবিষ্যত সমাজ এগোবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। নিরঞ্জন হালদার ঃ 'পরিবেশ আন্দোলন'; *জিজ্ঞাসা*, শিবনারায়ণ রায় (সম্পা), কলকাতা, ১৪০৩।

২। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, পৃষ্ঠা ৯০।

৩। সুকুমার সেনচৌধুরী ঃ 'বন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও শরৎকামিনী সেন চৌধুরাণী', সবুজবার্তা, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৫।

৪। সোমা বসু ঃ 'প্রকৃতি পরিবেশ ও নারী আন্দোলন - সবুজনারীবাদ', *নবীনপত্র*, কলকাতা, নভেম্বর-জানুয়ারি, ২০০৩-২০০৪, পৃষ্ঠা- ৪৬-৫১

৫। বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ঃ 'পরিবেশ ভাবনা, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ', *ধূসর বসুধা*, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা-১।

৬। রাহুল রায় ঃ 'পরিবেশ আন্দোলন ও পশ্চিমবঙ্গ', *পশ্চিমবঙ্গ ফিরে দেখা*, চুচুঁড়া, হুগলি, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৪৯। ৬ক পূর্বোল্লিখিত

৭। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ঃ পরমানু দৈত্য-প্রতিবাদে পথ হাঁটা, *উৎস মানুষ*, কলকাতা, মে ১৯৯৯।

৮। কালান্তর, ১২/১২/২০০৩।

৯। রবীন্দ্রনারায়ণ বসু (সম্পা) ঃ পরিবেশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

১০। সন্তোষকুমার ঘোড়ই ঃ 'পরিবেশ ঃ?' কলকাতা, ২০০০।

১১। মেদিনীপুর জেলার ফরেষ্ট অফিসার দীপঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ২৩/১১/২০০৩।

১২। গার্গী রায় ঃ 'পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বনসংরক্ষণ ও নারী', নক্ষত্র, শারদসংখ্যা, কলকাতা, ২০০২।

১৩। পূর্বোল্লিখিত

১৪। জয়া মিত্র ঃ জীবিকা বিহীন জীবন, উৎস*মানুষ*, জানুয়ারি, ২০০১।

১৫। ওদের জলদস্যুগিরির সামনে আমরা কি পিছিয়ে যাব?, পরিমণ্ডল, বর্ধমান, ৭/৪/২০০৪।

১৬। মুকুতা মুখোপাধ্যায় ঃ *ফ্রেণ্ডস অব ওয়েটল্যান্ডস অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ*-এর সম্পাদক।

সারাংশ

আর্তের আর্তনাদ— চিল্কার গভীরে ও অগভীরে

সুতপা ঘোষ দস্তিদার

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ চিন্তা ও বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ সংরক্ষণে জলাভূমি বা ওয়েটল্যান্ডের (Wetland) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলাভূমিকে 'ন্যাচারাল সিঙ্ক' (National Sink) বলা হয় কারণ জলাভূমি কলকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস বিশোষণ করে ও তরল বর্জ্য রাসায়ণিক পদার্থগুলি দ্রবীভূত করে। পরিবেশ ও বনবিভাগ মন্ত্রকের ১৯৯৬ সনের পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতবর্ষের জলাভূমি চার মিলিয়ন হেক্টরে বিস্তৃত। 'ন্যাশনাল কমিটি অন ওয়েটল্যান্ডস, ম্যানগ্রোভস্ অ্যান্ড কোস্টাল রিফস্' (National Committee on Wetlands, Mangroves and Coastal Reefs) নামক একটি রাষ্ট্রীয় সমিতি জাতীয় মানের ১৬টি জলাভূমির উল্লেখ করে, যার মধ্যে উরিষ্যার চিল্কা হ্রদ অগ্রগণ্য। ১৯৭১-এ 'রামসার সম্মেলন'(Ramsar Convention) এই হ্রদটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের জলাভূমি বলে ঘোষণা করে।

উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই হ্রদটি উক্ত রাজ্যের মৎসশিকারের প্রধান উৎস। বহু যুগ ধরে এই মৎস শিকার চলেছে গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলির কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। এই পঞ্চায়েতগুলি কিউতো, নাইরী, শর্তিয়া, গোখা, নোলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের ভিত্তিতে সংগঠিত এবং এরা এই হ্রদের সংরক্ষণ করে চলে। এরা বছরে কিছু সময় মৎস শিকার নিষিদ্ধ করে এবং মৎস শিকারের পদ্ধতি নির্ণয় করে। এই রীতিনীতিগুলি জলজ প্রাণীর ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং স্থানীয় মানুষের জীবিকানির্বাহ সুনিশ্চিত করে।

আশির দশকের আধুনিক মৎসচাষ বা 'অ্যাকোয়া কালচারের' (Aquaculture) ফলস্বরূপ এই সকল পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এই প্রকল্পতে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের অস্তিত্বই বিপন্ন করেনি, অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মৎসজীবিদের জীবনের নূন্যতম প্রয়োজনগুলির থেকেও বঞ্চিত করেছে। 'জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' (Zoological Survey of India) রায় ও সুন্দরমের পরিসংখ্যান অনুসারে চিল্কা হ্রদ আটশ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল। আধুনিক মৎস চাষের জন্য বাঁশের ঘেরাটোপ ও মাটির বাঁধ তৈরী করা হয়েছে যার ফলে জলজ উদ্ভিদগুলির ক্ষতি হয়। হ্রদের এই অংশের জলে অক্সিজেন হ্রাস পায়, যার কু-প্রভাবে জলজ প্রাণীগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রাণীগুলির স্বচ্ছল চলাফেরা বিঘ্নিত হয়। অনেকক্ষেত্রেই এই প্রান্তিক জলাভূমির

প্রাণীগুলি খাদ্যান্বেষণের কেন্দ্রাঞ্চলে আসতে পারে না। আবার মৎসচাষ প্রকল্পগুলিতে যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা হয় অনেকক্ষেত্রেই তার যথাযথ নিষ্কাশন হয় না এবং তা জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রকল্পগুলির ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbon) বা আর্গেনোফস্ফেট (Organophosphate) যুক্ত রাসায়ণিক পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই বহু সংখ্যক জলজ প্রাণীর পচনের প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

উড়িষ্যার 'হ্যান্ডবুক অন্ ফিসারিস স্ট্যাটিসটিক্স' (Handbook on Fisheries Statistics) অনুসারে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ সনের মধ্যে চিল্কায় ধৃত মাছের পরিমাণ ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ৪৫ শতাংশেরও বেশি বিরল প্রজাতির মাছ গত ৩০ বছরের মেয়াদে চিল্কা হ্রাদ থেকে অবলুপ্ত। এছাড়া ডল্ফিন, ধইঙ্গা, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণী অপম্রিয়মান প্রজাতির প্রাণী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এইগুলির মধ্যে ডল্ফিনের গুরুত্ব অপরিসীম। ডল্ফিন সামুদ্রিক প্রাণী হিসেবে পরিগণিত। পৃথিবীতে কেবলমাত্র দুটি দেশের হ্রদে ডল্ফিন পাওয়া যায় যর মধ্যে চিল্কা হ্রদে ডল্ফিন মেলে। আধুনিক মৎস প্রকল্পের প্রকোপে এই ডল্ফিনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। ২০০২ সনের ৩০ ডিসেম্বরের টেলিগ্রাফ পত্রিকায় উল্লিখিত আছে যে ২০০১ থেকে ২০০২এর মধ্যে ১১টি ডল্ফিনের প্রাণনাশ হয়েছে।

আধুনিক মৎসচাষ হ্রদের চারপাশের মানুষের জীবনও বিপন্ন করেছে। আধুনিক মৎসচাষ প্রকল্পগুলিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। উড়িষ্যার হ্যান্ডবুক অন ফিসারিস স্ট্যাটিসটিক্সের (Handbook on Fisheries Statistic) -এর মতে চিল্কার মৎস প্রকল্পের চিংড়ি চাষের ব্যয় প্রতি একরে এক লক্ষ টাকা। স্বভাবতই মৎস প্রকল্পগুলি বিত্তবান মৎস ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত। এরা উড়িষ্যার প্রণ-মাফিয়া (Prawn Mafia) নামে খ্যাত। এরা দেশের বাজারে মৎস বিপণন ও বিদেশে মৎস রপ্তানি করে আজ প্রচুর অর্থের মালিক। স্থানীয় মৎসজীবীরা সাধারণভাবে চিংড়ির চাষ করলেও মাছের বিপণন কেন্দ্রে বিত্তবান মৎসজীবিদের সাথে অক্ষম প্রজিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারে না। ক্রমে এরা মৎসচাষ প্রকল্পগুলির ঠিকা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

দরিদ্র মৎসজীবিদের উন্নয়নের চেষ্টায় কেবলমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে মৎস বিপণন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সরকার। প্রত্যেক বছর রাজস্ব বিভাগের সাহায্যে কেন্দ্রীয় মৎসজীবী সমবায় সমিতি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বহুনিয়া বা গ্রামের প্রধান মৎসজীবীর নামে, একটি এলাকার মৎসচাষের সত্ত্ব প্রদান করে। চিল্কা অঞ্চলে এমন একাধিক প্রাথমিক সমবায় সমিতি আছে, যেমন সাতাপাড়া সমবায় সমিতি, কালুপাড়া সমবায় সমিতি, বেরহামপুর সমবায় সমিতি ইত্যাদি। এই সমবায় সমিতিগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও,

প্রচলিত রীতি অনুসারে, চিল্কাহ্রদের মৎস বিপণন চলে খোলাবাজারে। ইংরেজ সরকারের আমল থেকেই হ্রদের কিছু অংশের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও মাছের বাজারের উপর বিত্তবান মৎসজীবিদের একচেটিয়া অধিকার এই রীতিকে সুদৃঢ় করে। মৎসচাষের ফসল প্রধানত বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রী করা হয়। কাগজে কলমে এলাকার মৎস বিপণন কেবলমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবচিত্র সে কথা বলে না। উড়িষ্যার 'ডিবেক্টরেট অব ফিসারিশ্' -এর (Directorate of Fisheries) পরিসংখ্যান অনুসারে নব্বইয়ের দশকের চিল্কার সমগ্র মৎসশিকারের কেবলমাত্র ৪.৭৫ শতাংশ বিপণন সমবায়ের মাধ্যমে করা হয়। এর ফলে স্থানীয় সাধারণ মৎসজীবিদের দুর্দশা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিল্কা হ্রদের অনেকাংশই সাধারণ মৎসশিকারের পরিবর্তে মৎসচাষ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে সরকারের বা প্রাথমিক সমবায় বা বিত্তশালী মৎসচাষীর তৎপরতায়। উরিষ্যার 'ডিরেক্টরেট অব ফিসরিশ্' -এর (Directorate of Fisheries) নথিপত্র এর পূর্ণ্য সাক্ষ্য বহন করে। ক্রমবর্ধমান দুঃখ দুর্দশার প্রকোপে সাম্প্রতিককালে বহু দরিদ্র মৎসচাষী মৎসচাষ প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে তারা মৎসচাষের কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়। ১৯৯৯ সালের ২৯ মের *দ্য স্টেট্সম্যান* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে চিল্কা সংলগ্ন একটি গ্রামে উক্ত দ্বন্দ্বের সাক্ষ্য বহন করে। অনুরূপ ঘটনা *টেলিগ্রাফ, হিন্দুস্তান টাইমস্* ও *আনন্দবাজার পত্রিকাতেও* প্রকাশিত হয়। দরিদ্র মৎসজীবীদের এই সংগ্রামে চিল্কা মৎসজীবী মহাসঙ্ঘ নামন মংসজীবী সমবায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তবে আজও চিল্কা হ্রদে মৎস চাষের নামে পরিবেশ দূষণ এবং আর্থ সামাজিক স্তরে বৈষম্য অবিরতভাবেই চলেছে। প্রান্তিক জলাশয়ের বাঁশের ঘেরাটোপ ও মাটির বাঁধের প্রকোপে, প্রতাপে চিল্কার সৌন্দর্য আজ অনেকটাই অতীতের গরিমামাত্র। উড়িষ্যার পর্যটন বিভাগ এই সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ-ক্লিষ্ট।

এইভাবেই, আধুনিক মৎসচাষপ্রকল্পগুলি কেবলমাত্র চিল্কার গভীরে আশ্রিত প্রাণীজগতের ক্ষতিসাধন করেনি, চিল্কার অগভীরে, হ্রদ সংলগ্ন মৎসজীবী প্রধান গ্রামগুলির দারিদ্র-ক্লিষ্ট মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খুলনার প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহাসিক স্থান

মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান

গৌরব ঘোষণার জন্য নয় বরং সত্য প্রকাশের জন্যই ইতিহাস। ইতিহাস মানবের সকল অতীত কর্মকাণ্ডের কাহিনী। শুধুমাত্র অতীত ঘটনাপঞ্জী ও দলিলপত্রে প্রাপ্ত বিষয়াদিই এর আলোচ্য বিষয় নয়, বরং অতীত সম্পর্কে যা কিছু পাওয়া যায় যেমন কীর্তিস্তম্ভ, দালান-কোঠা, প্রাচীন শিল্পকলা, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র প্রভৃতি সবকিছুই ইতিহাসের অন্তর্গত। সুতরাং মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে ইতিহাসের অবদান অপরিসীম। আর ইতিহাসকে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল এই প্রত্নসম্পদ। মরজগতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে অতীত ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত থাকে যার মধ্যে দিয়ে অতীত মানুষের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত খুলনার ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে। ১৮৪০সালে খুলনা মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮২সালে জেলায় রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য খুলনাই সর্ব প্রথম মহকুমা। যুগান্তকালের মানুষের কীর্তিরাজী এবং স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধারণ করে খুলনা স্মরণীয়। যুগে যুগে ঐতিহাসিক, গবেষক নিরলসভাবে অনুসন্ধিৎসা চালিয়ে এর অতীত গর্ভ থেকে খুঁজে বের করেছে কত স্মৃতি-সৌধ, কত প্রত্নসম্পদ। এ অঞ্চলের অতীত মানুষের ধ্যান-ধারণা, কর্ম-প্রচেষ্টা, কীর্তিসমূহ সভ্যতার ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া এসব কীর্তিরাজী এই অঞ্চলের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রত্নসম্পদ বলতে আমরা অতীতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মানবীয় কৃতিত্বের নিদর্শন সমূহের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই বুঝি। প্রাগৈতিহাসিক জীবনের পরিচায়ক উপাদান সমূহের সন্ধান, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণই এর মূল উদ্দেশ্য। কোন দেশের বা কোন জাতির প্রত্নসম্পদ সেই দেশের বা সেই জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। বলা বাহুল্য খুলনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। খুলনার প্রত্নসম্পদের যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে, তা এ অঞ্চলের মানুষের প্রাচীনতম সমৃদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

খুলনার প্রত্নসম্পদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, বাগেরহাটের পশ্চিম-উত্তর দিকে পানিঘাট নামক গ্রামের মাটির নীচে একটি অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে এই দেবীমূর্তিটি অতীব প্রাচীন এবং আদিযুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল।

চিতলমারী গ্রামের সন্নিকটে খড়মখালিতে মাটির নীচে প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটিতে শংখ, চক্র, গদা ও পদ্ম খোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, এটিও অত্যন্ত প্রাচীন।

পাইকগাছা থানার অন্তর্গত মহারাজপুর গ্রামে মৃত্তিকা গর্ভে প্রাচীনকালের ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর পাওয়া গেছে। এই গ্রামের তিনটি ভিটায় ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর সন্ধানও পাওয়া গেছে। শাকবাড়ে নদীর তীরে লবনের কারখানার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে দশ বারো হাত পাকা গাঁথুনি মৃত্তিকা গর্ভে দৃষ্ট হয়। এগুলি নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের এককালের কর্মচাঞ্চল্যের প্রমাণ দিচ্ছে।

মদিনারাবাদে অনেকগুলি পুরাতন কবরের নিদর্শন এবং অসংখ্য পুরাতন কড়ি পাওয়া গেছে। কড়ি দিয়ে যে একসময় ক্রয়বিক্রয় চলতো, মনে হয়, এগুলি তারই নিদর্শন। এখানে মৃন্ময় পাত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণে পুরানো ইঁট এবং ঝামা মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া গেছে। স্থানীয় তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাগেরহাটের বিখ্যাত খান জাহান আলীর দীঘি বা খাঞ্জেলী দীঘি খননের সময় একটি প্রাচীন আদি অকৃত্রিম বৌদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

চাঁদখালির ছয় মাইল দক্ষিণে কয়রা থানার আমাদি গ্রামের নিকট কপোতাক্ষ নদীর তীরে মসজিদকুঁড় একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পঞ্চদশ শতকে পীর খানজাহান আলীর দুই যোগ্য শিষ্য বুরহা খাঁ ও ফতেহ খাঁর দ্বারা ষাটগম্বুজ মসজিদের অনুকরণে ক্ষুদ্রতম ও বর্গাকৃতির, চার স্তম্ভ ও নয় গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়। সম্ভবত কেউ স্তম্ভের নীচের আসল পাথরগুলো অপসারণ করে পুরানো পাথর লাগিয়েছে। এই মসজিদের সন্নিকটেই পীর খানজাহানের দুই অনুসারী বুরাহ খান ও তার পুত্র ফতেহ খানের সমাধি আছে। কালের স্রোতে প্রথমটি নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ইট দিয়ে নির্মিত ফতেহ খানের সমাধি সৌধটি এখনও রয়েছে। পুরাতন স্মৃতিসৌধের তালিকা থেকে জানা যায় যে, সমাধিটি ৪০০বছরেরও অধিক পুরাতন। এই নিদর্শনগুলি খানজাহান আলী কর্তৃক সুন্দরবনের গভীর অঞ্চল পর্যন্ত আবাদের স্বাক্ষর বহন করবে। তার মৃত্যুর পর এ অঞ্চল আবার জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায় এবং ১৭৯০স্যালে হেংকেল সাহেবের পরিচালনায় পুনরাবাদকালে শ্রমিকগণ এই মসজিদ মাটি খুড়ে বের করে। সেই থেকে এই মসজিদের পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম হয়েছে মসজিদকুঁড়।

সাতক্ষীরার দুই মাইল দূরে বেত্রা নদীর তীরে লাবসা তুর্কী শাসনামলের বুড়ন রাজ্যের এক ঐশ্বর্যশালী গ্রাম। কালের গর্ভে বিলীন হলেও এখানে পুরাতন শহরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার মাইচম্পার দরগাহ এখনো প্রাচীন কালের নিদর্শন হিসেবে বর্তমান। মাইচম্পার দরগাহ এক গম্বুজ বিশিষ্ট অতি মজবুত গড়নের স্থাপত্য

নিদর্শন। স্থানীয় তথ্য থেকে জানা যায় যে, এটি মহৎপ্রাণ মাইচম্পা বিবির (মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতী) সমাধি।

সুন্দরবন অঞ্চলে খোলপেটুয়া নদীর তীরে কবর খননকালে ১৯১১ খ্রিঃ রাজা দনুজমর্দনের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাটি গোলাকৃতি। মুদ্রাটির প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলা হরফে 'শ্রীদনুজমর্দন দেব' এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ, শকাব্দ ১৩৩৯' লেখা আছে।

তালা থানার নিকট ধানদিয়া গ্রামে এক তেওর রাজবংশ রাজত্ব করতেন। এখনও দুর্গ, গড়, ও দীঘির চিহ্ন রয়েছে। কথিত আছে যে, এখানে রাজাদের খনি ও ছয় বুড়ির ছয়টি দীঘি ছিল। অতীতে এখানে কৃষকেরা চাষাবাদ করবার সময় প্রচুর ধনরত্ন পেত।

ডুমুরিয়া থানার আরশনগর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে। মসজিদটির সামনে একটি চৌকো কালোপাথরের উপর আরবী ফারসী হরফ দৃষ্ট হয়। উক্ত পাথরটি কবেকার এবং উক্ত লেখার মধ্যে কোন সত্য লুকিয়ে আছে তা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়।

বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা মতে দৌলতপুর থেকে ১৩মাইল দূরে ভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে ভরতভায়না গ্রামে একটি ইষ্টক নির্মিত বৃত্তাকার স্তুপ 'ভরত রাজার দেউল' নামে কথিত মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়। স্তুপটি খুলনার এক উল্লেখযোগ্য প্রত্নসম্পদ। কথিত আছে এই স্তুপের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে ভদ্রা নদীতে যাওয়া যেত। সাতক্ষীরার বাবলিয়া গ্রামে গণরাজাদের রাজধানীতে মৃত্তিকার নীচে ইষ্টক নির্মিত রাজবাড়ীর নিদর্শন আছে।

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে অতীতের গৌরবময় কীর্তির দিক থেকে ঐতিহাসিক স্থানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সাধক স্থপতি প্রশাসক- খানজাহান আলী (রঃ) ও তাঁর কীর্তি। সম্ভবত তাইমুরের ধ্বংসলীলার পর দিল্লী হতে তিনি এখানে আসেন এবং সুন্দরবন অঞ্চলে জায়গীর লাভ করে ঐ অঞ্চল আবাদ করেন। এ অঞ্চলে তাঁর মহৎ কীর্তির মধ্যে মসজিদ নির্মাণ, দীঘি খনন, রাস্তা ও পুল নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

বাগেরহাটে (এককালের মহকুমা) ১৪৫৯ সালে নির্মিত এই মহান সাধকের রওযা—যা এ অঞ্চলে পীর খানজাহান আলীর দরগাহ বলে পরিচিত। এই সমাধি ইটের তৈরী, বর্গাকৃতি, ৪৫ˊ ৪৫ˊ এবং অন্তর্ভাগ অষ্টকৌণিক; এর মিনারটি ৪৪ˊ ব্যাসযুক্ত এবং ৪৭ˊ উঁচু। খানজাহান আলী পরিণত বয়সে নিজের সমাধি ও মসজিদ প্রস্তুত এবং দীঘি খনন করেন। এই দরগাহ এলাকায় চৈত্র পূর্ণিমায় এক মেলা বসে। এই দিঘীর উত্তর-পশ্চিম দিকে আর একজন সাধক জীন্দাপীরের মাজার আছে। এখান থেকে তিন মাইল

উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাদেশের এক বৃহত্তম অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ষাটগম্বুজ মসজিদ, খানজাহানের অমর কীর্তি। আনুমানিক ১৪৫০ খ্রিঃ মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদটি লম্বায় ১৬০´ এবং চওড়ায় ১০৮´ ফুট। মসজিদের গৃহের ভিতরের গম্বুজের ছাদের উচ্চতা প্রায় ২১´ ফুট। শিল্পের দিক দিয়ে এতে দিল্লীর তুঘলকী এবং গৌড়ীর স্থাপত্যের সংগে স্থানীয় রীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। অসাধারণ কারুকার্যের চিহ্ন মসজিদটিতে এখনও বিদ্যমান। বাইরের দিকটা ইট দ্বারা নির্মিত এবং ভিতরে ষাটটি ধূসর বর্ণের পাথর নির্মিত স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলির উপর অর্ধবৃত্তাকার খিলানে নির্মিত ৭৭টি গম্বুজে ছাদ গঠিত। মসজিদের পশ্চিম দিকে দশটি মিহ্‌রাব ও একটি দরজা বাকি তিন দিকে ২৫টি দরজা আছে। তদুপরি চারকোণে চারটি মিনার আছে। এর গঠন সাধারণ দরবার কক্ষের মত। মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলে বিজয়ী খানজাহান আলী এখানে রাজকার্যও পরিচালনা করতেন। চারদিকে বিশাল বেষ্টন প্রাচীর এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে এই প্রাচীন মসজিদটি সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং এখানে নিয়মিত ইদ ও জুম্মার জামাত হয় এবং প্রায় তিন সহস্র লোক জামাতে দাঁড়াতে পারে। এর পাশেই খানজাহানের বিশাল ঘোড়াদীঘি অবস্থিত।

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার বার মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকটেই ইতিহাস খ্যাত বাংলার বারভুঁইয়াদের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর। মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় মোগল সম্রাট আকবরের সুযোগ্য সেনাপতি মানসিংহ ঈশ্বরীপুর আগমন করে রাজা প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং সেখানে মৃত বারোজন মোগল সেনাপতিদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। শুধু তাই নয় মুসলমানদের জন্য নিকটেই তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি টেংগা মসজিদ নামে পরিচিত। পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি এখন ধ্বংসের পথে। মসজিদটি এক শ্রেণীতে পাঁচটি ঘরে বিভক্ত, প্রত্যেক ঘরের উপর একটি গম্বুজ। মসজিদের মধ্যস্থলের ঘরটির ভিতরের মাপ ২০´-৯´´ ২০´-৯´´ এবং পাশ্ববর্তী অন্য চারটির প্রত্যেকটি ১৮´-৭´´ ১৮´-৭´´ইঞ্চি। মেঝে থেকে মসজিদের উচ্চতা ৩৬ ফুট। মসজিদটি প্রায় ছয় ফুট বসে গেছে। কারণ, এর মেঝে প্রথম সময়ে যদি মাটি থেকে ৩´ ফুট উঁচু ধরা যায় তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে, সেই মেঝেই তিন ফুট মাটির নীচে বসে গেছে। মাঝের ঘরের দরজার খিলান ৭´-৩´´ প্রশস্ত এবং অন্য ঘরগুলির দরজার খিলান ৬´-৩´´ প্রশস্ত। ভিত্তি সর্বখানে ৭´ফুট। বাগেরহাটের খানজাহান আলীর সমাধি, মন্দিরাদি ছাড়া এরূপ শক্ত মসজিদ এ প্রদেশে খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। টেংগা মসজিদের উত্তরাংশে আরো একটি অষ্টকোণ গম্বুজওয়ালা ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। যা লক্ষ্মী দেবীর মন্দির বা 'বিবির আস্তানা' নামে পরিচিত।

আরও একটি ঐতিহাসিক স্থান গোপালপুর। সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুর থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এই গোপালপুর। এখানে রাজা প্রতাপাদিত্য একটি মন্দির স্থাপন করেন, যা সাধারণত দোলমঞ্চ নামে পরিচিত।

খুলনার একটি প্রসিদ্ধ স্থান ধুমঘাট। ঈশ্বরীপুরের তিন মাইল দূরে ধুমঘাট অবস্থিত। এখানে (জঙ্গলের মধ্যে তিরকাটি নামক স্থানে) রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরের স্বাক্ষর বহন করছে 'পরমানন্দ কুঠি'। এরই অদূরে শিবপুর নামক জায়গায় বৌদ্ধের একটি মূর্তি ছিল বলে জানা যায়, যা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

কালীগঞ্জ থেকে বারো মাইল দক্ষিণে ঈশ্বরীপুর রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল এখানে তার দুর্গ, জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, হাম্মামখানা এবং বারো দুয়ারী দরবার কক্ষ ছিল। তাছাড়া, একটি কালীমন্দির ও ত্রিভুজ আকৃতির একটি মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলিও এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি গীর্জার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত এটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জেসুইট গীর্জা এবং এর নির্মাণকাল সম্ভবত ১৫৯৯-১৬০০খ্রিঃ।

কপিলমুনিতে কপিলেশ্বরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় তথ্য থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৮৫০ খ্রিঃ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল।

বাগেরহাটের যাত্রাপুর রেলষ্টেশন থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে লালা ইট দ্বারা নির্মিত দক্ষিণ বাংলার একটি আকর্ষণীয় মঠ রয়েছে। এই মঠ কোধলা মঠ নামে পরিচিত। ইটের শৈল্পিক কারুকার্য এই মঠের প্রধান বৈশিষ্ট।

বাগেরহাটের অন্তর্গত যাত্রাপুর বাজারের তিন মাইল উত্তরে বিখ্যাত অযোধ্যার মঠ অবস্থিত। কে বা কারা কোন প্রাচীনকালে এই ঐতিহাসিক গগনচুম্বী মঠ নির্মাণ করেন তা সঠিকভাবে জানবার কোন উপায় নেই। কালের বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ইষ্টক নির্মিত এই বিরাট মঠটি আজও প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। আলাইপুর, সামন্তসেনা, কাজদিয়া ও হোসেনপুর গ্রাম গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন সাহের নামের সংগে সম্পর্কযুক্ত। কথিত আছে, বাল্যকালে এ অঞ্চলে হোসেন শাহ লালিত-পালিত হয়েছিলেন। খানজাহানের শহরে অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাটের দুই মাইল পশ্চিমে যে সুন্দর দশ গম্বুজ মসজিদ আছে তা হোসেন শাহের মসজিদ নামে খ্যাত। ঐ মসজিদের ভেতরের মাপ ৬৩´-২৪´ ফুট; প্রতি গম্বুজের তলদেশের মাপ ১২´-১২´; এক সারিতে পাঁচটি করে গম্বুজ। মসজিদের সন্নিকটেই রয়েছে প্রকাণ্ড দীঘি। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এই মসজিদ খানজাহানের মসজিদ অপেক্ষা ভিন্ন নয়। প্রাচীন খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট শহরে হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নুসরৎ শাহের টাঁকশাল ছিল। এই টাঁকশাল শহরের মিঠা

পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত ছিল। এখানে মোট একুশটি টাঁকশালে তিন ধরনের মুদ্রা পাওয়া যায়।

খুলনার সেনহাটী একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। সম্ভবত গৌড়ের সেন বংশের রাজত্বকালে এই গ্রামের প্রতিষ্টা হয়। বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মভূমি এই সেনহাটী গ্রাম।

ফুলতলার দক্ষিণ ডিহি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী (১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর বেণীমাধবের কন্যা ভবতারিণী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহ করেন, পরবর্তীতে ঠাকুরবাড়ীতে তার নামকরণ হয় মৃণালিনী দেবী)। দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা গ্রাম আজও প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করে আসছে। এখানে তুর্কী আমলের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দিরের শেষাবস্থা বিদ্যমান।

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার মুকুন্দপুরের কাছে ধামরাইলে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক নির্মিত একটি চমকপ্রদ 'নবরত্ন মন্দির' দৃষ্ট হয়-যার গঠন অনেকটা দিনাজপুর জেলার কান্তজীর মন্দিরের মত। মন্দিরটি এখনও দন্ডায়মান তবে মন্দিরের নয়টি রত্ন অর্থাৎ নয়টি চূড়াই ভেঙ্গে গেছে। কথিত আছে এখানে যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা বসতো।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরের 'যাতার দৌল' নামে আকর্ষণীয় স্মৃতিসৌধ পরিলক্ষিত হয়। এই স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা একশ ফুট এবং এটিও এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

সাতক্ষীরার নলতা গ্রাম প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, জনসেবাব্রতী, লেখক, সাধক আহসানিয়া মিশনের প্রবর্তক পীর খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর জন্মস্থান এবং এখানেই পীর আহসান উল্লাহর মাজার রয়েছে।

খুলনার পাইকগাছার রাড়ুলী গ্রাম প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মভূমি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস সে যুগের প্রথম বাঙালী ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

যাত্রাপুর বাজার আজও রথযাত্রার মেলার গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে আসছে। তাছারা রণবিজয়পুর, পিলজংগ, বোলতলা, পয়ঃগ্রাম (কসবা) প্রভৃতিও খুলনার প্রসিদ্ধ স্থান। ফকিরহাটের আটটাকা গ্রাম খুলনার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সুবক্তা ও পার্লামেন্টারিয়ান খান এ. সবুরের জন্মভূমি।

খুলনা শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত চুকনগরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১এর ২০শে মে পাকবাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র প্রায় ৬ হাজার মানুষকে হত্যা করে। ভদ্রা নদীর পানি এ সকল মৃত ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত হয়। এরপর জীবনের ভয়ে পলায়নরত অনেক নিরীহ মানুষকে পাকবাহিনী ভারত সীমান্তের কাছাকাছি সাতক্ষীরার ঝাউডাঙায় গুলি করে হত্যা করে।

খুলনা শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত শিরোমনিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৪ই ডিসেম্বর হতে তিনদিন পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড ট্যাংক যুদ্ধ হয়। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ট্যাংক যুদ্ধের মধ্যে এটি অন্যতম। তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শিরোমনি একটি অত্যন্ত স্মরণীয় স্থান।

খুলনার প্রত্নসম্পদের ও প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলির যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। খুলনার প্রত্নসম্পদের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে এ অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবময় অবস্থার একটা ধারণা পাওয়া যায়। এগুলি যথাযথ সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সব সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকার ও জনগণের—সকলের। সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে গবেষণা চালিয়ে আরো প্রত্নসম্পদ ও ইতিহাসের অন্যান্য উপাদানের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা থেকে এ অঞ্চলের অতীতের কথা-অতীত মানুষের কথা-তাদের কর্ম প্রণালী তথা সভ্যতার কথা জানা যাবে, উদঘাটিত হবে প্রকৃত ইতিহাস।

সূত্রনির্দেশ

১। *A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan — Dr. S. M. Hassan.*

২। *যশোর খুলনা ইতিহাস — সতীশচন্দ্র মিত্র।*

৩। *সুন্দরবনের ইতিহাস — এ, এফ, এম, আব্দুল জলিল।*

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বামরাজনীতি : ১৯৭১-১৯৭৫

এ টি এম আতিকুর রহমান

এক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয় আওয়ামী লীগ এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩ বছর ৮ মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এ সময়কালে বাংলাদেশে বিভিন্ন বামদল ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালায় যার বেশিরভাগই ছিল সরকার বিরোধী। যদিও আওয়ামী লীগ শাসনকালের শুরুতে সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হলে তাতে সমাজতন্ত্রকে অন্যতম জাতীয় মূলনীতি হিসেবে স্থান দিয়েছিল তথাপি সে সময় দলটি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বেশিরভাগ বামদলের আস্থালাভে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েতপন্থী বামদলগুলো ব্যতীত সকল বামদলের কাছেই আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্রের বক্তব্য অসার প্রতীয়মান হয় এবং তারা অচিরেই সরকার বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তাঁদের এ তৎপরতা সমাজতন্ত্রের প্রচার ও লড়াইকে কতটুকু এগিয়ে নিল এ প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ হলেও সরকার পরিচালনার শুরু থেকে আওয়ামী লীগ যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তা বিনির্মাণে বেশিরভাগ বামদল যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

দুই

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে চীনপন্থী, সোভিয়েতপন্থী এবং তৃতীয় অন্য একটি ধারায় বামদলগুলো বিভক্ত ছিল।[১] এ তিন ধারার মধ্যে বিশেষ করে চীনপন্থীদের মধ্যে ছিল নানা রকমের উপদলীয় বিরোধ। নিজেদের মধ্যে এ রকম বিভক্তি সত্ত্বেও বামদলগুলো আলোচ্যকালের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল ব্যাপকভাবে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী), পূর্ববাংলার সাম্যবাদী দল (তোয়াহা গ্রুপ), পূর্ববাংলার সাম্যবাদী দল (নগেন গ্রুপ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেলিনবাদী), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি প্রভৃতি চীনপন্থী দল বা গ্রুপ এ সময় বাংলাদেশে সক্রিয় ছিল। এ সব দলগুলো আদর্শগত ও নেতৃত্বের প্রশ্নে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও আওয়ামী লীগ সরকারের

বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতা ছিল না। আওয়ামী লীগ স্থায়ী সরকার গঠনের আগেই তাদের অনেকে সরকারের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের অব্যবহিত পরে ভারত থেকে প্রবাসী অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকায় এসে নিজেদের বিপ্লবী সরকার হিসেবে ঘোষণা করলে তাদের অনেকে প্রচারপত্রের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সরকারের বক্তব্য প্রত্যাখান করে।[২] তাদের কেউ কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করেনি। কোন কোন উপদল ১৯৭৬ সালে চীন কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে পর্যন্ত পাকিস্তান ভিত্তিক বিপ্লবের লাইন অব্যাহত রাখে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নামেই কার্যক্রম চালায়।[৩] আবার কোন কোন উপদল আওয়ামী লীগ সরকারকে একই সঙ্গে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট এবং ভারত-রাশিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁবেদার সরকার হিসেবে চিহ্নিত করে বেছে নেয় সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন।[৪] গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাঁরা দেশব্যাপী চরম আতঙ্কাবস্থার সৃষ্টি করে।

চীনপন্থী বামদলগুলোর প্রায় সবকটি ছিল গোপন ও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। এসব দলের বেশিরভাগ মুক্তিযুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করায় ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল খুব সামান্যই। হত্যা, সন্ত্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে নাজেহাল করতে পারলেও গণআন্দোলন তৈরীতে তাদের পারঙ্গমতা ছিল না। চীনপন্থীদেব পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করেন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। মুক্তিযুদ্ধে মওলানার ভূমিকা অস্পষ্ট হলেও নেতিবাচক ছিল না। ফলে যুদ্ধের পরে গণ সম্পৃক্ততা পেতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। আওয়ামী লীগ শাসনের শুরুতেই তিনি ন্যাপকে সরকার বিরোধী দল হিসেবে পুনর্গঠিত করেন।[৫] ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর সরকার সমর্থকদের অত্যাচার, দ্রব্যমূল্য-দুর্নীতি-চোরাচালান বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়কে রাজনৈতিক ইস্যু করে ন্যাপ অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলনের সূত্রপাত করে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে ন্যাপের সরকার বিরোধী প্রচার ছিল ব্যাপক। ন্যাপের নেতৃত্বে এ সময়ে ১৪ টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন মিলিতভাবে গঠন করে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি। এ কমিটি সারা দেশে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা ব্যর্থতার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায়। সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী পালন করে সফল হরতাল।[৬] ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচনে কারচুপি-সন্ত্রাস ও সরকার পরিচালনায় নানা ব্যর্থতার দায় আওয়ামী লীগের উপর চাপিয়ে ভূখা মিছিল, হরতাল, অনশন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে মওলানা তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। তবে উপদলীয় তৎপরতা ১৯৭৪ সালের জুনে তাঁর গ্রেফতার এবং গৃহবন্দী হওয়ার প্রেক্ষপটে এ আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তিন

সোভিয়েতপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) নামে কার্যক্রম চালায়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে দলটির সঙ্গে সিবিপি সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়। এ দলের সঙ্গে যৌথ কাজের মাধ্যমে 'দলটির ভেতরে প্রগতিশীল মতাদর্শকে সংহত' করাকে সিবিপি দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে।[৭] প্রায় অনুরূপ মনোভাব নিয়ে সোভিয়েতপন্থী অপর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফর) রাজনৈতিক তৎপরতা চালায়। ধারণা করা যায় সিবিপি ও ন্যাপের ভূমিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটিতে 'জাতীয় গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ের বিধান সংবলিত একটি রাজনৈতিক মডেল প্রস্তাব করে।[৮] এপ্রস্তাবের পরেই সিবিপি ও ন্যাপ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জোর চেষ্টা চালায়। ১৯৭২ সালের ২৯ মে আওয়ামী লীগকে নিয়ে দল দুটি গঠন করে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট।[৯] জোট গঠনে আওয়ামী লীগের আগ্রহ ছিল খুবই কম। দলটির প্রভাবশালী মহল দেশের সমস্যা-সমাধানে নিজেদের যথেষ্ট ক্ষমতাবান মনে করতো।[১০] তাই জোট গঠন সত্ত্বেও এ পর্যায়ে সিবিপি ও ন্যাপের ঐক্য প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এ পরিস্থিতিতে দল দুটি অচিরেই আন্দোলনে নামে এবং সরকারী ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা শুরু করে। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি সিবিপি'র সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষনের প্রেক্ষাপটে সিবিপি ও ন্যাপ সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ উত্থাপন করে আন্দোলনে নামে।[১১] চীনপন্থীরাও এ আন্দোলনে সমর্থন দেয়। তবু এ আন্দোলন বেশিদূর এগোয়নি। কারণ ২২ জানুয়ারির মধ্যেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সিবিপি ও ন্যাপ নেতাগণ আপস-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন।[১২]

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে সিবিপি ও ন্যাপ নেতাগণ মস্কোতে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এ বৈঠকের পর আওয়ামী লীগের সাথে দল দুটির ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। উক্ত বৈঠকে 'গণতান্ত্রিক ও জাতীয় শক্তির' সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।[১৩] এ সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশে ফিরে এসে দল দুটির নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের কাছে পুনরায় ঐক্যপ্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে দেশে সংকটাবস্থা তৈরীর প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব সোভিয়েতপন্থীদের ঐক্যপ্রস্তাবে সম্মত হন। ফলে এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ, সিবিপি ও ন্যাপের সমন্বয়ে গঠিত হয় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট।[১৪] জোট গঠনে দলীয় প্রধানের অনুমতি

থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের একাংশ বিষয়টিকে সুনজরে দেখেনি। তাই জোটবদ্ধ হয়েও সিপিবি এবং ন্যাপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তাঁদের সহ্য করতে হয় সরকারী বাহিনীর নির্যাতন।[১৫]

১৯৭৪ সালের প্রথম থেকে দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিভিন্ন বামদলের উগ্রকার্যক্রম, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নানা ধরনের সংকট শাসকদল আওয়ামী লীগকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এ সময় গণতান্ত্রিকভাবে বিরোধী শক্তিকে মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সংকটগ্রস্থ আওযামী লীগকে সিপিবি সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করার পরামর্শ দেয় এবং এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত প্রভাবিত দেশগুলোর সহযোগিতা পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করে।[১৬] ইতিমধ্যে সারা দেশে দেখা দেয় ভয়ানক বন্যা। বন্যার পরে দেশ কবলিত হয় দুর্ভিক্ষে। না খেতে পেয়ে মৃত্যু বরণ করে অসংখ্য মানুষ।[১৭] দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সরকার ব্যর্থ হয়। বিরোধীরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারী ব্যর্থতাকে প্রকট করে তুলে ধরে। সম্ভবত এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সরকার গণবিচ্ছিন্নতা অনুভব করে সিপিবি নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটালে সিপিবি আওয়ামী লীগকে সহায়তা দেবে বলে উপর্যুপরি উৎসাহ দিতে থাকে।[১৮] ন্যাপও (মোজাফর) অনুরূপ ভূমিকা নেয়।[১৯] এ পরিস্থিতিতেই আওয়ামী লীগ এগিয়ে যায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী দেশে কায়েম হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার। সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি দল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এক মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি এক আদেশে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল নামক দল গঠন করেন এবং নিজেকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।[২০] এ পর্যায়ে সিপিবি ও ন্যাপ নিজ নিজ দলের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে বাকশালে যোগ দেয়। আওয়ামী লীগ শাসনামলের এ পর্যায়ে দল দুটির স্বতন্ত্র কার্যক্রমের এখানেই ইতি ঘটে।

চার

চীন ও সোভিয়েতপন্থী ধারার বাইরে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সর্বহারা পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। মুক্তিযুদ্ধের পরপর বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের পুতুল সরকার হিসেবে অভিহিত করে সর্বহারা পার্টি দলের কার্যক্রম শুরু করে। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে অসম্পূর্ণ আখ্যায়িত করে দলটি অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়। দলটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত ও স্বাধীন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। খতম ও

উৎখাতের রাজনীতিতে সর্বহারা পার্টির কার্যক্রম ছিল অন্য যে কোন বামদলের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র, সংগঠিত ও আক্রমণাত্মক। আওয়ামী লীগ কর্মী-সংগঠকদের হত্যা, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বহারা পার্টি আওয়ামী লীগের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। এতে আওয়ামী লীগ তীব্র আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়। সরকারী রক্ষীবাহিনীর হাতে বিচারহীনভাবে মৃত্যুবরণ করে অনেক সর্বহারা কর্মী। সরকার প্রধান শেখ মুজিব নিজে সর্বহারা পার্টির সঙ্গে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[২১] প্রচণ্ড চাপের মুখে সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদার ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।[২২] পরে ৩ জানুয়ারি সরকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য এর পরেও সর্বহারা পার্টি দলের সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে বিকশিত হচ্ছিল বাম রাজনীতির একটি ধারা। স্বাধীনতার পরপর এ ধারার নেতৃত্বে ছাত্রলীগের রব-সিরাজ অংশ আলাদা সম্মেলন করে 'শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য' বলে ঘোষণা করে।[২৩] এঘোষণা ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ গঠনের পূর্ব আয়োজন। এর অব্যবহিত পরে প্রায় অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিভক্ত হয়। পরে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম এ জলিল এবং আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করে জাসদ।[২৪] জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জাসদ আওয়ামী লীগ সরকারকে বুর্জোয়া সরকার অভিহিত করে সরকার উৎখাতের সংগ্রামে লিপ্ত হয়।[২৫] ছাত্র সমাজ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিরাট অংশের সমর্থন থাকায় এক বছরের মধ্যেই জাসদ বাংলাদেশের বৃহত্তর বিরোধী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি দেশব্যাপী প্রার্থী মনোনয়ন দিলে সরকারী দলের সঙ্গে এ দলের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগ জাসদের প্রতি দমন নীতির আশ্রয় নেয়। জাসদও প্রতিরোধ দিবস, হরতালসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকে।[২৬] ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চে জাসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও-এর মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘেরাওকালে সরকারী বাহিনীর গুলিতে ১২ জন জাসদ কর্মীর মৃত্যু হয়। সরকারী হিসেব অনুযায়ী এ ঘটনায় মৃত্যু বরণ করে ৬ জন।[২৭] এ ঘটনার পর জাসদের উপর সরকারী নির্যাতন সীমাহীন বৃদ্ধি পায়। নতুন পরিস্থিতিতে জাসদ মাও সেতুঙ এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করে "দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, এখানে সংগ্রাম অর্থ যুদ্ধ আর সংগঠন মানে সেনাবাহিনী।"[২৮] এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাসদ দ্রুত গড়ে তুলে সশস্ত্র গণবাহিনী।[২৯] এ বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। এর

একটি শাখা সেনাবাহিনীতে সংগঠিত হয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে।[৩৩] সশস্ত্র গণবাহিনী গঠনের পর জাসদ গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সশস্ত্র তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তবে এ পর্যায়ে সংগঠনটি তেমন কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

পাঁচ

আলোচনায় লক্ষণীয় যে, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে চীনপন্থীদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। তাঁদের তত্ত্বগত বিভ্রান্তি এর মূলে দায়ী। প্রধানত এ বিভ্রান্তি তৈরী হয় চীন স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকার না করায়। তত্ত্ববিভ্রান্তির ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়েই তাঁরা সুসংগঠিত গণ-আন্দোলন তৈরীর আগে সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ নেয়। সত্য যে, এর ফলে সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত নবীন দেশ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় নানা প্রতিবন্ধকতা। তবে এতে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন-প্রয়াসে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হয় না।

সোভিয়েতপন্থীগণও কোন আদর্শিক ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করেছেন বলা যায় না। অনুমিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন না দিলে তাঁদের ভূমিকাও অন্য রকম হতো। কেননা আওয়ামী লীগের একক ক্ষমতার দম্ভে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এক পর্যায়ে তাঁরা যখন সরকার বিরোধিতা শুরু করেন তখন সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সে বৈঠকের সিদ্ধান্তানুযায়ী পুনরায় তাঁরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে গঠন করেন ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বের ভূমিকার সঠিক কোনো ব্যাখ্যা সমকালে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করা হয় নি। ফলে তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের আস্থা অর্জনও সম্ভব হয় নি।

প্রবন্ধের তৃতীয় ধারায় সর্বহারা পার্টি ও জাসদের রাজনীতি আলোচিত হয়েছে। শুরু থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন অনুসরণ করে সর্বহারা পার্টি যে ভুল পথে পরিচালিত হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য তা সৃষ্টি করেছিল মারাত্মক বিপর্যয়। স্বাধীনতার পরে 'পূর্ব বাংলাকে মুক্ত ও স্বাধীন' করার লাইন কোনো বিবেচনায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সময়ে দলকে গণ আন্দোলনের পথে পরিচালিত না করে, গণ-অভ্যুত্থানের অনুকূল ক্ষেত্র না বানিয়ে 'খতম ও উৎখাতের' রাজনীতি সরকারের সামনে কেবল প্রতিবন্ধকতার দেয়ালই নির্মাণ করেছিল, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কোন অগ্রগতি হয় নি। জাসদের ভূমিকাও ছিল প্রায় অনুরূপ। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে চমক সৃষ্টি করলেও বৈজ্ঞানিকভাবে দল গঠন না করে 'সংগঠন মানে সেনাবাহিনী' ঘোষণা দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ধাবিত হওয়ায় এ দলটিও রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ

হয়। এভাবেই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেও বামদলগুলো মূলত ব্যর্থতার বৃত্তেই ঘুরপাক খায়। তাঁদের কার্যক্রম শাসকদল আওয়ামী লীগকে চরম সংকটে নিপতিত করলেও সমাজতন্ত্রের রাজনীতি প্রসারে তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি। ফলে সব ব্যর্থতার দায়ভার বহন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সূত্র নির্দেশ

১। লরেন্স লিফশলৎস, অসমাপ্ত বিপ্লব তাহেরের শেষ কথা (মুনীর হোসেন অনুদিত), কর্ণেল তাহের সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৪০।

২। রেজোয়ান সিদ্দিকী, কথামালার রাজনীতি, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ৩।

৩। আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন, তলস্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৭০।

৪। জগলুল আলম, বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, ১৯৪৮-৮৯, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা,১৯৯০,পৃঃ ৭২-৭৩।

৫। ভ্লাদিমির পুচকভ, বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক গতিধারা, ১৯৭১-১৯৮৫ (অভিজিৎ পোদ্দার ও অন্যান্য অনুদিত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ১০।

৬। জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩।

৭। ভ্লাদিমির পুচকভ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯।

৮। গোলাম হোসেন (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ১৭১।

৯। রেজোয়ান সিদ্দিকী,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪।

১০। ভ্লাদিমির পুচকভ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।

১১। রেজোয়ান সিদ্দিকী,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬-১৭।

১২। ঐ, পৃঃ ১৯।

১৩। ভবানী সেনগুপ্ত, মস্কো এন্ড বাংলাদেশ; প্রবলেম্স অব কমিউনিজম, ভল্যুম-২৪, নং ২ (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৫), পৃঃ ৬৩, গোলাম হোসেন (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত পৃঃ ১৭১।

১৪। আজিজ আহমেদ, 'সাপলিমেন্ট রিমার্কস', মান্থলি রিভিউ, ভল্যুম, ২৬, নং ৮ (জানুয়ারি, ১৯৭৫), পৃঃ ৩৬-৪৫। গোলাম হোসেন (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১।

১৫। জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।

১৬। গোলাম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১।

১৭। ভ্লাদিমির পুচকভ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।

১৮। রেজোয়ান সিদ্দিকী, পৃঃ ১৫।

১৯। ঐ।

২০। ঐ পৃঃ ৪৬।

২১। জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯।

২২। আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৬২।

২৩। কাজী জাওয়াদ, 'জাসদের রাজনীতি', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, পৃঃ ২৭।

২৪। জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।

২৫। নজরুল ইসলাম, জাসদের রাজনীতি — একটি নিকট বিশ্লেষণ, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ৯।

২৬। ঐ, পৃঃ ১০।

২৭। জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

২৮। নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

২৯। ঐ।

৩০। জগলুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ঃ ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা

আবুল কাশেম

১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে ঐ সংগঠনের কিছু সংখ্যক বাংলাভাষী নেতা ও কর্মী ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। কালক্রমে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকালীন পশ্চাদপদ নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করে পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই মূলত সমগ্র বাঙালী জনগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭১ সাল নাগাদ আওয়ামী লীগ নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উন্মেষ ঘটায়। ফলে পাকিস্তানের শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ শতকে চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল বক্তব্য দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আওয়ামী লীগ অন্যতম রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নেতৃবৃন্দ নিহত হন এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর ১৯৭২ সালে সংবিধানে সন্নিবেশিত অন্যান্য রাষ্ট্রাদর্শের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতারও পরিবর্তন ঘটানো হয়। ফলে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেলে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি চর্চার ক্ষেত্রে ক্রমাগত নতুনতর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সাংগঠনিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই সংগঠনের ঢাকাকেন্দ্রিক নেতা-কর্মীরা আওয়ামী মুসলীম লীগ নামে একটি নতুন 'মুসলিম লীগ' গঠন করেন। তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে এটা হয়তো একেবারে বেঠিক নয়। কিন্তু শুধুমাত্র সাংগঠনিক সমস্যা এবং নেতৃত্বের কলহের কারণেই আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং এই রাজনৈতিক দল গঠনে মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের একাংশের ইতিবাচক ভাবাদর্শিক রূপান্তর কাজ করেছিল। ১৯৪০-এর দশকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব রক্ষণশীল

ও মোল্লাতান্ত্রিক এবং অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক ও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী- এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প পূর্ব থেকে ক্রমাগতভাবে রক্ষণশীল ধারাটি মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ডের আশীর্বাদপুষ্ট হতে থাকে। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে উদারনৈতিক ও পাশ্চাত্যপন্থী নেতাকর্মীদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ গঠনের মূলে মুসলিম লীগের সাথে আদর্শগত বিরোধ থাকলেও আওয়ামী লীগ (জনগণের লীগ) কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ (জনগণের মুসলিম লীগ) নাম ধারণ করে। এ থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল মুসলিম লীগেরই একটি ভিন্নরূপ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারে বলা যায়, তথাকথিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং তার সাফল্য প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই জন্মলগ্নে পাকিস্তানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে ধর্মীয় উন্মাদনা বিদ্যমান ছিল তাতে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে 'মুসলিম লীগ' নাম ব্যবহার করে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবর রহমান নিজেও স্বীকার করেছেন, ''যে সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি 'সাম্প্রদায়িক' প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের ধর্মানুরাগের সুযোগে ইসলামকে হাতিয়ার করেই তার শাসন অব্যাহত রেখেছিল। জনগণও তখন লীগ সরকারের বিভ্রান্তি হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় আমাদের সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করা সম্ভব হলেও মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের মোকাবিলা করার কাজে তা ব্যর্থ হত।''[১] অর্থাৎ বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে টিকে থাকার জন্যই নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। একই কারণে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মুসলিম লীগবিরোধী ছাত্র সংগঠন গঠন করার সময়ও 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[২]

বস্তুত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাছ থেকে সংগঠনভাবে অথবা এর নেতাকর্মীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা আশা করা উচিৎ নয়। এই রাজনৈতিক দলের 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া মেনিফেষ্টো' শীর্ষক প্রথম দলিলটি রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মের নানাবিধ নির্দেশনায় পরিপূর্ণ। এতে মানুষকে প্রথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য 'ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয় জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের' বলে বর্ণনা করা হয়। এই দলিলে রাষ্ট্রকে খেলাফত হিসেবে উল্লেখ করে আরো বলা হয়, 'খেলাফত হিসেবে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইবে আল্লার উপায় ও পদ্ধতি

অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষ মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা।'[৩] এই বক্তব্য দ্বারা সকল ধর্মের তথা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের এই দলিলে 'দারুল ইসলাম', 'রব', 'রবুবিয়াত', 'রব্বানিয়াত' ইত্যাদি ইসলাম শব্দের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। তবে পাকিস্তানকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করে এবং আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের আধার হিসেবে গণ্য করে তার প্রতিনিধি জনগণকে এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়।[৪] এইভাবে সাংগঠনিক যাত্রার সূচনাকালে আওয়ামী লীগের ধারণায় রাষ্ট্রের এক প্রকার ধর্মীয় আবরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তথাপি রাষ্ট্র ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক নিম্নোক্ত বক্তব্য আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনায় গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা দরকার ঃ

> আধুনিক যুগে ধর্ম হলো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার এবং এটা শুধু আল্লার অস্তিত্ব এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ধর্মের আওতার বাইরে। বর্তমানে বস্তু জগৎ হতে সম্পর্কহীনভাবে ধর্ম নিছক পারলৌকিক বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ব্যাপার। ইহকাল রাষ্ট্রের উপর এবং পরকাল ধর্মের উপর ন্যস্ত। ব্যক্তি জীবন স্রষ্টার এবং সমাজ জীবন রাষ্ট্রের, ধর্মের এইরূপ ধারণা এবং অর্থই এখন বিশেষ প্রচলিত এবং সার্বজনীন।[৫]

পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির মূল ভিত্তিই এই উক্তির মধ্যে নিহিত। প্রতিষ্ঠাকালে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে যুগবৈশিষ্টকে অতিক্রম করতে না পারলেও পরবর্তীকালে সকল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচীতে ধর্মীয় রং ক্রমান্বয়ে ধূসরতর হতে থাকে। আওয়ামী লীগ সর্বোতভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, ভাষা আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিসম্পন্ন আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্টের landslide বিজয়ে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগেরই সদস্য ছিল ১৪০ জন।[৬]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে উদারনৈতিকতার পরশ লাগে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত সাংগঠনিক রিপোর্টে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংগঠিত দাঙ্গাকে গণআন্দোলনকে ব্যহত করার গণ-দুষমনদের একটি হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এ সম্বন্ধে আরো বলা হয়, 'এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া। মানুষের এই চেতনাই ১৯৫০ সালের দাঙ্গার শিক্ষা।'[৭] পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ভারত পাকিস্তান বিরোধ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ এই সকল নেতিবাচক ইস্যু বর্জন করে সংগঠনকে ঐতিহাসিকভাবে অগ্রসর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।[৮]

১৯৫৩ সালেই দেশের অধিকাংশ লোক বিশেষত কর্মীদের বহুলাংশ প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক করার জোর দাবীর[৯] প্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করা হয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ১৯৫৫ সালে এ বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে।[১]

আওয়ামী লীগের এই সকল রূপান্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের সরকারের ক্রিয়াকলাপে ইসলাম ও মুসলমানিত্বের প্রাবল্য সম্বন্ধে কিঞ্চিত ধারণা থাকা দরকার। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে গণপরিষদে যে আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাতে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। কেবল মাত্র আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, 'ইসলামিক অনুশাসনের ভিত্তিতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা', 'কোরান ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা' ইত্যাদি ছিল আদর্শ প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ দিক।[১১] আবার নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে ১৯৫৪ সালে সংবিধান সংক্রান্ত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত গণপরিষদে গৃহীত হলে তাতে 'একদিকে পাকিস্তানের জন্য পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা চালুর পক্ষে মত দেওয়া হয়, অন্যদিকে শরিয়তবিরোধী কোন আইন গ্রহণ না করার দাবী মেনে নেওয়া হয়। কোন আইন শরিয়তবিরোধী কিনা তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় পাঁচ সদস্যের একটি উলেমা বোর্ডকে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যার পরিবর্তে উলেমাদের নিয়ে একটা এক্সট্রা পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করার অর্থ ছিল দেশের সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ও অনগ্রসর একটি গ্রুপের হাতে দেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে চূড়ান্ত ভোট দেওয়ার অধিকার অর্পণ করা।'[১২]

দেশের সরকার, রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এই ধর্মীয় উন্মাদনাময় পরিবেশে আওয়ামী লীগের নতুন নামকরণের মাধ্যমে উদার ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোন বিরোধিতা করেনি। সম্ভবত ইসলামী

প্রজাতন্ত্রের ধারণার বিরোধিতা করলে আওয়ামী লীগ ব্যাপক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হত এই আশঙ্কায় তারা এ বিষয়টি হালকাভাবে গ্রহণ করেন।[১৬]

১৯৬০-এর দশক আওয়ামী লীগের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকে আওয়ামী লীগ বাঙালীদের স্বাধিকার আদায়ের প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও তেজোদীপ্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় ভাস্বর শেখ মুজিবর রহমান এই সময় আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বে আসীন হন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় বারের ন্যায় ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও গ্রহণ করে। এই ঘোষণাপত্র ছিল নিরঙ্কুশভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা বিবর্জিত। প্রথম ঘোষণাপত্রে ইসলামের ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়ে পাকিস্তানকে দারুল ইসলামে পরিণত করার কথা বলা হয়। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোন উচ্চারণই ছিল না। বরং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের নীতি গ্রহণ করা হয়। এতে সুস্পষ্টভাবে জাতীয়করণ নীতির উপর জোর দিয়ে প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হয়।[১৭] ১৯৬৪ সালেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাড়িয়ে প্রথম তাদের আস্থা অর্জনের সুযোগ লাভ করে। ষাটের দশকের আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে পরিচালিত সকল আন্দোলনের চরিত্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। এই সকল আন্দোলন সকল ধর্মের মানুষকে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় একাত্ম করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যাভিসারী করেছে। ১৯৭৯ সালে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে আইউব খানের পতনের পর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৯৬২ সালের আইউবীয় সংবিধানের একটি খসড়া সংশধনী প্রস্তুত করা হয়। এতে সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন করা হলেও পাকিস্তানে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীর রাষ্ট্রপতি না হওয়ার বিধান এবং রাষ্ট্রের ইসলামী রিপাবলিকের বিষয়টি অক্ষুন্ন রাখা হয়।[১৮] বিষয়টি যেকোন গবেষক-পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। কিন্তু পাতি বুর্জোয়া ধারার একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দৃষ্টি ছিল সাধারণ নির্বাচনের দিকে।

নির্বাচনী রাজনীতির কারণেই সম্ভবত আওয়ামী লীগ প্রায় ৮০% মুসলমানের দেশ পাকিস্তানে সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের নাজুক ধর্মীয় অনুভূতির কথা চিন্তা করেই ধর্মীয় বিষয়ে কোন র‍্যাডিকাল বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকে। বাস্তবিক অর্থে পাকিস্তানে ধর্মকে পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নজির বহু পুরাতন। তাই ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের আক্রমণকে আড়াল করার জন্য জাতীয়তাবাদী এলিটরা কোরান ও সুন্নাহর পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করার অঙ্গীকার করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার '২১-দফায়' এই ঘোষণামূলক অঙ্গীকারের স্থান না হলে মওলানা

ভাসানীর নির্দেশে শিরোনামের নিচেই এই 'নীতি' স্থান পায়।[১৬] বাঙালির দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রমণের পরও ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ একই কৌশল গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগের ঘোষণা অথবা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাষণেও এই বিষয়টি প্রকটিত হয়।[১৭,১৮]

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এগুলি বুর্জোয়া ধারার রাজনীতির একটি নির্বাচনী বক্তব্য। তবে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে কখনই দলীয় ভাবাদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। অবশ্য এই দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমানাধিকারের রক্ষাকবচের কাজ করেছে। যেমন, ১৯৭০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচীতে বলা হয়,

> শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হইবে এবং সকল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। আইনের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমমর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হইবে এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হইবে। সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম আচরণ, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারেও তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।[১৯]

বস্তুত ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণার সাথে বাঙালীর মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। তারা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে পাকিস্তানী হিসেবে নয় বরং বাঙালী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, রাওয়ালপিণ্ডির পরিবর্তে ঢাকায় আত্মানুসন্ধান করে এবং পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় নিজের ঠিকানা ঘোষণা করে। 'জয় বাংলা' স্লোগানে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়। এই অবস্থায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালীরা ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র, এর আদর্শগত ভিত্তি, সাংবিধানিক ঘোষণা সবই অতীতে পরিণত হয়।

পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধের পরিবর্তে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি multi-religious society -র ধারণাকে ধারণ করে, যদিও বাস্তব রাজনীতির কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলীয় ভাবাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭১ সালে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষের চরম ত্যাগের বিনিময়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে আওয়ামী লীগ বিলম্ব করেনি। ১৯৫০-এর দশক থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত চেতনার উর্ধে থেকে আওয়ামী লীগ যে রাজনীতির অনুশীলন

করেছিল তার ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের চারটি মূল নীতির অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সমগ্র পাকিস্তান আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিপরীতে রাজনীতি করে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে বাস্তববোধের জন্ম হয় তা থেকেই আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, তাত্ত্বিক চর্চার মাধ্যমে নয় বরং আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। ১৯৭২ সালের জুনে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উপর আলোকপাত করেন।[২০]

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর গণপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির ব্যাখ্যাদানকালে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু একই কথা বলেন।[২১]

বাংলাদেশের সংবিধানের মুখবন্ধেই শুধু অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজিত হয়নি বরং সংবিধানের operative অংশেও এই নীতি কার্যকরী করার বিধান রাখা হয়। এ বিষয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষ সমিতি ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকবে না।"[২২]

এভাবে সাংবিধানিক আইনের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চর্চার পথ বন্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ সুগম করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারীতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতা চর্চাকারীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান শেখ মুজিব।[২৩]

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি আওয়ামী রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের বাইরে তেমন সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তবে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের সমালোচনার আঙ্গিক ছিল ভিন্নতর। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে পাকিস্তানের ভাবাদর্শিক ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত হলে সহজাত পাকিস্তানপ্রীতির কারণে দক্ষিণপন্থীরা বিপদাপন্ন হয়। ফলে সংবিধানে রাষ্ট্রাদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সন্নিবেশ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ৩৮ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হলে তাদের রাজনীতি

চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ভারতের চাপে আওয়ামী লীগ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে বলে মত পোষণ করেন। অথচ স্বয়ং ভারতীয় সংবিধানেই ১৯৭২-এর চার বৎসর পর ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সংযোজিত হয়।[২৪] এই অসত্য বক্তব্য প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হল রাজনীতিতে আওয়ামী লীগকে ভারতপন্থী হিসেবে ব্র্যাকেটবন্দী করে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা। বস্তুগত উন্নয়নের জন্য পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের জনচেতনা এবং সাংস্কৃতিক মানের দুর্বলতার কারণে এই প্রচারণা গুরুত্ব পায়। অপরদিকে বামপন্থীদের সমালোচনার ধারাটি বিপরীতধর্মী। আওয়ামী লীগের বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে তারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিই মনে করেন না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক পরিমণ্ডলে বাঙালি মুসলমানের জীবনাচরণে যে সকল সহজাত ধর্মীয় উপাদান কাজ করে সেগুলো পর্যন্ত উচ্ছেদ না করায় তারা সমালোচনা করেন। এরা পাশ্চাত্যের সেকুলারিজম অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করেন। ফলে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ইসলামের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় যোগদান, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রাখা, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসরদের প্রতি নমনীয় মনোভাব ও ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বলে সমালোচনা করা হয়।[২৫] বস্তুত বামপন্থীরা আওয়ামী লীগের ব্যাখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে সকল ধর্মের সমান মর্যাদা, কিংবা অসাম্প্রদায়িকতা মনে করেন না। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে ইহজগত সচেতনতা, ধর্মের বিরাষ্ট্রীয়করণ বা ব্যক্তিগতকরণকে বুঝেন।[২৬] কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতায় এ ধরনের পাশ্চাত্যের বাস্তবতায় প্রয়োগযোগ্য যান্ত্রিক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি যে বাংলাদেশের মত ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য বাস্তবোচিত ছিল তা প্রমাণিত হয় ১৯৭৫ সালের পর। ১৯৭৫ সালের আগস্টএক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হন। এর তিন মাস পর মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ মুক্তিযুদ্ধের চার পুরোধা নেতৃত্বকে জেলখানার অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়। এর পর থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের দক্ষিণমুখী ভাবাদর্শিক যাত্রা। এই অব্যাহত যাত্রায় দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তবে সবচেয়ে ক্ষতি হয় ধর্মনিরপেক্ষ নীতির। ১৯৭৫ সালের রক্তক্ষয়ী ও রাষ্ট্রাদর্শবিনাশী ঘটনাবলীর প্রধান রাজনৈতিক বেনিফিসিয়ারি হলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই মূলত সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও পূর্বকথিত ৩৮

অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়। পরে ক্ষমতায় থেকে তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দলে ১৯৭৫-পূর্বকালের বহু বামপন্থী বিপ্লবী যেমন যোগদান করেন তেমন ১৯৭১-এর আগের পাকিস্তানবাদীরাও যোগ দেন। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিনষ্ট হয়ে বিপ্রতীপ আদর্শের লোকদের নিয়ে ভারসাম্যের রাজনীতি শুরু হয়। এই বিপ্রতীপ আদর্শের লোকেরা পূর্বেও আওয়ামী লীগ বিরোধী ছিলেন ভারসাম্যের রাজনীতিতেও তারা আওয়ামী লীগ বিরোধী নতুন এক রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলেন। সংবিধানে সন্নিবেশিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতি এই নতুন ধারার হাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৭৬ সালের ১লা মে সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান চীনপন্থীদের একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে অবাধে ধর্মকর্ম পালন করতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। এর মাত্র দুদিন পরে সামরিক ফরমান বলে স্থগিত সংবিধানের ৩৮ ধারাটি বাতিল করা হয়। ফলে ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়।[..] এই সময় বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের মূল নিয়ন্তা ছিলেন জিয়াউর রহমান। জিয়া ও সায়েমের যৌথ প্রশাসন ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ কোলাবোরেটর্স আদেশ বাতিল করে দেয়।[..] ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল কোন কারণ ছাড়াই সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রাধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরদিনই নতুন রাষ্ট্রপতি গণমনে অসন্তোষের দোহাই দিয়ে অধ্যাদেশ জারী করে ১৯৭২ এর স্থগিত সংবিধানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করেন। এই সংশোধনীতে সংবিধানের শিরোনামের নীচে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এই আরবী শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশ করা হয় এবং চার রাষ্ট্রাদর্শের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা পরিবর্তন করে তদস্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়।[..] জিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের অধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া জেনারেল এরশাদের আমলে ত্বরান্বিত হয়। এরশাদও সামরিক আইন জারী করে হুবহু জিয়ার পদাংক অনুসরণ করে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং রাষ্ট্রের দক্ষিণমুখী পদযাত্রাকে দৌড়ে পরিণত করেন। তিনি ১৯৮৮ সালের ৭ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী দ্বারা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সংশোধনীতে 'অন্যান্য ধর্মও শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে' বলে ঘোষণা থাকলেও এই রাষ্ট্রধর্মের বিধান দ্বারা রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের hegemony প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের ফলে রাষ্ট্রের চোখে নাগরিকরা আর নাগরিক নয় বরং তারা মুসলমান নাগরিক, হিন্দু নাগরিক ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সকল ধর্মাবলম্বীদের সমানাধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের স্বাধীনতা উত্তর বাঙালীর প্রত্যয় পর্যুদস্ত হয়। ১৯৭৫-পরবর্তী সরকারসমূহের উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির চেহারা

কি হয়েছে তা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরির নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণে ঃ

> পঁচাত্তরের রক্তাক্ত ঘটনা রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাতস্বরূপ। ক্ষমতায় আরোহণের প্রক্রিয়ায় জিয়াউর রহমান বামপন্থীদের উগ্র অংশের এবং দক্ষিণপন্থীদের সকল মহলের সমর্থন পান; এবং ক্ষমতায় আরূঢ় অবস্থায় তিনি যে তাঁর নির্ভরের বন্ধু কর্ণেল তাহেরকে হত্যা করেণনতাতে বোঝা যায় যে, তাঁর পথ বামদিকে নয়, প্রসারিত ছিল দক্ষিণমুখো। জিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা যে ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী ছিলেন সেটা সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে তিনি যে সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো আনেন সেখানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। পরে এরশাদ এসে আরোও এগিয়ে গেছেন, তিনি রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের প্রবর্তন করেছেন। পাকিস্তানী রাষ্ট্র ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বাঙালীরা জানতো যে ঐ রাষ্ট্র তাদের মিত্র নয়, শত্রু বটে; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। অজান্তে হলেও। কিন্তু এখন যখন রাষ্ট্রকে মানুষ জানে মিত্র হিসেবে তখন রাষ্ট্রের ধর্মানুগত্য তাদেরকে বিপদে ফেলেছে।[৬০]

এভাবে ১৯৭৫ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ তার দীর্ঘ দিনের লালিত ও অর্জিত আদর্শগুলো বিনষ্ট হওয়া অবলোকন করে। পঁচাত্তরের পূর্বে যে সকল বামপন্থী আওয়ামী লীগের নীতিসমুহের সমালোচনামুখর ছিলেন তাদের অধিকাংশ বামপন্থী ও ইহজাগতিক চেতনা ত্যাগ করে সামরিক শাসকদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের বৈধকরণ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে। বামপন্থীদের স্বপক্ষ ত্যাগে একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়ার পাল্লা ভারী হয় তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ অঙ্গন শূন্য হতে থাকে। ১৯৯০ সালের পর এই প্রবণতা তীব্রতর হয়। ১৯৯১ সালের পর থেকে তাই আওয়ামী লীগাররা নতুন করে যেন 'মুসলমান হওয়ার' প্রতিযোগিতায় নামেন। তাঁরা ঘন ঘন মক্কায় হজব্রত পালন করতে যান, নামের আগে আলহাজ বা হাজি সংযোজন করেন, মসজিদে যান এবং মসজিদে যেতে অধস্তনদের অনুপ্রাণিত করেন। আগেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নীতিগতভাবে ধর্মবিরোধী বা ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ১৯৭৫-এর পর ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদীরা আওয়ামী লীগকে ইসলামবিরোধী হিসেবে যে প্রোপাগাণ্ডা চালায় তা মোকাবিলার জন্য আওয়ামী লীগাররা বিসমিল্লাহ বলাসহ চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে দৃশ্যমানভাবে সাচ্চা মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণিত করার প্রচেষ্টা চালান। আওয়ামী লীগারদেরকে এরকম করতে হচ্ছে সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে। পঁচাত্তর পরবর্তী বাস্তবতাই

তাদের জন্য এই বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আওয়ামী লীগ আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করেনি।

সূত্র নির্দেশ

১। *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫ সন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট*, পৃ.২৬।

২। বিস্তারিত দেখুন ঃ সায়েরা সালমা বেগম, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ছাত্রলীগ, ১৯৪৯-১৯৭১ ঃ মূলধারা পর্যালোচনা",(অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৩৯-৪৭)।

৩। *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের খসড়া ম্যানিফেষ্টো*, পৃ.৯।

৪। ঐ

৫। ঐ পৃ.১।

৬। *Rangalal Sen, Political Elites in Bangladesh* (Dhaka : UPL, 1986), p. 125.

৭। *পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন সাংগঠনিক রিপোর্ট ১৯৫৩ সাল*, পৃ.৩।

৮। ঐ, পৃ.৪।

৯। *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ*, পৃ.২১।

১০। *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫ সন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট*, পৃ.২৬।

১১। ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, (ঢাকা সময় প্রকাশন, ১৯৯৯) , পৃ.৪৭।

১২। হাসান ফেরদৌস, 'ঠেকাতে হবে এখনই'; *প্রথম আলো*, জানুয়ারী, ১৭, ২০০৪।

১৩ এ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দীর সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃ.৭০-৭১; এই বিষয়ে শেখ মুজিবর রহমানের মনোভাবের জন্য দেখুন, আনিসুজ্জামান, *ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম*, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯২ (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ.৭।

১৪। Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, (Dhaka : Academic Publisher, 1990), pp. 287-292.

১৫। এই খসড়া সংশোধনীর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Modud Ahmed, Bangladesh : *Constitutional Quest for Autonomy*, (Dacca : UPL, 1979), pp. 281-320.

১৬। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৬।

১৭। *Morning News*, June 8, 1970.

১৮। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পা), *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, (ঢাকাঃ বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৭৯), পৃ.১৪-১৫।

১৯। *ইত্তেফাক*, জুন ৭, ১৯৭০।

২০। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।

২১। ঐ পৃ.১১৮।

২২। এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, (ঢাকাঃ ইউপিএল,১৯৯৩), পৃ.২৭৩-২৭৪।

২৩। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫।

২৪। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, (কলকাতাঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী,১৯৯৩) পৃ.১৪৫-১৪৬।

২৫। বামপন্থী তাত্ত্বিক চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের অজস্র লেখায় এ ধরনের সমালোচনা আছে।

২৬। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদী*, (ঢাকাঃ ইউ. পি. এল., ২০০০) পৃ.৩২১।

২৭। এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৩-২৭৪; Ariticle 38 was omitted by the Second Proclamention Order No. III of 1976. See : The Constitution of the People Republic of Bangladesh [As modified upto 30th June, 1994). P. 28.

২৮। এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫।

২৯। ঐ পৃ.২৮৪; Golam Hossain, *General Ziaur Rahman and the BNP : Political Transformation of a Military Regime*, (Dhaka : UPL, 1988) p. 18.

৩০। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪-৩৩৫।

কক্সবাজার গণহত্যা ঃ
পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

বাঙালী জাতীর শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হলে প্রথমেই রাষ্ট্র ভাষা বাংলার প্রশ্নে পাকিস্তানের অংশ ভুক্ত পূর্ব বাংলার মানুষের আশা ভঙ্গ হয়। ভাষার দাবীর সাথে জাতীয়তার চেতনা জাগাতে সক্ষম হয় পূর্ব বাংলার জনগণ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত অত্যাচারের শেষ পরিণতি ছিল ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের আপামর জনগণ শ্রেণী চেতনা, জাতীয়তা সর্বোপরী স্বাধীকারের জন্য লড়াই করে। বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রান্তীয় জেলা কক্সবাজারের জনগণও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা হলে কক্সবাজারে আওয়ামীলীগ নেতা আবছার কামাল চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[১] মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে একই সময়ে রামু, উখিয়া, টেকনাফ, চকরিয়া, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া থানায় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ৩০মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটের ফুলতলীর যুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের পতন হলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ৫মে স্থল পথে ১১৫ টি গাড়ী নিয়ে কক্সবাজার শহরে প্রবেশ করে। এ সময়ে তারা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করে।[২] পাকবাহিনী কক্সবাজার শহর নিয়ন্ত্রণের পূর্বে মহকুমা সদর ও বিভিন্ন থানা আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের[৩] নিয়ন্ত্রণে ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আসনে (সদর আসন ব্যতীত) জেলার সবকয়টি আসনে আওয়ামীলীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে। ভৌগলিক ও অবস্থানগত কারণে এ এলাকার প্রতি পাকবাহিনীর দৃষ্টি ছিল খুবই দুরভিসন্ধিমূলক। কারণ পাকবাহিনী শহরে প্রবেশের অনতিপূর্বে বিভিন্নদলের নেতৃবৃন্দ শহরের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে কৌশলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময়ে মহকুমার সর্বত্র পাকবাহিনীর

সহযোগী হিসেবে শান্তি কমিটির নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠে।[৩] এদের[৪] প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মহকুমার বিভিন্ন থানায় মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে গণহত্যা শুরু হয়।

কক্সবাজার শহরের সী বীচ রেষ্ট হাউসে তারা প্রধান ক্যাম্প স্থাপন করে। UOTC ক্যাপ্টেন ফরহাদ ও ছাত্রনেতা সুভাষকে প্রথমেই এখানে পাকবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কক্সবাজার শহরের সী বীচ রেষ্ট হাউসে তারা নির্যাতন ক্যাম্প তৈরী করে। কক্সবাজার মহকুমার সন্তান না হয়েও ফরহাদ ও সুভাষ দেশ মাতৃকার তাড়নায় এখানে এসে সংগঠিত করেন মুক্তিকামী জনগণকে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে কক্সবাজারের ট্রেজারী লুটের ঘটনায় পাকবাহিনীর দালাল কর্তৃক অভিযুক্ত ফরহাদকে বন্দীকরে কারাগারে প্রেরণ করে। পাকবাহিনী কক্সবাজারে এলে শহরে অবস্থানরত মুজাহিদ বাহিনী উপঢৌকন হিসেবে ফরহাদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে। মে মাসের প্রথমেই ফরহাদকে সমুদ্র পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। তিনি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রে ভেসে যান। খুব কষ্টে তিনি সমুদ্র পথ ধরে অতি ভোরে খুরুস্কুল এসে একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তখন জনগণকে অনুরোধ করেন যাতে তাকে একটি নৌকা ভাড়া করে দেয়া হয়। কিন্তু পাকবাহিনীর দোসর আমির হামজা মাঝি তাকে কক্সবাজার নিয়ে আসে এবং পাক বাহিনীর হাতে পুনরায় হস্তান্তর করে। পরদিন সকালে ফরহাদকে হত্যা করার জন্য থানা থেকে বের করে নিয়ে আসলে তিনি থানা সংলগ্ন বদর মোকাম মসজিদে নামাজ আদায় করেন। হানাদার বাহিনী তাকে কস্তুরা ঘাট সংলগ্ন বাকখালী নদী বক্ষে নৌকায় তুলে পুনরায় রাইফেল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে।[৫] ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সুভাষ কক্সবাজার শহরে অসহযোগ ও প্রস্তুতি পর্বে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি মহকুমার প্রথম পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানোর ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হয়ত এ কারণেই পাকবাহিনী তার উপর চরম অসন্তুষ্ট ছিল। সুভাষ কক্সবাজার থেকে নৌ পথে নিজবাড়ি বাঁশখালী চলে যাবার সময় শান্তিবাহিনীর সদস্য মোহাম্মদ ওসমানী - BFDC ঘাট থেকে তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। পাকবাহিনীর কমান্ডার Capt. রিজভী ৬মে তাকে জীপের পিছনে বেঁধে অমানুষিকভাবে টেনে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত করে। পরে তাকে সী বীচ রেষ্ট হাউসে নিয়ে এসে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।[৬]

পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে হত্যাকান্ডের নির্মম শিকার মহেশখালী থানার জনগণ। ৬ মে পাকবাহিনী মহেশখালী উপস্থিত হয়। প্রথমে তারা মহেশখালী ঘাটে নেমেই দক্ষিণ রাখাইন পাড়ার বৌদ্ধ মন্দির জ্বালিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। গোরকঘাটা বাজারের বিমল চৌধুরীকে পূজামগ্ন অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। বড় মহেশখালীতে হত্যা করে মনোহরী দে, উমাচরন দে, যোগেন্দ্র শীল,

রাধারাম শীলকে। মনোহরী দে কে বাঁশঝাড়ের উপরে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে।[৮] গোরকঘাটা বাজারের চা দোকানদার সাধন চন্দ্র বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও পাক দোসরদের হাত থেকে রেহায় পায়নি। হত্যা তালিকায় সংযোজিত হয় চিত্ত বিশ্বাস, অতুল চন্দ্র পাল, উপেন্দ্রচন্দ্র পাল। মুক্তিকামী দৃঢ়চিত্তের অধিকারী কমল সাধুকে চাকু দিয়ে হত্যা করে পাক বাহিনীর দোসর মৌলানা আলী আহমেদ। কম্পাউন্ডার যোগেশ চক্রবর্তী পেশাগত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে আদিনাথ পাহাড়ের পার্শ্বে তাকে হত্যা করে চৌকিদার আমির চাঁদ।[৯]

পাকবাহিনী গোরকঘাটা বাজার অপারেশন শেষ করে থানা শান্তি পরিষদ রাজাকার ও আলবদরদের নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী টার্গেট নির্ধারণ করে, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা দক্ষিণ হিন্দু পাড়া, ঠাকুর তলা, পুটি বিলার পালপাড়া, আদিনাথ মন্দির সহ বড় মহেশখালী হিন্দু পাড়া। কোন রকম উস্কানী ছাড়াই পাকবাহিনী এলাকার মৌলবাদী এবং উগ্রভাবপন্থী দোসরদের সহায়তায় আক্রমণ চালায় গোরকঘাটার দক্ষিণ হিন্দু পাড়ার মাতব্বর পরিবারে। পাকবাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে নির্মম হত্যার শিকার হয় ৯ জন।[১০] জল জল বলে চিৎকাররত মৃত্যুপথ যাত্রীদের রাইফেলের বাটের আঘাতে হত্যা করে। অনেক গুলিবিদ্ধ আহতদের পাশের নালায় মাটি চাপা দিয়ে জীবন্ত কবর দেয় এবং আহত ও পলায়নরত অনেককে ধরে এনে দাড় করে গুলি করে। জ্বালিয়ে দেয় পুরো গ্রাম।[১১] হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয়স্থান আদিনাথ মন্দিরকে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্গ মনে করে মেশিনগানের গুলি দিয়ে ধ্বংসকরে দেয় পাকবাহিনী। মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণকারী ২১ জনকে[১২] বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ঠাকুরতলা রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষুসহ ৪ জন পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এখানে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অনেককে গর্তে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করে। পুটি বিলার হিন্দু অধ্যুষিত পালপাড়া অপারেশনে পাকবাহিনী নির্মম ভাবে হত্যা করে ১৯ জন মুক্তি কামী নিরীহ জনগণকে।[১৩]

এ হত্যাকান্ডের সময় ২ জন রমনী স্বামীদের বাঁচাতে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলে তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়। শহীদ বদন পালের স্ত্রী বাসনী এবং শহীদ মনমোহন দের কন্যা প্রভারানী পাল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এ হত্যাকান্ড ছিল বিভীষিকাময়।[১৪] পাকবাহিনী পরবর্তী হত্যাকান্ড সংগঠিত করে ৭ মে তারিখে। এদিন তারা বড় মহেষশখালী হিন্দু পাড়া আক্রমণ করে ও আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। হিন্দু পাড়ার বৃদ্ধ সনাতন দের দোকান পুড়িয়ে দিয়ে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে। দেবাঙ্গাপাড়ার আওয়ামী পরিবারে সদস্য আবুল খাইর পিতা ঃ মৃত জলিল বকসু, মোহঃ জাফর পিতা ঃ জাহা বকসুকে লাইনে দাড় করে গুলি করে হত্যা করে।

নরপশুরা শামসুননাহার পিতা ঃ মুজাহের মিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[১৭] মুন্সীর ডেইলের আবদুছাত্তার পিতাঃ মোহাম্মাদুল হককে গুলি করে হত্যা করে।[১৮]

উখিয়া থানার পাকবাহিনীর হাতে ৭ মে শহীদ হন ইলিয়াছ মাষ্টার, ভট্ট মহাজন, আমানত উল্লাহ, দুদুমিয়া, আবুলহোসেন, ব্রজেন্দ্র শীল, যতীন্দ্র মোহন দে, মনীন্দ্র বড়ুয়া, নির্মল ধর।[১৯]

পাকিস্তানী বাহিনী কক্সবাজার শহরে প্রবেশের পূর্বে ২৭শে এপ্রিল অতর্কিতে চকরিয়া থানার চিরিঙ্গা হিন্দু পাড়া আক্রমণ করে। তারা আওয়ামীলীগ নেতা ও হিন্দুদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সময়ে নিহত হন মণীন্দ্র ও আবুল হোসেন। পাক বাহিনীর দোসররা ফাসিয়াখালীতে মহাজন বাড়ি লুট করে, যুবতী নারীদের ধর্ষণ করে এবং পিয়ারী মহাজনকে হত্যা করে।[২০]

মহকুমার প্রধান হত্যাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় সী বীচ রেষ্ট হাউস ও টেকনাফ রেষ্ট হাউস। মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে শান্তিপ্রিয় নারী ও পুরুষকে ধরে এনে সী বীচ রেষ্ট হাউসের দুটো কক্ষে বেধে রাখা হত। তাদের উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার। মেয়েদেরকে করা হত ভোগের পণ্য। এতে অস্বীকৃতি জানালে মেয়েদের স্তন কেটে নেয়া হত। বন্দীদেরকে নিজের কবর খুড়িয়ে গর্তের সামনে দাড় করে গুলি করে হত্যা করা হত। প্রতি রাতে ২/৩ জনকে মেরে ফেলা ছিল এখানকার রুটিন মাফিক কাজ। এখানে একসাথে মহিলা পুরুষ এগার জনকে হত্যা করা হয়।[২১] কক্সবাজার শহর, পার্শ্ববর্তী খুরুস্কুল সহ বিভিন্ন এলাকার লোকজন এখানে নিহত হন। তাঁরা হলেন এডভোকেট জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী, সতীশ মহাজন দে, নায়েক জোনাব আলী (যার মাধ্যমে কক্সবাজারবাসী সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ইপিআর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রথম অবগত হন), সিপাহী নুরুল আলম, নায়েব সবেদার আব্দুল লতিফ, সিপাহী মেছের আহমদ, সামসুল আলম, শশীকুমার বড়ুয়া, মাষ্টার শাহ আলম, মন্টু দাস, রঞ্জিত পাল। সী বীচ রেষ্ট হাউসের পিছনে পাতকুয়ার ভেতরে লোকজনকে জীবন্ত অথবা মেরে ফেলে দেওয়া হত। দেশ স্বাধীন হবার পর এ পাতকুয়া থেকে প্রচুর হাড়গোড়, মাথার খুলি, শাড়ি, ব্লাউস, শার্ট, লুঙ্গি, প্যান্ট, মেয়েদের চুল পাওয়া গেছে। তাছাড়া রান্না ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে প্রচুর রক্তের দাগ দেখা গেছে। রান্না ঘরের উত্তর পার্শ্বের কক্ষটি ছিল পাক হানাদারের নির্যাতন কক্ষ। বীরঙ্গনাদের এখানে বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন চালানো হত। বাঙালীদের দেয়া হত ইলেকট্রিক শক। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করত প্রতিদিন রাতে নিরীহ সহজ সরল বাঙালীদের রেষ্ট হাউসের সামনে সমুদ্র সৈকতের বালির স্তুপে অগণিত মানুষকে হত্যা করে গর্ত করে বালি চাপা দেওয়া হত।[২২]

টেকনাফ থানার ডাক বাংলোতে পাকবাহিনী তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম নির্যাতন ও হত্যা ক্যাম্প তৈরি করে। রামু, উখিয়া, হ্নীলা থেকে লোকজনকে ধরে এনে অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর থানাপরিষদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে গুলি করে হত্যা করা হত। গর্ত খুড়ে তার সামনে বসিয়ে জবাই করে গর্তের মধ্যে ফেলে তাদেরকে মাটি চাপা দিত। অনেককে অর্ধমৃত অবস্থায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হত। এখানে ২৫০ মত লোককে হত্যা করা হয়। কক্সবাজার মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত পাকসেনা কর্মকর্তা পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন আরিফ রিজভীর নির্দেশে ১৯ নভেম্বর চকরিয়া থানার অকুতভয় ছাত্রনেতা মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদকে এখানে ব্রাশ ফায়ারে নির্মম ভাবে হত্যা করে।[illegible] টেকনাফের গণ হত্যায় শহীদ হন মোহাম্মদ আলী, আমির হামজা, ক্যাপ্টেন মকবুল হোসেন, সামসুল আলম, হাবিলদার মেজর এজাহার মিয়া।[illegible]

পাকবাহিনীকে প্রতিহত করতে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ গোপনে বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অনেকে কৌশলে ভারতে পালিয়ে গিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকেন। বার্মায় অবস্থানকালে হাবিলদার আব্দুস সোবহানের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। তারা লামা, বান্দরবন, চকরিয়াসহ কক্সবাজার মহকুমার বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে পাকবাহিনীকে প্রতিহত করে। ফলশ্রুতিতে ১১ ডিসেম্বর পাক বাহিনী কক্সবাজার ত্যাগ করে। ১২ ডিসেম্বর কক্সবাজাব শত্রুমুক্ত হয়। এ সময়ে ভারতীয় মিত্রবাহিনী জাহাজযোগে বঙ্গোপসাগরের পথে কক্সবাজার অবতরণ করে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অগণিত শহীদদের সাথে কক্সবাজারের সাধারণ জনগণের অবদান অম্লান হয়ে রয়েছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। সাক্ষাৎকার, আবছার কামাল চৌধুরী, আহ্বায়ক সংগ্রাম পরিষদ, কক্সবাজার ২০ এপ্রিল ১৯৯৭ ইং।

২। সাক্ষাৎকার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ন্যাপনেতা, কক্সবাজার, ৫ এপ্রিল ১৯৯৮।

৩। ঐ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। নেতৃবৃন্দগণ হলেন, এড. জহিরুল ইসলাম, এ. কে. এম মোজাম্মেল হক, ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী, ডাঃ শামসুদ্দীন, এস. কে. শামসুল হুদা, শামসুল আলম চৌধুরী, জালাল আহমদ, ফজল করিম জমাদার বাদশা মিয়া, এম. এ. গনি, এ. কে. এম রফিক উল্লাহ, খায়েরুল্লাহ, অবিনাশ চন্দ্র দে, এড. মোস্তাক আহমদ, এড. নুর আহমদ (আওয়ামীলীগ), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোস্তাক আহমদ (ন্যাপ), কমরেড সুরেশ চন্দ্র সেন, (কমিউনিষ্ট পার্টি) কামাল হোসেন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, কৃষ্ণ প্রসাদ বড়ুয়া, ছুরত আলম, মোজাম্মেল, তৈয়ব উল্লাহ চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, সুনীল দে, সাকের আহমদ, আহমদ উল্লাহ, সিরাজুল মোস্তফা, আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ আলী, ফজল

করিম (ছাত্রলীগ), সুভাষ, রাখাল, সিরাজুল মোস্তাফা, ফয়জুল আজিম জেকব, দেবব্রত, আমিন, (ছাত্র ইউনিয়ন)।

৪। সাক্ষাৎকার, নরুল হুদা চৌধুরী, প্রাক্তন মুজাহিদ নোতা, কক্সবাজার, ৭ মার্চ, ১৯৯৩।

৫। প্রিয়তোষ পাল পিন্টু, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ, কক্সবাজার জেলা (অপ্রকাশিত), পৃষ্ঠা ৫৭ থেকে ৬০, এড. ছালামত উল্লাহ, মাওলানা আবু ছাবের, আবুল কাশেম মাষ্টার, নজির আহম্মদ, আবু বকর সিদ্দিক, বদিউল আলম মাষ্টার, আমির হামজা মাঝি, মকবুল আহমদ, আব্দুস ছালাম, আব্দুর রহিম মাষ্টার (কক্সবাজার সদর), আলি হোসেন মিয়া, মোহাম্মদ রশিদ বি. এ., মৌলভী জকরীয়া, হাজী আক্তার কামাল, আবুল হোসেন চেয়ারম্যান, ছালামতুল্লাহ খান, মৌলভী আমজাদ, মৌলভী রশিদ, শাহেদ মিয়া চৌধুরী, জালাল, আব্দুল আজিজ, ডাঃ সোলায়মান, গোলাম রসুল, হোসেন আহমদ, জিন্নাত আলী (মহেশখালী), নজির আহমদ চেয়ারম্যান, হাজী ছোট কালা মিয়া, হাজী ওমর মিয়া, হারেছ মেম্বার, মৌলনা ইব্রাহীম, ফজল আহমদ (টেকনাফ), মীর কাশেম চৌধুরী, মোক্তার আহমদ, আব্দুল করিম, ছাত্তার মিয়া, বুরুজ মেম্বার, আব্দুল আজিজ, কাজী সিরাজ, নরুল কবির, এড. শাহজালাল চৌধুরী, ডাঃ জহির উদ্দিন, শেখ শাহার উদ্দিন, হাশেম চৌধুরী, ফজল করিম বি.এ, সাকের আলী, কাজী সিরাজুলহক (উখিয়া), এড. মাঈদুর রহমান ওয়ারেচী, আজিজুর রহমান প্রকাশ লাল আজিজ, রুহুল কাদের চৌধুরী, আব্বাস আহমদ চৌধুরী, মোজাম্মেল হক চৌধুরী, এহতেশামুল হক চৌধুরী, মফজাল আহমেদ চৌধুরী (চকরিয়া), জালাল আহমদ চৌধুরী, ছালামত খাঁ, নুরুল আবছার, রফিক আহমেদ চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ সিকদার, মৌলভী উকিল আহমদ, আলী হোসেন, আবুল হোসেন ক্বারী (কুতুবদিয়া), ফজলকবির কোম্পানী, মোহাম্মদ আবদুল হক প্রকাশ হক সাহেব, জাফর আলম চৌধুরী, খুইল্যা মিয়া, জাকের আহমদ চৌধুরী, সোলতান আহমদ চৌধুরী, সামসুল ইসলাম চৌধুরী, কোরবান আলী (রামু)।

৬। খোরশেদ আলম, 'একজন বীরের মহাপ্রস্থান,' মুক্তি যুদ্ধের বিজয়, স্মারক গ্রন্থ, কক্সবাজার, ১৯৯২ পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখনেই।

৭। প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

৮। সাজ্জাদ জহির, 'মুক্তিযুদ্ধে মহেশখালী ঃ ইতিহাসের এক রক্তাক্ত দলিল', মুক্তিযুদ্ধে কক্সবাজার, ডিসেম্বর ১৯৯৯ পৃঃ ৮১।

৯। সাক্ষাৎকার, অজিতকুমার ভট্টাচার্য্য, গোরকঘাটা, মহেশখালী, ৫মে ১৯৯৮।

১০। প্রাগুক্ত, সাজ্জাদ জহির, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪, শহীদগণ হলেন শরৎচন্দ্র দে, পিতা প্রতাপ চন্দ্র দে, সুধীর চন্দ্র দে, পিতা ঃ প্রতাপ চন্দ্র দে, ননীগোপাল দে, পিতা ঃ যাত্রামোহন দে, হরিপদ দে, পিতা ঃ ঐ, বাশীরাম দে, পিতা ঃ ঐ, ফণীভূষন ভট্টাচার্য, পিতা ঃ শশাংক ভট্টাচার্য, কালু, পিতা ঃ জয় চন্দ্র দে, মণীন্দ্র শীল।

১১। সাক্ষাৎকার, অবিনাশ চন্দ্র দে, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা কক্সবাজার, ২০ মার্চ ১৯৯৫।

১২। প্রাগুক্ত, সাজ্জাদ জহির, পৃষ্ঠা ৮৫, শহীদগণ, ১. জতরাম দে, পিতা ঃ মেঘনাথ দে, ২ ধীরেন্দ্র, পিতা ঃ ঐ, ৩. সুন্দর রাম দে, পিতা ঃ মোহন চন্দ্র দে, ৪. বাবুল, পিতা ঃ বংশী, ৫. সোমত্ব, পিতা ঃ রজনী রাম দে, ৬. যতীশ, ৭. পরান, পিতা ঃ যতীশ, ৮. মিলধন, পিতা

ঃ যতীশ, ৯. সাধু রাম দে, পিতা ঃ ধনমালী, ১০. রসিক চন্দ্র দে, ১১. গুণধর, পিতা ঃ রমেশ চন্দ্র, ১২. হরিচন্দ্র, ১৩. জয়ন্ত কুমার, ১৪. মন্টু রাম দে, পিতা ঃ মোহন চন্দ্র দে, ১৫. সুধীর, পিতা ঃ অনুরুপ, ১৬. মণীন্দ্র বাইন্যা, ১৭. হরেকৃষ্ট, ১৮. অজিত কুমার দত্ত, পিতা ঃ ত্রিপুরা চরন দত্ত, ১৯. ভেককা, পিতা ঃ শ্রীমন্ত্র দত্ত, ২০. বাচাইয়া, পিতা ঃ শ্রীমন্ত্র দত্ত, ২১. হারাধন।

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৮৬। শহীদগণ ১ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতা ঃ নব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ২. মনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, পিতা ঃ কালী কুমার ভট্টাচার্য, ৩. কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, পিতা ঃ দিগম্বর পাল, ৪. ভূপেন্দ্র পাল, পিতা ঃ দিগম্বর পাল, ৫. ক্ষিরোধ চন্দ্র পাল, পিতা ঃ ষষ্ঠী চরন পাল, ৬. সতীন্দ্র পাল, পিতা ঃ তারক চন্দ্র পাল, ৭. বন্ধন চন্দ্র পাল, পিতা ঃ ঈশ্বর চন্দ্র পাল, ৮. সুমন পাল, পিতা মনিমোহন পাল, ৯. ব্রজেন্দ্রমোহন দে, পিতা ঃ প্রানকৃষ্ণ দে, ১০. প্রসন্ন কুমার পাল, ১১. মনোহরী দে, ১২. জগবন্ধু দে, ১৩. সুরেন্দ্র দে, ১৪. কৃষ্ণ চন্দ্র দে, ১৫. বাসনী পাল, স্বামী ঃ বদন চন্দ্র পাল, ১৬. প্রভা রাণী পাল, পিতা ঃ মনমোহন দে।

১৪। সাক্ষাৎকার, অজিত কুমার ভট্টাচার্য্য (৭০) পুটি বিলা, মহেশখালী, ২০ মার্চ ১৯৯০।

১৫। সাক্ষাৎকার, সাংসদ মোহঃ ইসহাক বি, এ, মহেশখালী - কুতুবদিয়া। ২৬ শে মার্চ১৯৯৬।

১৬। সাক্ষাৎকার, এ্যাডঃ সিরাজুল মোস্তাফা, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা, কক্সবাজার ২৬শে মার্চ ২০০১। শহীদ আব্দুস ছাত্তারের ভাইপো।

১৭। সাক্ষাৎকার, জনাব সমশের আলম চৌধুরী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা, কক্সবাজার ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৯।

১৮। ড. শামসুল আলম সাঈদ, 'চকরিয়ার শহীদ আব্দুল হামিদ', মুক্তি যুদ্ধের বিজয়, বিজয় দিবস স্মারক গ্রন্থ, কক্সবাজার ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ উল্লেখ নেই।

১৯। সাক্ষাৎকার, আব্দুল জলিল, পিতা ঃ জামাল হোসেন, নতুন বাহার ছড়া, কক্সবাজার, যুদ্ধ কালীন সময়ে রেষ্ট হাউজে বাধ্যতামূলক ভাবে কর্মরত, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

২০। মুহম্মদ আলী জিন্নাত, 'অযত্ন অবহেলায় কক্সবাজারের মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর স্থাপনা ও স্মৃতি চিহ্ন গুলো মুছে যাচ্ছে।' মুক্তি যুদ্ধে কক্সবাজারে, স্মারক গ্রন্থ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ: ৬৪।

২১। সাক্ষাৎকার, জলিল (মুচি)। টেকনাফ ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯, প্রত্যক্ষদর্শী, আলোচিত সময়ে উক্ত এলাকায় জুতা সেলাইয়ের কাজ করতেন। 'আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে চকরিয়া', মুক্তি যুদ্ধে বিজয়, বিজয় দিবস স্মারক গ্রন্থ, কক্সবাজার।

২২। প্রাগুক্ত, প্রিয়তোষ পাল পিন্টু। পৃষ্ঠা ঃ ৫০।

পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে (১৯৪৮-'৫২) 'আজাদ' - এর ভূমিকা

মোহাম্মদ জমালুল আকবর চৌধুরী

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য আগ্রহী করে তোলে। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক নিপিড়ীত-নিগৃহীত বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক ও একপেশে নীতির বিরুদ্ধে স্ব-স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬-এর ৬ দফা ও ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আরও পরে যখন ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভাবে জয়যুক্ত আওয়ামী লিগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি ও শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া খানের আলোচনা ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে। এদিকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে বাঙালিরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে নতুন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় নিশ্চিত করে।

১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে সর্বস্তরের বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার দেরীতে হলেও ১৯৫৬ সালে সরকার উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় স্বীকৃতি দেয়। আর এই আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রকাশে সে সময়কার সংবাদ সাময়িকীগুলোর নিষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোব মধ্যে আজাদ ছিল সবচাইতে এগিয়ে। আলোচ্য নিবন্ধে আজাদ এর উদ্ভব এবং ভাষা আন্দোলনে এই পত্রিকার ভূমিকা নিরূপণের চেষ্টা করা হবে।

আজাদ পত্রিকা ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর সর্বপ্রথম কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তখন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। আজাদ পত্রিকার নামের পরে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকতো 'মোছলেম বঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র'। পৃষ্টা সংখ্যা ছিল ৮। মূল্য ছিল দুই পয়সা। আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরত হয়। তখন নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তখন প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ১০ পয়সা।

প্রাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বেই ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। কাজী আবুল হোসেন "পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"-শীর্ষক এক লেখায় মন্তব্য করেন ঃ "রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাষাগত স্বাধীনতা পাওয়াও একান্ত প্রয়োজন। কারণ, নিজের ভাষাকে স্বাধীন ভাবে সবক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাতে মানুষের জীবনে যে পরম মুক্তির অনুভূতি জাগে, তাহা অন্য কোন ভাষার দ্বারাই পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে।[১] এজন্যই তিনি বাংলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এদিকে মোহাম্মদ আব্দুল হক "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"- শীর্ষক লেখায় উর্দুর বিরোধিতা করেন এজন্য যে -

> "পশ্চিম পাকিস্তান বা পূর্ব্ব-পাকিস্তান কোনো অংশেরই মাতৃভাষা উর্দ্দু নয় এবং যদিও সমগ্র ভারতে উর্দ্দুভাষীদের সংখ্যা অনেক তবু পশ্চিম বা পূর্ব্ব কোনো পাকিস্তানেই তাঁদের সংখ্যা বাংলাভাষীদের চেয়ে বেশী নয়। এবং ভাষাগত উৎকর্ষ ও সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে উর্দ্দুর চেয়ে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠতর। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দ্দুর দাবী বাংলার চেয়ে অনেক কম।"[২]

ইতিমধ্যে করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর বলপূর্বক উর্দ্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এ রকম একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমান আজাদ প্রতিনিধিকে ঐ রটনাকে নিছক বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস অভিহিত করে বলেন - "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে"।[৩] আবার ১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে ফজলুল হক মোছলেম হল মিলনায়তনে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য সচিব হবিবুল্লা বাহার বাংলা উর্দ্দু উভয়কে কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদানের প্রস্তাব করেন।[৪] এদিকে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাওয়াজা নাজেমুদ্দীনের নিকট বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন ঘোষণা দাবি জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বহু খ্যাতনামা কবি, শিল্পী, আইনজীবি, ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।[৫]

এভাবে রাষ্ট্রভাষার সম্পর্কে সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক ক্রমে সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করে। ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ তারিখে আজাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গতকল্য কয়েকজন মুসলমান যুবক "উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হউক" — শ্লোগান দিয়ে যখন বাসে করে পলাশী ব্যারাকের কাছে পৌঁছেলে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এতে ২০ জনের বেশি লোক

আহত হয়। কিন্তু এই ঘটনায় সরকার কোন রকম দুঃখ প্রকাশ না করে বরং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের শত্রুদের সতর্ক করে দওেয়া হয়।[৬]

'উর্দ্দু-বাংলা বিতর্ক' সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করলে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কুচক্রীর হস্ত'-শীর্ষক এক সতর্কবাণীতে পাকিস্তানের অখন্ডতা যেন হুমকির সম্মুখীন না হয় সেই জন্য আশা ব্যক্ত করা হয়।[৭] তাছাড়া আন্দোলনকারীদের পাকিস্তানের 'দুশমন' আখ্যায়িত করা হয়।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব বঙ্গের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্যদাদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু গণপরিষদ নেতা লিয়াকত আলীর ও প্রধানমন্ত্রী খাওয়াজা নাজেমুদ্দীনের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। গণপরিষদের ভাষা হিসাবে বাংলার অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা অসন্তুষ্ট হয়। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৬শে ফেব্রুয়ারী সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে। আবার আজাদ এর ২৯/০২/৪৮ তারিখে 'বাংলা ভাষার অপমান'— শীর্ষক শিরোনামে গণপরিষদে বাংলা ভাষার বিরোধিতাকারী সদস্যদের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়-

> ''পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পূর্ব হইতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ শুরু হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই বাদানুবাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করিয়া ছাত্র যুবক মহলে এই আশঙ্কা জাগে যে, পাকিস্তানে বাংলা ভাষা উপেক্ষিত হইবে। কিন্তু গণতন্ত্র বিশ্বাসী বুদ্ধিমান মানুষ এই আশঙ্কাকে অমূলক মনে করিয়াছিলেন। — কিন্তু পাক-গণপরিষদের সিদ্ধান্তে পূর্ব-পাকিস্তানের আশাবাদী বিদগ্ধ সমাজের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। পাক-গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে বাংলা গ্রহণ করার দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় এই আশঙ্কাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের ভাষা আজাদ পাকিস্তানে কোন স্থান পাইবে না এবং ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতি আশঙ্কাজনকভাবে ব্যহত হইবে।

এদিকে মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট থেকে বাংলা বাদ দিলে পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটি আগামী ১১ই মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৮] ১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে ১২ই মার্চ (১৯৪৮) তারিখে আজাদ-এর প্রতিবেদনে বলা

হয়, "অদ্য ঢাকায় বিভিন্ন সরকারী অফিসের সম্মুখে পুলিশের লাঠিচালনার ফলে বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাম এ. কে. ফজলুল হক সহ প্রায় ৫০ ব্যক্তি আহত হইয়াছেন।" এদিকে ১১ই মার্চের উদ্ভুত ঘটনা সম্পর্কে একই তারিখে পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে গোলযোগের জন্য ছাত্রদের দায়ী করা হয় ও পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রে গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্য সরকারের হস্তগত হইয়াছে বলা হয়।

এদিকে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজমের ঢাকায় আগমণ উপলক্ষে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকারের পক্ষে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদের মধ্যে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে "পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাকে উর্দুর সম-মর্যাদা প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা করিবার জন্য গভর্নমেন্টের তরফ হইতে পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন, রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি, সংবাদপত্র সমূহের উপর হইতে নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহার প্রভৃতি শর্ত অন্তভুক্ত ছিল।"

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯শে মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকায় আসেন। অতঃপর ২১শে মার্চ তারিখে (১৯৪৮) বিকালে রেডকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্ধনায় দীর্ঘ ৫০ মিনিট বক্তব্যে তিনি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেন ঃ

> "ভাষা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ করার জন্যই এই আন্দোলন করা হইয়াছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ন্যায্যভাবেই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং আমি আনন্দিত যে রাজনৈতিক ধ্বংসকারী অথবা তাহাদের দালালদের দ্বারা এই প্রদেশের শান্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে দমন করার জন্য তাঁহার গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ প্রদেশের সরকারী ভাষা বাংলা হইবে কিনা তাহা এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিই স্থির করিবেন। ...আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে, অন্য কোন ভাষা নহে। --- কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, যথাসময়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।"

অতঃপর ২৪শে মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কায়েদে আজমের সম্মানার্থে আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলেন ঃ

> "প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের জন্য এই প্রদেশবাসী তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন ভাষা গ্রহণ করিতে পারেন এবং এই প্রশ্নটি

> প্রদেশ-বাসীর অভিরুচি অনুযায়ী তাহারাই স্থির করিবেন। জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিগণ শান্ত ও সুস্থ মনে বিচার বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। তবে একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকিতে পারে এবং উহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্টের মধ্যে আদান-প্রদানের ভাষা হইবে এবং সে ভাষা উর্দ্দু ভিন্ন অপর কোন ভাষাই হওয়া উচিত নয়। সুতরাং উর্দ্দুই রাষ্ট্রভাষা হইবে।[১১]

রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির কর্ম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ২৪শে মার্চ ১৯৪৮ তারিখে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজমের এক সৌজন্য সাক্ষাৎ তারা বাংলাভাষা আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত বলে তাঁকে অভিহিত করে।[১২]

তথাপি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহে ২৮শে মার্চ ১৯৪৮ সন্ধ্যায় করাচি রওনার আগে পাকিস্তানের বেতারের ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বক্তৃতায় পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত হবে এরূপ আশা প্রকাশের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন।[১৩]

তবে পূর্ববঙ্গ বিধান-পরিষদের ৬ই এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাওয়াজা নাজিমুদ্দিন বাংলাকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৮ই এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখে তা সর্বসম্মত ভাগে গৃহীত হয়।[১৪] পরবর্তীতে ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঝিমিয়ে পড়ে এবং তাদের কর্মসূচী ১১ই মার্চ পালনের মধ্যে সীমবদ্ধ থাকে।

এদিকে মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গণপরিষদের নিকট পেশকৃত অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে ডর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে মর্যদাদানের সুপারিশ করা হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাকিস্তান সরকার গণপরিষদে রিপোর্ট সম্পকিত আলোচনা স্থগিত রাখেন। পরে ১৯৫১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হলে পরিস্থিতি বিস্ফোরণস্মুখ হয়ে পড়ে। প্রয়োজন ছিল একটি উপলক্ষ। সেই উপলক্ষও প্রস্তুত হয়ে যায় যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫২ সালে ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষা সম্পর্কিত মন্তব্যে বলেন ঃ

> "প্রদেশের ভাষা কী হবে তা প্রদেশবাসীই স্থির করবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।"[১৫] এই বক্তব্য বেতার যোগ্য প্রচারিত হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদে ২০শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় আহূত ছাত্র সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৬] ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ সম্পর্কে ৫ই ফেব্রুয়ারী এর *আজাদে* বলা হয়।

> "উর্দ্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষার প্রচলন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গতকল্য (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের সকল স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ ধর্মঘট পালন করেন। বেলা ১১ টা হইতে থেকে শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হন। জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীগণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন শিক্ষায়তনের পক্ষ হইতে ছাত্র বক্তাগণ পাকিস্তানের বৃহত্তম অংশ এই পূর্ব পাকিস্তানের নর-নারীর মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে এবং আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রবর্তন না করিতে দাবী করেন।
>
> সভার শেষে প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের বাসভবন হইয়া হাইকোর্টের দিয়া নওয়াবপুর রোড, পটুয়াটুলী, আমানীটোলা ও নাজিমুদ্দীন রোড অতিক্রম করে। ছাত্র-ছাত্রীগণ "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" আরবী হরফে বাংলা লেখা চলবে না"। প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণ করেন। শহরের বিভিন্ন জনপদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসেন"।[১৭]

৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশ থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে-সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।[১৮] কেননা পূর্ব বাংলা গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) তারিখে শুরু হবে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্রমাগত কর্মসূচীতে ভীত সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। এ রকম পরিস্থিতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখের কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সম্বন্ধে ৯৪, নবাবপুর রোড আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে "সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ" -এর বৈঠকে ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙা-না ভাঙার প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী গাজাউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও উপস্থিত ছাত্রদের চাপে ১৪৪ ধারা ভাঙার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙতে ছাত্ররা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ তাদের অনেকেই গ্রেফতার করলেও গাড়িতে করে নিয়ে ঢাকার বাইরে কিছু দূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু দুপুরের দিকে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ক্রমে সেখানে ছাত্রদের সংখ্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে পুলিশের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ফলে উভয় পক্ষে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের লাঠিচার্জ করলে ছাত্ররাও তখন আরও বেশী করে পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে।[১৯]

এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ অব্যহত থাকলেও বেলা তিনটায় পরিস্থিতির অবনতি হয়। এ সময় পুলিশের অনেক উর্দ্ধতণ কর্মকর্তা ও সরকারী আমলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার ছাত্রদের পিছু হটার জন্য বলা সত্ত্বেও ছাত্ররা পুলিশের দিকে এগিয়ে আসলে পুলিশ প্রথমে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। এতে কিছু ছাত্র মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের শেডে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অনেকে ফাকা আওয়াজ মনে করে শেড থেকে বের হয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের অনেকে গেটের দিকে এগিয়ে গেলে পুলিশ ছাত্রদের দিকে লক্ষ করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে তিনজন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়।[২০]

২২শে ফেব্রুয়ারী আজাদ-এর নিজস্ব রিপোটারের প্রেরিত সংবাদ প্রতিবেদনের শিরোনামগুলি ছিল ঃ

"ঢাকার মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

স্কুলের ছাত্রসহ ৬২ জন গ্রেফতার"

প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ঃ

"গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিকাল প্রায় ৪ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাউদ্দীন (২৬) ঘটনাস্থলে নিহত এবং বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। রাত্রি ৮টার পর তাহাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল জব্বার (৩০), আবুল বরকত (২৫) ও বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের

মালিকের পুত্র রফিকুদ্দীন আহমদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়েছে। —ঘটনার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরিষদ-ভবন এলাকায় সৈন্যবাহিনী মোতায়ন করা হয়। অধিক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদিগকে তথায় টহল দিতে দেখা যায়।[২১]

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখের *আজাদ*-এর আর একটি প্রতিবেদনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আহ্বানে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন বিক্ষোভ প্রদর্শনকরী ছাত্রদের উপর গুলি চালনা সম্পর্কে তদন্তের আশ্বাস দেন[২২] বলে জানা যায়।

২২ তারিখ ১৯৫২ *আজাদ* - এ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ঐ তালিকা অনুসারে নিহতরা হলেন ঃ ১) সালাউদ্দীন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), ২) আব্দুল জব্বার (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), ৩) আবুল বরকত (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) ও ৪) রফিক উদ্দিন (বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র)।

আর আহতরা হলেন ঃ ১) আনোয়ারুল ইসলাম (২৪), সলিমুল্লাহ মোছলেম হল, ২) এ. আর. ফৈয়াজ (১৯) জগন্নাথ কলেজ, ৩) সিরাজুদ্দীন খান (২২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪) আব্দুস সালাম (২৭), সরকারী শুল্ক বিভাগের পিয়ন, ৫) এম. এ. মোতালেব, ৬) এলাহী বকশ (৪০), ৭) মনসুর আলী (১৬). ৮) বছির উদ্দিন আহমদ (১৬), ৯। তাজুল এছলাম (১৯), ১০) মাছুদুর রহমান, ১১। আব্দুস সালাম (২২) ১২) আখতারুজ্জামান (১৯), ১৩) এ রাজ্জাক (১৭), ১৪) মোজাম্মেল হক (২৩), ১৫) সুলতান আহমদ (১৮), ১৬। এ রশিদ এবং ১৭) মোহাম্মাদ।[২৩]

প্রধানমন্ত্রী নরুল আমীন পরিস্থিতির ক্রমঅবনতিতে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[২৪]

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও হত্যাকান্ডের নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত বিবৃত্তি সমূহ *আজাদ* - এ প্রকাশিত হয়। মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের দাবী জানান।[২৫] ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখের *আজাদ* - এর সংবাদ প্রতিবেদনে শহীদদের 'গায়েবানা জানাজা' - শীর্ষক সংবাদে বলা হয় - "বেলা ২টায় উক্ত হল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয় এবং তাহাতে প্রায় চারি হাজার লোক যোগদান করেন। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, সলিমুল্লা মোছরেম হলের প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন।[২৬]

রক্তাক্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঘটনা যেমন আজাদ গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশ করেছিল তেমনি

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ঠিক ততোধিক প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালের আজাদ থেকে শহীদ স্মৃতি অমর রাখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা নিজেরাই একরাত্রের মধ্যে নিজেদের হোস্টেল প্রাঙ্গণে ১০ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া বিশিষ্ট একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে বলে জানা যায়।

২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় পশ্চিম পাকিস্তানেও বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের 'ইভনিং স্টার' ও 'ইভিনিং টাইমস' - দৈনিক পত্রিকাদ্বয়ও ঢাকায় সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের তদন্ত দাবির পাশাপাশি নিহতের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানায়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখের আজাদ থেকে জানা যায় যে করাচীর মেথরান হোস্টেলের ছাত্রগণ একতার যুগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামী কর্মীদের উপর পুলিশের গুলি চালনার তীব্র প্রতিবাদ ও শহীদ ছাত্রবৃন্দের আত্মীয় স্বজনের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন। এই ঘটনার তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষী শাস্তি বিধানের জন্য এই ভাবে সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয়।[২৭]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধীকার অর্জনের পথ পরিক্রমায় প্রথম আন্দোলন। আর এই ভাষা আন্দোলন বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে সকলেই অংশ নেয়। আজাদ পত্রিকা ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক সংবাদ, প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করলে গণমানুষের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি বাহান্নর এর একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আজাদ - পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখে পূর্ব পাক পরিষদের সদস্য পদে ইস্তাফা দেন। গর্ভনর ও পরিষদের স্পীকারের নিকট প্রেরিত পত্রে তিনি বলেন - "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থক - এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদুর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই দলের সহিত সংযুক্ত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।"[২৮] এজন্য ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা ও পুনর্গঠনে আজাদ পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য।

সূত্র-নির্দেশ

১। *আজাদ*, ২২-৬-১৯৪৭।
২। তদেব, ৩০-৬-১৯৪৭।
৩। *আজাদ*, ১১-১২-১৯৪৭।
৪। তদেব, ১৫-১১-১৯৪৭।

৫। *আজাদ,* ২২-৬-১৯৪৭।
৬। তদেব, ১৮-১১-১৯৪৭।
৭। তদেব, ২১-১২-১৯৪৭।
৮। *আজাদ,* ২২-৬-১৯৪৮।
৯। তদেব, ১৬-০৩-১৯৪৭।
১০। তদেব, ২২-০৩-১৯৪৭।
১১। তদেব, ২৫-০৩-১৯৪৮।
১২। তদেব।
১৩। বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ২০০৩, পৃ: ২৯০।
১৪। তদেব, পৃ: ২৯৩।
১৫। তদেব, পৃ: ৩১০।
১৬। তদেব, পৃ: ৩১৭।
১৭। "সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে" নরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ: ৩।
১৮। *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (১৭০৪-১৯৭০) প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৪৫৪।
১৯। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন* ও *তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, পৃ: ২৭৮-২৮৩।
২০। তদেব, পৃ: ২৮৪-২৯২।
২১। "সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে" তদেব, পৃ: ৮।
২২। তদেব, পৃ: ১১।
২৩। তদেব, পৃ: ১৩।
২৪। তদেব, পৃ: ২৪।
২৫। *আজাদ,* ২৩-০২-১৯৫২।
২৬। "সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে" তদেব, পৃ: ৪০।
২৭। তদেব, পৃ: ১৩৮।
২৮। তদেব, পৃ: ২৬।

সারাংশ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইস্যু ভিত্তিক একটি সমীক্ষা সন্দর্ভ পত্র

অজিত কুমার দাস

বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আটবার জাতীয় সংসদ নির্বচন এবং তিনবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচনের অধিকাংশই সামরিক শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রায় সব দলই তাতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই নির্বাচনগুলোতে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে দেশের প্রধান দুই দল আওয়ামীলীগ ও বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে মূল ইস্যু হিসেবে গ্রহণ না করে বরং সাংবিধানিক ও মতাদর্শিক বিতর্ক, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ইত্যাদিকে প্রধান ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ অন্যকথায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এর কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে। এই দুটি নির্বাচনেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সাংবিধানিক ও মতাদর্শিক বিতর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে বরং জাতীয়স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্টন, বেকার সমস্যার সমাধান ইত্যাদিকে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সন্ত্রাস-দুর্নীতি বন্ধ প্রভৃতির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি, ১৯৭৪-১৯৭৬ ঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ রোকনুজ্জামান

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ দলের মধ্যপন্থী নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, মূলত তারাই আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে গঠন করে জাসদ। এ দল

প্রতিষ্ঠার সময় তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পূর্ণ পুঁজিবাদী এবং একস্তর বিশিষ্ট বিপ্লবের মাধ্যমে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপনীত হওয়া যাবে বলে মনে করতো। বিপ্লবের মাধ্যম হিসেবে তারা বেছে নিয়েছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ। ১৯৭৩ সালের দেশে প্রথম সংসদ নির্বাচনে জাসদ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে তারা পায় মাত্র ১ টি আসন। এ পরাজয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দকে হতাশ করে। ১৯৭৪ সালের শুরু থেকে তারুণ্যেদীপ্ত জাসদ নেতৃবৃন্দ তাদের লক্ষ্য অর্জণের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটানোর ধারা অনুসরণ শুরু করেন। তারা গঠন করে গণবাহিনী নামে সশস্ত্র বাহিনী। একই সাথে জাসদ নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করে তাদের মাধ্যমেও বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা চালান। ১৯৭৫ সালের আগস্টে সেনাবাহিনীর এক বিদ্রোহী অংশের অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন. নভেম্বর মাসে পাল্টা অভ্যুত্থানে এদের বিতাড়িত করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ক্ষমতাসীন হন। এ অবস্থায় জাসদের সৈনিক অংশ ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তৃতীয় আর এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং পরিণতিতে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা দখলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল জাসদের রাজনীতিকে। তিনি ক্ষমতা দখল করেই জাসদের বিরুদ্ধে চরম দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করেন। হাজার হাজার জাসদ নেতা ও কর্মী কারাবন্দী হন। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি জাসদ নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন করে পূর্বের ধারায় আবার ফিরে আসেন।

এভাবে ১৯৭৬ সালে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার রাজনীতি শেষ হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিলা লিপি বিশারদ মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা

মোঃ আতাউর রহমান

শামসুদ্দীন আহমদ মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার থানার দেওয়ান পাড়া গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয় যে তাঁর পূর্বপুরুষ ইরান থেকে মুঘলযুগে ভারতে আসেন। ওঁর এক পূর্বপুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের পদ্মাতীরের একটি কুঠির দেওয়ান হন।

শামসুদ্দীন ছাত্রজীবন শেষ করে প্রথমে বর্ধমানের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে বহরমপুরের কে এন বি কলেজে অধ্যাপকের পদ পান। এর পর কলকাতার যাদুঘরে সহকারী কিউরেটার হিসাবে যোগ দেন। এরপর কর্মদক্ষতার ফলে তিনি সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট হন। ১৯৪১-৪২ সালে দু বছর তিনি পণ্ডিত গোলাম ইয়াজদানীর অধীনে ফার্সী ও আরবী শিলালেখ পড়ার প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৪৬ সালে পূর্বাঞ্চল শাখার সপারিনটেনডেন্ট আর্কিওলজিস্ট পদে যোগ দেন।

১৯৪৭ সালে উনি রাজশাহীতে যান ও ১৯৪৮ সালে তিনি পাকিস্থানের পুরাতত্ব বিভাগের অধিকর্তা হয়। ১৯৫৪ সালে ও পদ থেকে অবসর নেন। এর পর রাজশাহীতে ফিরে এসে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৭ সালে স্বাস্থ্যের কারণে উনি অবসর নেন।

শামসুদ্দীন আহমদ বহু সংস্থার সদস্য ছিলেন এবং অধ্যাপক হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯২১ সাল থেকে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাপা হতে থাকে যার সংখ্যা পঞ্চাশটির বেশী। এছাড়া বহু বই সম্পাদনা করে গিয়েছেন। ওঁর সবথেকে উল্লেখযোগ্য কীর্তি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত *ইনস্কিপসনস অব বেঙ্গল* (চতুর্থ খণ্ড)। যেটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের আরবী - ফার্সী শিলালেখর পাঠোদ্ধার করে শুধু তার ইংরাজী অনুবাদই দেননি, শিলালেখগুলির প্রাপ্তিস্থান ও ইতিহাসও আলোচনা করেছেন।

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন তারিখে শামসুদ্দীন আহমদ রাজশাহী মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার

শিল্পী গাঙ্গুলী

স্ত্রী শিক্ষা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে শিক্ষা কমিশন সর্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষাকে জাতীয় অগ্রগতির সোপান হিসেবে চিহ্নিত করে। স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য মহিলাদের সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ জাগরিত করা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অবৈতনিক, অত্যাবশ্যকীয় প্রচলিত শিক্ষাই যথেষ্ট নয় বয়স্ক, বৃত্তিমূলক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বাস্তব প্রয়োজনে হস্তশিল্প,

তাঁতশিল্প, মুরগী প্রতিপালন, সজী উৎপাদন ইত্যাদি স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলির মাধ্যমেই গ্রামীণ মহিলাদের উন্নতি সম্ভবপর হবে। পরিবারের স্বাস্থ্যচেতনা সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান থাকতে হবে।

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় এলাকা থেকে কমপক্ষে একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা নিয়োগের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৫ খ্রিঃ থেকে ২০০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত এক নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার ফলে মহিলা শিক্ষিকাদের গ্রামীণ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। সরকারী বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে। বালিকাদের ক্ষেত্রে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাদান চালু করা হয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যালয়ের পোশাক এবং দুপুরে টিফিন পর্যন্ত দেওয়া হয়। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক করার ব্যাপারে সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগেও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি'র উদ্যোগে ৩৬,০০০ অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে ৭০ শতাংশ ছাত্রী। মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগেও বহু মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক্রমশ মহিলাদের ব্যাপক যোগদান উন্নতির পরিচায়ক।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য অধিকতর আর্থিক অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে দূরসঞ্চার শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে হবে। গণমাধ্যমের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে জনমতকে সচেতন করতে হবে। সরকারী, বেসরকারী নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সুনিশ্চিত ও সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়।

ছাত্রআন্দোলন এবং ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণঅভ্যুত্থান ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

মোঃ জহীর রায়হান

দক্ষিণ কোরিয়ায় ছাত্র সমাজের স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি বড় ধরনের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯১০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোরিয়ায় জাপানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে ছাত্র সমাজ সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক দখলদারদের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সক্রিয় আন্দোলন করেছে। তবে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার স্বৈরশাসক সিং ম্যান রীর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ অব্যাহত আন্দোলন চালিয়ে ১৯৬০ সালের এপ্রিল বিপ্লবের মাধ্যমে তাকে উৎখাত করে। এরপর ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় লৌহমানব হিসেবে পরিচিত প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি-র স্বৈরাচারী ইউ শিন ব্যবস্থার পতন ঘটাতেও ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। পার্ক চুং হি-র পতনের পর পরবর্তী স্বৈরাচারী শাসক প্রেসিডেন্ট চুন ডু হোয়ানের বিরুদ্ধেও ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক সংস্কারের দাবী দাওয়া উপস্থাপন করে। এর মধ্যে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ইউ শিন ব্যবস্থার অবসান ছিল দুটি প্রধান দাবী।

১৯৮০-এর দশকের পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল উদারনৈতিক রাষ্ট্র কায়েম কবা। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন না হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্রসমাজ অধিকতরভাবে বাম মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এসব ছাত্রদের আদর্শগত দিকের পরিবর্তন ছিল ঐতিহাসিক। তারা ১৯৫০-৫৩ সালের কোরিয়ার যুদ্ধ এবং ১৯৬০ সালে এপ্রিল বিপ্লবের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ইউ শিন ব্যবস্থা এবং কোয়াং-জু ঘটনা প্রবাহের পরবর্তী পরিস্থিতির দ্বারা চালিত হয়েছে। ছাত্রসমাজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিরাজমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নয়া ঔপনিবেশিক ধাঁচের সম্পর্কের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সব সমস্যার মূল কারণ দেখতে পায়। তাদের মতে, কেবলমাত্র সামাজিক বিপ্লব সংগঠনের মাধ্যমেই এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব।[১]

এছাড়া ছাত্ররা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকে যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৯-৮০ সালে চুন প্রশাসন কর্তৃক ক্ষমতা দখলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৮০-র দশকে ছাত্রসমাজ দক্ষিণ কোরিয়ার বুদ্ধিজীবিদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করে। এ সময় কোরিয়ার সার্বিক রাজনৈতিক আন্দোলন উগ্রপন্থার দিকে যেতে থাকে এবং ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক এবং কৌশলগত দিকেরও পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন নেতাদের গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও ছাত্রেরা সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে থাকে। পুলিশের তৎপরতায় আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংলগ্ন বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে সীমিত হয়ে পড়ে। ১৯৮৬ সালে নজীরবিহীনভাবে ছাত্ররা আত্মহত্যার মাধ্যমে প্রতিবাদ এবং ব্যাপক ছাত্র ও শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে পুলিশের সাথে তাদের সংঘাত দেখা দেয়। বিশেষ করে, মে মাসে ইনচন নগরীতে এবং সিউলে কংগুক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জনতার সাথে পুলিশের রক্তক্ষয়ী সংঘাত হয় এবং এতে অনেকে মারা যায়। এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দান করে NKDP বা New Korea Democratic Party । ১৯৮৭ সালে এই দলের পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় (RDP) Reunification Democratic Party। এই দলের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের শুরুতেই একটি গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। এর লক্ষ্য ছিল স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটানো এবং এর জন্য তারা প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানায়। আন্দোলনকারীদের বিশ্বাস ছিল যে এর ফলে এক স্বৈরাচার কর্তৃক আরেক স্বৈরাচারের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরকে অসম্ভব হয়ে পড়বে, যেমনটি ১৯৪৮ সাল থেকে হয়ে আসছিল।[২] এসময় দক্ষিণ কোরীয় ছাত্রসমাজের মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতেই ১৯৭৯-৮০ সালে চুন-ডু হোয়ান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে। ১৯৮০ সালের কোয়াং-জু ঘটনায় তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের সম্পৃক্ততা সরাসরিভাবে দেখতে পায়। ১৯৮৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান চুনকে আমন্ত্রণ জানালে ছাত্রদের মধ্যে মার্কিন ষড়যন্ত্রের ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

১৯৮৭ সালের ১৩ এপ্রিল চুন-ডু হোয়ান সংবিধান সংশোধনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক অনুষ্ঠান বাতিল করে দেন এবং ১০ জুন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে চুনের খুবই বিশ্বাসভাজন জেনারেল রোহ্ তা-উ কে R.D.P. দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এ সময় দুটি ঘটনা ঘটে। যেগুলি দক্ষিণ কোরিয়ার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমটি হল ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফিলিপাইনস্-এর সুদীর্ঘকালীন স্বৈরশাসক ফার্ডিন্যান্ড মার্কোস গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এর এক বছর

পর তিনি যখন পুনরায় সংবিধান সংশোধন করতে অনীহা প্রকাশ করেন, তখন দেশের মধ্যে পুনরায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়টি, ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিশ পাক চোং-চোল নামক সিউল ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির একটি উগ্রপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে। এর পর ঘটনাটি ধামাচাপা করার চেষ্টা করা হলেও সর্বত্র বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট চুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে বরখাস্ত করেন। এই প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার প্রকাশ্যে পুলিশের নির্যাতনের কথা স্বীকার করে। ফলে সিউল, তেগু, পুসান, মাসান, চিনজু,কোয়াং-জু, তুন চোন-জু এবং অনজু-তে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে পুলিশের সাথে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের সংঘাত হয়। RDP দলের নেতা কিম ইয়াং-সাম এ সময় চুন ডু হোয়ানের প্রস্তাবকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান।

প্রেসিডেন্ট চুন জনতার দাবিকে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৯৮৭ সালের ২৯ জুন সেনা বাহিনীর প্রধান জেনারেল রোহ্ তা-উ চুনের ক্ষমতা ত্যাগ করা এবং একটি আট দফা সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঃ (১) জনগণের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান; (২) কিম-দে জাং এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তিদান ও তাদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া; (৩) মানবাধিকার সংরক্ষণ করা; (৪) সংবাদপত্রের উপরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া; (৫) স্থানীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা ইত্যাদি। রোহ্ এসব প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট চুনের নিকট উপস্থাপন করলে চুন প্রকাশ্যে তা অনুমোদন করেন। ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে উদারনৈতিক আন্দোলনের দুই নেতা কিম-ইয়াং সাম এবং কিম-দে জাং পরাজিত হন এবং রোহ্ তে উ জয়লাভ করেন। ১৯৮৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী রোহ্ তা-উ দক্ষিণ কোরিয়ায় নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এভাবে ১৯৮৭ সালের গণঅভ্যুত্থানের দ্বারা দীর্ঘ দিনের দাবীর কতকগুলো পূরণ হয়।[৩]

দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র সংগঠনগুলির এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা কি ছিল ও কোরিয়ায় ছাত্র সমাজের সুদীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্য রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে কোরিয়ার ছাত্ররা সবসময় বিদেশী শাসন এবং একনায়কতন্ত্রী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪] উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০-৬১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সিং ম্যান-রী প্রশাসন ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করলে ছাত্ররা সশস্ত্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে, যার ফলে সিং ম্যান-রী কে ক্ষমতা ত্যাগ করে নির্বাসনে চলে যেতে হয়।

প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং-হির মৃত্যুর সময় ছাত্র আন্দোলন একটি অন্তর্নিহিত কারণ ছিল। প্রেসিডেন্ট পার্কের একজন বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক কিম জে-কিউ এবং প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান চা. জি. চিয়োল এই ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরস্পর দ্বন্দে লিপ্ত হন এবং মিঃ কিমকে প্রেসিডেন্ট পার্ক ছাত্রদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন দমন না করার জন্য ভূর্ৎসনা করেন। ফলে তিনি প্রেসিডেন্ট পার্ককে হত্যা করেন। আবার প্রেসিডেন্ট চুন-ডু হোয়ানের প্রশাসন আমলে কেবলমাত্র ছাত্ররা কোয়াং জু-তে অভ্যুত্থানের পর নির্মম দমন নীতির শিকার হয়। এরপর ছাত্র আন্দোলন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার জন্য দাবী জানায়। এই প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট চুন তাঁর উপরোক্ত সাত দফা গণতন্ত্রায়নের প্রস্তাব ঘোষণা করেন।

ছাত্রসমাজ সব সময় দক্ষিণ কোরিয়ার গণতন্ত্রায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু ১৯৮৭ সালের জুন মাসের চূড়ান্ত উত্তরণের পর্বে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। ঐ সময় National Coalition for Democratic Constitution (NCDC) নামক একটি সংগঠন সবশ্রেণীর মানুষকে সরকার বিরোধী গণবিক্ষোভে একই পতাকা তলে সমবেত করে এবং জুন মাসের গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণকে পথে নেমে বিক্ষেভ প্রদর্শন করার মত একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন হল ছাত্রসমাজ একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

১৯৮৭ সালে তাদের ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় পর্যায় ধাঁচের। এর কারণ হল ছাত্র সমাজের আন্দোলনের প্রতি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষদের সমর্থনের একটা সীমা ছিল। উল্লেখ্য যে, কোরিয়ার অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের লক্ষ্য ছিল দেশে মিনজুং বা গণবিপ্লব ঘটানো এবং তার জন্য তারা প্রায়ই সশস্ত্রপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতো। ফলে কোরিয়ার সংখ্যাগারিষ্ঠ জনগণ, যারা মধ্যপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল, ছাত্রদলগুলিকে স্বৈরাচারী প্রশাসনের বদলে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার জন্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেনি। ১৯৭৯-৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোরিয়ার ছাত্র আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমটি, ১৯৭৯-৮৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন মূলত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং আন্দোলন নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়কাল ছিল কোরিয়ার ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। এ সময় ছাত্র আন্দোলন আবার সামনে আসতে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

১৯৭৯-৮০ ছাত্ররাজনীতিবিদরা স্বৈরাচারী প্রশাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে বিচ্ছিন্ন

সংগ্রাম করেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে ছাত্রদের পক্ষে এসময় সুস্থ সাংগঠনিক কার্যক্রম গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ছাত্ররা অন্যান্য শ্রেণীর জনগণের আন্দোলনের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু অধিকতর উগ্র হয়ে উঠে গণবিপ্লব সংগঠনের দিকে যেতে থাকে। কোয়াং-জু অভ্যুত্থানে রক্তাক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ছাত্ররা চলতে থাকে। ছাত্র সংগঠনগুলোর আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং মার্কিন বিরোধিতা তাদের আন্দোলন কর্মসূচীর অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতিকে পছন্দ না করলেও উত্তর কোরিয়া ও চীনের কমিউনিস্ট হুমকির মোকাবিলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক সহযোগিতাকে অবধারিত মনে করত।

১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং-হির হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্র আন্দোলন অন্যান্য সরকার বিরোধী শক্তির সাথে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে। এ সময় প্রশাসন ছাত্র আন্দোলনের প্রতি কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। ফলে ১৯৭৯ সালের ৯ ডিসেম্বর পাঁচ বছরের পুরাতন জরুরী অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৯৭৩ সাল থেকে যে ৮০০ জন ছাত্রকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়। এছাড়া ৩৯ জন বহিষ্কৃত অধ্যাপকদের মধ্যে পঁচিশজনকে পুনর্বহাল করা হয়।[৫]

ছাত্রনেতারা সরকারের এই উদার আচরণকে দুর্বলতা হিসেবে গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নেতারা ফিরে আসার পরই পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। প্রথম দিকে ছাত্র আন্দোলন ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মধ্যে সীমিত ছিল। বিশেষকরে, ছাত্ররা ছাত্র প্রতিরক্ষাবাহিনী ভেঙে দেওয়া, স্বায়ত্বশাসিত ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা, সরকারের দালাল অধ্যাপকদের পদত্যাগ এবং ক্যাম্পাসে নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে ও দায়ী করে। অবশ্য এসময় ছাত্ররা প্রশাসনের সাথে সরাসরি সংঘাত পরিহার করে চলে। সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দাবীদাওয়াসহ ছাত্ররা প্রশাসনের সাথে ক্রমশ সংঘাতে লিপ্ত হতে থাকে।[৬]

কোয়াং-জু ছাত্র অভ্যুত্থান রক্তাক্তভাবে দমন করার পর ছাত্র আন্দোলনের গতিধারা পাল্টে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট পার্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ছাত্র আন্দোলনের বড় বিষয়বস্তু ছিল ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার রূপায়ন এবং ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসন কার্যকরী করা। ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর সিউল ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির ছাত্ররা ক্যাম্পাস গণতন্ত্রায়নের ঘোষণা করে। এ সময় তারা প্রেসিডেন্ট পার্কের ইউ শিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং গণতন্ত্রায়নের প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দানের দাবী জানায়।[৭] ১৯৮০

সালের মে মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত ছাত্র সংস্থাগুলি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানায়। মে মাসের ২ তারিখে সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা গণতন্ত্রায়নের জন্য অভিযান চালাতে ঘোষণা করে যে তারা ইউ শিন ব্যবস্থার অবশিষ্ট দিক গুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করবে।[৮]

এভাবে ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য ও পদ্ধতি পাল্টে যায়। তাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র কায়েম করার পরিবর্তে মিন-জুং বা গণবিপ্লব সংগঠন করা এবং ফ্যাসীবাদী স্বৈর প্রশাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করা। এ সময় ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে চুন-ডু হোয়ান প্রশাসনকে জাতীয়তা বিরোধী, গণবিরোধী এবং এমন এক ফ্যাসিবাদী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে, জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, এবং কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির স্বার্থকে সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে শোষণ করা থেকে মুক্ত করাই তাদের লক্ষ্য।[৯]

১৯৮০ সালের ১১ ডিসেম্বর সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার ছাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঘোষণা করে। এ সময়ে প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্ররা জানায় যে, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মিন জুং বা গণশক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করবে। ঐ সময় শ্রমিক, কৃষক, এবং প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবিরা ঐক্যবদ্ধভাবে বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে পারবে।[১০]

মার্কিন বিরোধিতা ছাত্রদের মধ্যে সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে এবং ছাত্রনেতারা মার্কিন বিরোধী হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০-এর দশকে সরকার বিরোধী শক্তিগুলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মূলত একটি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সময় পার্ক প্রশাসনের মানবাধিকার লংঘনের সমালোচনা করতে থাকে। কোয়াং-জু গণঅভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত ছাত্র এবং সাধারণ মানুষেরা বিশ্বাস করতো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করবে। এক পর্যায়ে কোয়াং-জু অভ্যুত্থানের সময় একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে উৎসাহিত করে ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুসান বন্দরের অদূরে নোঙ্গর করা দুটি বিমানবাহী রণতরী কোরিয়া সরকারের হত্যাযজ্ঞ চালানো বন্ধ করতে এবং কোরিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে।[১১] এই ছাত্র নেতার উপরোক্ত দাবী সঠিক ছিল না এবং প্রকৃত ঘটনা ছিল ঠিক এর বিপরীত। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও কোরিয়ার সংযুক্ত বাহিনীর কমাণ্ডের অধীনে দায়িত্ব পালনরত বিশতম ডিভিশনের সৈন্যদেরকে কোয়াং জু-তে ছাত্রদের বিক্ষোভ দমন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[১২] এভাবে মার্কিন সৈন্যরা ছাত্র বিক্ষোভ দমনে বিতর্কিত অংশগ্রহণ করায় বহু ছাত্রেরা মনে করে যে, কোয়াং-জু হত্যাযজ্ঞের দায়

দায়িত্ব অনেকাংশে যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। বিশেষ করে, ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান প্রেসিডেন্ট চুন-ডু হোয়ানকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানালে ছাত্ররা মনে করতে থাকে যে যুক্তরাষ্ট্র চুন প্রশাসনকে জোরালো সমর্থন দিচ্ছে। ফলে ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ্যে তাদের মার্কিন বিরোধিতাকে প্রকাশ করতে থাকে। ১৯৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর এবং ১৯৮২ সালের ১৮ মার্চ কোয়াং-জু এবং পুসানে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ছাত্ররা আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৯৮২ সালের ২২শে এপ্রিল কাংগুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'ইয়াংকি ঘরে ফিরে যা' এই ধ্বনি দিয়ে মার্কিন পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

এ সময় ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। ছাত্ররা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, যে বিশ্বব্যবস্থার পটভূমিকায় তারা গণতন্ত্রায়নের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে তাকে বিশ্ববাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করতে হবে। ১৯৮২ সাল থেকে ছাত্ররা 'ইনসিককা জিওং রিয়্যাক' বা 'উপলব্ধিগত কৌশল' শীর্ষক একটি ছোট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সমকালীন পটভূমিকা সম্পর্কে নিজেদের উপলব্ধি জনগণের নিকট ব্যক্ত করে। এই বিজ্ঞপ্তিতে তারা দক্ষিণ কোরিয়াকে এমন এক নয়া ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে যেখানে জনগণের সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। তারা দাবী করে যে, কোরিয়ার সামরিক ফ্যাসিস্ট চক্রই হচ্ছে সে দেশের সামরিকবাদের উপর ভিত্তিশীল ফ্যাসিস্টরা। এমনকি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কোরিয়ার জনগণ সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি এবং দেশীয় মুৎসুদ্দি পুঁজির দ্বারা দুবার শোষিত হয়।[২৫]

সব ছাত্র সংগঠনই এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়নি। ফলে বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকে। এর ফলে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কোয়াং-জু অভ্যুত্থান এবং ব্যর্থ গণতন্ত্রায়ন আন্দোলনের পর ছাত্রনেতারা এই সংঘাতের কারণ এবং ছাত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নিরূপণ করতে থাকে। বিশেষকরে ছাত্ররা দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটির নাম হল মুরিম এবং অপরটির নাম হল হাকরিম। মুরিম গোষ্ঠী আন্দোলনের সাংগঠনিক দিককে শক্তিশালী করে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে থাকে। অন্যদিকে হাকরিম গোষ্ঠি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করার পক্ষপাতী ছিল। ১৯৮১ সালের শুরুতে হাকরিম সংগঠনটি ছাত্র আন্দোলনে প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৮২ সালে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে কৌশলগত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াবি গোষ্ঠী আন্তঃক্যাম্পাস বিষয়ে ছাত্রদের সচল করে তোলার পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে জিয়াংম্যান গ্রুপ আন্তঃক্যাম্পাস বিষয়ে সরকারকে

প্রতিহত করা এবং সরাসরি রাজনৈতিক সংঘাত ও রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করাকে তাদের কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে।[১৪]

১৯৮৪ সালের শুরুতেই সারাদেশ ব্যাপী ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ সময় সারা দেশে নতুন নতুন ছাত্র সংস্থা গঠিত হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে ছাত্র নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই উদ্যোগ ছিল স্বায়ত্বশাসিত ছাত্র প্রতিনিধি সংস্থা পুনর্গঠনের জন্য।[১৫]

১৯৮৪ সালের শেষ নাগাদ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র সংস্থা পুনরায় গঠিত হয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯৮৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সিউলের কোরিয়া ইউনিভারসিটিতে, ২৫ সেপ্টেম্বর ইয়োন সেই ইউনিভারসিটিতে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সিউল ন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে General Student Association গঠন করা হয়।[১৬]

এরপর জাতীয় পর্যায়ে আরো একটি বড় ছাত্র সংস্থা গঠনের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৪ সালের ৩ নভেম্বর ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০০ ছাত্র প্রতিনিধি সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং The Representative Organ of National Student নামক একটি সংস্থা গঠন করে। এরপর ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্র আন্দোলনকারীরা একটি সুসংবদ্ধ সংস্থা Umbrella Organization গঠন করে যার নাম দেওয়া হয় National Federation of Students Association । এদের আঞ্চলিক সংগঠন ছিল।[১৭] এভাবে সারাদেশে সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে ছাত্ররা অত্যাচারী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকে।

ছাত্র উপদলগুলির মধ্যে তখনও পর্যন্ত-আদর্শগত দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে সমসাময়িক মূল্যায়নের সময় ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে মতানৈক্য ও সংঘাত দেখা দিত।

১৯৮৬ সালের প্রথমভাগ পর্যন্ত কোরিয়ার ছাত্র নেতারা কোরীয় সমাজের পটভূমিকা, ছাত্রদের ভূমিকা এবং সরকার বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিশেষ করে পতাকা এবং পতাকা বিরোধী গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। পতাকা বিরোধী গোষ্ঠী সামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে, ছাত্র আন্দোলনকারীদের উচিৎ সুস্থ এবং বৈধ রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং ক্যাম্পাসের সমস্যাগুলিকে ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে ছাত্রদের নিকট থেকে সমর্থন লাভের পরই কেবলমাত্র সামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংঘাতে নামা উচিৎ। তারা তাদের সেক্টর ভিত্তিক আন্দোলনকে সুসংহত করে গণসংস্থা

গড়ে তুলতে থাকে অন্যদিকে পতাকা সমর্থনকারী গোষ্ঠী বিশ্বাস করতো যে আইন মাফিক পথে সংস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অনবরত সংগ্রাম করে ছাত্র আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে। তারা মত প্রকাশ করে যে জোরালো রাজনৈতিক সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ ধাঁচে ভ্যানগার্ড বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের শেষ দিকে ছাত্ররা 'মিনতুই'-বা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে যা ১৯৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারী শাসক দল Democratic Justice Party-র প্রধান কার্যালয় দখলে নেতৃত্ব দান করে।[১৮] ছাত্রদের মধ্যে এসময় আদর্শগত মতভেদ থাকলে উভয় গোষ্ঠী এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি ভ্যানগার্ড বাহিনী গঠন করে। এসময় পতাকা পন্থীরা 'সাম্মিনতুই'-বা তিনটি মিন, অর্থাৎ জনগণ, জাতি এবং গণতন্ত্রের জন্য গঠিত সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। এই দল ১৯৮৫ সালের প্রথমদিকে সিউলে মার্কিন দূতাবাস ভবন দখলের পরিকল্পনা করে। অন্যদিকে পতাকা বিরোধী গোষ্ঠী এই পরিকল্পনা সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। এভাবে উভয় গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'সাম্মিনতুই'কে নেতৃত্বদান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। 'সাম্মিনতুই'-প্রথম গঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২৫ মার্চ এবং এর পর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে জাতীয় ছাত্র সংস্থা ফেডারেশন-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে 'জিওন হাকরাইউন'। ১৮ জুলাই আরো ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাম্মিনতুই'-এর শাখা গঠিত হয়। নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে তারা জনগণের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করছিল।[১৯]

১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে 'সাম্মিনতুই'কে-এর অভ্যন্তরে চরমপন্থী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকা এবং জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা না থাকার জন্য সমালোচনা করা হয়। সমালোচকেরা আরো বলেন যে, জনগণের সত্যিকার দাবী দাওয়া তুলে ধরার পরিবর্তে সরকারী ভবন দখল করা, আগুনে পুড়ানো, সন্ত্রাস সৃষ্টি করার মত ন্যাক্কারজনক কাজে ছাত্ররা লিপ্ত রয়েছে।

'সাম্মিনতুই'-এর বিপরীতে সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমালোচকেরা 'জামিনতু' বা যুক্তরাষ্ট্রের দাসত্ব করা ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতন্ত্রায়নের জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ১১ এপ্রিল এই কমিটি জাতীয় মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শকে পরিচালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে।[২০] জামিনতু দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্তবাদী ধাঁচের হিসেবে বর্ণনা করে। আরো দাবী করা হয় যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের পদলেহনকারী চুনের (চুন-ডু হোয়ানের) স্বৈরাচারী সরকার এই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে।[২১] গণতন্ত্রায়নের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার সাথে সাথে জামিনতু কোরিয়া উপদ্বীপের পুনঃএকত্রীকরণের

জন্য সংগ্রাম চালাতে থাকে। তারা ঘোষণা করে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়া উপদ্বীপের বিভক্তির মূল কারণ। ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ পতাকাপন্থীরা 'মিন মিনতু' সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। এই সংস্থাটি ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক রেভলিউশন এর আদর্শগত উত্তরাধিকারত্ব লাভ করে। তারা কোরীয় সমাজব্যবস্থাকে নয়া ঔপনিবেশিক একচেটিয়া পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করে। সামরিক ফ্যাসীবাদীদেরকে উৎখাত করা তারা তাদের সংগ্রামের মূল লক্ষ্যবস্তুরূপে ঘোষণা করে।

জামিনতু যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং কোরীয় সরকারের মধ্যকার সম্পর্ককে লর্ড এবং ভ্যাসালের সম্পর্ক হিসেবে অভিহিত করত সেখানে মিন-মিনতু এই ব্যবস্থাকে নির্ভরশীল ধাঁচের সম্পর্করূপে অভিহিত করে। এই দুইয়ের মধ্যে মিনজুং বা জনগণের মধ্যকার সীমারেখা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মতপার্থক্য ছিল। জামিনতু কোরিয়ার জনগণকে সামাজিক রূপান্তরের মূল বাহন হিসেবে বিবেচনা করত। জামিনতুর মতে শ্রেণীগতভাবে পাতি ও জাতীয় বুর্জোয়া, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, এবং কৃষক ও শ্রমিক জনতা নিয়ে গণমানুষ গঠিত। অন্যদিকে মিন-মিনতুর মতে গণমানুষ বলতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝায়। জামিনতু স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মারমুখী সংগ্রামে বিরোধীদলের সাথে সংহতি দেখালেও মিন-মিনতু বলে যে, এ সব গ্রুপের প্রকৃতি রক্ষণশীল ধাঁচের এবং তাদের সরকারী প্রশাসন কুক্ষিগত করার দুরভিসন্ধি রয়েছে। এসব গোষ্ঠীর সাথে মিত্রতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিনিধিরা 'মিন-মিন-হাক-রিয়ান' বা Federation of National Democratic Students নামক একটি বৃহত্তর ছাত্র সংস্থা গঠন করে।[২২]

জামিনতু এবং *মিন-মিনতু* উভয়দল *সাম-মিনতু*-র উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসী কৌশলকে নিন্দা করলেও উভয়পক্ষই তাদের পূর্বসূরীদের থেকে খুব বেশী আলাদা ছিল না। মিন-মিনতু এবং জামিন-তু ১৯৮৬ সালের মে এবং অক্টোবর মাসে যথাক্রমে ইনচন ঘটনা এবং কোনকুক বিশ্ববিদ্যালয় দখলের মত দুটি উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছিল। এই সময় ছাত্র আন্দোলনগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে যৌথ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা, শ্রমিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা দেখানো, দ্বৈত সংগঠন গড়ে তোলা এবং চরমপন্থা অবলম্বন করা। এর কৌশলগত দিক ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত কার্যকরী আন্দোলন পরিচালনার জন্য কয়েকটি প্রতিবেশী কলেজের ছাত্ররা যৌথ বিক্ষোভের আয়োজন করতো। এসব বিক্ষোভ কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় তারা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করতো। একই সময় শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্ররা খণ্ডিতভাবে ভাগ হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতো যাতে পুলিশী শক্তি একই সময়ে তাদের ছত্রভঙ্গ

করতে না পারে। যৌথ বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা জমায়েত হত এবং নিজেদের সুবিধামত বিক্ষোভের সময় এবং স্থান বেছে নিত।

দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছাত্র-শ্রমিক সংহতি ছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৮০ সাল থেকে শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়। এই সময় শ্রমিক আন্দোলন চাঙ্গা করে তোলার জন্য অসংখ্য ছাত্র শ্রমিকের ছদ্মবেশে তাদের শিক্ষা পরিচয় গোপন করে কলকারখানায় প্রবেশ করতো এবং শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতো। তারা শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সাহায্য করতো। ১৯৮৫ সালের পর থেকে কোরিয়ার শিল্প কারখানা অঙ্গনে এ ধরনের ছদ্মবেশী ছাত্রদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে প্রায় ৫০ জন শ্রমিকবেশী ছাত্র কারখানাগুলিতে কাজ করতো, যাদের সংখ্যা মে মাসের মধ্যে ১২০, জুন মাসে ১৯০, জুলাই মাসে ২৩০ জন এবং আগস্টে ৪০০-এ উন্নীত হয়।[২৩] কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক ভাষ্যে দেখা যায় যে, ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে ৩৭৭টি কারখানায় ৬৯৯ জন শ্রমিকবেশী ছাত্র কাজ করতো এবং তারা ১৯৮৬ সালে যে ২৪৯টি শ্রমিক দাঙ্গা হয়েছিল তার ৩৮টির জন্য দায়ী ছিল।[২৪] ছাত্রকর্মীরা শ্রমিকদের সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্র এবং শ্রমিকদের এই নয়া সংহতি সামরিক প্রশাসনকে সম্ভাব্য বিপ্লব সম্পর্কে ভীত করে তোলে।

ছাত্র এবং শ্রমিকদের মধ্যে ফলপ্রসু সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামরিক সরকার বিরোধী কার্যকরী সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলেও আদর্শগত দিক থেকে কোরীয় সমাজের প্রেক্ষিত এবং সংগ্রামের উপায় নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে তখনও পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ছিল। এসময় ছাত্ররা সমগ্র ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার মত কোন বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি।

তৃতীয়ত সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দ্বৈততা ছিল এ সময়ের ছাত্র আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সরকারী ক্ষেত্রে সংগঠন ছাড়াও ছাত্রনেতা-কর্মীরা গোপন ভাবে বহু সংগঠন তৈরী করে যেগুলির লক্ষ্য ছিল সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকরী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। *সাম-মিনতুই* ১৯৮৫ সালে এবং *জামিন-তু* ও *মিন-মিন-তু* ১৯৮৬ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সংস্থাগুলিকে নিয়ে একটি বৃহত্তর ছাত্র সংগঠন তৈরী করে। এসব সংস্থা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের মত ছাত্র সংস্থা হলেও কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্র আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দান করতো।

চতুর্থত চরমপন্থা এবং সন্ত্রাস এ সময়ে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময় ছাত্র আন্দোলন অধিকতর উগ্র এবং সন্ত্রাসী সংগ্রামের রূপ ধারণ করে।

ছাত্ররা ক্রমবর্ধমানহারে দাঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করত। তারা পাথর, ইট, মলোটভ ককটেল, মশাল ইত্যাদি ব্যবহার করে পুলিশ বক্স, যানবাহন ধ্বংস এবং ক্ষতি করতে থাকে। কিন্তু তাদের উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষ্য ছিল না, বরং বিপ্লব সংঘটনই ছিল এ যুগের ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। ফলে তাদের এই উগ্র আদর্শবাদ দেশের সাধারণ মানুষ এবং আপামর ছাত্র জনতা থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলে।

১৯৮৭ সালের বসন্ত কালের ছাত্র আন্দোলনকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের নমনীয়করণ এবং জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ছাত্ররা মনে করে যে সন্ত্রাসী ধাঁচের সংগ্রাম জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে এবং সরকার এর বিরুদ্ধে দমননীতি গ্রহণ করে। এর আগে মে মাসে ইনচন ঘটনা এবং অক্টোবরে কোননুক বিশ্ববিদ্যালয় দখল ঘটনার পর ছাত্ররা জনগণের সমর্থন হারায়। ছাত্ররা তাদের ক্ষতিগ্রস্থ সাংগঠনিক তৎপরতা পুনরায় শুরু করে এবং গণমানুষের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। অধিকতর মধ্যপন্থী উপাদানগুলির পুনরুদ্ধার করে একটি ব্যাপক গণভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাস গণতন্ত্রায়ন প্রচেষ্টা শুরু করে। এই প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা, ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্ত সহজ করা এবং বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।[২৫]

১৯৮৭ সালের দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র আন্দোলনে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত ছাত্ররা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট নিজেদেরকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি এড়ানোর জন্য তাদের সাবেক উগ্রপন্থা কলা কৌশল অনেকাংশে পরিহার করে। এ সময় বিক্ষোভের সংখ্যা হ্রাস না পেলেও তাদের কর্মকাণ্ড ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমিত থাকে। এক্ষেত্রে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলকে কোন সময়ই রাস্তায় নিয়ে যেত না। দ্বিতীয়ত এই সময় থেকে ছাত্ররা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে জাতীয় ধাঁচের রাজনৈতিক ইস্যুগুলির পরিবর্তে। বিশেষ করে তারা সরকারপন্থী অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিদের পদচ্যুতি এবং ছাত্র কল্যাণ বৃদ্ধি করার জন্য দাবী-দাওয়া জানাতে থাকে। তৃতীয়ত সাধারণ ছাত্র সংস্থাগুলি এবং নেতৃত্বদানকারী সংস্থাগুলিরও ক্রমশ ভূমিকা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে থাকে। চতুর্থত ভ্যানগার্ড বাহিনী দুর্বল হওয়ায় বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব সহজে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। পঞ্চমত শ্রমিক সংস্থা ও ছাত্র সংস্থাগুলির ঐক্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, 'সোদেহিয়াপ' নামে ছাত্র সংস্থাটি ১৯৮৭ সালের ৮ মে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সিউল এলাকার কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এর উদ্দেশ্য ছিল একটি

নির্দিষ্ট ব্যানারের অধীনে ক্যাম্পাস ছাত্র পরিষদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তবে পূর্ববর্তী সংস্থা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন সংস্থা বা জীয়ং হাকরিম সংগঠনের চেয়ে এর সংহতির মাত্রা অনেক নিম্নমানের ছিল। শ্রমিকদের সাথে এদের তেমন কোন ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম ছিল না।

১৯৮৭ সালের ১৩ এপ্রিল সরকারের পক্ষ থেকে সবক্ষেত্রে অধিকতর গণতন্ত্রায়নের বিভিন্ন ব্যবস্থা ঘোষণা করার পরও ছাত্র সংস্থাগুলি তাদের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকে। তবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ব্যবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবি এবং ভিন্নমতাবলম্বী রাজনীতিবিদগণ প্রতিবাদ করে। এ সময় ছাত্ররা সরকারের তেমন কোন বিরোধিতা করেনি। ১৯৮৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ছাত্ররা সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রাম পদ্ধতি শুরু করে। ঐতিহ্যিকভাবে কলেজগামী ছাত্ররা ১৯৮০ সালের কোয়াংজু গণহত্যার পর থেকে ঐ দিনটির স্মরণে মে মাসের ১৮ তারিখে প্রতিবছর ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করত। জাতীয় পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ভাষ্য অনুযায়ী সারা দেশের ৬২টি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ২২ হাজারের বেশী ছাত্র-ছাত্রী ১৯৮৭ সালের ১৮ মে সারা দেশে এই দিনটি উপলক্ষ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।।[২৬]

এরপর কোরিয়ায় National Committee for Democratic Constitution (NCDC) বা গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য গঠিত জাতীয় কোয়ালিশনের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের ২৭ মে ছাত্র আন্দোলনকারী সংস্থাগুলি সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলে। জুনের ১০, ১৮ এবং ২৪ তারিখে NCDC অনেকগুলি বড় বড় শোভাযাত্রা করেছিল। এ সময় ছাত্ররা সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে বিশ দিন ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১০ থেকে ২৯ জুনের মধ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু NCDC অহিংস নীতিমালা অনুসরণ করতে বললেও ছাত্র বিক্ষোভকারীরা প্রায় সময়েই সহিংস পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করত। পুলিশের নির্মম দমননীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা বোমা এবং পাথর ছুঁড়ত। ছাত্ররা পুলিশ ফাঁড়ি, সরকারী ভবন, মহাসড়কে বাসের উপর আক্রমণ করত, ট্রেন থামাতো এবং সড়ক পথে ব্যারিকেড দিয়ে বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন থামাতো। NCDC-র অহিংস নীতিমালা সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলন চালাতে সুবিধাজনক হলেও ছাত্ররা এই ধরনের শক্তি প্রয়োগ কর্মসূচীকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করার একটা পথ হিসেবে ব্যবহার করত।

উপসংহার — ছাত্র আন্দোলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাবই ছিল। ১৯৮০-র দশকে ছাত্র সংগঠনগুলি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে। ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে চুন-ডু হোয়ান প্রশাসনের কঠোর নিবর্তনমূলক

ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র ছাত্র সংগঠনগুলি সামাজিক শক্তি হিসেবে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখে। ছাত্র উপদলগুলি তাদের সন্ত্রাসী কলা কৌশলের জন্য স্বৈরশাসনের অবসান এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলার বিকল্প শক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে তুলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল।[২৭]

১৯৮৭ সালের গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র সংগঠনগুলি প্রধান ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এর কারণ ছিল তাদের উগ্রপন্থী তৎপরতার উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। সাংগঠনিক দিক থেকে ছাত্র উপদলগুলি অবৈধ এবং চরমপন্থী সংগঠন গড়ে তোলে। এমন কি স্বৈরাচারী প্রশাসনের তীব্র নির্যাতনের মধ্যেও এসব উগ্রপন্থী সংগঠন টিকে ছিল। ১৯৮০ সালে কোয়াং-জু অভ্যুত্থানের পরই সব ধরনের সরকার বিরোধী শক্তি — এমন কি বিরোধী দল, ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন এবং এ ধরনের আরো সংগঠন চুন প্রশাসনের দমননীতির মুখে ধ্বংস হয়ে যায়। এই ধ্বংসের মধ্যে একমাত্র ছাত্ররাই সরকার বিরোধী আন্দোলনের দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে। কারণ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ছাত্রদের অবৈধ এবং উগ্রপন্থী সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

একথা সত্য যে, জোরালো ও স্থায়ী ছাত্র আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তবে ছাত্র সংগঠনগুলির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ছাত্র উপদলগুলি কখনই সবধরনের ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বদানের জন্য একটি ব্যাপক আকারের ছাত্র সংস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। সর্বোপরি, ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে আদর্শ ও কৌশলগত দ্বন্দ্ব সব সময়েই ছিল এবং এই দ্বন্দ্ব গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

আদর্শগত দিক থেকে ১৯৮০-র দশকের ছাত্র আন্দোলন অতীতের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ছিল। ছাত্ররা কোরীয় সমাজের বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতে মূল্যবান অবদান রেখেছিল। কোরীয় সমাজব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করার মাধ্যমে ছাত্ররা সরকার বিরোধী আন্দোলনের মানকে উর্দ্ধে স্থাপন করে এবং গণতন্ত্রায়নের জন্য অব্যাহত ও তীব্রতর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। সমাজব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় সমস্যাবলী কোথায় নিহিত আছে এবং স্বৈরাচার কিভাবে জনগণকে শোষণ করছে ছাত্ররা সে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

অন্যদিকে ছাত্র সংগঠনগুলি কর্তৃক অনুসৃত আদর্শগত দিক কড়াকড়িভাবে অনুসরণের ফলে ছাত্র উপদলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কোরীয় সমাজের মধ্যকার

স্ববিরোধিতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ছাত্র উপদলগুলির মধ্যে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সরকার বিরোধী আন্দোলনে কারা নেতৃত্ব দেবে এবং কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হবে সে নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ ছিল। এছাড়া বামপন্থী ছাত্র উপদলগুলি কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণের কারণে স্বৈরসরকার বিরোধীদেরকে নির্মমভাবে দমন করার আইনগত সুযোগ লাভ করে।

সাধারণ ছাত্র উপদলগুলি সামরিক সরকারের নীতি ও কার্যক্রমকে প্রতিহত করত। তাদের উগ্র কর্মপন্থার মাধ্যমে তারা আত্মরক্ষা করা ও সরকার বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখতো। ১৯৮৭ সালের জুন অভ্যুত্থানের সময় ছাত্ররা বিক্ষোভের সামনে এসে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এর ফলে সারাদেশে প্রতিবাদ বিস্তার লাভ করত। এতদ্‌সত্ত্বেও সহিংস আন্দোলন পদ্ধতি, নিজ নিজ আদর্শকে যে কোন মূল্যে সমুন্নত রাখতে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করা এবং নিজেদের মধ্যে বিভক্ত ছাত্রদলগুলিকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী গণতন্ত্রায়ন শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা থেকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে।[১৮]

সূত্র-নির্দেশ

১। Carter J. Eckert, *Korea : Old and New · A Hisotry,* Seoul. 1990, P. 379.

২। ঐ, P. 381.

৩। ঐ, P. 382-84.

৪। Seongyi Yun, Contributions and Limits of Student Movement in South Korea Democratization, *Korea Observer,* Vol, XXX, No. 3 P. 487, 1999.

৫। *Washington Post,* March 13, 1980.

৬। Yun, "Contributions and limits", P. 490.

৭। Young HAN, *Korean Society and Student Movements in the 1980s,* Seoule, 1989, P. 23.

৮। ঐ, P. 29.

৯। ঐ, P. 65-66.

১০। ঐ, P. 55-56.

১১। Kim Seongbo, *"History of Anti-American Movements in the 1980s",* *Society and Thought,* 1989. P. 135.

১২। Peterson. Mark. "Americans and the Kwangju Incident : Problems in the Writing of History," in Donald N. Clark (ed.) *The Kwangju*

Uprising : Shadows over the Regime in South Korea, London., 1988, P. 56.

১৩। Shin Chul, Kang. *The History of Student Movements in the 1980s,* Seoul, 1988, P. 38-40.

১৪। Choi Yeongu, "Ideological and organizational development of the 1980s Student Movement", in Jo Heeyeon (ed.) *History of Korean Social Movement,* 1990, P. 248.

১৫। Chang Min, Jeong, Logic and Reality of Student Movement in 1980s in Jo Jin Kyung (ed.), *Characteristics and Movement of Korean Society,* Seoul, 1987, P. 17.

১৬। Hee Yon, Jo. "Social movement in the 1980s and debates on Social Structure" in Park Hyun Chae and Jo Hee Yon (eds.) *Debate on Korean Social Structure,* Seoul, 1991, P. 58.

১৭। Jeong, "Logic and Reality", P. 318.

১৮। Jae Oh Lee. "A Study of the trend of the student Movement in the 1980s" *Situation and Perception,* 12:4 (Winter 1988), P. 79.

১৯। Ku Choi Yon, "The Process of Ideological and Organizational Development in the 1980s Student Movements" in Jo Hee Yon (ed.), *Hankuk Sahoiundongsa,* The History of Korean Social Movement) Seoul : Juksan, 1990), P. 252.

২০। Haw Ju Kim, "A Thorough Study on Min mintu" *Wolgan Chosun,* September, 1987, P. 452.

২১। Chan, Kim Jong, "Current Situation of Labor Movement Organizations" *Sin Dong*-A December, 1986, P. 480.

২২। Kim, "Thorough Study", P. 454.

২৩। *Sin Dong*-A December, 1986, P. 480.

২৪। *Ilbo JoongAng*, November 7, 1986.

২৫। *Far Eastern Economic Review,* July 9, 1987, P. 37.

২৬। *The Korea Herald,* May-19, 1987.

২৭। Yun, "Contribution and Limits", P. 503.

২৮। Yun, P. 504.

উনিশ শতকে স্কটল্যান্ড ও রেনফ্রুশায়ারে ক্যাথলিক জনগোষ্ঠীর আগমন ও শিক্ষায় তাদের প্রচেষ্টা (১৮৫০-১৮৭২)

সামিনা সুলতানা নিশাত

স্কটল্যান্ডের মধ্য অঞ্চলে নিম্নভূমিতে ডামবারটন, লানার্কশায়ার, এয়ারশায়ার ও রেনফ্রুশায়ার অবস্থিত। স্কটল্যান্ডের উত্তর ঢালে অবস্থিত রেনফ্রুশায়ার ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। কিন্তু আমেরিকার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে অতলান্তিক মহাসাগরে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হেতু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে রেনফ্রুশায়ারের প্রাধান্য বর্দ্ধিত হয়। মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিভাগটিতে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। নৌ-শিল্প ও বস্ত্র শিল্পে অঞ্চলটি উনিশ শতকের মধ্যে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর ফলস্বরূপ রেনফ্রুশায়ারের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার দিক থেকে স্কটল্যান্ডের মধ্যে প্রদেশটি ১৮৭১ সালের দশম স্থান থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে চতুর্থ স্থানে উন্নীত হয়। শিল্প-কারখানায় চাকুরীর প্রত্যাশায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে অভিবাসন ছিল জনসংখ্যা স্ফিতির কারণ। অভিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ আয়ারল্যান্ড থেকে আসে। জনসংখ্যার আধিক্য, জমির অনুর্বরতা, কর্ম সংস্থানের অভাব ও অনুন্নত জীবনযাত্রা ১৭৯০ সাল হতে আইরিশদের দেশত্যাগে বাধ্য করে।[১] আইরিশগণ তখন থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড অভিবাসন আরম্ভ করে। ১৭৯৮ সালে তারা সংখ্যাধিক্যে রেনুফ্রুশায়ার ও লানার্কশায়ারে অনুপ্রবেশ করে। ১৮৪৭-৪৮ সালের মহা দুর্ভিক্ষের পর তাদের আরেকটি দল রেনফ্রুশায়ারের পেইজলি, গ্রীনক, পোর্ট গ্লাসগোসহ বিভিন্ন শিল্প এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে

আইরিশদের অধিকাংশ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হওয়ায় স্কটল্যান্ডের সমাজ জীবনে এর অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আইরিশ ব্যতীত যুক্তরাজ্যের অন্যান্য স্থান হতেও কিছু সংখ্যক ক্যাথলিকের স্কটল্যান্ডে আগমন ঘটে। এ ছাড়া আগে থেকেই কিছু স্থানীয় ক্যাথলিক স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছিল। বস্তুত স্কটিশ ও আইরিশদের মধ্যকার পার্থক্য শুধু ধর্মগত ছিল না, আইরিশগণ সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক

ও অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত ছিল।[২] সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ে ক্যাথলিকগণ তাদের চার্চকে একটি বৃহৎ চার্চে পরিণত করতে সক্ষম হয়।[৩] উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই স্কটল্যান্ডে বেশকিছু ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীনক শহরে ১৮৬১ সালে 'সেন্ট মেরি'স চার্চ স্থাপিত হয়।[৪] পেইজলিতে ইতোপূর্বে ১৮০৮ সালে সেন্ট মার্গারেটস চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্লাসগো শহরে ১৮০১ সাল হতেই ২/৩টি ক্যাথলিক চার্চ ক্যাথলিকদের ধর্মীয় কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে আসছিল। ১৮৭০ এর মধ্যে স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ক্যাথলিক চ্যাপেলগুলি ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমাজে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। চার্চের পাদ্রীগণ দারিদ্র ও অধঃপতিত জীবন থেকে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের জীবন মান অধিকতর উন্নত করতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন।[৫]

স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে যে সব আইরিশ আসে, তারা প্রধানত ছিল সাধারণ শ্রমিক।[৬] অর্থের দৈন্যতা ক্যাথলিক শিশুদের অতি অল্প বয়সে শিল্প-কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করত। সুতরাং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশ পিতা-মাতা সন্তানদের সামান্য শিক্ষাদানের ব্যাপারে সচেতন হন। প্রথমদিকে ক্যাথলিক শিশুগণ বিদ্যালয়ের স্বল্পতাহেতু প্যারিশ ও অন্যান্য চার্চ অব স্কটল্যান্ডের (প্রোটেস্টান্ট স্কুল) স্কুলে শিক্ষারত ছিল। কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাদানের সময় তারা অনুপস্থিত থাকত। 'ক্যাথলিক এমানসিপেশন ১৮২৯' আইনের মাধ্যমে প্যারিশ স্কুলের দ্বার সম্পূর্ণরূপে ক্যাথলিক শিশুদের জন্য উন্মুক্ত হয়। (সরণী-১)

অন্য একটিসূত্র থেকে জানা যায় উক্ত সময়ে স্কটল্যান্ডে ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫,২২৯। একই সময়ে অন্য ধর্মের স্কুলে ৬০০০ এর বেশী ক্যাথলিক শিশু অধ্যয়নরত ছিল। এডিনবরার ক্যাথলিক পাদ্রী ফাদার ফিগ সর্বদা ক্যাথলিক শিশুদের প্রেসবাইটরী চার্চ অব স্কটল্যান্ডের অধীনস্ত স্কুলে শিক্ষা লাভ করতে উৎসাহ প্রদান করতেন। কারণ তার মতে এরূপ স্কুলে অধ্যয়ন করলে শিশুদের ধর্মপালনে অসুবিধা হবে না।[৭]

আঠার শতকের প্রারম্ভেই অভিবাসীগণ স্কুল তৈরীর মানসে সামান্য সঞ্চিত অর্থ থেকে সহায়তা প্রদান করতেন, যা 'পেনি প্রদান' নামে আখ্যায়িত হয়েছিল। এছাড়া রোববার চার্চের প্রার্থনা সভায় 'সেকেন্ড কালেকশন' গ্রহণ করা হত। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যাথলিক জনসংখ্যার জন্য এরূপ প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। কারণ সরকার কর্তৃক প্রদেয় ১,০০,০০০ পাউন্ড অনুদান থেকে ক্যাথলিক স্কুলগুলো বঞ্চিত ছিল।[৮] ১৮৪৭ সালে 'এডুকেশন কমিটি'র কার্যবিবরণী ক্যাথলিক স্কুলগুলিকে অনুদান থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের ক্যাথলিকগণ প্রতিবাদমুখর হন। অবশেষে ১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম ১,৬৯৬ পাউন্ড ইংল্যান্ডের ৪টি ক্যাথলিক স্কুলের মধ্যে বন্টন করা হয়।[৯]

১৮৬১ সালের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতনের কিয়দংশ, 'পিউপল শিক্ষক' এর

বেতন এবং বই, ম্যাপ ইত্যাদির জন্য সরকারী সাহায্য প্রদান করা হত। ১৮৬২ সালে 'রয়াল কমিশন অন এডুকেশন ইন স্কটল্যান্ড, ১৮৫৮'এর সুপারিশের উপর একটি রিভিশন কোড করে সমস্ত পৃথক পৃথক অনুদান একত্রিত করে স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্র উপস্থিতি হার, তাদের শিক্ষার মান এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অনুদান প্রদান করা হত।[১০] স্কুল পরিদর্শক কর্তৃক স্কুল পরিদর্শনের জন্য পরিক্ষকদের ইচ্ছানুযায়ী যোগ্যতানুসারে ছাত্রদের ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হত। এরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষকদের শিক্ষাদানের চাইতে পরিদর্শককে ফাঁকি দেয়ার মানসিকতা অধিক ছিল। যে কোন উপায়ে সর্বাপেক্ষা বেশী অনুদান আদায় করার জন্য তারা যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হন।[১১] ১৮৪৭ সালের আইনানুযায়ী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ বিল্ডিং অনুদান হিসেবে প্রদান করা হত। শর্ত ছিল স্কুলঘর চার্চের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না। আঠার শতকের মধ্যভাগে প্রায় প্রতিটি ক্যাথলিক স্কুল চ্যাপেল হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৮৭২ সালে স্থাপিত 'স্কুল কোড' বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ করার মনস্থ করলে ক্যাথলিক ও এপিসকোপাল চার্চ প্রতিবাদ করে এবং সরকারী ও স্থানীয় সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলস্বরূপ, এপিসকোপাল চার্চ স্কুলের সংখ্যা কমে যায়। কিন্তু ক্যাথলিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।[১২] মনে রাখা আবশ্যক শিক্ষার জন্য চার্চসমূহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চের কোন 'শিক্ষক প্রশিক্ষন' কলেজ স্থাপিত হয়নি। স্কটল্যান্ডে জাতীয় ক্যাথলিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে উনিশ শতকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ব্যয়িত হয়।

অর্থাভাব ও অনুদান লাভের পূর্বশর্ত পূরণে অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও ক্যাথলিক শিশুদের শিক্ষার জন্য স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন প্রদেশে চার্চের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। রেনফ্রুশায়ার প্রদেশের পেইজলি, গ্রীনক, পোর্ট গ্লাসগোতে ১৮৩৭ সালে মাত্র একটি করে স্কুল ছিল। ১৮৬৫ সালে বড় বড় শহরগুলিতে স্কুল সংখ্যা ১৩তে উন্নীত হয় এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০০ তে পরিণত হয় (সরণী - ২)। স্মরণ রাখা প্রয়োজন উক্ত সময়ে প্রদেশটিতে ক্যাথলিক জনসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। স্কটল্যান্ডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল লানার্কশায়ারের (যেখানে প্রচুর ক্যাথলিক ছিল) সাথে তুলনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে রেনফ্রুশায়ারের ক্যাথলিকগণের সাফল্য ছিল প্রায় কিংবদন্তীর মত (সরণী - ৩)।

ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এসব স্কুলে অনুপস্থিতির হার ছিল অত্যধিক। তথ্যের অভাবহেতু প্রতি শহরের বার্ষিক উপস্থিতির হার দেয়া সম্ভব হয়নি। ১৮৬৫ সালে পোর্ট গ্লাসগো, ইস্টউড, নেইলস্টোনসহ ছ'টি শহরে বছরের একটি

বিশেষ সময়ে ৯১১ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০১ জন অনুপস্থিত ছিল।[১৩] যদি ৫০১ জনই ক্যাথলিক শিশু হয়, তবে প্রমাণিত হয় ৫৫% ছাত্রই অনুপস্থিত থাকছে। অনুপস্থিতিজনিত সমস্যা অন্যান্য ধর্মীয় স্কুলের তুলনায় ক্যাথলিক স্কুলে অধিক ছিল (সরণী - ৪)।

ক্যাথলিক স্কুলে অনুপস্থিতির সংখ্যাধিক্যের কারণ ছিল সম্ভবত পিতা-মাতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা। সংসারের আর্থিক সঙ্গতির জন্য শিশুদের অতি অল্প বয়সে চাকুরীতে প্রবেশ করতে হত। শিল্প এলাকায় শিশুরা বস্ত্র শিল্পে অধিকহারে নিয়োজিত ছিল। মুদ্রন শিল্পেও তারা কর্মরত ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কুলের বেতন প্রদানে অক্ষমতা শিশুদের কাজে নিয়োগ করতে বাধ্য করত। বাসবি শহরে (পেইজলি সংলগ্ন) মুদ্রন শিল্পের বেশিরভাগ শিশুই ছিল আইরিশ ক্যাথলিক। তথাকার ক্যাথলিক পিতা-মাতার সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর অপারগতার জন্য তারা মুদ্রন শিল্পে শিশুদের প্রেরণ করত। অন্তত পক্ষে শিশুরা রাস্তায় অনর্থক ঘোরাফেরা থেকে বিরত থাকত।[১৪] এতে সমাজও উপকৃত হয়েছে। শিশু অপরাধের হাত হতে সমাজ রক্ষা পেয়েছে।

ক্যাথলিক স্কুলগুলোর বেতন-ভাতাও ছিল নামেমাত্র। সর্ব নিম্ন ক্লাশে এক শিলিং থেকে সর্বোচ্চ ক্লাশে তিন/চার শিলিং মাত্র। উপরন্তু অতি দরিদ্র শিশুদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়া হত। স্কুল চ্যারিটি বল, কনসার্ট, মিনা বাজার ও সহৃদয় ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যে এ তহবিল সংগৃহীত হত।[১৫] গ্রীনক শহরে ১৮৫৪ সালে ২৫০ জনের মধ্যে ১১০ জন ছাত্রকে এবং পেইজলি শহরে ১৩০ জনের মধ্যে ৭০ জনকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করা হত। এ তথ্য প্রমাণ করে ক্যাথলিক পিতা-মাতা অত্যন্ত দরিদ্র এবং এত সুযোগ সুবিধা ও সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতেও অনেক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

এছাড়া অর্ধ দিবস প্রথা সব স্কুলে প্রচলিত ছিল। অর্ধ দিবসের শিশুদের বয়স এগার বছরের উর্দ্ধে এবং তৃতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে নয় বছর বয়সী শিশুদেরও এ সুবিধা প্রদান করা হত। তাদের জন্য প্রতি দু'সপ্তাহে তিনদিন স্কুলে উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট ছিল। বাকী সময় তারা বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। এদের জন্য পরিদর্শকগণ সরকারী অনুদানের সুপারিশ করতেন না এবং শিক্ষকগণও তাদের লেখা-পড়ায় অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করতেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রায় দ্বিগুণ কাজ দিতেন। ফলে এ শিক্ষা তাদের জন্য অত্যাচার স্বরূপ ছিল। বহু ক্ষেত্রে অত্যধিক পড়াশুনার চাপে তারা ক্লাশেই পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ত।[১৬]

ক্যাথলিক স্কুলের শিক্ষার মান নির্ণয় পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভরশীল। রেনফ্রুশায়ারের কয়েকটি শহরের এ ধরনের স্কুল ১৮৬৫ সালে সরকারী অনুদানভুক্ত ছিল। পোর্ট গ্লাসগো ও পার্শ্ববর্তী গুটিকয়েক শহরের ৫টি স্কুলের মধ্যে ৪টি স্কুলই

সরকারী অনুদান পেত।[১৭] বিল্ডিং অনুদান ছাড়াও স্কুলগুলো হয়তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা ছাত্র-শিক্ষক (পিউপিল-টিচার) এর জন্য অনুদান পেত। কারণ অনুদানের অঙ্ক অনেক বেশী ছিল। এ্যাবি পেইজলিতেও ১৮৬০ সালে একটি অনুরূপ স্কুল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য অনুদানভুক্ত হয়। পরিদর্শনের ভিত্তিতে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তি হেতু অনুমিত হয় যে, এ স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান বেশ উন্নত ছিল। পুনরায় অনুদানহীন স্কুলগুলোর মান একেবারে খারাপ ছিল বলে ধারণা করা অনুচিত। কেননা সরকারী অনুদানের পূর্ব শর্ত ছিল স্কুল ঘরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ একত্রিত করা। সে অর্থ দরিদ্র আইরিশ ক্যাথলিকদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তবে যে, স্কটল্যান্ড এর ন্যায় বহু ঐতিহাসিকের মতে অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকের সন্তানহেতু ক্যাথলিক ও এপিসকোপাল স্কুলের নাম উৎকৃষ্ট ছিল না।[১৮]

ক্যাথলিকগণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তার আয়ারল্যান্ডের সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ থেকে স্কটল্যান্ডে আসে। দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করার সঙ্গতি ছিল না। উপরন্তু শিশুদের অতি অল্প বয়সে সংসারের আর্থিক সাশ্রয়কল্পে উপার্জন করতে হত। সরকারী সাহায্যও অপ্রতুল ছিল। তৎকালীন যুক্তরাজ্যের প্রোটেস্টান্ট সরকারের ক্যাথলিক বিরোধী মনোভাবের কারণে অন্যান্য ধর্মীয় স্কুলের তুলনায় স্কটল্যান্ডের ক্যাথলিক স্কুলগুলো সরকারী অনুদান কম পেত। তথাপি ক্যাথলিকগণ হতোদ্দম হয়নি। সাধ্য মত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ধনী সহৃদয় ব্যক্তি, পাদ্রী ও অশিক্ষিত দরিদ্র অভিভাবকের আগ্রহের ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই শতকরা ১০০ জন ক্যাথলিক শিশু মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। এ সাফল্য কিংবদন্তীর মত। প্রায় কোন প্রকার সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে স্কটল্যান্ডের (বিশেষ করে রেনফ্রুশায়ারের) ক্যাথলিকগণ একক প্রচেষ্টায় বৈরী পরিবেশে শত বছরের মধ্যে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছে।

সরণী - ১ : ১৮৪০ - ১৮৫০ সালের স্কটল্যান্ডে অন্য ধর্মীয় স্কুলে শিক্ষারত ক্যাথলিক শিশুর সংখ্যা

স্কুল	মোট ছাত্রসংখ্যা	ক্যাথলিক ছাত্র
প্যারিশ	৭৬,৪৯৩	১,২৪৩
এ্যাসেম্বলী	৩৩,০০০	১,০০০
ফ্রি চার্চ	৪৮,০০০	৯৭৪
অন্যান্য	৯১,০০০	২,৮৯৮
সর্বমোট	২,৪৮,৪৯৩	৬,১১৫

সূত্র : পিপি ১৮৬৫ xvii (এ. সি. i) মেনজিম, পিপি. ১৮৬৭ xxv (৩৮৪৫) (এ. সি. 2), সি. সি. এম. ১৮৪৯/৫০, গর্ডন জে, স্কটল্যান্ড - ২৫৫

সরণী - ২ ঃ রেনফ্রুশায়ারে ক্যাথলিক স্কুল ও ছাত্র সংখ্যার হার ঃ
১৮৩৭, ১৮৫৪ এবং ১৮৬৫ সাল

শহরের নাম	১৯৩৭		১৮৫৪		১৮৬৫	
	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
এ্যাবি পেইজলি					৩	১৮৬
ইস্ট উড					১	১৭৮
গ্রীনক	১	১১০	২	২৫০	২	২৫০
কিলবারটন					১	৬৭
মিয়ার্নস					২	৭৬
নেইলস্টন					২	২৩৮
পেইজলি	১	৯০	১	১৩০	১	১৩০
পোর্ট গ্লাসগো	১	৬০			১	২৭২
মোট	৩	২৬০	৩	৩৮০	১৩	১৩৯৭

সূত্র ঃ পিপি ১৮৪১ xix, ৬৫৩-৮৩, পিপি ১৮৫৪ ix, ৫১২, পিপি ১৮৬২ xiii, ৬৭, পিপি ১৮৬৭ xxvi, ২১২-১৭

সরণী - ৩ ঃ লানার্কশায়ার ও রেনফ্রুশায়ারে ক্যাথলিক জনসংখ্যা অনুপাতে ক্যাথলিক ছাত্র সংখ্যার হার ঃ

প্রদেশের নাম	ক্যাথলিক জনসংখ্যা (১৮৬১)	ছাত্র সংখ্যা (১৮৬৫)	শতকরা হার
লানার্কশায়ার	৯৩, ৩৯৪	১৩৪৯[১]	১.৫
রেনফ্রুশায়ার	২৪,৯৫৫	১৭৯৮[২]	১৩.৮৭

সূত্র ঃ ১। সেনসাস অব স্কটল্যান্ড ১৮৬১, ভলিউম ২। ২। পিপি ১৮৬৭ xxvi

সরণী - ৪ ঃ রেনফ্রুশায়ারের কয়েকটি শহরের বিভিন্ন ধরনের স্কুলের ছাত্র উপস্থিতির হার (১৮৬৫)

স্কুলের ধরণ	স্কুল সংখ্যা	মোট ছাত্র	উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা	উপস্থিত ছাত্র সংখ্যার হার	অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যার হার
ফ্রি চার্চ	৯	৮৪২	৬৭১	৭৯.৬৯	২০.৩১
এন্টিসকোপাল চার্চ	১	১৩৮	৯৫	৬৮.৮৪	৩১.১৬
চার্চ অব স্কটল্যান্ড	৭	৭২৩	৫৪৬	৭৫.৫২	২৪.৪৮
রোমান ক্যাথলিক	৮	৯১১	৪১০	৪৫.০০	৫৫.০০
সাবস্ক্রিপসন ও ফ্যাক্টরী স্কুল	৩৮	৩১৮৫	২৪৪৪	৭৬.৭৩	২৩.২৭

সূত্র ঃ পিপি ১৮৬৭ xxvi ২১২-১৭

সূত্র-নির্দেশ

১। সি. আর. রিচার্ড, আইরিশ সেটেলম্যান্ট ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী ব্রাডফোড', *ইয়র্কশায়ার বুলেটিন অব ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল রিসার্চ*, ১৯৬৮, পৃ: ৪০-৪৭; টি, ডিলন, 'দি আইরিশ ইন লিড্স ১৮৫১-৬১', *থর্সলি সোসাইটি পাবলিকেশন*, খণ্ড ১, পৃ: ১-২০।

২। আর. মিচিসন, *এ হিস্টরি অব স্কটল্যান্ড*, লন্ডন ১৯৭০, পৃ: ৩৮১।

৩। জে. এলডার কিউমিং, *দি চার্চ অব স্কটল্যান্ড*, ভলিউম ২, এডিনবরা, ১৯৭১, পৃ: ১৮৩-১৮৪।

৪। আর. এম. স্মিথ, *দি হিস্টরি অব গ্রীনক*, গ্রীনক, ১৯২১, পৃ: ৩৮১।

৫। এন. এস. এ., খণ্ড ৭, এডিনবরা, ১৮৪৫, পৃ: ৪৫, ৩৫৫।

৬। জে. স্কটল্যান্ড, *দি হিস্টরি অব স্কটিশ এডুকেশন*, খণ্ড ১, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ: ২৫৬।

৭। এ. সি. ১, রিগ

৮। টি. আর. বোন, *স্টাডিজ ইন দি হিস্টরি অব স্কটিশ এডুকেশন* ১৮৭২-১৯৩৯, লন্ডন, ১৯৬৭, পৃ: ১৮।

৯। জে. ই. হ্যান্ডলি, *দি আইরিশ ইন স্কটল্যান্ড ১৭৯৮-১৮৪৫*, গ্লাসগো, ১৯৪৫, পৃ: ৪৯।

১০। টি. আর. বোন, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫৪-৫৭।

১১। জে. ই. হ্যান্ডলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩০২।

১২। ঐ, পৃ: ৩০৯-২০।

১৩। পিপি ১৮৬৭ ২৬, *স্টাটিসটিকস্ রিলেটিভ টু স্কুলস ইন স্কটল্যান্ড*, পৃ: ২১২-১৭।

১৪। পিপি ১৮৪৩ ১৬, *চিলড্রেনস্ এমপ্লয়মেন্ট* (ট্রেডস এ্যান্ড ম্যানুফেকচারিজ), এ্যাপেনডিক্স টু সেকেন্ড রিপোর্ট, পৃ: ৪।

১৫। জে. ই. হ্যান্ডলি, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০২-৩০৬

১৬। ঐ, ৩০৬।

১৭। পিপি ১৮৬৭ ২৬, পৃ: ২১২-২১৭।

১৮। জে. স্কটল্যান্ড, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৬।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়করণ — ইতিহাসের একটি বিতর্কিত অধ্যায়

করবী মিত্র

"তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেন বায়ে।
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।"[১]

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ আগস্ট তারিখে বাটাভিয়াতে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' নামে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, উদ্ধৃত পংক্তিতে তারই সূচনা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিজ্ঞতা তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্র' ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে।

ঐ দেশে যাবার সময় সুনীতিকুমারের মনে হয়েছিল "যে বিদেশে আমরা এখন চলেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাদের কাছে ততটা নেই — এ বিদেশ আমাদেরই দেশের এতটুকু অংশ এইরকম একটা ধারণা (যেটা historical Sense বা ঐতিহাসিক অনুভূতির ফল) আমরা নিয়ে চলেছি। কাজেকাজেই দূর বিদেশ প্রবাসের একটা চাপা আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই।[২]

বস্তুত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন যুগের সমাজ-জীবন, রাজনৈতিক জীবন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিল্প, ভাষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ভারতীয় সংস্কৃতির যে গভীর প্রভাব খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকে পড়তে শুরু করেছিল তা বিশ শতকেও অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের কাব্যময় দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই তার সুচিন্তিত উক্তিতে "ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মালয়দ্বীপ অঞ্চলে ভারতবর্ষের জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে

মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্য আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি।"[৩] এই 'তীর্থযাত্রায়' রবীন্দ্রনাথ যে সচল জীবনযাত্রা সেখানে লক্ষ্য করেছিলেন তার অনেক অংশেই স্পষ্ট ভারতীয় প্রভাব তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল।

কবির মতো ইতিহাসবিদের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাবের ব্যাখ্যা সহজ নয়। অজস্র ঐতিহাসিক এই বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে বিষয়টির একটি রূপরেখা দেওয়া গেল।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরতর অনুসন্ধানের জন্য ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেটোর ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অধ্যাপক জহর সেনের মতে "এই সমিতি প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। ভারতীয় আর্যসভ্যতার বহির্ভারতে প্রসার ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনায় স্থান পায়নি বা অবহেলিত হচ্ছে। তাঁদের ঔদ্ধত্য বা ঔদাসীন্য রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। তাই বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের ছিল অকুণ্ঠ উৎসাহ।"[৪]

প্রথিতযশা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল সংযোজিত হয়েছিল। এই কাজে তাঁদের বিভিন্ন ইউরোপীয় ও প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছিল। সমকালীন ঔপনিবেশিক যুগের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিস্তারকে তাঁরা 'উপনিবেশকরণ' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ঐ অঞ্চলকে 'বৃহত্তর ভারত' অ্যাখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত N. J. Knom এর Hindoe - Javansche Ges-chindenis বা Hindu - Javanese History গ্রন্থে এই বিষয়ে চর্চার সূচনা হয় বললে অতিরঞ্জন দোষ হয় না। ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু শিলালিপিতে দক্ষিণী লিপি ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ব্যাপক প্রচার, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট ভারতীয় প্রভাব ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের মতবাদকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিমাংশুভূষণ সরকার, কালিদাস নাগ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিজনরাজ চ্যাটার্জী, নীলকান্ত শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ ঐ মতবাদের সমর্থক ছিলেন।[৫]

তাঁদের মতের সপক্ষে প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছিলেন। সেখানে ফুনান, চম্পা, দ্বারাবতী, শ্রীক্ষেত্র, শৈলেন্দ্র, শ্রীবিজয় প্রভৃতি রাজ্য পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছিল যেগুলি প্রধানত ভারতীয় হিন্দু অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হত। ধর্মচেতনা, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে

শিব-বুদ্ধ দেবতার প্রচলন হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারত কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে লোকসংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক হিমাংশুভূষণ সরকারের গবেষণার উল্লেখ করা যায়। তিনি ডাচ, ফরাসী, জার্মান, প্রাচীন জাভা ও বলিদ্বীপের ভাষা শিখে মূল উৎসগুলির অনুসন্ধান করেছিলেন। ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিলালিপিগুলির তিনি ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রধানত সিলজাঁ লেভি, জর্জ কিদেম, জে এফ ক্যাভি প্রমুখ গবেষকবৃন্দ ভারতীয়করণের মতবাদকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

প্রত্যেকের মতবাদের গভীরে না গিয়ে আমরা তাঁদের মতের ক্ষুদ্র একটি সারমর্ম আলোচনা করতে পারি। নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে ভারতের তৈরী কাঁচের পুঁতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে সংযোগের প্রমাণ মেলে। মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত এশিয়ার এই অঞ্চলগুলিতে একই ধরনের প্রচলিত কিছু সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও পূর্বপুরুষের পূজা, একই ধরনের কিছু শব্দের ব্যবহার, যন্ত্রপাতির প্রচলন প্রভৃতি উদাহরণ দেওয়া যায়।[৬] সম্ভবত ভারতে আর্যদের আগমণের পূর্বে ইন্দোচায়না অঞ্চল থেকে এক বা একাধিক উপজাতি গোষ্ঠীর যাতায়াতের সূত্রে এই মিলগুলি পাওয়া যায়। চীনা তথ্যে 'কুন লুন' বা ক্লীং নামে কোনও গোষ্ঠীর বিশেষ লিখন পদ্ধতি, ভাষা, বণিক, জলদস্যু প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছিল। ভারতীয় প্রভাব পৌঁছানোর আগে অবশ্য এই শব্দটি অমিল। কাজেই 'কুন লুন' বা ক্লীং শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধেও বিতর্ক আছে।

উপনিবেশ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে উপলব্ধি বিশ শতকের প্রথম দিকের ঐতিহাসিকদের হয়েছিল বিভিন্ন প্রমাণ থেকে মনে হয় যে সেই একই অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভারতীয় 'উপনিবেশকরণের' আওতায় আসেনি। কারণ 'উপনিবেশে' যেভাবে অর্থনৈতিক শোষণ চলে প্রাচীন যুগে সেধরনের কোনও ঘটনার নজীর আমাদের চোখে পড়েনা। সর্বোপরি ভারতে এযাবৎকাল এই বিষয়টির সপক্ষে জোরালো পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত তথ্যগুলি প্রায় সবই পরোক্ষভাবে ঐ অঞ্চলে ভারতীয়দের নিয়মিত যাতায়াতের দিকে নির্দেশ করে। যেমন বৌদ্ধজাতকে সমুদ্রযাত্রা ও বণিকের উল্লেখ, রামায়ণে জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ, পালি ধর্মগ্রন্থ মহাধর্মনির্দেশতে বিশেষ কিছু স্থানের উল্লেখকে নির্দেশ করা যায়। মেনান অববাহিকা অঞ্চলে ফ্রাপ্যাথিম, ফাং তুক অঞ্চলে গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী ধারায় নির্মিত বৌদ্ধ স্থাপত্য নিদর্শন, সেলিবিয়ে ও ভিয়েতনামের ডং ডুয়ং অঞ্চলে অমরাবতী রীতিতে নির্মিত বুদ্ধমূর্তির প্রভৃতি অজস্র নিদর্শনের উল্লেখ করা যায়।

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে সমুদ্র পারাপারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁরা বিভিন্ন দ্বীপে যাতায়াত শুরু করেছিলেন এই বিষয়টিও নানা বিতর্কের অবতারণা করে।। সম্ভবত প্রাচীন ভারতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ছাড়াও এমন কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল যা হয়তো তাদের সমুদ্রপার হবার সাহস যুগিয়েছিল। প্রাচীনতম এই ধরনের একটি ঘটনার উদাহরণ খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অনুষ্ঠিত মৌর্য্য সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ জয়।

তবে প্রাণভয় বা রাজ্যস্থাপনের আকাঙ্খার চাইতে সম্ভবত বাণিজ্যিক কারণে ভারতীয় বণিকরা মশলা, সুগন্ধি, স্বর্ণ ও চন্দনে সমৃদ্ধ ঐ দ্বীপগুলির উদ্দেশ্যে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে পা বাড়াত।

দুটি বিষয় অভিযাত্রীদের সহায়তা করেছিল। প্রথমত ৬০০ থেকে ৭০০ জন যাত্রী বহনের উপযোগী নৌযানের ব্যবস্থা[৭] এবং দ্বিতীয়ত বৌদ্ধধর্মের প্রসার। এই ধর্মে বর্ণগত বৈষম্যের অনুপস্থিতির ফলে দ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে সম্পর্ক স্থাপনের পথে কোনও প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়নি। এই সময় বৌদ্ধ বণিকদের অজস্র উল্লেখ বৌদ্ধজাতকে বর্তমান।

নিয়মিত যাতায়াতের সূত্রে সম্ভবত কিছু ভারতীয় প্রভাবিত রাজ্য সেখানে গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ কেদা রাজ্যের উদ্ভবের উল্লেখ করা যায়। সেখানে দেশজ প্রভাব সক্রিয় না থাকার ফলে ভারতীয় বণিকদের পক্ষে বসতি স্থাপন সহজ হয়েছিল। একই ভাবে মধ্য জাভা, মনদের দ্বারাবতী, কম্বোডিয়ার অংকোর, প্যাগান বার্মা বাণিজ্যকেন্দ্র অপেক্ষা উন্নত রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বণিক ছাড়াও ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা ভারতীয় প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উল্লিখিত রাজ্যগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের প্রভাব, সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

আধুনিক কালের এই গবেষণার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মধ্যে ডি. জি. ই. হল (D. G. E. Hall), ভ্যান ল্যর (Van Leur), এফ. ডি. কে. বস (F. D. K. Bosch) নিকোলাস টার্লিং (Nicholas Tarling) প্রমুখের গবেষণার উল্লেখ করা যায়।[৮] বিশদ বিবরণে না গিয়ে বলা যায় যে, এঁরা ঐ অঞ্চলের দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁরা মনে করেন যে ভারতীয় প্রভাব পৌঁছনোর অনেক আগেই ঐ অঞ্চলে দেশজ সংস্কৃতি তথা অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত কৃষিপ্রধান সমাজগুলিতে কিছু একই ধরনের রীতিনীতির সাদৃশ্য তাঁদের কাছে অধিক গুরুত্বলাভ করেছে।

ঐতিহাসিক পল মুস - এর মতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমতের অনুপ্রবেশের সময় ঐ

অঞ্চলের সমাজে আগন্তুক ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নেবার অনুকূল পরিবেশ তৈরী ছিল।[৯] ভ্যান ল্যর মনে করেন, যে বহিরাগত প্রভাবগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিষ্ঠিত সমাজগুলির কাছে একান্ত গৌণ ছিল। বণিকরা যে ভারতীয় প্রভাব বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই মতাবাদও তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশজ সমাজ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ভারতীয় ভাবধারা, শিল্পরীতি, রাজনৈতিক অনুশাসন গ্রহণ করেছিল। তবে এই গ্রহণের বিষয়টি একান্তভাবে অভিজাততান্ত্রিক ছিল। সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে দেশজ সংস্কৃতি বেঁচে থাকার প্রধান রসদ যোগাত।[১০]

সিদ্ধান্তে বলতে পারা যায় যে, আলোচ্য অঞ্চলে শান্তিপূর্ণপথে ও অরাজনৈতিক ভাবে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

ভারতের নানা অঞ্চল এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। বিষয়টি আরো গভীরতর গবেষণার দাবী রাখে।

ভূয়োদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিজ্ঞতায় ফিরে আসি —

"হয়েছিল রাখীবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে
সেই রাখী যে আজো দেখি
তোমার দখিন হাতে।[১১]

কাজেই কোনও দম্ভদৃপ্ত দিগ্বিজয় নয়, বণিকের মানদন্ডও নয়, পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী'*, জাভাযাত্রীর পত্র, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৬৭ বঃ, পৃ: ৪০-৪২।

২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *'রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ২০০২, পৃ: ২২।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃ: ৬।

৪। জহর সেন, 'প্রাচীন ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া : হিমাংশু ভূষণ সরকারের গবেষণা', *ইতিহাস অনুসন্ধান*-১৩, ফার্মা কে এল এম প্রা: লি:, ১৯৯৯, পৃ: ৮৪।

৫। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, *এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান কলোনীস ইন দ্যা ফার ইষ্ট*, প্রথম খণ্ড, পাঞ্জাব সংস্কৃত বুক ডিপো, লাহোর, ১৯২৭ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ঢাকা, ১৯৩৭-৩৮, হিমাংশু ভূষণ সরকার, ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য লিটারেচার অব জাভা এন্ড বালি, কলকাতা, গ্রেটার ইন্ডিয়া সোসাইটি, ১৯৩৪, *কর্পাস অব দ্য ইনসক্রিপশন অব জাভা আপটু ৯২৬ এ. ডি.*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম মুখো, ১৯৭১।

৬। বিশদ বিবরণ জর্জ কিদেস, *দ্য ইন্ডিয়ানাইজড স্টেটস অব সাউথ ইষ্ট এশিয়া*, হনলুলু, ১৯৬৮।

৭। দ্রষ্টব্য এস বিল, *ট্রাভেলস অব ফাহিয়েন এন্ড সুইউন বুদ্ধিষ্ট পিলগ্রিমস ফ্রম চায়না টু ইন্ডিয়া*, লন্ডন, ১৮৯৬

৮। ডি. জি. ই হল, *এ হিস্ট্রি অব সাউথ ইষ্ট এশিয়া*, নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৬৮, জে. এফ. ক্যাডি সাউথ ইষ্ট এশিয়া, ইটস হিস্টরিয়াল ডেভেলপমেন্ট, নিউ দিল্লী, টি. এম. এইচ এডিশন, ১৯৭৬, এন টার্লিং (সম্পা:) *'দ্য কেমব্রিজ হিস্ট্রি' অব সাউথ ইষ্ট এশিয়া*, প্রথম খণ্ড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২, ভ্যান ল্যার, *'ইন্দোনেশিয়ান, ট্রেড এন্ড সোসাইটি*, দ্য হেগ এন্ড বানদুং , ১৯৫৫ প্রভৃতি।

৯। জে. ডি. লেগি, দ্য রাইটিং অব সাউথ ইষ্ট এশিয়ান হিষ্ট্রী' তে উল্লেখিত, দ্রষ্টব্য পূর্বোল্লিখিত কেমব্রিজ হিস্ট্রি, পৃ: ১-৪৩।

১০। তদেব।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী'* তদেব।

ডি. এইচ লরেন্স এবং শিল্প বিপ্লব

জয়িতা রায়

ডি. এইচ. লরেন্স নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের উপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার এবং মনস্তাত্ত্বিক। তাঁর লেখায় তাঁর যে বিদ্রোহীসত্ত্বার পরিচয় আমরা পাই, তা আমাদের মনে প্রেম, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে সনাতন ধ্যানধারণা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায়। শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সামাজিক সম্পর্ক, বিশেষত নারীপুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও তার নিবিড় বিশ্লেষণ লরেন্সের লেখার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ঠিক কবে ঘটে তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। ঐতিহাসিকদের মতে এর সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা অতি দ্রুত বিকাশলাভ করতে শুরু করে।[১] শিল্পবিপ্লবের প্রভাব এতটাই ব্যাপক ছিলো যে ১৮৫০ সালের মধ্যে সমগ্র ইংলন্ডের এক আমূল পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যায়। ইংলন্ডের গ্রামাঞ্চলের ছবিটা দ্রুত বদলে যায়, গড়ে ওঠে নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল। আকাশ ঢেকে যায় কারখানার চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা কালো ধোঁয়ায়।[২]

সৃষ্টি হয় এক অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার। সমাজমনস্ক লরেন্স তাঁর উপন্যাসে এই সমাজের ছবিটাই তুলে ধরেছেন। তাঁর আপাত দৃষ্টিতে 'রোমান্টিক' বা কাব্যিক উপন্যাসগুলিতে বদলে-যাওয়া সময়ের প্রেক্ষিতে মানবীয় সম্পর্কের বিবর্তনকে তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

লরেন্স জন্মেছিলেন এক খেটে খাওয়া শ্রমিক পরিবারে। তাঁর বাবা কাজ করতেন ইস্টউডের কয়লাখনিতে। এই খনি শ্রমিকদের সমাজেই লরেন্সের ছোটবেলা কেটেছিল।[৩] পরবর্তীকালে লরেন্স তাঁর 'নটিংহাম অ্যাড দ্য মাইনিং কান্ট্রী'[৪] প্রবন্ধে এই ইস্টউডের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। লরেন্স দেখিয়েছেন কিভাবে ইস্টউডের শান্ত গ্রামীণ পরিবেশ গ্রাম সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পরিণত হয় এক কুৎসিত 'ভিক্টোরিয়ান' শহরে। কিভাবে বেসরকারী খনি কোম্পানীগুলির দৌরাত্ম্য এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই শহরের নীচুতলার জীবনযাত্রার বর্ণনায় অনিবার্যভাবেই মিশে গেছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপ। লরেন্স তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর অসংস্কৃত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাত্রার প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে তেমনই তোপ দেগেছেন মধ্যবিত্ত, তথাকথিত রুচিশীল সমাজের বিরুদ্ধে। লরেন্স এবং তার বাবার মতে নপুংসক মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশী শ্রেয় অন্ত্যজ মানুষের পুরুষালি বর্বর জীবনযাপন।

পার্কিন্স ও ই. পি. থমপ্সনের মতে শিল্পবিপ্লবের ফলে আমরা যাকে শ্রেণী বলি তার জন্ম হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল আয়ের একই উৎসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সৃষ্টি। তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল এবং নিজস্ব শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠল।[৫] সামাজিক পিরামিডকে কেন্দ্র করে বহু অর্থনৈতিক দলের সৃষ্টি হল, — যথা কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, লন্ডননগরীর গোষ্ঠী, বৃষ্টলের চিনি বিক্রেতার দল, লিভার পুলের ক্রীতদাস বিক্রেতারা ইত্যাদি। যদিও শ্রেণীভেদ পূর্বেও ছিল এবং সমাজে উচ্চ-নীচের দ্বন্দ্বের উদাহরণও আছে, পার্কিন্সের বক্তব্য হল যে ১৮ শো শতাব্দীর পূর্বে দ্বন্দ্ব হত বিভিন্ন সামাজিক পিরামিডগুলির মধ্যে।

শিল্পবিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি শ্রমবিভাজন। আর এই শ্রমবিভাজন থেকেই জন্ম নেয় শ্রেণীবৈষম্য। আসে শ্রেণীসচেতনতা। লরেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস *সন্স অ্যান্ড লার্ভাস*-এ এই শ্রেণীসচতনেতার আভাস পরিস্ফুট। উপন্যাসের নায়ক পল তার মা মিসেস. মোরেলের স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ নিছকই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। এর পিছনে রয়েছে এক গভীর শ্রেণীবিদ্বেষ, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মধ্যবিত্ত সমাজের চিরন্তন ঘৃণা। এই ঘৃণাকে লরেন্স প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর বাবার প্রতি তাঁর মায়ের বিদ্বেষের মধ্যে। *সন্স অ্যান্ড লার্ভাস* উপন্যাসটি তাই অনেকদিক থেকেই আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। পলের চোখ দিয়ে দেখা লরেন্সের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জলছবি। লরেন্সের মা লিডিয়াও ছিলেন মিসেস. মোরেলের মতই এক প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। স্বামীর শ্রমিকসুলভ বর্বরতাকে তিনি কখনই মেনে নিতে পারেননি। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন তাঁর ছেলেদের বিশেষত লরেন্সকে স্বামীর কু-প্রভাব থেকে দূরে রাখতে, তাদের এক উন্নততর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে। শ্রেণীসচেতনতা ও শ্রেণীবিদ্বেষেব সঙ্গে লরেন্সের এই প্রত্যক্ষ পরিচয় পরবর্তী কালে তার সমস্ত রচনার উপরেই পড়েছে। যেমন তাঁর উপন্যাস 'এ সিক কোলিয়ার', 'ডটার্স অফ দ্য ভিকার', 'ফ্যানি অ্যান্ড অ্যানি' ইত্যাদি।

ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের বিকাশ ঘটে কতগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কে আবিষ্কার করেন ফ্লাইং শাটল, যা যন্ত্রশিল্পে এক নতুন যুগের সূচনা করে। উৎপাদনশীলতা এক লাফে দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জেমস্ হারগ্রিভস এর স্পিনিং জেনি, (১৭৭৮) কিংবা রিচার্ড আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেমার বস্ত্রশিল্পের এই বিকাশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জেমস ওয়াট আবিষ্কার করলেন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। কলকারখানায় ভরে উঠতে লাগল গ্রামাঞ্চল। কবি উইলিয়াম ব্লেক এই কারখানাগুলিকে শয়তানের কারখানা আখ্যা দিয়েছিলেন।

কলকারখানার সংখ্যা এবং কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারখানা সংলগ্ন অঞ্চলে

অতি দ্রুত বেড়ে উঠল শ্রমিক বস্তির সংখ্যা। এইসব বস্তি - জীবনে না ছিল স্বাচ্ছন্দ্য না ছিল শান্তি। বস্তির অসহনীয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ হারাতে লাগল তার মনুষ্যত্ব, দূষণ ছড়িয়ে পড়ল তার দেহে, মনে, তার সমাজজীবনে। এমনই এক দূষিত খ্রিষ্ট শ্রমিকসমাজের পরিচয় আমরা পাই এলিজাবেথ গ্যাসকেলের লেখা *মেরি বার্টন* এবং *নর্থ এনড সাউথ* উপন্যাস দুটিতে।

লরেন্সের *সন্স অ্যান্ড লাভার্স* এ শ্রমিক বস্তির কদর্য, অস্বাস্থ্যকর রূপটি স্পষ্ট। উপন্যাস থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে "The Bottoms" succeded to Hell Row. Hell Row was a block of thatched, bulging cottages that stood by the brookside on Greenhill Lane. There lived the Colliers who worked in the little gin - pits two fields away......... The dwelling room, the kitchen, was at the back of the house, facing inward between the blocks, looking at a scrubby back garden, and then at the ash-pits. And between the rows, between the long lines of ash-pits, went the alley, where the children played and the women gossipped and the men smoked. So, the actual conditions of living in tue Bottoms, were quite unsavoury because people must live in the kitchens, and the kitchens opened on to that nasty alley of ash - pits.

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি পর্যায়েই সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী সবলের হাতে শোষিত ও নিপীড়িত হয়েছে। শিল্পবিপ্লব এই শোষণ ও নিপীড়ণকে নতুন মাত্রা দিল। মালিক পক্ষ চাইল যাবতীয় নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকদের প্রতারিত ও বঞ্চিত করে তাদের পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে। এ কাজে তারা তাদের দোসর হিসাবে পেলে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মমন্ডলীকে। চার্চ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে শেখালো কিভাবে যাবতীয় অত্যাচার, বঞ্চনা মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়। তবেই মিলবে স্বর্গ প্রবেশের ছাড়পত্র। অর্থলোলুপ মালিকপক্ষ আর সনাতন পন্থী চার্চ - পুঁজিবাদ সমাজ এ দুয়ের যাঁতাকলে পড়ে শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। এরই সঙ্গে আমদানি হল এক নতুন রাজনৈতিক দর্শনের, যার নাম 'লেসে্ ফেয়ার' বা মুক্ত বাণিজ্যের নীতি। লেখক - দার্শনিক কার্লাইল একে ঠাট্টা করে 'শুয়োরের দর্শন' নাম দিয়েছিলেন। অবহেলিত শ্রমিক সমাজের অধঃপতনের সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ল মেয়েদের উপর। নুতন সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন মেয়েরা ঘর থেকে বেড়িয়ে অর্থ উপার্জন করতে লাগল, অন্যদিকে তেমনই পারিবারিকস্তরে সৃষ্টি হল চরম অশান্তি। সনাতন সমাজ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট শ্রমবিভাগ অনুসারে নারীর ভূমিকা ছিল ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিল্পমুখী সমাজ ব্যবস্থা সেই সনাতন ধারণাকে ওলট - পালট করে দিল। তৈরী হল নারী স্বাধীনতা বা নারীমুক্তির এক নতুন সামাজিক দাবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইংলন্ডে শ্রমজীবি মেয়েরা তাদের নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে শ্রম আইন সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার ও সমান মজুরির দাবিতে ক্রমশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। *সন্স অ্যান্ড লাভার্স* এ এমনই এক বিদ্রোহী নারীচরিত্র ক্লারা ডস। উনবিংশ শতাব্দীর ৩০ ও ৪০ এর দশকে 'শ্রমিক নারী' এক সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত হয়। ধীরে ধীরে শ্রম আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা পুরুষদের তুলনায় ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকারকে সংকুচিত করে পুরুষশাষিত সমাজ শোষণের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। লরেন্সের বিদ্রোহী সত্ত্বা কোনওদিনই এই বঞ্চনাকে মেনে নিতে পারেনি। তাঁর সৃষ্টি নারীচরিত্রগুলি বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি। তবু তারা বিদ্রোহিনী। তাদের চরিত্রায়নে ফুটে ওঠে নারীত্বের এক নতুন রূপ। *সন্স অ্যান্ড লার্ভাস* এর ক্ল্যারা, *'রেনবোর'* উর্সুলা এবং *উইমেন ইন লাভ* এ গুড্রুন এমনই কয়েক জন ব্যতিক্রমী 'নব্য নারী'।

শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি পুঁজিবাদ। আর পুঁজিবাদের হাত ধরে এলো বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। লরেন্সের *ক্যাঙারু* এবং *দ্য প্লুমড় সারপেন্ট* এ সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রসভ্যতার রূপটি ধরা পড়েছে।

লরেন্স বিশ্বাস করতেন মানুষ (পুরুষ ও নারী যেই হোকনা কেন) যদি তার নিজের প্রকৃত সত্ত্বার সন্ধান পেতে চায় তবে তাকে তার পরিবারের এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গন্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। প্যাট হাডসন, *দ্য ইনডাসট্রিয়াল রেভোলিউসন*, গ্রেট ব্রিটেন ঃ রুটলেজ চ্যাপমেন অ্যান্ড হল, আই. এন. সি., ১৯৯২।

২। জওহরলাল নেহেরু, *গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিষ্টরি*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২ (প্রথম মুদ্রন)।

৩। রিচার্ড অলডিংটন, *ডি. এইচ. লরেন্স ঃ অ্যান ইনডিস্ক্রিসন*, সেট্‌ল ঃ ইউনিভার্সিটি অফ সেট্‌ল বুক স্টোর, ১৯২৭।

৪। ডি. এইচ লরেন্স, *সিলেকটেড এসেস*, পেঙ্গুইন বুকস লিমিটেড, ১৯৫০, ১৯৫৪, ১৯৬০।

৫। পার্কিনস্. *দ্যা ওরিজিনস্ অফ মডার্ন ইংলিশ সোসাইটি*. লন্ডন, ১৯৬৯, ই. পি. থম্পসন, *দ্য মেকিং অফ দ্য ইংলিশ ওয়ার্কিং ক্লাস*, লন্ডন, ১৯৬৩।

শক্তির ভারসাম্য ঃ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পরবর্তী পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত প্রাধ্যন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফুকুয়ামা এই পরিস্থিতিকে ইতিহাসের সমাপ্তি (দ্য এন্ড অফ্ হিস্ট্রি)[১] বলে বর্ণনা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মত সাধারণ মানুষের মনেও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে আজকের আন্তর্জাতিক বিশ্বে নতুন করে কোনরকম শক্তির ভারসাম্য আনা সম্ভব কি না। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক বিশেষ পর্যায়কে (১৬৪৮ - ১৯১৪) শক্তির ভারসাম্য অথবা ব্যালেন্স অফ পাওয়ার নামে অভিহিত করা হয়েছিল। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ইতিহাসের ধারায় এই শক্তির ভারসাম্য ছিল একটি ধারণা, একটি প্রক্রিয়া এবং একটি ব্যবস্থা। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই 'শক্তির ভারসাম্য' বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে দেখা দরকার যে এই ব্যবস্থা কোন্ প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আগ্রাসী নীতিকে প্রতিহত করার জন্য নতুনভাবে কোন শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কি না।

শক্তির ভারসাম্য ঃ একটি ধারণা

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য প্রাথমিকভাবে একটি ধারণা। এই ধারণায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশেষত বিভিন্ন বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্পর্কের তত্ত্বকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের একটি মৌলিকনীতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র যতদিন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে ততদিন শক্তির ভারসাম্য একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অব্যাহত থাকবে।

শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল আন্তর্জাতিক সমাজে রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা ও শক্তির পরিমাপের সমতা বজায় রাখা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন পরিমন্ডল সৃষ্টি করা দরকার যাতে কোন অবস্থাতেই একটি রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে। শক্তির ভারসাম্য হল এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে

এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে কোন রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলেই তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপরাজেয় জোটের সম্মুখীন হতে হয়।

ধারণা হিসেবে শক্তির ভারসাম্য সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত সার্বভৌমত্বের ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরও মূল ভিত্তি। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফ্যালিয়া চুক্তির পরে এই ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত। ফরাসী দার্শনিক জাঁ বোঁদার (১৫৩০-১৫৯৬) তত্ত্বে আমরা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পাই। তবে এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির দার্শনিক নিকেলো ম্যাকিয়াভেলিকে (১৪৬৯-১৫২৭) এক অর্থে তাঁর পূর্বসূরী বলা যায়। বোঁদার মতে সার্বভৌমত্বের অবস্থান রাষ্টের মধ্যে, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে নয়। তাই সার্বভৌমত্বের ধারণাটি ধারাবাহিক। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যান্য সীমাবদ্ধতা ছাড়াও অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ নেই।[২]

শক্তির ভারসাম্য ঃ একটি ব্যবস্থা

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপকে ধ্বংস করেছিল। ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। অবশ্য পার্কারের মতে এই চুক্তিটির ইতিবাচক দিক সব রাষ্ট্রের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। যেমন এই যুদ্ধের পরেও স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। পোল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে শত্রুতার তখনও অবসান হয়নি। আরও অনেক স্তরে অনেক অমীমাংসিত পরিস্থিতি চলে এসেছিল।[৩] তবু এই চুক্তিটিকে ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈঠক বলা হয়। এই চুক্তি ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত এই চুক্তি আন্তর্জাতিক সমাজে প্রথম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা নিয়ে আসে। তৃতীয়ত এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যে ব্যবস্থাকে নতুন উদ্ভূত জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে অলিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের মত মেনে চলেছিল।

তাছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি নানাদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই চুক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকৃতিদান করে। মধ্য ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কলমের এক আঁচড়েই সার্বভৌমত্বলাভ করে। নির্দিষ্ট ভূখন্ড বিশিষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পোপের বদলে রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মকে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। দ্বিতীয়ত ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর সব শাসকরাই জাতীয় সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে তৎপর হন। রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়। তার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বাড়ে, তার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় ও তার ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়ত এই ওয়েস্টফ্যালিয়া চুক্তি আন্তর্জাতিক বিশ্বে কয়েকটি শক্তিশালী

রাষ্ট্রকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেছিল — রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইউনাইটেড প্রভিন্সেস (বর্তমানে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম অঞ্চল)। এদের মধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ধর্মতান্ত্রিক উত্থানের ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে পা বাড়ায়। অপরদিকে রাশিয়া ও প্রাশিয়া ভূমিদাসপ্রথার অস্তিত্বে সামন্ততন্ত্রকেই টিকিয়ে রাখে। তবে উভয় ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্রের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিবর্তনশীল চুক্তির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সময় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপ মহাদেশের গন্ডী ছাড়িয়ে অন্যান্য মহাদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তর আমেরিকায় ভূখন্ডদখল নিয়ে ইংল্যাড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৪]

দীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল ধরে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থার অস্তিত্বকে আমরা অবশ্যই বিস্ময়কর বলে দাবি করতে পারি। এই সময়কালে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও নেপোলিয়ানের যুদ্ধ হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের (৫০ খ্রিষ্টপূর্ব - ৪০০ খ্রিষ্টাব্দ) পতনের পর ইউরোপে এত স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থা আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই স্থায়িত্বের পিছনে কোন একক শক্তির আধিপত্য ছিল না। বরং এই ব্যবস্থা ছিল একেবারে বহুত্ববাদী। তবে তার মানে এই নয় যে স্বার্থত্যাগ করে জাতীয় রাষ্ট্রগুলি এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছিল। তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, সন্দেহ ছিল এবং যে কোন সময়ে তারা ব্যবস্থাটি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারত।[৫]

এই দীর্ঘ কালপর্বের শেষ পর্যায়ে ইউরোপে রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন বিশেষভাবে মনে রাখার মত। ১৮৭০ সালে ইতালির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান রাষ্ট্রের পত্তন হয় ৩৯টি খন্ডকে একত্রিত করে ১৮৭১ সালে। ১৮৩০ সালে হল্যান্ড বিভক্ত হয় নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে। পাশাপাশি অটোমান সাম্রাজ্যের বাঁধন আলগা হয় যার ফলে ১৮২৯ সালে গ্রীস স্বাধীনতা পায়।[৬]

এত নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্যেও শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিল। এর কতকগুলো কারণ ছিল।

প্রথমত ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে একধরনের অন্তর্নিহিত ঐক্য ছিল। তারা ইউরোপীয়, খ্রিষ্টান, সুসভ্য এবং শ্বেতাঙ্গ—এই অনুভূতি থেকে তারা 'তাদের' পৃথিবীর অন্যান্য 'অপরদের থেকে আলাদা ভাবত।

দ্বিতীয়ত এই ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পশ্চাদপদ ভূখণ্ডগুলিতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে শান্তিভঙ্গ এবং তজ্জনিত ক্ষয়ক্ষতির বদলে তারা ঔপনিবেশিক শোষণে মন দিয়েছিল। উপনিবেশগুলি ছিল তাদের সুলভে কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের যোগানদার —উদ্বৃত্ত পণ্য

বিক্রী কবার বাজার ও উদ্ধৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা। এই ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মাধ্যমে ইউরোপের এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ পায়। এই সময় শিল্পবিপ্লব অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত হয়।

তৃতীয়ত তখনও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তেমন হয়নি। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী হয়নি। তাই পারমাণবিক যুগের ভীতি ও সন্ত্রাস থেকে তখন আন্তর্জাতিক বিশ্ব মুক্ত ছিল।

চতুর্থত গণবিপ্লবেব ভয়ে তখন ইউবোপের এলিট শ্রেণীগুলি ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করত। তার ফলে কন্টিনেন্টাল ইউরোপে একধরনের না-যুদ্ধ অবস্থা গড়ে উঠতে পেরেছিল।

ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিপ্লব হয় ১৭৭৬ সালে। আমেরিকান ও ফবাসী বিপ্লবের পরে দুটি মূল নীতি গুরুত্ব পায়। একটি শাসিতের সম্মতির দ্বারা চরম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ। আরেকটি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ যার ফলে মানুষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে অগ্রসর হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই দুটি নীতি রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে। ইউরোপের তৎকালীন পাঁচটি রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস অফ ভিয়েনা প্রতিষ্ঠা করে যার ফলশ্রুতি হল কনসার্ট অফ্ ইউরোপ। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে বড় যুদ্ধ বলা যায়। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নিরপেক্ষ ছিল। এইসময় আরও কিছু স্বল্পস্থায়ী ছোট খাট আঞ্চলিক যুদ্ধ হয়েছিল যেগুলিতে পাঁচটি বৃহৎ শক্তি কোনটিতেই যোগ দেয়নি।[৭]

শক্তির ভারসাম্য ঃ একটি প্রক্রিয়া

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে শক্তির ভারসাম্য একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করেছিল। আমরা যদি শক্তির ভারসাম্যকে একটি মুদ্রা হিসেবে ধরি তাহলে তার একপিঠে ছিল ইউরোপীয় ভূখন্ডে বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্র সম্বরণের নীতি। আর তার অপর পিঠে ছিল এই ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসী অর্থনৈতিক লোভ যার প্রকাশ ঘটেছিল ঔপনিবেশিক বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় যে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক উত্থানকে ত্বরান্বিত করার জন্যই শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং তাকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে দেখা গেল যে উপনিবেশ বিস্তারের প্রক্রিয়ায় আফ্রিকার মোট ভূখন্ডের প্রায় ৮৫ শতাংশ ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এশিয়াতে জাপান ও থাইল্যান্ড শুধুমাত্র সরাসরি ইউরোপ বা আমেরিকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

১৮৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিলিপিনস্, পুয়ের্তোরিকো, কিউবা ও অন্যান্য ছোট দ্বীপগুলি থেকে স্প্যানিশদের বিতাড়িত করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে পৃথিবীর মোট ভূখন্ডের পাঁচভাগের চারভাগই ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।[৮]

শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই। দুটি শক্তিশালী পরস্পরবিরোধী শিবির গড়ে ওঠে। ১৮৮২ সালে জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং ইতালির মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি গড়ে ওঠে। ব্রিটেন এইসময় জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে চীনে রাশিয়ার অগ্রগতিকে বন্ধ করার জন্য। এই চুক্তিটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রথম একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র (ব্রিটেন) একটি এশিয়ার রাষ্ট্রের (জাপানের) সঙ্গে চুক্তি করল অপর একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের (রাশিয়ার) বিরুদ্ধে। এইভাবে ব্রিটেন ভারসাম্যরক্ষাকারীর ভূমিকা থেকে সরে আসে। ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের চুক্তি সম্পাদিত হয়। শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানীর ভূমিকা একটু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের মানচিত্রে বৃহৎশক্তি হিসেবে জার্মানীর আবির্ভাব অনেক দেরীতে। তাই জার্মানীর নেতারা মনে করতেন যে জার্মানীকে যথাযথ কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস অফ্ বার্লিন জার্মানীকে মোটেই খুশি করতে পারেনি।

শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা সঠিক অর্থে ভেঙে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মধ্যে ১৯১৪ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। প্রথমত এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। অস্ট্রো হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তদুপরি অটোমান সাম্রাজের পতন হয় এবং অটোমানদের ইউরোপ থেকে বহিষ্কার করা হয়। দ্বিতীয়ত ভার্সাই চুক্তির শর্ত জার্মানদের আরও অসন্তুষ্ট করে। সেই অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে স্বৈরাচারী নাৎসীবাদী হিটলারের জন্ম দেয়। তৃতীয়ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে লীগ অফ্ নেশনস তৈরী হয়। কিন্তু লীগের আইনগত বা রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল দুর্বল এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা করার মত ক্ষমতা লীগের ছিল না।[৯] সব মিলিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী দীর্ঘ কুড়ি বছর (১৯১৯-১৯৩৯) ছিল আন্তর্জাতিক সমাজ এক অস্থিরতার যুগ। তাই এইসময় থেকেই শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থার পুনরুত্থানের সব আশাই নির্বাপিত হয়।

শক্তির ভারসাম্য ঃ ত্রুটি

শক্তির ভারসাম্য — তাকে ধারণা, ব্যবস্থা অথবা প্রক্রিয়া — যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি না কেন তার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। একটা বিশেষ পর্যায়ে ইউরোপ মহাদেশে খুব বড় যুদ্ধকে প্রতিরোধ করেছিল এই শক্তির ভারসাম্য। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থাটির কতকগুলি অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল যার প্রভাব সামগ্রিক ভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বের উপর পড়েছিল। মহাদেশীয় ইউরোপকে যুদ্ধবিগ্রহের কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিল। এর ফলে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং এই অঞ্চলগুলির প্রকৃতি ও মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরে বৃহৎ শক্তিগুলির অর্থনৈতিক শোষণের কবলে পড়ে যায়। ফলে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থার অর্থ দাঁড়ায় ঔপনিবেশিক শোষণের মূল্যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হওয়া। সেইদিক দিয়ে দেখলে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থাকে আদৌ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থাকে একটি ব্যবস্থা অথবা আদৌ কোন ব্যবস্থা বলা যায় না বলে অনেকে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল অনেক উপব্যবস্থা অথবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বলকান ব্যবস্থা বা জার্মান ব্যবস্থা। এই আঞ্চলিক ভারসাম্যগুলি বৃহৎ শক্তির সম্পর্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকটি দশক ধরে ইউরোপে দুটি পৃথক ভারসাম্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বলে অনেকে মনে করেন— একটি পশ্চিম ইউরোপে এবং অপরটি পূর্ব ইউরোপে।

এইসব ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক তত্ত্ববিদই এইমত প্রকাশ করেছেন যে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব হিসেবে খুবই মূল্যবান, কিন্তু সঠিক অর্থে তার বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য।

শক্তির ভারসাম্য ঃ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সমাজের পরিবর্তন ঘটে নানাভাবে। এই ব্যবস্থাকে আমরা যদি একটি মুদ্রা বলে মনে করি, তাহলে তার একপিঠে ছিল দ্বিমেরুপ্রবণতা যার প্রকাশ ছিল ঠান্ডা লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে। আর অপরপিঠে ছিল নয়া ঔপনিবেশিকতার প্রবল প্রতাপ যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত ছিল। দ্বিমেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন এক শক্তিসম্পর্কের সূচনা করেছিল যার ফলে দীর্ঘদিনের প্রচলিত শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থাকে আর ফিরিয়ে আনা যায়নি। পামার ও পারকিনস এই পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য

অনেকগুলি উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন জাতীয়তাবাদ, শিল্পায়ননীতি, গণতন্ত্র, জনশিক্ষা, যুদ্ধের নতুন পদ্ধতি ও কৌশল, জনমতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইনের গঠন, ক্রমসংকুচিত বিশ্বে রাষ্ট্রগুলির ও ব্যক্তির পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা, উপনিবেশগুলির অবলুপ্তি, নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব, পারমাণবিক যুগের সূচনা — সব মিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগকে এমন জটিল করে তুলেছে যে এখানে আর সেই সহজ সাবেকি শক্তির ভারসাম্যনীতি কাজ করছে না।[১০]

তাছাড়াও বলা যায় যে ১৯৯০ সালে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বের অবসান হয়। সূচনা হয় এককেন্দ্রিক বিশ্বের যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ধীরে ধীরে নয়া ঔপনিবেশিকতার প্রক্রিয়া জন্ম নেয় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার। আন্তর্জাতিক বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব পুঁজির নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। এতদিনের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলি সংকটের সম্মুখীন হয়। জে. এন্. রোসনাউ-এর মতে এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণাটি পুরনো হয়ে গেছে। বর্তমানে ধীরে ধীরে যে ব্যবস্থাটি জন্ম নিচ্ছে তাকে আমরা বলতে পারি উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি।[১১]

ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে ইউরোপ মহাদেশকে যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার তাগিদে শক্তির ভারসাম্য ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল। আজকের জটিল আন্তর্জাতিক পৃথিবীকে যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সেই কৌশল আর কোনমতেই কার্যকরী হবে না। তাই পৃথিবীর অস্তিত্বরক্ষার জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞরা নতুন কোন কৌশল খুঁজে পান কি না, উত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি সেই প্রতীক্ষায় থাকবে।

সূত্র-নির্দেশ

১। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ঃ দ্য এন্ড অফ্ হিস্ট্রি?, *দ্যা ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট*, নং ১৬, ১৯৮৯, পৃ: ৩-১৬।

২। জাঁ বোঁদা — *সিক্স বুকস অন্ দ্য কমনওয়েলথ*, অক্সফোর্ড, ইং ঃ বেসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৬৭, পৃ: ২৫, ২৮।

৩। জিওফ্রে পার্কার ঃ *ইউরোপ ইন ক্রাইসিস (১৫৯৮-১৬৪৮)*, ফনটানা প্রেস, ষষ্ঠ মুদ্রন, ১৯৯০, পৃ: ২৯৩।

৪। কারেন মিংগস্ট ঃ *এসেন্শিয়ালস অফ্ ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস*, ডব্লু. ডব্লু নর্টন এ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০১, পৃ: ২৮।

৫। যোসেফ ফ্রাঙ্কেল ঃ *ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ইন এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, চতুর্থ মুদ্রন, ১৯৮৮, পৃ: ১৬৭।

৬। ক্যারেন মিংগস্ট ঃ *এসেনশিয়ালস অফ্ ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস*, ডব্লু. ডব্লু. নর্টন এ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় মুদ্রন, ২০০১, পৃঃ ৩০।

৭। আইবিড., পৃঃ ২৯।

৮। আইবিড., পৃঃ ৩২।

৯। আইবিড., পৃঃ ৩৬-৩৭।

১০। পামার এ্যান্ড পারকিনস্ ঃ *ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস্*, সি. বি. এস. পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটারস, তৃতীয় মুদ্রন, (প্রথম ভারতীয় মুদ্রন, ১৯৮৫), পৃঃ ২৩১

১১। জেমস্. এন্. রোসনাউ ঃ *টারবুলেন্স ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স, ব্রাইটন, হারভেসটর হুইটসেফ,* পৃ. ৬ ৭।

সারাংশ

জুসীবাদ ও উত্তর কোরিয়ার রাজনীতি

মর্তুজা খালেদ

জুসীবাদ একটি দার্শনিক মতবাদ যা নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর কোরিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনসহ জীবনের সকল দিক। এ মতবাদ গড়ে উঠেছে মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, খ্রিষ্টধর্মতত্ত্ব, কনফুসীয়বাদ ও জেনোফোবিয়া (এ মতবাদে বিদেশীদের ঘৃণা করা হয়)-এর সংমিশ্রণে যাতে বলা হয় কোরীয় জনগণের গন্তব্য তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে। জুসী কোরিয়ান শব্দ যার অর্থ স্বনির্ভরতা, এ মতবাদে কোরিয়াকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল এক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। জুসীবাদের দু'টি দিক রয়েছে একটি তার দার্শনিক দিক যা জগৎ ও মানব সভ্যতা অনুসরণ করে, দ্বিতীয় তার অনুশাসনের দিক যা জনগোষ্ঠীকে মেনে চলতে হয়। এ মতবাদে স্রষ্টা উত্তর কোরিয়ার স্থপতি কিম জন ইলের মতে, "The history of social development is the history of man's independence, creativity and consciousness" জুসীবাদের অনুশাসনের ধারায় বলা হয়, কোন জনগোষ্ঠী নেতার অধীনে সংগঠিত না হলে তাদের বিপ্লবী আদর্শ অর্জনে সক্ষম হবে না। নেতা জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বিপ্লবের পথে চালিত করবেন। জুসীবাদে মানুষের বস্তুগত জীবনের চাইতে তার সমষ্টিগত জীবন ও রাজনৈতিক সংগঠিত হওয়াকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে বলা হয় দৈহিক জীবনের চাইতে রাজনৈতিক জীবন অধিকতর মূল্যবান। এভাবে জুসীবাদে নেতা ঐশ্বরিক সম্মান ও আনুগত্য দাবী করেন। ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টি জুসীবাদের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে কনফুসীয় দর্শনের অনুগত থাকার নীতি অনেকাংশে জনগণের উপর আরোপ করেন।

জুসীবাদের মতবাদ আলোকপাত করে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক আন্দোলনের মৌল নীতিমালাসমূহ। এ মতবাদে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও গুরুত্বের মূল্যায়ন করা হয়েছে। জুসীবাদ অনুযায়ী মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের বস্তুগত জীবনের সাথে সাথে রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অখন্ড জীবন। বস্তুগত আকৃতি তাকে জৈবিকভাবে বাঁচিয়ে রাখে আর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন তার জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক এক উপাদান। মানুষের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পায় কেবলমাত্র তার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। সচেতনা হলো সামাজিক মানুষের বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে জগৎ ও জগতের নিয়মগুলি উপলব্ধি করতে যা পৃথিবী

পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তা উপলব্ধি করার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর পরিবর্তনকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সৃষ্টিশীলতা, সচেনতা ও চাজুসং মানুষকে পৃথিবীর অন্য প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠতর প্রাণীতে রূপান্তর করেছে এবং মানুষকে পরিণত করেছে শক্তিমান, ফলে মানুষ আর অদৃষ্ট নির্ভর নয় বরং মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। "The Juche idea established a man-centred outlook on the world by throwing a fresh light on the essential characteristics of man and his position and role in the world"। জুসীবাদকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমত, সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। এ মতবাদ অনুযায়ী, মানুষ হলো পৃথিবী ও তার নিজের ভাগ্য নির্ধারক। এখানে অদৃষ্টবাদ, আধিভৌতিকবাদ, ভাববাদ সব কিছুকে অস্বীকার করে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ সচেতনাসহ সামাজিক এক প্রাণী যে প্রজ্ঞার দ্বারা পৃথিবীকে পরিবর্তন করে নিজের উপযোগী করে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ স্বাধীন এক প্রাণী। কোরিয়ান শব্দ চাজুসং অর্থ সামাজিক মানুষ যে বাস করতে ও বিকশিত হতে চায় স্বাধীন, সজ্ঞানতা ও সৃষ্টিশীলতার সাথে। মানুষের দৈহিক জীবন ছাড়াও থাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্ত্বা তাকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে। একই সাথে মানুষ প্রকৃতি ও সমাজেরও রূপান্তর ঘটায় ও তা সকলের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এটা করে মানুষ পুরাতনের পরিবর্তন ও নতুনের সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, "The masses of the people are the subject of social history"। এটা উপলব্ধি করা অপরিহার্য যে কারা ইতিহাস সৃষ্টি করে। জুসীবাদ অনুযায়ী শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। তারাই সমাজের প্রগতিশীল অংশ। শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃতি ও সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা থেকেই ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত, বস্তুজগতের মতো সমাজও পরিবর্তিত হয়। সমাজে পরিবর্তন ঘটে কিছু নিয়ম অনুসরণ করে। "society, too, changes and develops in accordance with a certain law, not by man's own will." এ নিয়মগুলি সাধারণভাবে সকল সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তবে ক্ষেত্র বিশেষ এ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হলো সমাজের বিকাশকে উপলব্ধি করে বিপ্লব সংগঠনের নিয়মগুলি জানা। জুসীবাদে আলোকপাত করা হয়েছে সামাজিক আন্দোলনের মৌলসূত্রগুলি। বিশেষ করে শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবী আন্দোলনের দিকে যারা সৃষ্টি করে ইতিহাস।

জুসীমতবাদকে মার্কসবাদের বিকশিত রূপ বলে এর স্রষ্টারা মনে করেন না। মার্কসবাদ বস্তুর সাথে স্বজ্ঞানতার সম্পর্ক বস্তুর সাথে চিন্তার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে যা ছিল দর্শনের এক মৌলিক প্রশ্ন। মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করেছে জগৎ বস্তু দিয়ে তৈরী ও তা পরিবর্তনশীল। অপরদিকে জুসীবাদ ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর সাথে মানুষের সম্পর্ক ও পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা। যদিও জুসীবাদ ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকবাদের নিয়মগুলি মেনে চলে তবে মার্কসীয় দর্শনসহ পূর্বের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে অবস্থান করে জুসীবাদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ মতবাদে সর্বপ্রথম যথার্থভাবে পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে বস্তু জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা। মার্কসবাদ বস্তু জগত কে ব্যাখ্যা করে তা বিকাশের নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধ করেছে। অপরদিকে জুসীবাদ ব্যাখ্যা করে মানুষের অপরিহার্য বৈশিষ্টাবলী ও সামাজিক অস্থিরতা ও মানবসৃষ্ট আন্দোলনসমূহের কারণ।

জুসীমতবাদকে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তবে জুসীবাদ মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নীতিগুলি সমর্থন করে। জুসীবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষ ও সে পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। সামাজিক আন্দোলন হলো মানুষের আন্দোলন যারা আধিপত্য বিস্তার করেছে ও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে পৃথিবীর।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতাসীন ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব স্ট্যালিন বিরোধী নীতির পাশাপাশি কমিউনিস্ট বিশ্বের একনায়কতান্ত্রিক শাসনসমূহের সমালোচনা করা শুরু করে। এ সময় তারা উত্তর কোরিয়া নেতা কিম ইল সাং এর সমালোচনা করে কোরিয় যুদ্ধে অসফলতার জন্য তাকে ব্যর্থ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কিম ইল সাং বাধ্য হন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক শিথিল করতে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ যে সংশোধনবাদী ধারার সূত্রপাত ঘটান তা ক্রমেই বিশ্বের সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকেও প্রভাবিত করে ও সকল দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। এ পরিবর্তন উত্তর কোরিয়ার রাজনীতিকেও স্পর্শ করে। এখানেও নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবী ক্রমশ জোরাল হয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘ কোরিয় যুদ্ধের ধকল সামলে উঠে পুনর্গঠনের পথে এগোচ্ছিল এ নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসন সংস্কারের পাশাপাশি এ সংশোধনবাদী বিষয়গুলি প্রতিরোধের পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হয় ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টি ও উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম ইল সাং কে।

১৯৫৫ সালে প্রথম উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ওয়ার্কার্স পার্টি দেখেছিল আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত স্বাধীনতা রক্ষা ও অন্য দেশকে অনুকরণ না করার বিষয়টি। মূলত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যই জুসীবাদের আর্বিভাব ঘটে।

উত্তর কোরিয়ার নেতৃবৃন্দ জুসীবাদ প্রবর্তনের কারণ হিসেবে বলেন তা কোরিয়ার জন্য অপরিহার্য ও ঐতিহাসিক এক প্রয়োজন। সময়ের দাবী মেটানোর জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। উনবিংশ শতকে মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদ থেকে মুক্তির পথনির্দেশ প্রদান করেছেন মার্কসবাদের দ্বারা। একইভাবে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদে উত্তোরণ ঘটে তা থেকে জনগণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ আবিষ্কার করেন। বিশ শতকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি শ্রমজীবী জনগণের ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোরিয়ায় নিষ্পেষিত জনগণই রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে। জুসীবাদ এই নতুন সময়ে ঐতিহাসিক দাবী মেটানোর জন্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

জুসীবাদকে এ সময় রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উত্তর কোরিয়ার সংবিধানের ৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তর কোরিয় সরকার, "Shall make the Juche ideology of the Workers' party the guiding principle for all its actions" এবং ওয়ার্কার্স পার্টির গঠনতন্ত্রে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত জুসীবাদ ব্যবহৃত ১৯৬০ এর দশকে চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব থেকে উত্তর কোরিয়ার সমান দূরত্বে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে। উত্তর কোরিয়ার সৃষ্টি এবং তার অব্যবহিত পরই কোরিয় যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। দুটি রাষ্ট্রই ভৌগলিকভাবে কোরিয়ার সন্নিকটে। উভয় রাষ্ট্রের সাথে উত্তর কোরিয়ার সমান রাষ্ট্রীয় ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান, ফলে ১৯৬০ দশকের চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বে উত্তর কোরিয়া বিব্রতকর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। দেশের অভ্যন্তরেও চীন-সোভিয়েত উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে মতাদর্শিক গ্রুপ গড়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সকল পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য প্রয়োজন ছিল কোরিয়ার এক স্বতন্ত্র নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ। যার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে জুসীবাদ।

১৯৫৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম জুসীবাদের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করেন উত্তর কোরিয় শাসক কিম ইল সাং শ্রমিকদের এক জনসভায়। তখন তিনি কথাটা

এভাবে বলেন, "আদর্শগত কার্যক্রম থেকে গোঁড়ামী ও আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে স্থাপন করতে হবে জুসী" এর পর ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা করা হয় নি। সে সময় জুসীবাদ সম্পর্কে আবার নতুন করে আলোকপাত করা হয় এবং তা করা হয় মতাদর্শিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য। এ সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন পথ অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী আলেক্সী এন. কোসিগিনের উত্তর কোরিয়া ভ্রমণের সময় কিম ইল সান উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করেন, "complete equality, sovereignty, mutual respect, and noninterference among the communist and workers' parties." পরবর্তীকালে কোরিয় তাত্ত্বিকগণ এই মতের আলোকে উত্তর কোরিয়ার চারটি নীতির কথা ঘোষণা করেন। সেগুলি প্রথমত মতাদর্শের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, দ্বিতীয়ত স্বাধীন রাষ্টীয় নীতি, তৃতীয়ত স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি এবং চতুর্থত আত্মনির্ভরশীল নিরাপত্তা। এই নীতি কোরিয় ভাষায় সংক্ষেপে তা Juche নামে পরিচিত হয়।

উত্তর কোরিয়ায় রাজনৈতিক লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি ও দুই কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণ কার্যকর করার জন্য জুসীবাদ ব্যবহার করা হচ্ছে। জুসীবাদকে সামনে রেখে উত্তর কোরিয়ায় সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম ইল জং এর মতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র জুসীবাদ। এ সংগ্রাম হলো জুসী চরিত্র সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র সংরক্ষণ। সাম্রাজ্যবাদ এখন অনেক বেশী করে ইচ্ছাকৃতভাবে জুসীবাদ ধ্বংসে তৎপর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জুসীবাদই উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র। আবার এখানে বলা হয় জুসীবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে উত্তর কোরিয়া উভয় কোরিয়ার একত্রীকরণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জুসীবাদ নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর কোরিয়ার সকল অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তর কোরিয় শাসক দল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ং সম্পূর্ণতা কার্যকর করার নীতিতে বিশ্বাসী। জুসীবাদ মনে করে পুঁজিবাদ জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। জুসীবাদ উত্তর কোরিয়ার সকল অর্থনীতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তর কোরিয় সরকার সকল বিষয়ে যে স্বনির্ভর হবার নীতি বিশ্বাস করেন একই ভাবে তা তাদের অর্থনীতিতেও প্রয়োগ করতে তারা তৎপর। এ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উত্তর কোরিয় শাসক কিম ইল জং অর্থনীতি সংস্কার করে কোন পুঁজিবাদী ধারা অর্থনীতির সাথে সংযোগ করতে আগ্রহী নন। জুসীবাদ উত্তর কোরিয়ায় সমাজ-সংস্কৃতি, পরিবার, শিক্ষা এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে মিশে রয়েছে এর প্রভাবে উত্তর কোরিয়া বেশী করে জাতীয়তাবাদী ও চূড়ান্তভাবে কিম জং ইলের প্রতি অনুগত। জুসীবাদ পাশ্চাত্যের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ধারণার বিপরীতে সামাজিক সমষ্টিগত জীবনযাপনের ধারণাকে উৎসাহিত করে।

জুসীবাদের ব্যবহারিক দিকগুলি পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই, ১. সামাজিক জীবনে রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রাখতে হবে। ২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বজায় রাখা। যেহেতু অর্থনীতি সামাজিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই অর্থনৈতিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা সক্ষম করে তোলে একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনভাবে চলার পথ। ৩. প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পর নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে তাই রাষ্ট্রের থাকবে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

উপসংহার - জুসীবাদ তাত্ত্বিক এক মতবাদ যার দ্বারা বিশ্ব ও তার পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারা ব্যাখ্যা করা যায়। উত্তর কোরিয় ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ এ মতবাদকে ব্যবহার করেছেন তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখা ও উত্তর কোরিয়ায় বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য। জুসীবাদে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে আদর্শগত ও রাজনৈতিক পথে জনগণকে চালিত করার লক্ষ্যে। এ মতবাদে জনগণের ব্যক্তি অধিকার ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয় সমষ্টিগত জীবনকে। এ মতবাদ গড়ে উঠেছে উত্তর কোরিয়ার বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পর্ক রেখে। জুসীবাদ ব্যবহার করে একদিকে উত্তর কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টির অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব ও অপরদিকে এর দ্বারা দূর করা হয়েছে দলীয় অনৈক্য। মার্কসবাদের সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার না করলেও জুসীবাদে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষাই অনুসরণ করা হ.‍ েছে এবং তা অনুসরণ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌল নীতিগুলি। ১৯৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের ফলে মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারণার প্রতি যখন সারা বিশ্বের জনগণ সন্দিহান হয়ে পড়ে তখন উত্তর কোরিয়ার জনগণ জুসীবাদ ব্যবহার করে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হুমকি মোকাবিলা করে তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। সুতরাং উত্তর কোরিয়ার রাজনীতিতে জুসীবাদের ভূমিকা অপরিসীম।